মনোবিদ্যা

(ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী দর্শন-পাঠ্যক্রম অনুসারে লিখিত)

Written in accordance with the latest syllabus of the 3-year Degree Philosophy Course (Psychology Paper)

শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য এম.এ. (দর্শন), এম.এ. (মনোবিদ্যা),
গোল্ড্ মেডালিস্ট্, গ্রিফিথ্ প্রাইজ্ম্যান্,
অধ্যক্ষ, দর্শন বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ; অধ্যাপক,
দর্শন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; প্রাক্তন
অধ্যাপক, সায়েন্স কলেজ, মনোবিদ্যা বিভাগ ;
বিদ্যাসাগর কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ,
মৌলানা আজাদ কলেজ, ভিক্টোরিয়া ইন্স্টিট্যুশন,
উইমেন্স্ কলেজ, কলিকাতা।

মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৺পিতৃদেব এবং ৺মাতৃদেবীর শ্রীচরণোদ্দেশ্যে
মনোবিদ্যা গ্রন্থখানি নিবেদিত হইল।

ভূমিকা

ভগবদিচ্ছায় ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী শ্রেণীর পাঠ্যক্রম অনুসারে মাতৃ-ভাষায় লিখিত "মনোবিদ্যা" বাহির হইল। আটাশ বৎসর মনোবিদ্যা অধ্যাপনায় শিক্ষার্থিগণের এই বিষয় সম্বন্ধে কতগুলি অসুবিধা চোখে পড়িয়াছে। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টাই বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে মনোবিদ্যার সহজ বিষয়গুলির সঙ্গে সঙ্গে কঠিন বিষয়গুলির বিস্তৃত ও বিশদ আলোচনা স্থান পাইয়াছে। মনোবিদ্যার গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া, উহার যথার্থ রূপ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টাই এই গ্রন্থরচনার লক্ষ্য। এই চেষ্টা কতটুকু ফলবতী হইয়াছে পাঠকমণ্ডলীই তাহা বিচার করিবেন।

যাহাতে বিষয় খুঁজিয়া বাহির করিতে অসুবিধা না হয়, সেই উদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রমের বিন্যাস অনুসারে গ্রন্থের পরিচ্ছেদগুলি পূর্বাপর-ক্রমে বিভক্ত ও বিন্যস্ত হইয়াছে। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদকে যথাসম্ভব ক্ষুদ্র এবং উহার অনুচ্ছেদগুলি বিভক্ত করিয়া পাঠকের মনোযোগকে বিশ্রাম দেওয়া হইয়াছে। আবার শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে পাঠ্য-পুস্তকাংশ নির্দেশিত এবং সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ও প্রশ্নোত্তরের পৃষ্ঠা-সংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে।

গ্রন্থটি পাস্ শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে লিখিত হইল। কিন্তু ইহা দ্বারা অনার্স ছাত্রছাত্রীরাও উপকৃত হইবেন। তথ্যাংশের সহিত তত্ত্বাংশের বিশ্লেষণ ও আলোচনা, প্রয়োগমূলক গবেষণার ব্যাখ্যা, চিত্র, রেখাঙ্কন ও তালিকা সাহায্যে উহার অবতারণা এবং খণ্ড, পরিচ্ছেদ ও পৃষ্ঠাসংখ্যা দেখাইয়া প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির উল্লেখ শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য সাধন করিবে।

এই সকল কারণে, চেষ্টা করিয়াও গ্রন্থখানি ছোট করা যায় নাই। গ্রন্থের কলেবর দর্শনে ভীত না হইয়া উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে সচেষ্ট হইলে, পাঠার্থিগণ লাভবান হইবেন বলিয়া বিশ্বাস।

গ্রন্থে অনাবশ্যক উদ্ধৃতি আলোচনার সহায়ক নয় বলিয়া উহা পরিহার করা হইয়াছে। পরিচ্ছেদান্তে উল্লিখিত পাঠ্যপুস্তকাংশ দেখিয়া প্রামাণ্য গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠার্থীর সুবিধা হইবে। গ্রন্থের মধ্যে পরিচ্ছেদান্তে প্রশ্নাবলী ছাড়া কোথায়ও ইংরাজী হরফ ব্যবহৃত হয় নাই। ইংরাজী হরফগুলিও বাংলায় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থপাঠে অগ্রসর হইলেই পাঠার্থীর প্রাথমিক অসুবিধার অবসান ঘটিবে। গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত তালিকা হইতেই লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই তালিকা অসম্পূর্ণ। কাজেই কতগুলি নূতন পারিভাষিক শব্দ তৈয়ারী করিতে হইয়াছে।

এই গ্রন্থের সমর্থিত দৃষ্টিভঙ্গী স্টাউট্, ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণের মতানুবর্তী। মনোবিদ্যা যে একটি বিজ্ঞান এবং উহার দৃষ্টিভঙ্গী যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পৃথক্, এই বিষয়ে পাঠককে অবহিত রাখিয়া, মনোবিদ্যার যথার্থ রূপটি তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

পাঠার্থীর সুবিধার্থে, গ্রন্থশেষে পারিভাষিক শব্দের তালিকা, নামনির্দেশিকা এবং বিষয়নির্দেশিকা দেওয়া হইল।

কিন্তু যত্ন সত্ত্বেও, গ্রন্থে কয়েকটি ত্রুটি রহিয়া গেল। যেমন, চিত্র এবং অনুচ্ছেদগুলির পূর্বাপর সংখ্যা নির্ভুল হয় নাই। মুদ্রাকর প্রমাদও ঘটিয়াছে। যেমন, ৪৯ পৃষ্ঠার শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'শারীরী' স্থানে 'শরীরী', ৭৬ পৃষ্ঠায় 'সাকেকা-নিওরোসিস্' স্থানে 'সাইকো-নিওরোসিস্', ১৯৪ পৃষ্ঠায় 'নণয়ের' স্থলে 'নির্ণয়ের', আবার ৩৯৭ পৃষ্ঠার পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে 'একটি ছোট' এর পরে 'এবং একটি বড়' এবং ৫৭১ পৃষ্ঠার পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে 'হয়' স্থলে 'নয়' হইবে। গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণে আরও অনেক ভুল থাকা সম্ভব। পাঠক নিজগুণে এই অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।

এই গ্রন্থরচনার মূল উৎস ছাত্রছাত্রীগণের আগ্রহ এবং অধ্যাপক-

গণের উৎসাহ। স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ রামচন্দ্র পাল, ঝাড়গ্রাম সরকারী কলেজের দর্শনাধ্যক্ষ ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ বসু, বাঁকুড়া খ্রীশ্চান কলেজের অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার রায়, উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীতপন চক্রবর্তী, গ্রন্থকারকে গ্রন্থরচনায় উৎসাহিত না করিলে, তাঁহার অলস লেখনী সক্রিয় হইত না এবং গ্রন্থটি প্রত্যক্ষ দিবালোকে আত্মপ্রকাশ করিত না। তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন বাহুল্য হইলেও, অবশ্য কর্তব্য।

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট্ লিমিটেড্-এর স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় অসুস্থতা সত্ত্বেও নিরলসভাবে এবং বিপুল আগ্রহে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকারকে দৃঢ় কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

যাহাদের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ লিখিত হইল, সেই ছাত্রছাত্রীগণ ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইলেই, সকল শ্রম সার্থক বলিয়া মনে হইবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ,
কলিকাতা
৮ই আষাঢ়, ১৩৭০
রথযাত্রা

শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী

(দি সাইকলজিক্যাল পয়েণ্ট অফ্ ভিউ)

১। মন কাহাকে বলে

মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী বুঝিতে হইলে 'মন' ও 'বিদ্যা' বলিতে কি বুঝায় তাহা জানা দরকার, কারণ মনের বিদ্যা অথবা মনের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাই মনোবিদ্যা।

মন সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই বলি। এই লোকটির মন খুব উঁচু অথবা ঐ লোকটির মন খুব নীচু, অমুকের মন আজ ভাল নাই অথবা অমুকের মন আজ খুব ভাল আছে, এই জাতীয় কথা বলিয়া আমরা মন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু যে মন সম্বন্ধে আমরা উঁচু, নীচু, ভাল নাই, ভাল আছে, প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করি সেই মন বস্তুটি কি? মনের কোনো রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ বা গন্ধ নাই। সুতরাং উহাকে চক্ষু দিয়া দেখা, জিহ্বা দিয়া আস্বাদন করা, নাক দিয়া আঘ্রাণ করা, কান দিয়া শোনা এবং ত্বক্ দিয়া স্পর্শ করা যায় না। তবেই মন আদপে আছে কি না তাহাই একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। আবার ইহা থাকিলেও উহাকে জানিবার উপায় কি তাহাও একটি প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর আপাততঃ স্থগিত থাকুক। কিন্তু প্রথম প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া দরকার, কারণ মন না থাকিলে মনোবিদ্যার কোনো অর্থ থাকে কি না তাহা সন্দেহের বিষয়।

মনের ক্রিয়া

মনের উল্লিখিত বিশেষণগুলি ক্রিয়ার্থক। মন ক্রিয়ায় প্রকাশিত হয় অথবা মন কাজ করে যাহা বুঝাইবার জন্য আমরা উহাকে উঁচু, নীচু, ভাল নাই বা ভাল আছে প্রভৃতি বলি। যেমন যাহার মন পরের সুখদুঃখে কাতর হয় তাহাকে আমরা বলি সহানুভূতিশীল বা উচ্চাশয়। আবার যে ব্যক্তি অন্যের কথা ভাবে না, কেবল নিজ সুখদুঃখেই লীন থাকে তাহাকে বলা হয় নীচাশয় বা স্বার্থপর। যে ব্যক্তি কান্নাকাটি করে বা চোখের জল ফেলে তাহাকে বলা

যায় দুঃখিত বা বিষণ্ণ। আবার যে ব্যক্তি হাসে বা নাচে তাহাকে বলা যাইতে পারে সুখী বা প্রফুল্ল।

তাহা হইলে মন আসলে যাহাই হউক না কেন, আমরা উহাকে উহার কাজ দিয়া জানিতে পারি। মন অনেক রকমের কাজ করে এবং আমরা ঐ কাজগুলির সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত। মন সুখদুঃখ অনুভব করে, ইচ্ছা বা চেষ্টা করে এবং চিন্তা করে। কোন সমস্যায় পড়িয়া আমরা অস্বস্তি বা দুঃখ অনুভব করি, উহার সমাধান করিবার ইচ্ছা বা চেষ্টা করি এবং কি করিয়া সমস্যার সমাধান হইবে তাহা চিন্তা করি। সমস্যায় পড়িবার অস্বস্তি বা দুঃখবোধ থাকিলেই উহার সমাধান করিয়া স্বস্তি বা সুখ লাভ করিবার চেষ্টা হয় এবং সমাধানের জন্য চিন্তা করিতে হয়।

তাহা হইলে সুখদুঃখ অনুভব, ইচ্ছা এবং চিন্তা, বা অবগতি এই সবগুলিই মনের ক্রিয়া। মনের সকল ক্রিয়াকেই এই তিন শ্রেণীর কোনো না কোনোটির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আবার এই প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যে একাধিক মানসক্রিয়া রহিয়াছে। যেমন চিন্তনের অন্তর্ভুক্ত মানসক্রিয়াগুলি হইল সংবেদন, প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ, স্মৃতি, কল্পনা, বিশ্বাস,[১] প্রত্যয়, অবধারণা, বিচার প্রভৃতি। আবার ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত মানসক্রিয়াগুলি হইল প্রতিবর্ত, স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ, ভাবজ প্রভৃতি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া এবং অভ্যাস,[২] কামনা, ইচ্ছা, অভিপ্রায়, সঙ্কল্প, মনোযোগ প্রভৃতি ঐচ্ছিক ক্রিয়া। তৃতীয়তঃ অনুভূতির অন্তর্ভুক্ত মানসক্রিয়াগুলি হইল সুখদুঃখ, বেদনা, ভয়, ক্রোধ, ভালবাসা, আনন্দ, বিষাদ প্রভৃতি প্রক্ষোভ এবং সত্য, শিব, সুন্দর এই আদর্শত্রয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট রসগুলি। ইহা ছাড়াও মনের অগণিত বৃত্তি বা ক্রিয়া আছে।

মানসবৃত্তির ত্রিধা বিভাগ

উপরে মনের কাজ তিন প্রকারের বলা হইয়াছে—যথা চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা। মানসবৃত্তির এই ত্রিধা বিভাগ (ট্রাইপার্টাইট ক্ল্যাসিফিকেশন্) সকল মনোবিৎ স্বীকার করেন নাই। মানসবৃত্তির এই ত্রিধা বিভাগের মূলে

১. বিশ্বাস শুধু চিন্তামূলক নয়। ইহার ইচ্ছামূলক এবং অনুভূতিমূলক দিকগুলি 'বিশ্বাস' পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে।

২. অভ্যাস যেমন ঐচ্ছিক তেমন অনৈচ্ছিক ক্রিয়াও বটে। ইহা মুখ্যভাবে ঐচ্ছিক হইলেও গৌণভাবে অনৈচ্ছিক। বিশদ আলোচনার জন্য 'অভ্যাস' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

রহিয়াছেন ক্রিশ্চিয়ান্ উল্ফ, মেণ্ডেলোশন, রুশো, টিটেন্স্ ও কাণ্ট্। কাণ্ট্ অবশ্য এই ত্রিধা বিভাগের নামতঃ উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার মনে করেন যে তাঁহার লিখিত তিনখানি ক্রিটিক্-এর সমানুপাতিক তিনটি মানসবৃত্তি আছে—যথা ক্রিটিক অব্ পিওর রিজ্ন্-এর সমানুপাতিক হইল চিন্তা, আবার ক্রিটিক্ অফ্ প্র্যাকটিকাল রিজ্ন্-এর ইচ্ছা এবং ক্রিটিক্ অফ্ জাজ্মেণ্ট্-এর অনুভূতি।

প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকেই কিন্তু মানসবৃত্তির এই ত্রিধা বিভাগ স্বীকার করেন নাই ; যেমন অ্যারিস্টটল্ চিন্তা ও ইচ্ছাকেই মনের দ্বিধা বৃত্তিভেদ (বাইপার্টাইট্ ক্ল্যাসিফিকেশান্) নির্দেশ করিয়াছেন। সাম্প্রতিক মনোবিদ্গণ প্রধানতঃ মনের ত্রিধা বিভাগবাদী। যেমন টিশ্নার বলেন যে সংবেদন, অনুভূতি এবং প্রতিরূপই মনের ত্রিবিধ বৃত্তি। কিন্তু রীড্ স্টিওয়ার্ট্, স্পেন্সর, মাহের্ প্রভৃতি মনোবিদ্গণ আবার মানসবৃত্তির দ্বিধা বিভাগবাদী। প্রথম দুইজন মননশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, স্পেন্সর অনুভূতি এবং অনুভূতির সম্বন্ধ এবং মাহের সংবেদনাত্মক এবং মননাত্মক ক্রিয়াতে মানসবৃত্তিব শ্রেণীভেদ করিয়াছেন।

মনের আসল রূপ

মনের একটি আসল রূপ বা স্বরূপ থাকিতে পারে বা নাও থাকিতে পারে। কিন্তু এই প্রশ্ন মনোবিদ্যার আলোচ্য নয়। এই ক্রিয়াগুলি যে মনেরই তাহাতে অনেক মনোবিৎ সন্দেহ করিয়াছেন। যেমন জড়বাদীরা উহাদিগকে শরীরের ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করেন। আবার চেষ্টিতবাদীরা (বিহেভিয়রিস্ট) মনে করেন যে নার্ভতন্ত্র এবং মস্তিষ্ক সাহায্যেই তথাকথিত মানসবৃত্তিগুলিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

মনের অস্তিত্ববিরোধী এই জাতীয় মতগুলি যথার্থ কি না তাহা মনোবিদ্যার বিচার্য নয়। মনোবিদ্যার পক্ষে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে দেহের অতিরিক্ত মন স্বীকার না করিলে মানসক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। স্টাউট্, ম্যাকডুগ্যাল্ প্রভৃতি মনোবিদ্গণের মতে উদ্দেশ্যাভিমুখিতাই মানসক্রিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ সকল মানসবৃত্তিই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মনের এই উদ্দেশ্যাভিমুখিতার প্রতি সুবিচার করিতে হইলে জড়বাদ বা চেষ্টিতবাদ গ্রহণ করা চলে না।

মানসক্রিয়া ছাড়াও মনের একটি পৃথক্ সত্তা অথবা স্বরূপ আছে কি না তাহা মনোবিদ্যার জিজ্ঞাস্য নয়। অথচ এই পৃথক্ সত্তা স্বীকার না করিলেও মনোবিদ্যার পক্ষে অগ্রসর হওয়া কঠিন। যে ব্যক্তিকে কাল দেখিয়াছিলাম তাহাকেই এখন দেখিতেছি এই প্রকারের স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ ইহা স্বীকার করিলে, মন যে মানসক্রিয়ার অতিরিক্ত একটি পৃথক্ সত্তা, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। যে আমি ঐ ব্যক্তিকে কাল দেখিয়াছিলাম সেই আমিই উহাকে আজ দেখিয়া চিনিতেছি। কাল এবং আজ সাক্ষাতের মধ্যবর্তী কালে হয়ত ঐ ব্যক্তির কথা একেবারেই আমার মনে হয় নাই। অথচ এই দুই দিনের ব্যবধান কালেও ঐ ব্যক্তিটির কথা অবশ্যই আমার মনে ছিল। আবার, কোনো ব্যক্তির জীবনে, তাহার প্রথম সংজ্ঞান মুহূর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সংজ্ঞান মুহূর্ত পর্যন্ত, কত ঘটনাই ঘটিয়াছে। অথচ এই পরিবর্তনশীল ঘটনাগুলি যে তাহার জীবনেরই ঘটনা ঐ ব্যক্তির সেই জ্ঞান আছে। এই ঘটনাগুলি তাহার জীবনে পূর্বাপরভাবে একই সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে। একটি পৃথক্ সত্তা রূপে মন না থাকিলে চেতনার এইরূপ একত্ব ও অবিরামত্ব বোধ (ইউনিটি অ্যাণ্ড কন্‌টি-নুইটি অব্ কনসাস্‌নেস্) থাকিতে পারে না।

এই সকল কারণে স্টাউট্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ মনে করেন যে যদিও পৃথক্ মানসসত্তা মনোবিদ্যার বিষয় নয়, তথাপি উহা মানিয়া লইয়াই মনোবিদ্যার আলোচনায় অগ্রসর হওয়া উচিত।

আবার অন্যভাবেও মনকে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক বস্তুর মত মনেরও দুইটি দিক্ আছে। একটি উহার ভাসমান বা প্রতীয়মান (ফেনোমেন্যাল্) রূপ এবং অপরটি উহার আসল (নুমেন্যাল) রূপ বা স্বরূপ। মনের কাজ অথবা বৃত্তিগুলি উহার আসল রূপ নয়, কিন্তু ভাসমান রূপ। চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা মনের তিন প্রকার প্রকাশ মাত্র। উহাদের অতিক্রম করিয়াও মনের একটি অন্তর্নিহিত রূপ আছে যাহা সাধারণ জ্ঞানের অগোচর। মধ্য-যুগীয় দার্শনিকগণ মন বলিতে প্রধানতঃ ইহার স্বরূপ বা আসল রূপকেই বুঝিতেন। তাঁহারা এই গুহাহিত অথবা সাধারণ জ্ঞানের অগোচব কূটস্থ মনকেই মনোবিদ্যার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা মন ও আত্মার সহিত বিশেষ পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। সুতরাং তাঁহাদের মনোবিদ্যা ছিল বিচারসাপেক্ষ মনোবিদ্যা (র‍্যাশন্যাল্ সাইকলজি)।

আজকাল মনোবিদ্যা মনের আসল রূপ লইয়া মাথা ঘামায় না, কিন্তু ইহাকে তত্ত্ববিদ্যার (মেটাফিজিক্‌স্) বিষয় বলিয়া ছাড়িয়া দেয়। মনোবিদ্যার প্রথম প্রয়োগশালা বা ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করেন হ্বুণ্ড্ লাইপ্‌জিগ্-এ, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। বিশেষ করিয়া উহার পর হইতেই মনোবিদ্যার মুখ্য বিষয় হইয়া দাঁড়ায় মনের ভাসমান রূপ অথবা ক্রিয়াগুলি (অবশ্য হ্বুণ্ড্-এর পূর্বে হিউম্ প্রভৃতি দার্শনিকেরা মনের ভাসমান রূপকেই মনোবিদ্যায় বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন)। এইরূপে ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক মনোবিদ্যা (এক্স্‌পেরি-মেণ্ট্যাল্ সাইকলজি) স্থান গ্রহণ করে বিচার মনোবিদ্যার (র‍্যাশন্যাল্ সাইকলজি)। ব্যবহারিক মনোবিদ্যার মতে মনের কাজ, বৃত্তি বা পরিণামই মন। এইগুলির অতিরিক্ত কোনো অপরিণামী মন নাই, অথবা থাকিলেও, তাহা মনোবিদ্যার সীমানার বাহিরে। বলা যাইতে পারে যে চেষ্টিত মনোবিদ্যা ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক মনোবিদ্যার একটি চূড়ান্ত রূপ। এই মতে মন কতগুলি উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি মাত্র। এই মত যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচিত হইবে।

শরীরী মন

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে মনের স্বরূপ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। মনের আসল রূপ কি, এই প্রশ্ন মনোবিদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। মন বলিতে আমরা বুঝিব চিন্তা, ইচ্ছা এবং অনুভূতিমূলক মনের কাজ অথবা বৃত্তি। এই কাজগুলির কর্তা রূপে মনকে অস্বীকার করিবার কোন হেতু নাই। আবার প্রত্যেক মানসক্রিয়ার জন্য নার্ভতন্ত্রের (নার্ভাস্ সিস্‌টেম্) মধ্যস্থতা প্রয়োজন। চক্ষু না থাকিলে দর্শন অসম্ভব, কান না থাকিলে শ্রবণ এবং মস্তিষ্ক না থাকিলে সকল উচ্চতর মানসক্রিয়াই অসম্ভব। কাজেই মন বলিতে আমরা যাহা বুঝিব তাহা হইতে দেহকে বাদ দেওয়া যায় না। এই কারণে স্টাউট্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ বলিয়াছেন যে শরীরী মনই (এম্‌বডিড্ মাইণ্ড) মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। অশরীরী কোনো মন থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু উহা মনোবিদ্যার বাহিরে। শরীরের মধ্যস্থতায় মনের যে সকল বৃত্তি ঘটিয়া থাকে তাহার আলোচনাই মনোবিদ্যা।

সুতরাং যাহা শরীর সাহায্যে চিন্তা করে, সুখদুঃখ অনুভব করে, কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইচ্ছা, যত্ন বা চেষ্টা করে এবং যাবতীয় মানসক্রিয়া সম্পাদন

করে তাহাই মন। মনের বিভিন্ন ক্রিয়া বা বৃত্তি লইয়া যে বিজ্ঞান আলোচনা করে তাহাই মনোবিদ্যা।

২। বিদ্যা বা বিজ্ঞান

প্রকৃতির কোনো নির্দিষ্ট বিভাগ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মসমষ্টিকে বিজ্ঞান বলে। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই (১) একটি নির্দিষ্ট বিষয়, (২) এই বিষয় সম্বন্ধে কতগুলি সাধারণ নিয়ম বা সূত্র, (৩) একটি নির্দিষ্ট প্রণালী বা অনুসন্ধান পদ্ধতি, (৪) শৃঙ্খলা, (৫) ফলগুলির নিখুঁত নির্ণয় এবং নিশ্চয়তা থাকে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল অবলম্বন হইল পর্যবেক্ষণ (অবজার্ভেশন্)। নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পর্যবেক্ষণের নাম প্রয়োগ বা এক্সপেরিমেণ্ট। বৈজ্ঞানিক সত্য সার্বভৌম বা সর্বসাধারণ, কোনো ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নয়।

বিজ্ঞান প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ঘটনানিষ্ঠ (পজিটিভ্) এবং আদর্শনিষ্ঠ (নর্ম্যাটিভ্)। যে বিজ্ঞান উহার বিষয়বস্তুকে নিছক ঘটনারূপে, অর্থাৎ উহা ঠিক যেরূপে ঘটে সেইরূপে, ব্যাখ্যা করে এবং উহার কোনো মূল্যমান করে না তাহাকে বলে ঘটনানিষ্ঠ বিজ্ঞান। যেমন পদার্থবিদ্যা একটি ঘটনানিষ্ঠ বিজ্ঞান, কারণ উহা তাপ, আলোক, তড়িৎ, শব্দ, চুম্বক প্রভৃতি পদার্থগুলিকে ঘটনা হিসাবে আলোচনা করে। অপরপক্ষে যে বিজ্ঞান উহার বিষয়কে কোনো আদর্শের মানদণ্ডে ফেলিয়া উহার মূল্যায়ন করে তাহাকে বলে আদর্শনিষ্ঠ বিদ্যা। যেমন নীতিবিদ্যা, বস্তুতঃ মানুষ কিরূপ আচরণ করে তাহার আলোচনা না করিয়া, মানুষের কিরূপ আচরণ করা উচিত তাহা আলোচনা করে। সুতরাং নীতিবিদ্যা একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

আবার অন্য দিক্ দিয়া বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যামূলক (এক্সপ্ল্যানেটরি) এবং বর্ণনামূলক (ডেস্ক্রিপ্টিভ্) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে বিজ্ঞান বিষয়ের বিবরণ দিয়াই সন্তুষ্ট তাহাকে বলে বর্ণনামূলক বিজ্ঞান এবং যে বিজ্ঞান শুধু বিষয়ের বর্ণনাতেই সন্তুষ্ট না হইয়া উহার কারণ অনুসন্ধান করে তাহাকে বলে ব্যাখ্যামূলক বিজ্ঞান।

আর এক দিক দিয়া বিজ্ঞানকে ভাগ করা যায় জ্ঞাননিষ্ঠ (থিওরেটিক্যাল্) এবং কার্যনিষ্ঠ (প্র্যাক্টিক্যাল্) রূপে। যে বিজ্ঞান শুধু জ্ঞান লাভ করিবার জন্যই বিষয়ের আলোচনা করে তাহাকে বলে জ্ঞাননিষ্ঠ বিজ্ঞান। আবার যে

বিজ্ঞান বিষয়ের জ্ঞানকে কার্যে প্রয়োগ করে তাহাকে বলে কার্যনিষ্ঠ বা ব্যবহারিক বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের আরও একটি বিভাগ দ্রষ্টব্য—যেমন প্রাকৃতিক (ন্যাচারাল্) এবং সাংস্কৃতিক (কাল্চার‍্যাল্) বিজ্ঞান। যে বিজ্ঞান সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ পদ্ধতির সাহায্যে প্রাকৃতিক বিষয়ের আলোচনা করে তাহাকে বলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। পক্ষান্তরে যে বিজ্ঞান মনের উচ্চতর মূল্যবোধগুলিকে অনুভূতি ও সহানুভূতির সাহায্যে আলোচনা করে তাহাকে বলা যায় সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের একটি সাধারণ বিভাগ মনে রাখা দরকার—যথা জড় (ফিজিক্যাল্), জৈব (বায়োলজিক্যাল্) এবং মানস (মেণ্ট্যাল্) বিজ্ঞান। যে বিজ্ঞান জড় জগতের কোনো বিশেষ বিভাগ লইয়া আলোচনা করে তাহাকে বলে জড়বিজ্ঞান—যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি। জীবজগতের কোনো বিশেষ বিভাগেব আলোচনাকে বলে জীববিজ্ঞান, যেমন উদ্ভিদ্‌বিদ্যা। আবার মনোজগতের কোনো বিশেষ অংশের আলোচনাকে বলে মানসবিজ্ঞান—যেমন মনোবিদ্যা, নীতিবিদ্যা (এথিক্‌স্), যুক্তিবিদ্যা (লজিক্), নন্দনবিদ্যা (ইস্‌থেটিক্‌স্) প্রভৃতি।

উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে বিজ্ঞানে মনোবিদ্যার স্থান বুঝিতে সুবিধা হইবে।

৩। বিজ্ঞান ও মনোবিদ্যা

মন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাকে মনোবিদ্যা বলে। বিজ্ঞানের সকল লক্ষণগুলিই মনোবিদ্যায় অল্পাধিক ভাবে রহিয়াছে। (১) প্রত্যেক বিজ্ঞানের যেমন একটি নির্দিষ্ট বিষয় থাকে, মনোবিদ্যারও তেমন নির্দিষ্ট বিষয় আছে। মনোবিদ্যার বিশেষ বিষয় হইল মনের কাজ বা বৃত্তি। (২) প্রত্যেক বিজ্ঞানের লক্ষ্য উহার বিশেষ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কতগুলি সাধারণ (জেনার‍্যাল্) নিয়ম আবিষ্কার করা। মনোবিদ্যাও মন সম্বন্ধে কতগুলি সাধারণ ও ব্যাপক নিয়ম বাহির করে। যেমন হ্বেবর-ফেক্‌নার সূত্রের সাহায্যে উদ্দীপককে কি পরিমাণে বাড়াইলে প্রতিক্রিয়া ঠিক বাড়িয়াছে বলিয়া বুঝা যায়, তাহা নির্ণয় করা হয়। আবার ল্যাঙ্গ্-জেম্‌স্ সূত্রের সাহায্যে দৈহিক সংবেদন ও প্রকাশের সহিত প্রক্ষোভের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা নির্ণয় করা যায়। (৩) আবার প্রত্যেক বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে উহার বিষয়ের আলোচনা করে।

মনোবিদ্যাও অন্তর্দর্শন এবং পর্যবেক্ষণের মিলিত প্রায়োগিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকে। (৪) বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যাও সুশৃঙ্খল ভাবে বিষয়ের আলোচনা করে। অন্যান্য বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যাও ধাপে ধাপে সহজ এবং সরল বিষয় হইতে জটিলতর বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হয়। (৫) বিজ্ঞান যেমন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা বা প্রয়োগের সাহায্যে অগ্রসর হয় বলিয়া নিশ্চিত, মনোবিদ্যাও অন্তর্দর্শন ও পর্যবেক্ষণের মিলিত প্রয়োগ পদ্ধতির সাহায্যে নিশ্চিত ফল বাহির করিতে সচেষ্ট। তাহা ছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যাও উহার ফলগুলি গাণিতিক হিসাবের সাহায্যে নিখুঁত করিবার চেষ্টা করে। সাম্প্রতিক মনোবিদ্যায় পরিসংখ্যান (স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স) এবং গণিতের বহুল প্রয়োগ হইতেছে।

৪। মনোবিদ্যা কোন্ শ্রেণীর বিজ্ঞান

মনোবিদ্যা যে বিজ্ঞান তাহা আলোচিত হইয়াছে। এখন দেখা যাউক মনোবিদ্যা কোন্ শ্রেণীর বিজ্ঞান।

(১) মনোবিদ্যা একটি মানস বিজ্ঞান, কারণ মনই ইহার আলোচ্য বিষয়। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের মত মনোবিদ্যা জড় বিজ্ঞান নয়, কারণ ইহা বাহ্যপ্রকৃতির কোনো জড় বস্তু লইয়া আলোচনা করে না। আবার মানসবিদ্যা হইলেও মনোবিদ্যা জীববিদ্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রাণ ও শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন মনের আলোচনা না করিয়া শরীরী প্রাণীর মন লইয়া মনোবিদ্যা আলোচনা করে। এই কারণে অনেক মনোবিৎ মনোবিদ্যাকে জীববিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অবশ্য এই মত গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয় না, কারণ, প্রাণের সহিত মনের পার্থক্য উড়াইয়া দেওয়া অসঙ্গত। প্রাণের আত্ম-চেতনা (সেল্‌ফ্-কন্‌সাস্‌নেস্) নাই, কিন্তু মনের আছে।

(২) মনোবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ বিদ্যা নয়, কিন্তু ঘটনানিষ্ঠ বিদ্যা। কোনো আদর্শের মানদণ্ডে মনের বিচার না করিয়া মনোবিদ্যা নিছক ঘটনা হিসাবে মানসবৃত্তির আলোচনা করে।

(৩) তৃতীয়তঃ মনোবিদ্যা বর্ণনামূলক এবং ব্যাখ্যামূলক উভয় প্রকার বিজ্ঞানেরই সমধর্মী। সংবেদন, প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ, স্মৃতি, কল্পনা প্রভৃতি মানসবৃত্তিগুলি কি এবং কিরূপে সম্পর্কিত, এই জাতীয় প্রশ্নগুলি মনোবিদ্যার আলোচ্য। আবার এই ঘটনাগুলির কোন্‌টি কোন্‌টির কারণ বা কার্য এই

প্রশ্ন ও মনোবিদ্যার আলোচ্য। মনোবিদ্যা যেমন মানসবৃত্তিগুলিকে ঘটনারূপে বর্ণনা করে, আবার কতগুলি সাধারণ নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কার করিয়া উহাদের ব্যাখ্যাও করে। সুতরাং মনোবিদ্যা যেমন বর্ণনামূলক বিজ্ঞান, তেমন ব্যাখ্যামূলক বিজ্ঞানও বটে।

(৪) মনোবিদ্যাকে সাধারণতঃ জ্ঞাননিষ্ঠ (থিওরেটিক্যাল্) বিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে। মনোবিদ্যা মনের গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে চায়। কি কি মানসবৃত্তি লইয়া মন গঠিত এবং এই সকল মানসবৃত্তি কোন্ কোন্ নিয়ম অনুসারে কাজ করে, মনোবিদ্যা এই সকল প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করে। সুতরাং ইহা যে একটি জ্ঞাননিষ্ঠ বিজ্ঞান তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অর্থে ইহাকে সাধারণ বা শুদ্ধ মনোবিদ্যা (জেনার‍্যাল বা পিওর সাইকলজি) বলা যাইতে পারে।

কিন্তু বর্তমানে মনোবিদ্যাকে শুধু জ্ঞাননিষ্ঠ বিদ্যাই বলা চলে না। মনোবিদ্যার সাধাবণ জ্ঞান আজকাল নানাপ্রকার ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের কাজে লাগানো হইতেছে। যেমন শিক্ষা মনোবিদ্যা হাতে কলমে অথবা কার্যকরী ভাবে শিক্ষার্থীর শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবনে সচেষ্ট। আবার শিল্পীয় মনোবিদ্যা কল, কারখানা, নানা ব্যবসায় প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হইতেছে। এইরূপে শুদ্ধ মনোবিদ্যার মত ফলিত মনোবিদ্যার (অ্যাপ্লায়েড্ সাইকলজি) উদ্ভব হইয়াছে। মনোবিদ্যাকে শুধু জ্ঞাননিষ্ঠ বলিয়া ছাড়িয়া দিলে ইহাকে সঙ্কীর্ণ করা হয়।

৫। মনোবিদ্যা কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান?

সর্বশেষে বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যার আর একটি দিকও আলোচ্য। মনোবিদ্যা কি পদার্থবিদ্যা, শারীরবৃত্ত, রসায়ন প্রভৃতির ন্যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অথবা নীতিবিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান?

প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির বিষয় হইল বাহ্যপ্রকৃতির কোনো না কোনো অংশ। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের পদ্ধতি হইল বাহ্য পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োগ। পক্ষান্তরে মনোবিদ্যার বিষয় হইল মন যাহা বাহ্যপ্রকৃতির কোনো অংশ নয় এবং যাহা শুধু বাহ্য পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োগ সাহায্যে আলোচ্য নয়, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পর্যবেক্ষণ ও অন্তর্দর্শন সাহায্যে আলোচ্য। তাহা ছাড়া, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয় কোনো উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, কিন্তু

মনোবিদ্যার বিষয় মন উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই তিনটি কারণে মনে করা যাইতে পারে যে মনোবিদ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়।

অন্য দিক দিয়া বলা যাইতে পারে যে আলোক, তাপ, শরীর প্রভৃতির মত মনও প্রকৃতিরই অংশ। অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তুর মত মনও মানুষের সৃষ্ট পদার্থ নয়। যে নিয়মে মন কাজ করে সেই নিয়মও মনের স্বভাব অথবা প্রকৃতিগত। তাহা ছাড়া, বাহ্য বস্তুকে যেমন আমরা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ সাহায্যে বুঝি, মনকেও অনুরূপ ভাবে জানিয়া থাকি। হাসি কান্না প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া, সুখ দুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তির জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। অতএব মনোবিদ্যাও একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। মনোবিদ্যা মনের আসল রূপ বা স্বরূপ লইয়া আলোচনা করে না, কিন্তু করে শরীরের মধ্যস্থতায় প্রকাশিত মনের বহিঃপ্রকাশগুলির। এই সকল কারণে হ্বুণ্ড্, উইলিয়ম্ জেম্স্, ওয়াট্শন প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইঁহারা মনে করেন যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যাও একটি বিশিষ্ট প্রাকৃতিক বস্তুর আলোচনা করে, প্রকৃতির একরূপতা (ইউনিফর্মিটি অফ্ নেচার) এবং কার্যকারণ সূত্র (ল অফ্ কজেশন) স্বীকার করে এবং পর্যবেক্ষণ, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ প্রভৃতি পন্থা অবলম্বন করে।

[হ্বুণ্ড্-এর পূর্ববর্তী মনোবিদ্‌গণ দর্শন হইতে পৃথক্ করিয়া মনোবিদ্যার অনুশীলন করেন নাই। সুতরাং মনোবিদ্যা ছিল দর্শনের পুচ্ছলগ্ন একটি বিষয়। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং সর্বশেষে জীববিদ্যা দর্শনের বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। ইহা দেখিয়া বহু মনোবিদ্ মনো-বিদ্যাকেও দর্শনের আশ্রয়চ্যুত করিতে চাহিলেন। হ্বুণ্ড্ এবং জেম্স্ মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। চেষ্টিতবাদের প্রতিষ্ঠাতা জন্ ওয়াট্শন্ জীববিদ্যার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। অন্তর্দর্শন, মন, চেতনা প্রভৃতিকে মনোবিদ্যার এই অগ্রগতির অন্তরায় মনে করিয়া ওয়াট্শন্ উহাদিগকে মনোবিদ্যা হইতে নির্বাসিত করিলেন।]

উপসংহার

উপসংহারে বলিতে হয় যে মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মনে করা অসঙ্গত। উহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিলে মানিয়া লইতে হয়

য় মন ও জড় বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অথচ ইহাদের একটি মৌলিক পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না—যেমন মন চেতন, কিন্তু জড়প্রকৃতি অচেতন। জড় পদার্থ জানে না যে ইহা জড়, কিন্তু মন জানিতে পারে যে ইহা চেতন। দ্বিতীয়তঃ বাহ্য বস্তুর যেমন বাহ্য প্রত্যক্ষ হয়, সুখ দুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তিগুলির তেমন হয় না। সুখ দুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তির বাহ্য প্রকাশগুলিরই বাহ্য প্রত্যক্ষ বা পর্যবেক্ষণ হয়, কিন্তু ইহাদের অনুভবগম্য অথবা নিজস্ব রূপের বহিঃপ্রত্যক্ষ হয় না। মানসবৃত্তির অনুভবগম্য রূপ শুধু অন্তর্দর্শন সাহায্যেই ধরা পড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মনোবিদ্যার অন্তর্দর্শন পদ্ধতি ইহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে পৃথক করিয়া দিতেছে। তৃতীয়তঃ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে—যেমন আলোক, তাপ প্রভৃতিকে—একাধিক ব্যক্তি একই সময়ে পর্যবেক্ষণ করিতে পারে। ইহাদের সর্বজনগ্রাহ্যতা আছে কি না সন্দেহ। ইহারা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। চতুর্থতঃ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির প্রধান ভিত্তি হইল প্রকৃতির একরূপতা এবং কার্যকারণসূত্র। ইহারা পূর্ববর্তী ঘটনা দিয়া পরবর্তী ঘটনার ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ উহাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইল যান্ত্রিক বা মেকানিক্যাল। পক্ষান্তরে ওয়ার্ড, স্টাউট্, ম্যাকুডুগ্যাল্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ দেখাইয়াছেন যে উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণ মনের একটি প্রধান লক্ষণ। মন কোনো জ্ঞাত বা অজ্ঞাত উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ করে। ওয়ার্ড এবং স্টাউটের মতে ইহার নাম ইচ্ছামূলক প্রবণতা (কোনেটিভ্ টেন্‌ডেন্‌সি) অথবা উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণ (টেলিয়লজিক্যাল্ ডিটারমিনেশন্) এবং ম্যাকডুগ্যাল্-এর মতে ইহার নাম হর্ম্ অথবা জৈব প্রেরণা। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মনের এই ধর্মটির ব্যাখ্যা করিতে পারে না, কারণ ইহা যান্ত্রিক-বাদী। ইহার মতে যন্ত্রের কলকব্জার মত মনের ক্রিয়াবলী নির্দিষ্টভাবে আবদ্ধ। কিন্তু মনের উদ্দেশ্যপ্রবণতা অথবা স্বাধীনতা এই নির্দিষ্ট ছকের বাহিরে।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে মনোবিদ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়। স্প্রাঙ্গার্, বিন্‌সোয়াঙ্গার, ইওয়াল্‌ড, ডিল্‌থে প্রমুখ জার্মান মনোবিদ্‌গণ প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে একটি মূল পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহারা জড়প্রকৃতির বিজ্ঞানকে বলিয়াছেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং মনোবিদ্যাকে বলিয়াছেন মানবিক বিজ্ঞান বা সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান। মানুষের মন বুঝিতে হইলে তাহার ব্যক্তিত্ব (ইন্‌ডিভিজুয়্যালিটি) বুঝিতে হইবে। আবার ব্যক্তিত্ব কোনো মূল্য (ভ্যালু) এবং অর্থ (সিগ্‌নিফিক্যান্স)-বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ডিল্‌থে প্রকৃতি ও মানুষের মূল পার্থক্যটি এই বলিয়া বুঝাইয়াছেন,

"আমরা প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করি: আমরা মানুষকে বুঝি (উই এক্সপ্লেইন নেচার: উই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড্ ম্যান্)।" এই প্রকার পার্থক্য নির্দেশ করিয়া ইহারা মনোবিদ্যাকে সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

সর্বশেষে বলা যায় যে প্রকৃতি কথাটির ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে—অর্থাৎ যাহা মানুষের সৃষ্ট নয় তাহাই প্রকৃতি এইরূপ বুঝিলে—মন প্রকৃতির অচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় এবং যে বিজ্ঞান মনের আলোচনা করে—অর্থাৎ মনোবিদ্যা—তাহাও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু প্রকৃতি কথাটির এইরূপ ব্যাপক অর্থের ফলে জড় প্রকৃতি ও চেতনের বৈশিষ্ট্য থাকে না। অথচ ইহাদের পার্থক্য অনস্বীকার্য। সুতরাং মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ না করিয়া সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানরূপে গ্রহণ করিতে হয়।

৬। মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী বা পয়েণ্ট্ অফ্ ভিউ

মনের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাই মনোবিদ্যা। কিন্তু মনের আলোচনা যে শুধু মনোবিদ্যাই করে এমন নয়। নীতিবিদ্যা, তর্কবিদ্যা এবং নন্দনবিদ্যা প্রভৃতি মানসবিজ্ঞানগুলিও মনেরই আলোচনা করে। আবার সকল বিজ্ঞানই এক দিক্ দিয়া মনের আলোচনা করে, কারণ উহারা প্রকৃতির বিভিন্ন অংশ-গুলির জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। যে বস্তুর কোনো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই তাহার আলোচনা অসম্ভব। যেমন শব্দ, আলোক বা নানা গ্যাসীয় উপাদান শ্রবণ, দর্শন বা আঘ্রাণ প্রভৃতি সংবেদনের সাহায্যে জ্ঞাত না হইলে উহাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলে না।

মনের এই ব্যাপকতার দিক বিবেচনা করিয়া কোনো কোনো মনোবিদ্ মনোবিদ্যাকে "সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান" বা "সায়েন্স্ অফ্ সায়েন্সেস্" বলিয়াছেন। সকল বিজ্ঞানই বিশেষ জ্ঞান এবং জ্ঞান মনেরই ধর্ম। সুতরাং সকল বিজ্ঞানই পরোক্ষভাবে মানসবিজ্ঞান হইয়া দাঁড়ায়।

দেখা যাইতেছে যে বিষয়ের দিক দিয়া মনোবিদ্যার সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের পার্থক্য নাই কারণ জড়, জীব, মানস, সকল বিজ্ঞানই অভিজ্ঞতার কোনো অংশ লইয়া আলোচনা করে। তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে বিজ্ঞানগুলির মধ্যে আসল পার্থক্য কি। উত্তর এই যে ইহাদের মূল পার্থক্য বিষয়ের নয় কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর। সুতরাং মনোবিদ্যার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে ইহার যে দৃষ্টিভঙ্গী ইহাকে অন্যান্য বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে তাহা বুঝা দরকার।

মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী পাত্রগত (সাবজেকৃটিভ্) বা পাত্রের দৃষ্টিভঙ্গী। যে ব্যক্তির মন মনোবিদ্যার আলোচ্য তাহাকে পাত্র (সাবজেকৃট্) বলে। পাত্রের মানসক্রিয়া বা বৃত্তিগুলি তাহার উপর নির্ভরশীল। মনোবিদ্যা মানসবৃত্তিগুলির আলোচনা করে পাত্রের দিক্ হইতে। পাত্র হয়ত তীরে বসিয়া নিবিষ্ট মনে সমুদ্রের ঢেউ দেখিতেছে। 'ঢেউ দেখা' রূপ মানসবৃত্তিটিকে দুই দিক্ হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে। একটি দিক্ হইল 'দেখা' মানসবৃত্তির বিষয় 'ঢেউ' সম্বন্ধে আলোচনা এবং অপরটি হইল 'ঢেউ' রূপ বিষয়ের 'দেখা' মানসক্রিয়াব আলোচনা। প্রথম দিকটি হইল বিষয়গত (অব্জেক্‌টিভ) এবং দ্বিতীয়টি পাত্রসাপেক্ষ। মনোবিদ্যা অবলম্বন করে দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি যাহা সাব্জেক্‌টিভ্ অথবা পাত্রসাপেক্ষ।

তাহা হইলে 'ঢেউ দেখা' রূপ অভিজ্ঞতাকে দুইটি দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা করা যায়—একটি হইল 'দেখা' মানসক্রিয়ার বিষয় 'ঢেউ'কে কেন্দ্র করিয়া এবং অপরটি হইল 'ঢেউ' বিষয়ের 'দেখা' মানসক্রিয়াকে কেন্দ্র করিয়া। একই 'ঢেউ দেখা' রূপ অভিজ্ঞতার এই দুই দিক বা দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা দুইটি পৃথক্ বিজ্ঞানের অবলম্বন। বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গীটি হইল সেই বিজ্ঞানের অবলম্বন, যে বিজ্ঞান শুধু পর্যবেক্ষণকেই উহার পদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করে। আবার পাত্রসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীটি হইল মনোবিদ্যার অবলম্বন, কারণ উহা অন্তর্দর্শনকেই উহার মূল পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করে।

'ঢেউ দেখা' মানসক্রিয়াটি আসলে কিরূপ, যে 'পাত্র' ঢেউ দেখিতেছে তাহার পক্ষেই তাহা জানা সম্ভব। অন্তর্দর্শন সাহায্যে এই মানসক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করিয়া পাত্র হয়ত বলিতে পারে যে তাহার মনোযোগ ঢেউ দেখাতেই নিবদ্ধ ছিল—অথবা অন্যান্য সকল বিষয় হইতেই তাহার মন বিচ্ছিন্ন ছিল। পাত্র হয়ত আরও বলিতে পারে যে তাহার ঢেউ দেখিতে ভাল লাগিয়াছিল, অথবা সমুদ্রের খোলা আবহাওয়ায় বসিয়া তাহার আরাম লাগিতেছিল। 'ঢেউ দেখা' রূপ মানসক্রিয়ার অনুভবগম্য দিকটিকে সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারে শুধু পাত্র অথবা সেই ব্যক্তি যে ঢেউ দেখিতেছে। অন্য ব্যক্তি অবশ্য দেখিতে পারে যে পাত্র ঢেউ দেখিতেছে। অন্য ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীটিকেও পাত্রগত বলা যাইতে পারে, কারণ তাহার অভিজ্ঞতার বিষয় পাত্র, যদিও এই ব্যক্তি নিজেই নিজ মনের অন্তর্দর্শন করিতেছে না, অথবা সে নিজেই অন্য কাহারও পর্যবেক্ষণের পাত্র নয়।

মনোবিদ্যার এই পাত্রসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলে সহজবোধ্য হইতে পারে। যেমন ঘড়ির হিসাবে অথবা বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গীতে যে সময়ের পরিমাণ এক ঘণ্টা তাহাই পাত্রের মন-সাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে এক ঘণ্টার বেশী বা কম বলিয়া মনে হইতে পারে। ঘড়ির কাঁটায় অথবা বাস্তবিক পক্ষে এই সময় এক ঘণ্টা মাত্র হইলেও, যে ঘণ্টাটি আমোদ প্রমোদে কাটে সেইটি এক ঘণ্টার কম বলিয়া মনে হয়, আবার সেই ঘণ্টাটি দুঃখে বা অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতায় কাটিলে যেন কাটিতেই চায় না এবং এক ঘণ্টা অপেক্ষা বেশী বলিয়া অনুভূত হয়।

আবার দূরত্ব বা ওজন সম্পর্কেও এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। মনের মত সঙ্গীর সহিত হাঁটিলে দূরপথও নিকট লাগে, আবার অনিচ্ছায়, অসুস্থশরীরে, নিঃসঙ্গভাবে অথবা ভয়ে ভয়ে ঐ একই পথ হাঁটিলে উহা আর যেন ফুরাইতে চায় না। আবার মাপ বা ওজন সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। কোন বস্তুর ওজন এক হইলেও, সতেজ শরীর ও মন লইয়া বস্তুটিকে তুলিলে উহা হাল্কা এবং অবসন্ন শরীর ও মন লইয়া উহাকে তুলিলে উহা ভারী মনে হয়।

নীচে দুইটি সমান সরলরেখা দেওয়া হইল। উহাদের একটি দুই প্রান্তে উন্মুক্ত বা খোলা এবং অপরটি আবদ্ধ। এই সরলরেখা দুইটি বস্তুতঃ বা বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমান। কিন্তু পাত্রসাপেক্ষ অথবা পাত্রের অভিজ্ঞতার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উন্মুক্ত সরলরেখাটি বড় এবং আবদ্ধ সরলরেখাটি ছোট বলিয়া মনে হয়।
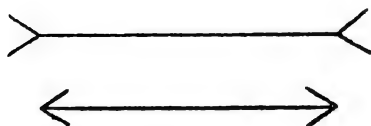
১নং চিত্র

বলা যাইতে পারে যে মনোবিদ্যার পাত্রগত বা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ উহাতে বস্তুর ঠিক ঠিক রূপ ধরা পড়ে না, অথবা বিকৃতভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী তুচ্ছ বা উপেক্ষণীয় নয়, কারণ ইহাতে বিষয় যে ভাবে জ্ঞাত হয় তাহাও একটি বাস্তব ঘটনা। উপরের বদ্ধ সরলরেখাটিকে যে ছোট দেখা যাইতেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কয়েকটি জড়বিজ্ঞান হইতে মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য একটি দৃষ্টান্ত সাহায্যে বুঝানো যাউক। যেমন, একটি শব্দ শুনিতেছি। এই স্থলে শব্দ এই বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে। মনোবিদ্যা শব্দকে বাহিরের বস্তু হিসাবে বা বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে না দেখিয়া ইহাকে শোনা বা 'শ্রবণ করা' রূপ মানস অভিজ্ঞতা বা শ্রবণ সংবেদনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখে। অর্থাৎ মনোবিদ্যা শব্দের নিজস্ব বিষয়গত রূপ লইয়া মাথা ঘামায় না। অভিজ্ঞতা বা শ্রবণ সংবেদনের দিক্ হইতে অর্থাৎ ইহার পাত্রসাপেক্ষ রূপই মনোবিদ্যার আলোচ্য।

পক্ষান্তরে শারীরবৃত্ত 'শব্দ শোনা' রূপ ব্যাপারটিকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখে। শব্দ শুনিতে হইলে কর্ণের কোন্ অংশ কি কাজ করে এবং শব্দ-উদ্দীপক নার্ভপ্রবাহের আকারে কোন্ নার্ভের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া জাগায়, এই জাতীয় প্রশ্নই শারীরবৃত্তের আলোচ্য। শারীরবৃত্তের দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়গত, কারণ ইহা শব্দকে অভিজ্ঞতা বা শ্রবণ সংবেদনের দিক হইতে না দেখিয়া যে সকল শারীরক্রিয়া ঘটিলে এই সংবেদন ঘটে উহাদের দিক হইতে দেখে।

আবার পদার্থবিদ্যাও শব্দ লইয়া আলোচনা করে। বায়ু-কম্পনের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, গঠন প্রভৃতি কিরূপে শব্দের বিভিন্নতা ঘটায় এই জাতীয় প্রশ্ন-গুলিই পদার্থবিদ্যার আলোচ্য। পদার্থবিদ্যা শব্দকে উহার শোনা বা শ্রবণ রূপ অভিজ্ঞতা হইতে পৃথক করিয়া বাহ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ ইহার দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়গত, মনোবিদ্যার মত পাত্রগত বা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ নয়।

উপসংহার

উপরের আলোচনায় মনোবিদ্যার পাত্রগত বা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টভাবে বুঝানো হইয়াছে। তাহা হইলে মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইল বিষয়কে অভিজ্ঞতা হইতে স্বতন্ত্র বা উহার নিরপেক্ষ বিষয় হিসাবে না দেখিয়া বিষয়ের জ্ঞাতা ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল বিষয় হিসাবে দেখা। এই দৃষ্টি-ভঙ্গীই মনোবিদ্যার সেই বৈশিষ্ট্য যাহা উহাকে অন্যান্য বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ করিয়াছে। একই বিষয়কে অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ এবং অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ রূপে আলোচনা করা যাইতে পারে। অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ বা পাত্রগত দৃষ্টিভঙ্গীই মনোবিদ্যার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী।

৭। মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীর দোষ—ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা

অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ বা পাত্রগত দৃষ্টিভঙ্গীর একটি প্রধান দোষ হইল উহার ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। পাত্রের অভিজ্ঞতাই যদি মনোবিদ্যার অবলম্বন হয়, তাহা হইলে উহার আলোচনা ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। প্রত্যেক ব্যক্তির বা পাত্রের অভিজ্ঞতা উহাতেই সীমাবদ্ধ। জড়বিজ্ঞানগুলি এমন বিষয় লইয়া আলোচনা করে যাহা একই সময়ে বা স্থানে অনেক ব্যক্তি জানিতে পারে। যেমন শব্দের বায়ু-কম্পন সকল ব্যক্তির নিকটই এক। একটি ঘণ্টা বস্তু হিসাবে সকল ব্যক্তির নিকটই এক। অথচ মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ঐ একটি ঘণ্টা বেশী বা কম। যাহার অভিজ্ঞতা উহা তাহারই নিজস্ব সম্পত্তি—উহা অনেকের অভিজ্ঞতা হইতে পারে না। যাহার মাথা ব্যথা উহার অনুভূতি তাহারই, অপর কাহারও নয়।

প্রশ্ন এই যে এইরূপ ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া কোনো সর্বজনগ্রাহ্য, সার্বভৌম বা ব্যাপক জ্ঞান লাভ করা যায় কি না। ব্যাপকতা বা সার্বভৌমতাই বৈজ্ঞানিক সত্যের বিশেষ লক্ষণ। অথচ মনোবিদ্যা পাত্রের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল হইয়া এইরূপ ব্যাপক বা সর্বজনগ্রাহ্য ফলে পৌছিতে পারে না। এক কথায়, মনোবিদ্যা ব্যক্তিগত ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়—ইহার সাহায্যে এমন কোনো জ্ঞান লাভ করা যায় না যাহা নৈর্ব্যক্তিক অথবা ব্যক্তিগত মতামতের উর্দ্ধে।

উত্তর এই যে মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী পাত্রের অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ হইলেও ইহা ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যেই এমন জ্ঞান লাভ করা মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য যাহা ব্যক্তিসর্বস্ব নয়, কিন্তু ব্যাপক বা সার্বভৌম। একই প্রকারের অভিজ্ঞতা কৃত্রিমভাবে বা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায়, অথবা পরীক্ষা সাহায্যে বিভিন্ন পাত্রের মনে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। প্রত্যেক পাত্র ঐ একজাতীয় অভিজ্ঞতার যে অন্তর্দর্শন বিবরণ দেয় তাহা তুলনা করিলে বিভিন্ন পাত্রের একই জাতীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে কতগুলি মিল দেখা যায়। এই মিল বা সাদৃশ্যই সার্বভৌম নিয়ম বা সূত্রের আকারে ব্যক্ত হয়। এই নিয়মগুলি সর্বজনগ্রাহ্য অথবা ব্যাপক। ইহারা কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা পাত্রে সীমাবদ্ধ নয়। যেমন এই পদ্ধতিতে সুখ অনুভূতি সম্বন্ধে কতগুলি সাধারণ নিয়ম বাহির করা যায়—যথা সুখ অনুভূতি হইলে ফুস্‌ফুস্, হৃদয়, যকৃৎ প্রভৃতি শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির ক্রিয়া নিয়মিত হয়।

পাত্রগত দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে মনোবিদ্যা যে ব্যাপক নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারে তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। যেমন বায়ু-কম্পনরূপ উদ্দীপক কানের সংগ্রাহক নার্ভপ্রান্তকে উদ্দীপিত করিলে এবং এই উদ্দীপনা মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্রে পৌঁছিলে শ্রবণ-সংবেদন উৎপন্ন হয়। প্রশ্ন এই যে নার্ভ-প্রান্তের উদ্দীপনা এবং শ্রবণরূপ প্রতিক্রিয়ার ব্যবধান কাল (রিয়্যাক্‌শন টাইম্) কতটুকু? এই ব্যবধান-কাল নির্ণয় করিবার জন্য বিভিন্ন পাত্রকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে শ্রবণের ব্যবধান-কাল প্রায়ই একই প্রকার। পাত্রকে শব্দ শুনিয়া কোন প্রতিক্রিয়া করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। দেখা গিয়াছে যে পাত্রের প্রতিক্রিয়ার দিকে নজর থাকিলে প্রতিক্রিয়া-কাল হয় এক সেকেণ্ডের ১২৫ সহস্রাংশ এবং শুনিবার দিকে নজর থাকিলে এই প্রতিক্রিয়া-কাল হয় এক সেকেণ্ডের ২২০ সহস্রাংশ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মনোবিদ্যা উহার পাত্রগত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যে সকল ফল বাহির করে সেইগুলি ব্যক্তিগত নয়, কিন্তু ব্যাপক বা নৈর্ব্যক্তিক।

অতএব মনোবিদ্যা ব্যক্তিকেন্দ্রিক এইরূপ আপত্তি অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

৮। মনোবিদ্যার বিষয়—(সাবজেক্‌ট্‌ম্যাটার্ অফ্ সাইকলজি)

স্টাউট্ বলিয়াছেন যে মানসক্রিয়াবলীর অথবা মানসজীবনের আলোচনার নাম মনোবিদ্যা। অর্থাৎ মানসক্রিয়া অথবা মানসজীবন সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহাই মনোবিদ্যার বিষয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যাহা লইয়া মনোবিদ্যা আলোচনা করে তাহাই উহার বিষয়। দেখা যাউক মনোবিদ্যা কি কি বিষয়ের আলোচনা করে, অথবা উহার আলোচ্য বিষয় কি।

(১) প্রথমতঃ মনোবিদ্যা কাহাকে বলে? মনোবিদ্যার সংজ্ঞা নিরূপণ উহার একটি আলোচ্য বিষয়।

(২) মনোবিদ্যা বিজ্ঞান কি না এবং বিজ্ঞান হইলে এই হিসাবে উহার অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ কি? অথবা মনোবিদ্যা কোন্ শ্রেণীর বিজ্ঞান? উহার দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ? ইহা কি অন্যান্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরূপ অথবা উহা হইতে পৃথক্? এই প্রশ্নগুলিও মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

(৩) মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় মন। মন বলিতে কি বুঝায়? মন কি উহার ক্রিয়াগুলির সমষ্টি, অথবা ঐগুলি হইতে কোনো পৃথক্ অতিরিক্ত সত্তা? শরীরের অতিরিক্ত মন স্বীকার করিবার প্রয়োজন আছে কি, অথবা মন শরীরেরই বিকারবিশেষ? মন কি শুধু চেতন অথবা অসংজ্ঞান ও নির্জ্ঞানও বটে?

(৪) মনের বৃত্তিগুলি কি কি? উহাদের সম্বন্ধই বা কি?

(৫) মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ কি? মন ও শরীর কি পরস্পর ক্রিয়াশীল অথবা পরস্পর নিরপেক্ষ অথচ সমান্তরাল?

শরীরের কোন্ অংশের সহিত মনের সম্বন্ধ সর্বাপেক্ষা বেশী ঘনিষ্ঠ? ইহা যদি নার্ভতন্ত্র, মেরুমজ্জা এবং মস্তিষ্ক হয় তাহা হইলে উহাদের সংগঠন ও ক্রিয়া কি প্রকার? ইন্দ্রিয়গুলি কি কি? উহাদের গঠন এবং ক্রিয়াই বা কিরূপ? শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির কাজ কি? বিভিন্ন গ্রন্থিগুলি কি কাজ করে?

(৬) মনোবিদ্যার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি? ইহা কি অন্তর্দর্শন, অথবা পর্যবেক্ষণ, অথবা উহাদের সমন্বয়? পরিমাণগত পদ্ধতিগুলি (কোয়াণ্টিটেটিভ্ মেথড্) কি মনোবিদ্যায় প্রযোজ্য?

(৭) সংবেদন, প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ, স্মৃতি, কল্পনা, প্রত্যয়, অবধারণা, বিচার, বিশ্বাস, ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া, সহজ ক্রিয়া, ভাবজ ক্রিয়া, অনুভূতি, প্রক্ষোভ, রস প্রভৃতি মানসবৃত্তিগুলি কি? উহাদের সম্বন্ধই বা কি? উহারা কি কি নিয়মে কাজ করে?

(৮) ব্যক্তিত্ব বা পার্সন্যালিটি কাহাকে বলে? ইহার বিকাশ, বিশেষ লক্ষণ, মাত্রা কি? ব্যক্তিত্ব পরিমাপের উপায় কি? ব্যক্তিত্ব কি বংশগত অথবা পরিবেশগত? ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ কি? ব্যক্তিত্বের শ্রেণীভেদই বা কি কি? গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণের দ্বারা ব্যক্তিত্ব কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়? ব্যক্তিত্বের নানাত্ব বা একান্তরতা বলিতে কি বুঝায়?

(৯) বুদ্ধি কাহাকে বলে? কি কি নিয়মে উহার ক্রমবিকাশ হয়? বুদ্ধির পরিমাপ কি এবং কিরূপে করিতে হয়? বুদ্ধির স্তরভেদ কি কি এবং উহার উন্নতি সম্ভব কিনা?

(১০) শিক্ষা কাহাকে বলে? শিক্ষার সূত্র এবং মতবাদগুলি কি কি? কিরূপ নিয়ম বা পদ্ধতিতে অভ্যাস করিলে শিক্ষা সহজ এবং সফল হয়?

এক কথায় বলা যাইতে পারে যে যাহা মনোবিদ্যার আলোচ্য তাহাই উহার বিষয়। সমগ্র গ্রন্থখানিতে যে বিষয় সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে তাহাই

মনোবিদ্যার বিষয়। অথবা গ্রন্থের বিষয়সূচীতে যে বহুসংখ্যক পরিচ্ছেদ এবং অনুচ্ছেদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার সবগুলিই মনোবিদ্যার বিষয়।)

সুতরাং এই বিস্তৃত বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত অপেক্ষা বেশী ব্যাখ্যা করা নিরর্থক অথবা বাহুল্য মাত্র।

পাঠ্যপুস্তকাংশ

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেণ্ট্স্ অফ্ সাইকলজি—প্রথম পরিচ্ছেদ—ভূমিকা
জি এফ্ স্টাউট্—এ ম্যানুয়্যাল্ অফ্ সাইকলজি—ভূমিকা—প্রথম পরিচ্ছেদ
উড্ওয়ার্থ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস্—সাইকলজি—প্রথম পরিচ্ছেদ
ই. বি. টিশ্নার্—এ টেক্স্ট্ বুক্ অফ্ সাইকলজি (পৃঃ ১-৯)
সি. এস্ মায়ার্স—এ টেক্সট্বুক্ অফ্ এক্সপেরিমেণ্ট্যাল্ সাইকলজি—প্রথম পরিচ্ছেদ

Exercise

1. In what sense is psychology the science of mind? Explain. (pp 1-4)
2. Expound the nature of psychology as a science. Is psychology a natural science? Discuss. (pp 7-12)
3. What is the psychological point of view? Explain it with, examples. (pp 12-17)
4. Distinguish the psychological point of view from that of the other sciences with examples. (pp 12-17)
5. Give a critical estimate of the psychological point of view. (pp 16-17)
6. Define the subject matter of psychology (pp 17-19)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মনোবিদ্যার উপাত্ত ও পদ্ধতি

(ডেটা অ্যাণ্ড্ মেথড্স্ অফ্ সাইকলজি)

১। মনোবিদ্যার উপাত্ত

বিজ্ঞান কতগুলি বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিয়া উহাদের ভিত্তিতে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করে। বিজ্ঞানের প্রধান অবলম্বন হইল বিশেষ বিশেষ ঘটনা। ঘটনা যেমন ঘটে অথবা পর্যবেক্ষণে উহাকে যেমন পাওয়া যায়, অর্থাৎ যাহা উদ্ভাবন করিতে হয় না, কিন্তু দেওয়া থাকে অথবা পাওয়া যায় তাহাকে উপাত্ত বলে। এই উপাত্ত যেমন পাওয়া যায় বিজ্ঞান ঠিক তেমনভাবেই মানিয়া লয়। এই প্রদত্ত বা উপস্থিত ঘটনাগুলি সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোনো প্রশ্ন তোলে না।

বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যাও কতগুলি উপাত্ত সংগ্রহ করিয়া উহার গবেষণায় অগ্রসর হয়। মনোবিদ্যা এই উপাত্তগুলিকে বিনা প্রশ্নে মানিয়া লয় এবং উহাদের ভিত্তিতে ব্যাপক বা সাধারণ নিয়ম বাহির করিতে চেষ্টা করে। যেমন রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি উপাত্ত বা প্রদত্ত বস্তুগুলিকে গ্রহণ করিয়া মনোবিদ্যা উহাদের সংজ্ঞা, শ্রেণীভেদ প্রভৃতি নির্ণয় করে এবং উহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে কতগুলি সাধারণ সত্যে উপনীত হয়। পর্যবেক্ষণ যেমন অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উপাত্ত সংগ্রহের উপায় তেমন মনোবিদ্যার ক্ষেত্রেও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ আবশ্যক হয়। অবশ্য মনোবিদ্যায় পর্যবেক্ষণ শুধু বাহিরের পর্যবেক্ষণ নয়, কিন্তু মানস পর্যবেক্ষণ বা অন্তর্দর্শনও বটে।

মনোবিদ্যার উপাত্ত যে বাহ্য বস্তু নয় তাহা মনে রাখা দরকার। মানসবৃত্তির যে কোনো বিষয়ই মনোবিদ্যার পক্ষে প্রকৃত উপাত্ত ও বিষয়। আকাশকুসুম বলিয়া কোনো বাহ্যবস্তু নাই, সুতরাং জড়বিজ্ঞানের পক্ষে ইহা তুচ্ছ বা অবস্তু। কিন্তু কেহ যদি আকাশকুসুমের চিন্তা করে, তবে উহা বাস্তবে না থাকিলেও চিন্তার বিষয় হিসাবে তুচ্ছ বা অবস্তু নয়। ইহা বস্তুতঃ না থাকিলেও এই ক্ষেত্রে যে চিন্তার বিষয়রূপে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার যদি কেহ রজ্জুকে সর্প বলিয়া দেখে, সেই ক্ষেত্রে বাহ্য বস্তু হিসাবে সর্প না থাকিলেও প্রত্যক্ষরূপ মানসবৃত্তির বিষয় হিসাবে যে ইহা রহিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দেখা যাইতেছে, মনোবিদ্যার উপাত্ত হইতে হইলে যে উহাকে বাস্তবেই থাকিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। উহা মনের বিষয় হইলেই হইল। কেহ হয়ত একটি নীল ঘোড়ার স্বপ্ন দেখিল। বস্তু হিসাবে নীল ঘোড়া নাই সত্য, কিন্তু স্বাপ্নিক অভিজ্ঞতার বিষয় হিসাবে উহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং আকাশ-কুসুম, রজ্জুতে সর্প অথবা নীল ঘোড়া বাস্তব জগতে না থাকিলেও, কল্পনা, প্রত্যক্ষ এবং স্বপ্নের বিষয়রূপে এই উপাত্তগুলি অবশ্যই স্বীকার্য। আবার যে বস্তু মানসক্রিয়ার বিষয় নয় অথবা যে বস্তু সম্বন্ধে মনের কোন ক্রিয়াই ঘটে নাই বা অভিজ্ঞতা হয় নাই তাহা যত বাস্তবই হউক না কেন মনোবিদ্যায় তাহার কোন গুরুত্ব নাই এবং তাহা মনোবিদ্যার উপাত্ত নয়।

২। মনোবিদ্যার কয়েকটি মূল সূত্র

উপাত্তগুলি ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণ সত্যে উপনীত হইবার জন্য সকল বিজ্ঞানই এক বা একাধিক মূল সূত্র (ফাণ্ডামেণ্টাল্ প্রিসাপোজিশন্স্) মানিয়া লয়। যেমন প্রকৃতির একরূপতা (য়্যুনিফর্মিটি অফ্ নেচার্) এবং কার্য-কারণ সূত্র (ল' অফ্ কজেশন্) স্বীকার না করিলে কোন বিজ্ঞানই উহার উপাত্তগুলির ভিত্তিতে সাধারণ সত্যে উপনীত হইতে পারে না। তাহা ছাড়াও বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের এক বা একাধিক মূল সূত্র মানিয়া লইতে হয়। যেমন পদার্থবিদ্যা মাধ্যাকর্ষণ সূত্র (ল' অফ্ গ্র্যাভিটেশন্) এবং রসায়ন নির্দিষ্ট মাত্রাত্মক মিশ্রণের সূত্র (ল' অফ্ ডেফিনিট্ প্রোপোর্শন্) স্বীকার করে।

উপাত্তগুলি ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণ সত্যে উপনীত হইবার উদ্দেশ্যে মনোবিদ্যাও কয়েকটি মূল সূত্র মানিয়া লয়। যেমন, (১) প্রত্যেক ব্যক্তির মানসবৃত্তির একরূপতা (য়্যুনিফর্মিটি ইন্ মেণ্টাল্ প্রসেস্) আছে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা সকলেই আশা করিয়া থাকি যে আমাদের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিরা আমাদের দেখিয়া চিনিতে পারিবে অথবা তাহাদের দেখিলে আমরা চিনিতে পারিব। তেমনই আমরা ধরিয়া লই যে আমাদের চারিপাশের কর্মব্যস্ত লোকেরা সকলেই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছুটিতেছে। স্কুল, কলেজ, সমিতি, ডাকঘর, রেলবিভাগ প্রভৃতি সংগঠনগুলির নিকট আমরা এক এক রকমের সাধারণ ব্যবহার প্রত্যাশা করি। ব্যবহারের একটি সাধারণ মাপকাঠি না থাকিলে আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবন অচল হইত। অবশ্য একথা ঠিক যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং প্রতিষ্ঠানে

প্রতিষ্ঠানে পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু ইহাও ঠিক যে এই পার্থক্যের মধ্যেও একটি ধারা বা নিয়ম আছে।

(২) মনোবিদ্যা ইহাও মানিয়া লয় যে মানসবৃত্তির সহিত শারীরিক প্রকাশ বা চেষ্টিতের নিয়মিত সম্বন্ধ আছে। অপর ব্যক্তির মানসবৃত্তি প্রত্যক্ষ করা যায় না। তথাপি মানসবৃত্তির বাহ্য শারীর প্রকাশ দেখিয়া আমরা অপরের মন বুঝিতে পারি। ভুল বুঝার সম্ভাবনা থাকিলেও এই জ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সহায়।

(৩) কিন্তু বাহ্য দুনিয়ার সহিত মনোরাজ্যের একটি বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। বাহ্য বস্তুগুলি পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী হিসাবে কার্যকারণসূত্রে সম্বদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু মানসক্রিয়াকে যে নিয়ম বা সূত্র নিয়ন্ত্রিত করে তাহা উদ্দেশ্যমূলক (টেলিয়লজিক্যাল্ ডিটার্‌মিনেশন্)। বাহ্যবস্তু'দেশে (স্পেইস) অবস্থান করে এবং একটি অপরটির সহিত দৈশিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়। কিন্তু চেতনা দেশের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। চেতন ব্যক্তির মানস ঐক্যসূত্র জড় কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না। উদ্দেশ্যাভিমুখিতাই মানসজীবনের ঐক্য সাধন করে। কোনো ব্যক্তি কেন বা কি কারণে কোনো কাজ করিল এই প্রশ্ন উঠিলে উত্তর দিতে হয় সে কোন্ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কাজটি করিল। এইজন্যই বলিতে হয় যে লক্ষ্যাভিমুখিতাই চেতন ব্যক্তির মানসজীবনের নিয়ন্ত্রণ সূত্র।

৩। মনোবিদ্যার পদ্ধতি

ভূমিকা

বিজ্ঞান পদ্ধতিনিষ্ঠ বা মেথডিক্যাল। একটি নির্দিষ্ট প্রণালী বা পদ্ধতি ছাড়া কোন বিজ্ঞানই গবেষণায় অগ্রসর হইতে পারে না। সুতরাং বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যারও একটি নির্দিষ্ট প্রণালী বা পদ্ধতি আবশ্যক।

কিন্তু মনোবিদ্যার পদ্ধতি কি এই বিষয়ে মনোবিদ্‌গণের মধ্যে গুরুতর মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে অন্তর্দর্শনই (ইনট্রস্‌পেক্‌শন্) মনোবিদ্যার অনুসরণীয় পদ্ধতি। ইঁহাদের মতে মনোবিদ্যার পদ্ধতি পাত্রগত বা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। যে পাত্রের মানসবৃত্তি গবেষণার বিষয় ঐ বৃত্তি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শুধু সেই পাত্রের পক্ষে থাকা সম্ভব। সুতরাং ঐ বৃত্তি সম্বন্ধে ঐ ব্যক্তির অন্তর্দর্শনই মনোবিদ্যার অনুসরণীয় পদ্ধতি।

আবার কেহ কেহ বলেন যে অন্তর্দর্শন নিতান্ত ব্যক্তিগত পদ্ধতি। সুতরাং এই পদ্ধতি সাহায্যে মনোবিদ্যা সম্বন্ধে কোনো সর্বজনগ্রাহ্য ফল লাভ করা যায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা ব্যক্তিগত ব্যাপারে পর্যবসিত হয় এবং বিজ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইঁহাদের মতে মানসবৃত্তির বহিঃ-প্রকাশগুলির পর্যবেক্ষণ সাহায্যেই মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। সুতরাং পর্যবেক্ষণই মনোবিদ্যার অনুসরণীয় পদ্ধতি।

তৃতীয় মতাবলম্বী মনোবিদ্‌গণ বলেন যে মনোবিদ্যার পদ্ধতি শুধু অন্তর্দর্শন বা শুধু পর্যবেক্ষণ হইতে পারে না। যে অন্তর্দর্শন পর্যবেক্ষণের সহিত যুক্ত তাহাই মনোবিদ্যার আদর্শ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিই প্রকৃত প্রায়োগিক পদ্ধতি (এক্স্‌পেরিমেণ্টাল্ মেথড্) এবং ইহার সাহায্যেই মনোবিদ্যাকে প্রায়োগিক বিদ্যায় উন্নীত করা সম্ভব।

কোনো কোনো মনোবিদ্ বলেন যে জনি পদ্ধতি বা বিবর্তন মূলক পদ্ধতিই মনোবিদ্যার অবলম্বন। মনকে জানিতে হইবে উহার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া। কিরূপে একটি মানসবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন ক্রমবিকাশের স্তর অতিক্রম করে এবং পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়, এই ধারাবাহিক বিকাশ লক্ষ্য করিবার পদ্ধতিই মনোবিদ্যার অনুসরণ করা উচিত। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন মানস উপাদানগুলির বিশ্লেষণ (অ্যানালিসিস্) করিতে হয়। সুতরাং বিবর্তন পদ্ধতির আনুষঙ্গিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিই মনোবিদ্যায় অভিপ্রেত। আবার মনের ক্রমবিকাশকে বিশ্লেষণ করিতে হইলে পশুর মনের সহিত শিশুর মন এবং শিশুর মনের সহিত পরিণত (অ্যাডাল্ট্) মনের তুলনামূলক আলোচনা করিতে হয়। সুতরাং তুলনামূলক পদ্ধতিকেই মনোবিদ্যার আদর্শ পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করা উচিত।

মানসবৃত্তির দুইটি রূপ

মানসবৃত্তির বিদ্যাই মনোবিদ্যা। কিন্তু মানসবৃত্তির দুইটি দিক্ আছে। প্রথমটি উহার অন্তর্মুখী বা অনুভবগম্য দিক্। শুধু জ্ঞাতা বা পাত্র অর্থাৎ যাহার মানসবৃত্তি অনুসন্ধানের বিষয় সেই ব্যক্তিই ইহার এই অন্তর্মুখী দিক্‌টি অনুভব করিতে বা সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারে। দ্বিতীয়টি মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশিত দিক্। পাত্র বা জ্ঞাতা মানসবৃত্তির এই দিক্‌টি অনুসন্ধান করিতে পারে না। ইহা জানিতে পারে অপর কোনো পর্যবেক্ষক ব্যক্তি

(অব্‌জার্ভার) যাহার পক্ষে অন্তর্মুখী বা অনুভবগম্য রূপটি জানা সম্ভব নয়। যেমন সুখ, এই মানসবৃত্তিটির অনুভবগম্য বা ভিতরকার দিকটির খবর রাখিতে পারে শুধু ইহার ভুক্তভোগী। যাহার সুখ হইয়াছে শুধু সেই জানে সুখের মর্ম কি। আবার সুখের একটি বহির্মুখী বা বহিঃপ্রকাশিত দিক্‌ও রহিয়াছে যাহা হাসি, গান, নাচ প্রভৃতি স্থূলভাবে পর্যবেক্ষণীয় বাহ্য লক্ষণগুলিতে প্রকাশিত হয়। সুখবোধের আরও কতগুলি সূক্ষ্ম বাহ্যপ্রকাশ আছে যেগুলি যন্ত্রসাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা যায়। যেমন সুখবোধের সহকারী বহু আন্তরযন্ত্রীয় (ভিসার‍্যাল্) পরিবর্তন ঘটে—হৃৎস্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, রক্তপ্রবাহ, নাড়ীর গতি এবং আরও নানাপ্রকার গ্রন্থীয় (গ্ল্যাণ্ডুলার) রসক্ষরণের (সিক্রিসন্) পরিবর্তন। এই বাহ্যপ্রকাশগুলির পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া সম্ভব হয় না।

৪। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

মনের বহিঃপ্রকাশিত রূপটি পাত্রের অন্তর্দর্শনে ধরা পড়ে না। ইহা জানিবার উপায় একমাত্র পর্যবেক্ষণ। মনের বৃত্তিগুলির বহিঃপ্রকাশ (এক্স্‌টারন্যাল্ ম্যানিফেস্টেশন্) দেখিয়া উহাদিগকে জানিবার পদ্ধতিকে মনোবিদ্যায় পর্যবেক্ষণ বলে। হাসি, গান, নাচ, হাততালি প্রভৃতি দেখিয়া সুখবোধের জ্ঞান হয়। কান্না, আকুলি-ব্যাকুলি, কপাল চাপড়ানো প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া দুঃখানুভূতি হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। আরক্ত চক্ষু, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, আস্তিন গুটাইয়া ঘুষি মারিতে যাওয়া প্রভৃতি বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করিয়া ক্রোধের জ্ঞান হয়। আবার পলায়ন করা, মুখচোখ ফ্যাকাশে হইয়া যাওয়া, গলা শুকাইয়া যাওয়া প্রভৃতি বহিঃপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ ভয়ের জ্ঞাপক। গায়ে হাত বুলানো, আদর করা, চুম্বন করা, প্রভৃতি বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করিলে ভালবাসা জন্মিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। নিশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তপ্রবাহ, রক্তচলাচল, নাড়ির গতি, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতির ক্রিয়া পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করিলে মানসবৃত্তির জ্ঞান জন্মে। আবার অ্যাড্রিন্যাল, থাইরয়েড্, পিট্যুইটারি প্রভৃতি গ্রন্থির রসক্ষরণ (সিক্রিশন্) পেশীর সঙ্কোচন-প্রসারণ (কনট্র্যাক্‌শন্-এক্সপ্যান্‌সন্) এবং অন্যান্য বহু শারীরিক লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়াও উহাদের সহকারী মানসবৃত্তির জ্ঞান লাভ করা যায়।

যাঁহারা অন্তর্দর্শনকে মনোবিদ্যার বিশিষ্ট পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে বাহ্যপ্রকাশ এবং উহার পর্যবেক্ষণই মানসবৃত্তির প্রকৃত

পরিচায়ক। সুখ বলিতে উঁহারা সুখের বাহ্যপ্রকাশকেই বুঝিয়া থাকেন। উঁহারা বলেন যে পর্যবেক্ষণ সাহায্যে আমরা প্রত্যক্ষভাবেই মানসবৃত্তির জ্ঞান লাভ করি। মানসবৃত্তি এবং উহার বাহ্যপ্রকাশ আলাদা জিনিস নয়। পর্যবেক্ষণ সাহায্যে জানা যায় না মানসবৃত্তির অতিরিক্ত এমন কোনো মন বা মানসবৃত্তি নাই। আবার অতিরিক্ত মন বা মানসবৃত্তি থাকিলেও বহিঃপ্রকাশই উহার একমাত্র পরিচায়ক। সুতরাং পর্যবেক্ষণ সাহায্যে মানসবৃত্তির প্রত্যক্ষ বা সোজাসুজি জ্ঞান ঘটে। কাহাকেও কাঁদিতে দেখা এবং তাহাকে দুঃখিত বা শোকার্ত হইতে দেখা একই বস্তু।

অপর পক্ষে সাধারণতঃ পর্যবেক্ষণ বলিতে মানসবৃত্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞান বুঝায় না, বুঝায় উহার পরোক্ষ বা আনুমানিক জ্ঞান। বাহ্যলক্ষণ মানসবৃত্তি নয়, কিন্তু মানসবৃত্তির প্রকাশ। সুতরাং বাহ্যলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া মানসবৃত্তির পযবেক্ষণ হয় না। আমরা বাহ্যলক্ষণ পর্যবেক্ষন করিয়া থাকি, উহার অন্তর্নিহিত মানসবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করি না। বাহ্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা মানসবৃত্তির অনুমান বা আন্দাজ করি মাত্র। কোনো ব্যক্তিকে হাসিতে বা নাচিতে দেখিয়া আমরা অনুমান করি যে ঐ ব্যক্তি সুখ অনুভব করিতেছে। আবার কোনো ব্যক্তিকে কাঁদিতে বা কপালে করাঘাত করিতে দেখিয়া আমরা মনে কবি যে সে দুঃখিত হইয়াছে। এই সকল মনোবিদের মতে সুখ-দুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তির হাসি, কান্না প্রভৃতি বাহ্যপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষককে নিজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অন্যের হাসি, কান্না প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে পড়িয়া যায় যে তিনিও অতীতে তাঁহার সুখ-দুঃখ অনুভূতিকালে হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন। সুতরাং অনেকটা সাদৃশ্য বা উপমান ন্যায় অনুসারে পর্যবেক্ষক অনুমান করেন যে অপর ব্যক্তি যখন তাঁহারই মত হাসিতেছে বা কাঁদিতেছে, সে তাঁহারই মত সুখ বা দুঃখ অনুভব করিতেছে। অর্থাৎ এই সকল মনোবিদ্ হাসি, কান্না প্রভৃতি বাহিরের লক্ষণগুলিব মিল দেখিয়া সুখ-দুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তিরও মিল আছে এইরূপ অনুমানই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ভিত্তি বলিয়া মনে করেন।

পর্যবেক্ষণের অনুমান অংশটি স্পষ্ট ও পৃথক্‌ভাবে আমাদের মনে আসে এমন নয়। মানসবৃত্তি এবং উহার বহিঃপ্রকাশ এইরূপ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে যে দ্বিতীয়টি দেখা মাত্রই প্রথমটি মনে আসে—দ্বিতীয়টি দেখা এবং প্রথমটি মনে আসার মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। ফলে সুখদুঃখের বহিঃপ্রকাশ

দেখিয়া উহাদের যে জ্ঞান হয় তাহা প্রত্যক্ষেরই সামিল, যদিও এই প্রত্যক্ষের সহিত মানসবৃত্তিও উহার প্রকাশের অতীত সাহচর্যজ্ঞান অচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন থাকে। একটি লোক হাসিতেছে **সুতরাং** সে সুখী, আর একজন কাঁদিতেছে, **সুতরাং** সে দুঃখিত—পর্যবেক্ষণের তথাকথিত অনুমান বা পরোক্ষ জ্ঞান নিশ্চয়ই এইরূপ স্পষ্ট অনুমানের আকারে উপস্থিত হয় না। একটি সুখী লোক হাসিতেছে অথবা একটি দুঃখী লোক কাঁদিতেছে—এই আকারে পর্যবেক্ষণ হয়। বহিঃপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ এবং মানসবৃত্তির জ্ঞান দুইটি পৃথক্ অথবা বিচ্ছিন্ন মানসপ্রক্রিয়ার আকারে ঘটে না।

পর্যবেক্ষণের গণ্ডী বা পরিধি

মনের যে কোন বহিঃপ্রকাশই বহির্দর্শন (এক্স্ট্রস্‌পেক্‌শন্) বা পর্যবেক্ষণ (অব্‌জার্‌ভেশন্) পদ্ধতির বিষয় হইতে পারে। আবার শুধু যে ব্যষ্টিমনের (ইন্‌ডিভিজুয়্যাল্ মাইণ্ড্) বহিঃপ্রকাশই পর্যবেক্ষণের বিষয় তাহা নয়। সমষ্টি-মনের (কালেক্‌টিভ্ মাইণ্ড্) নানা বহিঃপ্রকাশও ইহার বিষয় হইয়া থাকে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি মনের উন্নত সৃষ্টিগুলি নানা বহিঃপ্রকাশে আকার লাভ করে। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকীর্তি, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পদ, জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনা অথবা আচার্য শঙ্করের দার্শনিক চিন্তা তাঁহাদের বহিঃপ্রকাশিত সৃষ্টির মধ্য দিয়া সংরক্ষিত হইয়া আছে। এই সকল ছবি, কাব্য, আবিষ্কার, তত্ত্ব যে সকল গ্রন্থে বা কাজে আকারিত হইয়াছে সেইগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া স্রষ্টার মন সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান লাভ করি। তাজমহল দেখিয়া সাজাহানের মমতাজপ্রেম বুঝি। স্বামীজীর মঠ সংগঠন দেখিয়া, তাঁহার বক্তৃতা, পত্রাবলী প্রভৃতি পাঠ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মানসরাজ্য সম্বন্ধে ধারণা গঠন করিতে পারি। এইরূপে ব্যষ্টিমনের যে কোনো বহিঃপ্রকাশই পর্যবেক্ষণের বিষয়। যেহেতু মানুষ যাহা করে তাহাই তাহার কোনো না কোনো মানস অবস্থার পরিচায়ক, এই সকল কার্যের পর্যবেক্ষণ মনের জ্ঞান লাভে সহায়ক।

ব্যষ্টিমনের মত সমষ্টিমনের নানা বহিঃপ্রকাশও পর্যবেক্ষণের বিষয়। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি প্রভৃতি সমষ্টিমনগুলির পরিচয় পাওয়া যায় উহাদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ করিয়া। যেমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি, আচারবিচার, বিধিনিষেধ, মন্দির, বিদ্যায়তন, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি সমষ্টিমনেরই বহুমুখী প্রকাশ।

পর্যবেক্ষণের গুণ

(১) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি মানসজ্ঞান লাভ করিবার স্বাভাবিক পদ্ধতি। মনের গতি স্বভাবতঃ বহির্মুখী। সুতরাং মনের বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করিয়া উহার জ্ঞানলাভই মনোবিদ্যার সাধারণ পদ্ধতি।

(২) তাহা ছাড়া নিজ মনের অন্তর্দর্শন সম্ভব হইলেও অপর ব্যক্তির মন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার প্রধান উপায় হইল পর্যবেক্ষণ। বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ না করিয়া অপর ব্যক্তির মানসবৃত্তিতে প্রবেশ অথবা উহার অন্তর্দর্শন করিবার উপায় নাই। সুতরাং অপর মনের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পর্যবেক্ষণই অবলম্বনীয় পদ্ধতি।

(৩) আবার অন্তর্দর্শন সাহায্যে নিজ মনের যে জ্ঞান হয় তাহা অসম্পূর্ণ। মানসবৃত্তির অনুভবগম্য বা ভিতরকার দিক্‌টিই শুধু অন্তর্দর্শন সাহায্যে জানা যায়। কিন্তু উহার বহিঃপ্রকাশিত বা বাহিরের দিক্‌টির অন্তর্দর্শন সম্ভব নয়। অথচ মনের অন্তর ও বাহির না জানিলে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বাহিরের দিক্‌টি জানিবার অপরিহার্য উপায় হইল পর্যবেক্ষণ। নিজ মনের বাহিরের দিক্‌টি স্বয়ং দেখা যায় না। এই উদ্দেশ্যে অপব ব্যক্তির বা পর্যবেক্ষকের সাহায্য দবকার। সে যাহা হউক, নিজ মনের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য পর্যবেক্ষণ আবশ্যক।

(৪) উপরন্তু অন্তর্দর্শন পদ্ধতির সাহায্যে শুধু নিজ মনের অসম্পূর্ণ জ্ঞান-লাভ সম্ভব। সুতরাং এই পদ্ধতি যে সমষ্টি মনেব জ্ঞানলাভে সহায়তা করে না তাহা নিশ্চিত। সমষ্টি মনের, যেমন পবিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি প্রভৃতির মানসক্রিয়াপ্রণালীর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে উহাদের আচার-বিচার, রীতিনীতি, বিধিনিষেধ, সঙ্ঘজীবন প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। সুতরাং সমষ্টিমন জানিবার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হইল পর্যবেক্ষণ।

(৫) শিশুর মন কিরূপে ক্রিয়া কবে তাহা অন্তর্দর্শন সাহায্যে জানিবার উপায় নাই, কারণ শিশু নিজ মনের অন্তর্দর্শন করিতে পারে না। সুতবাং পর্যবেক্ষণই শিশু মনোবিদ্যার একমাত্র পদ্ধতি হইয়া দাঁড়ায়। আবার পশুমন গবেষণা করিবারও একমাত্র উপায় হইল পর্যবেক্ষণ।

(৬) জড়ধী (ইডিয়ট্) ব্যক্তির বুদ্ধি গর্দভের ন্যায়। আবার, অস্বভাবী (অ্যাব্‌নর্ম্যাল্) ব্যক্তির বুদ্ধিও স্বাভাবিক নয়। ইহারা নিজ মনের অন্তর্দর্শন করিতে পারে না। কিন্তু উহাদের মনের বহিঃপ্রকাশগুলি পর্যবেক্ষণ সাহায্যে জানা যাইতে পারে।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে পর্যবেক্ষণপদ্ধতি মনোবিদ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে।

পর্যবেক্ষণের দোষ

পর্যবেক্ষণের উপরোক্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও উহার দোষ উপেক্ষণীয় নয়।

(১) পর্যবেক্ষণে বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। বাহিরের প্রকাশ বহির্দর্শন বা প্রত্যক্ষ করিয়া মনের স্বভাব ও প্রকৃতি বুঝিবার পদ্ধতিই পর্যবেক্ষণ। কিন্তু পর্যবেক্ষণলব্ধ মানসজ্ঞান প্রায়ই ভ্রান্তিমূলক হইয়া থাকে।

(ক) বিভিন্ন মানসবৃত্তির বাহ্যিক প্রকাশ একই প্রকার হইতে পারে। দুঃখের মত আনন্দেও অশ্রুমোচন হইতে পারে। সুতরাং অশ্রুমোচন দেখিয়া অন্তর্নিহিত মানসবৃত্তির জ্ঞান সঠিক না হইবার সম্ভাবনা। তেমনই দৌড়ানো দেখিয়া অন্তর্নিহিত মানসবৃত্তির জ্ঞান সম্ভব নয়, কারণ ক্রোধান্ধ, ভয়ার্ত, আনন্দিত এবং শোকার্ত ব্যক্তি একই প্রকারে দৌড়াইতে পারে।

(খ) আবার একই মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে। যেমন সুখ অনুভূতি মানুষকে যেমন স্থির ও নিস্পন্দ করিতে পারে, তেমনই চঞ্চল ও আত্মহারা করিতে পারে। সুতরাং বাহ্যলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া উহার অন্তর্নিহিত মানসবৃত্তির জ্ঞানলাভ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

যদি বলা হয় যে একই মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন হইতে পারে না, কারণ মানসবৃত্তিব তারতম্য অনুসারেই প্রকাশের তারতম্য ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে পর্যবেক্ষণ গৌণ হইয়া পড়ে, কারণ মানসবৃত্তির তারতম্য অন্তর্দর্শনই শুধু প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ অন্তর্দর্শনের উপর নির্ভরশীল হইয়া দাডায়।

(গ) উপরোক্ত দোষ দুইটি ছাড়াও পর্যবেক্ষণের আর একটি গুরুতব দোষ আছে। বাহ্য প্রকাশ দেখিয়া আমরা প্রায়ই উহার অন্তর্নিহিত মানসবৃত্তি সম্বন্ধে ভুল করিয়া বসি। এই ভুল মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতে পারে যখন পর্যবেক্ষণ সাহায্যে পর্যবেক্ষক তাঁহার মনের তুলনায় পৃথক মনকে জানিতে চেষ্টা করেন। কোনো ব্যক্তির হাসি কপট বা ক্রুর অথবা সরল বা অমায়িক, ইহা সঠিকভাবে বুঝিতে পারা কঠিন। তাহা ছাড়া শিশুর এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর বা পশুর আচরণের অন্তর্নিহিত মানস অবস্থা জানিতে গিয়া আমরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি। ইহাদের চেষ্টিত অথবা বাহ্য প্রকাশ দেখিয়া অন্তর্নিহিত

মানসবৃত্তির জ্ঞান সেই পরিমাণে ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা যে পরিমাণে ইহারা মানুষের তুলনায় পৃথক্। এই সকল ক্ষেত্রে প্রায়ই শিশুর এবং পশুর মনকে পরিণত মনুষ্যমনের মানদণ্ডে বুঝিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। এই দোষ যাহাতে না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে বিখ্যাত তুলনামূলক মনোবিৎ (কম্প্যারেটিভ্ সাইক-লজিস্ট্) লয়েড্ মর্গ্যান্ একটি নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার নাম লয়েড্ মর্গ্যান-এর সূত্র (লয়েড্ মর্গ্যানস্ ক্যানন্)। নিয়মটি এই—কোনো নিম্নতর মনের চেষ্টিত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া দেখিতে হইবে যে উহা মানুষের নিম্নতর মানসবৃত্তির আলোকে ব্যাখ্যা করা যায় কি না এবং এইরূপে ইহার ব্যাখ্যা সম্ভব হইলে উচ্চতর মানসবৃত্তির সাহায্যে উহার ব্যাখ্যা করা উচিত নয়।

(২) দ্বিতীয়তঃ পর্যবেক্ষণ স্বাধীন পদ্ধতি হইতে পারে না। আসলে অন্তর্দর্শনের উপর পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠিত। বহিঃপ্রকাশগুলি যে সকল মানসবৃত্তির প্রকাশ তাহার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলে উহাদের পর্যবেক্ষণ সাহায্যে মানসবৃত্তির জ্ঞান সম্ভব হয় না। হাসি যে আনন্দের অথবা কান্না যে দুঃখের বহিঃপ্রকাশ এই জ্ঞান তাহার পক্ষেই লাভ করা সম্ভব যাহার আনন্দের হাসি এবং দুঃখের কান্নার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়াছে। যাহার সুখ এবং দুঃখ অনুভূতি হয় নাই এবং উহাদের বাহ্যপ্রকাশ হাসি এবং কান্নার অভিজ্ঞতা ঘটে নাই তাহার পক্ষে হাসি যে সুখের এবং কান্না যে দুঃখের বহিঃপ্রকাশ এই জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। অথচ এই মানসবৃত্তিগুলির প্রত্যক্ষ পরিচয় পর্যবেক্ষণ সাহায্যে হয় না, কিন্তু হয় অন্তর্দর্শন সাহায্যে।

[দেখা যাইতেছে যে অন্তর্দর্শনই মনোবিদ্যার মূল পদ্ধতি এবং পর্যবেক্ষণ এই মূল পদ্ধতির সহায়ক পদ্ধতি মাত্র। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে সুখদুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তির প্রত্যক্ষ পরিচয়ের জন্য যে অন্তর্মুখী জ্ঞানের দরকার তাহাকে অন্তর্দর্শন বলা চলে না। এই জ্ঞান একপ্রকার স্বাভাবিক চেতনা হইতে ঘটে। সুতরাং পর্যবেক্ষণ অন্তর্দর্শন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল, এইরূপ আপত্তি ভ্রান্ত। যে চেতনার উপর পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠিত তাহা এক-প্রকার স্বতঃক্রিয় চেতনা, ইহার জন্য ইচ্ছা এবং চেষ্টা দ্বারা প্রসূত অন্তর্দর্শন পদ্ধতি নিষ্প্রয়োজন। এই কথাটির তাৎপর্য পরবর্তী অন্তর্দর্শন অনুচ্ছেদে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইবে।]

(৩) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির গণ্ডী বা প্রসার ব্যাপক হইলেও মনের কতগুলি অবস্থার জ্ঞান ইহার গণ্ডীর বাহিরে। যেমন মনের চেতনবৃত্তিগুলির

পর্যবেক্ষণই সম্ভব। কিন্তু চেতনার অন্তস্তলে মনের গভীরতর স্তরগুলি, বিশেষ করিয়া নির্জ্ঞান স্তরের পর্যবেক্ষণ অসম্ভব। নির্জ্ঞান মনের বহিঃপ্রকাশ বিকৃত। সুতরাং বহিঃপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ করিয়া নির্জ্ঞান মনের গবেষণা সম্ভব নয়।

৫। অন্তর্দর্শন-পদ্ধতি

ভূমিকা

অন্তর্দর্শনকে মনোবিদ্যার আসল বা মূল পদ্ধতি (সাইকলজিক্যাল্ মেথড্ পার্ এক্স্ সেলেন্স্) বলা হইয়া থাকে। অন্তর্দর্শন বলিতে মানসবৃত্তির দর্শন বুঝায়। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য বস্তুর মত মানসবৃত্তির পর্যবেক্ষণ হয় না। মানসবৃত্তি মনে অথবা অন্তরে ঘটে বলিয়া উহাকে দেখিতে হয় মনে অথবা অন্তরে। এই কারণে ইহাকে বলে অন্তর্দর্শন, অন্তরবলোকন বা অন্তর্নিরীক্ষণ।

এক ব্যক্তি অপরের মানসবৃত্তি সাক্ষাৎভাবে দেখিতে বা দর্শন করিতে পারে না। প্রত্যেকেই শুধু নিজ নিজ মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন করিতে পারে। অর্থাৎ শুধু পাত্র বা দ্রষ্টা স্বয়ং নিজ মনের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে অথবা নিজ মনকে দর্শন করিতে পারে। এই পদ্ধতিতে যে ব্যক্তি মানসবৃত্তি দর্শন করে তাহা তাহারই মানসবৃত্তি। এই কারণে অন্তর্দর্শনকে পাত্রগত (সাবজেক্টিভ্)পদ্ধতি বলা হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টি বুঝানো যাউক। পাঠক পুস্তকটি পাঠ করিতেছেন। তাঁহার মন পুস্তকপাঠে মগ্ন রহিয়াছে। হয়ত অপর কোনো ব্যক্তি পাঠককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি করিতেছেন?" অমনি পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গী বদ্-লাইয়া যাইবে। এতক্ষণ তাঁহার মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল পুস্তকে, অর্থাৎ তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিষয়গত (অবজেক্টিভ্)। "আপনি কি করিতেছেন?" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া তিনি হয়ত বলিবেন, "আমি মনোযোগ দিয়া পুস্তকটি পাঠ করিতেছি।" পাঠকের যে দৃষ্টিভঙ্গী ইতঃপূর্বে পুস্তকরূপ বিষয়ের দিকে ছিল তাহা এখন মোড় ফিরিয়া "মনোযোগ দেওয়া"রূপ মানসবৃত্তির দিকে ঘুরিয়াছে। এখন তাঁহার মন আর বহির্মুখী নাই, কিন্তু অন্তর্মুখী হইয়াছে। একটি বাহ্য বিষয় হইতে মনোযোগ ফিরাইয়া তিনি এখন "মনোযোগ দেওয়া" রূপ মানস-ক্রিয়ার উপর উহা নিবদ্ধ করিয়াছেন। পাঠকের প্রথম দৃষ্টিভঙ্গীটি ছিল বহির্দর্শন অথবা পর্যবেক্ষণ (অব্জার্ভেশন্)-মূলক, কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি হইয়া দাঁড়াইল অন্তর্দর্শন বা অন্তর্নিরীক্ষণ (ইন্ট্রস্পেক্শন্)-মূলক। এই দৃষ্টান্তে পাঠকের প্রথম মনোভাবটি বিষয়গত, কিন্তু পরবর্তী মনোভাবটি "পাত্রগত"। দ্বিতীয় দৃষ্টি-

ভঙ্গীতে মন পুস্তকরূপ মনোযোগের বিষয়ে আর নিবদ্ধ নাই, কিন্তু পাত্রের "মনোযোগ"-রূপ মানসক্রিয়ায় নিবদ্ধ হইয়াছে। এই "পাত্রগত" দৃষ্টিভঙ্গীই মনোবিদ্যার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। এই বিষয়টি পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অন্তর্দর্শনের তিনটি স্তর

"অন্তর্দর্শন" কথাটি মনোবিদ্যায় একটি বিশিষ্ট ও সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; সাধারণভাবে যে কোনো আত্মচেতনার অর্থে হয় না। মনের বা অন্তরের ক্রিয়াগুলির যে কোনো প্রকারের দর্শনই অন্তর্দর্শন নয়। প্রত্যেক সংজ্ঞান (কন্‌সাস্) মানসবৃত্তি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার কোনো না কোনো চেতনা থাকে। কিন্তু এই চেতনা প্রায়ই অস্পষ্ট হওয়ায় উহা যে আছে তাহা অনুভূত হয় না। আবার বইটি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উহার আশেপাশের বস্তু সম্বন্ধেও অস্পষ্ট চেতনা থাকে। চেতনার বস্তু সম্বন্ধে এই চেতনা বা জ্ঞান মানসবৃত্তিরই দর্শন বা জ্ঞান। কিন্তু এই চেতনা স্বতঃস্ফূর্ত। ইহাকে অন্তর্দর্শন বলা যায় না। উহা অন্তর্দর্শনের একটি **প্রাথমিক ও সহজ স্তর**। ইহা বৈজ্ঞানিক নয়, কিন্তু প্রাগ্‌বৈজ্ঞানিক বা প্রি-সায়েন্টিফিক্।

এই প্রাথমিক মানসস্তরের তুলনায় স্পষ্টতর আরও একটি স্তর আছে। এই স্তরের দর্শন বা জ্ঞান স্পষ্টভাবে ঘটে। কিন্তু ইহাও স্বতঃস্ফূর্ত, সুতরাং অন্তর্দর্শন পদবাচ্য নয়। যেমন পুস্তকটি পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে "পুস্তক পাঠ করা" রূপ মানসবৃত্তির একটি সহচারী জ্ঞান বা চেতনা থাকে। কিন্তু এই আন্তর জ্ঞানকে অন্তর্দর্শন বলা যায় না, কারণ প্রথমতঃ এই জ্ঞান অনিচ্ছাকৃত এবং দ্বিতীয়তঃ মানসবৃত্তির স্বভাব বুঝিবার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া ইহাকে ঘটানো হয় না। ইহা আপনা আপনি ঘটে।

তৃতীয়তঃ আন্তর জ্ঞানের আরও একটি স্তর আছে যাহা স্বেচ্ছায় এবং বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য লইয়া অনুশীলিত হয়। "পুস্তক পাঠ করা" রূপ সহচারী চেতনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে থাকে। কিন্তু "পুস্তক পাঠ করা" রূপ মানসবৃত্তির স্বভাব বা প্রকৃতি কি, উহা কি কি উপাদানে গঠিত, কোন্ কোন্ নিয়ম অনুসারে উহা ঘটে, কিরূপ অবস্থায় উহার উন্নতি বা অবনতি ঘটানো যায়, প্রভৃতি নানা প্রশ্নসমাধান করিবার জন্য যে মানসজ্ঞানের অনুশীলন করা হয় তাহাই প্রকৃত অন্তর্দর্শন।

সংক্ষেপে বলা যায় যে **যে আন্তর দর্শন মনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তাহাই বিশেষ অথবা নির্দিষ্ট অর্থে মনোবিদ্যা-**

সঙ্গত অন্তর্দর্শন। ইহার পূর্ববর্তী দুই প্রকারের মানসজ্ঞান সাধারণ অর্থে অন্তর্দর্শন হইলেও মনোবিদ্যার বিশেষ অর্থে অন্তর্দর্শন নয়।

অন্তর্দর্শনের গুণ

অন্তর্দর্শন পদ্ধতির প্রধান গুণ হইল এই যে ইহাতে কোনো যন্ত্রপাতি বা প্রয়োগশালার প্রয়োজন হয় না। মনই অন্তর্দর্শন পদ্ধতির আপন প্রয়োগ-শালা। বাহিরের অবস্থার উপর নির্ভর না করিয়াই অন্তর্দর্শন চলিতে পারে। যে কোনো সময়ে এবং স্থানে অন্তর্দর্শন পদ্ধতি সাহায্যে মানসিক বৃত্তির গবেষণাকার্য চালানো যায়। এইরূপ গবেষণায় দেশ, কাল, অবস্থা প্রভৃতি বাহিরের বস্তু-গুলির উপর নির্ভর করিতে হয় না। তাহা ছাড়া, এইরূপ গবেষণায় অর্থব্যয়ের প্রয়োজন নাই।

অধিকন্তু, অন্তর্দর্শন মানসবৃত্তির অনুভবগম্য অথবা অন্তরঙ্গ স্বভাব জানিবার একমাত্র পদ্ধতি। বহির্দর্শন বা পর্যবেক্ষণ সাহায্যে মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ জানা যাইতে পারে। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট বহিঃপ্রকাশ যে কোনো নির্দিষ্ট মানস-বৃত্তির বা অভিজ্ঞতার প্রকাশ তাহা জানিবার একমাত্র উপায় হইল অন্তর্দর্শন। হাসি বা কান্না যে সুখ বা দুঃখ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ তাহা জানিতে হইলে ঐ ঐ অনুভূতির প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা দরকার। অথচ এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান শুধু অন্তর্দর্শন সাহায্যেই সম্ভব। সুখ বা দুঃখের প্রত্যক্ষ অন্তর্দর্শনলব্ধ জ্ঞান থাকিলে উহাদের ফলেই যে হাসি বা কান্নারূপ বহিঃপ্রকাশ ঘটে এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে।

সুতরাং অন্তর্দর্শন মানসবৃত্তির জ্ঞান লাভ করিবার প্রধান উপায়। এমন কি শিশু, পশু, অস্বভাবী ব্যক্তি প্রভৃতির মন জানিতে হইলেও অন্তর্দর্শনের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহারা অন্তর্দর্শন করিতে পারে না। কিন্তু ইহাদের বহিঃ-প্রকাশ দেখিয়াই ইহাদের মানসবৃত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হয়। ইহাদের ক্ষেত্রেও, কোনো বহিঃপ্রকাশ যে কোনো মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ তাহা জানিতে পারা যায়, অন্তর্দর্শন সাহায্যে। ঐ ঐ বহিঃপ্রকাশ যে ঐ ঐ মানস-বৃত্তিরই বহিঃপ্রকাশ তাহা জানিতে হইলে প্রত্যক্ষ অন্তর্দর্শনলব্ধ উহাদের অনুষঙ্গ বা সম্বন্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে হয়।

আবার অন্তর্জ্ঞান (সাব্-কন্‌সাস্), আসংজ্ঞান (প্রি-কন্‌সাস্) নির্জ্ঞান (আন্-কনসাস্) প্রভৃতি মানসস্তরগুলির জ্ঞান আহরণেও অন্তর্দর্শনের গুরুত্ব

অস্বীকার করা যায় না। প্রথমতঃ এই সকল স্তরের মানসবৃত্তিগুলিই অতীতে সংজ্ঞান মনে ছিল। এই দিক দিয়া উহাদের অতীত সংজ্ঞান রূপের অন্তর্দর্শন অবশ্যই হয়ত ছিল। তাহা ছাড়া, ইহারা বর্তমানে সংজ্ঞান মনের নীচে চলিয়া গেলেও, সংজ্ঞান মনের আলোকেই ইহাদিগকে বুঝিতে হয়। সংজ্ঞান মনের কর্মপ্রণালীর নিয়ম বা সূত্র অনুসারে, অথবা উহাদের ভিত্তিতে ইহাদিগের আলোচনা করিতে হয়।

সে যাহা হউক, অন্তর্দর্শন যে মনোবিদ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেক মনোবিৎই অন্তর্দর্শনকে মনোবিদ্যার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলিয়াছেন।

কিন্তু অন্তর্দর্শনের গুণগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, উহার দোষগুলির সন্ধান এবং পরীক্ষা করা দরকার।

অন্তর্দর্শনের দোষ

নিজ মনকে নিজ মানসবৃত্তির উপর নিবদ্ধ করিয়া উহাকে জানিবার পদ্ধতিই অন্তর্দর্শন। এই পদ্ধতির কতগুলি দোষ রহিয়াছে।

(১) নিজ মনের উপর নিজ মন নিবদ্ধ কবিবার মত অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী নয়। মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী হইল বহির্মুখী বা বিষয়গত। অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ বা বহির্দর্শনই স্বাভাবিক পদ্ধতি এবং অন্তর্দর্শন অস্বাভাবিক।

(২) প্রত্যেক মানসবৃত্তিই কোনো না কোনো বিষয়কে অবলম্বন করিয়া ঘটে। বাহিরের বস্তু মানসবৃত্তির বিষয় হইতে পারে, যেমন "রং দেখা" রূপ সংবেদনের বিষয় হইল মনের বাহিরে রংটি। আবার অন্য কোনো মানসবৃত্তিও মানসবৃত্তির বিষয় হইতে পারে।

যেমন সুখ বা দুঃখের অনুভূতিতে সুখদুঃখরূপ মানসবৃত্তি অনুভূতিরূপ মানসবৃত্তির বিষয়। মোটের উপর কোনো মানসবৃত্তিই সাধারণতঃ নির্বিষয় নয়। বিষয় না থাকিলে কোনো মানসিক বৃত্তিই ঘটিতে পারে না। সুতরাং অন্তর্দর্শনে যে মানসবৃত্তির উপর মনকে নিবদ্ধ করা হয় সেই মানসবৃত্তির বিষয় থাকা চাই। মনের বিষয় মানসবৃত্তি, আবার মানসবৃত্তির বিষয় অন্য কোনো মানসবৃত্তি অথবা বাহিরের বস্তু। এইরূপ অবস্থায় মন দুই প্রকারে দ্বিধা বিভক্ত (বাইফার্কেটেড) হইয়া যায়।

মনের এই দ্বিধা বিভাগ (বাইফার্কেশন্) দুই প্রকারে ঘটে। (ক) প্রথমতঃ অন্তর্দর্শনে মানসবৃত্তির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে মনই দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা (সাবজেক্ট্), আবার মনই দৃশ্য, জ্ঞেয় বা বিষয় (অব্জেক্ট্)। এই রূপে একই মন দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়—ফলে মনের একত্ব বা ইউনিটি নষ্ট হয়। আবার একই মন জ্ঞাতা ও বিষয় হওয়ায় কর্মকর্তৃবিরোধ ঘটে, কারণ ইহা একাধারে কর্তা এবং কর্ম হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং অন্তর্দর্শন অসম্ভব।

(খ) অন্তর্দর্শনে মনের দ্বিধা বিভাগ আর এক প্রকারেও ঘটিয়া থাকে। উপরে দেখানো হইয়াছে যে মনের বিষয় কোনো মানসবৃত্তি, আবার মানসবৃত্তির বিষয় অন্য কোনো বস্তু। মানসবৃত্তি না থাকিলে যেমন অন্তর্দর্শন অসম্ভব, মানস-বৃত্তির বিষয় না থাকিলেও তেমনই মানসবৃত্তি অসম্ভব। কোনো নির্বিষয় (অব-জেক্ট্লেস্) মানসবৃত্তি সম্ভবতঃ ঘটে না। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে মনকে দুইটি কাজ করিতে হয়। প্রথমতঃ মানসবৃত্তি দর্শন করিতে হয় এবং দ্বিতীয়তঃ মানসবৃত্তির বিষয়ের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়। কিন্তু মনের পক্ষে একই সঙ্গে বা যুগপৎ এই দুইটি কাজ চালাইয়া যাওয়া সম্ভব কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। সুতরাং এই কারণেও অন্তর্দর্শন অসম্ভব হইয়া পড়ে। মানসবৃত্তিব অন্তর্দর্শন করিলে উহার বিষয় হইতে মন সরিয়া যায় এবং মানসবৃত্তি নিবিষয় হইয়া পডায় উহা বিনষ্ট হয় এবং অন্তর্দর্শনের বিষয় মানসবৃত্তিটি নষ্ট হওয়ায় অন্তর্দর্শন অর্থহীন এবং বিষয়-হীন হইয়া যায়। আবার বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিলে অন্তর্দর্শনের মুখ্য বিষয় মানসবৃত্তিটি হইতে মন সরিয়া আসে। এইরূপে উভয় ক্ষেত্রেই অন্তর্দর্শন অসম্ভব হইয়া পডে।

(৩) তৃতীয়তঃ অন্তর্দর্শন মনের আসল বা অবিকৃত রূপটিকে জানিতে পারে না। এই পদ্ধতিতে মনের যে রূপটি ধরা পডে সেটি উহার বিকৃত রূপ। মন নিত্য চঞ্চল। নিয়ত পরিবর্তনশীল অথবা নিত্য প্রবহমান নদীর স্রোতের মত মনও নিরন্তর অস্থির বা চঞ্চল। গাছ, পাথর, প্রভৃতি স্থূল বস্তুর মত মনেব সম্মুখে মানসবৃত্তিকে নিশ্চলভাবে রাখিয়া উহার দর্শন করা সম্ভব নয়। কোনো মানসবৃত্তিই এক মুহূর্তের বেশী স্থায়ী হয় না।—ঘটিবার পরক্ষণেই উহা অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। ফলে মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, কারণ মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন করিতে হইলে উহা ঘটিবার পরও উহার কিছুক্ষণ স্থায়ী হওয়া দরকার।

(৪) সুতরাং অন্তর্দর্শন আসলে পশ্চাদ্দর্শন (রেট্রস্‌পেক্‌শন্) হইয়া পড়ে। মানসবৃত্তি পরিবর্তনশীল এবং ঘটিবার পর মুহূর্তেই ইহা বিলীন হইয়া যায়। অথচ ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্তর্দর্শন অসম্ভব এবং পর মুহূর্তে বিলীন হইয়া যায় বলিয়া তখনও ইহার অন্তর্দর্শন সম্ভব নয়। ঘটিবার পরে মিলাইয়া যাইতেছে এইরূপ অবস্থায় উহাকে পশ্চাদবলোকন অথবা পশ্চাদ্দর্শন করা যায় মাত্র যেমন সবেগে ধাবমান গাড়ী দেখিতে না দেখিতেই ছুটিয়া চলিয়া যায় বলিয়া উহাকে দেখিতে হইলে পিছন হইতে ফিরিয়া দেখিতে হয়। সুতরাং যাহাকে অন্তর্দর্শন বলা হয় তাহা বস্তুতঃ পশ্চাদ্দর্শনের সামিল।

অন্তর্দর্শনে মন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়, সুতরাং অন্তর্দর্শন সম্ভব নয়—অগাস্ট কোঁৎ-এর এই আপত্তির উত্তরে জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ বলিয়াছেন যে যদিও ঘটিবার কালে মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন সম্ভব নয়, কিন্তু ঘটিবার পর উহা স্মৃতি (মেমরি) সাহায্যে জ্ঞাত হইতে পারে। মিল্-এর এই প্রকার যুক্তি অন্তর্দর্শনকে রেট্রস্‌-পেকশন্ বা পশ্চাদ্দর্শনে পরিণত করারই নামান্তর।

(৫) মিল্-এর উক্তির চূড়ান্ত রূপ দিয়াছেন অধ্যাপক উইলিয়ম্ জেম্‌স্। পশ্চাদ্দর্শনই যদি অন্তর্দর্শনের প্রকৃত রূপ হইয়া থাকে তাহা হইলে অন্তর্দর্শন শব-ব্যবচ্ছেদে (পোস্ট মর্টেম্ ডিসেক্‌শন্) পরিণত হয়। জেম্‌স্ বলিয়াছেন, "শব-ব্যবচ্ছেদই মানসবৃত্তির একমাত্র পরীক্ষা।" এইরূপ আপত্তির তাৎপর্য বুঝানো যাইতেছে। কোনো মানসবৃত্তিকে উহার বর্তমান বা ঘটমান মুহূর্তে অন্তর্দর্শন করা যায় না। উহা ঘটিয়া অদৃশ্য হইলেই উহাকে স্মরণ করিয়া জানা যায় মাত্র। অর্থাৎ জীবন্ত বা বাস্তব মানসবৃত্তি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাহিরে। এই মানসবৃত্তি অদৃশ্য হইয়া গেলেও উহা আমাদের মনে রাখিয়া যায় উহার প্রতিরূপ (ইমেজ্) যাহা উহার সজীব সত্তার মৃতাবশেষ মাত্র। এই মৃতাব-শেষ রাখিয়া মানসবৃত্তি মরিয়া যায়। অন্তর্দর্শন বলিতে এই মৃত প্রতিরূপেরই স্মরণ এবং বিশ্লেষণ বুঝায়, সজীব মানসবৃত্তিব অন্তর্দর্শন বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বুঝায় না। সুতরাং জীবন্ত মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন সম্ভব নয়, সম্ভব উহার মৃত-প্রতিরূপ-সত্তার অঙ্গব্যবচ্ছেদ মাত্র।

(৬) এই প্রধান আপত্তিগুলি ছাড়াও ওয়াটসন্ অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে একটি প্রবল আপত্তি তুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে অন্তর্দর্শন পাত্রগত (সাব-জেক্‌টিভ্) পদ্ধতি, সুতরাং উহার ফলাফল পাত্রের বা জ্ঞাতার মনেই সীমাবদ্ধ। অন্তর্দর্শন পদ্ধতি সাহায্যে আমরা এমন কোনো সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি না

যাহা সর্বজনগ্রাহ্য অথবা সার্বভৌম। দ্বিতীয়তঃ, অন্তর্দর্শন সাহায্যে লব্ধ ফলাফল সন্দিগ্ধ অথবা সংশয়পূর্ণ। একই সমস্যার সমাধানে অন্তর্দর্শন বিভিন্ন এবং অনেক সময় পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যেমন, "অপ্রতিরূপ চিন্তা" (ইমেজ্‌লেস্ থট্‌) সম্ভব কি না, অর্থাৎ প্রতিরূপের সাহায্য না লইয়া চিন্তা করা যায় কি না, এই প্রশ্নের অন্তর্দর্শনলব্ধ উত্তর পরস্পরবিরোধী। টিশ্‌নার্ অন্তর্দর্শন পদ্ধতির সাহায্যে গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "অপ্রতিরূপ চিন্তা" অসম্ভব। আবার একই পদ্ধতির সাহায্য লইয়া কুল্পে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "অপ্রতিরূপ চিন্তা" সম্ভব। যে অন্তর্দর্শন পদ্ধতি এইরূপ পরস্পরবিরোধী ফল উৎপন্ন করে তাহা কখনও নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ অন্তর্দর্শন পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক। অন্যান্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে রহিয়াছে উহার বিষয়গত পদ্ধতি অথবা পর্যবেক্ষণ। পক্ষান্তরে, অন্তর্দর্শন পদ্ধতিকে আঁকড়াইয়া রাখিয়া মনোবিদ্যা বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং এই পদ্ধতি মনোবিদ্যার উন্নতির অন্তরায় এবং পর্যবেক্ষণই উহার অবলম্বনীয় পদ্ধতি। ব্যক্তির বাচিক বিবরণ (ভার্ব্যাল্ রিপোর্ট্‌) অথবা উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ায় পাত্র যাহা বলে তাহাই মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতি হওয়া উচিত। প্রতিক্রিয়ায় কি কি মানসবৃত্তি ঘটে তাহা ওয়াট্‌সন প্রভৃতি চেষ্টিত-বাদীর আলোচ্য নয়, কারণ তাঁহাদের মতে নার্ভতন্ত্র হইতে পৃথক্ কোনো মন নাই। মানুষের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ভাষার আকারেই প্রকাশ পায়। এই ভাষা বা বাচিক বিবরণই মনোবিদ্যার পদ্ধতি।

(৭) তাহা ছাড়া কতগুলি মানসবৃত্তি আছে যাহারা পাত্রের বা জ্ঞাতার মর্মনিহিত এবং যাহাদের অন্তর্দর্শন অসম্ভব। প্রক্ষোভ বা আবেগ (ইমোশন্) এই শ্রেণীর মানসবৃত্তি। ইহাদের অন্তর্দর্শন করিতে গেলেই ইহারা অন্তর্হিত হয়। যেমন ক্রুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে তাহার ক্রোধ অন্তর্দর্শন করা অসম্ভব, কারণ প্রথমতঃ, ক্রোধকালে ক্রোধের অন্তর্দর্শন করিবার মত মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করা কঠিন, যেহেতু এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতে যে শান্ত মনোভাবের প্রয়োজন তাহা ক্রোধের মত চঞ্চল অবস্থার প্রতিকূল। আবার দ্বিতীয়তঃ, এই শান্ত মানস অবস্থা সৃষ্টি করিতে গিয়া ক্রোধ অন্তর্হিত হয় এবং অন্তর্দর্শন বিষয়হীন হইয়া পড়ে।

(৮) আর একটি কারণেও অন্তর্দর্শন মনোবিদ্যার সাধারণ পদ্ধতি হইতে পারে না, কারণ ইহার সাহায্যে মনুষ্যেতর প্রাণীর, শিশুর এবং অস্বভাবী মনের

গবেষণা করা যায় না। মনুষ্যেতর প্রাণীর চেষ্টিত সম্বন্ধে চেতনা আছে কিনা সন্দেহ। আবার শিশু তাহার মানসবৃত্তি সম্বন্ধে চেতন হইলেও অন্তর্দর্শনক্ষম নয়। অস্বভাবী ব্যক্তিও তাহার মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন করিতে অক্ষম। সুতরাং অন্তর্দর্শনের ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, কারণ ইহা শুধু পরিণত ও স্বভাবী মানুষের মানসবৃত্তিতে প্রযোজ্য।

(৯) অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি এই যে ইহা শুধু সংজ্ঞান মানসবৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ এবং অন্তর্জ্ঞান (সাব-কনসাচ্), আসংজ্ঞান (প্রি-কনসাচ্) ও নির্জ্ঞান (আন্-কন্সাচ) মনে অপ্রযোজ্য। মনের এই স্তরগুলি সম্বন্ধে এমন চেতনা থাকে না যাহার ফলে উহাদের অন্তর্দর্শন সম্ভব হইতে পারে।

অন্তর্দর্শনের দোষ পরীক্ষা

অন্তর্দর্শনের দোষগুলি পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখা যায় যে উহাদের অধিকাংশই অযৌক্তিক।

(১) বলা হইয়া থাকে যে মনের স্বাভাবিক গতি বহির্মুখী, অন্তর্দর্শন অন্তর্মুখী, সুতরাং ইহা অস্বাভাবিক পদ্ধতি। উত্তরে বলিতে হয় যে তরবারির দুইটি পৃষ্ঠের মত বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী দিক দুইটি মনেরই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গী, যাহাদের একটি অপরটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেক মানসবৃত্তি যেমন কোনো বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ঘটে, তেমনই এই মানসবৃত্তির সঙ্গে থাকে উহার চেতনা। বস্তু বা বিষয়কে আশ্রয় করাই পর্যবেক্ষণ নয়, আবার মানস-বৃত্তির চেতনা থাকাই অন্তর্দর্শন নয়। বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গিটি যেমন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তি তেমন অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গিটি মনোবৈজ্ঞানিক অন্তর্দর্শনের ভিত্তি। ইহারা প্রাগ্‌বৈজ্ঞানিক বা প্রি-সায়েন্টিফিক্ স্তর।

(২) অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি এই যে ইহা মনকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া ফেলে। উত্তরে বলা যায় যে এই আপত্তি স্বীকার করিলে সকল প্রকার মানসজ্ঞানই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। অথচ মানসজ্ঞান অসম্ভব এই মত অগ্রাহ্য।

মনের পক্ষে নিজকে জানা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। অন্তর্দর্শনে মনের এক সঙ্গে দুইটি কাজ করিতে হয় সত্য। মন একদিকে মানসক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকে, আবার আর এক দিকে মানসক্রিয়ার অন্তর্দর্শনে নিযুক্ত থাকে। আবার অন্য অর্থে মন এক দিক্ দিয়া মানসক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকে এবং অন্য দিক্ দিয়া মানসক্রিয়ার বিষয়েও ব্যাপৃত থাকে। প্রশ্ন হইল যে এই দুইটি ক্রিয়া করিতে

গিয়া মন বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত হইয়া পড়ে কিনা। সাম্প্রতিক প্রায়োগিক মনোবিদ্যার (এক্স্‌পেরিমেণ্টাল্ সাইকলজি) গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে একই সময়ে একাধিক বস্তুতে মনোনিবেশ করা যায় এবং তাহাতে মনের ঐক্য-সূত্র ছিন্ন হয় না। মায়ার্স্ প্রভৃতি মনোবৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে অভ্যাস ও অনুশীলনের ফলে মনকে দোলকের মত মানসবৃত্তি হইতে বিষয়ে, আবার বিষয় হইতে মানসবৃত্তিতে দোলানো (অসিলেট্) বা পরিবর্তিত করা যায়। অর্থাৎ অনুশীলনের ফলে উক্ত অসুবিধা অনেকাংশে দূর হইতে পারে।

এইরূপে অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে মনকে দ্বিধা বিভক্ত করিবার আপত্তি অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়।

(৩) অন্তর্দর্শন বিজ্ঞানসম্মত হইলে মনের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে না। অভ্যাস ও প্রস্তুতির ফলে মানসবৃত্তিকে অব্যাহত রাখিয়া উহার অন্তর্দর্শন সম্ভব।

(৪, ৫) অন্তর্দর্শন পশ্চাদ্দর্শন ও মৃত মানসবৃত্তির শবব্যবচ্ছেদ কিনা আলোচনা করা যাউক। অন্তর্দর্শনকে যাঁহারা এই আপত্তিতে খণ্ডন করিতে চাহিয়াছেন তাঁহারা ইহা ভাবেন নাই যে অনধিগত বিষয়ের স্মরণ হয় না। মানসবৃত্তি ঘটিবার কালেই যদি অন্তর্দৃষ্ট না হইয়া থাকে তবে উহাকে স্মরণ করা যায় না। সুতরাং বলিতে হয় যে মানসবৃত্তির পশ্চাদ্দর্শন সম্ভব হইলে উহার অন্তর্দর্শন অবশ্যই সম্ভব।

আরও বলিতে হয় যে অন্তর্দর্শন মৃত মানসবৃত্তির, অর্থাৎ মানসবৃত্তি ঘটিয়া অন্তর্হিত হইলে উহার পরিত্যক্ত প্রতিরূপের অঙ্গব্যবচ্ছেদ মাত্র নয়। অবশ্য এই আপত্তির স্বপক্ষে স্বীকার করিতে হয় যে এই অন্তর্দর্শন বৈজ্ঞানিক স্তরের ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যমূলক অন্তর্দর্শন নয়। কিন্তু ইহা যে এক প্রকারের প্রাগ্-বৈজ্ঞানিক অন্তর্দর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। মানসবৃত্তি যে নিত্য-চঞ্চল, ইহা যে স্থির হইয়া থাকে না এই কথা সত্য। কিন্তু অভ্যাস ও অনুশীলনের ফলে ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে মানসবৃত্তিকে আংশিকভাবে দেখিয়া লওয়া যায়। আবার ভবিষ্যতে ঐ মানসবৃত্তি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্য একটি অন্তর্দর্শন করা যাইতে পারে। এইভাবে পুনঃ পুনঃ একই মানসবৃত্তির বিভিন্ন দিক্ অন্তর্দর্শন করিয়া উহার একটি সম্পূর্ণরূপ সংকলন করা যায়। মানসবৃত্তির সমগ্র রূপ একটি অন্তর্দর্শন ক্রিয়ায় ধরা না পড়িলেও ঐ বিলীয়মান বৃত্তিকে পুনঃ পুনঃ তির্যগ্ দৃষ্টিতে দেখিয়া (কাস্টিং সাইড্ গ্লান্সেস্) উহাকে সমগ্রভাবে জানা

যাইতে পারে। অবশ্য এইরূপ অন্তর্দর্শন দীর্ঘ অভ্যাস ও অনুশীলন সাপেক্ষ। এই পদ্ধতিকে যত সহজ ও অনায়াসসাধ্য বলিয়া মনে করা হয় ইহা সেইরূপ নয়। মানসবৃত্তি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্তর্দর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। তাহা ছাড়া একই মানসবৃত্তিকে পুনঃ পুনঃ অন্তর্দর্শন করিবার ধৈর্য থাকা আবশ্যক।

(৬) চেষ্টিতবাদী ওয়াট্‌সন্ অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন সেইগুলিও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। অন্তর্দর্শন পাত্রগত বলিয়া উহার ফল শুধু পাত্রে বা জ্ঞাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকে এইরূপ আক্ষেপ করা হইয়াছে। কিন্তু শুধু এক ব্যক্তিমনের অন্তর্দর্শন মনোবিদ্যার অবলম্বিত পদ্ধতি নয়। বিভিন্ন পাত্র একই মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অন্তর্দর্শনলব্ধ ফলগুলি তুলনা করিয়া যে সম্মিলিত (কমন্) ফল লাভ করা যায় তাহাই অন্তর্দর্শনের ফল। সুতরাং অন্তর্দর্শন ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল খুশীর ব্যাপার নয়। এই পদ্ধতি কোনো একক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সীমাবদ্ধ নয়। বহু মনোবিদের সমবেত প্রচেষ্টায় যথাসম্ভব সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌছানোই অন্তর্দর্শনের লক্ষ্য।

ওয়াট্‌সন্ একই সমস্যার সমাধানে অন্তর্দর্শনের পরস্পরবিরুদ্ধ ফলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই দোষটি অন্তর্দর্শনের নয়, কিন্তু নির্দোষভাবে অন্তর্দর্শন না করিবার ফল। সুতরাং অন্তর্দর্শন অবৈজ্ঞানিক অথবা অবিশ্বাস্য এই আপত্তিও দুর্বল হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া অন্তর্দর্শনই একক পদ্ধতি নয়। ইহার সহিত পর্যবেক্ষণ মিলিত হইয়া অন্তর্দর্শনকে অনেক দোষ হইতে মুক্ত করে।

ওয়াট্‌সন্ বলিয়াছেন যে বাচিক বিবরণই মনোবিদ্যার অনুসরণীয় পদ্ধতি। কিন্তু বাচিক বিবরণ অন্তর্দর্শনকে একেবারে বাদ দিয়া সম্ভব হয় কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। পাত্র তাহার মানস অবস্থার জ্ঞানকেই বাচিক বিবরণে প্রকাশ করে এবং এই জ্ঞান অন্তর্দর্শনসাপেক্ষ বলিয়া মনে হয়।

(৭) প্রক্ষোভ প্রভৃতি মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন সুকঠিন সন্দেহ নাই। এই ক্ষেত্রে পশ্চাদ্দর্শনই অন্তর্দর্শনের স্থান গ্রহণ করে বলিয়া মনে হয়।

(৮, ৯) অন্তর্দর্শনের ক্ষেত্র সর্বব্যাপক নয় তাহা ঠিক। মনুষ্যেতর প্রাণীর, শিশুর এবং অস্বভাবী ব্যক্তির মন অন্তর্দর্শন সাহায্যে গবেষণীয় নয়। কিন্তু এই সব মনের বহির্দর্শন পরিণত মনের অন্তর্দর্শনের আলোকে সম্ভব হয়। আবার অস্তর্জ্ঞান, আসংজ্ঞান, নির্জ্ঞান মনের অন্তর্দর্শন সম্ভব না হইলেও উহাদের জ্ঞান অনেকাংশে নির্ভর করে সংজ্ঞান মনের অন্তর্দর্শন-লব্ধ জ্ঞানের উপর।

তাহা ছাড়া এই ক্ষেত্রগুলি মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখার আলোচ্য বিষয়। ইহারা অন্তর্দর্শনের বহির্ভূত হইলেও ইহার বিশেষ হানি নাই। অন্তর্দর্শন সাধারণ মনোবিদ্যার (জেনার‍্যাল্ সাইকলজি) পদ্ধতি—সংজ্ঞান মনই ইহার মুখ্য বিষয়। সুতরাং এমনও যদি হয় যে উপরোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্দর্শন পদ্ধতি সাহায্যে গবেষণীয় নয়, তাহা হইলেও সাধারণ মনোবিদ্যার সংজ্ঞান মনের পদ্ধতি-রূপে ইহার মূল্য কমিয়া যায় না।

৬। মিলিত অন্তর্দর্শন ও বহির্দর্শন পদ্ধতি

অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি তোলা হইয়া থাকে সেইগুলি বহির্দশন বা পর্যবেক্ষণ হইতে বিচ্ছিন্ন অন্তর্দর্শনের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে প্রযোজ্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বর্তমানকালে বহির্দর্শনকে বাদ দিয়া মনোবিদ্যায় অন্তর্দর্শন পদ্ধতির প্রয়োগ হয় না বলিলেই চলে। অন্তর্দর্শন এবং বহির্দর্শনের দোষগুলি হইতে উহাদের মিলিত পদ্ধতি মুক্ত। অন্তর্দর্শন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অথবা ইহা শুধু পাত্রের মনেই সীমাবদ্ধ। ইহা পাত্রের মানসবৃত্তির অন্তর্নিহিত বা অনুভবগম্য রূপটির সন্ধান করে। কিন্তু মানসক্রিয়ার যেমন একটি অন্তর্নিহিত রূপ আছে তেমন উহার একটি বহিঃপ্রকাশিত রূপও অনস্বীকার্য এই দুইটি রূপ লইয়াই মানসবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ রূপ। অন্তর্দর্শন শুধু মানসবৃত্তির অন্তরঙ্গ রূপটির সহিত পরিচিত। আবার বহির্দর্শন বা পর্যবেক্ষণ শুধু উহার বহিরঙ্গ রূপের জ্ঞান। সুতরাং পৃথকভাবে উহারা উভয়েই মনের একদেশদর্শী। মানসবৃত্তির সমগ্র রূপ দর্শন করিতে হইলে উহার অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ অথবা অন্তর্নিহিত এবং বহিঃপ্রকাশিত এই উভয় রূপেরই সন্ধান করা আবশ্যক। যেমন সুখ অনুভূতির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা অন্তর্নিহিত রূপ আছে যাহা শুধু সুখী ব্যক্তির অনুভবগম্য। রামের সুখ হইয়াছে। তাহার সুখের অন্তর্নিহিত রূপটি শুধু রামই অনুভব করিতে পারে, অথবা অন্তর্দর্শন সাহায্যে জানিতে পারে। শ্যামের ক্রোধ হইয়াছে—তাহার ক্রোধের অন্তর্নিহিত বা অনুভবগম্য দিক্‌টির সহিত শুধু শ্যামই পরিচিত। কিন্তু অন্তর্নিহিত বা অনুভবগম্য দিক্‌টির সঙ্গে সঙ্গে সুখ, ক্রোধ প্রভৃতি মানসবৃত্তির কতগুলি বহিঃপ্রকাশও ঘটে, যেমন সুখের হাসি, ধীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি এবং ক্রোধের আরক্ত চক্ষু, দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি শারীর লক্ষণগুলি। এই বহিঃপ্রকাশগুলি না জানিলে সুখ, ক্রোধ প্রভৃতি মানসবৃত্তির সমগ্ররূপ জানা যায় না। আবার বহিঃপ্রকাশগুলি

অন্তর্দর্শন করা যায় না, কিন্তু বহির্দর্শন করা যায় এবং অন্তর্নিহিত অনুভবগম্য রূপ বহির্দর্শন করা যায় না, কিন্তু অন্তর্দর্শন করা যায়।

দেখা যাইতেছে যে অন্তর্দর্শনের একদেশদর্শিতা সংশোধন করে বহির্দর্শন বা পর্যবেক্ষণ, আবার দ্বিতীয়টির একদেশদর্শিতা সংশোধন করে প্রথমটি। এই দুই পদ্ধতির মিলিত প্রয়োগে মানসবৃত্তির সমগ্ররূপ জানা সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং ইহাদের মিলিত পদ্ধতিই মনোবিদ্যার পদ্ধতি।

৭। প্রায়োগিক পদ্ধতি (এক্সপেরিমেণ্ট্যাল মেথড্)

বর্তমানে প্রয়োগ পদ্ধতিই মনোবিদ্যার স্বীকৃত পদ্ধতি। অন্তর্দর্শন মানস ক্রিযার মানস পর্যবেক্ষণ, আবার পর্যবেক্ষণ উহার বহির্দর্শন। উভয়ক্ষেত্রেই নিজ নিয়ম অনুসারে মানসবৃত্তি ঘটিলে উহার পর্যবেক্ষণ করা হইয়া থাকে। অথবা উভয় ক্ষেত্রেই পর্যবেক্ষণ নির্ভর করে মানসবৃত্তির উহার নির্দিষ্ট ধারায় ঘটিবার উপর। কখন মানসবৃত্তিটি ঘটিবে তাহার প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট-ভাবে বসিয়া থাকা অন্তর্দর্শন ও বহির্দর্শন এই দুই পদ্ধতিরই সাধারণ ত্রুটি। অন্তর্দর্শন বা পর্যবেক্ষণের মানসক্রিয়াগুলি মনোবিদের ইচ্ছা বা প্রয়োজন অনুসারে ঘটে না, উহারা ঘটে উহাদের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে। ফলে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন অনুসারে উহাদের গবেষণা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই মানসবৃত্তিগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে কৃত্রিমভাবে ঘটাইবার বা উৎপন্ন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। **নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় মানসবৃত্তিকে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে উৎপন্ন করিয়া উহার অন্তর্দর্শন এবং পর্য-বেক্ষণকে মনোবিদ্যার প্রায়োগিক পদ্ধতি** (এক্স্‌পেরিমেণ্টাল মেথড্ অফ্ সাইকলজি) বলে। যে মনোবিদ্যা প্রয়োগ পদ্ধতির সাহায্যে মানসবৃত্তির গবেষণা করে তাহাকে বলে প্রায়োগিক মনোবিদ্যা বা এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকলজি। আজকাল মনোবিদ্যা বলিতে প্রায়োগিক মনোবিদ্যা বুঝায়।

তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে কিরূপে মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শনলব্ধ অন্তর্নিহিত বা ভিতরকার রূপকে বাদ না দিয়া নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় উহার বাহ্যলক্ষণগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। মনোবিদ্যার প্রায়োগিক পদ্ধতির এই মূল কথাটিই ইহার আসল সমস্যা।

মনোবিদ্যার প্রায়োগিক পদ্ধতিতে সাধারণতঃ কমপক্ষে দুই ব্যক্তির সহ-যোগিতা আবশ্যক। মনোবিৎ স্বয়ং হইলেন প্রয়োগকর্তা বা পর্যবেক্ষক (অব্জার্-

ভার্, এক্স্‌পেরিমেণ্টার্) এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাহার মানসবৃত্তি গবেষণার বিষয়, তিনি হইলেন পাত্র (সাব্‌জেক্‌ট্)। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিষয় ও (অব্‌জেক্‌ট্) বলা হইয়া থাকে, কারণ তাঁহার মনই প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণের বিষয়।

প্রয়োগকর্তা বা পর্যবেক্ষকের কি কি করণীয় দেখা যাউক। তিনি প্রয়োগের অবস্থাগুলি প্রয়োজনমত তৈয়ারী করেন বা সাজান। প্রথমতঃ তিনি প্রয়োগ-শালার পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি আয়ত্তে লইয়া আসেন—যেমন উপযুক্ত আলোক, তাপ প্রভৃতি, পাত্রের বসিবার আরামদায়ক স্থান, প্রয়োগের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন—এবং পাত্র যাহাতে স্বচ্ছন্দভাবে এবং আরামে প্রয়োগ গ্রহণ করিতে পারে তাহার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি পাত্রকে বুঝাইয়া দেন তাহার করণীয় কি। যেমন উদ্দীপক উপস্থাপিত হওয়া মাত্র তাহার কিরূপে প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে এবং প্রতি-ক্রিয়ায় পূর্ববর্তী (ফোর্ পিরিয়ড্), মধ্যবর্তী (মিড্ পিরিয়ড্) এবং পরবর্তী (আফ্‌টার পিরিয়ড্) কালে তাহার মানস অবস্থার অন্তর্দর্শন বিবরণ (ইনট্রস্-পেক্‌টিভ্ রিপোর্ট) দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ প্রয়োগকর্তার আর একটি করণীয় রহিয়াছে যাহা পাত্রের পক্ষে করা সম্ভব হইতে পারে না। তিনি পর্যবেক্ষণ করিবেন প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন কালে পাত্রের বহিঃপ্রকাশগুলি। সর্বশেষে প্রয়োগ-কর্তার প্রধান কাজ হইল পাত্রের অন্তর্দর্শন এবং তাঁহার নিজ পর্যবেক্ষণ বিবরণের ভিত্তিতে কি কি ফল বা সিদ্ধান্ত বাহির করা যায় তাহা নির্ণয় করা। সিদ্ধান্ত বা ফল নির্ণয়ের জন্য তাঁহাকে নানাপ্রকার পরিসংখ্যান পদ্ধতির (স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল্ মেথড্) সাহায্য লইতে হয়।

প্রয়োগকর্তা বা পর্যবেক্ষক এবং পাত্রের সহযোগিতায় মানসক্রিয়ার অন্ত-র্নিহিত এবং বহিঃপ্রকাশিত এই দুইটি দিক্‌ই বুঝিতে পারা যায়। প্রয়োগকর্তা পাত্রের বহিঃপ্রকাশগুলি পর্যবেক্ষণ করেন এবং পাত্র স্বয়ং তাঁহার মানসবৃত্তি বা অভিজ্ঞতার প্রতি মনোনিবেশ করেন। ফলে মানসবৃত্তির একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়।

মনোবিদ্যার প্রয়োগ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হইল প্রয়োগে ব্যবহৃত উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করা। এই উদ্দীপকের সহিত আরও অনেক উদ্দীপক থাকিতে পারে যাহা প্রয়োগের লক্ষ্য নয়। মনোবিদ্যার প্রয়োগ পদ্ধতিতে এই আনু-ষঙ্গিক উদ্দীপক এবং উহাদের প্রতিক্রিয়াগুলিকে অপরিবর্তিত (কন্‌স্ট্যাণ্ট্) রাখিয়া পরীক্ষণীয় উদ্দীপককে পরিবর্তিত (ভ্যারিয়েব্‌ল্) করিতে হয়। উদ্দেশ্য

এই যে অন্যান্য অপরিবর্তিত উদ্দীপকের মধ্যে থাকিয়া ঐ পৃথক্ বা নিরপেক্ষ উদ্দীপকের পরিবর্তনে প্রতিক্রিয়ায় কি কি পরিবর্তন ঘটে তাহা নির্ণয় করা। এই কারণরূপ উদ্দীপককে বলা হয় নিরপেক্ষ ভেদ্য (ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট্ ভেরিয়েব্‌ল্) এবং উহার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্তিত প্রতিক্রিয়া ঘটে তাহাকে বলা হয় সাপেক্ষ ভেদ্য (ডিপেন্‌ডেন্ট্ ভেরিয়েব্‌ল্)। অন্যান্য উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়াগুলি অপরিবর্তিত (কন্‌স্ট্যাণ্ট্) থাকিয়া যায়। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও যদি একটি অবস্থার পরিবর্তন আর একটি অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় তাহা হইলে বুঝা যায় যে প্রথমটি দ্বিতীয়টির কারণ এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটির কার্য।

প্রায়োগিক পদ্ধতির দোষ

মনোবিদ্যার প্রায়োগিক পদ্ধতি যে দোষমুক্ত তাহা নয়। ইহার কয়েকটি অসুবিধা আছে।

মানসবৃত্তি নিত্য চঞ্চল। স্থূল বস্তুর মত উহাকে নিশ্চল ও নিস্পন্দ করিয়া রাখা যায় না। আবার মানসবৃত্তিকে স্থিরভাবে রাখিতে না পারিলে উহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা অসম্ভব। এই কারণে মনোবিদ্যায় প্রয়োগ পদ্ধতি কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োগের এবং প্রয়োগশালার কৃত্রিম পরিবেশে মনের স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত, সুতরাং পরীক্ষণীয় মানসবৃত্তিগুলি বিকৃত হয়। ফলে মনোবিৎ প্রয়োগশালায় মনের যে রূপ জানিতে পারেন তাহা মনের প্রকৃত রূপ নাও হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, পাত্র হয়ত প্রয়োগ কর্তাকে খুশী করিবার জন্য প্রয়োগকর্তার বাঞ্ছিত প্রকারে প্রতিক্রিয়া এবং উহার অন্তর্দর্শন করিতে পারেন। এইরূপ অবস্থায় প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়।

সর্বোপরি কতগুলি মানসবৃত্তি আছে যাহাদের উপর প্রয়োগ পদ্ধতি প্রায় অচল। আবেগ বা প্রক্ষোভ এই শ্রেণীর মানসবৃত্তি।

উত্তরে বলিতে হয় যে প্রয়োগ পদ্ধতির অনেক অসুবিধা আছে সত্য, কিন্তু প্রায়োগিক মনোবিদ্যা এই অসুবিধাগুলি অনেকাংশে নিজ আয়ত্তে আনিতে পারিয়াছে। (১) মানসবৃত্তি চঞ্চল হইলেও, উহা একবার ঘটিয়াই শেষ হইয়া যায় না—প্রয়োজন মত এবং নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় উহার পুনরুৎপাদন সম্ভব। (২) আবার প্রয়োগের কৃত্রিম পরিবেশ সহজ করিবার চেষ্টায়ও মনোবিদ্যার ত্রুটি

নাই। পাত্র যাহাতে স্বচ্ছন্দে ও সুস্থ মনে প্রয়োগে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন সে দিকে সযত্ন লক্ষ্য রাখিয়াই প্রয়োগকর্তা প্রয়োগে অগ্রসর হইয়া থাকেন। (৩) উপরন্তু পাত্রকে প্রয়োগ সম্বন্ধে এমনভাবে সুশিক্ষিত করা হয় যাহার ফলে তাঁহার মধ্যে প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া ওঠে এবং তিনি তাঁহার প্রতিক্রিয়া এবং অন্তর্দর্শন যথাযথভাবে করিতে পারেন। তাহা ছাড়া একটি মাত্র পাত্রের উপর একটি মাত্র প্রয়োগ করিয়াই প্রয়োগকর্তা নিরস্ত হন না। তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাত্রের উপর অসংখ্য প্রয়োগ করিয়া মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। (৪) প্রক্ষোভ প্রভৃতি মানসবৃত্তি মনো-বৈজ্ঞানিক প্রয়োগে অসুবিধা সৃষ্টি করে সত্য, কিন্তু এই অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টায় মনোবিদের বিরাম নাই। পাত্রকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় যাহার ফলে তিনি প্রক্ষোভের অন্তর্দর্শন অথবা উহা সম্ভব না হইলে উহার পশ্চাদ্দর্শন করিতে পারেন।

প্রায়োগিক পদ্ধতির গুণ

প্রায়োগিক পদ্ধতির প্রধান গুণ এই যে (১) মানসবৃত্তি কখন নিজ স্বভাব-বশে ঘটিবে তাহার অনির্দিষ্ট প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয় না। যতবার প্রয়োজন ততবারই মানসবৃত্তিকে উৎপন্ন করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যায়। (২) দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিতে জ্ঞাতব্য মানসবৃত্তিকে উহার অসংখ্য সহকারী অবস্থা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা যায়, ফলে উহার আসল বা বিশুদ্ধ রূপটি মনোবিদের নিকট ধরা পড়ে। (৩) তৃতীয়তঃ প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে মানসবৃত্তির ভিতরকার এবং বাহিরের এই উভয় রূপই জানা যায়, ফলে উহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ হয়। (৪) চতুর্থতঃ এই পদ্ধতির সাহায্যে কোন্ মানসবৃত্তির সহিত কোন্ শারীর লক্ষণ বা প্রকাশ ঘটে, অর্থাৎ মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ কি, তাহা জানা যায়। (৫) সর্বোপরি প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে আমরা এমন কতগুলি সিদ্ধান্ত বা ফল লাভ করি যাহাকে মাত্রিক (কোয়াণ্টিটেটিভ্) উপায়ে নির্ণয় করিয়া মনোবৈজ্ঞানিক নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারি। গণিত ও পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে নির্ণীত হওয়ায় প্রায়োগিক পদ্ধতিলব্ধ সিদ্ধান্ত সঠিক বা নিশ্চিত এবং নিখুঁৎ হইতে পারে। প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যেই মনো-বিদ্যাকে একটি তাত্ত্বিক (থিওরেটিক্যাল্) বিষয় হইতে প্রায়োগিক (এক্স্পেরি-মেণ্টাল্) বিষয়ে উন্নীত করা যায়।

৮। জনি বা বিবর্তন পদ্ধতি—(জেনেটিক্ মেথড্)

উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি মনোবিদ্যার উপাত্ত বা মালমশলা সংগ্রহের সহায়ক। উহাদিগকে পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি বলা যাইতে পারে।

কিন্তু উপাত্ত বা মাল মশলা সংগ্রহ করিলেই হইল না। উহাদের ব্যাখ্যা করাও দরকার। জনি বা বিবর্তন পদ্ধতি (জেনেটিক্ মেথড্) একটি ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি। ইহা মানসবৃত্তির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করে। সুতরাং ইহাকে মনের পরিণাম বা বিকাশমূলক পদ্ধতিও বলা যাইতে পারে।

মন স্থির বা অচঞ্চল সত্তা নয়। স্থির বা অচঞ্চল মন যদি বা থাকেও তবে তাহা মনোবিদ্যার বিষয় নয়। মনোবিদ্যা মানসক্রিয়ার বিদ্যা। বিশ্বের অন্যান্য বস্তুর মত মনও পরিণামী বা ক্রমবিকাশশীল। সাধারণ মনোবিদ্যা যে পরিণত মনের আলোচনা করে তাহা সুদীর্ঘ পরিণাম বা বিবর্তনের ফল।

সুতরাং প্রশ্ন এই যে পরিণত মন কোন্ কোন্ অবস্থা বা স্তর অতিক্রম করিয়া পরিণত অবস্থা লাভ করিয়াছে। মনের প্রাথমিক অপরিণত অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া উহার পরিণত অবস্থায় ক্রমবিকাশের আলোচনাই জনি বা বিবর্তন পদ্ধতির বিষয়।

জনি পদ্ধতির সহিত বিশ্লেষণ পদ্ধতির (অ্যানালিটিক্ মেথড্) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। পরিণত মনের বিশ্লেষণ করিয়া উহার ক্রমবিকাশের ধারা বুঝিবার চেষ্টাই জনি পদ্ধতির উদ্দেশ্য। ওয়ার্ড্, স্টাউট্, ম্যাক্‌ডুগাল্ প্রভৃতি মনোবিদ্ এই উভয় পদ্ধতির মিলিত পদ্ধতিতে মনোবিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন। যে মনোবিদ্যা এই পদ্ধতির সাহায্যে মনের আলোচনা করে তাহাকে বিবর্তন বা জনি মনোবিদ্যা (জেনেটিক্ সাইকলজি) বলা হয়। এই পদ্ধতিটি শিশু মনোবিদ্যায় (চাইল্ড্ সাইকলজি) বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ মনের ক্রম-পরিণতি বুঝিতে হইলে শিশুর অপরিণত মন হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ করা আবশ্যক।

জনি পদ্ধতি মন সম্বন্ধে যে সকল তথ্য এবং সূত্র উপস্থিত করে সেইগুলি এই :—

(১) প্রথমতঃ মন নিয়ত পরিবর্তনশীল। মানসবৃত্তি এক মুহূর্তও স্থির হইয়া থাকে না।

(২) একটি মানসবৃত্তির সহিত অপরটির ধারাবাহিকতা (কন্‌টিন্যুইটি) আছে। মানসবৃত্তিগুলির মধ্যে কোথাও কোনো ছেদ বা ব্যবধান (গ্যাপ্) নাই—

ইহারা একরূপতা (য়ুনিফর্মিটি) এবং কার্যকারণসূত্রে (ল' অফ্ কজেশন্
নিয়ন্ত্রিত। জনি পদ্ধতি প্রমাণ করে যে মন নিরবচ্ছেদ।

(৩) ক্রমবিকাশের ধারায় প্রত্যেক পরবর্তী মানসবৃত্তি উহার পূর্ববর্তী মানসবৃত্তির সহিত ধারাবাহিক হইলেও উহা একটি নূতন মানসবৃত্তি। যেমন সংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষের ধারাবাহিকতা থাকিলেও প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি নূতন মানসবৃত্তি।

(৪) জনি পদ্ধতি মানসবৃত্তির ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ অথবা সরল মানসবৃত্তি হইতে অপেক্ষাকৃত জটিল মানসবৃত্তিকে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী রূপে সাজাইয়া ফেলে। যেমন জ্ঞান (নলেজ্) কোন্ কোন সহজতর মানস অবস্থার ক্রমিক পরিণতি? সংবেদন (সেন্সেশন) জ্ঞানের সহজ-তম বা নিম্নতম স্তর—কারণ জ্ঞানের মৌলিক উপাদান হইল শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ, প্রভৃতি যাহা সংবেদন সাহায্যে সংগৃহীত হয়। আবার প্রত্যক্ষ, স্মৃতি কল্পনা, অবধারণ এবং অনুমান পূর্বাপর ক্রমে একটি অপরটির সহজতর অবস্থা

শিশু মনোবিদ্যার ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ হইয়া থাকে শিশুমনের আরম্ভ এবং ক্রমবিকাশ এই পদ্ধতির আলোচ্য। এই পদ্ধতি শিশুমন সম্বন্ধে নিম্ন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন এবং আলোচনা করে। কোন্ কোন্ মানসবৃত্তি শিশু বংশগত (হেরিডিটারি) অথবা সহজভাবে (নেটিভ্, ইনেট্) প্রাপ্ত হয় পরিবেশ (এন্ভায়রন্মেণ্ট্) শিশুমনের বিকাশে কি প্রভাব বিস্তার করে শিশুর আচরণ বা চেষ্টিত কি সহজ প্রবৃত্তি (ইন্স্টিংক্ট্) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অথবা অর্জিত (অ্যাকোয়ার্ড্) এবং বুদ্ধির দ্বারা অল্পাধিক পরিমাণে প্রভাবিত বুদ্ধির প্রকৃতি কি? বুদ্ধি কি উপায়ে নির্ণয় করা যায়? বুদ্ধির অল্পতা অথবা নীতিবোধের অল্পতা কি উপায়ে দূর করা যায়? সামাজিক বোধ কিভাবে বিকাশ লাভ করে?

বিবর্তন বা জনি পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া শিশুর মানসবিকাশের স্তরগুলিকে কয়েকটি খণ্ডে (পিরিয়ড্) ভাগ করা যায়। জন্ম হইতে প্রায় দেড় বৎসর পর্যন্ত অবস্থাকে বলে অপোগণ্ড(ইন্ফ্যান্সি) অবস্থা; পরবর্তী প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী শৈশব অবস্থা (বেবিহুড্), পরবর্তী প্রায় সাত বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী অবস্থা হইল পূর্ব বাল্যাবস্থা (আর্লি চাইল্ড্হুড্); তৎপরবর্তী প্রায় কুড়ি বৎসর পর্যন্ত খণ্ড হইল কৈশোর (অ্যাডোলেসেন্স্)। শিশু মনোবিদ্যা ক্রমপরিণতি পরবর্তী অবস্থাগুলি আলোচনা করে না। তথাপি বলিয়া রাখা ভাল যে পরবর্তী

অবস্থাগুলি হইল যৌবন অবস্থা (ইয়ুথ্—প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত), মধ্যবয়স অবস্থা (মিড্‌ল্ এজ্—প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত), পরিণত অবস্থা (মেচিউরিটি—প্রায় ষাট্ বৎসর পর্যন্ত), পূর্ব বৃদ্ধবয়স (আর্লি ওল্‌ড্ এজ্—প্রায় সত্তর বৎসর পর্যন্ত), বৃদ্ধাবস্থা (ওল্‌ড্ এজ্—প্রায় আশী বৎসর পর্যন্ত), স্থবির অবস্থা বা সিনাইল্ এজ্—প্রায় নব্বুই বৎসর পর্যন্ত)। সর্বশেষে মৃত্যু এই জীবন নাট্যে ছেদ টানিয়া দেয়।

জনি বা বিবর্তন পদ্ধতির সহিত তুলনামূলক পদ্ধতির (কম্‌পারেটিভ্ মেথড্) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। শিশুর মন বুঝিতে হইলে উহাকে পরিণত বা বয়স্ক ব্যক্তির মনের সহিত তুলনা করিয়া বুঝিতে হয়। আবার মনুষ্যেতর অথবা নিম্নতর প্রাণীর বা পশুর মন বুঝিতে হইলে উহাকে শিশুমনের সহিত তুলনা করিয়া বুঝিতে হয়। **পরিণত মনুষ্যমনের সহিত তুলনা করিয়া শিশু-মনের এবং দ্বিতীয়টির সহিত তুলনা করিয়া নিম্নতর প্রাণিমনের জ্ঞান লাভ করিবার পদ্ধতিকে বলা হয় তুলনামূলক পদ্ধতি।** আবার যে মনোবিদ্যা এইরূপ তুলনামূলকভাবে শিশু এবং প্রাণিমন বুঝিতে চেষ্টা করে তাহাকে বলে তুলনামূলক মনোবিদ্যা (কম্‌পারেটিভ্ সাইকলজি)।

জনি পদ্ধতির গুণ ও দোষ

জনি পদ্ধতির গুণ এই যে ইহা মনের সক্রিয়তা (ডায়নামিজ্‌ম্) লক্ষ্য করে। মনের সক্রিয়তা একটি স্বীকৃত সত্য। মনের এই যথার্থরূপের উপর আলোকপাত করিয়া জনি পদ্ধতি মনোবিদ্যার সহায়তা করে।

কিন্তু জনি পদ্ধতির দোষ এই যে মানসবৃত্তির অন্তরালে যে মানসসত্তা থাকিতে পারে এই পদ্ধতি তাহাতে মূল্য আরোপ করে না। অথচ স্টাউট্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণের মতে এইরূপ স্থির মানসসত্তা স্বীকার না করিলে মনের ঐক্য এবং ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করা যায় না।

তাহা ছাড়া এই পদ্ধতির আরও একটি দোষ আছে। শিশুর মনকে আমরা অনেক সময় আমাদের পরিণত মনের মানদণ্ডে বিচার করিয়া বসি। এই প্রকার বিচার শিশুকে বৃদ্ধে পরিণত করার নামান্তর।

কিন্তু এই অসুবিধা জনি পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক মূল্য হ্রাস করে না। পরিণাম বা ক্রমবিকাশ একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। জনি পদ্ধতি মনের ক্রমোন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বৈজ্ঞানিক পথই অনুসরণ করিয়াছে।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

উড্ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড মাকু ইস্—সাইকলজি—প্রথম পরিচ্ছেদ

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেণ্টস্ অফ্ সাইকলজি—প্রথম পরিচ্ছেদ

জি. এফ্ ষ্টাউট্—ম্যানুয়াল্ অফ্ সাইকলজি—ভূমিকা—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ই. বি. টিশ্নার্—এ প্রাইমার্ অফ্ সাইকলজি—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঐ —এ টেক্সটবুক্ অফ্ সাইকলজি—পৃঃ ১৯-২৫

সি. এস্ মায়ার্স্—এ টেক্সটবুক্ অফ্ এক্স্পেরিমেণ্ট্যাল্ সাইকলজি—প্রথম পরিচ্ছেদ

Exercise

1 What are the data of psychology ? How are these obtained ? (pp. 20-21)

2. State and explain some fundamental principles of Psychology. (pp. 21-22)

3. Explain and examine the objective method of Psychology. (pp. 24-30)

4. What do you mean by the subjective method of Psychology ? Do you accept it ? Explain the reasons for your answer. (pp 30-40)

5. Is introspection possible ? If so, in what sense ? (pp. 32-41)

6 What do you mean by the experimental method of Psychology ? Is it possible ? Discuss (pp. 41-44)

7 Are the objective and subjective methods of Psychology opposed to each other ? Discuss. (pp. 41-43)

8 Write notes on (a) The Genetic Method, (b) The Comparative Method, (c) Lloyd Morgan's Canon. (pp. 45-47 , 47 , 29)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মনোবিদ্যার সংজ্ঞা এবং ক্ষেত্র

ডেফিনিশন্‌স্ অ্যাণ্ড্ স্কোপ্ অফ্ সাইকলজি

১। মনোবিদ্যার সংজ্ঞার ইতিহাস

মন সম্বন্ধে বিদ্যাই মনোবিদ্যা। কাজেই 'মন' বলিতে আমরা কি বুঝিব মনোবিদ্যার সংজ্ঞা তাহার উপর নির্ভর করে। মনের ধারণা বদলাইবার সঙ্গে সঙ্গে মনোবিদ্যার লক্ষণ বদলায়।

প্লেটো মন বলিতে দেহাতিরিক্ত আত্মসত্তা এবং মনোবিদ্যা বলিতে "আত্মসত্তার বিদ্যা" বুঝিয়াছেন। তাঁহার মতে, কূটস্থ ও নিত্য "আত্মসত্তার বিদ্যাই মনোবিদ্যা" ("সায়েন্স অফ্ দি সাইকি অর্ সোল্")। মনের দুইটি দিক্—একটি উহার প্রতীয়মান বা ভাসমান (ফেনোমেনাল্) রূপ এবং অপরটি উহার নিজস্ব রূপ (নুমেন্যাল্) বা স্বরূপ। প্লেটোর মতে আত্মস্বরূপই মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

কিন্তু প্লেটো-প্রদর্শিত সংজ্ঞা মনোবিদ্যার অসাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের জ্ঞাপক নয়। আত্মস্বরূপ তত্ত্ববিদ্যার (মেটাফিজিক্স্) জ্ঞাতব্য বিষয়। এই লক্ষণ অনুসারে তত্ত্ববিদ্যার সহিত মনোবিদ্যার বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না। এই সংজ্ঞা মনোবিদ্যাকে দর্শনের পুচ্ছলগ্ন করিয়া রাখে এবং উহাকে বিজ্ঞান-পদবাচ্য হইতে দেয় না, কারণ আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে আধুনিক মনোবিদ্যার প্রায়োগিক পদ্ধতি একেবারেই খাটে না।

প্লেটোর পরবর্তী এবং তাঁহার শিষ্য অ্যারিস্টট্‌ল্ হইলেন য়্যুরোপীয় মনোবিদ্যার জনক। তিনি মনকে নিছক দেহাতিরিক্ত আত্মা বলিয়া নির্দেশ করেন নাই। আত্মা শরীরী, ইহা শরীর হইতে অভিন্ন, কারণ দেহ বা শরীর-বিচ্ছিন্ন আত্মা ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। অ্যারিস্টট্‌ল্-এর মতে মনোবিদ্যা শরীরী আত্মার বিদ্যা (সায়েন্স্ অফ্ দি লিভিং অর্গ্যানিজ্‌ম্)।

কিন্তু অ্যারিস্টট্‌ল্ যে দেহাতিরিক্ত আত্মসত্তা একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন তাহা নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতায় আত্মা দেহ হইতে অবিচ্ছিন্ন হইলেও ইহা একটি দেহাতিরিক্ত সত্তাও বটে। পুষ্টি (ন্যুট্রিশন), এবং প্রবৃত্তি (অ্যাপিটাইট্) শারীরী আত্মার বিশেষ লক্ষণ এবং জ্ঞান বা বিচার (রিজন্) উহার শরীরাতি-

রিক্ত সত্তার বিশেষ লক্ষণ। প্রথম দুইটি হইল মনের জৈব (অ্যানিম্যাল্) এবং তৃতীয়টি হইল উহার দৈব (ডিভাইন্) উপাদান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অ্যারিস্টট্ল্-প্রদত্ত মনোবিদ্যার সংজ্ঞা প্লেটো'র সংজ্ঞার তুলনায় অধিক বাস্তবধর্মী।

অ্যারিস্টট্ল্-এর বাস্তবধর্মী মনোবিদ্যার লক্ষণ পরিণতি লাভ করিল মনোবিদ্যা হইতে আত্মসত্তার নির্বাসনে। মধ্যযুগীয় মনোবিদ্যা হইয়া দাঁড়াইল "মন সম্বন্ধীয় বিদ্যা (সায়েন্স অফ্ দি মাইণ্ড্)"। কিন্তু এই সংজ্ঞাটিও গ্রহণীয় হইল না। কারণ, প্রথমতঃ, "মন" কথাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট। মনের বহু দিক্ আছে। মনোবিদ্যা মনের সকল দিক্ অথবা কোনো বিশেষ দিক্ লইয়া আলোচনা করে কিনা তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রয়োজন। অর্থাৎ মন কাহাকে বলে সেই বিষয়ে মধ্যযুগীয় দার্শনিকগণ নীরব। দ্বিতীয়তঃ, মন শুধু মনোবিদ্যারই বিষয় নয়। ইহা একাধারে নীতিবিদ্যা (এথিক্স্), সৌন্দর্যবিদ্যা (ইস্থেটিক্স্), যুক্তিবিদ্যা (লজিক্) এবং সর্বোপরি দর্শনের বিষয়ও বটে। সুতরাং মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞাটি "অতিব্যাপ্তি" দোষে দুষ্ট। তাহা ছাড়া মনোবিদ্যা কোন্ শ্রেণীর বিজ্ঞান, ইহা কি ব্যবহারিক বা ঘটনানিষ্ঠ (পজিটিভ্) বা আদর্শনিষ্ঠ (নর্ম্যাটিভ) বিজ্ঞান, তাহা এই সংজ্ঞায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে নাই।

দে কার্তে মনোবিদ্যার পরবর্তী সংজ্ঞার ভূমি প্রস্তুত করিলেন। তিনি মনোবিদ্যাকে "মন সম্বন্ধীয় বিদ্যা" বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু মন বলিতে কি বুঝায় তাহা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, চিন্তন বা থট্ অথবা চেতনা বা কন্সাচ্নেস্ই মনের স্বরূপ। এইরূপে তাঁহার নিকট মনের বিদ্যার পরিবর্তে মনোবিদ্যা "চেতনার বিদ্যা" (সায়েন্স অব্ কন্সাচ্নেস্) হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু মনোবিদ্যার এই তৃতীয় সংজ্ঞাটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। ইহা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রকে চিন্তন বা চেতনায় সীমাবদ্ধ করিল। কিন্তু একমাত্র চেতনাই মনোবিদ্যার সমগ্র বিষয় হইতে পারে না। চেতনার নিম্নেও মনের কয়েকটি স্তর আছে, যাহারা মনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—যেমন অন্তর্জ্ঞান (সাব্কন্সাচ্), আসংজ্ঞান (প্রি-কন্সাচ্) এবং নির্জ্ঞান (আন্কন্সাচ্) মন। দে কার্তে মনকে চেতনার সহিত সমব্যাপ্ত করিয়া মনের ক্ষেত্র হইতে এই তিনটি স্তরকে বাদ দিয়াছেন।

মনোবিদ্যার এই ক্ষেত্রসঙ্কোচ পরিহার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন জার্মান্ মনোবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা লাইব্নিজ্। তিনি মনের ক্ষেত্র বা পরিধিকে চেতনায়

বা সংজ্ঞানে সীমাবদ্ধ করেন নাই, কিন্তু অন্তর্জ্ঞান স্তরে প্রসারিত করিয়াছেন। অবশ্য তিনি অসঙ্গতভাবে এই স্তরটির গভীরতর নির্জ্ঞান বা আন্‌কন্‌সাচ্ স্তরের কথা বলেন নাই। সে যাহা হউক, লাইবনিজ্-এর ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা "চেতনার বিদ্যা" হইতে প্রসারিত হইয়া "চেতন এবং অন্তর্জ্ঞান মনের বিদ্যা" রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার মতে প্রত্যেক সংজ্ঞান বৃত্তিই অসংখ্য "ক্ষুদ্র প্রত্যক্ষের (পিটাইটিস্ পারসেপ্‌শন্‌স্)" বা অন্তর্জ্ঞান বৃত্তির সমষ্টি।

সাম্প্রতিক য়্যুরোপীয় প্রয়োগিক মনোবিদ্যার সূত্রপাত হইয়াছে প্রথমতঃ ফেক্‌নার্-এর মানসদৈহিক প্রয়োগে (সাইকোফিজিক্যাল্ এক্সপেরিমেণ্ট) এবং দ্বিতীয়তঃ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর লাইপ্‌জিগ্ সহরে হ্বুণ্ড্ কর্তৃক প্রথম মনোবিদ্যার প্রয়োগশালা বা ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠায়। হ্বুণ্ড্ মনোবিদ্যাকে দর্শন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি এবং তাঁহার অনুগামী টিশ্‌নার্, কুল্পে প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ মনোবিদ্যাকে মানসবৃত্তির বিদ্যায় পরিণত করিলেন। হ্বুণ্ড্-এর মতে মনোবিদ্যা হইল "ব্যক্তির অভিজ্ঞতাবিদ্যা (সায়েন্স অব্ ইন্‌ডিভিজুয়্যাল্ এক্স্‌পেরিয়েন্স)"। অনেকের মতেই মনোবিদ্যা "মানসবৃত্তির বিদ্যা (সায়েন্স অফ্ মেণ্ট্যাল্ স্টেট্‌স্ অ্যাণ্ড্ প্রসেসেস্)" হইয়া দাঁড়াইল। মনোবিৎ স্টাউট্‌ও মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞাই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তিনি মানসবৃত্তির অতিরিক্ত একটি মানসসত্তাকে স্বীকার করিয়া মনোবিদ্যায় অগ্রসর হইয়াছেন। এই মানস সত্তা, তাঁহার মতে, মনোবিদ্যার বিষয় না হইলেও ইহা মনোবিদ্যার একটি মূল সূত্র।

হ্বুণ্ড্, টিশ্‌নার্, কুল্পে প্রভৃতি মানসক্রিয়ার সহিত শারীর ক্রিয়াও মনোবিদ্যার আলোচ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ মানসক্রিয়া শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটিতে পারে না। সুতরাং মনোবিদ্যা কি তাহা বুঝিতে হইলে শারীরবৃত্তের (ফিজিয়লজি) জ্ঞান অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, মানসক্রিয়া বা অভিজ্ঞতার বিদ্যা হইলে মনোবিদ্যা অভিজ্ঞাতার (এক্সপিয়েরিয়েন্‌সিং ইন্‌ডিভিজুয়্যাল্) উপর নির্ভরশীল হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণে টিশ্‌নার্ বলিয়াছেন যে "অভিজ্ঞাতৃসাপেক্ষ অভিজ্ঞতার বিদ্যাই মনোবিদ্যা (সায়েন্স অব্ এক্স্‌পিয়েরিয়েন্স্ ডিপেন্‌ডেণ্ট্ আপন্ অ্যান্ এক্স্‌পিয়েরিয়েন্সিং পার্‌সন্)"। সাম্প্রতিক মনোবিদ্যায় ওয়ার্ড্ ও স্টাউট্ প্রভৃতি এই শেষোক্ত সংজ্ঞাটির সহিত একমত। তবে তাঁহারা হ্বুণ্ড্, টিশ্‌নার প্রভৃতির ন্যায় মনোবিদ্যাকে শারীরবৃত্তের সহিত পুচ্ছলগ্ন করিতে অনিচ্ছুক। তাহা ছাড়া, তাঁহারা মানসসত্তাকে

মনোবিদ্যার মুখ্য বিষয় হিসাবে স্বীকার না করিলেও, উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহেন না।

আধুনিক মনোবিদ্যা মোটের উপর মনের ক্রিয়াশীল (ডায়নামিক্) দিক্‌টিকে বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে এবং মনোবিদ্যাকে একটি ঘটনানিষ্ঠ (পজিটিভ্) বিদ্যা হিসাবে স্বীকার করে। উইলিয়াম্ ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ বলিয়াছেন, "মনোবিদ্যা প্রাণিচেষ্টিতের ঘটনানিষ্ঠ বিদ্যা—পজিটিভ্ সায়েন্স্ অফ্ দি বিহেভিয়র্ অফ্ লিভিং থিঙ্গ্‌স্।" ম্যাক্‌ডুগ্যাল্-এর প্রদর্শিত মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞা আপাতদৃষ্টিতে চেষ্টিতবাদী বা বিহেভিয়রিস্ট্-এর সংজ্ঞার মতই মনে হয়, কারণ চেষ্টিতবাদীও মনোবিদ্যাকে "প্রাণিচেষ্টিতের বিদ্যা—সায়েন্স্ অফ্ বিহেভিয়র্"—বলিয়া থাকেন।

কিন্তু ম্যাক্‌ডুগ্যাল্-ব্যবহৃত চেষ্টিত অথবা বিহেভিয়র্ কথাটির সহিত চেষ্টিতবাদীর ব্যবহৃত ঐ কথাটির আমূল পার্থক্য রহিয়াছে। চেষ্টিতবাদী "চেষ্টিত" বলিতে শুধু "উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একক (ষ্টিমুলাস্-রেস্‌পন্স্ ইউনিট্‌স্)" বুঝিয়া থাকেন। এই অর্থে চেষ্টিত একটি নিছক যান্ত্রিক (মেকানিক্যাল্) ক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়। চেষ্টিতের উপর চেতনা বা মনের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। যন্ত্রের একটি অংশ যেমন আর একটি অংশকে সক্রিয় করে এবং এই ব্যাপারে অংশগুলির নিজস্ব উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা থাকে না, চেষ্টিতবাদীর চেষ্টিতও তেমন কর্তার উদ্দেশ্য বা স্বাধীন ইচ্ছামুক্ত যান্ত্রিক ব্যাপার। আগুনে হাত লাগিবামাত্র হাত সরাইয়া লওয়া উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার একটি একক। এইরূপ কতগুলি একক লইয়া সকল প্রকারের চেষ্টিত গড়িয়া ওঠে।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্-ব্যবহৃত চেষ্টিত কথাটির অর্থ বিপরীত। তাঁহার মতে প্রাণিচেষ্টিত যান্ত্রিক ব্যাপার নয়—ইহা কোনো না কোনো জ্ঞাত বা অজ্ঞাত উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উদ্দেশ্যবিহীন প্রাণিচেষ্টিত ঘটিতে পারে না। সুতরাং ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ চেষ্টিতবাদী নহেন, কিন্তু উদ্দেশ্যবাদী মনোবিৎ (হর্মিক্ সাইকলজিস্ট্)। তাহা ছাড়া চেষ্টিতবাদী মন বা অন্তর্দর্শন স্বীকার করেন না, কিন্তু ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ করেন।

গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যাও চেষ্টিতবাদীর বিরুদ্ধ মত পোষণ করে। গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার মতে "উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া" এককগুলি বিচ্ছিন্ন। পক্ষান্তরে মন একটি সমগ্র বস্তু (হোল্)—এমন কি প্রত্যেক মানসক্রিয়াই একটি গোটা বা সম্পূর্ণ বস্তু। কতগুলি উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একককে যোগ করিয়া মানস-

ক্রিয়ার মৌলিক সম্পূর্ণতা পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে একটি গোটা মানসক্রিয়া পাইবার পর ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া এককগুলি পাওয়া যাইতে পারে। "সমগ্র হিসাবে মনের ক্রিয়াগুলির বিদ্যাই মনোবিদ্যা—সায়েন্স অব্ মেণ্টাল প্রসেস্ অ্যাজ্ এ হোল্।" অথবা "মনোবিদ্যা গোটা মানসক্রিয়ার বিদ্যা।" কফ্কা মনে করেন যে মনোবিদ্যা হইল "মানস-শারীর ক্ষেত্রের সহিত কার্য-কারণসূত্রে আবদ্ধ চেষ্টিতের বিদ্যা (স্টাডি অফ্ বিহেভিয়র্ ইন্ ইট্স্ কজ্যাল্ কনেক্শন্স্ উইথ্ দি সাইকোফিজিক্যাল্ ফিল্ড্)"।

সাম্প্রতিক মনোবিদ্যা চেষ্টিত অথবা বিহেভিয়রকে মনোবিদ্যার বিষয় বলিয়া মনে করে। এই কথা উপরে আলোচনা করা হইয়াছে। উড্ওয়ার্থ "ব্যক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনাকে (সায়েন্স্ অফ্ দি অ্যাক্টি-ভিটিজ্ অফ্ দি ইন্ডিভিজুয়াল্)" মনোবিদ্যা বলিয়াছেন। ব্যক্তিই মনোবিদ্যার একক। জগৎ ও অন্যান্য ব্যক্তির সম্পর্কে ব্যক্তি যে ব্যবহার বা কাজ করে তাহাই মনোবিদ্যার বিষয়। মানুষের জীবন ক্রিয়াময় এবং ব্যক্তির কর্ম বা ক্রিয়াই মনোবিদ্যার আলোচ্য।

উড্ওয়ার্থ ক্রিয়া বা কর্ম কথাটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, যাহার ফলে চিন্তা, অনুভব প্রভৃতি সকল মানসবৃত্তিই ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মনোবিদ্যার আধুনিক সংজ্ঞাগুলির একটি সাধারণ গুণ এই যে ইহারা মনো-বিদ্যাকে দর্শন হইতে মুক্ত করিতে চায়। তাহা ছাড়া এই সংজ্ঞাগুলি মনের সচল ও সক্রিয় রূপটি তুলিয়া ধরে। ইহারা মনোবিদ্যাকে একটি প্রায়োগিক বিদ্যার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, কারণ মানসবৃত্তি অথবা ব্যক্তির ক্রিয়া প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে আলোচনা করা হয়। পক্ষান্তরে এই সকল সংজ্ঞার বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে মনোবিদ্যা মানসবৃত্তি অথবা ব্যক্তির ক্রিয়ার বিদ্যা হইলে মনের অন্তর্জ্ঞান, আসংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান স্তরগুলি মনোবিদ্যা হইতে বাদ পড়িয়া যায়, কারণ ইহাদের মানসক্রিয়া বলা যায় কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে।

আরও দু'একটি মনোবিদ্যার আধুনিক সংজ্ঞা উল্লেখ করা আবশ্যক। অবয়বী মনোবিদ্যা (অর্গ্যানিজ্মিক্ সাইকলজি) এবং পূর্ণাঙ্গ মনোবিদ্যা (হোলিষ্টিক্ সাইকলজি) উড্ওয়ার্থীয় মনোবিদ্যার মত শুধু ব্যক্তিকে একক না ধরিয়া ব্যক্তি ও যে বস্তুর সম্পর্কে সে সক্রিয় এই উভয়ের মিলিত একক বা

পূর্ণাঙ্গ বস্তুকে মনোবিদ্যার একক বলিয়া মনে করে। উহাদের মতে ব্যক্তি ও বস্তুর সম্বন্ধজনিত ক্রিয়াই মনোবিদ্যার বিষয়। তাহা হইলে এই মতে "অবয়বী (অর্গ্যানিজ্‌ম্) এবং উদ্দীপকের বিশিষ্ট পারস্পরিক ক্রিয়ার আলোচনাকে (সায়েন্স্ অব্ দি স্পেসিফিক্ ইণ্টার‍্যাক্‌শন্‌স্ বিটুইন্ অর্গ্যানিজম্‌স্ অ্যাণ্ড্ ষ্টিমুলেটিং অব্‌জেক্‌ট্‌স্)" মনোবিদ্যা বলে।

আধুনিকতম অস্মিতা মনোবিদ্যা বা পার্‌সন্যালিষ্টিক্ সাইকলজি মনোবিদ্যার আর একটি সংজ্ঞা দিয়াছে। এই মতে 'অহং' বা 'আমি'ই মনোবিদ্যার বিষয়। আধুনিক মনোবিদ্যায় উইলিয়ম্ জেম্‌স্ এই মতবাদের পথিকৃৎ। বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগলব্ধ উপাত্ত পাইবার প্রয়াসে মনোবিদ্যা 'অহং'কে ভুলিতে বসিয়াছিল। অথচ 'অহং'ই মনোবিদ্যার মূল বিষয়। প্রত্যেক মানসক্রিয়া 'অহং' চেতনার অংশরূপেই ঘটিয়া থাকে। চেতনার মধ্যেই চেতন মানসক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে ঘটে—আবার ইহার মধ্যেই মানসক্রিয়া উহা হইতে স্বতন্ত্র বস্তুর সহিত সম্পর্কিত হয় এবং অনেক বস্তু হইতে কোনো কোনো বস্তু বাছিয়া লয়।

মেরি ক্যাল্‌কিন্‌স্ এবং উইলিয়ম স্টার্ন্ প্রভৃতির মতে অহং-চেতনা একটি অবিসংবাদী সত্য। মানসক্রিয়া পরিবর্তনশীল—কিন্তু ইহারা যে অহং-চেতনারই পরিবর্তন এই বোধটি বদ্ধমূল এবং স্থির। "অহং-চেতনাকে কেন্দ্র করিয়া যে মানসক্রিয়া ঘটে মনোবিদ্যা তাহার বিদ্যা", কারণ অহং-চেতনা সকল মানস-ক্রিয়ার মূলকেন্দ্র।

গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার পুর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত অস্মিতা মনোবিদ্যা একমত। কিন্তু পুর্ণ বা সমগ্র বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'অহং'কে গেস্টাল্ট মনোবিদ্যা উপেক্ষা করিয়াছে এবং অস্মিতা মনোবিদ্যা ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

২। মনোবিদ্যার সংজ্ঞা

মনোবিদ্যার উপরোক্ত সংজ্ঞা—ইতিহাস আলোচনার আলোকে উহার কতগুলি সংজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে। উহাদের উল্লেখ ও সমালোচনা নিম্নরূপ।

(১) প্রথম শ্রেণীর সংজ্ঞাগুলি মনোবিদ্যাকে আত্মস্বরূপমূলক করে। প্লেটো-র মতে "আত্মস্বরূপের বিদ্যাই মনোবিদ্যা (সায়েন্স্ অফ্ দি সাইকি অর্ সোল্)"। অ্যারিস্টট্‌ল্‌ও মনোবিদ্যাকে এইরূপে অভিহিত করিবার পক্ষপাতী।

এই উভয় দার্শনিকের সংজ্ঞার পার্থক্য এই যে প্লেটো আত্মাকে শরীর হইতে পৃথক্ এবং অ্যারিস্টট্‌ল্ ইহাদের ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ করিয়াছেন।

কিন্তু এই সংজ্ঞা মনোবিদ্যাকে তত্ত্ববিদ্যা বা মেটাফিজিক্স্ হইতে স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। ফলে মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞান-পদবাচ্য বলা যায় না। বৈজ্ঞানিক প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে আত্মস্বরূপ অজ্ঞেয়। সুতরাং এই সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) "মনের বিদ্যাই মনোবিদ্যা (সায়েন্স্ অফ্ মাইণ্ড্)"। মধ্যযুগীয় দার্শনিক-গণের মতে আত্মার পরিবর্তে মনই মনোবিদ্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

এই সংজ্ঞাটি প্রথমটির তুলনায় গ্রহণীয় সন্দেহ নাই, কারণ মন আত্মা হইতে স্থূল এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনার পক্ষে আত্মার তুলনায় অধিক উপযোগী। ইহাতে মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ অধিকতর স্পষ্ট।

কিন্তু মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞাটিও সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। প্রথমতঃ, এই সংজ্ঞাটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। নীতিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা এবং সৌন্দর্যবিদ্যাও মনের বিদ্যা। ইহারা মনের ইচ্ছামূলক, চিন্তামূলক এবং অনুভূতিমূলক আদর্শ, যথা শিব, সত্য ও সুন্দরের আলোচনা করে। দ্বিতীয়তঃ, মনোবিদ্যা মনের ঘটনানিষ্ঠ অথবা আদর্শনিষ্ঠ বিদ্যা। এই সংজ্ঞায় ইহার স্পষ্ট নির্দেশ নাই।

(৩) "চেতনার বিদ্যাই মনোবিদ্যা—(সায়েন্স্ অফ্ কন্‌সাচ্‌নেস্)"। দেকার্তে এই সংজ্ঞার নির্দেশক। এই সংজ্ঞা দ্বিতীয়টির তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট, কারণ ইহাতে মনোবিদ্যাকে শুধু মনের বিদ্যা বলিয়া অস্পষ্ট রাখা হয় নাই। ইহাতে মনের স্বভাব এবং বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বলা হইয়াছে এবং মনোবিদ্যাকে অন্তর্দর্শন পদ্ধতির উপযোগী করিয়া তোলা হইয়াছে।

কিন্তু এই সংজ্ঞাটিও নানাপ্রকারে দূষণীয়। ইহা অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। মন বলিতে শুধু চেতনাই বুঝায় না। চেতন বা সংজ্ঞান স্তরের নীচে আরও অন্ততঃ কয়েকটি মানস স্তর আছে—যথা অন্তর্জ্ঞান, আসংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান। এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে মনের উক্ত স্তরগুলি বাদ পড়িয়া যায় এবং মনোবিদ্যার ক্ষেত্র অযথা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

(৪) "চেতন বা সংজ্ঞান এবং অন্তর্জ্ঞান মনের বিদ্যাই মনোবিদ্যা"। লাইব্‌নিজ্-সমর্থিত এই সংজ্ঞা তৃতীয় সংজ্ঞাটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত নির্দোষ, কারণ ইহাতে মনোবিদ্যাকে শুধু সংজ্ঞান মনে সীমাবদ্ধ রাখা হয় নাই, কিন্তু অন্তর্জ্ঞান মনে প্রসারিত করা হইয়াছে।

কিন্তু এই সংজ্ঞাও দোষমুক্ত নয়, কারণ ইহাতে মনের আরও গভীরতর নির্জ্ঞান স্তরের উল্লেখ না থাকায় অব্যাপ্তি দোষ রহিয়াই গিয়াছে।

(৫) "মনোবিদ্যা মানসবৃত্তির বিদ্যা—(সায়েন্স্ অফ্ মেণ্টাল্ প্রসেসেস্)"। এই সংজ্ঞাটি আত্মস্বরূপ, চেতনা প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়ের পরিবর্তে স্থূল মানসবৃত্তিকে মনোবিদ্যার বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া এই বিজ্ঞানটিকে স্পষ্টরূপ দেয়।

কিন্তু এই সংজ্ঞাটির প্রধান দোষ এই যে ইহা কোনো মানসসত্তা স্বীকার করে না, ফলে মানসবৃত্তির ধারাবাহিকতা এবং ঐক্য ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হয়। এই সংজ্ঞার প্রথম প্রধান নির্দেশক হইলেন ডেভিড্ হিউম্। তিনি মনকে অসংখ্য দ্রুত পরিবর্তনশীল মানসবৃত্তিতে পরিণত করিয়াছেন এবং উহাদের ঐক্য শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

অনেকেই মনোবিদ্যাকে মানস অবস্থা ও বৃত্তির বিদ্যা—(সায়েন্স্ অফ্ মেণ্টাল্ স্টেট্স্ অ্যাণ্ড্ প্রসেসেস্)"-রূপে অভিহিত করিয়াছেন। মনোবিৎ স্টাউট্ও মনোবিদ্যার অনুরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক মনোবিৎই মানসসত্তা স্বীকার করেন নাই। অপর দিকে স্টাউট্ উহা স্বীকার করিয়াছেন।

এই সংজ্ঞার প্রথম দোষটি দেখানো হইয়াছে। এই দোষটি অর্থাৎ মনকে সম্পূর্ণভাবে মানসবৃত্তিতে পরিণত করিবার দোষ—ওয়ার্ড, স্টাউট্, ক্যালকিন্স্, উইলিয়ম্ স্টার্ন্ প্রভৃতি মনোবিদ্গণ পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে মন শুধু মানসবৃত্তির সমষ্টি নয়, কিন্তু তাহা ছাড়াও একটি বিশিষ্ট সত্তা যাহা বহু মানসবৃত্তির মধ্যে একত্ব সূত্রের মত ক্রিয়া করে।

এই সংজ্ঞার দ্বিতীয় দোষ এই যে ইহা মনোবিদ্যা কোন্ শ্রেণীর বিদ্যা তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করে না। অবশ্য মনোবিদ্যাকে শুধু মানসবৃত্তির বিজ্ঞানে পরিণত করিয়া ইহা ইঙ্গিত করে যে মনোবিদ্যা একটি ঘটনানিষ্ঠ বা পজিটিভ বিদ্যা।

ইহার তৃতীয় দোষ এই যে ইহা মনের অন্তর্জ্ঞান, আসংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান স্তরগুলির প্রতি সুবিচার করে কিনা সন্দেহ।

(৬) ক। "প্রাণিচেষ্টিতের ঘটনানিষ্ঠ বা ব্যবহারিক বিদ্যাই মনোবিদ্যা—(পজিটিভ্ সায়েন্স্ অফ্ দি বিহেভিয়র্ অফ্ লিভিং বিইংস্)।" ম্যাক্ডুগ্যাল্-প্রদত্ত মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞাটি পূর্ববর্তী সংজ্ঞাগুলির তুলনায় অনেকাংশে নির্দোষ। প্রথমতঃ, এই সংজ্ঞাটি প্রায়োগিক মনোবিদ্যার সহিত সুসঙ্গত। ইহাতে বলা

হইয়াছে যে মনোবিদ্যা একটি ঘটনানিষ্ঠ বিদ্যা। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বের সংজ্ঞাগুলি শুধু মানুষের মনেই সীমাবদ্ধ ছিল—উহাতে নিম্নতর প্রাণিমন যে মনোবিদ্যার আলোচ্য তাহা বলা হয় নাই। এই সংজ্ঞাটিতে মনোবিদ্যার ক্ষেত্র শুধু মনুষ্য-মনে সীমাবদ্ধ হয় নাই। তৃতীয়তঃ, এই সংজ্ঞা চেষ্টিতকে, যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা না করিয়া উদ্দেশ্যমুখী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে। ইহাতে চেষ্টিতের ঐক্যসূত্র হিসাবে মানসসত্তার উল্লেখ না থাকিলেও উদ্দেশ্যাভিমুখিতা সেই অনুক্তিদোষের কিঞ্চিৎ প্রতিকার করিয়াছে।

কিন্তু এই সংজ্ঞার ত্রুটি হিসাবে বলা যাইতে পারে যে ইহা মনকে উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত রূপে গ্রহণ করিয়া মনোবিদ্যার সংজ্ঞাকে অস্পষ্ট এবং রহস্যাবৃত করিয়া তুলিয়াছে।

(খ) "ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের বিদ্যা মনোবিদ্যা—(সায়েন্স্ অফ্ দি অ্যাক্‌টিভিটিজ্ অফ্ দি ইন্‌ডিভিজুয়াল্)"—উড্‌ওয়ার্থ্-প্রদত্ত এই সংজ্ঞাটি মনোবিদ্যার সক্রিয় (ডায়নামিক্) রূপের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, মনোবিদ্যার ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা পাত্রগত রূপও এই সংজ্ঞায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইহার দোষ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে ইহা মানসসত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করায় মানসক্রিয়ার ঐক্য কিরূপে ব্যাখ্যা করে তাহা বুঝা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ এই সংজ্ঞা শুধু সংজ্ঞান মনেই মনোবিদ্যার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অন্তর্জ্ঞান, আসংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান মানস অবস্থাগুলিকে ক্রিয়া বলা যাইতে পারে কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে।

(গ) "চেষ্টিতের বিদ্যাই মনোবিদ্যা—(সায়েন্স্ অফ্ বিহেভিয়র্)"—ওয়াট্‌সন্-প্রদত্ত এই সংজ্ঞা মনোবিদ্যাকে যান্ত্রিক বিদ্যায় পরিণত করিয়াছে। এখানে চেষ্টিত বলিতে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়াকে একক হিসাবে ধরা হইয়াছে এবং উহার উদ্দেশ্যাভিমুখিতা উপেক্ষিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এই সংজ্ঞাটি মনোবিদ্যা হইতে 'মন', 'চেতনা', 'অন্তর্দর্শন' প্রভৃতি নির্বাসিত করিয়াছে।

কিন্তু এই সংজ্ঞার গুণ এই যে ইহা মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীকে বিষয়গত বা অবজেক্‌টিভ্ রূপে গ্রহণ করিয়া ইহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির সমশ্রেণীভুক্ত করিয়াছে। ফলে মনোবিদ্যার ফলগুলি ব্যাপক এবং ব্যক্তিগত হইবার দোষ হইতে মুক্ত হয়।

(৭) ক। কয়েকটি সংজ্ঞা মনোবিদ্যার বিষয়ের সম্পূর্ণতা বা সমগ্রতা ফুটাইয়া তোলে। এই জাতীয় একটি সংজ্ঞা হইল গেস্টাল্ট মনোবিদ্যা প্রদত্ত সংজ্ঞা। সমগ্র বা পূর্ণ মানসবৃত্তির বিদ্যাই মনোবিদ্যা—(সায়েন্স্ অফ্ মেণ্টাল্ প্রসেসেস্ অ্যাজ্ হোলস্) অথবা কফ্‌কার ভাষায় "মানস-শারীর ক্ষেত্রের সহিত কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ চেষ্টিতের বিদ্যা" হইল মনোবিদ্যা। মানসবৃত্তি কতগুলি মৌলিক উপাদানের যৌগিক ফল নয়, কিন্তু একটি সমগ্র অথবা পূর্ণ বস্তু। এই সংজ্ঞার গুণ এই যে ইহা মনোবিদ্যাকে অনুষঙ্গবাদ (ল'জ্ অফ্ অ্যাসোসিয়েশন্) হইতে মুক্ত করে। প্রত্যেক মানসবৃত্তিই যে একটি সম্পূর্ণ এবং নূতন জিনিস, ইহা যে কতগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন বৃত্তির সমষ্টিমাত্র নয়—এই বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া বুঝানোই এই সংজ্ঞার লক্ষ্য। তাহা ছাড়া এই সংজ্ঞাটি প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত।

উপরোক্ত গুণটি এই সংজ্ঞায় থাকিলেও ইহাতে মানসবৃত্তির ঐক্যসূত্র হিসাবে কোনো মানসসত্তার ইঙ্গিত নাই। তাহা ছাড়া মানসবৃত্তির সমগ্রতাকে একটি ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করিয়াই এই সংজ্ঞা সন্তুষ্ট। সমগ্রতারূপ ঘটনাটি কোনো স্থায়ী মানসসত্তা না থাকিলে কিরূপে সম্ভব এই প্রশ্নের উপর ইহা বিশেষ আলোকপাত করে না। তৃতীয়তঃ, এই সংজ্ঞা সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ রূপ মানসবৃত্তিতেই প্রধানভাবে সীমাবদ্ধ। প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত অনেক মানস-বৃত্তি সম্বন্ধেই ইহা অপেক্ষাকৃত নীরব। চতুর্থতঃ, এই সংজ্ঞায় মনোবিদ্যার যে রূপটি তুলিয়া ধরা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নূতন নয়। যেমন স্টাউট্‌ও মানস-বৃত্তির সমগ্র রূপের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র রূপটি শুধু ঘটনারূপে স্বীকার করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, কিন্তু মনোযোগের সংশ্লেষণকে ইহার কারণরূপে নির্দেশও করিয়াছেন।

(৭) খ। "উদ্দীপকবস্তু-ও—জীবের বিশেষ পারস্পরিক ক্রিয়াই মনোবিদ্যার আলোচ্য—সায়েন্স্ অফ্ দি স্পেসিফিক্ ইন্টারঅ্যাক্‌শন্‌স্ বিটুইন্ অর্গ্যানিজম্‌স্ অ্যাণ্ড্ স্টিমুলাস্ অবজেক্টস্"। অবয়বী মনোবিদ্যা (অর্গ্যানিজ্‌মিক্ সাইকলজি) ও পূর্ণাঙ্গ মনোবিদ্যা (হোলিস্টিক্ সাইকলজি) প্রদর্শিত এই সংজ্ঞা গেস্টাল্ট মনোবিদ্যার মত মনের সমগ্র রূপটি ব্যাখ্যা করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও উদ্দীপকবস্তু-ও-মনের সমগ্ররূপটির মূলে ঐক্যসূত্ররূপে জীবের স্বীকৃতি নাই।

(৮) "অহং-চেতনাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল মানসবৃত্তি ঘটে তাহার আলোচনাই মনোবিদ্যা—সায়েন্স্ অফ্ পার্‌সন্যাল্ কন্‌সাচ্‌নেস্"। এই সংজ্ঞাটি

অস্মিতা মনোবিদ্যার (পার্সন্যালিষ্টিক্ সাইকলজি) সমর্থিত সংজ্ঞা। ইহাতে বলা হইয়াছে যে মানসবৃত্তি সকল অসংখ্য হওয়া সত্ত্বেও অহং-চেতনার অবিভাজ্য অংশ।

এই সংজ্ঞার গুণ উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে ইহা মানসসত্তার স্বীকার করিয়া মানসবৃত্তির ঐক্য ব্যাখ্যা করিতে পারে। তাহা ছাড়া এই সংজ্ঞায় স্বীকৃত অহং-চেতনা শুধু একটি তত্ত্বমাত্র নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব সত্য।

ইহার দোষ রূপে বলা যায় যে অধিকাংশ প্রায়োগিক মনোবিদ্‌গণ মনোবিদ্যার এইরূপ সংজ্ঞাকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন না। তাঁহারা অহং-চেতনারূপ মানস ঐক্যসূত্রের তুলনায় মানসবৃত্তিগুলিকেই মনোবিদ্যার যোগ্যতর বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

উপরে যে সংজ্ঞাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল পূর্ব অনুচ্ছেদে উহাদের বিস্তৃততর আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং মনোবিদ্যার সংজ্ঞা নিরূপণ প্রসঙ্গে বর্তমান অনুচ্ছেদটিকে পূর্ববর্তীর সহিত যুক্ত করিয়া পাঠ করা আবশ্যক।

৩। উপসংহার—গ্রহণীয় সংজ্ঞা

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে এক কথায় বা সংক্ষেপে মনোবিদ্যার স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। মনোবিদ্যার সংজ্ঞা নির্দেশ কালে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে সংজ্ঞাটি মনোবিদ্যার বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ করে, অর্থাৎ মনোবিদ্যা ঠিক যাহা তাহাই বুঝায় এবং মনোবিদ্যা যাহা নয় তাহা ইহার উপর আরোপ না করে।

এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে স্টাউট্-প্রদত্ত মনোবিদ্যার সংজ্ঞাকেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়, যদি স্টাউট্ যেমন বলিয়াছেন সেইরূপভাবে সংজ্ঞায় অনুক্ত অংশগুলির দিকে লক্ষ্য রাখা যায়। "মনোবিদ্যা মানসক্রিয়া সংক্রান্ত বিদ্যা—সায়েন্স্ অফ্ মেণ্টাল্ প্রসেসেস্)"—এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে মনোবিদ্যা স্বভাবতঃ ঘটনানিষ্ঠ বা পজিটিভ্ বিদ্যা হইয়া দাঁড়ায়। ইহার গ্রহণযোগ্যতার সমর্থনে আরও বক্তব্য এই যে এই সংজ্ঞার সহিত আধুনিকতম প্রায়োগিক মনোবিদ্যার কোন বিরোধ নাই, কারণ ইহা প্রায়োগিক পদ্ধতি এবং মাত্রা (কোয়াণ্টিটেটিভ) পদ্ধতি স্বীকার করিয়া লইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই সংজ্ঞা মনোবিদ্যাকে ঘটনানিষ্ঠ বিজ্ঞানরূপে গ্রহণ করিয়াও উহাকে যান্ত্রিক বিদ্যায় পর্যবসিত করে নাই, কারণ

মানসবৃত্তির উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণ ইহার একটি মূল সূত্র। এই দিক্ হইতে বিচা করিলে দেখা যায় যে ইহা চেষ্টিতবাদের দোষগুলি পরিহার করিয়া ম্যাক্‌ডুগ্যাল প্রদর্শিত উদ্দেশ্যাত্মক মনোবিদ্যার গুণগুলি গ্রহণ করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, এ সংজ্ঞা মনোবিদ্যাকে শুধু সংজ্ঞান মনে সীমাবদ্ধ করে নাই, কিন্তু মনের অন্তর্জ্ঞা ও নির্জ্ঞান স্তর দুইটিকেও গ্রহণ করিয়াছে। চতুর্থতঃ, এই সংজ্ঞা মনকে শু মানসবৃত্তিরাশিতে পর্যবসিত করে নাই, কিন্তু সকল পরিবর্তনশীল বৃত্তিগুলিে অনুপ্রবিষ্ট মানসসত্তাকে ঐক্যসূত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছে, যদিও ইহাকে মনে বিদ্যার বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়া এই বিজ্ঞানটিকে দর্শনে পরিণত করে নাই সর্বোপরি এই সংজ্ঞা আধুনিক গেস্টাল্ট্, অবয়বী এবং পূর্ণাঙ্গ মনোবিদ্যা একটি প্রধান গ্রহণীয় দিক উহাদের পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছে—অর্থাৎ মানসবৃত্তি একটি পূর্ণ অথবা গোটা বস্তু তাহা স্টাউট্ স্বীকার করিয়াছেন।

দেখা যাইতেছে যে স্টাউট্ প্রদর্শিত মনোবিদ্যার সংজ্ঞাটিকে তাঁহার অনুস্ ধারায় ব্যাখ্যা করিলে ইহা অনেকাংশে সন্তোষজনক হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মনে বিদ্যার কোনো সংজ্ঞাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার পূর্বে মনে রাখা দরকার মনোবিদ্যা এখনও একটি উন্নতিশীল বিজ্ঞান। সুতরাং ইহাকে কোনো বাঁধাধ সংজ্ঞায় শৃঙ্খলিত না করাই সঙ্গত।

৪। মনোবিদ্যার ক্ষেত্র বা পরিসর—স্কোপ্ অফ্ সাইকলজি

মনের ক্রিয়াবলীই মনোবিদ্যার বিষয়, যাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে এখন আলোচ্য এই যে মনের ক্রিয়াবলীর ক্ষেত্র বা পরিধি কতদূর বিস্তৃত— অর্থাৎ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মনের পরিচয় পাওয়া যায়, অথবা কোথায় কোথা মন আত্মপ্রকাশ করে। কারণ, **যাহা মনের সহিত সংশ্লিষ্ট, যাহা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে অথবা যাহার উপর মন প্রভাব বিস্তার করে তাহাই মনোবিদ্যার ক্ষেত্র।**

উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে যাহা মানুষের মনকে স্পর্শ করে, যাহা মানুষের জ্ঞান গোচর তাহাই মনোবিদ্যার ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ হইলে মনোবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে কোনো বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, এক কথায়, যাহাই মানবিক তাহার কিছুই বাহিরে পড়ে না। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলিও মনের প্রত্যক্ষ, মনন প্রভৃতি মানসবৃত্তির ফলরূপে

়নোবিদ্যার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে। সুতরাং এই অর্থে মনোবিদ্যা "সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান"—(সায়েন্স্ অব সায়েন্সেস্)-এর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ মনোবিদ্যা সেই সকল মানসবৃত্তিরই আলোচনা করে যাহার ফলে মানুষ যাহাই করুক না কেন তাহা সম্ভব হয়।

কিন্তু মনোবিদ্যার ক্ষেত্রকে এইরূপ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে মনোবিদ্যা প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন হইয়া পড়ে। যে বিজ্ঞান সকল জ্ঞেয় বস্তুরই অনুশীলন করে তাহাকে বিজ্ঞান বলা চলে না, কারণ বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষণ হইল বৈশিষ্ট্য এবং এইরূপ সর্বান্তর্ভাবী বিজ্ঞানকে বিশিষ্ট বা বিশেষ প্রকারের জ্ঞান বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, সকল বিজ্ঞানকেই মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করিলে একটি মারাত্মক ভুল করা হয়। মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে ইহা মাত্রগত বা অভিজ্ঞাতৃ-সাপেক্ষ, কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়গত বা বস্তুসাপেক্ষ। সকল বিজ্ঞানকে মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে ফেলিলে এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য অস্বীকার করা হয়। মনোবিদ্যা উহার বিষয়ের আলোচনা করে জ্ঞাতার বা মনের দিক্ হইতে, কিন্তু অন্য বিজ্ঞানগুলি উহাদের বিষয় আলোচনা করে আলোচ্য বিষয় বা বস্তুর দিক্ হইতে।

প্রথমতঃ, মনোবিদ্যার সকল বিষয়ই উহার ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। মনোবিদ্যার সংজ্ঞা, দৃষ্টিভঙ্গী, ইহার সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্বন্ধ, ইহার পদ্ধতি শরীর ও মনের সম্বন্ধ, প্রত্যাবর্ত, সহজ প্রবৃত্তি, সংবেদন, প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ, স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তন, অনুভূতি, প্রক্ষোভ, রস, বংশানুগতি ও পরিবেশ, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি প্রভৃতি মনোবিদ্যার আলোচ্যগুলি উহার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট। এক কথায় বলিতে গেলে, মনোবিদ্যার সকল বিষয়ই উহার ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ, মনোবিদ্যার বিষয়ের তুলনায় উহার ক্ষেত্র ব্যাপকতর। যেমন যাহা প্রত্যক্ষ বা মুখ্যভাবে মনোবিদ্যার বিষয়ীভূত নয় এমন অনেক বিষয়ই মনোবিদ্যার ক্ষেত্র। (১) যেমন, মনোবিদ্যার প্রধান বিষয় পরিণত ব্যক্তির মন (অ্যাডাল্ট্-মাইণ্ড্)। কিন্তু পরিণত মন বুঝিতে হইলে কিরূপে শিশুর, এমন কি নিম্নতর প্রাণীর অপরিণত মন হইতে মন পরিণতি লাভ করে তাহা বুঝিতে হয়। সুতরাং শিশুমনোবিদ্যা এবং প্রাণিমনোবিদ্যাও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। শিক্ষণ ব্যাপারে মনোবিদ্যার জ্ঞান দরকার। সুতরাং শিক্ষা মনোবিদ্যাও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত। (২) আবার সাধারণ মনোবিদ্যা গোষ্ঠীর, সমাজের বা জাতির মন লইয়া মুখ্যভাবে আলোচনা করে না। অথচ এই সংগঠনগুলির

মানসপ্রকাশও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে, কারণ মন সম্বন্ধে মনোবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকেই ইহাদের বুঝিতে হয়। এইরূপে সমাজ মনোবিদ্যাও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়। (৩) শিল্প, কারিগরি প্রভৃতি বিদ্যাগুলির মানুষের মন হইতেই সৃষ্টি। শ্রমিক, কারিগর, শিল্পী, মালিক বা নিয়োগকর্তার মন কি কি নিয়মে কাজ করে তাহা আলোচনা করে শিল্পীয় মনোবিদ্যা। কি কি নিয়মে উৎপাদন বাড়ে বা কমে, কিরূপে কাজ করিলে সুফল পাওয়া যায়, প্রভৃতি প্রশ্নের মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনাই শিল্পীয় মনোবিদ্যার বিষয়। এই সকল আলোচনায় সাধারণ মনোবিদ্যার জ্ঞান আবশ্যক হয়। সুতরাং শিল্পীয় মনোবিদ্যাও মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। অস্বভাবী মনোবিদ্যাও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। কিরূপে অস্বভাবী মনের ক্রিয়া বুঝা যাইতে পারে তাহা এই বিদ্যাটির জ্ঞাতব্য। কিন্তু সাধারণ মনোবিদ্যা এই বিষয়ের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করে, কারণ, স্বভাবী মনের আলোকেই অস্বভাবী মন বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়। (৪) শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যাও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই বিদ্যায় শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ আলোচিত হয়। (৫) শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ চিকিৎসা মনোবিদ্যাও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট। আবার চিকিৎসা মনোবিদ্যার নিকটবর্তী মনোরোগবিদ্যাও মনোবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে বাদ পড়ে না। বিভিন্ন মনোরোগের প্রকৃতি ও চিকিৎসায় সাধারণ মনোবিদ্যার জ্ঞান অত্যাবশ্যক। (৬) অস্বভাবী মনোবিদ্যা বর্তমানে বহু শাখায় শাখায়িত হইয়াছে। যেমন, ফ্রয়েড্-এর মনঃসমীক্ষণ, য়্যুঙ্গ্-এর বিশ্লেষণ মনোবিদ্যা, অ্যাড্‌লার্-এর ব্যক্তি মনোবিদ্যা, ম্যাগডুগ্যাল্-এর উদ্দেশ্যমূলক মনোবিদ্যা প্রভৃতি অস্বভাবী মনোবিদ্যার কয়েকটি প্রধান শাখা। এই সকল অস্বভাবী মনোবিদ্যার উপর সাধারণ মনোবিদ্যা যথেষ্ট আলোকপাত করে বলিয়া উহারাও ইহার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

মানুষের মনকে যাহাই স্পর্শ করে এবং যাহার উপর মনোবিদ্যা প্রভাব বিস্তার করে তাহাই মনোবিদ্যার ক্ষেত্র অধিকার করিয়া থাকে। সাম্প্রতিককালে (৭) যুদ্ধ মনোবিদ্যা যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। মানুষের মধ্যে যোধন বা যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তিই প্রধান, অথবা শান্তিতে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার সামাজিক প্রবৃত্তিই প্রধান? যুদ্ধ কি মানুষের পক্ষে একটি অপরিহার্য সঙ্কট যাহা এড়াইবার উপায় নাই, অথবা মানুষের মন সম্বন্ধে জ্ঞানের ভিত্তিতে বলা

যায় যে, এই সঙ্কটের কোনো স্থায়ী সমাধান আছে ? এই জাতীয় এবং শান্তি-কালীন এবং যুদ্ধকালীন বহু সমস্যা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। (৮) এই জাতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া বিভিন্ন জাতির মনোভাব বুঝিতে হয়। যেমন কোনো বিশেষ জাতির মানসিক প্রকৃতিই কি এইরূপ যে সে কোনো না কোনো প্রকারে যুদ্ধ বাধাইয়া বসিবেই ? আবার অন্য কোন জাতির মনোভাব কি এইরূপ যে সে সর্বপ্রযত্নে যুদ্ধ এড়াইয়া শান্তিতে বসবাস করিতেই চাহিবে ? যুদ্ধে জয়-লাভ করিবার অথবা পরাজিত হইবার মনোভাবও কি বিশেষ বিশেষ জাতির জাতীয় মনোভাব ? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া জাতীয় মনোবিদ্যার উদ্ভব হয় যাহা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে স্থান লাভ করে। (৯) তাহা ছাড়া, মানুষের রীতিনীতি, আচার-বিচার, ন্যায়-অন্যায় বোধ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া আচার মনোবিদ্যার উদ্ভব হয়। (১০) বর্তমানে মনোবিদ্যার শাখার অন্ত নাই। প্রতি-নিয়ত ইহার ক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে। পেশা মনোবিদ্যা, অভীক্ষা মনোবিদ্যা প্রভৃতি শাখাগুলি মনোবিদ্যায় গুরুত্বপুর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

মনোবিদ্যার ক্ষেত্র এমন ব্যাপক যে ইহার কোনো চূড়ান্ত আকারের আলোচনা সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় নয়। উপরের আলোচনায় মনোবিদ্যার বিস্তৃত ক্ষেত্রের আভাস দেওয়া হইল মাত্র। মানবীয় বিষয়মাত্রই ইহার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত। যেমন ধর্ম, নীতি, সৌন্দর্য প্রভৃতি বোধগুলি সম্বন্ধেও বিশেষ বিশেষ মনোবিদ্যার শাখা উৎপন্ন হইয়াছে। ধর্মীয় মনোবিদ্যা মনোবিদ্যার একটি নবীন শাখা। আবার বিকাশ মনোবিদ্যা বা ডেভেলাপ্‌মেণ্টাল্ সাইকলজি মনের বিকাশ লইয়া আলোচনা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মনোবিদ্যার ক্ষেত্র সুবিস্তীর্ণ।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

উইলিয়ম্ ম্যাক্‌ডুগ্যাল্—সাইকলজি—প্রথম অধ্যায়

উড্‌ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড মার্ক্‌ইস্—সাইকলজি—প্রথম পরিচ্ছেদ

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেণ্টস্ অফ্ সাইকলজি—প্রথম পরিচ্ছেদ

জি. এফ. ষ্টাউট্—এ ম্যানুয়াল্ অফ্ সাইকলজি—ভূমিকা—প্রথম পরিচ্ছেদ

বোরিং, ল্যাংফেল্ড্, ওয়েল্ড্—ফাউণ্ডেশনস্ অফ্ সাইকলজি—প্রথম পরিচ্ছেদ

আর্ এস্. উডওয়ার্থ—কণ্টেম্পোরারি স্কুলস্ অফ্ সাইকলজি—সপ্তম পরিচ্ছেদ

এফ্ অ্যাভেলিং—সাইকলজি : দি চেঞ্জিং আউট্‌লুক্—প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এফ্ এস্. কেলার্—দি ডেফিনিশন্ অফ্ সাইকলজি—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

Exercise

1. Give a short history of the definitions of Psychology. (pp. 49-54)
2. Can Psychology be defined as the science of (*a*) Soul, (*b*) Mind (*c*) Consciousness or (*d*) Behaviour ? Discuss. (pp. 54 59)
3. Define Psychology after Woodworth and Stout. (pp. 56, 57, 59-60)
4. What, according to you, is the proper definition of Psychology ? (pp. 59-60)
5. Define the scope of Psychology. (pp. 60 63)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখা

ডিফারেণ্ট্ ব্র্যাঞ্চেস্ অফ্ সাইকলজি

মনোবিদ্যার ক্ষেত্র আলোচনা কালে উহার কতগুলি শাখার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় শাখার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

১। শিশুমনোবিদ্যা (চাইল্ড্ সাইকলজি)

মনোবিদ্যার যে শাখা শিশুমনের স্বভাব, প্রকাশ, বিকাশ প্রভৃতি প্রশ্নের আলোচনা করে তাহাকে শিশুমনোবিদ্যা বলে। শিশুর মা তাই তাহার মন সম্বন্ধে সবশ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানীর নিস্পৃহ বা নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া মাতার পক্ষে সন্তানমনের অনুসন্ধান করা কঠিন। সুতরাং মাতার বিবরণ শিশুমনোবিজ্ঞানীর প্রয়োজনীয় উপাদান বা মাল মসলা সংগ্রহ করিলেও ইহা নির্ভরযোগ্য নয়। তেমনই শিশুমনের অন্যান্য পর্যবেক্ষক, যেমন ধাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রভৃতি, শিশুমনের মূল্যবান উপকরণ দিয়া থাকেন। কিন্তু উঁহাদের বিবরণও প্রায়ই বিশদ এবং ধারাবাহিক হয় না, কারণ ইঁহারা অনেক সময় শিশুমনের ক্রমিক প্রকাশ পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন না এবং যতটুকুও বা পারেন তাহা প্রায়ই নিরপেক্ষ হয় না। অথচ শিশুমন পর্যবেক্ষণ করিতে হইলে এই সকল বিবরণ উপেক্ষণীয় নয়।

শিশুমন অনুসন্ধানের প্রধান অন্তরায় এই যে শিশু অন্তর্দর্শন করিতে পারে না, ফলে বহির্দর্শন বা পর্যবেক্ষণই এই অনুসন্ধানের একমাত্র উপায়। আবার এই অনুসন্ধানে বহির্দর্শনও অসুবিধামুক্ত নয়, কারণ আমরা শিশুমনের বহিঃপ্রকাশ-গুলিকে প্রায়ই পরিণত মনের উপমায় ব্যাখ্যা করিতে চাই, ফলে অপরিণত শিশুমনের অবিকৃত জ্ঞান লাভ করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। শিশুমনের পর্যবেক্ষণে মনোবিজ্ঞানীকে শিশুর মাতা, ধাত্রী, শিক্ষক প্রভৃতির প্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর করিতে হয়।

শিশুমনোবিদ্যার গুরুত্ব

শিশুমনোবিদ্যার গুরুত্ব এই যে পরিণত মনের জ্ঞান ইহার উপর নির্ভর করে। শিশুর মনই ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিয়া পরিণত মনের স্তরে উন্নীত হয়। সুতরাং পরিণত মনের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শিশুমনের জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। পরিণত মনের এমন কোনো বৃত্তি নাই যাহা শিশুমনে ছিল না। "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে"। বিকশিত শিশু মনকেই পরিণত মন বলা যায়। মনের কোনো অবস্থা বা ক্রিয়াই হঠাৎ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু ইহা পূর্ববর্তী অবস্থার বিকাশফল। শিশুমনোবিদ্যা মানসিক বিকাশের ধারাবাহিকতা (কন্‌টিন্যুইটি) এবং ঐক্যশৃঙ্খলা (ইউনিটি) প্রদর্শন করে। সংবেদন, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তন, ইচ্ছা, অনুভূতি, শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি প্রভৃতি কি কি নিয়ম অনুসারে উহাদের প্রাথমিক অপরিণত অবস্থা হইতে নানা স্তর অতিক্রম করিয়া পরিণতি লাভ করে তাহা জানিতে পারা যায় শিশু-মনোবিদ্যার সাহায্যে। শিশুর মনেই সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে সর্বাপেক্ষা সহজ অথবা অকৃত্রিম অবস্থায় দেখা যায়। শিক্ষা, দীক্ষা, অভিভাবন (সাজেশন্), অনুকরণ (ইমিটেশন্) এবং অন্যান্য পরিবেশগত প্রভাব হইতে শৈশব অপেক্ষাকৃত বেশী মুক্ত, ফলে শিশুর মনেই মানসবৃত্তিগুলি যথাসম্ভব বিশুদ্ধ অবস্থায় ঘটিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, বংশগতি ও পরিবেশের সম্বন্ধ কি, এই প্রশ্নের আলোচনা শিশুমনকে ভিত্তি করিয়া যত নির্ভরযোগ্য হয় পরিণত মনকে অবলম্বন করিয়া তত নির্ভরযোগ্য হয় না। এই প্রশ্নটির যথেষ্ট গবেষণামূলক আলোচনা হইয়াছে ভ্রাতৃ-যমজ (ফ্র্যাটারন্যাল্ টুইন্‌স্) এবং পিতৃ-যমজ (প্যাটারন্যাল্ টুইন্‌স্) শিশুদের উপর পরীক্ষা চালাইয়া। দুইটি পিতৃ-যমজ শিশুর বংশগতি বা হেরিডিটি প্রায়ই হুবহু এক প্রকার হইয়া থাকে। এই দুই শিশুকে ভিন্ন পরিবেশে বা শিক্ষার অধীনে রাখিয়া পর্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায় ইহাদের ক্রমিক বিকাশ বা পরিবর্তন কি পরিমাণে পরিবেশ এবং কি পরিমাণে বংশগতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

শিশুর জীবন-খণ্ড (পিরিয়ড্‌স্ অফ্ চাইল্ড্‌হুড্)

শিশুর জীবন প্রকৃতপক্ষে আরব্ধ হয় মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণাবস্থা হইতে। আধুনিক বিজ্ঞানের মত ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রেও মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইবার কাল হইতে শিশুর বয়স গণনা করা হইয়া থাকে। ভ্রূণাবস্থা নয় মাস দশ দিন স্থায়ী

হইলেও ইহার কতগুলি স্তর আছে যাহা শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রমবিকাশ অনুসারে বিভক্ত।

(১) শৈশব বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার সূত্রপাত হয় ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে। প্রথম জন্মক্রন্দনে শিশুর জীবন-নাট্য আরম্ভ হয়। শিশুর জন্মকাল হইতে প্রায় আঠার মাস বা দেড় বৎসর পর্যন্ত কালকে বলা হয় অপোগণ্ড অবস্থা (ইন্‌ফ্যান্সি)। এই অবস্থায় শিশু নিতান্ত অসহায়, কারণ ক্রন্দনই তাহার অভাব অভিযোগ জানাইবার একমাত্র উপায় হইয়া দাঁড়ায়। তিন, চার মাস বয়স হইতে সে পদের একাংশ উচ্চারণ (মনোসিলেবিক্ য়াটার‍্যান্স্) করিতে শিখে, কিন্তু এই অর্ধস্ফুট ভাষার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। হাত পা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নডাচডা শিখিতেই অথবা উদ্ভিদ্ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতেই তাহার সকল শক্তি ব্যয়িত হয়।

(২) তারপর আসে শিশুর পরবর্তী জীবন-অধ্যায় যাহার স্থায়িত্ব প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পর্যন্ত এবং যাহাকে প্রকৃত শৈশব (বেবিহুড্) বলা হয়। এই অবস্থায় শিশুব ক্ষমতা আরও বাড়িতে থাকে। সে এখন তাহার ভাবগুলি ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, খেলা করে এবং অন্য শিশুর খেলা দেখিয়া তাহা উপভোগ করে, নড়াচড়া বা বিচলনগুলি অল্পাধিক তাহার আয়ত্তের মধ্যে আসে, হাঁটিতে, এমন কি দৌড়াইতেও শিখে, প্রাথমিক সংবেদন স্তর হইতে প্রত্যক্ষের, এমন কি কল্পনার, স্তরে অগ্রসর হয় এবং তাহার কল্পনাপ্রবণ মন নানা প্রশ্ন তুলিতে আরম্ভ করে।

(৩) শিশু-জীবনের তৃতীয় অধ্যায়টি প্রায় সাড়ে তিন বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়া পাঁচ বৎসব বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই জীবন-খণ্ডকে প্রাথমিক বাল্যাবস্থা (আর্লি চাইল্ডহুড্) বলা যায়। এখন শিশু বুঝিতে আরম্ভ করে যে সেও একদিন বড হইয়া পরিণত মানুষের ভূমিকা অভিনয় করিবে। সে বড়দের অনুকরণ করিতে আরম্ভ কবে এবং মধ্যে মধ্যে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। ক্রমে ক্রমে শিশু পিতামাতার অংশ অভিনয় করিতে শিখে এবং ছোটদের উপর শাসকের স্থান গ্রহণ করে, কারণ এই অবস্থায় তাহার অহংবোধ উন্মেষিত হয়। তাহার সত্তার একটি অংশ বিবেক বা অধিশাস্তার (কন্‌সায়েন্স্, সুপার্-এগো) স্থান গ্রহণ করে। নানা-প্রকার প্রক্ষোভ, যেমন ভয়, ক্রোধ, ভালবাসা, প্রভুত্ব প্রবৃত্তি, যৌন প্রবৃত্তি তাহার উপর প্রাধান্য লাভ করে। বুদ্ধি ও বিচার শক্তির উন্নতি হয়। এই

অবস্থায় শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় এবং তাহার মধ্যে সামাজিক প্রবৃত্তিরও উন্মেষ ঘটে।

পঞ্চম বৎসর শিশুর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কাল। এই সময়ে শিশুর মনে আরোহানুমানের (ইন্‌ডাক্‌শন্) শক্তি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। উইলিয়ম্ স্টার্ণ ও জীন পিয়াজে প্রভৃতি শিশু মনোবিৎ উপরোক্ত মত পোষণ করেন। এই সময়ে শিশু নানা প্রশ্ন, বিশেষ করিয়া যৌন জীবনের বহু প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা করে কার্ক্ প্যাট্রিক্-এর মতে তিন বৎসর হইতে ছয় বৎসর কাল শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সময়।

পঞ্চম বর্ষের মূল্য আরও বাড়িয়া যায়, কারণ এই বয়সই সাধারণতঃ বিদ্যারম্ভের কাল।

(৪) পরবর্তী প্রায় বারো বৎসর পর্যন্ত উত্তর বাল্যাবস্থা বা লেটার চাইল্‌ড্‌হুড্। ইতঃপুর্বে যে সকল ক্ষমতা অর্জিত হইয়াছে পাঁচ বৎসরের পর হইতে বারো বৎসর পর্যন্ত কালে সেইগুলির বিকাশ ঘটিতে থাকে। উহাদের গণ্ডী বা ক্ষেত্রও বাড়িতে থাকে। বিচলনগুলি তাহার আরও আয়ত্তে আসে. জ্ঞানের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়, শব্দভাণ্ডার বাড়িয়া যায়, পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য ক্ষমতা আরও পরিণতি লাভ করে এবং আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর হয়।

পঞ্চম বর্ষের পর দ্বিতীয় সঙ্কটপূর্ণ জীবনসন্ধিকাল হইল একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষটি। এই সময়ে শিশু বৃহত্তর জীবনক্ষেত্রের সংস্পর্শে আসে এবং বয়ঃসন্ধি বা পিউবার্টি'র নানা সমস্যা তাহার চিত্তকে আলোড়িত করে। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সকল দিক্ দিয়া তাহার দায়িত্ব বাড়িয়া যায়। শিশু তাহার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ওঠে। বিশেষ করিয়া বালিকাদের পক্ষে এই বয়ঃসন্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাহাদের শারীর লক্ষণগুলির সূচনা হয় এবং প্রথম নারীত্বের চেতনার সহিত সামঞ্জস্য সাধনের জন্য সচেষ্ট হইতে হয়। বালকবালিকাদের পুর্ববর্তী সমান সম্বন্ধ ধীরে ধীরে অসমান হইয়া ওঠে। এই বয়সে শিশু তাহার আত্মকেন্দ্রিক জীবন হইতে বহির্বিশ্বে পদক্ষেপ করে এবং বাস্তববাদী হইয়া দাঁড়ায়। খেলাধূলা, লেখাপড়া, চিন্তাশক্তি প্রভৃতির প্রভাবে মনের ক্ষেত্র সর্বাঙ্গীণ ভাবে প্রসারিত হয়। এই সময়ে শিশুর সামাজিক প্রবৃত্তি বিকাশ লাভ করে।

(৫) পরবর্তী কৈশোর (অ্যাডোলেসেন্স্) অবস্থা প্রায় কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত চলিতে থাকে। এই জীবনখণ্ডে শিশুর মন পরিণত হইতে থাকে।

হুলিংওয়ার্থ "দ্বাদশোত্তর" (টিন্‌স্) অর্থাৎ ত্রয়োদশ হইতে উনবিংশ বর্ষ পর্যন্ত কালের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন। প্রজনন শক্তির (রিপ্রডাক্‌টিভ্ পাওয়ার্) প্রারম্ভই কৈশোরের প্রারম্ভ। এই সময়ে গৌণ যৌন লক্ষণগুলি (সেকেণ্ডারি সেক্সুয়্যাল্ ক্যার‍্যাক্‌টার্) যেমন কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন, বয়ঃসন্ধির কেশোদ্গম প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। স্যর্ স্ট্যান্‌লি হল্-এর পর ই. ডি. স্টারবাক্ কৈশোর সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিয়াছেন।

শিশুমনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ শিশুমনের ক্রমবিকাশ এবং উহার বিভিন্ন খণ্ডগুলি হইলেও, ইহার সহিত বহু প্রশ্ন জড়িত থাকায় এই বিজ্ঞানটির ক্ষেত্র সুবিশাল। সকল মানসবৃত্তির আলোচনাই এই মনোবিদ্যার বিষয়।

২। প্রায়োগিক মনোবিদ্যা—(এক্সপেরিমেণ্ট্যাল্ সাইকলজি)

যে মনোবিদ্যা কৃত্রিম পরিবেশে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় মানসবৃত্তি উৎপন্ন করিয়া উহার অন্তর্নিহিত রূপ এবং বহিঃপ্রকাশ আলোচনা করে তাহাকে প্রায়োগিক মনোবিদ্যা বলে। সাধারণ বা তাত্ত্বিক মনোবিদ্যা নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় মানসবৃত্তি উৎপন্ন করে না, কিন্তু ইহা স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নিয়মে যে ভাবে ঘটিয়া থাকে ঠিক সেইরূপে উহাদের সন্ধান করে। সুতরাং সাধারণ মনোবিদ্যাকে আধুনিক অর্থে বিজ্ঞান বলা যায় না, পক্ষান্তরে উহা দর্শনের আশ্রিত একটি বিদ্যা।

মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞানপদবাচ্য করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগপদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার। বিজ্ঞানের প্রয়োগপদ্ধতি ব্যবহারের ফলে সাধারণ মনোবিদ্যা প্রায়োগিক মনোবিদ্যার আকার ধারণ করে।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হ্বিল্‌হেল্‌ম্ হ্বুণ্ড্ জার্মানীর লাইপ্‌জিগ শহরে প্রথম প্রয়োগশালা স্থাপন করিয়া প্রায়োগিক মনোবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন। হ্বেবর্ ফেক্‌নর্, জোহানেস্ মুয়েলার্, লট্‌জা প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ হ্বুণ্ড্-এর প্রায়োগিক মনোবিদ্যার ভূমি প্রস্তুত করিতেছিলেন। এবিংহাউস্, টিশ্‌নার্, কুল্পে প্রভৃতি পরবর্তী প্রায়োগিক মনোবিদ্‌গণ বিজ্ঞানটির ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করিয়া তোলেন।

মানসবৃত্তির দুইটি রূপ—যথা অন্তর্নিহিত বা অনুভবগম্য রূপ এবং বহিঃ-প্রকাশিত রূপ। অন্তর্নিহিত রূপটি জানা যায় অন্তর্দর্শন পদ্ধতির সাহায্যে।

কিন্তু এই পদ্ধতির বহিঃপ্রকাশিত রূপ জানিবার উপায় হইল বহির্দর্শন যাহা আবার অন্তর্নিহিত রূপটি জানিবার পক্ষে অনুপযোগী।

এই দুইটি পদ্ধতিকে মিশ্রিতভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে উভয়েরই পৃথক্ গুণগুলি গ্রহণ এবং দোষগুলি বর্জন করা যায়। কিন্তু একই ব্যক্তির পক্ষে এই পদ্ধতির সম্মিলিত প্রয়োগ সম্ভব নয়। অন্ততঃ দুই ব্যক্তির সহযোগিতায় অন্তর্দর্শন ও বহির্দর্শন এই যুগ্ম পদ্ধতির অনুসরণ সম্ভব হইতে পারে। প্রথম ব্যক্তি তাহার মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি উহার বহিঃপ্রকাশগুলি পর্যবেক্ষণ অথবা বহির্দর্শন করে। প্রথম ব্যক্তিকে বলা হয় পাত্র (সাব্জেক্ট্) এবং দ্বিতীয় জনকে বলা হয় প্রয়োগকর্তা বা পর্যবেক্ষক (এক্স্পেরিমেণ্টার্, অব্জার্ভার্) এই দুই ব্যক্তির যুক্ত প্রচেষ্টায় মানসবৃত্তির যে রূপটি পাওয়া যায় তাহাই উহার সম্পূর্ণ রূপ। তাহা ছাড়া, মানসবৃত্তি নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় উৎপন্ন করিতে পারিলে, কখন উহা নিজ স্বভাব অনুসারে ঘটিবে তাহার নিষ্ক্রিয় প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয় না, কিন্তু অনুসন্ধান বা গবেষণার প্রয়োজন অনুসারে উহাকে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন করিয়া বুঝিবার সুবিধা হয়। এই পদ্ধতির ব্যাখ্যা "প্রায়োগিক পদ্ধতি" শীর্ষক অনুচ্ছেদে আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[১]

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে প্রায়োগিক মনোবিদ্যা ও শারীর মনোবিদ্যার সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্ঠ, কারণ প্রথমটি দ্বিতীয়টির মতই মানসবৃত্তিকে উহার নানা শারীর প্রকাশের সহিত আলোচনা করে। আবার প্রায়োগিক মনোবিদ্যার এবং চেষ্টিতমনোবিদ্যার সম্বন্ধও বিশেষ ঘনিষ্ঠ, কারণ দ্বিতীয়টির মত প্রথমটিও উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন পেশীয় (মাস্কুলার্) এবং গ্রন্থীয় (গ্ল্যাণ্ডুলার্) প্রতিক্রিয়াগুলি অনুসন্ধান করে, যদিও চেষ্টিত মনোবিদ্যার মত প্রায়োগিক মনোবিদ্যা অন্তর্দর্শন পদ্ধতিকে ত্যাগ করে না অথবা মন, চেতনা প্রভৃতিকে নির্বাসিত করে না।

লট্‌জা'র ত্বক্ সংবেদন বিষয়ে স্থানীয় নির্দেশ (লোক্যাল সাইন্), মুয়েলার্-এর বিশেষ-নার্ভ-শক্তি সূত্র (থিওরি অব্ স্পেসিফিক্ এনার্জি অব্ নার্ভস্) হ্বেবর্-এর নিম্নতম বোধগম্য সংবেদনের সহিত নির্দিষ্ট উদ্দীপক-মাত্রা-বৃদ্ধির সম্বন্ধ, ফেক্‌নর্ কর্তৃক ঐ সংবেদনের মাত্রানির্দেশ যাহাকে যুগ্মভাবে বলা হয়

১. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—পৃঃ ৪১-৪৩

হ্বেবর্ ফেক্‌নর্ ল', হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্-এর রূপ ও শব্দ সংবেদনের বিখ্যাত মতবাদ এবং হেরিং-এর রূপ সংবেদন সম্বন্ধে মতবাদ, প্রভৃতি প্রায়োগিক মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী আবিষ্কার। উপরোক্ত মনোবিদ্‌গণের প্রত্যেকেই প্রায়োগিক মনোবিদ্যার পথিকৃৎ।

কিন্তু প্রায়োগিক মনোবিদ্যার বর্তমান রূপ ও মর্যাদার মূলে রহিয়াছে হ্বিল্‌হেল্‌ম্ হ্বুণ্ড্-এর সংগঠনমূলক প্রতিভা। তিনি তাঁহার প্রয়োগশালায় বহু বিদেশাগত মনোবিজ্ঞানীকে গবেষণায় অনুপ্রাণিত করেন। সংবেদনের গুণ, অনুভূতির মাত্রা, প্রতিক্রিয়া-কাল, মনোযোগের পরিধি বা পরিসর প্রভৃতি অসংখ্য প্রায়োগিক গবেষণায় হ্বুণ্ড্ মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহা ছাড়া, তিনি সাম্প্রতিক প্রায়োগিক মনোবিদ্যার অনেকগুলি শাখার ভিত্তি স্থাপন করেন—যেমন শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা (ফিজিয়লজিক্যাল্ সাইকলজি), সমাজ মনোবিদ্যা (সোস্থাল্ সাইকলজি) প্রভৃতি।

হ্বুণ্ড্-এর প্রদর্শিত পথে যে সকল বিখ্যাত মনোবিৎ গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা ক্যাটেল্, টিশ্‌নার্, কুল্পে প্রভৃতি। ক্যাটেল্-এর প্রতিক্রিয়া-কাল এবং অন্যান্য বহু গবেষণার মধ্যে টিশ্‌নার্ ও কুল্পে'র অপ্রতিরূপ চিন্তা বা ইমেজ্‌লেস্ থট্ সম্বন্ধে গবেষণা বিখ্যাত। যাহারা হ্বুণ্ড্-এর সমকালীন অথচ তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্তভাবে গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন ব্রেন্‌টানো, মাইনং, এবিংহাউস, মুয়েলার্, বিনে, বুরডোঁ, জেম্‌স, ল্যাড্, মুয়েন্‌স্টারবার্গ্ প্রভৃতি।

প্রায়োগিক মনোবিদ্যার প্রথম গবেষণা আরম্ভ হইয়াছিল সংবেদনকে অবলম্বন করিয়া, কারণ সংবেদনের সহিত শরীরের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ, স্মৃতি, কল্পনা, ভাব-অনুষঙ্গ (অ্যাসোসিয়েশন্ অব্ আইডিয়া) চিন্তন, অনুভূতি, প্রক্ষোভ, রস (সেন্টিমেণ্ট্), প্রতিবত, ইচ্ছা, ব্যক্তিত্ব বা অস্মিতা (পার্সন্যালিটি), বুদ্ধি প্রভৃতি মনোবিদ্যার যাবতীয় বিষয়গুলির উপর প্রায়োগিক মনোবিদ্যা প্রচুর আলোকপাত করিয়াছে। তাহা ছাড়া, ইহার প্রভাবে মনোবিদ্যার প্রত্যেক শাখা অধিকতর প্রায়োগিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩। শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা (ফিজিয়লজিক্যাল্ সাইকলজি)

প্রায়োগিক মনোবিদ্যার অগ্রগতির সহিত শারীরবৃত্তের অগ্রগতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, কারণ মানসবৃত্তির শারীর প্রকাশ পর্যবেক্ষণ না করিয়া প্রায়োগিক

পদ্ধতি চলিতে পারে না। সংবেদনের প্রয়োগগুলি যেমন মনোবিদ্যার তেমনই শারীরবৃত্তেরও। যেমন হেল্‌মহোল্‌জ্‌ বলিলেন যে তিনটি মৌলিক রং বা রূপ দর্শনের মূলে রহিয়াছে অক্ষিপটে (রেটিনা) অবস্থিত তিনটি নার্ভতন্তুর উত্তেজনা। ডঃ হেড্ বলিলেন যে বিভিন্ন স্তরের স্পর্শ সংবেদন ত্বকের নিম্নে অবস্থিত বিভিন্ন নার্ভের উদ্দীপনার ফলে ঘটিয়া থাকে। এইরূপে দেখা যাইতে পারে যে প্রত্যেক মানসবৃত্তির সহিত শারীরবৃত্তি জড়িত থাকে। মনোবিদ্যার বিষয় অশরীরী আত্মা নয়, কিন্তু শরীরাশ্রিত বা শরীরী মন অথবা স্টাউট্‌-এর ভাষায় "এম্‌বডিড্ মাইণ্ড্"।

তাহা হইলে **কোন্ কোন্ মানসবৃত্তি কোন্ কোন্ শরীরাংশের কোন্ কোন্ ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কিত এই বিষয়ের আলোচনা** মনোবিদ্যারই আলোচনা। মনোবিদ্যার এইরূপ আলোচনাকেই শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা বা **ফিজিয়লজিক্যাল্ সাইকলজি** বলে। শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা শরীরের এই সকল অংশের গঠন ও ক্রিয়া লইয়া আলোচনা করে যাহাদের সহিত মানসক্রিয়ার সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্ঠ এবং যাহা বাদ দিয়া তৎ তৎ সংশ্লিষ্ট মানস বৃত্তিকে ভালভাবে বুঝা যাইতে পারে না।

মনের সহিত শরীরের যে অংশ বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ সেইটি হইল নার্ভ-তন্ত্র (নার্ভাস্ সিস্‌টেম্), বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র (সেণ্ট্রাল্ নার্ভাস্ সিস্‌টেম্)। আবার কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হইল (১) মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশগুলি, যেমন গুরুমস্তিষ্ক (সেরিব্রাম্ , ব্রেন্), মধ্যমস্তিষ্ক (মিড্ ব্রেন্), লঘু-মস্তিষ্ক (সেরিবেলাম্), সুষুম্নাশীর্ষক (মেডুলা অব্‌লঙ্গেটা) (২) সুষুম্নাকাণ্ড (স্পাইনাল্ কর্ড) এবং (৩) স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র (অটোনমিক্ নার্ভাস্ সিস্‌টেম্)। সুতরাং শারীর-বৃত্তীয় মনোবিদ্যা ইহাদের গঠন এবং ক্রিয়া লইয়া বিশদ আলোচনা করে। ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলির আলোচনা এই মনোবিদ্যার একটি প্রধান বিষয়, কারণ ইহাদের দ্বার দিয়াই সকল সংবেদন উৎপন্ন হয় , যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় রূপ, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এবং রস সংবেদনের কারণ এবং ইহাদের গঠন ও ক্রিয়া না জানিয়া এই সংবেদনগুলি বুঝিবার চেষ্টা বৃথা।

কোনো উদ্দীপকই সরাসরিভাবে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে প্রতিক্রিয়া বা সাড়া জন্মায় না। উদ্দীপক প্রথমতঃ কোন ইন্দ্রিয়স্থানবর্তী নার্ভের বহিঃপ্রান্তকে (পেরিফে-র‍্যাল্ এণ্ড্) উদ্দীপিত করে। এই উদ্দীপনা অন্তর্মুখ নার্ভের (অ্যাফেরেণ্ট্ নার্ভ) ভিতর দিয়া নার্ভ প্রবাহের (নার্ভাস্ ইম্‌পাল্‌স্) আকারে নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্রে

অবস্থিত ঐ নার্ভের অন্তঃপ্রান্তে (সেন্ট্রাল্ এণ্ড্) বাহিত হইয়া জ্ঞান উৎপন্ন করে। আবার ইহা ঐ অন্তঃপ্রান্তের সন্নিহিত বহির্মুখ (এফেরেণ্ট্) নার্ভের অন্তঃপ্রান্ত দিয়া কোনো পেশী বা গ্রন্থিতে অবস্থিত উহার বহিঃপ্রান্তে প্রবাহিত হইয়া বিচলন অথবা রসক্ষরণ উৎপন্ন করে। সংবেদন বুঝিতে হইলে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত শারীর অংশগুলি অবশ্যই বুঝিতে হয়। শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা হইতে আমরা এই জ্ঞান লাভ করি।

তাহা হইলে মনোবিদ্যার জ্ঞান লাভের জন্য ইন্দ্রিয়যন্ত্র অন্তর্মুখ নার্ভ, নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্র, মস্তিষ্ক, বহির্মুখ নার্ভ, পেশী, গ্রন্থি প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন ও ক্রিয়া বুঝা দরকার। শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা এই দিক্ দিয়া মনোবিদ্যাকে সাহায্য করে।

প্রতিবর্ত, অভ্যাস এবং স্বতঃক্রিয়ার কেন্দ্র অবস্থিত সুষুম্নাশীর্ষকে। আবার স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র পরিপাক ক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচলাচল, প্রজনন প্রভৃতি জৈবক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রন্থিগুলি রসক্ষরণ করিয়া প্রক্ষোভ, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি প্রভৃতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির ক্রিয়া ও গঠন শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার বিষয়।

ব্যক্তিত্বের উপর যে গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণ অসীম প্রভাব বিস্তার করে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার ব্যক্তিত্ব বংশগতি এবং পরিবেশ (এন্ভায়রন্মেণ্ট্) এই উভয়ের দ্বারাই যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু বংশগতির মূল বাহক (মিডিয়াম্) কি? কিরূপে পূর্বপুরুষের অনেক ধর্ম পরবর্তী পুরুষে সংক্রামিত হয়? এই সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ও শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা বিশদভাবে আলোচনা করে।

স্মৃতি, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানসক্রিয়ার মূলে যে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণশক্তি রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। একটি অধীত পাঠ আপাততঃ মনে না পড়িলেও কোনো না কোনো আকারে মনে অবস্থান করে। অনেকের মতে অধীত অথচ আপাতবিস্মৃত পাঠের পরবর্তী অবস্থা হইল মস্তিষ্কের অচেতন ক্রিয়া (আন্কনসাচ্ সেরিব্রেশন্) বা পরিবর্তন (মডিফিকেশন্)।

সম্ভবতঃ শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার সূত্রপাত হয় গল্ প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ফ্রেনোলজি বা মস্তিষ্ক সংগঠন বিদ্যায়। এই মতে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্ফীতাংশ বিভিন্ন মানসশক্তির পরিচায়ক। যেমন কোনো স্ফীতাংশ শিশুর প্রতি স্নেহপ্রবণতার সূচক, আবার আর একটি হয়ত বাক্শক্তিসূচক, ইত্যাদি। আধুনিক

শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা বর্তমানে উন্নতরূপ ধারণ করিয়াছে চার্লস্ বেল্, ম্যাগেন্ডি, বার্নার্ড্, হ্বুণ্ড্, হেল্ম্হোল্জ্, হেরিং, ফ্লোরেন্স্, হ্বেবর্, ফেক্নর্, গোল্ড্সাইডার্, ভন্ক্রজ্, ডঃ হেড্, ব্রোকা, প্যাভ্লো, ম্যাক্ডুগ্যাল্ এবং পরবর্তী বিজ্ঞানিগণের অক্লান্ত গবেষণার ফলে।

৪। অস্বভাবী মনোবিদ্যা—অ্যাব্নর্ম্যাল্ সাইকলজি

অস্বভাবী (অ্যাব্নর্ম্যাল্) ব্যক্তির প্রতি চিরাচরিত উপেক্ষা, উহাদের অবস্থা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা এবং উহাদের উপর উৎপীড়ন স্বভাবী লোকের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। মধ্যযুগে হিস্টিরিয়া রোগীকে ভূতে বা পেত্নীতে পাইয়াছে বলিয়া মনে করা হইত। ওঝা ডাকিয়া নানাপ্রকার মন্ত্রতন্ত্র এবং 'উত্তম-মধ্যমই' ছিল উহার চিকিৎসা। মনোরোগের প্রথম চিকিৎসার সূত্রপাত করেন ডি মণ্ডিভিলে। তিনি বলেন যে ভ্রমবাতুল (প্যারানয়েড্) রোগীর রোগ উপশম হয় তাহাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া (পারসুয়েশন্) এবং জাল চিঠিপত্রের দ্বারা। মধ্যযুগীয় প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া আধুনিক অস্বভাবী মনোবিদ্যা প্রমাণ করিয়াছে যে মানসরোগ কোনো ভূত বা অপদেবতার প্রভাবে ঘটে না, কিন্তু অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনার মত উহারাও প্রাকৃতিক কারণেই ঘটে এবং ঐ কারণ দূর করিতে পারিলেই মানসিক রোগ নিরাময় হইতে পারে।

পরবর্তী যুগে প্যারাসেল্সাস্-এর অনুকরণে মেস্মার্ ঠিক করিলেন যে রোগীর দেহে হস্তসঞ্চালন দ্বারা উহাতে চিকিৎসক কর্তৃক সৌরজাগতিক এবং জৈব চুম্বক শক্তি (অ্যানিম্যাল্ ম্যাগ্নেটিজ্ম্) সংক্রামিত করাই মানসিক রোগ নিরাময়ের উপায়। সার্কো সংবেশন (হিপনটিজ্ম্) সাহায্যে মনোরোগ চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন এবং হিস্টিরিয়ার সহিত সংবেদনের সাদৃশ্য দেখাইলেন। ন্যান্সী সম্প্রদায়ভুক্ত বের্নহাইম্ এবং লিয়েবোল্ট্ জোর দিয়া বলিলেন যে সংবেশনের কারণ অভিভাবন (সাজেশন্) এবং অভিভাবন একটি সহজাত প্রবণতা। ব্যাবিন্স্কি প্রভৃতি দেখাইলেন যে অভিভাবনের ফলে কোনো ধারণা বদ্ধমূল হইয়াই রোগলক্ষণ প্রকাশ করে। তাঁহাদের পরবর্তী পিয়ারে জ্যানে নির্দেশ করিলেন যে স্নায়বিক শক্তি হ্রাসের ফলে বিষঙ্গ (ডিসোসিয়েশন্ই) মনোরোগের কারণ।

সিগ্মণ্ড্ ফ্রয়েড্ ব্রয়ারপ্রযুক্ত অবাধ কথন পদ্ধতি হইতে তাঁহার অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি (ফ্রী অ্যাসোসিয়েশন্ মেথড্) উদ্ভাবন করিলেন। মনে

যাহা আসে রোগী তাহাই বলিয়া যাইতে থাকিবে, ফলে যে সকল অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছা রোগলক্ষণরূপে প্রকাশ পায় উহারা সংজ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করে। তাহার অবরুদ্ধ আবেগগুলি মনঃসমীক্ষককে (সাইকোঅ্যানালিস্ট্) কেন্দ্র করিয়া জাগিয়া ওঠে। এই অবস্থায় মনঃসমীক্ষক রোগীকে এমন শিক্ষা দেন যাহার সাহায্যে সে নিজকে বাস্তবের সহিত মানাইয়া লইতে পারে। এই বাস্তবের সম্বন্ধে পুনঃশিক্ষণের (রি-এডুকেশন্ টু রিয়্যালিটি) ফলে রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া ওঠে।

ফ্রয়েড্-এর দক্ষিণ ও বাম হস্ত ছিলেন সি. জি. য়্যুঙ্গ্ এবং এ. অ্যাড্লার্। তাঁহারা ফ্রয়েড্-এর তথাকথিত সর্বকামবাদ (প্যান্সেক্সুয়্যালিটি) স্বীকার করিতে না পারিয়া অস্বভাবী মনোবিদ্যার দুইটি পৃথক্ শাখা গঠন করিলেন। য়্যুঙ্গ্ এবং অ্যাড্লার্ প্রতিষ্ঠিত এই দুইটি উপশাখার নাম যথাক্রমে বিশ্লেষণ মনোবিদ্যা (অ্যানালিটিক্যাল্ সাইকলজি) এবং ব্যক্তি মনোবিদ্যা (ইনডিভি-জুয়্যাল্ সাইকলজি)। ইহারা অবশ্য ফ্রয়েড্-এর প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারিয়াছেন কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে।

মর্টন্ প্রিন্স্, ম্যাক্ডুগ্যাল্ ও রিভার্স্ প্রতিষ্ঠিত অস্বভাবী মনোবিদ্যার উপ-শাখাগুলি ফ্রয়েড্-এর মতানুবর্তী না হইলেও উহার দ্বারা যে বিশেষ প্রভাবিত তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অস্বভাবীর সংজ্ঞা

অস্বভাবী মনের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাকে অস্বভাবী মনোবিদ্যা বলে। কিন্তু অস্বভাবী মনের মানদণ্ড কি? আইনের সংজ্ঞা অনুসারে প্রকৃত অস্বভাবী ব্যক্তি তাহাকেই বলে যে আত্মরক্ষায় অক্ষম অর্থাৎ যে দৈনন্দিন জীবনের আপদ বিপদ হইতে নিজকে রক্ষা করিতে পারে না, অথবা স্নান আহার প্রভৃতি আত্মরক্ষামূলক কাজেও পরমুখাপেক্ষী। মনোবিদ্যার দিক্ হইতে বলা যায় যে যাহার মন ও মস্তিষ্কের বিকাশ স্বাভাবিক নয় সে অস্বভাবী। কিন্তু এই সংজ্ঞায় অস্বভাবী মন ও মস্তিষ্কের কোনো স্পষ্ট লক্ষণের উল্লেখ নাই। যদি বলা যায় যে ব্যক্তি স্বভাবী নয় সে অস্বভাবী তাহা হইলে সংজ্ঞাটি নঞ্বাচক, সুতরাং নিষ্ফল। অধিকন্তু, এই সংজ্ঞায় স্বভাবী মন কাহাকে বলে যাহার সহিত তুলনা করিয়া অস্বভাবী মন বুঝিতে পারা যায় তাহারও উল্লেখ নাই।

বলা যাইতে পারে যে স্বভাবী মন তাহাই যাহা সাধারণতঃ শতকরা পঞ্চাশ জনের অধিক সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। তাহা হইলে কোনো

ব্যক্তিকে আমরা তখনই স্বভাবী বলিয়া বুঝিব যখন দেখিব যে কোনো সুস্থ সমাজের শতকরা পঞ্চাশ জনের অধিক লোকের সহিত তাহার ব্যবহারের সাদৃশ্য আছে। অনুরূপভাবে অস্বভাবী ব্যক্তি বলিতে আমরা বুঝিব সেই ব্যক্তিকে যাহার ব্যবহারে তাহার সমাজস্থ শতকরা পঞ্চাশ জন অপেক্ষা কম ব্যক্তির সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে। এক কথায়, যে ব্যক্তি বেশীর ভাগ ব্যক্তি হইতে ভিন্ন সে অস্বভাবী।

এইরূপ সংজ্ঞার দোষ এই যে আইন্‌স্টাইন্ বা শঙ্করাচার্য নিশ্চয়ই তাঁহাদের সমাজস্থ অধিকাংশ ব্যক্তি হইতে পৃথক্, সুতরাং তাঁহারাও অস্বভাবী হইয়া দাঁড়ান। অথচ তাঁহারা এই ব্যাপক অর্থে অস্বভাবী হইলেও অস্বভাবী নহেন—তাঁহাদিগকে বলা যাইতে পারে অতি-স্বভাবী বা সুপার্‌নর্ম্যাল। উল্লিখিত অতিব্যাপ্তিদোষ দূর করিতে হইলে সংজ্ঞাটিকে আরও সঙ্কীর্ণ করা দরকার। বলিতে হইবে যে সমাজস্থ অধিকাংশ লোক হইতে পৃথক্ যে সকল ব্যক্তি সমাজের কোনো উপকারে আসে না কিন্তু সমাজের পক্ষে দায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় তাহারাই প্রকৃত অস্বভাবী, কিন্তু যাহারা সমাজস্থ অধিকাংশ ব্যক্তি অপেক্ষা পৃথক্ হইয়াও সমাজের সম্পদস্বরূপ অথবা সমাজের উপকারী তাঁহারা অস্বভাবী নহেন।

উল্লিখিত সমস্যার সমাধানরূপে আমরা স্বভাবের দিক দিয়া ব্যক্তিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি, যদিও এই বিষয়ে অনেক অস্বভাবী মনোবিৎ ভিন্ন মত পোষণ করিতে পারেন। প্রথমতঃ, স্বভাবী শ্রেণীটি সমাজস্থ অধিকাংশ ব্যক্তি লইয়া গঠিত। দ্বিতীয়তঃ, যাহারা সমাজস্থ অধিকাংশ লোক হইতে "খারাপ" অর্থে পৃথক্ তাহারা নিম্নস্বভাবী বা সাব্‌নর্ম্যাল্ এবং তৃতীয়তঃ, যাঁহারা সমাজের অধিকাংশ লোক হইতে "উন্নত বা ভাল" অর্থে পৃথক্ তাঁহারা অতিস্বভাবী বা সুপার-নর্ম্যাল। সাধারণতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী দুইটিকে একসঙ্গে অস্বভাবী বলা হইয়া থাকে।

অস্বভাবী মনোবিদ্যার বিষয়

অস্বভাবী মনোবিদ্যা মনের বিভিন্ন অস্বাভাবিক প্রকাশ কি কারণে ঘটিয়া থাকে, উহারা কত প্রকারের হইতে পারে, প্রভৃতি প্রশ্নের আলোচনা করে। মানসরোগগুলিকে দৈহিক প্রভাবের তারতম্য অনুসারে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—যথা উন্মায়ু (নিউরোসিস্), বায়ুরোগ (সাকেকো-

নিউরোসিস্) এবং বাতুলতা (সাইকোসিস্)। এই সকল মানসরোগ ছাড়াও, নানারূপ ঔষধের ক্রিয়ায় যে অস্বভাবী প্রকাশ দেখা দিতে পারে তাহাও অস্বভাবী মনোবিদ্যার আলোচ্য। যেমন মদ্যপান করিবার, আফিং গাঁজা প্রভৃতি খাইবার ফলে অনেকপ্রকার অস্বভাবী লক্ষণ প্রকাশ পায়। মানস-রোগের কারণ সন্ধান করিতে গিয়া নির্জ্ঞান মন, দ্বন্দ্ব (কনফ্লিক্ট্), অবদমন (রিপ্রেশন্), বিযঙ্গ (ডিসোসিয়েশন্), একান্তর ব্যক্তিত্ব (অল্টারনেট্ পার্সন্যালিটি) প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা অস্বভাবী মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়। মানসরোগের উৎপত্তি, নির্ণয়, নিদান (ডায়াগ্নোসিস্), আরোগ্য সম্ভাবনা (প্রোগ্নসিস্) প্রভৃতি সমস্যাও ইহার আলোচ্য। রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি, সুতরাং ইহার আনুষঙ্গিক অভিভাবন (সাজেশন্) সংবেশন (হিপ্নোসিস্) বা বিরেচন (ক্যাথার্সিস্) প্রভৃতি মনোরোগ চিকিৎসার পদ্ধতিও এই মনোবিদ্যাব বিষয়। মনঃসমীক্ষণ, হর্মিক্ মনোবিদ্যা, বিশ্লেষণ মনোবিদ্যা, ব্যক্তিমনোবিদ্যা প্রভৃতি মতগুলিও ইহার বিষয়ীভূত।

এক কথায় অস্বভাবী মন সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই অস্বভাবী মনোবিদ্যার বিষয়।

৩। শিক্ষা-মনোবিদ্যা (এডুকেশন্যাল্ সাইকলজি)

শিক্ষা-মনোবিদ্যা ফলিত মনোবিদ্যার একটি মুখ্য শাখা বা বিভাগ। ইহাতে বিশুদ্ধ (পিওর্) অথবা সাধারণ মনোবিদ্যার নিয়ম বা সূত্রগুলির শিক্ষণ ব্যাপারে ব্যবহারিক প্রয়োগ হয়। মানুষের আচরণ বা চেষ্টিত কি প্রকারে নূতন শিক্ষণীয় বস্তু জানিবার ফলে ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া ওঠে ইহাই শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচ্য। পরিণত অপেক্ষা অপরিণত শিশু বা কিশোর মনই ইহার প্রধান বিষয়। আবার বিস্তীর্ণ পরিবেশ অপেক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিস্থিতিই ইহার মুখ্য আলোচ্য, যদিও জীবনের প্রথম মুহূর্ত হইতে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত শিক্ষা চলিতে থাকে এবং যদিও বৃহত্তর বিশ্বই শিক্ষার প্রয়োগশালা।

শিক্ষামনোবিদ্যার বিষয়

(১) মানুষের আদিম স্বভাব—শিশু ভূমিষ্ঠ হয় কতগুলি সহজাত ক্রিয়া, প্রবৃত্তি, প্রলক্ষণ (ট্রেইট্) এবং ক্ষমতা লইয়া। যেমন জন্মক্রন্দন (বার্থ ক্রাই) অথবা মাতৃস্তন্যপানের ক্ষমতা ও ক্রিয়া শিশুর সহজাত। শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে

কতগুলি প্রতিবর্ত (রিফ্লেক্স্) প্রক্রিয়া প্রকাশ পায় যাহা সে শিক্ষা না করিয়া বংশগতি বা হেরিডিটি সূত্রে লাভ করে এবং ইহারাই শিশুজীবনের পরবর্তী শিক্ষার মূল ভিত্তি। এই সহজাত বা বংশজ ক্রিয়াগুলি শিক্ষার ফলে পরিবর্তনীয় অথবা উহা সত্ত্বেও অপরিবর্তনীয় কিনা—শিক্ষা-মনোবিদ্যা এই প্রশ্নের আলোচনা করে। তাহা ছাড়া, শিশুর সহজাত প্রক্ষোভ বা ইমোশন্‌গুলি কি কি এবং উহারা শিক্ষার ফলে কতটুকু পরিবর্তনীয় বা অপরিবর্তনীয়—এই জাতীয় প্রশ্নগুলিও শিক্ষা মনোবিদ্যার আলোচ্য।

(২) **শিক্ষাপদ্ধতি**—কি প্রণালীতে শিক্ষা সম্ভব হয় ইহা শিক্ষা-মনোবিদ্যার একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। মানুষের সহজাত শক্তিগুলি মানিয়া লইয়া শিক্ষক অনুসন্ধান করেন শিক্ষার অবস্থাগুলি কিরূপে সাজাইলে শিক্ষার্থীর তরফ হইতে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়। নানাপ্রকার শিক্ষা প্রক্রিয়া আলোচনা করিয়া শিক্ষা-মনোবিদ্যা শিক্ষা-সংক্রান্ত কতগুলি নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। কোন্ শিক্ষণপদ্ধতি অবলম্বনের ফলে শিক্ষার গতি কিরূপ দ্রুত বা মন্থর হয়, ইহার কিরূপ উন্নতি বা অবনতি ঘটে, শিক্ষার সীমা কিরূপ বাড়ে বা কমে? কিরূপে শিক্ষণকার্য চালাইলে সময় ও পরিশ্রমের লাঘব হয়, অথবা কম সময় ও পরিশ্রম লাগে? শিক্ষণ সংক্রান্ত এই জাতীয় প্রশ্নগুলি শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচ্য।

(৩) **প্রয়োগ**—শিক্ষা মনোবিদ্যা শিক্ষার কতগুলি সাধারণ নিয়ম বা সূত্র বাহির করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, উপরন্তু পাঠ করা, বানানশিক্ষা, পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিশেষ বিষয়গুলির শিক্ষাকার্যে উহাদের প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হয়। এই প্রয়োগের প্রশ্ন আলোচনা করিতে গিয়া বহু শিক্ষা পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে।

(৪) **শিশুগবেষণা**—শিশুই শিক্ষা-মনোবিদ্যার উপযুক্ত পাত্র। শিশুর মন না বুঝিয়া উহার শিক্ষণ সম্ভব নয়। যথাসম্ভব অকৃত্রিম, অথবা পরিবেশ দ্বারা কম প্রভাবিত অবস্থায় সহজ বৃত্তিগুলিকে শিশুর চেষ্টিতেই পাওয়া যায়। সহজ প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি শৈশবের কোন্ অবস্থায় প্রথম পরিলক্ষিত হয়? শিশু কিভাবে ভাষা বা কথা বলা শিক্ষা করে? শিশুর অঙ্কন স্বভাব কখন, কি অবস্থায় আবির্ভূত হয় এবং তাহার শিক্ষাকার্যে ইহাকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়? এই জাতীয় প্রশ্নগুলি শিশু-গবেষণা-মূলক। ইহারা শিক্ষা-মনোবিদ্যার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

(৫) শিক্ষাপরিসংখ্যান—শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল উহার আলোকে শিক্ষার্থীর মনকে পরিবর্তিত করা। কোন্ শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর মন কি পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে না জানিতে পারিলে ভবিষ্যতে উহার প্রয়োগ কতটা ফলপ্রসূ হইবে তাহা বলা যায় না। সুতরাং শিক্ষার ফলগুলিকে পরিসংখ্যান বা স্ট্যাটিস্টিক্স্-এর সাহায্যে হিসাব করিয়া গাণিতিক সংখ্যায় প্রকাশ করিতে হয়। এই পরিসংখ্যান হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে কোন্ শিক্ষা কতটুকু ফলপ্রসূ।

আবার যে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে হইবে কোনো বিষয় শিক্ষার পূর্বে উহাতে তাহার কতটুকু সামর্থ্য (এবিলিটি) ছিল এবং শিক্ষার ফলে উহা কি পরিমাণে বাড়িল অথবা তাহার কৃতিত্ব (অ্যাচিভ্‌মেন্ট্) কতটুকু হইল, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে পরিসংখ্যান আবশ্যক। ব্যক্তিত্বের এবং বুদ্ধির পরিমাপ (মেজার্‌মেন্ট্) শিক্ষামনোবিদ্যার অপরিহার্য অঙ্গ। নানারূপ বুদ্ধির অভীক্ষা (ইন্‌টেলিজেন্স্ টেস্ট্‌স্) করিয়া বুদ্ধ্যঙ্ক (ইন্‌টেলিজেন্স্ কোসেন্ট) বাহির করা হয় এবং এই বুদ্ধ্যঙ্কের উপর শিক্ষার্থীর শিক্ষা অনেকাংশে নির্ভর করে। শিক্ষার্থীর বুদ্ধ্যঙ্ক যদি ২৫-এর কম হয় তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার বুদ্ধি গর্দভের মত। এইরূপ জড়ধীকে (ইডিয়ট্) শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। আবার তাহার বুদ্ধ্যঙ্ক যদি ২৫ হইতে ৫০ পর্যন্ত হয় তাহা হইলে সে বোকা বা মন্দধী (ইম্‌বেসাইল্) এবং তাহার পক্ষে স্নান, আহার, পরিধান প্রভৃতি নিম্নস্তরের কাজগুলি শেখা সম্ভব হইলেও কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষা নিষ্ফল। এইরূপে গর্দভতুল্য বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিভাসূচক বুদ্ধি, যাহার বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪০-এরও ঊর্ধ্বে পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীর শিক্ষাব্যবস্থা পৃথক্ হওয়া আবশ্যক। এই সকল কারণে আধুনিক শিক্ষামনোবিদ্যায় পরিসংখ্যানের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৬। শিল্পীয় মনোবিদ্যা (ইন্‌ডাস্ট্রিয়্যাল্ সাইকলজি)

শিল্প মানুষের সৃষ্টি এবং এই সৃষ্টি মনেরই কাজ। অথচ এই স্থূল সত্যটির প্রতি শিল্পপতিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে সম্প্রতি, শিল্পীয় মনোবিদ্যা প্রচলিত হইবার পর। শিল্পী শুধু শিল্প উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র নয়। সেও একজন মনবিশিষ্ট সুখ-দুঃখ-স্বাচ্ছন্দ্য-ক্লান্তি প্রভৃতি বোধসম্পন্ন মানুষ। শিল্পীয় মনোবিদ্যা দেখাইয়াছে যে উৎপাদনবৃদ্ধি, লভ্যাংশ, শিল্পের প্রসার প্রভৃতি শিল্পপতির কাম্য লক্ষ্যগুলি শিল্পিমনের সুখ-দুঃখ-অবসাদ-আরাম প্রভৃতি অবস্থার উপর নির্ভর

করে, শুধু বেশী মূলধন বা শিল্পী নিযুক্ত করিলে অথবা শ্রমিকদের বেশী খাটাইলেই হয় না। শ্রমিক বা শিল্পীর শ্রমে উৎসাহ বা আনন্দের খোরাক থাকা চাই, নতুবা শ্রম পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়, অথবা আশানুরূপ ফলপ্রসূ হইতে পারে না।

শিল্পীয় মনোবিদ্যার পরীক্ষা ও নিরীক্ষার দুই একটি উদাহরণ দিয়া শিল্পীয় মনোবিদ্যার গুরুত্ব দেখানো যাইতে পারে। যেমন, দেখা গেল যে প্রত্যেক কাজেই বিভিন্ন শ্রমিক বা শিল্পীর বহু অনাবশ্যক গতি বা হস্তসঞ্চালন ঘটে। ক্রনোসাইক্লোগ্রাফ্ যন্ত্রের সাহায্যে এই বিভিন্ন গতিগুলির ফটো তুলিয়া রাখা হইল। এই ফটোগুলির সাহায্যে বুঝা যায় কোন্ গতিগুলির মিলনে শিল্প কার্যের পক্ষে লাভজনক গতি উৎপন্ন করা যায়।

আবার শ্রমজনিত ক্লান্তি বা অবসাদ বা ফেটিগ্ সম্বন্ধে শিল্পীয় মনোবিদ্যার গবেষণা বিশেষ মূল্যবান্। শারীরিক ক্লান্তির কারণ সুবিদিত। বার বার সঙ্কোচনের ফলে পেশীয় কলা (মাস্কিউলার্ টিস্যু) শরীরের সঞ্চিত ইন্ধন (ফুয়েল্) ফুরাইয়া দেয়। ফলে, নিউরন্-এর প্রান্তসন্নিকর্ষে (সায়নাপ্টিক্ জাংশন) বিষাক্ত মল (পয়জনাস্ প্রডাক্ট্) সঞ্চিত হইয়া পেশীর পুনঃ সঙ্কোচনে বাধা দেয়। মানসিক ক্লান্তির কারণও অনুরূপ। শুধু এইস্থলে নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্র সুষুম্নাকাণ্ড হইতে মস্তিষ্কে সরিয়া যায়। শারীরিক অবসাদে সুষুম্নাকাণ্ডের নার্ভগুলি সক্রিয়, কিন্তু মানসিক অবসাদে মস্তিষ্কের নার্ভগুলি সক্রিয় হয়।

কর্মকালের প্রথম দিকে শিল্পী মনোযোগের সহিত কাজ করিতে পারে, কিন্তু কিছু কাল পরেই তাহার মন মাঝে মাঝে অন্য দিকে পরিচালিত হয়। নানা অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা এবং কর্তব্য কাজ এই উভয়ের প্রতি মনোযোগের দ্বন্দ্বাভিঘাতে তাহার মানসিক ক্লান্তি আসিয়া পড়ে। এই ক্ষেত্রে শিল্পীয় মনোবিদ্যা শিক্ষা দেয় যে শিল্পীর কাজ যাহাতে আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক হয় সেই দিকে শিল্পপতির লক্ষ্য রাখা উচিত। তাহা ছাড়া, কার্যকাল এইরূপ ভাবে বিভক্ত হওয়া উচিত যাহাতে ক্লান্তির সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

উৎপাদনের প্রকার ও পরিমাণ রেখাচিত্রের (কার্ভ) সাহায্যে প্রতিফলিত করা যাইতে পারে। ফলে, কিরূপ সময়ে এবং কিরূপ অবস্থায় কিরূপ উৎপাদন হয় তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। এই রেখাচিত্রে দেখা যায় যে কর্মকালের প্রথমে উৎপাদন বৃদ্ধি, পরে ক্রমিক ভাবে বৃদ্ধির হ্রাস এবং শেষের দিকে অর্থাৎ শ্রম বা কার্য শেষ হইবার ঠিক পূর্বে হঠাৎ পুনরায় উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে। রেখাচিত্র

গবেষণা করিয়া শিল্পীয় মনোবিৎ বলিতে পারেন কার্যপ্রণালীর কিরূপ পরিবর্তন করিলে উৎপাদনবৃদ্ধি এবং ক্লান্তিহ্রাস ঘটিতে পারে।

শিল্পীয় মনোবিদের আর একটি জ্ঞাতব্য হইল কর্ম ও বিশ্রামকালের বিন্যাস। রাত্রির সুনিদ্রা দিবসের কর্মক্লান্তি দূর করে এবং কর্মে নূতন প্রেরণা ও শক্তি যোগায়। ক্লান্তির প্রতিকার বিশ্রাম। সুতরাং কর্মকালের মধ্যে বিশ্রাম দরকার। তাহা ছাড়া, যে অবস্থায় কাজ করিতে হয় তাহার অসুবিধা দূর করা আবশ্যক। আলো-বাতাসের অভাব, যন্ত্রপাতির বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি অসুবিধাগুলি পরিশ্রমে বিরক্তি ঘটায় এবং উৎপাদন হ্রাস করে।

বৃত্তীয় পরিচালনা (ভোকেশন্যাল্ গাইড্যান্স্) শিল্পীয় মনোবিদ্যার আর একটি কাজ। কোনো শিল্পী বা শ্রমিক কোন্ কাজের উপযোগী তাহা তাহার বুদ্ধ্যঙ্ক, ব্যক্তিত্বের পরিমাপ, সামর্থ্য, প্রতিন্যাস (অ্যাটিচুড্), চরিত্র, আকস্মিক দুর্ঘটনা-প্রবণতা (অ্যাক্সিডেণ্ট্ প্রোননেস্) প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। শিল্পীয় মনোবিৎ এইগুলি পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন। বড় বড় কারখানায় এবং অন্যান্য কাজে আকস্মিক দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে ইহা শুধু বাহিরের কারণ নয়, মানসিকও বটে। শিল্পীয় মনোবিদ্যা এই বিষয়টির উপর বিশেষ আলোকপাত করে। তাহা ছাড়া, প্রচার, বিজ্ঞাপন (অ্যাড্ভারটাইজ্-মেণ্ট্) প্রভৃতি কিরূপে চিত্তাকর্ষক হয় তাহাও শিল্পীয় মনোবিদ্যার আলোচ্য।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

মেলোন্ অ্যাণ্ড ড্রামণ্ড্—এলিমেণ্ট্স্ অফ্ সাইকলজি—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এফ্ অ্যাভেলিং—সাইকলজি : দি চেঞ্জিং আউটলুক্—দশম পরিচ্ছেদ

ই বি টিচ্নার্—প্রাইমার অফ্ সাইকলজি—চতুর্দশ, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

Exercise

1. What are the methods and importance of child study? Give a brief account of the subject-matter of child Psychology. (pp 65-69)
2. Define Experimental Psychology and explain the method of investigating it. (pp. 69-71)
3. Explain the relation of Physiological Psychology to Experimental Psychology. Briefly explain the scope of Physiological Psychology.
4. Write short notes on (a) Physiological Psychology; (b) Abnormal Psychology; (c) Educational Psychology and (d) Industrial Psychology. (pp. 71-74, 74-77, 77-79, 78-80)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মনোবিদ্যা পাঠের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

(দি এইম্ অ্যাণ্ড্ ইউটিলিটি অফ্ সাইকলজি)

১। মনোবিদ্যা পাঠের উদ্দেশ্য

মনোবিদ্যা পাঠের উদ্দেশ্য মন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা। সকলেরই হয়ত মন সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান কমবেশী থাকে। এই জ্ঞান না থাকিলে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা অসম্ভব হইয়া পড়ে, কারণ অপরের সহিত ব্যবহার-বিনিময় অথবা নিজ মনের সহিত বুঝা-পড়া জীবনের অনেকখানি জুড়িয়া থাকে। রাম যখন শ্যামের সহিত কথা বলে তখন রাম ধরিয়া লয় যে শ্যাম তাহার কথা শুনিতেছে ; অথবা কাহাকেও হাসিতে, কাঁদিতে এবং দাঁতে দাঁত ঘষিতে দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে ঐ ব্যক্তি, সুখী, দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু নিজ বা অপর মন সম্বন্ধে এইরূপ জ্ঞান প্রায়ই অস্পষ্ট থাকে, কারণ ইহার ভিত্তি সম্বন্ধে জ্ঞানও প্রায়ই অস্পষ্ট। এই প্রকার স্বতোলব্ধ জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক বলা যায় না। ইহা একপ্রকার প্রাগ্-বৈজ্ঞানিক (প্রি-সায়েন্টিফিক্) জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞানের ভিত্তি অস্পষ্ট থাকায় ইহা সম্বন্ধে কেহ কোনো প্রশ্ন বা সন্দেহ তুলিলে সেই প্রশ্নের অথবা সন্দেহের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া যায় না। এই জ্ঞানের স্বরূপ বা গঠন আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখি না। ইহা এক প্রকার অবিশ্লিষ্ট (আন্-অ্যানালাইজ্‌ড্) এবং যুক্তিনিরপেক্ষ (ইর‍্যাশন্যাল্) জ্ঞান।

মনোবিদ্যা মনের এইরূপ স্বতোলব্ধ বা সহজ জ্ঞান নয়। ইহা আয়াসলব্ধ, বিশ্লেষণাত্মক এবং উদ্দেশ্যমূলক জ্ঞান। যত্নসাধ্য প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে মনের জ্ঞান লাভ করাই মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। মন একটি সহজ অথবা সরল বস্তু নয়। মনের মত জটিল ও দুর্বোধ্য আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। মনের বিচিত্র ভঙ্গী, অনন্ত বৈচিত্র্য, সুদূর প্রসার এবং অতল গভীরতা। মন মনুষ্য জীবনের সহিত প্রায় সমব্যাপ্ত (কো-এক্সটেন্‌সিভ)। এই গহন ও জটিল মনের অমেয় প্রসার এবং অতল গভীরতা বুঝিতে চেষ্টা করাই মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য।

মনোবিদ্যার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ

কৌতূহল বা জানিবার ইচ্ছা মানুষের স্বভাবে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। মানুষ অজানাকে জানিতে চায়। অজানা বিপদের কারণ হইতে পারে। হয়ত অজানার

বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জৈব প্রয়োজনে মানুষ অজানাকে জানিতে চায়। সে যাহা হউক, মন মানুষের নিকটতম সহচর। এই মনের স্বভাব ও নিয়ম জানিবার আগ্রহ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মনকে যে কোনো বাহিরের উদ্দেশ্য লইয়াই জানিবার ইচ্ছা হয় এমন নাও হইতে পারে। শুধু জানিবার জন্যই এই জানিবার আগ্রহ ঘটিতে পারে। এইরূপ নিস্পৃহ জ্ঞানাসক্তিই বিজ্ঞান ও দর্শনের মূল আকর্ষণ।

মন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভই মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য

সুতরাং মনোবিদ্যা পাঠের উদ্দেশ্য শুধু মনোবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভেই পর্যবসিত হইলে বিস্ময়ের কোনো কারণ নাই। মন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার আগ্রহ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভই মনোবিদ্যা পাঠের উদ্দেশ্য হইতে পারে। জ্ঞানাৎ পরতরং নাস্তি। জ্ঞানই শক্তি। বস্তুতঃ শুদ্ধ মনোবিদ্যার (পিওর্ সাইকলজি) উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞান লাভ করা। আবার ফলিত মনোবিদ্যার (অ্যাপ্লায়েড্ সাইকলজি) উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞান নয়, কিন্তু জ্ঞানের কার্যকরী প্রয়োগ বা ব্যবহার।

মন সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ

যে মন মানুষের নিত্য সহচর—যাহা তাহার জীবনের প্রথম সজ্ঞান মুহূর্ত হইতে শেষ সজ্ঞান মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাকে ছাড়িয়া যায় না, সেই মন কি, উহার ক্রিয়া বা প্রকাশ কি, উহা কি কি নিয়মে কাজ করে, উহার নানা ক্রিয়া কিরূপে বা কি কারণে সম্ভব হয়, প্রভৃতি প্রশ্ন স্বভাবতঃ মানুষের মনে জাগিয়া ওঠে এবং তাহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে।

নিজ মন সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ

বিশেষ করিয়া নিঃসঙ্গ নির্জনতায়, যখন মানুষ নিতান্ত একাকী ও আত্মনির্ভর হইতে বাধ্য হয়, তখনই তাহার দৃষ্টি বা লক্ষ্য নিবদ্ধ হয় তাহার মনের উপর। কেন, কোথা হইতে তাহার চিন্তা, ভাবনা, দুঃখ, বেদনা, ইচ্ছা, সঙ্কল্প প্রভৃতি মানসবৃত্তিগুলি আসিতেছে? ইহাদের কি কোনো নিয়ম নাই বা ইহারা কি অকারণেই ঘটিতেছে? জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাত, মানসিক দ্বন্দ্ব, সংশয় এবং নানা সমস্যার গুরুত্ব মানুষকে আত্মসচেতন করিয়া তোলে। কাজে কাজেই

মানুষ জানিতে চায় তাহার নিজ স্বরূপকে। মনোবিদ্যা তাহার এই উদ্দেশ্য সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করে।

নিজ মনকে না জানিলে মানুষের জীবনযাত্রা অচল হইয়া পড়ে। নিজ মনের আলোকেই অপর ব্যক্তির মন জানিবার সম্ভাবনা। সুতরাং নিজ মনকে জানিবার প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনোবিদ্যা পাঠে তাহার নিজ মনকে জানিবার পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হয়।

অপর মনের জ্ঞান

মনোবিদ্যা যে শুধু ব্যক্তিকে তাহার নিজ মন জানিতেই সাহায্য করে তাহা নয়। অপরের মন জানিবার ভিত্তি হইল নিজ মনের জ্ঞান। অপরের মন কি কি নিয়মে কাজ করে, কি কি উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রভৃতি প্রশ্নের সমাধান করে মনোবিদ্যা। আবার অপর-মনের প্রসার বা পরিধি অনন্ত। অপর ব্যক্তির মন যেমন কোনো ব্যক্তিমনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তেমন সমাজের, রাষ্ট্রের, জাতির এবং সমষ্টিগত মানুষের মনও উহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

অপর মন সম্বন্ধে জানিবার প্রয়োজন

মনোবিদ্যা যে শুধু ব্যক্তিকে তাহার নিজ মনের জ্ঞানলাভে সহায়তা করে তাহা নয়, উপরন্তু নিজ মনের আলোকে অপরের মন এবং অপরের মনের আলোকে নিজ মন জানিতেও সহায়তা করে। আবার মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য শুধু ব্যষ্টিমনের জ্ঞানই নয়, সমষ্টিমনের জ্ঞানও বটে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সমষ্টিমূলক সংগঠনগুলির মনোভাব আলোচনা করাও মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য।

নানাপ্রকার মন সম্বন্ধে জ্ঞান

সাধারণ মনোবিদ্যা সুস্থ বা স্বভাবী মনের আলোচনা করে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনোবিদ্যার আলোচনা শুধু স্বভাবী মনেই সীমাবদ্ধ নয়। ইহা অস্বভাবী বা অসুস্থ মনের ক্রিয়াপ্রণালীরও অনুসন্ধান করে। এইরূপে শিক্ষায়, শিল্পে, যুদ্ধে, শান্তিতে প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে মানুষের মন কিভাবে কাজ করে তাহা আলোচনা করাই মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য।

আবার মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য যে শুধু মানুষের মন সম্বন্ধেই আলোচনা করা তাহা নয়। মনুষ্যেতর প্রাণীরা কিরূপ আচরণ করে এবং তাহাদের আচরণে কোন্ স্তরের মানসবৃত্তি কাজ করিয়া থাকে তাহার অনুসন্ধান করাও মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য।

এক কথায় যাহা মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় তাহার অনুসন্ধানই উহার উদ্দেশ্য।

২। ব্যষ্টিজীবনে মনোবিদ্যার উপকারিতা

মনের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাই যদি মনোবিদ্যা হইয়া থাকে তাহা হইলে মনোবিদ্যা পাঠের উপকারিতা সহজেই অনুমেয়।

মন মানুষের নিত্য সহচর। জাগরণের চেতন অবস্থা তো বটেই, এমন কি আবেশ, মূর্ছা, তন্দ্রা, স্বপ্ন এবং নিদ্রা প্রভৃতি অস্পষ্ট চেতন এবং নির্জ্ঞান অবস্থায়ও মানুষ মন হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। মনুষ্যজীবনের এইরূপ সর্বান্তর্ভাবী মনকে জানিবার উপকারিতা যে অসীম তাহাতে সন্দেহ নাই।

(১) প্রথমতঃ মনোবিদ্যার সাহায্যে ব্যক্তি তাহার নিজ মনকে জানিবার অধিকার লাভ করে। কিরূপ অবস্থায় তাহার মন কিরূপ ক্রিয়া করে, কোন্ প্রকার পরিস্থিতিতে তাহার সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি অনুভূতি বা প্রক্ষোভগুলি ঘটে তাহা জানিয়া তাহার ভবিষ্যতে অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করা প্রয়োজন।

(২) কোনো যন্ত্রপাতি বা প্রয়োগশালার সাহায্য না লইয়াই মানুষ তাহার নিজ মনকে অন্তর্দর্শন করিতে পারে। মনই তাহার প্রযোগশালা। এই অন্তর্দর্শনলব্ধ জ্ঞানকে বহির্দর্শন দ্বারা পরীক্ষা করিয়া অথবা প্রয়োগপদ্ধতির সাহায্যে আরও বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তোলা যায়।

(৩) ব্যক্তিগত জীবনেও ব্যক্তিকে বহুপ্রকার ব্যক্তির সহিত ব্যবহার করিতে হয়। এই লোকব্যবহার ও আদান-প্রদানের ভারসাম্য বজায় রাখিবার কার্যে মনোবিদ্যা সহায়ক।

(৪) দৈনন্দিন জীবনে মনোবিদ্যার উপকারিতা অসীম। সংসারী লোকের শিশুপালন একটি প্রধান কর্তব্য। শিশুকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইলে তাহার মন কোন্ স্তরের এবং কি নিয়মে উহা কাজ করে তাহা বুঝা দরকার। এই জ্ঞান না থাকিলে আমরা শিশুর আচরণকে পরিণত

মনের মানদণ্ডে বিচার করিয়া বসি। শিশুমনোবিদ্যা শিশুমনের জ্ঞান আহরণ করে।

(৫) দাম্পত্য জীবনেও মনোবিদ্যার জ্ঞান বাঞ্ছনীয়। নারীর মন কি নিয়মে কাজ করে, তাহার শরীরের গঠনভেদের অনুরূপ মনের গঠনভেদ আছে কিনা এই জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির জ্ঞান থাকিলে বহু ভ্রান্ত ধারণা দূর করা যায়।

(৬) প্রত্যেক ব্যক্তির যে একটি নিজস্ব মন আছে এবং সেই মনের যে একটি নিজস্ব কর্মধারা থাকা স্বাভাবিক, মনোবিদ্যার এই অতি সাধারণ জ্ঞানটুকু থাকিলে স্বার্থসঙ্কীর্ণ দৃষ্টি পরিহার করা যায়। অপর ব্যক্তির মন সম্বন্ধে লক্ষ্য থাকিলে যে ধৈর্য, সহনশীলতা ও অপক্ষপাত দৃষ্টি খুলিয়া যায় তাহা সংসারের শান্তি, শৃঙ্খলা ও ঐক্য অটুট রাখিতে সাহায্য করে। মনোবিদ্যা এই দৃষ্টি গঠনে সহায়তা করে।

(৭) সকলকেই কোনো না কোনো শিক্ষালাভ করিতে হয়। শিক্ষা কাহাকে বলে, শিক্ষার নিয়ম কি, কাহার পক্ষে কি প্রকার শিক্ষা উপযোগী প্রভৃতি প্রশ্নের সম্মুখীন না হইয়া উপায় নাই। মনোবিদ্যা এই সকল প্রশ্নের সমাধানে সহায়তা করে।

(৮) আবার কর্ম না করিয়াও উপায় নাই, বিশেষতঃ জীবিকা অর্জনের জন্য। কাহার পক্ষে কোন্ কর্ম উপযোগী, কর্মে উৎসাহ বা শিথিলতার কারণ কি, প্রভৃতি কর্ম বা উপজীবিকা সম্পর্কীয় বহু প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় মনো-বিদ্যা হইতে।

(৯) ভুল-ভ্রান্তি, স্বপ্ন, চিত্তবিভ্রম, মানসব্যাধি প্রভৃতি সমস্যা সকলকেই অল্প বিস্তর ভাবাইয়া তোলে। মনোবিদ্যার জ্ঞান থাকিলে ইহাদের সুরাহা হইতে পারে।

(১০) মনোবিদ্যার সর্বাধিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা এই যে ইহার অনুশীলনে যে অন্তর্দর্শনপটুতা জন্মে তাহার ফলে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত সজ্ঞানভাবে চলিতে পারে। নিজ মন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। আবার মন ব্যক্তির নিত্য সহচর। এই নিত্য সঙ্গীর অজ্ঞতা মনোবিদ্যাই দূর করিতে পারে।

(১১) উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, "আত্মানং বিদ্ধি" এবং সক্রেতিস বলিয়াছেন, "নো দাইসেল্‌ফ্"। এই আত্মজ্ঞানের সহায়ক মনোবিদ্যা।

মনোবিদ্যা অবশ্যই আত্মবিদ্যা নয়। কিন্তু আত্মবিদ্যা যে মনোবিদ্যাকে বাদ দিয়া হইতে পারে না তাহাও ঠিক। যেমন যোগমতে আত্মবিদ্যার উপায় হইল

চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধ আবার কোনো কোনো বৈষ্ণবপন্থীর মতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ নয়, উহার উর্দ্ধগতিই যোগ। সে যাহা হউক, আত্মানুশীলনের (সেল্ফ্ কাল্চার্) পক্ষে চিত্তবৃত্তি অথবা মানসক্রিয়াবলীর জ্ঞান আবশ্যক এবং ইহাদের জ্ঞান মনোবিদ্যা সাহায্যে সম্ভব।

৩। সমাজ-জীবনে মনোবিদ্যার উপকারিতা

(১) সমাজ জীবনের প্রথম সূত্রপাত হয় ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুর সহিত তাহার পিতামাতার সম্বন্ধের ভিতর দিয়া। হয়ত শিশুর জীবনের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার ভাবী জীবনের ভিত্তি রচিত হয়। শিশুর সহিত তাহার পিতামাতার সম্বন্ধকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রাথমিক সমাজ জীবন আরম্ভ হয় তাহার জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মনোবিদ্যার, বিশেষতঃ শিশুমনোবিদ্যার জ্ঞান আবশ্যক।

(২) তারপর শিশুর সমাজজীবন ক্রমশঃ প্রসারিত হয় তাহার ভ্রাতা-ভগিনী এবং পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদের কেন্দ্র করিয়া। ক্রমে ক্রমে শিশুর সমাজ-জীবনের গণ্ডী আরও বাড়িতে থাকে। খেলার সাথী, বিদ্যালয়ের সহপাঠী, পাড়া-প্রতিবেশী প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিয়া তাহার সমাজজীবন ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে থাকে। শিশু কিশোর হয়, কিশোর যুবক হয় এবং দাম্পত্য জীবনে সে একটি নারীকে তাহার জীবনসঙ্গিনী করিয়া লয়। এইরূপে স্তরে স্তরে সমাজ-জীবন কর্মক্ষেত্রে, রাষ্ট্রে, দেশে, মহাদেশে, এমন কি বিশ্বে প্রসারিত হইয়া ব্যক্তিকে পৃথিবীর নাগরিক করিয়া তোলে।

মনোবিদ্যা সমাজ জীবনের প্রকৃতি, নিয়ম, ব্যক্তির উপর প্রভাব প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া এই জীবন সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞানলাভের সহায়তা করে। সমাজ ব্যক্তিমনের কোন্ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গড়িয়া ওঠে, ব্যক্তির স্বতন্ত্র রূপ অথবা ব্যক্তিত্ব সমাজ জীবনে কি আকার ধারণ করে, কি কি নিয়মে পরিবার, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র, ধর্ম, নীতি, সভাসমিতি, সঙ্ঘ, ক্রীড়াসংগঠন, নাট্য বা আমোদ-প্রমোদ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়?

এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক আলোচনা করে মনোবিদ্যা।

(৩) জীবন একটি শিক্ষা ক্ষেত্র। পুরাতন জ্ঞান ভাণ্ডারের সাহায্যে নূতন বস্তুকে আয়ত্ত করার নাম শিক্ষা। প্রত্যেক ব্যক্তিই একাধারে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক। তাহাকে শিক্ষার্থী হিসাবে শিক্ষকের এবং শিক্ষক হিসাবে শিক্ষার্থীর

মন বুঝিতে হয়। শিক্ষক কেন অন্য প্রকার শিক্ষা না দিয়া এই প্রকার শিক্ষা দিলেন? তাঁহার উদ্দেশ্য কি? শিক্ষণীয় বিষয় কি প্রকারে শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থী উহা শিক্ষা করিতে পারে? সহজ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ শক্ত বিষয়ের শিক্ষায় অগ্রসর হওয়া কি সঙ্গত, অথবা প্রথমেই জটিল বিষয়ের অবতারণা বাঞ্ছনীয়? শিক্ষার্থীর বুদ্ধি কোন স্তরের? তাহার বুদ্ধ্যঙ্ক কি? তাহার মনের ঝোঁক অথবা প্রবণতা কিরূপ শিক্ষণীয় বিষয়ের দিকে? ভাল করিয়া বুঝান সত্ত্বেও কি কারণে কোনো কোনো শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয় বুঝিতে পারে না? বুঝাইবার কোন ত্রুটি আছে কি, অথবা শিক্ষার্থীরই গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কম? শিক্ষার্থীর বুঝিবার বা গ্রহণ করিবার শক্তি কি উপায়ে বাড়ানো যায়? তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে না কেন? স্বভাবতঃই কি তাহার মনোযোগের অভাব, অথবা শিক্ষণীয় বিষয়টিকে আরও সরস এবং চিত্তাকর্ষক করা দরকার? বার বার অভ্যাস করিয়াও কেন শিক্ষার্থী শিক্ষা করিতে পারিতেছে না? তাহার কি স্মৃতিশক্তি কম? স্মৃতিশক্তির উন্নতির উপায় কি? পড়াইবার অথবা পড়িবার রীতি বদলানো দরকার কি না? অথবা শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ক-দুর্বলতাই স্মৃতিশক্তি কম হইবার কারণ? শিক্ষার্থী কোনো কোনো বিষয় বেশ মনে রাখিতে পারে অথচ কোনো কোনো বিষয় সহজে এবং তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যায় কেন? বিভিন্ন বিষয় কি একই রীতিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত অথবা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন? একসঙ্গে কতক্ষণ পড়া উচিত? একটানা ভাবে পড়িয়া যাওয়া ভাল, অথবা পড়ার সময় বিভক্ত করিয়া বিশ্রাম—কাজ—বিশ্রাম—কাজ এইরূপ ধারায় পড়া ভাল? শিক্ষার উপযুক্ত বয়স কত বৎসর হইতে কত বৎসর পর্যন্ত? বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বিষয় শিক্ষা করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায় কেন? বার্ধক্যে নূতন শিক্ষা অসম্ভব হইয়া ওঠে কেন?

এক কথায়, শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় মনোবিদ্যা পাঠ করিয়া। সুতরাং শিক্ষায় মনোবিদ্যা পাঠের গুরুত্ব অসীম।

(৪) শিক্ষার মত কর্মও মানুষের সামাজিক জীবনের অনেকখানি অধিকার করিয়া থাকে। তাহার কর্ম শুধু তাহার নিজ ব্যক্তিত্বেই সীমাবদ্ধ থাকে না, কিন্তু উহার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত অন্য ব্যক্তিও তাহার গণ্ডীতে আসিয়া পড়ে। শিশুর লেখাপড়া, খেলাধূলা প্রভৃতি সকল কর্মই আরও পাঁচ জন শিশুর সহিত সহযোগিতায় ঘটে। কোনো শিশু তাহার সঙ্গীদের

সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারে, আবার কেহ কেহ পারে না। কোনো শিশু খেলাধূলায় নেতৃত্ব গ্রহণ অথবা আধিপত্য বিস্তার করে, আবার কোনো শিশু হয়ত নিষ্ক্রিয় দর্শকের অথবা শুধু আদেশ পালন করিবার ভূমিকা গ্রহণ করে। শিশুর সমাজ-জীবন বুঝিতে হইলে মনোবিদ্যার সাহায্যে তাহার মানস-ক্রিয়া বা কর্মপ্রণালী বুঝিতে হয়।

শিশু বড় হইয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। তাহার জীবিকা সংগ্রহের এবং পরিবার প্রতিপালনের জন্য কর্ম করিতে হয়। কোনো কোনো কর্মী নিয়োগ-কর্তার সহিত কিছুতেই মানাইয়া চলিতে পারে না, মনে করে যে নিয়োগকর্তা অত্যধিক কর্তৃত্ব ফলাইতেছেন। এই সকল কর্মীর কর্মজীবন পুঞ্জীভূত অসন্তোষে ভরিয়া ওঠে। আবার কোনো কোনো কর্মী নিয়োগকর্তার অত্যধিক অনুগত এবং অন্ধ সমর্থক। এই সকল কর্মী নিয়োগকর্তার সুনজরে পড়িয়া ক্রমশঃ উন্নতি করিতে থাকে এবং স্বাধীনচেতা কর্মীদের বিরাগভাজন হন। তাহা ছাড়া কর্ম করিবার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র চাই। কর্মক্ষেত্রের কিরূপ অবস্থা হইলে কর্মস্পৃহা বাড়ে অথবা কমে? কর্মকাল কি ভাবে কর্মে নিয়োজিত করিলে সুফল পাওয়া যায়? মোটের উপর শিল্পীয় মনোবিদ্যার যাবতীয় প্রশ্ন কর্মক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে এবং এই বিদ্যার জ্ঞান না থাকিলে এই সকল প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া যায় না।

(৫) মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ-জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের ধর্ম, নীতিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, এক কথায়, তাহার কৃষ্টি বা সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে। সভা, সমিতি প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংস্রবে আসিয়া ব্যক্তির উন্নতি হইতে পারে। এই সকল প্রতিষ্ঠান মানুষের সংস্কৃতি বা কৃষ্টিকামী মনকে কিরূপে সাহায্য করে? ব্যক্তি কেন তাহার আত্মস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়াও এই সকল সংগঠনের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়? প্রত্যেক সংগঠনই অনেক সভ্য বা সদস্য লইয়া গঠিত—এই সকল সমাজ সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য কি? ব্যক্তির নিজস্ব সত্তাকে লুপ্ত করাই কি ইহাদের উদ্দেশ্য? তাহা না হইলে, কি উপায়ে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন, এমন কি, পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিত্বকে সংগঠনমূলক উদ্দেশ্যে পরিচালনা করা যাইতে পারে? সংগঠনে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা কি পরিমাণে সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়? ইহার নেতৃত্বভার কিরূপ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত? কোনো স্বৈরাচারী বা উগ্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোককেই কি নেতৃত্বভার দেওয়া উচিত, অথবা একেবারে ব্যক্তিত্ববর্জিত ব্যক্তিই ঐ দায়িত্ব পালনের

উপযুক্ত পাত্র, অথবা যাহার মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও নমনীয়তার সামঞ্জস্য রহিয়াছে তিনিই নেতৃত্ব গ্রহণের অধিকারী?

(৬) রাষ্ট্রজীবনও মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। প্রত্যেক নাগরিকেরই রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য রহিয়াছে। রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের সহিত শাসিত জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাঁহারা যদি জনসাধারণের মনোভাব না বুঝেন তাহা হইলে শাসনকার্য অচল হইয়া পড়ে। জনসাধারণ কি চায়? মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলি কি কি? তাহাদের দুঃখবেদনার কারণ কি এবং ইহার প্রতিকারই বা কি? গণবিক্ষোভ অথবা গণ-আন্দোলনের কারণ কি? কি উপায়ে আন্দোলনের সম্মুখীন হইয়া উহা মিটানো যায়? জনসাধারণের সমবেত সমর্থন লাভের উপায় কি? নির্বাচনে জয়লাভ করিতে হইলে কি উপায়ে ভোটদাতাদিগের সমর্থন লাভ করা যায়?

একটি রাষ্ট্রের সহিত আর একটি রাষ্ট্রের সম্বন্ধ কি? অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সৌহার্দ্য বজায় রাখিবার উপায় কি? এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের সংঘর্ষ হয় কেন? বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিপরীত মনোভাবই কি ইহার কারণ? এইরূপ বিপরীত মনোভাব কি কারণে ঘটে?

(৭) বিভিন্ন জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্য কি? তাহারা কি করিয়া মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারে? গুজব কি? গুজবের প্রভাব এত গভীর ও ব্যাপক কেন? যুদ্ধ হয় কেন? যুদ্ধোন্মাদনা বন্ধ করিবার উপায় কি? কোনো জাতি যুদ্ধপ্রিয় আবার অপর কোনো জাতি শান্তিপ্রিয় হয় কেন? সৈনিক কাহার হওয়া উচিত? শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় কি? স্থায়ী শান্তি অথবা যুদ্ধের সম্পূর্ণ লোপ সম্ভব হয় কি?

এই জাতীয় বহু রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

(৮) তাহা ছাড়া, অস্বভাবী মানুষের বৈচিত্র্য অসীম। কি কারণে মানসিক রোগ হয় এবং উহা নিরাময় হয়? সমাজে অস্বভাবী লোকের অভাব নাই। মনোবিদ্যা উহাদের প্রতি যোগ্য মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং উহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইতে শিখায়। অস্বভাবী মনের ক্রিয়া যে অকারণে ঘটে না, উহারও যে এইরূপ কারণ থাকে যাহার উপর অস্বভাবী ব্যক্তির কোনো ক্ষমতা নাই—এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি জানা থাকিলে সমাজ-জীবন আরও সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইয়া ওঠে। তাহা ছাড়া, স্বভাবী এবং অস্বভাবী মনের মধ্যে যে কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নাই, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই যে কোনো না কোনো অস্বভাবী লক্ষণ

থাকিতে পারে এই জ্ঞান থাকিলে সমাজ-জীবনের ব্যবহার-বিনিময় আরও বোধগম্য হয়।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন নানাপ্রকার অস্বভাবী লক্ষণ দেখা যায়, সমাজের. রাষ্ট্রের বা জাতির ক্ষেত্রেও সেইরূপ দেখা যাইতে পারে। অস্বাভাবিক যোধন বৃত্তি অথবা শান্তিপ্রিয়তা যেমন ব্যক্তিমনের ভারসাম্য নষ্ট করিতে পারে, তেমন সমাজ, রাষ্ট্র বা জাতির ক্ষেত্রেও এই দুইটি বৃত্তির অসামঞ্জস্য উহাকে অস্থির অথবা উহার অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে। ইহার ফলে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হইয়া ওঠে।

মনোবিদ্যা পাঠে ব্যক্তি ও সমষ্টি মন সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞানের রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া যায়।

উপসংহার

মনোবিদ্যার উপকারিতা সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে মানুষের সমগ্র সত্তাকে পরিব্যাপ্ত করে মনোবিদ্যা। মনোবিদ্যা পাঠে (১) ব্যক্তি তাহার নিজ মনকে বুঝিতে পারে, ফলে তাহার নিজ মনের সমস্যার সমাধান করিতে পারে। (২) ব্যক্তি তাহার নিজ মনের জ্ঞানের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সমস্যার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। তাহার পারিবারিক, সামাজিক. রাষ্ট্রীয় এবং মানবিক সম্বন্ধ সুস্থ ও স্বাভাবিক হইতে পারে মনোবিদ্যার সাহায্যে। তাহা ছাড়া, (৩) শিশুর লালন পালন, শিক্ষা, প্রভৃতি সামাজিক কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে মনোবিদ্যায় জ্ঞান থাকিলে। (৪) কর্মসংস্থান. উপজীবিকা, মনোরোগ, প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে সাহায্য করে মনোবিদ্যা। (৫) বিভিন্ন জাতির মন মনোবিদ্যা সাহায্যে জানা যাইতে পারে—যুদ্ধ, শান্তি প্রভৃতি জাতীয় সমস্যাগুলি মনোবিদ্যা পাঠে বুঝা যায়। সর্বোপরি, (৬) মনোবিদ্যা পাঠে মানুষের ভুল, ত্রুটি, দোষ সম্বন্ধে সহনীয়তা ও ধৈর্য আসিতে পারে এবং (৭) মন সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবার ফলে নিস্পৃহতা অথবা অপক্ষপাত দৃষ্টির বিকাশ হয়।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

সি. টি. মর্গ্যান্—ইন্‌ট্রোডাকশন্ টু সাইকলজি—পৃঃ ১৭-২২

এন্. এল্. মান্—সাইকলজি—পৃঃ ২৭

ই. বি. টিশ্‌নার্—এ টেক্সট্‌বুক্ অফ্ সাইকলজি—পৃঃ ৫৫০-৫৫২

Exercise

1. Explain the aims of studying Psychology. (pp. 82-85)
2. What are the uses of a psychological study ? (pp. 85-91)
3. What is the utility of psychological study in individual life ? (pp. 85-87)
4. What are the uses of psychological study for social life ? (pp. 87-91)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মানসজীবনের শারীর ভিত্তি

ফিজিয়লজিক্যাল্ বেসিস্ অফ্ মেণ্টাল্ লাইফ্

১। দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

অশরীরী মন মনোবিদ্যার আলোচ্য নয়। শরীরের সাহায্যে মন কিরূপ কাজ করে তাহাই ইহার আলোচ্য। কোনো মানসবৃত্তিই শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অথবা শরীরের উপর নির্ভর না করিয়া কাজ করে না। সংবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া যুক্তি বা বিচার পর্যন্ত, অনুভূতি হইতে আরম্ভ করিয়া রসবোধ পর্যন্ত এবং স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ঐচ্ছিক ক্রিয়া পর্যন্ত সকল মানসবৃত্তিরই মূল ভিত্তি হইল শরীর। যেমন রূপ সংবেদন চক্ষুর সাহায্যে ঘটে। ইথরতরঙ্গ চক্ষুর বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়া অক্ষিপটের (রেটিনা) পীতবিন্দুতে (ইয়েলো স্পট্) প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলনের ফলে উহার সন্নিহিত দর্শন নার্ভের (অপ্‌টিক্ নার্ভ্) বহিঃপ্রাপ্ত (পেরিফেরাল্ এক্সট্রিমিটি) উদ্দীপিত হয় এবং এই উদ্দীপনা নার্ভপ্রবাহের আকারে মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে (অক্সিপিট্যাল্ লোব্) বাহিত হইয়া রূপ সংবেদন উৎপন্ন করে। অনুরূপভাবে দেখানো যাইতে পারে যে প্রত্যেক মানসবৃত্তিই ঘটে শরীরের বিভিন্ন অংশগুলির সহযোগিতায়। এমন কি যুক্তি বা বিচার প্রভৃতি উচ্চতর মানস-বৃত্তিগুলিও শরীরের সাহায্যে ঘটিয়া থাকে। মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ প্রদেশ (অ্যাসোসিয়েশন্ এরিয়া) কার্যকরী না হইলে স্মৃতি, কল্পনা, ধারণা, অবধারণা, বিচার প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি সম্ভব হয় না।

২। দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের প্রমাণ

মন যে শরীরের উপর নির্ভরশীল তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

(১) নিম্নতম প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ পর্যন্ত সকল প্রাণীর নার্ভতন্ত্র তুলনামূলক ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে নার্ভতন্ত্রের ক্রম-বিকাশের সহিত মানসিক ক্রমবিকাশের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। যে প্রাণীর নার্ভতন্ত্র যত উন্নত, তাহার আচরণ বা চেষ্টিতও তত উন্নত।

(২) বিশেষ করিয়া মস্তিষ্কের ক্রমিক বিকাশের সহিত বুদ্ধির ক্রমিক বিকাশ সমান তালে অগ্রসর হয়। যেমন এমিবা, প্রটোজোয়া প্রভৃতি এক-কোষীয় জীবের (ইউনিসেলুলার অর্গ্যানিজম্) মধ্যে বুদ্ধির ক্রিয়া নাই বলিলেই চলে এবং উহাদের কোনো মস্তিষ্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। আবার বানর বা শিম্পাঞ্জী জাতীয় নরবানর প্রভৃতির বুদ্ধিবৃত্তি যেমন উন্নত, উহাদের মস্তিষ্কও তেমন উন্নত।

(৩) তাহা ছাড়া, শরীরের ওজনের অনুপাতে মস্তিষ্কের ওজনের উপরও বুদ্ধিবৃত্তি নির্ভরশীল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যথা মানুষের শরীরের ওজনের অনুপাতে যেমন তাহার মস্তিষ্কের ওজন অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা বেশী, তাহার বুদ্ধিও তেমন অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা বেশী।

(৪) অধিকন্তু মস্তিষ্কের কোনো প্রদেশ রুগ্ন বা আহত হইলে কোনো না কোনো মানসক্রিয়া ব্যাহত হয়। যথা দর্শনকেন্দ্র (বা অক্সিপিট্যাল্ লোব্) বিকল হইলে দর্শন সংবেদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অথবা ব্রোকা আবিষ্কৃত প্রদেশ ক্ষতি-গ্রস্ত হইলে বাক্‌শক্তি এবং উহার সহিত অন্যান্য অনেক শক্তি বিকল হইয়া পড়ে। মস্তিষ্ক আহত হইলে চেতনা বিলুপ্ত হয় এবং উহা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে চেতনা অব্যাহত থাকে। এই সকল যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শরীর মানসজীবনের মূল ভিত্তি।

এই যুক্তিগুলি হইতে এইরূপ বুঝিবার হেতু নাই যে শরীরই মানসজীবনের একমাত্র কারণ। মস্তিষ্ক ও চেতনার নিবিড় সম্বন্ধের ভিত্তিতে জড়বাদীরা সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে মস্তিষ্কই আসল সত্য এবং চেতনা বা মন মস্তিষ্কেরই একটি বিকার মাত্র। যকৃৎ যেমন পিত্ত নিঃসরণ করে, মস্তিষ্কও তেমন চিন্তা বা চেতনা নিঃসরণ করে। আবার কোনো জড়বাদী মনে করেন যে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণের ফলে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি হয়, মস্তিষ্কের কোষগুলির পারস্পরিক সংঘাতের (ফ্রিক্‌শন্) ফলেও চেতনা বা চিন্তার উৎপত্তি হয়।

এই জাতীয় জড়বাদ সত্য কি মিথ্যা সেই আলোচনা মনোবিদ্যায় অপ্রা-সঙ্গিক। তবে মনোবিদ্যা হয়ত মনের স্বাতন্ত্র্য বা নিজ বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিতে পারে না, কারণ অন্তর্দর্শনে মনের এই রূপ ধরা পড়ে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে জড়বাদ মন বা চেতনাকে মস্তিষ্কে বা নার্ভতন্ত্রে পরিণত করিয়া মনের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে। তাহা ছাড়া মস্তিষ্ক মনের বা চেতনার একটি আংশিক কারণ হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ কারণ নয়।

৩। নিউরোন্-এর গঠন এবং ক্রিয়া স্ট্রাকচার্ অ্যাণ্ড্ ফাংশন্ অফ্ নিউরোন্স্।)

শরীরী মনই মনোবিদ্যার বিষয়—অর্থাৎ যে মন শরীরের সাহায্যে ক্রিয়া করে তাহাই মনোবিদ্যার আলোচ্য। আবার শরীর মনের উপর ক্রিয়া করে নার্ভতন্ত্রের সাহায্যে। কাজেই মনোবিদ্যা নার্ভতন্ত্রের আলোচনা না করিয়া পারে না।

নার্ভতন্ত্রের গঠন বুঝিতে হইলে উহার মৌলিক অংশ,—অর্থাৎ নার্ভতন্ত্র যে সকল অংশ লইয়া গঠিত তাহা বুঝা প্রয়োজন। নার্ভতন্ত্র অসংখ্য নিউরোন্-এর সমষ্টি। একটি জড়পদার্থকে বিশ্লেষণ করিলে যেমন পরমাণুবাদ মতে কতগুলি ন্যূনতম বিভাজ্য পরমাণু পাওয়া যায়, তেমনই নার্ভতন্ত্রকে বিভাগ করিলে এমন কতগুলি ন্যূনতম বিভাজ্য অংশ পাওয়া যায় যাহাদের সংযোগে অথবা সমন্বয়ে সমগ্র নার্ভতন্ত্র গঠিত। নিউরোন্ নার্ভতন্ত্রের এই ন্যূনতম বিভাজ্য অংশ। অসংখ্য নিউরোন্-এর সমন্বয় বা বা সংযোগবৈচিত্র্যে নার্ভতন্ত্র গঠিত হয়। অথবা নিউরোন্ই নার্ভতন্ত্রের মৌলিক একক। অবশ্য নার্ভতন্ত্রের গঠনের দিক্ দিয়াই নিউরোন ইহার একক, কিন্তু ইহার ক্রিয়ার দিক হইতে প্রতিবর্তই নার্ভতন্ত্রের একক। অন্ততঃ দুইটি নিউরোন্ সংযুক্ত না হইলে নার্ভতন্ত্র ক্রিয়া করিতে পারে না। এইরূপ দুই বা ততোধিক নিউরোনের সমন্বয়ে যে স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া ঘটে তাহাকে প্রতিবর্ত বলে।

অনুমান করা হয় যে মানুষের নার্ভতন্ত্র অন্ততঃ এক কোটি নিউরোন্ দিয়া গঠিত। ইহারা আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র—এত ক্ষুদ্র যে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও উহাদের দেখা দুরূহ।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় নিউরোন্-এর কয়েকটি চিত্র দেওয়া হইল।

নিউরোন্-এর অংশত্রয়

সাধারণতঃ প্রত্যেক নিউরোন তিনটি অংশ লইয়া গঠিত: (১) প্রথম অংশটিকে বলে সেনট্র্যাল্ সেল বডি, বা অন্তর্মুখী **কোষ দেহ** বা নার্ভ সেল্; (২) দ্বিতীয় অংশটি হইল কোষদেহের কেন্দ্র বা **নিউক্লিয়াস্**; (৩) আবার তৃতীয় অংশটির নাম **নার্ভতন্তু** বা নার্ভ ফাইবার—ইহা কোষদেহের কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস্ হইতে উৎপন্ন হয়। এই অংশগুলি উপরের ৪ ও ৫ নং চিত্রে দেখানো হইল।

কোষদেহের অংশ

কোষদেহ বা সেল্ বডি আবার চারটি অংশে গঠিত। যথা (১) ইহার কঠিন বহিরাবরণ বা কোষপ্রাচীর বা সেল্-ওয়াল্; (২) ইহার মধ্যস্থিত তরলাকৃতি অংশ, যাহাকে বলা হয় প্রটোপ্লাজম্ বা জীবকোষ—ইহাকে অনেকটা ডিমের শ্বেতাংশ বা অ্যালবুমেন্-এর মত দেখায়; (৩) এই প্রটোপ্লাজম্-এর কেন্দ্রস্থ একটি অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত কেন্দ্রের নাম নিউক্লিয়াস্ এবং (৪) নিউক্লিয়াস্-এর মধ্যে ভাসমান ক্ষুদ্রতর অংশগুলির নাম নিউক্লিওলাই।
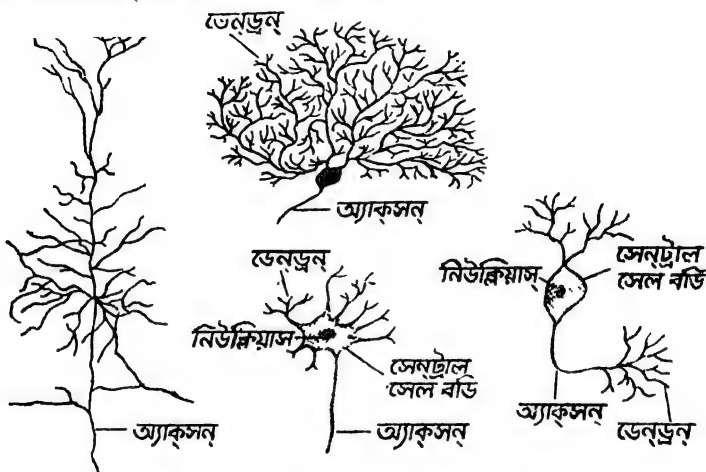
২, ৩, ৪ ও ৫নং চিত্র। ২, ৩, ৪ ও ৫নং চিত্র বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর এবং ৩নং চিত্র উপরে রহিয়াছে।

(সম্ভবতঃ **কোষদেহের কার্য** এই যে ইহা নিউরোন্-এর পুষ্টি জোগায়। কোষদেহ অসুস্থ হইলে নিউরোন্ কাজ করিতে পারে না। কোষদেহ আবার নার্ভপ্রবাহের শক্তি উৎপন্ন (ইভলভ্) করে এবং প্রয়োজন মত উহাকে বাড়াইয়া (রি-এন্ফোর্স) বা ব্যাহত করিয়া (ইন্হিবিট্) দেয়।)

নিউরোন্-এর শাখা—অ্যাক্সন্ ও ডেনড্রন্

শাখাপ্রশাখা সমন্বিত কোষদেহকে নিউরোন্ বলে। নার্ভতন্ত্র অসংখ্য নিউরোন্-এর সমষ্টি। অধিকাংশ নিউরোন্-এর দুই শ্রেণীর শাখা থাকে—যথা একটি অ্যাক্সন্ এবং একাধিক ডেনড্রন্। সকল নিউরোন্-এরই একটি করিয়া অ্যাক্সন থাকে, কিন্তু কোনো কোনো নিউরোন্-এর ডেনড্রন্ নাও থাকিতে

পারে। অ্যাক্সন কোষদেহ হইতে প্রসৃত একটি শাখা। ইহা অপেক্ষাকৃত মসৃণ, দীর্ঘ এবং প্রশাখাবিহীন।

অ্যাক্সন্-এর তুলনায় ডেন্ড্রন্ অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব বা ক্ষুদ্র, অসম এবং অধিক-সংখ্যক। কোনো কোনো অ্যাক্সন্-এর দৈর্ঘ্য কয়েক ফুট্ পর্যন্ত হইতে পারে। ডেন্ড্রনগুলি অনেকটা বৃক্ষপল্লবের মত দেখায়। অ্যাক্সন্ এবং ডেন্ড্রেন এই উভয়েরই প্রান্তসীমায় কেশের মত ব্রাশ্ থাকে—এই আকারের জন্য উহাদের প্রান্তসীমাকে প্রান্তমার্জনী বা এণ্ড্ব্রাশ্ বলে।

নিউরোন্-এর ক্রিয়াগত শ্রেণীভেদ

ক্রিয়ার (ফাংশন) দিক দিয়া নিউরোন্ প্রথমতঃ দুই শ্রেণীর হইতে পারে—যথা সংবেদীয় বা অন্তর্মুখী (সেন্সরি, এফেরেণ্ট্) এবং চেষ্টীয় বা বহির্মুখী, (মোটর, ইফেরেণ্ট)। সংবেদীয়, বা অন্তর্মুখী (এফেরেণ্ট্, সেন্সরি) নিউরোন্-এর কোষদেহ কোনো না কোনো ইন্দ্রিয়যন্ত্রের (সেন্স্ অর্গ্যান্) মধ্যে অবস্থিত। যেমন দর্শন (অপ্টিক্) নিউরোন্-এর অ্যাক্সন্ অক্ষিপটে (রেটিনা) অবস্থিত কোষদেহ হইতে বাহির হইয়া মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্রে (অক্সিপিটাল্ লোব্) পৌছিয়াছে। আবার চেষ্টীয় বা বহির্মুখী (মোটর, ইফেরেণ্ট্) নিউরোন্-এর কোষদেহ মস্তিষ্কের বা মেরুমজ্জার কোনো চেষ্টীয় কেন্দ্রে অবস্থিত। ঐ কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া উহা কোনো পেশী (মাস্ল্) অথবা গ্রন্থিতে (গ্লাণ্ড্) পৌছিয়াছে।
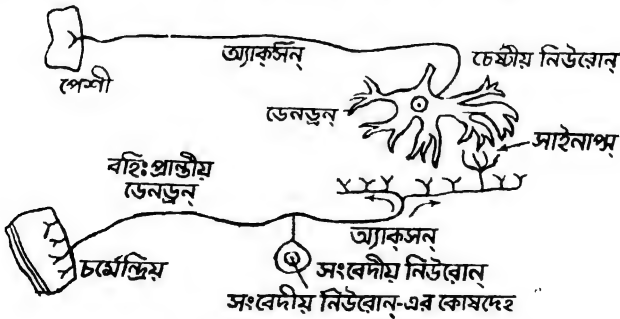
৬নং চিত্র—সংবেদনীয় এবং চেষ্টীয় নিউরোন্

৬ নং চিত্রে সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় নিউরোন্-এর নক্সা দেখানো হইয়াছে।

উপরে দেখানো হইয়াছে যে ক্রিয়ার (ফাংশন্) দিক দিয়া নিউরোন্ সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় এই দুই শ্রেণীর হইতে পারে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর অতিরিক্ত

একটি তৃতীয় শ্রেণীর নিউরোন্-ও আছে। ইহাকে সংযোজক বা কনেক্টিভ্ নিউরোন্ বলা যায়, কারণ ইহা উপরোক্ত সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় নিউরোন্-এর মধ্যে যোগ-সূত্র স্থাপন করে। সংযোজক নিউরোনগুলি কেন্দ্রীয়, কারণ ইহারা নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্রে অবস্থিত। ৫ নং চিত্রটি সংযোজক নিউরোন্-এর চিত্র।

নিউরোন্-এর গঠনগত শ্রেণীভেদ

আবার গঠনের (স্ট্রাক্চার্) দিক হইতে নিউরোন্ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা, একশাখাবিশিষ্ট (ইউনিপোলার্), দ্বিশাখাবিশিষ্ট (বাইপোলার্) এবং বহুশাখাবিশিষ্ট (মাল্টিপোলার্)। একশাখাবিশিষ্ট নিউরোন্ উহার কোষদেহ এবং উহা হইতে নিঃসৃত একটি শাখা লইয়া গঠিত। বাস্তবিকপক্ষে এই নিউরোন্ মনুষ্যদেহে দ্বিশাখাবিশিষ্ট, কারণ কোষদেহ হইতে এককভাবে নিঃসৃত হওয়া সত্ত্বেও একটু দূরে গিয়া ইহা দুই দিকে বিভক্ত হইয়া যায়। বহুশাখাবিশিষ্ট নিউরোন্-এর একটি অ্যাক্সন্ এবং একাধিক ডেন্ড্রন্ থাকে। উপরে এই দুই শ্রেণীর নিউরোন্-এর নক্সা দেওয়া হইয়াছে। যেমন, ৩, ৪, ৫ নং চিত্রগুলি বহুশাখাবিশিষ্ট (মাল্টিপোলার) এবং ৬নং চিত্র দ্বিশাখাবিশিষ্ট (বাইপোলার্) নিউরোন্-এর চিত্র।

অ্যাক্সন্ ও ডেন্ড্রন্-এর ভিন্ন ক্রিয়া

অ্যাক্সন্ ও ডেন্ড্রন্-এর ক্রিয়ায় পার্থক্য লক্ষ্য করিবার মত। ডেন্ড্রন্-এর কাজ হইল নার্ভপ্রবাহ গ্রহণ করা এবং একটু দূরে অবস্থিত কোষদেহে উহাকে প্রেরণ করা। কিন্তু অ্যাক্সন্-এর কাজ ইহার বিপরীত। ইহার কাজ হইল নার্ভপ্রবাহকে কোষদেহ হইতে দূরে, অর্থাৎ নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্রে প্রেরণ করা। অর্থাৎ, ডেন্ড্রন্ নার্ভপ্রবাহের সংগ্রাহক (রিসেপ্টর্) এবং অ্যাক্সন্ উহার নিঃসারক (ডিস্চার্জার) বা প্রেরক (ট্রান্স্মিটার)। এই বিষয়টি "নার্ভপ্রবাহের নিয়মাবলী" আলোচনা প্রসঙ্গে, এই পরিচ্ছেদের পরবর্তী অনুচ্ছেদে স্পষ্টতর হইবে।

অ্যাক্সন্-এর গঠন

অ্যাক্সন্ অথবা নার্ভতন্তু (নার্ভ ফাইবার্) সাধারণতঃ তিনটি অংশের দ্বারা গঠিত। (১) ইহার কঠিন বহিরাবরণটির নাম আদিম কোষ (প্রিমিটিভ্ বা

সোয়ান্ সীথ্ বা নিউরিলেমা)। এই কোষটি একপ্রকার শ্লেষ্মা-ঝিল্লী পদার্থ (মেম্ব্রেনাস্ সাব্স্ট্যান্স্) দ্বারা নির্মিত। (২) ইহার অন্তরাবরণটি একপ্রকার শুভ্র স্নেহ পদার্থ (ফ্যাটি ম্যাটার) দ্বারা নির্মিত। ইহাকে মধ্যস্থ আবরণ (মেডুলারি বা মায়েলিন্ সীথ্) বলে। এই দুইটি আবরণের দ্বিতীয়টি প্রথমটির দ্বারা আবৃত। (৩) ইহাদের দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে রক্ষিত কোমল সারাংশটির (কোর্) নাম অ্যাক্সিস্ সিলিণ্ডার্। ইহা জীবকোষীয় পদার্থ (প্রটোপ্লাজ্মিক্ সাব্স্ট্যান্স) দিয়া নির্মিত।

সকল প্রকার অ্যাক্সনেই যে উপরোক্ত তিনটি অংশ থাকে তাহা নয়। যেমন মেডুলেটেড্ নার্ভে সব অংশগুলিই থাকে, কিন্তু নন্-মেডুলেটেড্ নার্ভে তৃতীয় অংশটি থাকে না।

৪। নার্ভপ্রবাহের বা নিউরোন্ কার্যের নিয়মাবলী (ল'জ্ অফ্ নার্ভাস্ ইম্পাল্সেস্)

নিউরোন্ কত প্রকারের এবং ইহার ক্রিয়া কত প্রকারের তাহা পূর্ব অনুচ্ছেদে সাধারণভাবে আলোচিত হইয়াছে। নিউরোন্ কি কি নিয়মে কাজ করে তাহার আলোচনা করিলে নিউরোন্-এর শ্রেণী ও ক্রিয়াভেদ আরও স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

নিউরোন্-এর ক্রিয়াবলী কতগুলি নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। নিম্নে ইহার ক্রিয়ার প্রধান নিয়মাবলী আলোচিত হইতেছে।

(১) **উদ্দীপনশীলতা** (ইরিটেবিলিটি) নিউরোন্-এর একটি প্রধান ধর্ম। প্রত্যেক নিউরোন্ উহার যোগ্য উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপিত হয়। যেমন ইথর তরঙ্গ দর্শন নিউরোন্‌কে উদ্দীপিত করে। এই নিয়মকে উদ্দীপনশীলতার নিয়ম (ল' অফ্ ইরিটেবিলিটি) বলে।

(২) নিউরোন্ শুধু উহার যোগ্য উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপিত হইয়াই উহার কাজ শেষ করে না। উপরন্তু এই উদ্দীপনা নিউরোন্-এর মধ্য দিয়া **প্রবাহিত হয়**। এই নিয়মকে পরিবহনশীলতার নিয়ম (ল' অব্ কন্ডাক্টিভিটি) বলা হইয়া থাকে।

(৩) সাধারণতঃ উদ্দীপনা এবং পরিবহনের ফলে নিউরোন্-এর **অবসাদ** আসে, যখন কোনো উদ্দীপকই উহাকে উত্তেজিত করিতে পারে না। এই অবস্থাটিকে অবসাদ কাল (রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড্) বলে। এই অবসাদ কি

কারণে ঘটে ? অনেক শারীরবৃত্তবিৎ মনে করেন যে ইহা ঘটে প্রান্তসন্নিকর্ষের (সাইনাপ্স্) প্রতিকূলতার জন্য। বর্তমান পরিচ্ছেদের পঞ্চম অনুচ্ছেদে প্রান্তসন্নিকর্ষের প্রতিকূলতা আলোচিত হইবে।

আবার প্রান্তসন্নিকর্ষের সন্ধিস্থল অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে নার্ভপ্রবাহের বিলম্ব হয়। এই কালবিলম্বকে **প্রান্তসন্নিকর্ষজ বিলম্ব** (সাইনাপ্‌টিক্ ডিলে) বলা হয়।

(৪) নার্ভপ্রবাহের আর একটি প্রধান নিয়মের নাম **অগ্রে পরিবাহিত হইবার নিয়ম** (ল' অব্ ফরওয়ার্ড কন্‌ডাক্‌শন্)। নার্ভপ্রবাহের অগ্রগতি হয় নিউরোন্-এর অ্যাক্‌সন্ হইতে ডেন্‌ড্রনে, অথবা ইন্দ্রিয়যন্ত্র হইতে নার্ভতন্ত্রের কোনো কেন্দ্রে এবং ঐ কেন্দ্র হইতে কোনো পেশীতে বা গ্রন্থিতে। ইহার বিপরীতক্রমে, অর্থাৎ গ্রন্থি বা পেশী হইতে কেন্দ্রে অথবা কেন্দ্র হইতে ইন্দ্রিয়যন্ত্রে, অথবা ডেন্‌ড্রন্ হইতে অ্যাক্‌সনে নার্ভপ্রবাহ পরিচালিত হয় না। নার্ভপ্রবাহ সংবেদীয় (সেন্সরি, এফেরেণ্ট্) নার্ভের নিউরোন্ হইতে চেষ্টীয় (মোটর্, ইফেরেণ্ট্) নিউরোনে প্রবাহিত হয়, কিন্তু ইহার বিপরীত গতিতে হয় না।

এই নিয়মটিও সাইনাপ্স্-এর প্রতিকূলতা (রেজিস্ট্যান্স্) বা বাধা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে। যে নিউরোন্-পথে কোনো নার্ভপ্রবাহ পুনঃ পুনঃ পরিচালিত হইয়াছে সেই নিউরোন্-পথই ঐ নার্ভপ্রবাহের চলাচল করিবার পক্ষে নিম্নতম বাধাসঙ্কুল পথ (পাথ্ অফ্ লিস্ট্ রেজিস্ট্যান্স্) হইয়া দাঁড়ায়, কারণ সাইনাপ্স্ এই পথে নার্ভপ্রবাহকে নিম্নতম বাধা দেয়। আবার নার্ভপ্রবাহ যে নিউরোন্-পথে সর্বপ্রথম পরিচালিত হয়, ঐ পথের সাইনাপ্স্ নার্ভপ্রবাহের গতিতে সর্বোচ্চ বাধা সঞ্চার করে—সুতরাং এই নিউরোন্-পথ সর্বোচ্চ বাধাসঙ্কুল পথ (পাথ্ অফ্ গ্রেটেস্ট্ রেজিস্ট্যান্স) হইয়া দাঁড়ায়।

এই নিয়মটিকে ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ প্রদর্শিত স্নায়ু-অনুষঙ্গ নিয়ম (দি ল' অফ্ নিউর‍্যাল্ অ্যাসোসিয়েশন্) অনুসারেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

(৫) আবার যদি দুই বা ততোধিক নার্ভপ্রবাহ একযোগে একই প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে তাহা হইলে ঐ নার্ভপ্রবাহগুলি যুক্ত বা সম্মিলিত হইয়া প্রতিক্রিয়াটিকে প্রবলতর করিয়া তোলে। এই নিয়মটিকে যোগ নিয়ম (দি ল' অফ্ সামেশন্) বলা হইয়া থাকে।

(৬) একই নিউরোন্-পথে একটানাভাবে নার্ভপ্রবাহ চলিতে থাকিলে ঐ পথের সাইনাপ্স্ বা প্রান্তসন্নিকর্ষ ঐ নার্ভপ্রবাহের অগ্রগমনে বাধা দিয়া থাকে।

এই প্রতিকূলতার কারণ হয়ত পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার ফলে সাইনাপ্সে সঞ্চিত কোনো বিষাক্ত (টক্সিন্) পদার্থ। নার্ভপ্রবাহের অনুকূলতা (ফেসিলিটেশন্) এবং প্রতিকূলতা (ইন্‌হিবিশন্) এই দুইটি বিপরীত ক্রিয়াই সাইনাপ্সের ধর্ম। এই নিয়মকে অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা নিয়ম (দি ল' অব্ ফেসিলিটেশন্ অ্যাণ্ড্ ইন্‌হিবিশন্) বলা হয়।

(৭) কিন্তু যদি দুই বা ততোধিক নার্ভপ্রবাহ একযোগে বিপরীত প্রতিক্রিয়া মুখে চালিত হয় তাহা হইলে একটি অপরটিকে অবরুদ্ধ (ইন্‌হিবিট্) করে।

(৮) নিউরোন্ ক্রিয়ার আরও একটি প্রধান নিয়ম হইল পূর্ণ-বা-শূন্য নিয়ম (অল্ অর্ নান্ ল')। নিউরোন্ হয় উত্তেজিত হয়, নতুবা হয় না। উত্তেজিত হইলে নিউরোন্ পূর্ণশক্তিতে ক্রিয়াশীল হয়, কিন্তু কিছু শক্তি ব্যবহার করিয়া বাকীটুকু সঞ্চিত রাখিয়া ক্রিয়াশীল হয় না। আবার উহা উত্তেজিত না হইলে একেবারেই ক্রিয়াশীল হয় না।

৫। নার্ভপ্রবাহের প্রকৃতি
(নেচার্ অফ্ নার্ভাস্ ইম্‌পাল্‌স্)

উদ্দীপিত হইলে নিউরোন্ সক্রিয় হয়—অর্থাৎ ইহাতে নার্ভপ্রবাহ (নার্ভাস্ ইম্‌পাল্‌স্) উৎপন্ন হয়।

কিন্তু এই নার্ভপ্রবাহের প্রকৃতি কি? ইহার উৎপাদনে কোনো উদ্দীপক যে স্থূল অথবা যান্ত্রিকভাবে (মেকানিক্যাল্) নিউরোন্‌কে উদ্দীপিত করে এইরূপ মনে হয় না। যেমন দূরের বস্তু দেখিবার কালে দৃষ্ট বস্তুটি সশরীরে আসিয়া চক্ষুতে ক্রিয়া করে না।

শারীরবৃত্তবিদ্‌গণ বলেন যে নার্ভপ্রবাহের স্বরূপ আংশিকভাবে তাড়িত (ইলেকট্রিক্যাল), রাসায়নিক (কেমিক্যাল্) এবং তাপীয় (থার্ম্যাল্)। গ্যাল্‌ভানোমিটার বা তড়িৎ-পরিমাপক যন্ত্রে নার্ভপ্রবাহের তড়িৎ-ক্রিয়া ধরা পড়ে। আবার থার্মোপাইল বা তাপপরিমাপক যন্ত্রে নার্ভপ্রবাহের উদ্দীপনাকালে এবং উদ্দীপনার পর বিরামকালে উহার তাপীয় ক্রিয়া পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া নার্ভ-প্রবাহ যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় তাহাতেও সন্দেহ নাই। নার্ভফাইবার্ বা নিউরোন্-এর পরিপুষ্টি (মেটাবলিক্) ক্রিয়ার ফলে উহা সক্রিয় থাকে।

নার্ভক্রিয়াকে নার্ভপ্রবাহ (নার্ভ কারেণ্ট্ ; নার্ভ ইম্‌পাল্‌স্) বলা হয়, কারণ সম্ভবতঃ এই ক্রিয়ায় নিউরোনে তাড়িত-রাসায়নিক তরঙ্গের (ইলেক্‌ট্রো-কেমি-ক্যাল্ ওয়েভ্‌স্) সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গ খুবই মৃদু। ইহাতে নিউরোন্-এর খুবই কম শক্তি ব্যয়িত হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা পেশীকে বা নার্ভকেন্দ্রকে সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারে।

নার্ভপ্রবাহ যে পুর্ণভাবে তাড়িত নয় তাহা উহার গতিবেগ (ভেলোসিটি) দ্বারা প্রমাণিত হয়। তড়িৎপ্রবাহ আলোকের গতিতে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল ভ্রমণ করে। পক্ষান্তরে মানুষের বড় নার্ভগুলির গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১২০ মিটারের কাছাকাছি অর্থাৎ শব্দের গতিবেগ অপেক্ষা কম। তাহা ছাড়া, নার্ভপ্রবাহের জন্য অম্লজানের (অক্সিজেন্) দরকার, কারণ অম্লজানের অভাব ঘটিলে নিউরোন্ পরিবহন ক্রিয়া চালাইতে পারে না।

নার্ভগুলি সহজে ক্লান্ত হয় না। এমনও যদি হয় যে উহাদের ক্লান্তি বা অবসাদ জন্মে, তাহা হইলেও উহারা ইহাকে দ্রুত কাটাইয়া উঠিতে পারে। নার্ভপ্রবাহের তথাকথিত অবসাদ আসলে নার্ভের জন্য নয়, কিন্তু সাইন্যাপ্স্-এর প্রতিকূলতাব জন্য ঘটে।

৬। সাইনাপ্স্ বা প্রান্তসন্নিকর্ষ

মেরুমজ্জাবিশিষ্ট প্রাণীর নার্ভপ্রবাহ সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়যন্ত্র (রিসেপ্টর্ সেন্স অর্গ্যান্) হইতে সম্পাদক (এফেক্টর্) পেশী বা গ্রন্থি পর্যন্ত চক্রাংশ (আর্ক্) পরি-ভ্রমণ করে অন্ততঃ দুইটি নিউরোন্-এর মধ্য দিয়া। প্রথম এবং দ্বিতীয় নিউরোন্-এর মধ্যে একটি সংযোগস্থল না থাকিলে এই দুইটি নিউরোন্ একই চক্রাংশের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। **একটি নিউরোন্-এর শেষ প্রান্তের সহিত অপর একটি নিউরোন্-এর প্রথম প্রান্তের সংযোগ সন্ধিকে সাইনাপ্স্ বা প্রান্তসন্নিকর্ষ** বলে। অবশ্য এই সন্ধিস্থানে নিউরোন্ দুইটির কোনো স্থূল সংস্পর্শ ঘটে কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু স্থূল সংস্পর্শ ঘটুক বা না ঘটুক, এই সন্ধিস্থলে যে একটি নিউরোন্-এর মধ্য দিয়া পরিচালিত নার্ভপ্রবাহ বাধা অতিক্রম করিয়া পরবর্তী নিউরোন্‌টিতে সঞ্চারিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। সাইনাপ্সে দুইটি নিউরোন্-এর কোনো গঠনাত্মক সংস্পর্শ হয় না, কিন্তু যে সংস্পর্শ হয় তাহা ক্রিয়াত্মক (ফাংশন্যাল্ কন্‌ট্যাক্ট্)।

৬ নং চিত্রে একটি চেষ্টীয় এবং একটি সংবেদীয় নিউরোন্-এর প্রান্তসন্নিকর্ষ দেখানো হইয়াছে।

প্রান্তসন্নিকর্ষ নিউরোন্-এর মত কোনো স্থূল বস্তু নয়। নিউরোন্ নষ্ট হইয়া গেলে উহার ক্ষয় প্রান্তসন্নিকর্ষকে অতিক্রম করিয়া পরবর্তী নিউরোন্-এ সংক্রামিত হয় না। প্রান্তসন্নিকর্ষ পূর্ববর্তী নিউরোন-এর অ্যাক্সন্ এবং পরবর্তী নিউরোন্-এর ডেনড্রন্-এর সান্নিধ্যস্থল। নার্ভপ্রবাহের অ্যাক্সন্ হইতে ডেনড্রনে প্রবাহপথে মধ্যবর্তী সন্ধিস্থানটিই প্রান্তসন্নিকর্ষ।

নার্ভপ্রবাহের অ্যাক্সন্ হইতে ডেনড্রনে যাত্রাপথে প্রান্তসন্নিকর্ষ উহার গতিবেগকে বাধা দিয়া থাকে। কিন্তু এই বাধার পরিমাণ বা মাত্রা অবস্থানুসারে পরিবর্তিত হইতে পারে। ইহার একটি বিশেষ ধর্ম এই যে নার্ভপ্রবাহ যতবার প্রান্তসন্নিকর্ষকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয় উহার বাধা বা প্রতিকূলতা সেই পরিমাণে কমিতে থাকে। এইরূপে নিউরোনে ঐ নার্ভপ্রবাহের একটি অবাধ বা নিম্নতম বাধা-সঙ্কুল পথ (পাথ্ অব্ লিস্ট্ রেজিস্ট্যান্স্) তৈয়ারী হয়। ঐ নিউরোন্-পথে নার্ভপ্রবাহটি যখন সর্বপ্রথম পরিচালিত হইয়াছিল, তখন উহাই ছিল ইহার পক্ষে সর্বোচ্চ বাধাসঙ্কুল পথ (পাথ্ অব্ ম্যাক্সিমাম্ রেজিস্ট্যান্স্), কারণ তখন প্রান্তসন্নিকর্ষের বাধা অতিক্রম করা উহার পক্ষে কষ্টকর ছিল।

অভ্যাস এবং ক্লান্তি বা অবসাদ

নার্ভতন্ত্রের দিক দিয়া সকল প্রকার অভ্যাস বা শিক্ষা বলিতে ইহাই বুঝায় যে প্রথমে যে নিউরোন্-পথ প্রান্তসন্নিকর্ষের প্রতিকূলতার জন্য দুর্গম ছিল তাহাই পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের জন্য প্রান্তসন্নিকর্ষের বাধা বা প্রতিকূলতা কমিয়া যাইবার ফলে সুগম হইয়া দাড়ায়। অনেকের মতে নিউরোন্-পথে পুনঃ পুনঃ নার্ভ-প্রবাহ পরিচালিত হইবার দরুণ প্রান্তসন্নিকর্ষে একপ্রকার বিষাক্ত মল (টক্সিক্ প্রডাক্ট্) সঞ্চিত হয় এবং তাহার ফলে নার্ভপ্রবাহের পক্ষে প্রান্তসন্নিকর্ষের বাধা বা প্রতিকূলতা প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া পড়ে বলিয়া ক্লান্তি বা অবসাদ (ফেটিগ্) এবং নিদ্রা উৎপন্ন হয়।

৭। নিউরোন্-এর শ্রেণীভেদ

উপরের আলোচনা হইতে তিন শ্রেণীর নিউরোন্ দেখা গিয়াছে। যথা (১) অন্তর্মুখী বা সংবেদীয় (সেন্সরি, এফেরেণ্ট্) নিউরোন্। ইহা কোনো ইন্দ্রিয়-

যন্ত্র হইতে—যেমন দর্শন সংবেদনের ক্ষেত্রে অক্ষিপট (রেটিনা) হইতে—বহির্গত হইয়া নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্রে, অর্থাৎ মস্তিষ্কে বা মেরুমজ্জায় (দর্শনের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্রে বা অক্সিপিটাল্ লোবে) পৌছায় এবং কোনো সংবেদন উৎপন্ন করে। ইহার কোষদেহ ইন্দ্রিয়যন্ত্রে অবস্থিত। (২) বহির্মুখী বা চেষ্টীয় (মোটর, ইফেরেণ্ট্) নিউরোন্। ইহা নার্ভতন্ত্রের কোনো কেন্দ্র হইতে বহির্গত হইয়া কোনো পেশীতে বা গ্রন্থিতে পৌছায় এবং পেশীর বিচলন (মুভ্মেণ্ট্) অথবা গ্রন্থির রসক্ষরণ (সিক্রিশন্) উৎপন্ন করে। এই নিউরোন্-এর কোষদেহ নার্ভ-তন্ত্রের কোনো কেন্দ্রে, যথা মস্তিষ্কে অথবা মেরুমজ্জায়, অবস্থিত। (৩) সংযোজক বা সংযোগকারী (কনেক্টিভ্) নিউরোন্। ইহা নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় নিউরোন্-এর সংযোগ সাধন করে।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর নিউরোন্ই চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ৪, ৫ ও ৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

৮। নার্ভতন্ত্রের প্রধান অংশ—(পোর্ট্স্ অফ্ দি নার্ভাস্ সিস্টেম্)

নার্ভতন্ত্র প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত।

(১) প্রথম ভাগটি হইল মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জা লইয়া—ইহারাই শরীরের মূল কেন্দ্র। (২) দ্বিতীয় ভাগটি হইল প্রান্তীয় নার্ভপুঞ্জ (পেরিফেরাল্ নার্ভস্) —এই নার্ভগুলি মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার সহিত শরীরের বিভিন্ন অংশের সংযোগ সূত্র এবং (৩) স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র—এই নার্ভগুলি যকৃৎ, হৃদয় প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিকে (ভিসার‍্যাল্ অর্গ্যান্) শরীরের মূলকেন্দ্র মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার সহিত সংযুক্ত করে।

এইবার নার্ভতন্ত্রের উপরোক্ত তিনটি প্রধান অংশের গঠন ও ক্রিয়ার আলোচনা করা যাউক।

৯। মেরুদণ্ডের গঠন—(স্ট্রাকচার্ অফ্ দি স্পাইন্যাল কর্ড্ অর্ কলাম্)

মেরুদণ্ড মলদ্বার বা বস্তিগহ্বরের (রেক্টাম্) একটু উপর হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তিষ্কের নিম্নে স্কন্ধদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। মোটের উপর ৩৩ অথবা ৩৪ খানি দণ্ডাস্থি বা কশেরুকা (ভার্টিব্রি) দ্বারা মেরুদণ্ড গঠিত। কশেরুকাগুলি একটি

আর একটির উপর সুষমভাবে সাজানো রহিয়াছে। ফলে মেরুদণ্ড একটি দণ্ডের আকার ধারণ করে, যে কারণে ইহাকে মেরুদণ্ড বলা যাইতে পারে। আবার প্রত্যেকটি দণ্ডাস্থি বা কশেরুকা সচ্ছিদ্র অথবা গহ্বরবিশিষ্ট। উহারা একটি আর একটির উপর সমভাবে স্থাপিত হওয়ার ফলে, মেরুমজ্জার নিম্নতর প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তিষ্কের অধোভাগ পর্যন্ত একটি নিরবচ্ছিন্ন ছিদ্র বা নালিকার সৃষ্টি হইয়াছে। ছিদ্র বা নালিকাটি একপ্রকার কোমল পদার্থে পরিপূর্ণ। মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত এই কোমল পদার্থকে মেরুমজ্জা (স্পাইন্যাল্ কর্ড্) বা সুষুম্নাকাণ্ড বলে। মেরুমজ্জা একটি সূত্রের মত সমস্ত মেরুদণ্ড নালিকায় ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

প্রস্থচ্ছেদ করিলে দেখা যায় যে মেরুদণ্ডে দুই প্রকার পদার্থ আছে—উহার ভিতরের অংশটি ধূসর এবং ধূসর পদার্থটিকে বেষ্টন করিয়া উহার বাহিরে যে অংশটি আছে তাহা শ্বেত। ধূসর পদার্থ নার্ভকোষগুচ্ছ (নার্ভসেল্) এবং শ্বেত-পদার্থ নার্ভসূত্রগুচ্ছ (নার্ভ-ফাইবার) দিয়া গঠিত। ধূসর পদার্থটিকে আকৃতিতে ইংরাজী এইচ্ (H) এর মত দেখায়। ধূসর এবং শ্বেত মজ্জার উপাদান হইল লসিকার (লিম্ফ্) মত একপ্রকার তরল পদার্থ। দুইটি অবনমিত অর্ধনালী (ফিসার্) বা খাঁজ দ্বারা মেরুদণ্ড দক্ষিণ ও বাম অংশে বিভক্ত। এই ফিসার্ অথবা চির দুইটিকে সম্মুখের মধ্যচির (অ্যান্টিরিয়ার মিডিয়ান্ ফিসার) এবং পশ্চাতের মধ্য খাঁজ (পস্টিরিয়ার্ মিডিয়ান্ সাল্কাস্) বলে।

উপরে সাধারণভাবে মেরুদণ্ডের গঠন আলোচিত হইয়াছে। ইহার গঠন আর একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা যাউক।

মেরুদণ্ডের পাঁচটি ভাগ আছে—যথা গ্রীবাদেশীয় (সার্ভাইক্যাল্), বক্ষদেশীয় (থোরাসিক্), কটিদেশীয় (লাম্বার্), নিম্নদেশীয় বা ত্রিকাস্থি (সেক্র্যাল্) এবং অনুত্রিকাস্থি (কক্সিক্স্)। এই পাঁচটি যথাক্রমে সাত, বার, পাঁচ, পাঁচ এবং চার বা পাঁচ খানি অস্থি বা কশেরুকা (ভার্টিব্রি) লইয়া গঠিত। তাহা হইলে মেরুদণ্ড তেত্রিশ বা চৌত্রিশখানি অস্থি লইয়া গঠিত হইয়াছে দেখা যায়। আবার প্রতি দুইটি কশেরুকার মধ্যস্থলে একটি করিয়া নমনীয় উপাস্থির চাক্তি (ডিস্ক্) থাকায় কশেরুকাগুলি মজবুত অথচ নমনীয়ভাবে সংবদ্ধ থাকে।

মেরু-নার্ভ (স্পাইন্যাল্ নার্ভ) মেরুদণ্ডের উভয় দিক হইতে বাহির হয়। মেরুদণ্ডে প্রবেশ করিবার মুখে প্রত্যেক নার্ভের দুইটি মূল বা রুট্ থাকে—একটি সম্মুখের (অ্যান্টিরিয়ার্ বা ভেন্ট্র্যাল্) এবং অপরটি পশ্চাতের (পস্টিরিয়ার্ বা

ডর্স্যাল্)। ইহাদের প্রথমটি বহির্মুখী বা চেষ্টীয় (ইফেরেণ্ট্ বা মোটর্) এবং দ্বিতীয়টি অন্তর্মুখী বা সংবেদীয় (এফেরেণ্ট্, সেন্সরি) নার্ভের উৎসমূল।
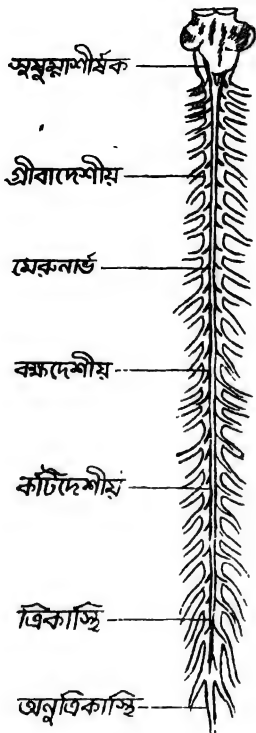
৭নং চিত্রে মেরুদণ্ডের পাঁচটি ভাগ দেখানো হইয়াছে

দেখা গেল যে প্রতিটি মেরুনার্ভ মেরুদণ্ড হইতে একটি সম্মুখ ও একটি পশ্চাৎ—এই দুইটি মূল লইয়া বাহির হইয়াছে। অথবা মেরুদণ্ডের দক্ষিণে ও বামে প্রত্যেক জোড়া কশেরুকার সংযোগস্থল হইতে মেরুনার্ভগুলি নির্গত হইয়াছে।

মেরুনার্ভগুলির সংখ্যা একত্রিশ জোড়া। মেরুদণ্ডের গ্রীবাদেশে (সার্ভাইক্যাল) আট জোড়া, বক্ষোদেশে (থোরাসিক্) বার জোড়া, কটিদেশে (লাম্বার্) পাচ জোড়া, ত্রিকাস্থি দেশে (সেক্র্যাল্) পাচ জোড়া এবং অনু-ত্রিকাস্থি দেশে (কক্সিক্স্) এক জোড়া করিয়া মেরুনার্ভ মেরুদণ্ডের দক্ষিণ ও বাম অংশে প্রবেশ করিয়াছে।

মেরুদণ্ডের শ্বেত ও ধূসর পদার্থ সম্মুখবর্তী (অ্যান্টিরিয়ার্) এবং পশ্চাদ্বর্তী (পস্টিরিয়ার্) হর্ণ দ্বারা তিন ভাগে (কলাম্) বিভক্ত হইয়াছে যথা, সম্মুখবর্তী (অ্যান্টিরিয়ার্), পার্শ্ববর্তী (ল্যাটার্যাল্) এবং পশ্চাদ্বর্তী (পস্টিরিয়র্) ভাগ। এই তিনটি ভাগের নার্ভগুলি গুচ্ছাকারে সজ্জিত হইয়া মেরুদণ্ডের অঞ্চল (ট্র্যাক্ট্) গঠিত করে—যথা ঊর্ধ্ববাহী (অ্যাসেণ্ডিং ট্র্যাক্ট্স্) অঞ্চল এবং নিম্নবাহী (ডিসেণ্ডিং ট্র্যাক্টস্) অঞ্চল।

মেরুদণ্ডের কার্য বা ফাংশন্

মেরুদণ্ডের প্রধান কাজ হইল প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (রিফ্লেক্স্ অ্যাক্‌সন্) নিয়ন্ত্রণ করা। ইহা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। তাহা ছাড়া কতগুলি শিক্ষালব্ধ ক্রিয়া যাহা অভ্যস্ত (হ্যাবিচুয়াল্) ক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে উহারাও অনেকাংশে মেরুদণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

অসংখ্য প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় মেরুদণ্ডের অন্তর্মুখী বা সংবেদীয় (এফেরেন্ট্) এবং বহির্মুখী বা চেষ্টীয় (ইফেরেন্ট্) মেরুনার্ভের সাহায্যে। চক্ষুর পাতার (আই-লিড্) স্পন্দন, কনীনিকার (আইরিস্) স্পন্দন, শরীরের ভার-সাম্য (ব্যালেন্স্) রক্ষার জন্য বিভিন্ন বিচলন, উদ্গীরণ (সোয়ালোইং), হাঁটুর ঝাঁকানি (নী-জার্ক্), পায়ের অঙ্গুলি স্পন্দন, হাঁচি প্রভৃতি যে সকল প্রতিক্রিয়া প্রধানতঃ বিপজ্জনক উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন হয় সেই সকল প্রতিক্রিয়া এবং হাঁটা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালনা প্রভৃতি যে সকল প্রতিক্রিয়া প্রথমে বা মুখ্যভাবে ঐচ্ছিক থাকে কিন্তু পুনঃপুনঃ অনুশীলনের বা শিক্ষার ফলে গৌণ-ভাবে স্বতঃক্রিয় অভ্যাসে পরিণত হয়, সেই সকল ক্রিয়ার কেন্দ্র মেরুদণ্ডে অবস্থিত।

উপরে দেখানো হইয়াছে যে প্রত্যেক মেরুনার্ভের দুইটি মূল আছে—সম্মুখের মূলটি বহির্মুখী বা চেষ্টীয় মেরুনার্ভের উৎস এবং পশ্চাতেরটি অন্তর্মুখী বা সংবেদীয় মেরুনার্ভের উৎস। একটি পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়। একটি ব্যাংএর মেরুদণ্ডের দক্ষিণাংশস্থ সম্মুখের নার্ভমূল কাটিয়া ফেলা হইল। এইবার উহার দক্ষিণ দিকের পিছনের পা উত্তেজিত করিলে উহার কোনো বিচলন হয় না, কারণ এই অবস্থায় মেরুদণ্ড হইতে পেশীর নার্ভসংযোগ ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু উহার চর্মের উত্তেজনা হইতে উৎপন্ন মেরুদণ্ডের অন্তর্মুখী বা সংবেদীয় নার্ভ-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। আবার যদি ঐ ব্যাংএর মেরুদণ্ডের বামভাগের পশ্চাদ্দেশীয় নার্ভমূল কাটিয়া ফেলা হয় তাহা হইলে দেখা যায় উহার বাম দিকের পিছনের পায়ে উত্তেজনার ফলে কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটে না।[১]

এইরূপ পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে মেরুদণ্ডের সম্মুখের নার্ভমূলগুলি বহির্মুখী বা চেষ্টীয় (মোটর্, ইফেরেন্ট্) এবং পশ্চাতের নার্ভমূলগুলি অন্তর্মুখী, সংবেদীয় (সেন্সরি, এফেরেন্ট্)।

মেরুদণ্ডের পশ্চাদংশীয় (পস্টিরিয়ার্) নার্ভগুচ্ছ স্পর্শ ও রূপের জ্ঞান মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। উহার পার্শ্ববর্তী (ল্যাটারাল্) নার্ভগুচ্ছ পেশী ও সন্ধিসমূহের বার্তা ও বেদনসংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ মস্তিষ্কে লইয়া যায় এবং মস্তিষ্কের চেষ্টীয় কেন্দ্র

১. আমাদের হস্তে অবস্থিত মেরুনার্ভের পশ্চাদ্বর্তী মূলগুলি নষ্ট হইলে হস্তের বেদনা বা স্পর্শানুভূতি লুপ্ত হয়, যদিও উহা নাড়াচাড়া বা সঞ্চালন করিবার ক্ষমতা অটুট থাকে। আবার উহার সম্মুখবর্তী মূল নষ্ট হইলে অনুভূতি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া হস্তসঞ্চালনের ক্ষমতা লোপ পায়।

(মোটর্ সেণ্টর্) হইতে চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ মেরুদণ্ডের সম্মুখ (অ্যান্টিরিয়র্) ভাগে পৌছাইয়া দেয় এবং সেখান হইতে ঐ প্রবাহ পেশীতে পৌছায়।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ও গঠন

নার্ভতন্ত্রের একটি প্রধান অংশ হইল গুরুমস্তিষ্ক (সেরিব্রাম্)। মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড মিলিত হইয়া কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র (সেন্ট্রাল্ নার্ভাস্ সিস্টেম্) গঠন করে। মেরুদণ্ডের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মস্তিষ্কের প্রধান বিভাগগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) মস্তিষ্কের প্রথম বিভাগ হইল পশ্চাদ্দেশীয় মস্তিষ্ক (হাইণ্ড্ ব্রেন্)। ইহার আবার তিনটি অংশ আছে। গ্রীবার উপরে মেরুদণ্ড ক্রমশঃ প্রশস্ত ও স্থুল হইয়া একটি পুষ্পবৃন্তের আকারে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে এবং এই বৃন্তের উপর ভর করিয়া যেন পুষ্পাকৃতি মস্তিষ্কটি বিরাজ করিতেছে। মস্তিষ্কের এই নিম্নতম পুষ্প বৃন্তাকার অংশকে আয়তমজ্জা বা সুষুম্নাশীর্ষক (মেডুলা অবলংগেটা, ব্রেন্-স্টেম্, বাল্ব্) বলে। সুষুম্নাশীর্ষকের সম্মুখে একটি বৃহৎ নলাকৃতি স্ফীতাংশ সেতুর মত আড়া-আড়িভাবে চলিয়া গিয়াছে। ইহার নাম যোজক (পন্স্)। আবার পন্স ও মেডুলা অবলংগেটার দুই পার্শ্বে এবং অধোভাগে রহিয়াছে মস্তিষ্কের আর একটি প্রধান অংশ যাহার নাম লঘুমস্তিষ্ক বা ক্ষুদ্র-মস্তিষ্ক (সেরিবেলাম্)। সেরিব্রাম্ বা মস্তিষ্কের পশ্চাতে অবস্থিত লঘু মস্তিষ্ককে খোপার মত বেণীবদ্ধ দেখায়।

(২) মস্তিষ্কের দ্বিতীয় বিভাগটি হইল মধ্যমস্তিষ্ক (মিড্-ব্রেন্)। পশ্চাদ্দেশীয় মস্তিষ্ক উপরের দিকে আরও বিস্তৃত হইয়া মধ্যমস্তিষ্ক বা মিড্-ব্রেন্-এর আকার ধারণ করিয়াছে। মানুষের মস্তিষ্কে এই অংশটি অতি ক্ষুদ্র।

মধ্য-মস্তিষ্কের নিম্নাংশে চারটি উচ্চস্থান (কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা) এবং ভিতর দিকে দুইটি অত্যন্ত মোটা তন্তুগুচ্ছ বা মস্তিষ্কের ডাঁটা (পিডাংকল্স্) আছে। এই দুইটি পিডাংকল্স্-এর মধ্যে কিছু নার্ভতন্তু আছে যাহার নাম টেগ্মেণ্টাস্। ইহার মধ্যাংশে আছে রেড্ নিউক্লিয়াস্ নামক ধূসর পদার্থ।

(৩) সম্মুখ মস্তিষ্কই (ফোর্ব্রেন্) মনুষ্য মস্তিষ্কের বৃহত্তম অংশ। ইহার পশ্চাদংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অন্তঃমস্তিষ্ক (ইণ্টার্ব্রেন্)।

অন্তঃমস্তিষ্কে রহিয়াছে বেজ্যাল্ গ্যাংলিয়া। বেজ্যাল্ গ্যাংলিয়া আবার অপ্টিক্ থ্যালামাস্, উহার নিম্নদেশে অবস্থিত হাইপো-থ্যালামাস্ এবং

দুইটি কর্পোরা স্ট্রায়েটা লইয়া গঠিত। কিন্তু অন্তঃমস্তিষ্কের প্রধান সম্মুখ অংশ হইল গুরুমস্তিষ্ক (সেরিব্রাম্)। গুরুমস্তিষ্কের আবরণকে বলে কর্টেক্স্।

৮নং চিত্র। মস্তিষ্কের ক্রিয়াঞ্চল

গুরু মস্তিষ্ক (সেরিব্রাম্) আদ্যোপান্ত দুইটি গোলকার্ধে (হেমিস্ফিয়র্) বিভক্ত। প্রত্যেক গোলকার্ধের উপরিভাগ ভাঁজে (কন্‌ভলুশন্) পূর্ণ। এই দুই গোলকার্ধের ভিতরে কর্পাস্ কলোসাম্ যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে। যোগসূত্রটি পন্‌স্-এর উপরে। মেরুদণ্ডের মত গুরুমস্তিষ্কেও ধূসর পদার্থ (গ্রে ম্যাটার) এবং শুভ্র পদার্থ (হোয়াইট্ ম্যাটার্) আছে। অবশ্য গুরুমস্তিষ্কে এই দুইটি পদার্থের সন্নিবেশ মেরুদণ্ডের বিপরীত। প্রথমটিতে উপরের অংশ ধূসর এবং ভিতরের অংশ শুভ্র পদার্থে পূর্ণ—পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টিতে উপরের অংশই শুভ্র, কিন্তু ভিতরের অংশ ধূসর পদার্থে পূর্ণ। এই বিপরীত বিন্যাসের কারণ এই যে, গুরুমস্তিষ্কের অনেক সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় নার্ভগুচ্ছ সুষুম্নাশীর্ষকে (মেডুলা অব্‌লংগেটা) পরস্পর ছেদ করিয়া মেরুদণ্ডের বিপরীত দিকে চলিয়া যায়। গুরুমস্তিষ্কের নার্ভগুচ্ছের পারস্পরিক ছেদ হেতু মেরুদণ্ডে এই দিক্ পরিবর্তনকে ডিকাসেশন্ অফ্ পিরামিড্‌স্ বলে।

গুরুমস্তিষ্কে কয়েকটি চির (ফিসার্) আছে। এই চিরগুলির মধ্যে দুইটি প্রধান—যথা সম্মুখের রোলাণ্ডো চির (ফিসার অফ্ রোলাণ্ডো) এবং পশ্চাতের পার্শ্ববর্তী (ল্যাটার‍্যাল্) সিল্‌ভিয়স্ চির (ফিসার্ অব্ সিল্‌ভিয়স্)। ফিসার্ অফ্ রোলাণ্ডোকে মধ্য চিরও (সেণ্ট্রাল্ ফিসার্) বলা হয়।

উপরোক্ত চির দুইটি গুরুমস্তিষ্ককে প্রধানতঃ চারটি অঞ্চলে (লোব্) বিভক্ত করিয়াছে। ইহাদের নাম ললাটাঞ্চল (ফ্রণ্টাল্ লোব্), রগাঞ্চল (টেম্পোর‍্যাল্

লোব্), শিরকুম্ভাঞ্চল (প্যারায়েটেল্ লোব্) এবং শিরনিম্নাঞ্চল (অক্সিপিট্যাল্ লোব্)।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ৮ নং চিত্রে এবং উহার ভাঁজ, চির এবং অঞ্চলগুলি ৯ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে।

১১। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজ বা ফাংশন্

(১) পশ্চাৎ মস্তিষ্কের (হাইণ্ড্ ব্রেন্) কাজ ঃ—

আয়তমজ্জার কাজ—পন্স্ বা যোজকের নিম্নে বড় খাঁজ (কন্‌ভলুশন্) হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুমজ্জার প্রথম গ্রীবাদেশীয় (সার্‌ভাইক্যাল্) নার্ভের উদ্গম-স্থান পর্যন্ত মস্তিষ্কের অংশকে আয়তমজ্জা বা সুষুম্নাশীর্ষক (মেডুলা অব্‌লংগেটা) বলে।

মেরুদণ্ডের পশ্চাদংশ হইতে যে সকল সংবেদীয় প্রেরণা আসে তাহা আয়ত-মজ্জার দ্বারা গৃহীত হয় এবং এই স্থান হইতে উহা গুরুমস্তিষ্কের বহিরাবরণে (কর্টেক্স্) যায়। শ্রবণযন্ত্র, করোটির চর্ম এবং মুখগহ্বরের শ্লেষ্মা ঝিল্লী হইতে অন্তর্মুখী বা সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ এইস্থানে পৌছায়। আবার এই স্থান হইতে
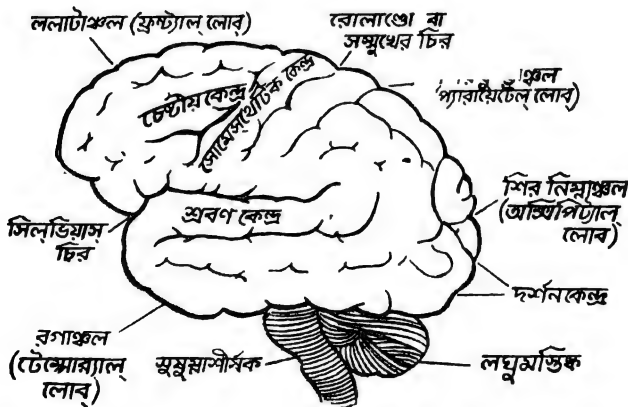
৯নং চিত্র। মস্তিষ্কের গোলকার্ধের ভাঁজ (কন্‌ভল্যুশন্), চির (ফিসার্) এবং অঞ্চল (লোব্)

বহির্মুখী বা চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ পেশীসমূহে এবং লালাগ্রন্থিতে (স্যালাইভারি গ্ল্যাণ্ড্)প্রেরিত হয়। তাহা ছাড়া দ্বিতীয় স্তরের এবং তৃতীয় স্তরের প্রতিবর্ত এই কেন্দ্র দিয়া চলাচল করে। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, মুখের পেশীগুলির মুখ-ভাব প্রকাশ, গলাধঃকরণ বা উদ্গীরণ, বমন, হাঁচি, কাশি, লালা-নিঃসরণ, পরিপাক

প্রভৃতি জৈব ক্রিয়াগুলির কেন্দ্র আয়তমজ্জায় অবস্থিত। যে সকল যন্ত্র এই ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে উহাদের সহিত আয়তমজ্জার যোগসূত্র কাটিয়া ফেলিলে ক্রিয়াগুলি বন্ধ হইয়া যায় এবং যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ থাকিলে ক্রিয়াগুলিও অটুট থাকে।

পন্‌স্ বা যোজকের কাজ—পন্‌স্-এর মধ্যে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত নার্ভগুচ্ছগুলি গুরুমস্তিষ্কের বহির্মুখী বা চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ লঘুমস্তিষ্কে (সেরিবেলাম্) পৌছায়। তাহা ছাড়া এই কেন্দ্রের মধ্য দিয়া সংবেদীয় ও চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ ইহার উপরে ও নীচে চলাচল করে।

সেরিবেলাম্ বা লঘুমস্তিষ্কের কাজ—অঙ্গবিন্যাস (পস্‌চার), দেহের ভারসাম্য (ইকুইলিব্রিয়ম্) ও সুসংবদ্ধ পেশীচালনা (কো-অর্ডিনেটেড্ মুভ্‌মেণ্ট্) এবং গতিবিধির নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র লঘুমস্তিষ্ক (সেরিবেলাম)। এই কেন্দ্র নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে হস্তপদ বিচ্ছুরণ, টলায়মানতা, অঙ্গকম্পন প্রভৃতি দেখা দেয়। এই অঙ্গের বিকৃতি ঘটিলে গতি বা বিচলন শক্তি, লিখিবার, দেখিবার, কথা বলিবার ক্ষমতা ব্যাহত হয়। যে দিকের সেরিবেলাম্ বিকৃত হয় সেই দিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকলতা (অ্যাটাক্সিয়া) জন্মে।

(২) মধ্যমস্তিষ্কের (মিড্-ব্রেন্) কাজ ঃ—

কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা এবং দুইটি সেরিব্র্যাল্ পিডাংক্‌ল্‌স্-এর মধ্যে যে টেগ্‌মেণ্টম্ নামক নার্ভতন্তু আছে উহার ভিতর দিয়া বড় বড় সংবেদীয় নার্ভতন্তু উহার উপরে অবস্থিত থ্যালামাসে উঠিয়া গিয়াছে। আবার পিডাংক্‌ল্‌স্ হইতে এফেরেণ্ট্ বা সংবেদীয় নার্ভ রেড্ নিউক্লিয়াসে পৌছিয়াছে। রেড্ নিউক্লিয়াস্ পেশীর ক্ষমতা, শ্রবণ ও অঙ্গসংস্থান ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। আবার এই কেন্দ্রের মধ্য দিয়া চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ উপর হইতে নীচে পৌছায়।

(৩) সম্মুখ মস্তিষ্কের (ফোর-ব্রেন্) কাজ ঃ—

থ্যালামাস্-এর কাজ—সম্মুখ মস্তিষ্কের একটি অংশ হইল অন্তঃমস্তিষ্ক বা থ্যালামাস্। শরীরের বিভিন্ন অংশ হইতে অন্তর্মুখী বা সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ এবং উহাদের পেশী বা গ্রন্থিতে পরিচালিত বহির্মুখী বা চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ নার্ভ-কোষের সংযোজক নিউরোন্‌গুলির সাহায্যে মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে, বিশেষতঃ কর্টেক্সে পৌছায় অথবা ঐ কেন্দ্র হইতে বহির্গত হয়। কিন্তু কর্টেক্সে এবং পেশীতেও গ্রন্থিতে পৌছিবার পূর্বে উহারা অন্তঃমস্তিষ্কের, বিশেষতঃ থ্যালামাস্-

এর মধ্য দিয়া যায়। থ্যালামাস্-এ অবস্থিত নার্ভকোষ হইতে নার্ভতন্তুসমূহ গুরুমস্তিষ্কের কর্টেক্স্-এ এবং কর্টেক্স্-এর ভিতরে অবস্থিত চেষ্টীয় বা মোটর্-কেন্দ্রগুলিতে প্রেরিত হয়।

কর্পাস্ স্ট্রায়েটাম্ বা বেজ্যাল্ গ্যাংলিয়াকে **সমন্বয় কেন্দ্র** বলা হয়, কারণ ইহার ভিতরের নার্ভকোষ চেষ্টীয় ও সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহগুলির সমন্বয় সাধন করে। কর্পাস স্ট্রায়েটামে থ্যালামাস্ হইতে অন্তর্মুখী বা সংবেদীয় (এফেরেন্ট) প্রেরণা আসে এবং বহির্মুখী বা চেষ্টীয়, (ইফেরেন্ট্) প্রেরণা হাইপো-থ্যালামাসে যায়। মানুষের মস্তিষ্কে কর্পাস্ স্ট্রায়েটাম্ আকারে ক্ষুদ্র এবং কম ক্রিয়াশীল, কিন্তু ঐচ্ছিক গতিক্রিয়া (ভলাণ্টারি মুভ্‌মেণ্ট্) ইহার দ্বারা নিয়মিত। কর্পাস্ স্ট্রায়েটাম্ বিকৃত হইলে পেশীর বিচলন ক্ষমতা ব্যাহত হয়।

থ্যালামাস্-এর নিম্নে অবস্থিত হাইপোথ্যালামাস্ পরিপাক ক্রিয়া এবং পেশীয় বা চেষ্টীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। তাহা ছাড়া ইহা অনুভূতি বা প্রক্ষোভের (ইমোশন্) একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

(৪) গুরুমস্তিষ্কের (সেরিব্রাম্) কাজ ঃ—

সেরিব্রাম্ বা গুরুমস্তিষ্ক নার্ভতন্ত্রের প্রধান এবং সর্বোচ্চ নিয়ামক কেন্দ্র। নার্ভতন্ত্রের নিম্নস্তরগুলির সহিত ইহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকিলেও গৌণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সৈন্যবাহিনীর সর্বময় কর্তা হইলেন প্রধান সেনাপতি। তিনি প্রত্যেকটি সৈনিকের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন না, অথচ তাঁহার অধস্তন কর্মচারিগণের পর্যায়ক্রমিক মধ্যস্থতায় প্রত্যেকটি সৈনিকের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেন। গুরুমস্তিষ্ক ও প্রত্যেকটি নিম্নস্থ নার্ভস্তরকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না, কিন্তু উহার অধস্তন নার্ভস্তরগুলির পর্যায়ক্রমিক সহায়তায় সর্বনিম্ন যে কোনো নার্ভক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে।

এই কারণে উড্‌ওয়ার্থ্ গুরুমস্তিষ্ককে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

গুরুমস্তিষ্ক বা সেরিব্রাম্ মনের সকল উচ্চতর বৃত্তিগুলির কেন্দ্র। ইচ্ছাশক্তি (ভলিশন্), চিন্তা, বিচারশক্তি, জ্ঞান, এমন কি উচ্চতর অনুভূতি এবং রস নিয়ন্ত্রিত হয় ইহা দ্বারা।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সেরিব্রাম্ বা গুরুমস্তিষ্কে তিন প্রকার কেন্দ্র বা অঞ্চল (সেণ্টার্, এরিয়া) আছে।

চেষ্টীয় (মোটর্) কেন্দ্র—গুরুমস্তিষ্কস্থ ফিসার্ অফ্ রোলাণ্ডো বা সম্মুখ চিরের সম্মুখে ললাটাঞ্চলে (ফ্রন্ট্যাল্ লোব্) চেষ্টীয় কেন্দ্র অবস্থিত। পায়ের আঙ্গুল হইতে আরম্ভ করিয়া হাঁটু, জঙ্ঘা, পেট, বুক, ঘাড়, কনুই, কব্জি, হাত, গলা, মুখ, ঠোঁট, জিহ্বা, স্বরনালী, চোখ, কপাল, মাথা প্রভৃতি অংশগুলির কেন্দ্র বিপরীতক্রমে এই অঞ্চলে অবস্থিত। অর্থাৎ সর্বোচ্চ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির বিচলন নিয়ন্ত্রিত হয় এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা সম্মুখাংশীয় বা নিম্নে অবস্থিত কেন্দ্রের দ্বারা এবং সর্বনিম্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির বিচলন নিয়ন্ত্রিত হয় ইহার সর্বাপেক্ষা পশ্চাদংশীয় বা উচ্চে অবস্থিত কেন্দ্রগুলির দ্বারা। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাম অঙ্গের মোটর্ কেন্দ্র দক্ষিণ সেরিব্রামে এবং দক্ষিণ অঙ্গের মোটর্ কেন্দ্র বাম সেরিব্রামে অবস্থিত। পুর্বোল্লিখিত ডিকাসেশন্ অফ্ পিরামিড্‌স্ই ইহার কারণ।

১০নং চিত্র—মস্তিষ্কের ক্রিয়াঞ্চল

১০নং চিত্রে মস্তিষ্কের উপরোক্ত ক্রিয়াঞ্চলগুলি দেখানো হইয়াছে।

ডাঃ ব্রোকা ফ্রন্ট্যাল্ প্রদেশে 'কথা বলা'র কেন্দ্র (মোটর্ স্পীচ্ সেণ্টার্) আবিষ্কার করেন। সেই কারণে এই প্রদেশকে 'ব্রোকার প্রদেশ' বলা হয়। দর্শন, শ্রবণ, মনন, লিখন ও পঠন, এই সংবেদনগুলি লইয়া বাগিন্দ্রিয় গঠিত। এই সংবেদনগুলির কেন্দ্র টেম্পোর‍্যাল্, ফ্রন্ট্যাল্, প্যারায়েটেল্ লোবে অবস্থিত। এই কেন্দ্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে অ্যাফেসিয়া বা নানাপ্রকার শব্দরোগ উৎপন্ন হয়। দর্শনকেন্দ্রে আঘাত লাগিলে লেখা অক্ষর বুঝা যায় না। আবার শ্রবণ

এবং দর্শনের মোটর্ কেন্দ্রে আঘাত লাগিলে মোটর্ অ্যাফেসিয়া ঘটে, অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণ এবং লিখন শক্তি নষ্ট হয়।

সংবেদীয় (সেন্সরি) ক্ষেত্র—রোলাণ্ডো চিরের (ফিসার্ অফ্ রোলাণ্ডো) ঠিক পশ্চাতে শিরকুন্তলাঞ্চলের (প্যারায়েটেল্ লোব্) সম্মুখে রহিয়াছে চেষ্টাবেদন (কাইনেস্থেটিক্) সংবেদন এবং স্পর্শ সংবেদনের কেন্দ্র। ইহাকে সোমাটিক্ বা সোমেস্থেটিক্ অঞ্চল বলে। দর্শন সংবেদনের কেন্দ্র সিল্ভিয়াস চিরের (ফিসার্ অফ্ সিলভিয়াস্) ঠিক নীচে—অন্তর্মস্তিষ্কের রগাঞ্চলে (টেম্পোর‍্যাল্ লোব্) অবস্থিত। আস্বাদন এবং ঘ্রাণ সংবেদনের কেন্দ্র ললাটাঞ্চলের (ফ্রণ্ট্যাল্ লোব্) পশ্চাদংশে অবস্থিত হিপ্পোক্যাম্প্যাল্ অঞ্চলে। বেদনার মস্তিষ্ক-কেন্দ্র এখনও অজ্ঞাত।

অনুষঙ্গ (অ্যাসোসিয়েশন্ এরিয়া) অঞ্চল সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত অস্পষ্ট। এই অঞ্চলের কার্য সম্বন্ধেও কোনো সঠিক জ্ঞান নাই। এই জাতীয় প্রধান প্রধান অঞ্চলের সংখ্যা চারটি। প্রথমটি ফ্রণ্ট্যাল্ লোব্-এর অধিকাংশ লইয়া গঠিত। দ্বিতীয়টি রহিয়াছে চেষ্টাবেদন, স্পর্শ, এবং দর্শন কেন্দ্রের স্থানগুলিতে প্যারায়েটেল্ লোবে। তৃতীয়টি টেম্পোর‍্যাল্ লোব্-এর অধিকাংশ লইয়া গঠিত। চতুর্থ ক্ষেত্রটি রহিয়াছে রেইল্ এলাকায় অথবা আয়ল্যাণ্ড্ অব্ রেইলে।

উপসংহার

মোটের উপর সেরিব্রাম্ বা গুরুমস্তিষ্কের কাজগুলি এই: (১) মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তিগুলির কেন্দ্রস্থল সেরিব্রাম্ বা গুরুমস্তিষ্ক। (২) সেরিব্রাম্-এর বহিরাবরণ বা কর্টেক্সে সকল প্রকার সংবেদন, অনুভূতি ও ইচ্ছামূলক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। বাগিন্দ্রিয়, কথা বলা, লেখা পড়া প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট চেষ্টীয় সংবেদনগুলির কেন্দ্র এই স্থানে অবস্থিত। (৩) শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি বা বিচলন কেন্দ্রও সেরিব্রামেই অবস্থিত। এক কথায়, জ্ঞানাত্মক, অনুভূতিমূলক এবং ইচ্ছামূলক সকল মানসক্রিয়ার মূলে রহিয়াছে সেরিব্রাম্ বা গুরুমস্তিষ্ক।

কিন্তু পৃথক্ ক্রিয়াসকল সেরিব্রাম্-এর পৃথক্ পৃথক্ কেন্দ্রগুলি দ্বারা প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হইলেও—সেরিব্রাম্-এর বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কার্য করে না, কিন্তু কার্য করে সংযুক্ত ও সমবেতভাবে। অর্থাৎ একটি ক্রিয়ায় মস্তিষ্কের একাধিক অংশ একযোগে ক্রিয়াশীল হয়। ফলে কোনো একটি কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত

হইলে উহার পাশাপাশি কেন্দ্রগুলি উহার কাজ আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার লয়।

১২। মস্তিষ্ককেন্দ্রগুলির স্থাননির্দেশ (লোক্যালাইজেশন অফ্ ব্রেন্ সেণ্টারস্)

মেরুমজ্জা ও মস্তিষ্কের উপরোক্ত কেন্দ্রনির্দেশ অথবা উহাদের ক্রিয়াস্থানগুলি নিরূপণের জন্য যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে সেইগুলি আলোচনা করা যাইতেছে :—

তুলনামূলক অথবা কম্প্যারেটিভ্ পদ্ধতি—ভ্রূণবিদ্যা পদ্ধতি (এম্‌ব্রায়োলজিক্যাল্ মেথড্) ইহার অন্তর্ভুক্ত। নার্ভতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিলে নার্ভতন্ত্রের কোন্ অংশের সহিত কোন্ ক্রিয়ার সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা বিশুদ্ধভাবে না হইলেও মোটের উপর বুঝা যাইতে পারে।

রোগিপরীক্ষামূলক (ক্লিনিক্যাল্) এবং রোগবিদ্যামূলক (প্যাথ-লজিক্যাল্) পদ্ধতি : দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন অস্বভাবী লক্ষণের সহিত নার্ভতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের অসুস্থতা বা বিকৃতি অনুসন্ধান করিয়াও উহার কেন্দ্রগুলি নিরূপণ করা যাইতে পারে।

শারীরবৃত্তীয় (ফিজিয়লজিক্যাল্) পদ্ধতি—এই পদ্ধতিটি তিন প্রকারের হইতে পারে—যথা (১) নার্ভতন্তুর উৎস সন্ধান বা ফাইবার্ ট্রেসিং প্রণালী সাহায্যে—নার্ভক্ষয় (নার্ভ ডিজেনারেশন্) গবেষণা করিয়া শারীরবৃত্তবিদেরা ঐ নার্ভের গতি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত নার্ভ-প্রান্তে শেষ হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। (২) অঙ্গব্যবচ্ছেদ (এক্সটার্‌পেশন্) প্রণালী সাহায্যে—শারীরবৃত্তবিদেরা অস্ত্রোপচারের ফলে নার্ভতন্ত্র হইতে বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া গবেষণা পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন এই ব্যবচ্ছেদের ফলে কোন্ ক্রিয়া ব্যাহত হয়। যে অংশ বিচ্ছেদের ফলে যে ক্রিয়া লুপ্ত বা বিকৃত হয় সেই অংশ সেই ক্রিয়ার কেন্দ্র।

(৩) তৃতীয় শারীরবৃত্তীয় গবেষণা প্রণালী হইল তাড়িত উদ্দীপনা (ইলেক্‌ট্রিক্যাল্ স্টিমুলেশন্)। শারীরবৃত্তীয়বিদেরা গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে মস্তিষ্কের কোনো কোনো স্থানকে বিদ্যুতের সাহায্যে উদ্দীপিত করিলে কোনো

কোনো ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে ঐ ঐ স্থানগুলি ঐ ঐ ক্রিয়াগুলির নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র।

ফ্লাউরেন্স্ প্রভৃতি শারীরবৃত্তবিৎ মনে করেন যে মস্তিষ্কের উপরি-উক্ত বিভাগগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না। তাঁহাদের মতে মস্তিষ্ক সমগ্র হিসাবে কাজ করে। ইহার অর্থ এই নয় যে প্রত্যেক কার্যে মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি অংশই একযোগে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। ইহার অর্থ এই যে মস্তিষ্কের কয়েকটি এলাকা বা অঞ্চল জুড়িয়া একটি বিস্তৃত প্যাটার্ণ্ বা নক্সা গঠিত হয়। এই প্যাটার্ণ্-এর কোনো ক্ষুদ্র অংশ বিকল হইলে উহার সন্নিহিত কোনো অংশ উহার কাজ সম্পাদন করে। কিন্তু উহার কোনো বৃহৎ অংশ ক্ষুণ্ণ হইলে কোনো সন্নিহিত অংশ উহার কাজ সম্পাদন করে না, ফলে কাজটি ব্যাহত হয়।

১৩। বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র (পেরিফেরাল্ নার্ভাস সিস্‌টেম্)

পেরিফেরাল্ নার্ভাস্ সিস্‌টেম্ বা বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র বলিতে বুঝায় মস্তিষ্কের বাহিরে বার জোড়া খুলির নার্ভ (ক্র্যানিয়াল্ নার্ভ) এবং একত্রিশ জোড়া মেরুদণ্ডীয় (স্পাইন্যাল্) নার্ভ। ইহারা মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের ভিতর হইতে উৎপন্ন হইলেও উহাদের বাহিরে নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভগুলি নিম্নলিখিত রূপ :—

ক্র্যানিয়াল্ নার্ভ	ক্রিয়া	প্রকৃতি	উৎপত্তি স্থান
১। অল্‌ফ্যাক্টরি বা ঘ্রাণীয়	ঘ্রাণেন্দ্রিয়	সংবেদীয়	নাকের অল্‌ফ্যাক্টরি বাল্ব্
২। অপ্‌টিক্ বা দর্শন	চক্ষুরিন্দ্রিয়	,,	রেটিনার গ্যাংলিয়নিক স্তর
৩। অকুলোমোটর্	,,	চেষ্টীয়	থ্যালামাস্ (ঘিলুব জাইরাস্)
৪। ট্রক্লিয়ার্	,,	,,	,, ,,
৫। ট্রাইজেমিনাল্	চক্ষু, মুখ, নাক,	,,	,, ,,
	স্পর্শ, বেদনাজ্ঞান	সংবেদীয়	,, ,,
৬। এবৃডুসেন্ট	চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পেশী	চেষ্টীয়	,, ,,

ক্র্যানিয়াল্ নার্ভ	ক্রিয়া	প্রকৃতি	উৎপত্তি স্থান
৭। ফেসিয়াল্	মুখভঙ্গী, গ্রন্থিরসক্ষরণ	চেষ্টীয়	থ্যালামাস্ (ঘিলুর জাইরাস্)
	আস্বাদন	সংবেদীয়	,, ,,
৮। অডিটারি	কর্ণেন্দ্রিয়	,,	ভেস্টিবুলার্, সেরিবেলাম্
৯। গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল্	গলাধঃকরণ, রসক্ষরণ	চেষ্টীয়	ঘিলুর জাইরাস্
	আস্বাদন	সংবেদীয়	থ্যালামাস
১০। ভেগাস্	গলাধঃকরণ, বাগিন্দ্রিয়	চেষ্টীয়	ঘিলুর জাইরাস্
	অন্ননালীর কুঞ্চন কানের	,,	,, ,,
	স্পর্শানুভূতি মাথা ও	সংবেদীয়	থ্যালামাস্
১১। অ্যাক্সেসারি	ঘাড়ের নড়নচড়ন	চেষ্টীয়	ঘিলুর জাইবাস্
১২। হাইপোগ্লস্যাল্	জিহ্বার নড়নচড়ন	,,	,, ,,

বহিঃপ্রান্তীয় মস্তিষ্ক নার্ভের তালিকা দেওয়া হইল। এই বার জোড়া মস্তিষ্কীয় বহিঃপ্রান্তিক নার্ভ ছাড়া আরও একত্রিশ জোড়া মেরুদণ্ডীয় বহিঃপ্রান্তিক নার্ভ আছে। বাহুল্যবোধে সেইগুলি দেখানো হইল না।

১৪। স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রবিভাগ ও ক্রিয়া (অটোনমিক্ নার্ভাস্ সিস্টেম্)

নার্ভতন্ত্রের তৃতীয় বিভাগ হইল স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র। স্বতন্ত্র বা স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড হইতে অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করে। সেই কারণে ইহাকে স্বতন্ত্র বা স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র বা অটোনমিক্ নার্ভাস্ সিস্টেম্ বলে।

স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত। (১) মস্তিষ্কীয় ও গ্রীবাদেশীয় (ক্র্যানিয়্যাল, সারভাইক্যাল); (২) বক্ষোদেশীয় ও কটিদেশীয় (থোরাসিকো—লাম্বার)—ইহাকেই বলা হয় সমবেদী (সিম্প্যাথেটিক্) নার্ভতন্ত্র এবং (৩) বস্তি বা ত্রিকাস্থিদেশীয় (সেক্র্যাল অটোনমিক্)।

প্রথম এবং তৃতীয় অংশ দুইটি মস্তিষ্কের নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্ব দিয়া কক্সিক্স্ পর্যন্ত প্রলম্বিত এবং সমবেদী তন্ত্রের চারিপাশে অবস্থিত। এই কারণে ইহাকে পরাসমবেদী নার্ভতন্ত্র (প্যারাসিম্প্যাথেটিক্ নার্ভাস্ সিস্টেম্) বলা হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্রের দুইটি বিভাগ—যথা, সমবেদী (সিম্প্যাথেটিক্) এবং পরাসমবেদী (প্যারাসিম্প্যাথেটিক্)।

স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র এক দিকে যেমন মেরুদণ্ডের সহিত সম্বদ্ধ, আবার তেমনই পাকস্থলী, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির (ভিসার‍্যাল্ অর্গ্যান্‌স্) সহিতও ঘনিষ্ঠ সূত্রে সম্বদ্ধ। তাহা ছাড়া গ্রন্থি (গ্ল্যাণ্ড্) ও মসৃণ পেশীর (স্মুথ্ মাস্‌ল্) ক্রিয়াও স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উপরন্তু ইহা রক্ত সরবরাহেরও (ব্লাড্ সাপ্লাই) নিয়ামক কেন্দ্র। আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির উপর ইহার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা থাকার ফলে প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশগুলিও—যেমন ক্রোধে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ বা আক্রমণ, আবার ভয়ে পলায়ন, দ্রুত বক্ষস্পন্দন প্রভৃতি—এই নার্ভতন্ত্রের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্রের মস্তিষ্কীয় এবং বস্তিদেশীয় বা ত্রিকাস্থি বিভাগকে পরাসমবেদী (প্যারাসিম্প্যাথেটিক্) নার্ভতন্ত্র বলা হয়। আবার বক্ষ এবং কটি দেশীয় (থোরাসিকো-লাম্বার্) অংশকে বলা হয় সমবেদী (সিম্প্যাথেটিক্) নার্ভতন্ত্র। ইহাদের আঙ্গিক সম্বন্ধ যেমন পৃথক, ইহাদের কার্যপ্রণালীও তেমন অনেকাংশে বিপরীত।

উর্ধ্বতন বা মস্তিষ্কীয় পরাসমবেদীয় বিভাগটি পরিপাক রস (গ্যাস্‌ট্রিক্ যুস) ক্ষরণে এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রের (ইন্‌টেস্টাইন্‌স্) ক্রিয়ার সহায়তা করিবার ফলে পরিপাক বা হজম ক্রিয়া সম্ভব হয়। আবার নিম্ন বা ত্রিকাস্থিদেশীয় বিভাগটি বস্তি (ব্লাডার্), মলনালী (রেক্টাম্) এবং যৌনযন্ত্রের সহায়তা করে।

অপর পক্ষে মধ্যদেশীয় বা সমবেদী (সিম্প্যাথেটিক্) বিভাগটি (থোরাসিকো-লাম্বার্) পরিপাক, রক্তসরবরাহ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের ক্রিয়াগুলি এবং যৌন উত্তেজনা সংযত করে। দেখা যাইতেছে উর্ধ্ব এবং অধোভাগীয় অর্থাৎ পরাসমবেদী (প্যারাসিম্প্যাথেটিক্) নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়াকে ব্যাহত করাই মধ্যভাগীয়, অর্থাৎ সমবেদী (সিম্প্যাথেটিক্) নার্ভতন্ত্রের একটি প্রধান কাজ। অনুভূতি বা প্রক্ষোভ (ইমোশন্)-প্রতিক্রিয়ার সহিত গ্রন্থির রসক্ষরণ (গ্ল্যাণ্ডুলার্ সিক্রিশন্) এবং আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির কার্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু উর্ধ্ব-অধোভাগ এবং মধ্যভাগের প্রক্ষোভ-প্রতিক্রিয়া, বিপরীতভাবে প্রকাশ পায়। যেমন সুখজনক দৈহিক প্রতিক্রিয়া, পরিপাক এবং যৌনক্রিয়া মস্তিষ্কীয় এবং বস্তিদেশীয় অথবা উর্ধ্বাধোভাগীয় পরাসমবেদী নার্ভতন্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। আবার দুঃখজনক দৈহিক প্রতিক্রিয়া, ভয় ক্রোধ প্রভৃতি অনুভূতির

প্রতিক্রিয়া বক্ষ এবং কটিদেশীয় অথবা মধ্যভাগীয় সমবেদী নার্ভতন্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অবশ্য এই বিপরীত প্রতিক্রিয়াগুলি একই সময়ে চলিতে পারে না,—যেমন একই সময়ে ক্রুদ্ধ এবং প্রেমানুরক্ত হওয়া যায় না।

১১নং চিত্রে স্বতন্ত্র নার্ভ তন্ত্রের ইঙ্গিত দেওয়া হইল।
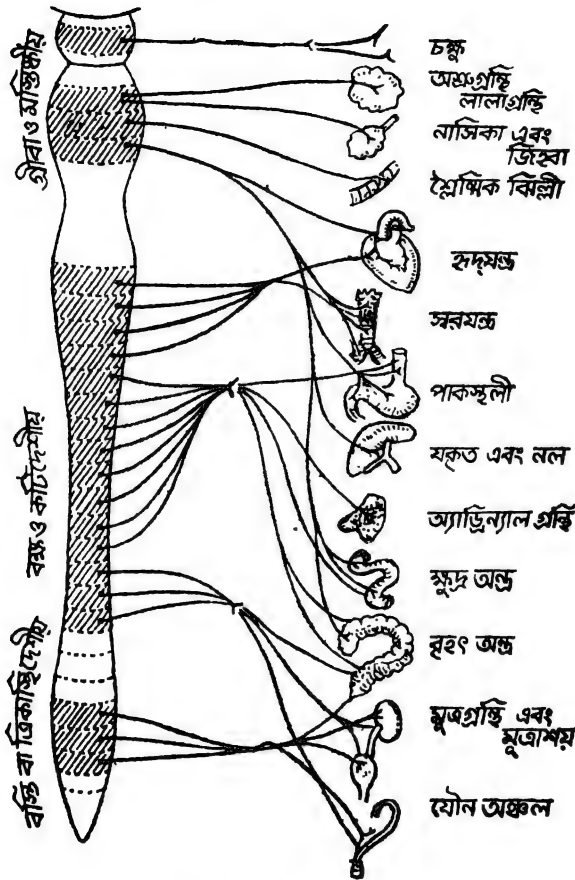
১১নং চিত্র—স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের ইঙ্গিত

১৩। পেশীর গঠন ও ক্রিয়া (স্ট্রাকচার অ্যাণ্ড্ ফাংশন্ অফ্ মাস্‌ল্‌স্)

কতগুলি তন্তু বা ফাইবার্ একত্র বা গুচ্ছবদ্ধ হইবার ফলে পেশী বা মাস্‌ল্ নির্মিত হয়।

মনুষ্যদেহে তিন-শ্রেণীর মাংসপেশী বা মাস্‌ল্ আছে। যথা, (ক) ঐচ্ছিক (ভলাণ্টারি), (খ) অনৈচ্ছিক (ইন্‌ভলাণ্টারি) এবং (গ) মিশ্রিত (মিক্স্‌ড্)। তৃতীয় শ্রেণীর পেশীকে হৃৎপিণ্ডের পেশী (কার্ডিয়াক্ মাস্‌ল্) বলা হয়।

ঐচ্ছিক পেশীগুলি রেখাঙ্কিত (স্ট্রাইপ্‌ড্ বা স্ট্রায়েটেড্)। এই পেশী চলা-ফেরা, কথা বলা প্রভৃতি ঐচ্ছিক কার্য সম্পাদনে সক্রিয় হয়।

যে সকল পেশীর ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, তাহাদের অনৈচ্ছিক (ইন্‌ভলাণ্টারি) পেশী বলে। ইহারা রেখাবিহীন (আন্‌স্ট্রাইপ্‌ড্)। কণ্ঠ, অন্ন-নালী, শ্বাস ও বায়ুনালী, পিত্তকোষ ও পিত্তনালী, মূত্রযন্ত্র, জননেন্দ্রিয়, চর্ম স্বেদগ্রন্থি প্রভৃতি যন্ত্রের মাংসপেশী এই শ্রেণীর।

হৃৎপিণ্ডের পেশী রেখাঙ্কিত অথচ অনৈচ্ছিক।

সকল পেশীই কুঞ্চনশীল। নার্ভতন্ত্র হইতে আগত চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহই পেশী সঙ্কোচনের কারণ। পেশী অত্যধিক ক্রিয়া করিলে ক্লান্ত বা অবসন্ন হইয়া পড়ে। মাংসপেশীর অত্যধিক ক্রিয়াজনিত উহার মধ্যে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হওয়ার ফলেই উহাতে অবসাদ বা ক্লান্তি উপস্থিত হয়।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল—টেক্সট্‌বুক্ অফ্ অ্যানাটমি অ্যাণ্ড্ ফিজিয়লজি —নার্ভতন্ত্র পরিচ্ছেদ
এ কাবানভ্ (অনুবাদ—ডাঃ সমর চৌধুরী)—মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ— ঐ
জি. এল্. ফ্রীম্যান্—ফিজিয়লজিক্যাল্ সাইকলজি — ঐ
এম্. কলিন্‌স্ অ্যাণ্ড্ জে. ড্রিভার—এক্সপেরিমণ্ট্যাল সাইকলজি — অ্যাপেনডিক্স্ এ
উড্‌ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস্—সাইকলজি —নার্ভতন্ত্র পরিচ্ছেদ
বোরিং, ল্যাংফেল্ড, ওয়েল্ড্—ফাউণ্ডেশন্‌স্ অফ্ সাইকলজি —দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
জি. মার্ফি —জেনারাল্ সাইকলজি—পঞ্চম এবং দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
পি স্যাণ্ডিফোর্ড —এডুকেশন্যাল্ সাইকলজি—তৃতীয় এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদ

Exercise

1. What are the evidences for an intimate relation of mind and body? (pp 93-95)
2. What is the neuron? Explain its structure by means of diagrams. (pp. 95-97)
3. What are different kinds of neuron according to its structure and function? (pp. 97-98; 103-104)
4. Explain the functions of the neuron. What are the properties of the neuron or the laws of nervous impulse? (pp. 99-101)

5. Bring out the nature of the nervous impulse. (pp. 101-102)
6. Define the synapse and explain its action. (pp. 102-103)
7. Indicate the principal parts of the nervous system. (pp 104-110 ; 119)
8 Point out the different parts of the spinal cord Explain its structure and function (pp 104-108)
9 Explain the principal parts of the brain with diagrams. (pp 108-110)
10 Explain the function of the principal parts of the brain. (pp 110-115)
11 What are the principal lobes of the brain ? Map out the different motor and sensory centres in the brain (pp 112-114)
12 On what evidences does the localisation of brain functions rest ? How are the main functions of the brain localised in it ? (pp. 115-116)
13 Give a sketch of the peripheral nervous system (pp 116-117)
14. Define what you mean by the autonomic nervous system Show its main parts and functions of these parts. (pp. 117-119)
15 Briefly sketch out the different parts of the central nervous system. (pp 104-110 , 116-119)
16 Explain the structure of a muscle What are the different kinds of muscles and their functions ? (pp. 119-120)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রিয় যন্ত্রের গঠন

স্ট্রাক্‌চার অফ্‌ সেন্‌স্‌ অর্গ্যান্‌স্‌

১। ভূমিকা

বাহ্য জগৎকে জানিবার অর্থ, বস্তুর রূপ (রং, আলোক-অন্ধকার), রস (আস্বাদন), শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি জানা। কিন্তু বাহ্যজগতের উল্লিখিত ধর্মগুলি জানিবার উপায় হইল ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলি। উপরোক্ত পাঁচটি সংবেদন যথাক্রমে চক্ষু, জিহ্বা, কর্ণ, ত্বক্‌ এবং নাসিকা এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়যন্ত্রের সাহায্যে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়যন্ত্রের গঠন না বুঝিলে উহাদের সাহায্যে উৎপন্ন সংবেদন বুঝা সম্ভব হয় না। সুতরাং সংবেদন আলোচনার ভিত্তি হিসাবে অথবা মানসজীবনের মূল অবলম্বন হিসাবে ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলির গঠন বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত।

বাহ্য জগতের সহিত মনের প্রতিক্রিয়ায় সংঘটিত মানসবৃত্তিই মনোবিদ্যার আলোচ্য। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্‌ এবং জিহ্বাই বাহ্য জগতের সহিত মনের প্রতিক্রিয়ার দ্বার। চক্ষুর সাহায্যে আমরা বাহ্য জগতের আলোক, অন্ধকার, নানা বর্ণবৈচিত্র্য, বস্তুর সামীপ্য বা দূরত্ব প্রভৃতির অত্যাবশ্যক জ্ঞান আহরণ করি। আবার কর্ণ সাহায্যে নানা শব্দবৈচিত্র্য, শরীরের ভারসাম্যবোধ প্রভৃতি জ্ঞান লাভ করিয়া এবং শব্দ শুনিয়া শব্দের উৎস কত নিকট বা দূর তাহাও বুঝিতে পারি। নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়। ঘ্রাণের সহিত আমাদের স্বাস্থ্য এবং অসুস্থতা, সুখঃদুঃখ প্রভৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আবার ত্বক্‌ সাহায্যে আমরা বাহ্যবস্তুর অবস্থান এবং স্পর্শ, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থানীয় নির্দেশ, বস্তুর সামীপ্য, দূরত্ব, আকার, ওজন প্রভৃতি বুঝিতে পারি। জিহ্বা বা রসনা আমাদিগকে স্বাদ গ্রহণের সামর্থ্য দান করে। স্বাদ গ্রহণের সহিত স্বাস্থ্য এবং অসুস্থতা, দৈহিক পুষ্টি বা ক্ষয় প্রভৃতি জড়িত।

সুতরাং ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলির কার্যকারিতা নিঃসন্দিগ্ধ। ইন্দ্রিয়গুলি কিরূপে উহাদের কার্য করে, অথবা উহাদের কোন্‌ অংশ কোন্‌ কার্য করে এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জানা দরকার ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলি কি কি অংশে গঠিত। ইন্দ্রিয়যন্ত্র নিরবয়ব বা অংশবিহীন নয়, কিন্তু নানা অংশের সমষ্টি। ইহার ক্রিয়া সম্ভব

হয় প্রত্যেকটি অংশের নিজস্ব ক্রিয়া সম্পাদনের ফলে। ইন্দ্রিয় যন্ত্রাংশের গঠন এবং উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ না বুঝিতে পারিলে, ইন্দ্রিয়যন্ত্রের কাজ বা ক্রিয়া বুঝিতে পারা যাইবে না। সুতরাং উপরোক্ত প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়যন্ত্রের গঠন জানা আবশ্যক।

২। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গঠন (স্ট্রাক্চার অফ্ দি আই)

করোটির (স্কাল্) অক্ষিগহ্বরে (আই-সকেট্) বা চক্ষুকোটরে অবস্থিত **অক্ষিগোলকই** (আই-বল্) দর্শনযন্ত্রের বাহ্য রূপ। তাহা ছাড়া অক্ষিগহ্বরে অক্ষিগোলককে অনায়াসে সঞ্চালিত করিবার জন্য রহিয়াছে **চক্ষুপেশী** (আই মাস্ল্স্)। অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগে রহিয়াছে **অক্ষিপুট বা অক্ষিপল্লব, বা চোখের পাতা** (আই-লিড্স্) যাহা ইহাকে বাহিরের অনিষ্টকর বস্তু, যেমন ধূলা, বালি, পোকা, মাকড় প্রভৃতি হইতে রক্ষা করে।

চক্ষুগোলকের উপরিস্থ কোণে রহিয়াছে **অশ্রুক্ষরণকারী গ্রন্থিগুলি** (ল্যাক্রিম্যাল্ গ্ল্যাণ্ড্স্ বা টিয়ার গ্ল্যাণ্ড্স্)। এই গ্রন্থি সর্বদা একপ্রকার তরল পদার্থ নিঃসরণ করিয়া অক্ষিগোলককে সিক্ত রাখে যাহার ফলে উহা শুষ্ক হইতে পারে না। আবার অক্ষিগোলকের ভিতরের অংশ **জলীয় পদার্থে** (অ্যাকুইয়াস্ হিউমর্) এবং **গাঢ় তরল পদার্থে** (ভিট্রিয়স্ হিউমর) পূর্ণ থাকে।

তিনটি পর্দা (স্ক্লেরোটিক, কোরয়েড, অক্ষিপট) অচ্ছোদপটল, কণীনিকা, **চক্ষুমণি, অক্ষিমুকুর, জলীয় পদার্থ, গাঢ় তরল পদার্থ, পীতাভ বিন্দু, অন্ধ বিন্দু, পেশী।**

অক্ষিগোলকের তিনটি স্তর বা পর্দা (কোট্) আছে যাহাদের দ্বারা ইহা সুরক্ষিত। (১) **বাহিরের ঘন, অস্বচ্ছ বা শ্বেত পর্দা** (স্ক্লেরোটিক্ কোট্)। এই পর্দাটি শক্ত তন্তুময় আবরণে চক্ষুগোলককে ঢাকিয়া রাখিয়া উহার গোল ভাব বজায় রাখে। এই পর্দাটি চক্ষুগোলকের সম্মুখবর্তী **অচ্ছোদপটলের** (কর্ণিয়া) সহিত মিলিত হইয়াছে। (২) শ্বেত বা স্ক্লেরোটিক্ পর্দার নীচে রহিয়াছে **মধ্যবর্তী রঙ্গীন (কোরয়েড) পর্দা।** এই পর্দাটি পাত্‌লা, কিন্তু ইহা রক্তনলীতে পূর্ণ। কোরয়েড্ অচ্ছোদপটলের পশ্চাদ্বর্তী চক্ষুতারকা বা **কণীনিকার** (আইরিস্) এবং সিলিয়ারি পেশীর সহিত সংযুক্ত। আবার কণীনিকার মধ্যস্থলে অবস্থিত রহিয়াছে **চক্ষুমণি,** বা তারারন্ধ্র (পিউপিল্)। আইরিস বা কণীনিকার সংলগ্ন সিলিয়ারী পেশীগুলির সাহায্যে আলোকের

পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য তারারন্ধ্রের সঙ্কোচন বা প্রসারণ হইয়া থাকে। কণীনিকার পশ্চাতে রহিয়াছে **অক্ষিমুকুর** (লেন্স্)। ইহাকে **সাস্‌পেন্‌সারি লিগামেণ্ট** স্বস্থানে আটকাইয়া রাখিয়াছে। লেন্স্ স্বচ্ছ এবং বাই-কন্‌ভেক্স বা উত্তল, অর্থাৎ উহা উভয়দিকেই ঠেলিয়া আছে। সিলিয়ারি প্রোসেসের সহায়তায় অক্ষিমুকুর প্রসারিত বা শ্লথ অর্থাৎ চ্যাপ্‌টা বা উত্তল আকার ধারণ করে। অচ্ছোদপটল এবং অক্ষিমুকুরের মধ্যবর্তী স্থানটি অ্যাকুইয়াস্ হিউমর্ নামক **জলীয় পদার্থে** পূর্ণ থাকে।

(৩) অক্ষিগোলকের তৃতীয় পর্দাটির নাম **অক্ষিপট (রেটিনা)**। রেটিনা হইতে **দর্শন সংবেদীয় নার্ভ** (অপ্‌টিক্ নার্ভ) বাহির হইয়া মস্তিষ্কে অবস্থিত দর্শনকেন্দ্রে (অক্সিপিটাল লোব্) পৌছিয়াছে। অক্ষিপটের (রেটিনা) ঠিক মাঝখানে এবং তারারন্ধ্রের (পিউপিল্) বিপরীত দিকে রহিয়াছে পীতাভ বিন্দু (ইয়েলো স্পট্ বা ম্যাকুলা লুটিয়া)। পীতাভ বিন্দুর কেন্দ্রবিন্দুর নাম ফোভিয়া সেণ্ট্রালিস্। ম্যাকুলা লুটিয়াই স্পষ্টতম দর্শনের অংশ। কোনো বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখিতে হইলে উহার পেশীর সাহায্যে চক্ষুর ভঙ্গী এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যাহার ফলে দর্শনীয় বস্তুটি চক্ষুর পীতাভ বিন্দুতে (ম্যাকুলা লুটিয়া) প্রতিফলিত হয়। অক্ষিপটের যে স্থান হইতে দর্শন নার্ভ (অপ্‌টিক্ নার্ভ) নির্গত হইয়াছে সেই স্থানটির নাম অন্ধ বিন্দু (ব্লাইণ্ড্ স্পট্)। এই বিন্দুটিতে আলোকের প্রতিফলন হয় না, কারণ ইহা আলোক-সংবেদনহীন।

তাহা হইলে দেখা গেল যে চক্ষুর বিভিন্ন অংশগুলি এইরূপ। প্রথমতঃ, ইহার তিনটি পর্দা (কোট্‌স্), যথা স্ক্লেরোটিক্, করয়েড ও রেটিনা ; দ্বিতীয়তঃ, অচ্ছোদপটল (কর্ণিয়া), কণীনিকা (আইরিস্), কণীনিকার কেন্দ্রস্থল অথবা তারারন্ধ্র (পিউপিল্), অক্ষিমুকুর (লেন্স্), অক্ষিপটস্থ পীতাভ বিন্দু (ম্যাকুলা লুটিয়া) এবং তন্মধ্যবর্তী ফোভিয়া সেণ্ট্রালিস্ এবং অক্ষিপটের সন্নিহিত দর্শন সংবেদীয় নার্ভ (অপ্‌টিক্ নার্ভ)।

অক্ষিগোলকের মধ্যে দুই প্রকার তরল পদার্থ রহিয়াছে—একটি অচ্ছোদ-পটল ও অক্ষিমুকুরের মধ্যবর্তী জলীয় পদার্থ (অ্যাকুইয়স্ হিউমর্) এবং অপরটি অক্ষিমুকুর এবং অক্ষিপটের মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত ঘন বা গাঢ় তরল পদার্থ (ভিট্রিয়স্ হিউমর্)

আবার অক্ষিগোলকের গতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রহিয়াছে চারটি ঋজু পেশী (রেক্টাস্) এবং দুইটি তির্যক্ পেশী (অব্‌লিক্)। প্রথম চারটি পেশীর

সাহায্যে যথাক্রমে উপরে ও নীচে, ভিতরের দিকে এবং বাহিরের দিকে অক্ষিগোলককে সঞ্চালন করা যায়। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর দুইটি পেশীর সাহায্যে চক্ষুগোলককে যথাক্রমে নীচে ও বাহিরের দিকে এবং উপরে ও বাহিরের দিকে সঞ্চালন করা যায়।

৩। অক্ষিপটের (রেটিনা) বিশেষ গঠন—দণ্ড ও শঙ্কু

অক্ষিপট অক্ষিগোলকের (আই বল্) আলোক সংবেদনপ্রবণ অংশ। আলোক-তরঙ্গ রেটিনায় প্রতিফলিত হইয়া এবং উহার সন্নিহিত দর্শন নার্ভকে (অপ্‌টিক্ নার্ভ্) উদ্দীপিত করিয়া সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহে রূপান্তরিত হয় এবং মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্রে (অক্সিপিট্যাল্ লোব্) পৌছায়।

দণ্ড ও শঙ্কু

অক্ষিপটে দশটি স্তর (লেয়ার) আছে। ইহার নবম স্তব অসংখ্য আলোক-সংবেদনশীল কোষ দ্বারা পূর্ণ। এই কোষগুলি আবার দুই শ্রেণীর, যথা দণ্ড (রড্‌স্) এবং শঙ্কু (কোন্‌স্)। শঙ্কু ও দণ্ডগুলির নামকরণ হইয়াছে উহাদের আকৃতি অনুসারে—প্রথমটির আকৃতি শঙ্কু বা চূড়ার মত এবং দ্বিতীয়টির আকৃতি দণ্ডের মত।

দণ্ড এবং শঙ্কু বিচিত্র আকারের কোষাণু। ইহারাই অক্ষিপটের আসল আলোক-সংগ্রাহক কোষ। ইহারা অক্ষিপটের বাহিরের স্তরে অবস্থিত। মধ্যবর্তী স্তরগুলিতে রহিয়াছে দ্বিমুখী এবং নার্ভগ্রন্থীয় কোষসকল (বাইপোলার অ্যাণ্ড্ গ্যাংগ্লিয়ন্ সেলস) এবং অসংখ্য সংযোগকারী নার্ভ। দণ্ড এবং শঙ্কুগুলির মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে। উহারা উভয়েই দীর্ঘ বা লম্বাকৃতি কোষ। উহাদের কোষদেহ কোষের ভিতর দিকে এবং আলোকসংবেদনশীল পদার্থ কোষের বাহিব অংশে অবস্থিত। দণ্ডগুলি নলাকৃতি এবং শঙ্কু অপেক্ষা পাতলা এবং উহাদের আলোকসংবেদনশীল রং (পিগ্‌মেণ্ট্) ভিন্ন।

দণ্ড-দৃষ্টি এবং শঙ্কু-দৃষ্টি (রড্‌ভিশন্ অ্যাণ্ড কোন্‌ভিশন্)

অক্ষিপটে অসংখ্য দণ্ড এবং শঙ্কু আছে, কিন্তু দণ্ডের সংখ্যা শঙ্কু অপেক্ষা বেশী। অক্ষিপটের বিভিন্ন অংশে ইহারা বিভিন্ন মাত্রায় বর্তমান। যেমন, ফোভিয়ায় বা অক্ষিপটের দৃষ্টিকেন্দ্রে দণ্ড নাই, শুধু ঘনসন্নিবিষ্ট শঙ্কুই আছে।

ফোভিয়া শুধু শঙ্কু দ্বারা পুর্ণ থাকায় ইহাই স্পষ্টতম দিবালোক দর্শন এবং বর্ণ সংবেদনের স্থান। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে শঙ্কু-কোষগুলিই উজ্জ্বল বা

১২নং চিত্র—অক্ষিগোলকের বিভিন্ন অংশ

১২ নং চিত্রে অক্ষিগোলকের বিভিন্ন অংশগুলি এবং ১৩নং চিত্রে দণ্ড ও শঙ্কুর গঠন পার্থক্য দেখানো হইল।
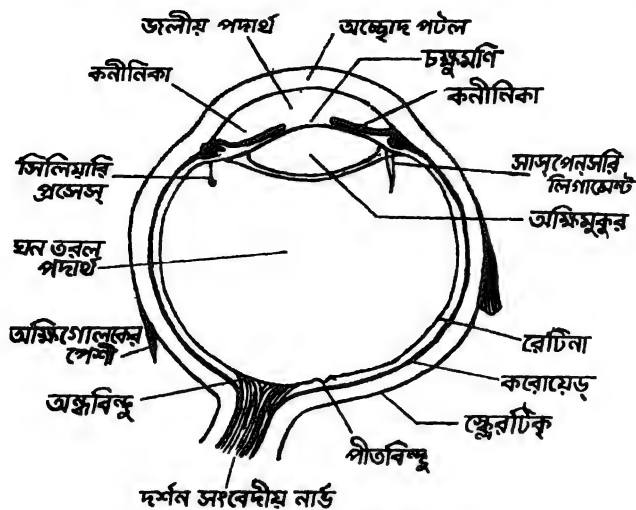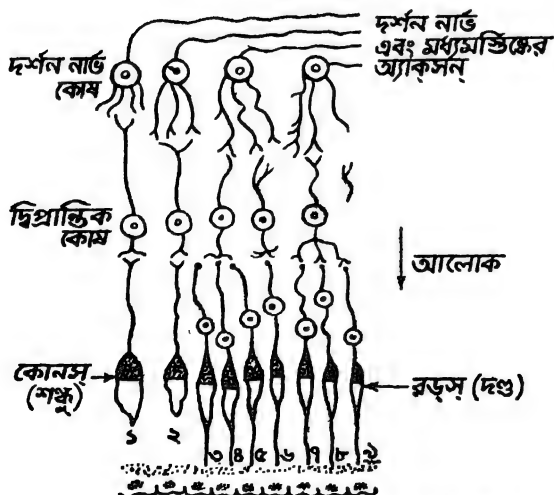
১৩নং চিত্র—দণ্ড ও শঙ্কু

১ ও ২নং রেখা দুইটি শঙ্কু এবং ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ রেখাগুলি দণ্ড

প্রখর আলোক এবং বর্ণের সংগ্রাহক যন্ত্র। ফোভিয়া হইতে যতই অক্ষিপটের বহিঃপ্রান্তে অগ্রসর হওয়া যায় এই সংবেদন দুইটি কমিবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কুর

সংখ্যাও কমিয়া যায়। পক্ষান্তরে ফোভিয়ার বাহিরে অথবা অক্ষিপটের বহিঃ-প্রান্তে দণ্ডের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। দণ্ডগুলি রাত্রির বা সাঁঝের আলোক এবং মৃদু আলোক অথবা গোধূলি-দর্শনের সহায়ক যন্ত্র। ফোভিয়ায় দণ্ড না থাকায় উহা মৃদু আলোক (টোয়াইলাইট্) দর্শনে সহায়ক হয় না। আবার অক্ষিপটের যে সকল অংশে শুধু দণ্ডই থাকে উহারা বর্ণান্ধ।

৪। কর্ণেন্দ্রিয়ের গঠন (স্ট্রাকচার্ অফ্ দি ইয়ার্)।

কর্ণ সাহায্যে শব্দ শোনা যায়। সুতরাং কর্ণকে বলা হয় শ্রবণেন্দ্রিয় (অর্গ্যান অফ্ হিয়ারিং অথবা অডিটারি অর্গ্যান্)।

প্রথমতঃ, কর্ণের **তিনটি প্রধান অংশ**—যথা বহিরংশ বা বহিঃকর্ণ (এক্স্-টারন্যাল্ ইয়ার্), মধ্যবর্তী অংশ বা মধ্যকর্ণ (মিড্ল্ ইয়ার্) এবং অন্তর্বর্তী অংশ বা অন্তঃকর্ণ (ইন্টারন্যাল্ ইয়ার্)।

বহিঃকর্ণের অংশ

বহিঃকর্ণের (এক্স্টারন্যাল্ ইয়ার্) ভাগগুলি এবং উহাদের গঠন নিম্নরূপ। বহিঃকর্ণের দুইটি অংশ, যথা **কানের পাতা** যাহা বাহিরে দেখা যায় (পিনা, অরিকল্) এবং বহিঃছিদ্র, **বহিঃকর্ণপথ** বা কর্ণছিদ্র (এক্সটারন্যাল অডিটারি মিয়েটাস, ইয়ার হোল্)। এই ছিদ্র বা পথ মধ্য কর্ণের **কর্ণপটহ** (টিম্প্যানিক্ মেম্‌ব্রেন্) পর্যন্ত গিয়াছে। কর্ণপটহ বা কানের পর্দা বহিঃকর্ণ পথকে মধ্যকর্ণ গহ্বর হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে।

মধ্যকর্ণের অংশ

মধ্যকর্ণের (মিড্ল্ ইয়ার্) অংশগুলি এবং উহাদের গঠন এইরূপ। এই কর্ণের প্রথম ভাগটি হইল **কর্ণপটহ** বা কানের পর্দা (টিম্প্যানিক্ মেম্‌ব্রেন বা ইয়ার্-ড্রাম)। ইহা স্নায়ুতন্তু (ফাইব্রাস্ টিস্যু) দিয়া তৈয়ারী এবং অল্প বাঁকা-ভাবে বসানো। কর্ণপটহের পিছনে আছে তিনটি অতি ক্ষুদ্র **কর্ণাস্থি** (ইয়ার্ বোন্স্, অসিকল্স্)। একটিকে বলা হয় হাতুড়ি অস্থি (হ্যামার্ বোন্ বা ম্যালিয়াস্) যেহেতু ইহা দেখিতে অনেকটা হাতুড়ির মত এবং ইহার কাজও বায়ুতরঙ্গকে হাতুড়ির মত আঘাত করা। দ্বিতীয় অস্থিটির নাম নেহাই অস্থি (অ্যান্‌ভিল্ বোন্ বা ইনকাস্), এবং তৃতীয়টির নাম হইল রেকাব অস্থি

(স্টিরাপ্ বোন্ বা স্টেপিস্), কারণ উহাকে দেখিতে অনেকটা ঘোড়ার জিনের পার বা রেকাবের মত। মধ্যকর্ণের ভিতরের অস্থিতে দুইটি ছিদ্র থাকে, একটি ডিম্বাকৃতি (ওভ্যাল) এবং অপরটি গোল (রাউণ্ড্)। মধ্যকর্ণের সহিত গলার সংযোগপথকে বলা হয় **ইউস্ট্যাশিয়ান্ টিউব্**।

অন্তঃকর্ণের গঠন

অন্তঃকর্ণের (ইণ্টারন্যাল্ ইয়ার্) গঠন বিশেষ জটিল। ইহা হাড় দিয়া তৈয়ারী একটি গোলক ধাঁধাঁ (ওসিয়াস্ বা বোনি ল্যাবিরিন্থ্) বিশেষ। এই হাড় বা অস্থির ব্যূহে তিনটি ভাগ আছে। মধ্যভাগের অস্থিকে বলা হয় ভেস্টি-বিউল্। ভেস্টিবিউল্-এর এক প্রান্তে রহিয়াছে তিন বার ঘুরানো অর্ধগোল খাল (সেমি-সার্কুলার্ কেনাল্) এবং অন্য প্রান্তে রহিয়াছে শম্বুকাকৃতি অংশ (কক্লিয়া)। সেমি-সার্কুলার্ কেনাল্ অর্ধবৃত্তাকার। কক্লিয়া আড়াই পাকের একটি চক্রাকৃতি (স্পাইর‍্যাল্) কাম্‌রা।

(দুইটি পাত্‌লা হাড় কক্লিয়াকে তিনটি কামরায় বিভক্ত করিয়াছে—যথা স্কেলা ভেস্টিবিউল, স্কেলা মিডিয়া এবং স্কেলা টিম্প্যানি। কক্লিয়ায় দুইটি ছিদ্র আছে—একটি ডিম্বাকৃতি যাহার নাম ফেনেস্ট্রা ওভালিস্ এবং অপরটি গোল, যাহার নাম ফেনেস্ট্রা রোটাণ্ডা। স্কেলা মিডিয়া এবং স্কেলা টিম্প্যানির মাঝখানে রহিয়াছে একটি সূক্ষ্ম কোমল পর্দা, যাহার নাম বেসিলার্ মেম্‌ব্রেন্। বেসিলার্ মেম্‌ব্রেন্ গঠিত হয় বিভিন্ন আকারের অসংখ্য তন্তু দ্বারা। ইহা একটি পাতলা ঝিল্লী এবং শ্রুতিশম্বুকনালীর (কক্লিয়া) নিম্ন হইতে শীর্ষদেশ পর্যন্ত প্রসারিত। বেসিলার্ মেম্‌ব্রেন্-এর উপর কোমল ও স্পর্শকাতর (সেন্‌সিটিভ্) চুলের শ্রেণী (হেয়ার্ সেল্‌স্) খাড়াভাবে সজ্জিত আছে। এই চুলগুলিকে বলে **অর্গ্যান্ অফ্ কর্টি**।) অর্গ্যান্ অফ্ কর্টি বা স্পর্শকাতর চুলের কোষাণুতে আছে **শ্রুতি-সংবেদীয় নার্ভের** (অ্যাকাউস্টিক্ নার্ভ) ডেন্‌ড্রন্ সকল। এই নার্ভই শব্দনার্ভ-প্রবাহকে (অডিটারি নার্ভাস্ ইম্‌পাল্‌স্) মস্তিষ্কে বহন করে।

হাড়ের (বোনি ল্যাবিরিন্থ্) চক্রব্যূহে ঝিল্লী দিয়া তৈয়ারী যে নল (টিউব্) আছে উহাকে মেম্‌ব্রেনাস্ ল্যাবিরিন্থ্ বলে। ইহার দুইটি মুখই বন্ধ থাকে। ঝিল্লী ঢাকা এই নলে পরিষ্কার তরল রস (এণ্ডোলিম্ফ্) আছে। আবার নলের ও হাড়ের খোলে লসিকারস (পেরিলিম্ফ্) আছে। এই রস

ক্ষরিত হয় ককলিয়ার মধ্যবর্তী বহু সূক্ষ্ম ধমনী, শিরা এবং লসিকাবাহী নালী-সমূহ হইতে।

মেম্‌ব্রেনাস্ ল্যাবিরিন্থ্-এর সুড়ঙ্গ মধ্যে দুইটি থলি আছে—উহাদের নাম উট্রিকল্ এবং স্যাকিউল্। উট্রিকল্-এর পিছনে আছে এণ্ডো-লিম্‌ফ্যাটিক্ ডাক্‌ট্ নামক একটি নালি। এই নালি মস্তিষ্ক কঙ্কালে প্রবেশ করিয়াছে। স্যাকিউল্-এর সহিত ককলিয়া-র যোগসূত্রকে বলা হয় কেনালিস্ রি-ইউনিয়ন্ অথবা হোন্সেন্-এর ডাক্‌ট্।

৫। সাম্য এবং মাথার অবস্থান সংবেদন (ইকুইলিব্রিয়ম্ অ্যাণ্ড্ হেড্ পজিশন্ সেন্‌স্)

কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সবগুলি অংশই শ্রবণ সংবেদনে অংশ গ্রহণ করে না। যেমন সেমি-সার্কুলার্ কেনাল্ শ্রবণ ব্যাপারে কোনো অংশ গ্রহণ করে না কিন্তু গতিসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। চলার গতি এবং নড়ন-চড়নের সমতা বিধান করার প্রেরণা বা নার্ভপ্রবাহ এই তিন বৃত্তাকার যন্ত্র হইতে উঠিয়া মেডুলা অবলংগেটা ও সেরিবেলামে যায় ও সেখানে গতিসাম্য স্থির হয়। পশুপক্ষীদের এই তিন কেনাল নষ্ট হইলে তাহাদের ঘাড় ঝুলিয়া পড়ে,
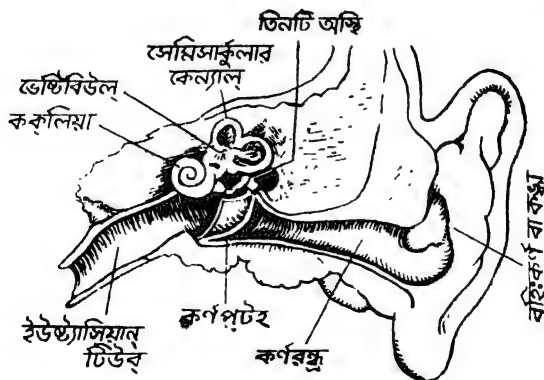
১৪নং চিত্র—কর্ণের বিভিন্ন অংশ

তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া যায় (গ্র্যাভিটি ও রোটেশন্) এবং গতিসাম্য রক্ষা করিতে পারে না। টলিয়া পড়া রোগ (ভার্টিগো) এই কেনাল-এর বিকার হইতে উৎপন্ন হয়।

মাথা ঘুরানো ও ফিরানোর ক্রিয়াও সেমি-সার্কুলার কেনাল-এর সহিত জড়িত। তিন বৃত্তাকার কেনালটি পাঁচটি নল ও ছিদ্র দ্বারা উট্রিকল্-এর সহিত যুক্ত আছে। আবার ঐ উট্রিকল্-এর সহিত স্যাকিউল্‌ও একটি নল দ্বারা সংযুক্ত। যখন মাথা একদিকে হেলানো হয় তখন সেই দিকের কানের স্যাকিউল্-এর মধ্যস্থ মিউকাস্ ও অটোলিথ্ ঝিল্লী পর্দাতে
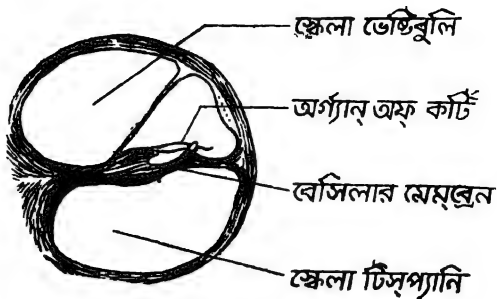
১৫নং চিত্র—কক্লিয়া-এর একটি ছেদ

টান পড়ে, অথচ অপর দিকের কানের স্যাকিউল্ নিষ্ক্রিয় থাকে। আবার মাথা সাম্‌নে অথবা পিছনে হেলাইলেও উট্রিকল্-এর ভিতরে ঐরূপ টান পড়ে। ফলে আমরা বুঝিতে পারি কোন্ দিকে মাথা হেলানো হইয়াছে অথবা মাথা কিভাবে অবস্থিত রহিয়াছে।

১৬নং চিত্র—অন্তঃকর্ণের গহ্বর

দেখা যাইতেছে কানের সেমি-সার্কিউলার কেনাল্ অংশটি শ্রবণ ব্যাপারে কোন অংশ গ্রহণ না করিলেও দেহের সাম্যবোধ এবং মস্তকের অবস্থিতিবোধ নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া সম্পাদন করে।

৬। স্পর্শেন্দ্রিয়—চর্ম—ট্যাকচুয়াল্ অর্গ্যান্

চর্মকেই স্পর্শেন্দ্রিয় বলা হয়। চর্মের দুইটি স্তর আছে। প্রথম স্তরটিকে বলা হয় উপত্বক্ (এপিডার্মিস্) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় ত্বক্ (ডার্মিস্ বা ট্রু স্কিন্)। উপত্বকের আবার দুইটি স্তর—উপরের স্তরটি কঠিন আবরণযুক্ত এবং নীচের স্তরে কোষাণু অবস্থিত।

ত্বক্ (ডার্মিস্, কিউটিস্) ঘন (কনেক্‌টিভ্) ও নমনীয় (ইলাষ্টিক্) তন্তুতে (টিস্যু) তৈয়ারী। ইহাতে রহিয়াছে অসংখ্য সূক্ষ্ম ধমনী ও শিরার জাল। তাহা ছাড়া বহু চুলের গোড়া (হেয়ার রুট্), তৈলগ্রন্থি ও ঘর্মগ্রন্থি ত্বকে অবস্থিত।

চার শ্রেণীর ত্বক্ সংবেদন—চার প্রকার সংগ্রাহক যন্ত্র

ত্বকের উদ্দীপনা হইতে চার শ্রেণীর সংবেদন উৎপন্ন হয়। যথা চাপ (প্রেসার বা টাচ্), ব্যথা (পেইন্), শৈত্য (কোল্ড্) এবং তাপ (হিট্ বা ওয়ার্ম্‌থ্)। আবার প্রত্যেকটি শ্রেণীর সংবেদন উৎপন্ন হয় ত্বকে অবস্থিত বিভিন্ন সংগ্রাহক যন্ত্রের উদ্দীপনার ফলে।

ত্বকের উদ্দীপনার ফলে উৎপন্ন এই চার শ্রেণীর সংবেদনকে একত্রভাবে স্পর্শ সংবেদনও বলা হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে স্পর্শ সংবেদনের ইন্দ্রিয় যন্ত্রগুলি ত্বকের নিম্নে অবস্থিত। যথার্থভাবে বলিতে গেলে শুধু চাপ সংবেদনই স্পর্শ সংবেদন।

চাপ সংবেদনের ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলি হইল মিস্‌নার এবং প্যাসিনি আবিষ্কৃত নার্ভ্‌প্রান্ত। ইহাদিগকে **মিস্‌নার এবং প্যাসিনি-এর কর্পাস্‌ল্‌স্** বলা হয়। এই কর্পাস্‌ল্‌স্ বা রক্তকণিকাগুলি এবং চর্মরোমের মূলে (হেয়ার রুট্‌স্) অবস্থিত নার্ভ্‌প্রান্তসকল (নার্ভ্ এণ্ডিঙ্গ্‌স্) অথবা উহাতে অবস্থিত সংগ্রাহক কোষগুলিই চাপ সংবেদনের ইন্দ্রিয়যন্ত্র।

দেহের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগে চাপবিন্দু (প্রেসার্ স্পট্‌স্) অধিক সংখ্যায় অবস্থান করে। জে. বি. ওয়াট্‌শন্ বলেন যে চর্মের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে নীচের দিকে সাতটি এবং উপর দিকে তিনশতটি পর্যন্ত গড়ে পঁচিশটি করিয়া চাপবিন্দু থাকে।

প্যাসিনিয়ান্ কর্পাস্‌ল্‌গুলি চর্ম, টেণ্ডন্, ফাসিয়া, ফুসফুস্ ও ধমনীর গাত্রে ছড়াইয়া আছে। ইহারা ডিম্বাকৃতি গ্র্যানুলার বাল্ব্, মধ্যস্থলে একটি নার্ভ্‌সূত্র এবং উহাকে ঘিরিয়া থাকে ক্যাপ্‌সুল। যদিও অঙ্গুলীর অগ্রভাগেই ইহারা অধিক সংখ্যায় বর্তমান, কিন্তু ইন্টার-ওসিয়াস্ পর্দায়, পেশীতে, মেসেণ্টারি, মিসো, কোলন্ প্রভৃতি স্থানেও ইহারা থাকে। তাহা ছাড়া চর্মের প্যাপিলিতে, জিহ্বার অগ্রভাগেও এই কোষাণু আছে। এই কোষাণু পৃষ্ঠে খুব কম থাকে।

ব্যথা সংবেদনের ইন্দ্রিয়যন্ত্র

ব্যথা সংবেদনের সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় চর্মের নানা অংশে ছড়াইয়া আছে। কতগুলি মুক্ত প্রান্তীয়-যন্ত্র (ফ্রী নার্ভ্-এণ্ডিংস্) এই সংবেদনের সংগ্রাহক। তাহা ছাড়া ত্বকের নীচে গভীর স্নায়ুসূত্রগুলিও ব্যথা সংবেদনের আংশিক ইন্দ্রিয়যন্ত্র হইতে পারে।

ব্যথা সংবেদনের মুক্ত নার্ভ্প্রান্তগুলি চর্মের বহিঃস্তর বা এপিডার্মিসে চালিত হইয়া বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই শাখাগুলি এপিডার্মিস্-এর কোষে (সেল্স্) আসিয়া শেষ হয়, আবার কখনও বা উহাদের ভিতরে প্রবিষ্ট হয়।

ব্যথাবিন্দু (পেইন্ স্পট্স্) চর্মের সর্বত্র অল্পাধিক সংখ্যায় রহিয়াছে। চর্মের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে গড়ে একশত হইতে দুইশতটি ব্যথাবিন্দু বর্তমান থাকে। অন্যান্য স্পর্শবিন্দুর—যেমন চাপ, শৈত্য, তাপ—তুলনায় ব্যথাবিন্দুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। মুখগহ্বরে ব্যথাবিন্দু নাই বলিলেই চলে, অবশ্য ওষ্ঠে, দাঁতে এবং জিহ্বাগ্রে আছে। সর্বাপেক্ষা ব্যথাকাতর হইল অচ্ছোদপটল (কর্ণিয়া)।

শৈত্য সংবেদনের ইন্দ্রিয়যন্ত্র

শৈত্য সংবেদনের সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়যন্ত্র হইল ভন্ ক্রজ্ আবিষ্কৃত প্রান্তীয় বাল্ব্গুলি (এণ্ড্-বাল্ব্)।

শৈত্যবিন্দু (কোল্ড্ স্পট্স্) দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমে ছড়াইয়া থাকে। ইহারা অনিয়মিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়—কখনও গুচ্ছ আকারে, কখনও বা বিচ্ছিন্নভাবে। দেহের সর্বত্র থাকিলেও, কপালেই ইহারা অধিক সংখ্যায় থাকে। দেহের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে শৈত্যবিন্দু থাকে গড়ে তেরোটি করিয়া।

তাপ সংবেদনের ইন্দ্রিয়যন্ত্র

তাপ সংবেদনের ইন্দ্রিয়যন্ত্র রাফিনি আবিষ্কৃত প্রান্তীয়-যন্ত্র (এণ্ড্-অর্গ্যান্) অথবা রক্তকণিকা (কর্পাস্‌ল্)। ইহারা শৈত্য সংবেদনের ইন্দ্রিয় ক্রজ্-এর প্রান্তীয় বাল্ব্গুলির তুলনায় চর্মের গভীরতম তলদেশে অবস্থিত। এই কারণে ইহাদের প্রতিক্রিয়াকাল (রিয়্যাকশ্ন্ টাইম্) শৈত্য সংবেদন অপেক্ষা অধিক।

তাপবিন্দু (হিট্ স্পট্) শৈত্যবিন্দুর তুলনায় কমসংখ্যক। চর্মের প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারে তাপবিন্দু থাকে দুইটি করিয়া। শৈত্যবিন্দুর মত তাপবিন্দুও দেহের সকল অংশে ছড়াইয়া থাকে।

স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপরোক্ত যন্ত্রগুলি ১৭ নং চিত্রে দেখানো হইল।
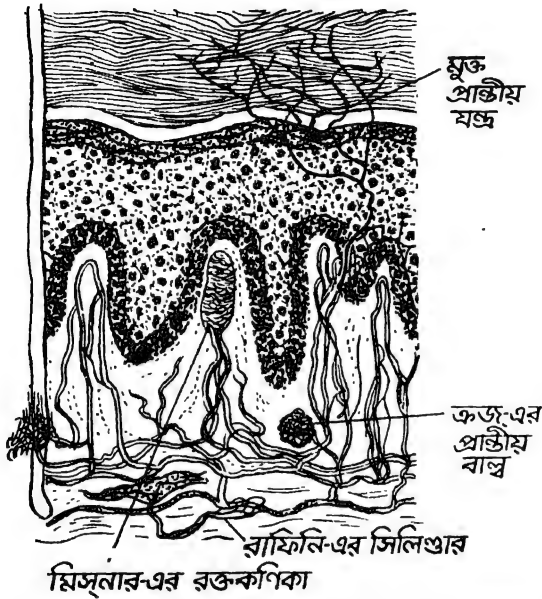
১৭নং চিত্র—স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন যন্ত্র অথবা চর্মস্থ সংবেদীয় নার্ভপ্রান্ত

৭। পেশী সংবেদনের ইন্দ্রিয়যন্ত্র

পেশী সংবেদনের ইন্দ্রিয় পেশীতে অবস্থিত ফেসিয়্যাল্ রক্তকণিকা (ফেসিয়্যাল্ কর্পাস্ল্স্) এবং পেশী দণ্ড (স্পিণ্ড্ল্স্)। রক্তকণিকাগুলি সম্ভবতঃ একপ্রকার চাপ সংবেদন উৎপন্ন করে।

পেশীর তিনটি শ্রেণীভেদ পুর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। রেখাঙ্কিত(স্ট্রাইপ্ড্) রেখাবিহীন (আন্স্ট্রাইপ্ড্, স্মুথ্) এবং মিশ্রিত পেশী যথাক্রমে কি কি কাজ করে তাহাও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

পেশী সংবেদনের সহিত টেন্ডিনাস্ এবং আর্টিকুলার সংবেদন প্রায়ই মিশ্রিত থাকে। একটি পেশীর সহিত আর একটি পেশীর অথবা অস্থির সংযোজক সূত্রকে (কনেক্টিভ্ টিস্যু) টেন্ডন্ বলে।

আবার আর্টিকুলার্ লিগামেণ্ট্স্-এ বা সন্ধিবন্ধনীতে অবস্থিত প্রান্তাঙ্গ বা এণ্ড্-অর্গ্যান্ হইতে উৎপন্ন সংবেদনকে বলে আর্টিকুলার্ বা বন্ধনী সংবেদন।

সংবেদন পরিচ্ছেদে এই সংবেদনগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮। স্বাদেন্দ্রিয়যন্ত্র
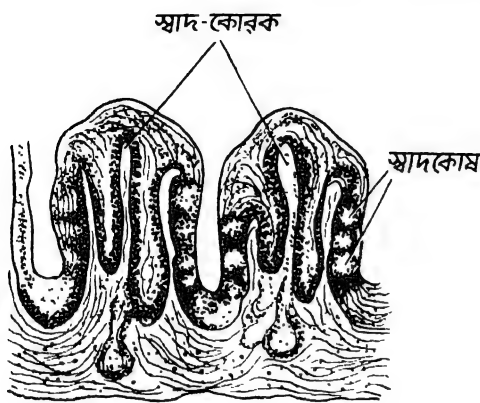
১৮নং চিত্র—স্বাদ-কোরক ও কোষ

স্বাদ সংবেদনের ইন্দ্রিয় জিহ্বার উপরিস্থিত স্বাদ-কোরক (টেইস্ট্ বাড্স্)। জিহ্বার উপর আঁচিলের মত এই কোরকগুলি বা প্যাপিলি গুচ্ছে গুচ্ছে অবস্থান করে। জিহ্বার পশ্চাতে অবস্থিত স্বাদ কোরক প্যাপিলিগুলিকে বলে সার্কাম্ভ্যালেট প্যাপিলি এবং উহার আশেপাশে অবস্থিত প্যাপিলি বা স্বাদ-কোরক-গুলিকে ফাঙ্গিফর্ম প্যাপিলি বলে। এই কোরকগুলির ভিতরে স্বাদকোষ (টেইস্ট্ বাড্স্) অবস্থিত। ইহাদের সন্নিহিত স্বাদ-নার্ভ্ (টেইস্ট নার্ভ্) উত্তেজিত হইলে এবং ঐ উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছিলেই স্বাদ সংবেদন উৎপন্ন হয়। স্বাদেন্দ্রিয়ের কোরক এবং কোষ ১৮নং চিত্রে দ্রষ্টব্য।

১৯নং চিত্র—ঘ্রাণ-কোষ

১৯নং চিত্রে ঘ্রাণকোষ দেখানো হইয়াছে

৯। ঘ্রাণেন্দ্রিয়যন্ত্র
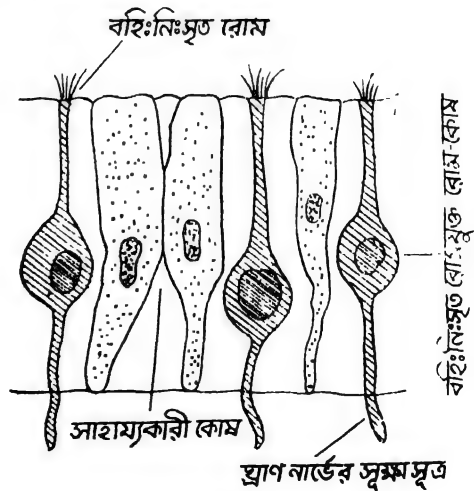
ঘ্রাণ সংবেদনের ইন্দ্রিয় স্থূলভাষায় নাসিকায় এবং আসলে নাসিকাগহ্বরের পর্দা বা ঝিল্লীর (নেজ্যাল্ মেম্ব্রেন্) উপরিভাগে অবস্থিত ঘ্রাণকোষগুলি। অল্ফ্যাক্টরি বাল্ব্ যে পর্দা বা ঝিল্লীর উপর অবস্থিত সেইটি মোটা, ইহার রং অনেকটা হল্‌দে। অল্ফ্যাক্টরি বাল্ব অথবা গন্ধকোষ প্রকৃত স্নায়ুকোষে তৈয়ারী। মস্তিষ্কের এক নম্বর নার্ভের নাম অল্ফ্যাক্টরি নার্ভ। অল্ফ্যাক্টরি নার্ভের একটি শাখার কাজ হইল মস্তিষ্কে গন্ধ বহন করা এবং আর একটি শাখার কাজ হইল সুড়সুড়ি সংবেদন (টিক্লিং সেন্সেশন্) সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়টির সহিত গন্ধ সংবেদনের কোন সম্পর্ক নাই।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

ডাঃ যতীন্দ্রনাথ গোপাল — টেক্সটবুক অফ্ অ্যানাটমি অ্যাণ্ড্ ফিজিয়লজি — ইন্দ্রিয়যন্ত্রের আলোচনাংশ
এ কারানভ (অনুবাদ ডাঃ সমর চৌধুরী) — মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ — ঐ
জি এল্ ফ্রীম্যান্ — ফিজিয়লজিক্যাল্ সাইকলজি — ঐ
ই কলিন্স্ অ্যাণ্ড জে ড্রিভার — এক্সপেরিমেন্ট্যাল সাইকলজি — অ্যাপেনডিক্স্ ঐ
উড্ওয়ার্থ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস্ — সাইকলজি — ইন্দ্রিয়যন্ত্রের আলোচনাংশ
বোরিং ল্যাঙ্ফেল্ড্, ওয়েল্ড্ — ফাউণ্ডেশন্স্ অফ্ সাইকলজি — ঐ
মার্ফি — জেনারাল সাইকলজি — ঐ
স্যাণ্ডিফোর্ড — এডুকেশন্যাল সাইকলজি — চতুর্থ পরিচ্ছেদ

Exercise

1. Explain the importance of studying the structure of the sense-organs in Psychology (pp 122-123)
2. Show with diagrams the different parts of the eye (pp 123-125, 126)
3. Point out the structure of the retina. (pp 125-127)
4. Distinguish between the structure and function of rods and cones (pp. 125-127)
5. Sketch out the different parts of the ear and explain the function of these parts. (pp 127-129)
6. Explain the structure and function of the cochlea What is the organ of corti ? (p 128)
7. What do you mean by the equilibrium sense ? Which parts of the ear govern it ? (pp 129-130)
8. Sketch out the different organs of tactual sensation. (pp. 130-133)
9. Explain briefly the organ of muscular sensation. (pp 133-134)
10. Show the different organs involved in taste and smell sensations and explain their structure. (pp. 134-135)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রতিক্রিয়া-কাল—রি-অ্যাক্‌শন্ টাইম্

প্রতিবর্ত চক্র (রিফ্লেক্স্ আর্ক্)—সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স্)

১। প্রতিক্রিয়া কাল কাহাকে বলে

উদ্দীপক (ষ্টিমুলাস্) কোনো ইন্দ্রিয়ের বহিঃপ্রান্তকে (পেরিফেরাল্ এক্স্‌ট্রিমিটি) উত্তেজিত করিলে এবং সেই উত্তেজনা নার্ভকেন্দ্রে পৌছিয়া কোনো পেশীর বিচলন বা গ্রন্থির রসক্ষরণ ঘটাইলে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ উদ্দীপক উপস্থিত হইবামাত্র প্রতিক্রিয়া ঘটে না, কিন্তু উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী কতগুলি নার্ভ্, পেশী এবং গ্রন্থিক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর প্রতিক্রিয়া ঘটে। অথবা উদ্দীপকের উপস্থিতি ও প্রতিক্রিয়া সংঘটনের মধ্যে কিছু সময়ের বা কালের ব্যবধান থাকে। **উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী এই ব্যবহিত কালকে প্রতিক্রিয়া-কাল (রি-অ্যাক্‌শন টাইম্) বলা হইয়া থাকে।**

আলোকদর্শনরূপ প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত সাহায্যে প্রতিক্রিয়াকাল বুঝা যাইতে পারে। ধরা যাউক যে একটি আলোকের উদ্দীপনা চক্ষুর বিভিন্ন অংশগুলি অতিক্রম করিয়া অক্ষিপটে (রেটিনা) প্রতিফলিত হইল। ফলে, উহার সন্নিহিত দর্শননার্ভ (অপ্‌টিক্ নার্ভ) উদ্দীপিত হইল। আবার ঐ উদ্দীপনা নার্ভ-প্রবাহরূপে (নার্ভাস্ ইমপাল্‌স্) মস্তিষ্কে অবস্থিত দর্শন-কেন্দ্রে (অক্সিপিট্যাল্ লোব্) পৌছিল। তারপর ঐ উত্তেজনা সংবেদীয় নার্ভের (এফেরেন্ট্ নার্ভ্) কেন্দ্রীয় বা মস্তিষ্ক প্রান্তের (সেনট্রাল্ এণ্ড্) নিকট অবস্থিত চেষ্টীয় নার্ভকে (ইফেরেন্ট্ নার্ভ্) উদ্দীপিত করিল এবং চেষ্টীয় নার্ভ-প্রবাহরূপে উহা চক্ষুর পেশীতে পৌছিয়া চক্ষুকে সক্রিয় করিয়া তুলিল। ফলে চক্ষু বিস্ফারিত হইল (আলোক কম হইলে) অথবা সঙ্কুচিত হইয়া (আলোক বেশী হইলে) বুজিয়া গেল। এইরূপে আলোক উদ্দীপকের ক্রিয়ায় চক্ষুর প্রসারণ বা সঙ্কোচনরূপ প্রতিক্রিয়া (রি-অ্যাক্‌শন্) ঘটিল।

উপরের উদাহরণটিতে মূল উদ্দীপক আলোক এবং উহার প্রতিক্রিয়া চক্ষু মেলিয়া যাওয়া বা বুজিয়া যাওয়া রূপ প্রতিক্রিয়ার ব্যবধানে অনেকগুলি ক্রিয়া ঘটিয়াছে। এই ক্রিয়াগুলি ঘটিতে কিছুকাল ব্যয়িত হয়। **উদ্দীপকের উপস্থিতি এবং প্রতিক্রিয়া ঘটিবার মধ্যবর্তী এই কাল-ব্যবধানকে প্রতিক্রিয়াকাল (রি-অ্যাক্‌শন্ টাইম্ বলে)।**

২। সরল ও যৌগিক প্রতিক্রিয়া-কাল (সিম্প্‌ল্ অ্যাণ্ড্ কম্পাউণ্ড্ রি-অ্যাকশন্ টাইম্)

নানারূপ প্রয়োগ (এক্স্‌পেরিমেণ্ট্) এবং অন্তর্দর্শন পদ্ধতির সাহায্যে প্রতিক্রিয়া-কালের নির্ণয়চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রতিক্রিয়াকাল প্রধানতঃ দুই প্রকার, যথা সরল প্রতিক্রিয়া-কাল (সিম্প্‌ল্ রি-অ্যাক্‌শন্ টাইম্) এবং যৌগিক বা জটিল প্রতিক্রিয়া-কাল (কম্‌পাউণ্ড্ রি-অ্যাক্‌শন্ টাইম্)। যৌগিক প্রতিক্রিয়া-কাল আবার দুই রকমের হইতে পারে, যথা নির্বাচন প্রতিক্রিয়াকাল (চয়েস্ রি-অ্যাক্‌শন্ টাইম্) এবং ভেদ প্রতিক্রিয়া-কাল (ডিস্‌ক্রিমিনেশন রি-অ্যাক্‌শন্ টাইম্)।

সরল প্রতিক্রিয়া-কাল নিরূপণের প্রণালী

সরল প্রতিক্রিয়া-কালের নিরূপণ প্রণালী এইরূপ। প্রয়োগকর্তা (এক্স্-পেরিমেণ্টার্) পাত্রকে আড়াল করিয়া একটি পর্দার পেছনে বসেন। তাঁহার নিকট হয়ত থাকে একটি সুইচ্ যাহা টিপিবামাত্র পাত্রের নিকট স্থাপিত একটি বাল্বে আলো জ্বলিয়া ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রনোস্কোপ্ বা কালপরিমাপক একটি ঘড়ির কাঁটা চলিতে থাকে। পর্দার অপর দিকে পাত্র আসন গ্রহণ করেন। ঐ আলোক দেখিবামাত্র তিনি তাঁহার নিকট স্থাপিত আর একটি সুইচ্ টিপিয়া দেন যাহার ফলে আলোকটি নিভিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির কাঁটাটিও থামিয়া যায়। প্রয়োগকর্তা এইবার ঘড়ির কাঁটার গতির দ্বারা পরিমাপিত সময়টি লিপিবদ্ধ করিয়া নেন। ক্রনোস্কোপের প্রত্যেকটি দাগের সহিত পরবর্তী দাগের ব্যবধান এক সেকেণ্ডের সহস্র অংশ বা মাইক্রোমিলিমিটার্ হিসাবে নির্ণীত হয়। এই পরীক্ষাটি হিপ্-এর ক্রনোস্কোপ্ সাহায্যে কি ভাবে করিতে হয় বলা হইল। ২০নং চিত্রে ভার্ণিয়ার ক্রনোস্কোপ্ সাহায্যে পীরক্ষার নিয়ম সংক্ষেপে বলা হইল।

যৌগিক প্রতিক্রিয়াকাল নিরূপণের প্রণালী

এইবার যৌগিক প্রতিক্রিয়াকাল কিরূপে নির্ণীত হয় তাহা দৃষ্টান্ত সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। যৌগিক প্রতিক্রিয়াকাল দুই প্রকার ; যথা—ভেদ প্রতিক্রিয়াকাল (ডিস্‌ক্রিমিনেশন্ রি-অ্যাক্‌শন্ টাইম্) এবং নির্বাচন প্রতিক্রিয়াকাল (চয়েস্ রি-অ্যাক্‌শন্ টাইম্)।
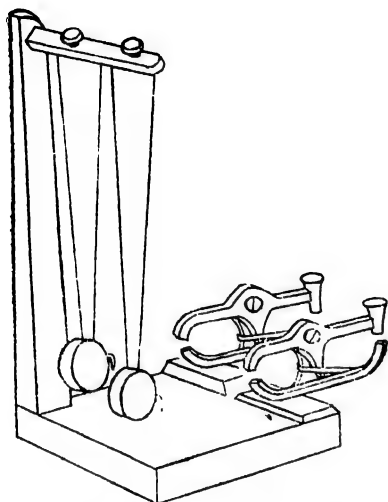
২০ নং চিত্র—ভার্ণিয়ার ক্রনোস্কোপ—ইহাতে দোলক দুইটি এবং চাবি দুইটি টিপিয়া চালাইয়া দিলে দোলক দুইটি দুলিতে থাকে। উহাদের দোলনের হার পৃথক। উহারা কতবার দুলিবার পর ঠিক পাশাপাশি দোলে তাহার সংখ্যা অনুসারে প্রতিক্রিয়া কালের হিসাব করা হয়।

ভেদ প্রতিক্রিয়াকাল এইরূপে পরীক্ষিত হয়। যেমন পাত্রকে বলা হইল যে তাহার সম্মুখে হয় লাল নতুবা নীল আলো জ্বালানো হইবে এবং শুধু লাল আলোটি দেখিলেই তিনি সুইচ টিপিবেন, কিন্তু নীল আলো দেখিলে তিনি কোন প্রতিক্রিয়া করিবেন না। এই প্রতিক্রিয়াকাল সরল নয়, কিন্তু যৌগিক, কারণ ইহাতে পাত্র যে আলো দেখিবা মাত্র প্রতিক্রিয়া করেন (যেমন সরল প্রতিক্রিয়া করিবার সময় তিনি করেন) তাহা নয়, কিন্তু একটি আলোকের সহিত আর একটি আলোকের ভেদ প্রত্যক্ষ করিয়া প্রতিক্রিয়া করেন। এই ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াটি আর সরল বা সহজ রহিল না কিন্তু যৌগিক বা জটিল হইয়া দাঁড়াইল, কারণ আলোক দেখা এবং উহাতে প্রতিক্রিয়া করিবার মধ্যবর্তী আরও একটি ক্রিয়া—অর্থাৎ আলোকটিকে অন্য একটি আলোক হইতে পৃথক রূপে বুঝিবার ক্রিয়া ঘটে।

ভেদ প্রতিক্রিয়াকাল সরল প্রতিক্রিয়াকাল অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে। ভেদ বুঝিবার কালই এই বিলম্বের কারণ। আলো দেখিবামাত্র প্রতিক্রিয়ায় যে সময় লাগে, আলোক দেখিবার পর ইহা বুঝিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে তদপেক্ষা বেশী সময় লাগে।

নির্বাচন প্রতিক্রিয়াকাল (চয়েস্ রি-অ্যাক্‌শন্ টাইম্) নিরূপণের প্রণালী এইরূপ। পাত্রকে বলা হইল তাহার সম্মুখে একটি লাল এবং আর একটি নীল আলো জ্বালানো হইবে, এবং লাল আলোটি দেখিবামাত্র ডান হাত দিয়া, আবার নীল আলোটি দেখিবামাত্র বাম হাতে তিনি সুইচ্ টিপিবেন। এই ক্ষেত্রে ডান হাত অথবা বাম হাত দিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে এই দুই প্রকার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার একটিকে বাছিয়া লইতে হয়। নির্বাচন করিতে গিয়া কিছু সময় ব্যয়িত হয়—ফলে নির্বাচন প্রতিক্রিয়াকাল সাধারণতঃ সর্বাধিক হইয়া থাকে।

৩। প্রতিক্রিয়াকাল পরীক্ষার কালাংশ বা পিরিয়ড্

প্রতিক্রিয়া-কালের পরীক্ষাকে তিনটি কালাংশ বা পিরিয়ড্-এ ভাগ করা যায়—যথা পূর্বাংশ (ফোর্ পিরিয়ড্), মধ্যাংশ (মিড্-বা মেইন্ পিবিয়ড্) এবং পরাংশ (আফ্‌টার পিরিয়ড্)।

যে কালাংশে প্রতিক্রিয়া করিবার প্রস্তুতি (প্রিপ্যারেটরি সেট্) ঘটে তাহাকে পূর্বাংশ (ফোর্ পিরিয়ড্) বলে। প্রয়োগকর্তা পাত্রকে বুঝাইয়া দিয়াছেন কিরূপে তাহার প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে, এবং তখনও উদ্দীপক উপস্থাপিত হয় নাই। উদ্দীপক উপস্থিত হইলে পাত্র সেইটিকে বুঝিবেন অথবা উহা উপস্থিত হওয়া মাত্র প্রতিক্রিয়া করিবেন—এই জাতীয় প্রস্তুতি ঘটে পূর্বাংশে। প্রস্তুতি-কাল কতটুকু হওয়া উচিত তাহা বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে।

প্রতিক্রিয়ার মধ্যাংশে পাত্র প্রতিক্রিযা করিতে আরম্ভ করেন। এই কালটি ব্যয়িত হয় উদ্দীপকের উপস্থিতি হইতে আরম্ভ করিয়া উহার প্রতি পাত্রের প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত কালের মধ্যে। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিবার সময় পাত্রের নানা অভিজ্ঞতা হয়। এই অভিজ্ঞতাগুলি পাত্রের অন্তর্দর্শন এবং প্রয়োগকর্তার পর্যবেক্ষণ সাহায্যে জানিতে পারা যায়।

আবার প্রতিক্রিয়া শেষ হইবার পরবর্তী কালাংশকে বলা হয় পরাংশ। এই কালাংশ ব্যয়িত হয় পাত্রের প্রতিক্রিয়া ঘটিবার পর ঐ সম্বন্ধে তাঁহাব অন্তর্দর্শন-বিবরণ দেওয়ার কাজে।

৪। সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়াকাল (সেন্সরি অ্যাণ্ড্ মোটর্ রি-অ্যাক্‌শন্ টাইম্)

প্রতিক্রিয়া-কাল আবার সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় ভেদে দুই শ্রেণীর হইতে পারে।

সংবেদীয় প্রতিক্রিয়া ঘটে উদ্দীপকের সংবেদন ঘটিবার পর। এই প্রতি-ক্রিয়ায় উদ্দীপকের সংবেদন বা জ্ঞান হইলে পাত্রের প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে এইরূপ মনোভাব বা প্রস্তুতি থাকে। আলোকটি **দেখিবার পর,** অথবা অলোকটি **ভাল ভাবে দেখিয়া,** সুইচ্ টিপিতে হইবে এইরূপ মনোভাব (অ্যাটিচুড্) সংবেদীয় প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য। ইহাতে ক্রিয়া বা চেষ্টার তুলনায় সংবেদন বা জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে। যে পাত্র এই প্রকার সংবেদীয় প্রতি-ক্রিয়ার মনোভাব-সম্পন্ন তাহাকে সংবেদীয় শ্রেণীর (সেন্সরি টাইপ্) বলা যায়। সংবেদীয় প্রতিক্রিয়া-কাল স্বাভাবিক কারণেই চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া-কাল অপেক্ষা বেশী হয়। উদ্দীপককে বুঝিয়া বা জানিয়া প্রতিক্রিয়া করাই এই প্রতিক্রিয়া-কাল বেশী হইবার কারণ।

আবার কোনো কোনো পাত্রের মনোভাব (অ্যাটিচুড্) বা প্রস্তুতি চেষ্টীয় প্রকারের হইতে পারে। আলোকটি **দেখিবামাত্র** প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে —তাহার এইরূপ মনোভাবে প্রতিক্রিয়া করিবার প্রবণতাই প্রাধান্য লাভ করে। সংবেদীয় পাত্র যেমন আলোক দেখিবার দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে, চেষ্টীয় পাত্রের তেমনই প্রতিক্রিয়া করিবার দিকেই ঝোঁক বেশী। ইহাতে সংবেদনের দিকে ঝোঁক থাকে না, কিন্তু প্রতিক্রিয়ার দিকেই ঝোঁক থাকে বলিয়া, চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়াকালের তুলনায় ইহা কম হইয়া থাকে।

সুতরাং দেখা, জানা প্রভৃতি সংবেদন বা জ্ঞানের উপর এবং প্রতিক্রিয়া করার উপর গুরুত্ব আরোপের সহিত প্রতিক্রিয়া কালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সংবেদীয় প্রতিক্রিয়াকাল যে অপেক্ষাকৃত বেশী এবং চেষ্টীয় প্রতি-ক্রিয়াকাল যে অপেক্ষাকৃত কম হয় তাহা পর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

মায়ার্স্[১] এই দুই প্রকার প্রতিক্রিয়াকালের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। সংবেদীয় পাত্র প্রতিক্রিয়ার তুলনায় উদ্দীপকের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বেশী। আবার চেষ্টীয় পাত্র উদ্দীপকের তুলনায় প্রতিক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বেশী। ফলে উহাদের প্রতিক্রিয়াকাল যথাক্রমে বেশী এবং কম হয়।

পাত্র সংবেদীয় অথবা চেষ্টীয় কিনা, এই প্রশ্নটি তাহার শিক্ষা, জীবিকা প্রভৃতি ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্যার উপর বিশেষ আলোকপাত করে। যেমন

১। **মায়ার্স্—এক্সপেরিমেণ্টাল্ সাইকলজি—পৃঃ ১২৬**

সংবেদীয় পাত্র হয়ত বুদ্ধিজীবী এবং চেষ্টীয় পাত্র হয়ত কারিগরিজীবী হইবে।

উদ্দীপক	চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া-কাল	সংবেদীয় প্রতিক্রিয়া-কাল
শব্দ	১২৫ σ	২১০ σ
আলোক	১৭৫ σ	২৭০ σ
স্পর্শ	১১০ σ	২১০ σ
তাপ	১৩০ σ	১৯০ σ
শৈত্য	১১৫ σ	১৫০ σ

৫। প্রতিক্রিয়াকালের সহিত উদ্দীপক, ইন্দ্রিয়যন্ত্র প্রভৃতির সম্বন্ধ

উপরের প্রতিক্রিয়া-কাল তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে প্রতিক্রিয়া-কাল স্থির বা নির্দিষ্ট নয়। ইহা কোন্ উদ্দীপক উপস্থাপিত হয় তাহার উরপ নির্ভর করে। দেখা যাইতেছে যে আলোকের প্রতিক্রিয়া-কাল সর্বাপেক্ষা বেশী এবং স্পর্শ ও শৈত্যের প্রতিক্রিয়া-কাল কম। এই তালিকায় স্বাদ ও গন্ধের প্রতিক্রিয়া-কাল উল্লিখিত হয় নাই।

পরীক্ষা সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে স্বাদ ও ঘ্রাণের প্রতিক্রিয়া-কাল আলোক অপেক্ষাও বেশী।

প্রতিক্রিয়া-কাল যেশুধু উদ্দীপকের তারতম্য অনুসারেই পৃথক হয় তাহা নয়। ইহা আবার উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়যন্ত্রের তারতম্য অনুসারেও পৃথক হয়। যেমন চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলির প্রতিক্রিয়া-কাল অপেক্ষাকৃত কম।

আবার, শুধু যে উদ্দীপকের সাধারণ তারতম্য প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য ঘটায় তাহা নয়। উদ্দীপকের তীব্রতা (ইন্‌টেন্‌সিটি) বা ক্ষীণতা অনুসারেও প্রতিক্রিয়া-কাল ভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন একটি ক্ষীণ আলোকের তুলনায় তীব্র আলোকের প্রতিক্রিয়াকাল কম হয়।

৬। প্রতিক্রিয়া-কাল সম্বন্ধে ক্যাটেল্-এর পরীক্ষা

হেল্‌ম্‌হোলজ্‌ই প্রতিক্রিয়া-কালের উপর প্রথম পরীক্ষা বা প্রয়োগ

σ চিহ্নটি এক সেকেণ্ডের এক সহস্রাংশ, বা মাইক্রোমিলিমিটার বা মিলি-সেকেণ্ড বুঝায়।

করিয়াছেন শতাধিক বৎসর পূর্বে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। পরে সুইজারল্যাণ্ডদেশীয় হিপ্ ক্রনোস্কোপ্ সাহায্যে চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্ প্রভৃতির প্রতিক্রিয়া-কাল নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা চালাইয়াছেন। এই গবেষণায় পরবর্তী পদক্ষেপ করেন ডাচ্ শারীর-বৃত্তবিৎ ডণ্ডার্স্। তিনি নির্বাচন এবং ভেদ প্রতিক্রিয়া-কাল উদ্ভাবন করেন। এক্স্নারই রি-অ্যাক্শন্ টাইম্ কথাটি প্রচলিত করেন। তিনি প্রস্তুতি ক্ষেত্রের (প্রিপারেটরি সেট্) উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হ্ব্ুণ্ড্ মনোবিদ্যার প্রথম প্রয়োগশালা (ল্যাবরেটরি) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এবং তাঁহার ছাত্রেরা সরল ও যৌগিক প্রতিক্রিয়া-কালের উপর গবেষণা চালাইতে থাকেন।

জেম্স্ ম্যাক্কিন্ ক্যাটেল্ হ্ব্ুণ্ড্-এর সুযোগ্য ছাত্র ও সহকর্মী। তিনি লাইপজিগে হ্ব্ুণ্ড্-এর সহিত প্রতিক্রিয়া-কালের উপর দীর্ঘ গবেষণা চালাইয়া পরে আমেরিকার পেনসিল্ভ্যানিয়া এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘতর গবেষণা চালাইতে থাকেন।

প্রতিক্রিয়া-কালের গবেষণায় ক্যাটেল্-এর স্থান হ্ব্ুণ্ড্-এর সমপর্যায়ভুক্ত। তিনি প্রতিক্রিয়া-কাল নিরূপণের ক্রনোস্কোপ্ বা কালমাপক যন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়যন্ত্রের তারতম্য অনুসারে প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া-কালের পার্থক্যও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি ভেদ প্রতিক্রিয়া-কাল এবং নির্বাচন প্রতিক্রিয়া-কালের উপর গবেষণা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ-কাল (পার্সেপশন্-টাইম্) এবং সঙ্কল্প কাল (উইল্-টাইম্) সম্বন্ধেও গবেষণা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া অনুষঙ্গ-কাল বিষয়ে তাঁহার গবেষণাও মূল্যবান। তিনি প্রতিহত (কনস্ট্রেইন্ড্) এবং অবাধ (ফ্রী) অনুষঙ্গ, এই উভয়ের কাল নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আবার উদ্দীপকের তীব্রতা (ইন্টেন্সিটি), মনোযোগ, ভেদ (ডিস্ক্রিমিনেশন্) প্রভৃতির সহিত প্রতিক্রিয়া-কালের সম্বন্ধ বিষয়েও তাঁহার গবেষণা মূল্যবান। ক্যাটেল্ প্রতিক্রিয়া-কালের উপর অসংখ্য পরীক্ষা বা প্রয়োগ করিয়াছেন, প্রতিক্রিয়াকাল নিরূপণের সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের প্রতিক্রিয়া-কালীন অন্তর্দর্শন গ্রহণের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার পরীক্ষার কয়েকটি নিদর্শন উল্লেখ করা যাইতেছে। এই পরীক্ষাগুলি প্রত্যক্ষ-কাল এবং পাঠ-কাল নির্ণয় করে। এই দুইটি বিষয়েই ক্যাটেল্ পথপ্রদর্শক।

একটি ড্রাম-এর উপর কতগুলি অক্ষর আঁটিয়া দেওয়া হইল। তারপর ড্রামটিকে ঘুরাইয়া দেওয়া হইল। পাত্র একটি পর্দার আড়ালে বসিয়া আছেন। আড়াল বা পর্দার ছিদ্র দিয়া তিনি চলন্ত ড্রাম-এর উপর একসঙ্গে একটি করিয়া অক্ষর দেখিতে পান এবং পৃথকভাবে প্রত্যেকটি অক্ষর দেখিয়া উহার নাম বলিতে তাঁহার আধ সেকেণ্ড মাত্র সময় লাগে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তাহার প্রতিক্রিয়া-কাল মাত্র আধ সেকেণ্ড। কিন্তু পর্দার ছিদ্র দিয়া ঐ একটি অক্ষর দেখিতে না দেখিতেই যদি আর একটি অক্ষর উপস্থাপিত হয় তাহা হইলে ঐ অক্ষরের নাম বলিতে আধ সেকেণ্ডের পরিবর্তে এক/তৃতীয় অথবা এক/পঞ্চমাংশ সেকেণ্ড সময় লাগে—অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া-কাল কমিয়া যায়। আবার যদি প্রথম অক্ষরটির নাম বলিবার পূর্বে দুইটি, তিনটি এমন কি পাঁচটি পর্যন্ত অক্ষর উপস্থাপিত হয় তাহা হইলে উহার নাম বলিবার সময় আরও কমিয়া যাইবে।[1]

এই পরীক্ষা হইতে বুঝা যায় যে পৃথক পৃথক অক্ষর প্রত্যক্ষ বা পাঠ করিতে যে সময় লাগে ঐ অক্ষরগুলি শব্দ গঠন করিলে উহাদের প্রত্যক্ষে বা পঠনে তদপেক্ষা কম সময় লাগে। অথবা যদি অক্ষরগুলি শব্দ গঠন করে, তাহা হইলে একই সময়ে অধিক অক্ষর প্রত্যক্ষ বা পাঠ করা যায়। আবার আলাদাভাবে কতগুলি শব্দ প্রত্যক্ষ বা পাঠ করিতে যে সময় লাগে উহারা বাক্য গঠন করিলে উহাদের প্রত্যক্ষে বা পাঠে আরও কম সময় লাগে।

উপরোক্ত পরীক্ষার সাহায্যে ক্যাটেল্‌ একটি উপসংস্থাপনের (ওভারল্যাপিং) অর্থাৎ একটি পূর্ববর্তী অক্ষর বা শব্দ পড়িতে পড়িতেই কতগুলি পরবর্তী অক্ষর বা শব্দ পড়া হইয়া যায় তাহার পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এক একটি পৃথক্‌ অক্ষর প্রত্যক্ষ বা পাঠ করিতে যে সময় লাগে একটি নাতিদীর্ঘ শব্দ প্রত্যক্ষে বা পাঠে তাহার বেশী সময় লাগে না, ক্যাটেল্‌-এর এই আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ সম্পূর্ণ শব্দটির প্রত্যক্ষ পৃথক অক্ষরগুলির তুলনায় কম সময়েই ঘটে। এই আবিষ্কার ইদানীন্তন শিক্ষা পদ্ধতির উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহার এই গবেষণার ফলে ইহাই নির্ধারিত হইয়াছে যে শব্দ প্রত্যক্ষে উহার পৃথক অক্ষরগুলির পৃথক পৃথক প্রত্যক্ষ হয় না, অর্থাৎ অনেকগুলি শব্দের একত্র প্রত্যক্ষ ঘটিয়া থাকে।

১ এই পরীক্ষাটির মত ক্যাটেল্‌-এর অধিকাংশ প্রত্যক্ষ-কাল, পাঠ-কাল, মনোযোগ-প্রসার (রেঞ্জ্‌ অফ অ্যাটেন্‌শন্‌) সম্বন্ধীয় পরীক্ষাই ক্ষণদৃক্‌জাতীয় (ট্যাশিস্টোকোপ্‌) পরীক্ষা।

ক্যাটেল্-এর আর একটি মূল্যবান গবেষণা হইল এই যে কোনো বিদেশী ভাষার তুলনায় মাতৃভাষা অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি পড়া যায়। বহু পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের সহিত কোনো বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিলে এবং মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিলেও হয়ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না।

তাহা ছাড়া ক্যাটেল্ মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার কাল, উদ্দীপকের তীব্রতার ফলে প্রতি-ক্রিয়া-কালের অল্পতা বা আধিক্য, প্রত্যক্ষ-কালের ভিত্তিতে উদ্দীপকের তীব্রতা-ভেদ, স্বল্প-বিরাম উদ্দীপনার (ইন্‌টারমিটেণ্ট্ ষ্টিমুলেশন্) ফলে স্পর্শ সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়গুলির প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বহু মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। বাহুল্য বোধে এইগুলির বিস্তৃত আলোচনা বর্জন করা হইল।

৭। প্রতিবর্ত ক্রিয়া (রিফ্লেক্স অ্যাক্‌শন)

কোন উদ্দীপক কোনো ইন্দ্রিয়ের বহিঃপ্রান্তকে উদ্দীপিত করিলে চেতনার সাহায্য বা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই, অতীত শিক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া একরূপভাবে (ইউনিফর্ম্‌লি) সোজাসুজি (ইমিডিয়েট্‌লি) যে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রতিবর্ত (রিফ্লেক্স্) বলে। যেমন আগুনে হাত লাগিবা মাত্রই হাত সরাইয়া লওয়া হয়, অথবা নাকে সুড়সুড়ি লাগিবা মাত্র হাঁচি আসে। এই দুইটিই প্রতিবর্ত ক্রিয়া। আগুনে হাত লাগিবা মাত্র হাত সরাইয়া লওয়া, এই প্রতিবর্তের শারীর ধাপ বা স্তরগুলি বুঝিতে পারিলেই প্রতিবর্ত বুঝিবার সুবিধা হইবে। স্পর্শ-নার্ভের বহিঃপ্রান্ত থাকে ত্বকের ঠিক নীচে, আবার ইহার অন্তঃপ্রান্ত থাকে মেরুদণ্ডে। স্পর্শ-নার্ভের বহিঃপ্রান্ত আগুনের স্পর্শে উত্তেজিত হইল। এই উত্তেজনা নার্ভ-প্রবাহের আকারে অন্তর্গামী (ইন্‌কামিং) বা সংবেদীয় (সেন্সরি) নিউরোন্ দিয়া মেরুদণ্ডে পৌঁছাইল। আবার মেরুদণ্ডেই অবস্থিত রহিয়াছে সংবেদীয় স্পর্শ-নার্ভের অন্তঃপ্রান্তের সন্নিহিত বহির্গামী (আউট্‌গোয়িং) বা চেষ্টীয় (মোটর) নিউরোনের অন্তঃপ্রান্ত। উত্তেজনাটি এই চেষ্টীয় নার্ভের অন্তঃপ্রান্তের দ্বারা গৃহীত হইল এবং ইহা চেষ্টীয় নার্ভ-প্রবাহের আকারে পরিচালিত হইল হস্তের পেশীতে যাহার ফলে হাত সরাইয়া লওয়া রূপ বিচলন প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হইল। আগুনে হাত দেওয়ারূপ উদ্দীপক এবং আগুন হইতে হাত সরাইয়া লওয়ারূপ প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী এমন কোনো চেতনা বা ঐচ্ছিক ক্রিয়া থাকে না যাহা এই প্রতিক্রিয়াকে সংযত বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

২১নং চিত্রে উপরোক্ত প্রতিবর্তের শারীর ধাপ বা স্তরগুলি দেখানো হইল।

প্রতিবর্তক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য

প্রতিবর্ত একপ্রকার (১) **সহজ প্রতিক্রিয়া**, কারণ ইহাতে ক্রিয়াশীল নিউরোন, পেশী বা গ্রন্থির সংখ্যা ঐচ্ছিক প্রতিক্রিয়ার তুলনায় কম। প্রতিবর্ত **সহজাত**, অর্থাৎ জন্মের মুহূর্ত হইতেই ইহার গঠন এবং প্রকৃতি সম্পূর্ণ থাকে। প্রতিবর্ত **সহজে সংশোধিত বা পরিবর্তিত হয় না**।

(২) প্রতিবর্ত ক্রিয়ার **আকার নির্দিষ্ট।** যেমন আগুনে হাত লাগিলে হাত সরাইয়া লওয়া একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া। (৩) প্রতিবর্ত **শিক্ষালব্ধ নয়,** কিন্তু ইহা সহজাত এবং অপেক্ষাকৃত অপরিবর্তনীয় প্রতিক্রিয়া। (৪) একরূপতা প্রতিবর্তের আর একটি বিশেষ ধর্ম—যেমন সকল নবজাত শিশুই একরূপে স্তন্য-পান করে। উদ্দীপক ক্রিয়াশীল হইবামাত্র প্রতিবর্ত ঘটিয়া থাকে। ইহা দ্রুত অথবা ত্বরান্বিত।

প্রতিবর্তের অপরিবর্তনীয়তা

উপরে প্রতিবর্তক্রিয়ার সংশোধন বা পরিবর্তন ঘটে না, এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহার পরিবর্তন বা সংশোধন ঘটিয়া থাকে। এই দিক দিয়া প্রতিবর্তকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) কতগুলি বিশুদ্ধ প্রতিবর্ত **কোনক্রমেই পরিবর্তিত হয় না**—যেমন তারারন্ধ্রীয় প্রতিবর্ত (পিউপিলারি রিফ্লেক্স), উত্তাপে বা ব্যথায় হাত সরাইয়া লওয়া, পাকস্থলীর হজমক্রিয়া, নাক ডাকা প্রভৃতি। আবার (২) কতগুলি প্রতিবর্ত প্রধানতঃ বিশুদ্ধ হইলেও ব্যাহত বা বর্ধিত হইতে পারে—যেমন কাশি, হাই তোলা, বমন, লালা-নিঃসরণ প্রভৃতি। (৩) তৃতীয়তঃ, আরও কতগুলি প্রতিবর্ত প্রায়ই বিশুদ্ধ হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশোধিত হইয়া থাকে—যেমন হাসি, কান্না, হাঁপানো প্রভৃতি। (৪) চতুর্থতঃ, কতগুলি প্রতিবর্ত শৈশবে বিশুদ্ধ থাকিলেও পরিণত বয়সে অবশ্যই পরিবর্তিত হয়—যেমন স্তন্যপান, কাম্‌ড়ানো, থুথু ফেলা প্রভৃতি। ইহা ছাড়াও, (৫) কতগুলি দেহভঙ্গিমা (পশ্চার) সংক্রান্ত প্রতিবর্ত আছে যেগুলি সর্বদা পরিবর্তিত হইয়া থাকে —যেমন মাথা সোজা করিয়া রাখা, বসা, দাঁড়ানো, দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা প্রভৃতি।

৮। প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ (রিফ্লেক্স্ আর্ক্)

প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজ হইলেও, ইহা নার্ভতন্ত্রের একাধিক অংশ সাহায্যে ঘটিয়া থাকে। এই অংশগুলি চিত্রাকারে আঁকিলে উহাদিগকে একটি বৃত্তাংশের (আর্ক্) মত দেখায়। সেই কারণে যে নার্ভ-পথ সাহায্যে প্রতিবর্ত ঘটে তাহাকে বলা হয় প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ (রিফ্লেক্স্ আর্ক্)। এই নার্ভ-পথ বুঝিতে হইলে নার্ভতন্ত্রের যে যে অংশ ক্রিয়া করিবার ফলে প্রতিবর্ত ঘটে তাহা বুঝা দরকার।

প্রতিবর্ত ক্রিয়ার বিশ্লেষণ এইরূপ। প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় প্রথমতঃ কোনো ইন্দ্রিয়যন্ত্রের সংবেদীয় বা অন্তর্গামী নার্ভের বহিঃপ্রান্ত উত্তেজিত হয়। এই উত্তেজনার ফলে একটি নার্ভপ্রবাহের (নার্ভাস্ ইম্পাল্স্) সৃষ্টি হয়। নার্ভ-প্রবাহটি উত্তেজিত সংবেদীয় নার্ভ দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঐ নার্ভের অন্তঃপ্রান্তে, যাহা মেরুদণ্ডে বা মস্তিষ্কের কোন অংশে অবস্থিত রহিয়াছে সেইখানে, পৌছায়। সংবেদীয় নার্ভের কেন্দ্রীয় অন্তঃপ্রান্তের পাশেই রহিয়াছে চেষ্টীয় বা বহির্গামী নার্ভের অন্তঃপ্রান্ত। ঐ নার্ভপ্রবাহ এইবার চেষ্টীয় নার্ভের অন্তঃপ্রান্তকে উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনা চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহের আকারে চেষ্টীয় নার্ভ দিয়া প্রবাহিত হইয়া উহার বহিঃপ্রান্তে, যাহা কোনো পেশীতে বা গ্রন্থিতে অবস্থিত রহিয়াছে সেইখানে, পৌছায়। ফলে পেশীর বিচলন বা গ্রন্থির রসক্ষরণরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে।

সংবেদীয় নার্ভের অন্তঃপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া চেষ্টীয় নার্ভের বহিঃপ্রান্ত পর্যন্ত নার্ভ-পথটি বুঝানো হইল। এই নার্ভ-পথকেই প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ (রিফ্লেক্স্ আর্ক) বলে।

প্রতিবর্ত বৃত্তাংশে পাচটি বিভাগ থাকে। (১) সংগ্রাহক নার্ভপ্রান্ত (রিসেপ্টিভ্ নার্ভ-এণ্ডিংস্)—ইহা কোনো সংবেদীয় বা ইন্দ্রিয়যন্ত্রের, যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্, জিহ্বা, বহিঃপ্রান্তে অবস্থিত থাকে। (২) অন্তর্মুখী বা সংবেদীয় নার্ভ—উদ্দীপকের দ্বারা ইহার বহিঃপ্রান্ত উত্তেজিত হওয়ার ফলে, ইহাতে নার্ভপ্রবাহের সৃষ্টি হয়, যাহা কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে পরিচালিত হয়; (৩) কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র, অর্থাৎ মেরুদণ্ড বা মস্তিষ্ক—সংবেদীয় নার্ভের অন্তঃপ্রান্ত ইহাতে অবস্থিত, ফলে সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ এই স্থানে পৌছায়; (৪) বহির্মুখী বা চেষ্টীয় নার্ভ—ইহার অন্তঃপ্রাপ্ত সংবেদীয় নার্ভের অন্তঃপ্রান্তের সংলগ্ন থাকে। ফলে সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ চেষ্টীয় নার্ভে পরিচালিত হয়; (৫) সম্পাদক যন্ত্র

এফেক্‌টর অর্গ্যান্), যেমন পেশী, গ্রন্থি, প্রভৃতি—চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ পেশী বা গ্রন্থিতে পরিচালিত হইয়া যথাক্রমে বিচলন এবং রসক্ষরণ ঘটায়।

৯। প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের স্তরভেদ

প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের কয়েকটি স্তরভেদ রহিয়াছে। এই স্তরভেদের উপর প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের সহজতা বা জটিলতা নির্ভর করে। সাধারণতঃ প্রতিবর্ত একাধিক বৃত্তাংশের একসঙ্গে কাজ করিবার ফল। সহজতর প্রতিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম এবং জটিলতর প্রতিবর্তে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃত্তাংশ থাকে।

নিম্নতর প্রতিবর্তের কেন্দ্র হইল নার্ভতন্ত্রের কোনো নিম্নতর অংশ, যেমন মেরুদণ্ড বা লঘুমস্তিষ্ক। উচ্চতর প্রতিবর্তের কেন্দ্র হইল ইহার কোনো উচ্চতর অংশ, যেমন গুরুমস্তিষ্ক। সহজতর বৃত্তাংশগুলি নিম্নতর এবং জটিলতর বৃত্তাংশগুলি উচ্চতর। যেমন জানুক্ষেপ (নী-জার্ক) একপ্রকার সহজতর এবং নিম্নতর অথবা মেরুদণ্ডীয় (স্পাইনাল্) প্রতিবর্ত, আবার স্তন্যপান বা সাকিং একপ্রকার জটিলতর এবং উচ্চতর প্রতিবর্ত।

আগুনে হাত লাগিবামাত্র হাত সরাইয়া লওয়া একটি সহজ ও নিম্নস্তরের প্রতিবর্ত। এই প্রতিবর্তে নার্ভপ্রবাহ যে বৃত্তাংশ (রিফ্লেক্স আর্ক) দিয়া পরিচালিত হয় তাহা এইরূপ :—
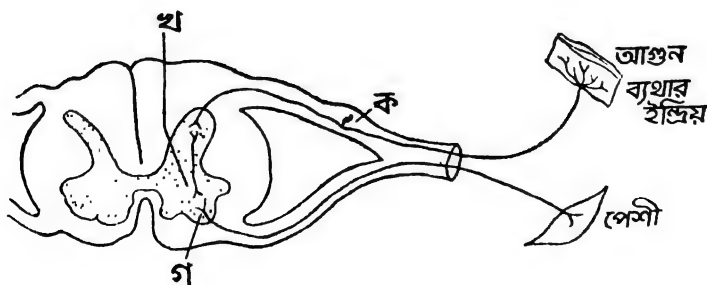
২১নং চিত্র—তিনটি নিউরোন বিশিষ্ট সহজ প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ

(ক) সংবেদীয় নিউরোন, (গ) চেষ্টীয় নিউরোন, (খ) সংযোজক নিউরোন আগুন (উদ্দীপক) মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে এবং পেশীর প্রতিক্রিয়া ঘটায়। ইহা একটি মেরুদণ্ডীয় প্রতিবর্ত (স্পাইনাল্ রিফ্লেক্স)।

উপরোক্ত প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের মত চোখের পাতার স্পন্দন, দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা, জানুক্ষেপ (নী-জার্ক), হাঁচি প্রভৃতি যে সকল প্রতিবর্ত বিপজ্জনক উদ্দীপকের ফলে উৎপন্ন হয় উহারা ছোট বৃত্তাংশের সাহায্যে ঘটিয়া থাকে। এইগুলি মেরুদণ্ডীয় প্রতিবর্তেরই উদাহরণ।

উপরে **তিনটি স্তরের** বৃত্তাংশ উল্লিখিত হইয়াছে। এই **তিনটি** স্তরের ব্যাখ্যা না করিলে ইহারা সহজবোধ্য হইবে না।

প্রাথমিক স্তরের প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ (রিফ্লেক্স্ আর্ক্ অফ্ দি প্রাইমারী লেভেল্ অথবা স্পাইন্যাল্ রিফ্লেক্স্) মেরুদণ্ডের উপরে ওঠে না। এইরূপ সহজতম বৃত্তাংশ বিপজ্জনক উদ্দীপকের ফলে দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য আবশ্যক হয়। ইহাকে স্থানীয় টেলিফোনের ডাকের সহিত তুলনা করা যায়। আগুনে হাত দেওয়া মাত্র হাত সরাইয়া লওয়ার উদাহরণ দেখানো হইয়াছে। ঐরূপ পায়ের পাতা বিদ্ধ হইলে ঐ উত্তেজনা পায়ের পাতা হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ড পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে এবং চেষ্টীয় নার্ভ দিয়া পরিচালিত হইয়া পায়ের পেশীতে পৌঁছায় এবং উহার সঙ্কোচন উৎপন্ন করিয়া পায়ের অপসারণ ঘটায়।

সর্বাপেক্ষা সরল বৃত্তাংশে একটি সংবেদীয় এবং একটি চেষ্টীয়, মাত্র এই দুইটি নিউরোন থাকে। অবশ্য মাত্র দুইটি নিউরোন-এ গঠিত বৃত্তাংশ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। জানুর বামদিকে (প্যাটেল) আঘাত করিলে জানুর পেশী-সঙ্কোচ হয়। ইহাকে জানু-কম্পন বা হাঁটুর ঝাঁকানি (নী-জার্ক) বলে। অপর পায়ের তলায় চিম্টি কাটিলে তৎক্ষণাৎ পা সরাইয়া লওয়া হয়। এই দুইটি ক্রিয়ার চক্রাংশও দুইটি নিউরোন দ্বারা গঠিত। ইহাদিগের কেন্দ্র মেরুদণ্ড। এইজন্য ইহাদিগকে বলা হয় মেরুদণ্ডীয় (স্পাইন্যাল) প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ।

দ্বিতীয় স্তরের (সেকেণ্ডারি লেভেল্) প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ প্রাথমিক স্তরেরটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত জটিল। ইহা গঠিত হয় মেরুদণ্ডীয় বৃত্তাংশের সংবেদীয় নার্ভের শাখাপ্রশাখা সাহায্যে। এইজন্য এই প্রতিবর্ত বৃত্তাংশকে সংবেদীয় স্তরের বলা হয়। ইহা উদ্দীপিত নার্ভের বহিঃপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের উপরাংশে সুষুম্নাশীর্ষক (মেড়ুলা) এবং মস্তিষ্কের বহিঃস্তর বা ধূসর পদার্থের (কর্টেক্স্) মধ্যবর্তী কেন্দ্রে পৌঁছায় এবং চেষ্টীয় নার্ভের মধ্য দিয়া কোনো পেশীতে বা গ্রন্থিতে শেষ হয়। চেষ্টীয় নার্ভগুলি প্রাথমিক সংবেদীয় নার্ভের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। নূতন কোষদেহগুলি একত্র হয় এবং মাথায়

অবস্থিত ইন্দ্রিয় হইতে নির্গত নিউরোনের কোষদেহগুলি একটি বড় গ্যাংগ্লিয়ন্ গঠন করে যাহাকে মস্তিষ্কের প্রথম সূত্রপাত বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় স্তরের বৃত্তাংশে তিনটি বা তাহার বেশী নিউরোন থাকে। এই স্তরে সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় নিউরোন-এর মধ্যবর্তী নার্ভকোষ—সংযোগকারী নিউরোনগুলি মেরুদণ্ডে এবং মস্তিষ্কে ছড়াইয়া পড়ে।

দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা, হাঁটা, দৌড়ানো প্রভৃতি জটিল সমন্বয় (কো-অর্ডিনেশন) মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তাংশ সাহায্যে সম্পন্ন হয়। চক্ষুতে আলো পড়িয়া চক্ষু উদ্দীপিত হইবার ফলে তারা-রন্ধ্রের সংকোচন এই স্তরের প্রতিবর্ত। এইরূপ প্রতিবর্তকে দূরাগত টেলিফোন ডাকের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

তৃতীয় স্তরের মস্তিষ্ককেন্দ্রিক প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ দ্বিতীয়টির তুলনায় আরও জটিল। উচ্চস্তরের চিন্তনকে তৃতীয় স্তরের প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ বলা যাইতে পারে। ইহা দ্বিতীয় স্তর অপেক্ষা আরও উন্নত ও জটিল নার্ভসংযোগ সাধন করে। ইহাতে মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তাংশের সহিত আরও জটিল সম্বন্ধপথ রচিত হয়। মাধ্যমিক স্তরটি যেমন প্রাথমিক স্তরের সমন্বয়-সাধন করে, তৃতীয় স্তরটিও তেমন মাধ্যমিক স্তরের সমন্বয় সাধন করে। ফলে মস্তিষ্কের আকার আরও বড় হয়। মানুষ এবং অন্যান্য উচ্চতর প্রাণীর গুরুমস্তিষ্কের অনুষঙ্গ এলাকাই (অ্যাসোসিয়েশন্ এরিয়া) তৃতীয় স্তরের প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের কেন্দ্র। উচ্চতম মানসবৃত্তিগুলি এই বৃত্তাংশের ক্রিয়া। এই অঞ্চলের উন্নতির সহিত মানুষের সেই উচ্চতর মানস শক্তিগুলি সংশ্লিষ্ট যাহার ফলে মানুষ অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই অঞ্চলগুলির উপর শিক্ষালব্ধ উন্নতি নির্ভর করে।

তৃতীয় স্তরের প্রতিবর্ত বৃত্তাংশকে বহু দূর হইতে আগত টেলিফোন ডাকের সহিত তুলনা করা যায়।

প্রাথমিক স্তরের বৃত্তাংশ সর্বাপেক্ষা মৌলিক এবং স্থায়ী। তৃতীয় স্তরের বৃত্তাংশ যেমন সর্বশেষে বিকাশ লাভ করে তেমনই ইহারা সর্বাপেক্ষা জটিল। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তাংশ প্রধানতঃ সহজাত কিন্তু তৃতীয় স্তরের বৃত্তাংশ শিক্ষার ফলে অর্জিত এবং মানুষের জীবিতকালে গঠিত হয়। সুতরাং নবজাত শিশুর মধ্যেই হৃৎস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি জৈব বৃত্তির নিয়ন্ত্রণকারী প্রাথমিক বৃত্তাংশগুলি সম্পূর্ণ কর্মক্ষম থাকে। মাধ্যমিক বৃত্তাংশগুলি অল্পকালের মধ্যেই বিকাশ লাভ করে। কিন্তু তৃতীয় স্তরের বৃত্তাংশ শিশুর জীবন ও

অভিজ্ঞতার ফলে বিকশিত হয় এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে।
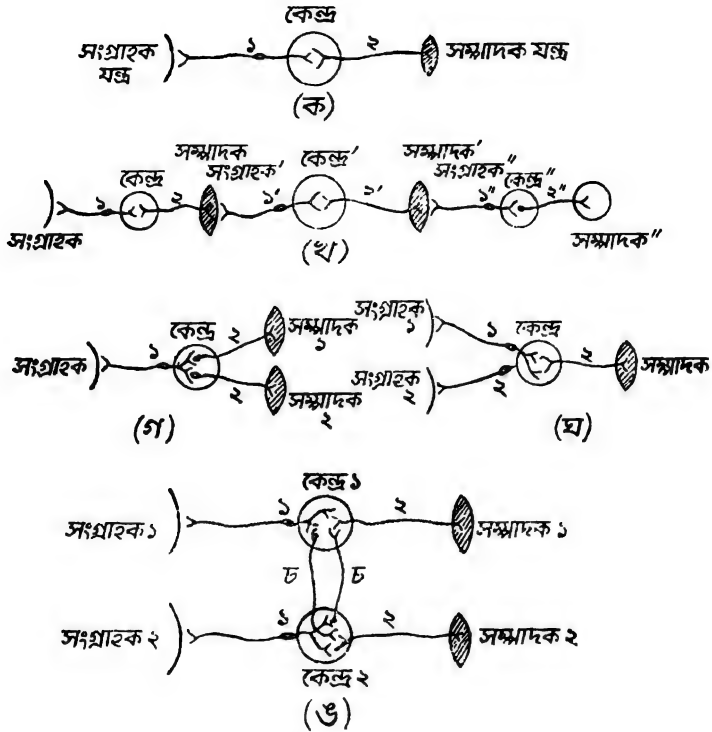
২২ নং চিত্র—পাঁচ শ্রেণীর প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ

(ক) সহজ প্রতিবর্ত। ১, ২ যথাক্রমে উহার সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় নিউরোন্।

(খ) প্রতিবর্ত-শৃঙ্খল (চেইন-রিফ্লেক্স্)। ইহাতে প্রথম প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক হইয়াছে।

(গ) একটি উদ্দীপক দুইটি সম্পাদকের ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে।

(ঘ) দুইটি উদ্দীপক একটি সম্পাদকের ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে।

(ঙ) দুইটি অনুষক্ত প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের চিত্র। একটি বৃত্তাংশের সংগ্রাহক অপর বৃত্তাংশটির সম্পাদকের সহিত যুক্ত হইয়াছে অনুষঙ্গ নিউরোন্ চ-এর সাহায্যে।

২২ নং চিত্রটি দেখিলে প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের প্রকারভেদ বুঝা যাইবে।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজাত গ্রন্থীয় বা পেশীয় প্রতিক্রিয়া। ইহা কোনো সংগ্রাহক যন্ত্রের উদ্দীপনার ফলে কোনো সংবেদীয় নিউরোন-এর উত্তেজনায়

সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়া থাকে। উজ্জ্বল আলোকে চক্ষুতারার সঙ্কোচ, জানুক্ষেপ এবং খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মুখে লালা নিঃসরণ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত।

শারীর ও চেতন প্রতিবর্ত (ফিজিয়লজিক্যাল্ অ্যাণ্ড্ কন্‌সাচ্ রিফ্লেক্স্)—প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে প্রধানতঃ শারীর এবং চেতন এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমটির উদাহরণ হইল তীব্র আলোকে চক্ষুতারার সঙ্কোচ। ইহাতে চেতনার কোনো ক্রিয়া নাই। এই প্রতিবর্ত চলিতে থাকা কালে অথবা ঘটিবার পরেও উহার কোনো চেতনা হয় না।

কিন্তু চেতন প্রতিবর্তে, প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকা কালে উহার কম বেশী চেতনা থাকে। প্রতিক্রিয়ার উৎপাদনে চেতনার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তথাপি চেতনা প্রতিক্রিয়াকে অল্পাধিক নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন কাশি একপ্রকার চেতন প্রতিবর্ত যাহা চেতনার দ্বারা অল্পাধিক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কাশি চেতনা দ্বারা সাময়িক বা স্থায়ীভাবে থামানো যায় এবং প্রতিক্রিয়াটি স্বেচ্ছায় উৎপাদনও করা যায়।

প্রতিবর্ত—নার্ভক্রিয়ার একক

নিউরোন যেমন নার্ভতন্ত্র সংগঠনের একক, প্রতিবর্ত তেমনই নার্ভ-ক্রিয়ার একক। প্রতিবর্ত বলিতে সংবেদ-চেষ্টীয় (সেন্সরি মোটর) একক বুঝায়। কোনো সংগ্রাহক যন্ত্র (রিসেপ্টর্ অর্গ্যান্) হইতে কার্যকরী যন্ত্রে পরিচালিত হইতে হইলে নার্ভপ্রবাহের পক্ষে অন্ততঃ দুইটি নিউরোনের সংযোগ আবশ্যক। নার্ভপ্রবাহ কোনো প্রান্ত-সন্নিকর্ষের (সাইনাপ্স্) মধ্য দিয়া একটি নিউরোন হইতে অপরটিতে পরিচালিত হয়। নার্ভতন্ত্রের সহজতম কর্মীয় একক হইল একটি সংবেদ-চেষ্টীয় বৃত্তাংশ (সেন্সরি মোটর আর্ক্)।

যদিও দুইটি নিউরোনের দ্বারা গঠিত প্রতিবর্ত আছে, কিন্তু সাধারণতঃ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী একটি কেন্দ্রীয় নিউরোন থাকে এবং এই নিউরোনটি উহাদের সহিত প্রান্ত-সন্নিকর্ষের সাহায্যে সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ, প্রতিবর্ত সাধারণতঃ দুইটির বেশী নিউরোন লইয়া গঠিত হইয়া থাকে।

১০। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত—কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স্

প্রতিবর্তকে আরও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যথা সহজ, নিরপেক্ষ বা অপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্ত (সিম্প্‌ল্ বা আন্‌কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স্) এবং সাপেক্ষ বা সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্ত (কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স্)।

যেমন উজ্জ্বল আলোকের উদ্দীপনায় যে তারারন্ধ্রীয় প্রতিবর্ত (পিউপিলারি রিফ্লেক্স্) ঘটে, উহা নিরপেক্ষ বা সহজ প্রতিবর্ত। কিন্তু উজ্জ্বল আলোকের সঙ্গে সঙ্গে যদি একটি ঘণ্টা বাজানো হয় তাহা হইলে ঘণ্টাধ্বনিই তারারন্ধ্রীয় প্রতিবর্ত উৎপন্ন করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রতিবর্তটি সাপেক্ষ বা সপ্রতিবন্ধ (কন্‌ডিশন্‌ড), কারণ ঘণ্টাধ্বনি স্বভাবতঃ এই প্রতিবর্ত ঘটাইতে পারে না কিন্তু এই প্রতিবর্তের সহজ বা স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত অনুষক্ত হইবার ফলে পারে। কোন সহজ বা স্বাভাবিক উদ্দীপক অন্য কোন বস্তুর সহিত অনুষক্ত হইবার ফলে উহা ঐ বস্তুটির সর্ত (কন্‌ডিশন্) হইয়া দাঁড়ায় এবং সেজন্য ঐ বস্তুটি ঐ স্বাভাবিক উদ্দীপকের কাজ করিতে পারে। যেমন উজ্জ্বল আলোকের সহিত ঘণ্টাধ্বনি চলিবার ফলে উজ্জ্বল আলোকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ঘণ্টাধ্বনিতে সংক্রামিত হয়, যাহার ফলে উজ্জ্বল আলোকের সাহায্য ছাড়াই ঘণ্টাধ্বনি উজ্জ্বল আলোকের নিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়া—যেমন তারারন্ধ্রের সঙ্কোচন—সাপেক্ষভাবে ঘটাইতে পারে।

আবার যেমন উচ্চ শব্দের প্রতি শিশুর স্বাভাবিক ভীতি আছে। কয়েকবার উচ্চ শব্দ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি শিশুকে একটি খেলার পুতুল দেওয়া হয়, ক্রমে উচ্চ শব্দের ভীতি খেলার পুতুলে সংক্রামিত হইবে। ফলে যে খেলার পুতুল তাহার নিকট কৌতুকের বস্তু ছিল তাহাই ভয়ের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে।

তাহা হইলে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত বলিতে বুঝায় সেই প্রতিবর্ত যাহা উহার স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত অনুষক্ত অন্য কোনো বস্তুর দ্বারা উৎপন্ন হয়, অথবা যাহা যে বস্তুর দ্বারা স্বভাবতঃ বা নিরপেক্ষভাবে উৎপন্ন হয় না তাহা দ্বারাই উৎপন্ন হয় সাপেক্ষভাবে, অর্থাৎ স্বাভাবিক উদ্দীপকের উপর নির্ভর করিয়া। স্বাভাবিক উদ্দীপক (আন্‌কনডিশন্‌ড্ ষ্টিমুলাস্) স্বাভাবিকভাবে উহার প্রতিবর্ত উৎপন্ন করে। এই জন্য উহাকে অন্য কোনো উদ্দীপকের উপর নির্ভর করিতে হয় না। স্বাভাবিক উদ্দীপক স্বাধীনভাবে, কিন্তু অস্বাভাবিক উদ্দীপক পরাধীনভাবে প্রতিবর্ত উৎপন্ন করে। এই কারণে সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে অস্বাভাবিক প্রতিবর্ত (আন্‌ন্যাচার্যাল বা আর্টিফিসিয়্যাল্ রিফ্লেক্স) বলা যাইতে পারে।

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ঘটে স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত উহার অস্বাভাবিক উদ্দীপকের অনুষঙ্গের ফলে। এই প্রতিবর্ত অস্বাভাবিক উদ্দীপকের নিজস্ব শক্তিপ্রসূত নয় কিন্তু যে স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত উহা অনুষক্ত উহার

শক্তিপ্রসূত। কাজেই অস্বাভাবিক উদ্দীপকটি যদি মাঝে মাঝে স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত পুনরায় অনুষক্ত হইয়া উহা হইতে উহার শক্তি আহরণ না করে তাহা হইলে উহার দ্বারা উৎপন্ন সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। যেমন উজ্জ্বল আলোকের সহিত অনুষক্ত হইবার ফলে ঘণ্টাধ্বনি তারারন্ধ্রীয় সঙ্কোচন উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু যাহাতে এই অস্বাভাবিক উদ্দীপকটির পক্ষে অস্বাভাবিক তারারন্ধ্রীয় সঙ্কোচন উৎপন্ন করা সম্ভব হইতে পারে সেইজন্য মাঝে মাঝে উজ্জ্বল আলোকের সহিত ইহাকে পুনরায় উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। নতুবা উজ্জ্বল আলোক হইতে উহার ধার করা শক্তি ফুরাইয়া যায়।

১১। প্যাভ্লো-উদ্ভাবিত সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের পরীক্ষা

সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ রুশ্ শারীরবৃত্তবিৎ আই. পি. প্যাভ্লো এবং তাঁহার সহকর্মিগণের আবিষ্কার।

একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখে মাংসখণ্ড দিলে উহার একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইবে লালাগ্রন্থি হইতে বর্ধিত লালানিঃসরণ। এই লালানিঃসরণ একটি স্বাভাবিক প্রতিবর্ত—ইহা উৎপন্ন হয় ঘ্রাণ এবং স্বাদের সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় এবং লালানিঃসারক গ্রন্থির সম্বন্ধ থাকিবার ফলে। এইবার যদি যতবার কুকুরটিকে মাংস খাওয়ানো হয় ততবারই উহার পূর্বে অথবা যুগপৎ একটি ঘণ্টা বাজানো যায়, তাহা হইলে ঘণ্টার শব্দ শুনিবামাত্র তাহার লালানিঃসরণ আরম্ভ হইবে। শব্দ-সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের এবং লালানিঃসারক গ্রন্থির এই সম্বন্ধ স্বাভাবিক নয়, কিন্তু ইহা একটি অভিজ্ঞতা বা শিক্ষালব্ধ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ নিম্নলিখিত ভাবে দেখানো যাইতে পারে :—

উ$_1$ (মাংস) →প্র$_1$ (লালানিঃসরণ—সহজ প্রবৃত্তি)

উ$_2$ (ঘণ্টাশব্দ) →প্র$_2$ (শব্দ প্রতিক্রিয়া—সহজ প্রবৃত্তি)

উ$_1$ + উ$_2$ (যুগপৎ উপস্থাপিত)→প্র$_1$ (লালানিঃসরণ প্রতিক্রিয়া)—

কয়েকবার দেওয়া হইল ;

উ$_2$ (ঘণ্টাশব্দ) →প্র$_1$ (লালানিঃসরণ—সাপেক্ষ প্রতিবর্ত)

দেখা যাইতেছে যে ঘণ্টাশব্দের ফলে লালানিঃসরণ হইতেছে, অর্থাৎ লালানিঃসরণ প্রতিবর্তটি সাপেক্ষ হইয়াছে।

কুকুরকে মাংস দিবার পূর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে যদি একটি ঘণ্টা বাজানো হয় তবে কয়েকবার ঘণ্টা-ও-মাংস ঘণ্টা-ও-মাংস এই ক্রমের পুনরাবৃত্তি করিলে, মুখে মাংসের সংস্পর্শজনিত লালা-নিঃসরণ ঐ ঘণ্টাধ্বনির দ্বারাও সংঘটিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনি করিবামাত্র লালানিঃসরণ হইতে থাকে।

শুধু যে ঘণ্টাধ্বনির দ্বারাই লালানিঃসরণরূপ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত উৎপন্ন হয় তাহাই নয়। মাংসের সহিত অনুষক্ত যে কোন অবস্থা দ্বারাই ইহা উৎপন্ন হইতে পারে। যেমন যে ব্যক্তি মাংস দেয়, তাহার অথবা মাংসপাত্রের দর্শন মাত্র লালানিঃসরণ ঘটিতে পারে। আবার যে ব্যক্তি মাংস দেয় তাহার পদধ্বনি শোনা মাত্র লালানিঃসরণ আরম্ভ হইতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লালা-নিঃসরণের স্বাভাবিক উদ্দীপক মাংসের শক্তি উহার আনুষঙ্গিক অবস্থায় সংক্রামিত হওয়ার ফলে ঐ আনুষঙ্গিক অবস্থাগুলি স্বাভাবিক উত্তেজকের অনুরূপ ক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারে।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সাপেক্ষ উদ্দীপকের এমন কোনো নিজস্ব শক্তি নাই যাহার ফলে উহা স্বাভাবিক উদ্দীপকের উপর নির্ভর না করিয়া সাপেক্ষ প্রতিবর্ত উৎপন্ন করিতে পারে। উহা যে শক্তিতে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে তাহা নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক উদ্দীপক হইতে ধার করা শক্তি। যদি কয়েকবার ঘণ্টাধ্বনির পরেই বা সঙ্গে সঙ্গে মাংসখণ্ড না দেওয়া হয় তাহা হইলে উহার দ্বারা উৎপন্ন লালানিঃসরণ কয়েকবার ঘটিবার পরে আর ঘটিবে না। উহা কমিতে কমিতে ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইবে। এই ঘটনাটিকে সাপেক্ষ প্রতিবর্তের লোপ (এক্সটিংশন্) বলে। সুতরাং ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে মাংসখণ্ড দিয়া ঘণ্টাধ্বনির লালানিঃসরণের উৎপাদনশক্তি বর্ধিত করিয়া লইতে হয়। নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত সাপেক্ষ উদ্দীপককে এইরূপ মাঝে মাঝে অনুষক্ত করিয়া উহার শক্তিবৃদ্ধিকে **বর্ধনক্রিয়া** (রি-এনফোর্স্‌মেণ্ট্) বলা হয়।

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত অনেক প্রকারের হইতে পারে। যদি ঘণ্টাধ্বনি কিছুকাল চলিতে থাকিবার পর, যেমন পাঁচ, দশ বা পনর মিনিট পর, কুকুরকে মাংসখণ্ড দেওয়া হয়, তাহা হইলে লালানিঃসরণ আরম্ভ হইবে ঘণ্টাধ্বনি আরম্ভের এবং মাংসখণ্ড দেওয়ার মধ্যবর্তী সময় অতিবাহিত হইবার পর। এইরূপ সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে বলা হয় **বিলম্বিত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত** (ডিলেড্ কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স্)। এই ক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা উৎপন্ন লালানিঃসরণ সঙ্গে সঙ্গে না হইয়া কিছু বিলম্বে হয়।

আর এক প্রকার সাপেক্ষ প্রতিবর্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঘণ্টাধ্বনি খানিকক্ষণ চলিবার পর থামানো হইল এবং কিছুক্ষণ পরে মাংসখণ্ড দেওয়া হইল। এইরূপ ক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে লালানিঃসরণ উৎপন্ন হইবে না, কিন্তু ঘণ্টাধ্বনি থামিয়া যাইবার পর মাংসখণ্ড দিবার ঠিক পূর্বে এই সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে। এইরূপ সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে **রেখাত্মক সাপেক্ষ প্রতিবর্ত** (ট্রেস্ কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স্) বলে।

সহজ অথবা নিরপেক্ষ প্রতিবর্তকে যেমন সাপেক্ষ বা সপ্রতিবন্ধ প্রতিবর্তে রূপান্তরিত করা যায়, তেমন সাপেক্ষ প্রতিবর্তকেও নিরপেক্ষ প্রতিবর্তে ফিরাইয়া আনা যায়। যেমন ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা লালানিঃসরণরূপ যে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাকে নিরপেক্ষ (আন্‌কন্‌ডিশন্) করা যাইতে পারে। যদি ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার মাংসখণ্ড না দেওয়া যায়, তবে উহার ফলে লালানিঃসরণ বন্ধ হইয়া যাইবে, অর্থাৎ ঘণ্টাধ্বনি আর লালানিঃসরণ উৎপন্ন করিতে পারিবে না।

১২। ওয়াটসন্ ও সাপেক্ষ প্রতিবর্ত

শিশুর স্বাভাবিক অনুভূতি বা প্রক্ষোভকে কিরূপে সাপেক্ষ করা যাইতে পারে চেষ্টিতবাদী ওয়াট্‌সন তাহা অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার মতে শিশুর নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক প্রক্ষোভ তিনটি—যথা ক্রোধ, ভয় এবং ভালবাসা। ক্রোধের স্বাভাবিক উদ্দীপক হইল শিশুর স্বাধীন বিচলনকে বাধা দেওয়া। এইরূপে উচ্চ শব্দ করা বা আশ্রয়চ্যুত এবং আদর করা বা গায়ে হাত বুলানো হইল যথাক্রমে ভয় এবং ভালবাসার স্বাভাবিক উদ্দীপক। এই তিনটি নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক প্রক্ষোভকে সাপেক্ষ করা যাইতে পারে। যেমন উচ্চ শব্দ স্বভাবতঃ শিশুর ভীতি উৎপাদন করে। শিশুর এই ভয় একটি সহজ অথবা নিরপেক্ষ প্রক্ষোভ। কিন্তু যে বস্তুতে শিশুর স্বাভাবিক ভয় নাই, যেমন শাদা ইঁদুর বা খেলনা, যদি সেইরূপ কোনো বস্তু উচ্চ শব্দ করিবার পুর্বে শিশুকে দেওয়া হয়, তবে ঐ বস্তুতেও শিশুর ভীতি জন্মিবে। আবার এই সাপেক্ষ ভীতিকে নিরপেক্ষ করা যাইতে পারে। ঐ সাপেক্ষ ভীতিজনক বস্তুটি উপস্থাপিত করিবার পূর্বে যদি নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক ভীতিজনক বস্তু উপস্থাপিত করা না হয় তাহা হইলে ঐ সাপেক্ষ ভীতি দূর হইবে। অবশ্য কার্যকালে দেখা যায় যে শিশুর সাপেক্ষ প্রক্ষোভ সহজে যায় না।

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত একটি বিশাল আলোচ্য বিষয়। প্যাভ্‌লো ইহার উপর বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন এবং বিছ্‌টেরিও প্রভৃতি ইহার উপর আলোকপাত করিয়াছে। বিছ্‌টেরিও সাপেক্ষ প্রতিবর্তের নাম দিয়াছেন অনুষঙ্গ প্রতিবর্ত (অ্যাসোসিয়েটেড্ রিফ্লেক্স্)। সাপেক্ষ কথাটির বদলে 'পরিবর্তিত' (ট্র্যান্সফারড্ বা সাবস্টিটিউট্) প্রতিবর্ত নামটিও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

১৩। সাপেক্ষ প্রতিবর্তের সাধারণ ধর্ম

সাপেক্ষ প্রতিবর্তের কয়েকটি সাধারণ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। (১) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত যে কোনো শিক্ষালব্ধ প্রতিক্রিয়ার মত অল্পাধিক অস্থায়ী বা অস্থির। (২) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত একটি বিশেষ সাপেক্ষ উদ্দীপকের দ্বারাই উৎপন্ন হইতে পারে কিন্তু যে কোনো উদ্দীপকের দ্বারাই উৎপন্ন হইতে পারে না। (৩) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত যোগাত্মক নিয়ম (ল' অফ্ সামেশন্) অনুসারে কাজ করে। একই সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া দুইটি সাপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত যুক্ত হইলে প্রতিক্রিয়াটি প্রবলতর হয়। (৪) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত কালক্রমে ক্ষীণ হইয়া অবলুপ্ত হয়, বিশেষতঃ যদি সাপেক্ষ উদ্দীপক নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত উপস্থাপিত হইয়া শক্তিশালী না হয়। (৫) কয়েকটি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত প্রতিষ্ঠিত হইলে একটির বিলুপ্তি অপরটির বিলোপ ঘটায় না। (৬) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ঘটিবার সময় অথবা ঠিক পূর্বে অন্য কোন উদ্দীপক উপস্থাপিত করিলে সাপেক্ষ প্রতিবর্তটি সাময়িকভাবে দুর্বল হয়। (৭) এই বাধাকে (ইন্‌হিবিশন্) আবার বাধা দেওয়া যায় (ডিজ্-ইন্‌হিবিশন্)। যেমন প্রতিকূল উদ্দীপকটিকে ব্যর্থ বলিয়া বুঝিলে ইহা বাধা জন্মাইতে পারে না। (৮) বৃদ্ধ ব্যক্তিদের তুলনায় অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত সহজতরভাবে উৎপন্ন করা যায়।

পরবর্তী 'শিক্ষণ' শীর্ষক পরিচ্ছেদে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৪। প্যাভ্‌লো অনুসৃত পদ্ধতি

প্যাভ্‌লো কুকুরের সাহায্যেই সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের গবেষণা করিয়াছেন। পশুটিকে যেখানে শব্দ ঢুকিতে পারে না এমন বদ্ধ ঘরে ঢিলা করিয়া বাঁধিয়া রাখা প্রয়োজন। ঘরের বাহির হইতে একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সাহায্যে কুকুরটিকে খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা বিধেয়। প্যারোটিড্ গ্রন্থি হইতে লালানিঃসরণের পরিমাপ

করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে প্যাভ্‌লো তাঁহার কুকুরের গণ্ডদেশ কাটিয়া উহার ভিতরে একটি পরিমাপ-নল স্থাপন করিলেন। নিঃসৃত লালা এই নলে সঞ্চিত হইত এবং নলের দাগ বা চিহ্ন দিয়া উহার পরিমাণ স্থির করা যাইত। আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় এই যে পরীক্ষাগার বা প্রয়োগশালার অবস্থায় পশুটিকে অভ্যস্ত করিয়া লইতে হইবে।

প্যাভ্‌লো-র উদ্দেশ্য

প্যাভ্‌লো একজন প্রসিদ্ধ শারীরবৃত্তবিৎ। তিনি সাপেক্ষ প্রতিবর্তের গবেষণায় কোনো মনোবৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সাপেক্ষ প্রতিবর্তে ক্রিয়াশীল উচ্চতর মস্তিষ্ক পথগুলি আবিষ্কার করা এবং ক্লান্তি, নিদ্রা প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় সমস্যার সমাধান বাহির করা।

কিন্তু তাঁহার গবেষণা ফল শুধু শারীরবৃত্তে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। শিক্ষণ মত সম্বন্ধে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটাইয়াছে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ। শিক্ষণ শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে। যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

উডওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস —সাইকলজি—অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদ

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্ —এলিমেণ্ট্‌স্ অফ্ সাইকলজি—পঞ্চম, সপ্তম পরিচ্ছেদ, গ্লসারি

জি এফ্. স্টাউট —ম্যানুয়্যাল্ অফ্ সাইকলজি—ভূমিকা—তৃতীয় পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ

বোরিং, ল্যাংফেল্ড, ওয়েল্ড্ —ফাউণ্ডেশনস্ অফ্ সাইকলজি—তৃতীয় ও সপ্তম পরিচ্ছেদ

এম্ কলিন্‌স্, জে ড্রিভার —এক্স্‌পেরিমেণ্টাল সাইকলজি—অষ্টম পরিচ্ছেদ

পি. স্যাণ্ডিফোর্ড —এড়ুকেশন্যাল্ সাইকলজি—পঞ্চম ও নবম পরিচ্ছেদ

জি মার্ফি —জেনারাল্ সাইকলজি—তৃতীয় ও ষোড়শ পরিচ্ছেদ

Exercise

1 Define 'reaction-time' What are the physiological processes involved in it ? Or, what are the causes of 'reaction-time' ? (pp 136-137)

2 Distinguish between the different types of 'reaction-time' with examples of each. (pp 137-139)

3. What are the 'periods' in a 'reaction-time' experiment ? (p. 139)

4. Distinguish between sensory and motor reaction-time (pp. 139-141)

5. Briefly explain some of the 'reaction-time' experiments made by Cattell. (pp. 141-144)
6. What is reflex action ? Explain its characteristics. (pp. 144-145)
7. Explain, with a diagram, the reflex arc. (pp. 146-147)
8. Show the reflex arc of different levels (pp 147-151)
9. Bring out the importance of reflex action in psychology. Distinguish between physiological and conscious reflexes. (p. 151)
10 Explain, with examples, the conditioned reflex. How does it differ from the simple reflex ? (pp. 151-153)
11 How is a conditioned reflex established ? (pp. 151-155)
12. Show how Pavlov carried on his C R experiments (pp. 151-155, 156-157)
13 What do you mean by "re-enforcement," "extinction", "inhibition" and "disinhibition" ? (pp 154-155)
14 Write short notes on 'delayed conditioned reflex' and 'trace conditioned reflex'. (pp 154-155)
15. Point out briefly Watson's contributions to the conditioning of emotions. (pp. 155-156)
16. Explain the general properties of the conditioned reflex. (p. 156)
17. Explain the method and purpose of Pavlov's experiments on the conditioned reflex. (pp. 156-157)

নবম পরিচ্ছেদ

কর্মসম্পাদক গ্রন্থিগুলির গঠন এবং ক্রিয়া

এণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ড্স্ঃ স্ট্রাক্‌চারস্ অ্যাণ্ড্ ফাংশন্স্

১। গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড্-এর শ্রেণীভেদ এবং অবস্থান

মোটর বা চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহ যে শুধু পেশীকেই সক্রিয় করে তাহা নয়, ইহা গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড্‌কেও সক্রিয় করিয়া তোলে। গ্রন্থির ক্রিয়া বলিতে উহা হইতে শক্তিশালী রসের ক্ষরণ বুঝায়। গ্রন্থির ক্ষরিত রসকে হরমোন্ বা অটাকয়েড্ বলে।

গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড দুই শ্রেণীর—যথা অন্তঃক্ষরা বা নালিকাবিহীন গ্রন্থি (ডাক্টলেস্ গ্ল্যাণ্ড্) এবং বহিঃক্ষরা বা নালিকাযুক্ত (ডাক্ট্ গ্ল্যাণ্ড্স্) গ্রন্থি।

থাইরয়েড্, এড্রিনেল্, পিটুইটারি প্রভৃতি গ্রন্থিগুলির কোনো নল (ডাক্ট্) নাই যাহার মধ্য দিয়া উহাদের ক্ষরিত রস শরীরের বাহিরে নিঃসৃত হইতে পারে। উহাদের ক্ষরিত রস শরীরের মধ্যেই থাকে। শরীর ঐ ক্ষরিত রস শোষণ করিয়া লয় এবং ঐ রস হইতে নিজ বল ও পুষ্টি আকর্ষণ করে।

আবার যৌন গ্রন্থি (গোনাড্স্), লালা গ্রন্থি (প্যারোটিড্ গ্ল্যাণ্ড্), অশ্রুগ্রন্থি (ল্যাক্রিম্যাল্ গ্ল্যাণ্ড্স্), স্বেদ গ্রন্থি (সোয়েট্ গ্ল্যাণ্ড্) প্রভৃতি নলযুক্ত (ডাক্ট্) গ্রন্থিগুলি যে রসক্ষরণ করে তাহা কোনো নলপথের মধ্য দিয়া শরীরের বাহিরে উপ্‌চাইয়া পড়ে।

থাইরয়েড্ বা গলগ্রন্থি গ্রীবাদেশে স্বরযন্ত্রের কিছু নিম্নে অবস্থিত। ইহার কোনো রসনিঃস্রাবী ডাক্ট্ বা নল নাই। থাইরয়েড্ যে আঠাল, শ্লেষ্মা জাতীয় তরল পদার্থ ক্ষরণ করে তাহাকে থাইরক্সিন্ বলে। থাইরয়েড্-এর অধিক (হাইপার্) এবং অল্প (হাইপো) রসক্ষরণ মানুষের মন ও শরীরের উপর অসামান্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

পিটুইটারি আর একটি নলহীন গ্রন্থি। ইহা মস্তিষ্কের নিম্নদেশে অপ্‌টিক্ বা দর্শন নার্ভের নির্গমন পথের নিকট অবস্থিত। ইহা ডিম্বাকৃতি এবং পরিমাণে একটি ছোলার মত। ইহা পিটুইটিন্ নামক এক প্রকার শক্তিশালী হরমোন্ ক্ষরণ করে। এই গ্রন্থির অতিরিক্ত ও অল্প ক্রিয়াশীলতা মনুষ্য-মন ও দেহের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করে।

এড্রিনেল্ আর একটি নলহীন গ্রন্থি। ইহা মূত্রযন্ত্রের (কিড্‌নী) মাথায় টুপীর মত অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার ক্ষরণকে এড্রেলিন্ বলে। এই হরমোন্‌কে আপৎকালীন বা এমার্জেন্সী হরমোন্ বলা হয়—কারণ ভয়ের বা ক্রোধের উত্তেজনায় পলায়ন বা আক্রমণ করিয়া আত্মরক্ষার শক্তি জোগায় এই হরমোন্। উপরে গ্রন্থিগুলির সাধারণ পরিচয় দেওয়া হইল মাত্র। এইবার গ্রন্থিগুলির বিস্তৃততর আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাউক।

এই গ্রন্থিগুলিব অবস্থান ২২ নং চিত্রে দ্রষ্টব্য। অধিকাংশ বহিঃক্ষরা গ্রন্থি দেহের অত্যন্ত অভ্যন্তরে অবস্থিত। কাজেই, উহাদিগকে দেখানো সম্ভব নয়।

২। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (ডাক্ট্‌লেস্ গ্ল্যাণ্ড্‌স্)

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি শরীর ও মনের ক্রিয়াকে অসামান্য ভাবে প্রভাবিত করে। ইহাদের ক্ষরিত রস শরীরের বাহিরে নির্গত হইবার কোনো পথ বা দ্বার পায় না। কাজেই এই রস রক্তের সহিত মিশিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির ক্ষরিত রস একপ্রকার বিশেষ শক্তিশালী পদার্থ। এই রস শরীরের সকল যন্ত্রে ক্রিয়া করে বলিয়া ইহাকে বলা হয় রাসায়নিক বার্তাবহ (কেমিক্যাল মেসেন্‌জারস্), হরমোন্ বা অটাকয়েড্।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলিকে এন্‌ডোক্রিন অর্গ্যান বলা হয়, কারণ ইহারা ইহাদের ক্ষরিত রস শরীরের দ্বারগুলি দিয়া বাহির না করিয়া রক্তের সহিত মিশাইয়া দেয়।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির সংখ্যা অনেক—যেমন থাইরয়েড্, প্যারাথাইরয়েড্, থাইমাস্, পিনিয়াল্, পিটুইটারি, সুপ্রারেনাল্ বা এড্রিনেল্, প্যান্‌ক্রিয়্যাজ্-এর অংশ, যৌনগ্রন্থির অংশ, প্রভৃতি।

মানুষের আচরণ ও ব্যক্তিত্বের উপর সকল অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির রসক্ষরণই প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু ইহার উপর থাইরয়েড্, এড্রিনেল্ এবং পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণই সমধিক প্রভাবশালী।

(ক) থাইরয়েড্ ও প্যারাথাইরয়েড্ গ্ল্যাণ্ড্—থাইরয়েড্ গ্রন্থি দুইটি বেগুনী রং-এর ডিম্বাকৃতি অংশ। ইহারা স্বরযন্ত্র এবং শ্বাসনালীর দুই দিকে অবস্থিত। উহার প্রত্যেকটির পাশে দুইটি করিয়া, সাকুল্যে চারটি প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থি অবস্থিত। থাইরয়েড্ ও প্যারাথাইরয়েডের ক্রিয়া বিভিন্ন। মাথা পিছনে ঝুঁকাইয়া গিলিলে আয়নায় থাইরয়েড্ গ্রন্থিপিণ্ডটি সহজেই দেখা যাইতে পারে।

থাইরয়েড্-এর ক্ষরিত রসকে থাইরক্সিন্ বলে। এই রস কম বা বেশী পরিমাণে ক্ষরিত হইলে ব্যক্তিত্বের নানারূপ বিকৃতি ঘটে। থাইরক্সিন্ কম হইলে (হাইপো-থাইরয়েডিজ্‌ম্) শিশু বামন (ক্রেটিন্) হইয়া থাকে। এই অবস্থাকে বলে খর্বকায়তা (ক্রেটিনিজ্‌ম্)। ক্রেটিন্ শিশুর বুদ্ধি কমিয়া যায় এবং সে উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে অসমর্থ হয়। আবার বয়স্ক লোকদিগের থাইরক্সিন্ কম হইলে তাহাদের মাইক্সিডেমা নামক রোগ হয়। এই সকল ব্যক্তি অলস, কর্মবিমুখ এবং নিস্তেজ হয়। তাহাদের যৌন ক্ষমতার বিকাশ হয় না এবং তাহারা বিনা কারণেই ঝিমাইয়া বা ঘুমাইয়া পড়ে।

আবার থাইরক্সিন্ অধিক পরিমাণে (হাইপার-থাইরয়েডিজ্‌ম্) নিঃসৃত হইলেও শরীর ও মনের নানা বিকৃত অবস্থা ঘটে। এই রসের আধিক্য হইলে গলগণ্ড (এক্সফ্‌থ্যাল্‌মিক্ গয়টার) দেখা দেয়। ইহার ফলে অনিদ্রা (ইন্-সোম্‌নিয়া) ও সর্বাঙ্গীন অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য ঘটে। তাহা ছাড়া শরীরের ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুততালে চলিতে থাকে, যেমন হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি জৈবক্রিয়াগুলি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে থাইরয়েড্ গ্রন্থি দেহ ও মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ইহার স্বাভাবিক ক্ষরণের উপর শরীর ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ নির্ভর করে।

আবার প্যারাথাইরয়েড্-এর রসক্ষরণও সাধারণভাবে শরীর ও মনের নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করে। ইহার অভাব হইলে চরম অস্থিরতা, অবসাদ, পেশীয় দুর্বলতা প্রভৃতি দৈহিক ও মানসিক বিপর্যয় ঘটে। ফলে শরীর ও মনের অবনতি হয়। আবার ইহার আধিক্য হইলে বিপরীত কুফলগুলি উৎপন্ন হয়।

থাইরয়েড্-এর ক্রিয়াকে হাপরের বাতাসের সহিত তুলনা করা যায়। বাতাস না থাকিলে আগুন নিভিয়া যায়। বাতাস থাকিলে আগুন প্রখরভাবে জ্বলে।

কেহ কেহ মন ও ব্যক্তিত্ব-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে থাইরয়েড্ গ্রন্থির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, যেন ইহাই একমাত্র মন ও ব্যক্তিত্বের নিয়ামক। অনুভূতি বা প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে থাইরয়েড্ গ্ল্যাণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সত্য, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুভূতি বা প্রক্ষোভও থাইরয়েড্ গ্ল্যাণ্ডের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে, অর্থাৎ ইহারা পরস্পর নির্ভরশীল।

প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থিও যে প্রক্ষোভের সাম্য (ইমোশনাল্ স্টেবিলিটি) নিয়ন্ত্রণ করে তাহা দেখা গিয়াছে। তাহা ছাড়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থি চারটি দেহের ক্যাল্‌সিয়াম

ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে। ক্যাল্‌সিয়াম ব্যবহারের ফলেই দন্ত এবং অস্থি ঠিক মত গঠিত হয়। সুতরাং প্যারাথাইরয়েড্‌ গ্রন্থির গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।

(খ) এড্রিনেল্‌ অথবা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি—এড্রিনেল গ্রন্থি বলিতে দুইটি ক্ষুদ্র, পীতাভ ত্রিভুজাকৃতি যন্ত্র বুঝায়। ইহারা বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থির উপর দুইটি টুপীর মত চাপানো থাকে। ইহাদের প্রত্যেকটির আবার স্বতন্ত্র ক্ষরণশীল অংশ রহিয়াছে, যথা উহাদের কেন্দ্রকে বলা হয় এড্রিনেল মেডুলা এবং বহিরাবরণকে বলা হয় এড্রিনেল কর্টেক্স্‌। এড্রিনেল কর্টেক্স্‌ কতগুলি পদার্থ নিঃসরণ করে এবং এইগুলিকে একসঙ্গে কর্টিন্‌ বলা হয়। কর্টিন্‌-এর ক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। তবে ইহা ঠিক যে জীবনের কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইলে কর্টিন্‌-এর দরকার। কর্টিন্‌ বেশী নিঃসৃত হইলে নারীদের দেহে ও মনে পুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, অথবা অত্যধিক কর্টিন্‌ কি নারী কি পুরুষ উভয়েরই যৌন বিকাশ ব্যাহত করে। আবার কর্টিন্‌-এর ক্ষরণ কম হইলে শরীরের কৃশতা, অবসাদ ও দুর্বলতা ঘটে।

এড্রিনেল মেডুলা যে পদার্থ ক্ষরণ করে তাহার নাম এড্রিনেলিন, এড্রিনিন বা এপিনেফ্রিন্‌। জীবন ধারণের পক্ষে এড্রিনিন্‌, তেমন প্রয়োজনীয় নয়। অথচ আপৎকালীন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইলে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এড্রিনিন প্রাণীকে বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত করে। এই কারণে ক্যানন্‌ এড্রিনেল্‌ গ্রন্থিকে আপৎকালীন (এমারজেন্সি গ্ল্যাণ্ড্‌) বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া এই গ্রন্থি সমবেদী নার্ভতন্ত্রের (সিম্‌প্যাথেটিক্‌ নার্ভাস্‌ সিস্টেম্‌) দ্বারা পরিচালিত হয়। আবার সমবেদী নার্ভতন্ত্রের দ্বারা উদ্দীপিত প্রায় সকল প্রান্তীয় যন্ত্রের ক্রিয়াকেই ইহা সাহায্য করে।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে এড্রিনিন্‌ দেহের বিভিন্ন অংশের রং (পিগ্‌মেণ্ট্‌), চর্মে চুলের উন্মেষ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। বেদনা, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি প্রবল প্রক্ষোভগুলির প্রকাশও ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অধ্যাপক ক্যানন্‌ দেখাইয়াছেন যে প্রবল প্রক্ষোভে রক্তের এড্রিনিন্‌ পরিমাণে বাড়িয়া যায়। তিনি আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে এড্রিনিন্‌ যকৃৎ হইতে রক্তশর্করা (ব্লাড্‌-সুগার) রেখাঙ্কিত পেশীতে (স্ট্রাইপ্‌ড্‌ মাস্‌ল্‌) সরবরাহ করিয়া উহার শক্তি বাড়ায়, আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের (ভিসারাল্‌ অর্গ্যান্‌স্‌) পেশীর ক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করে, রক্তের চাপ-বাঁধা (কো-অ্যাগুলেশন অফ্‌ ব্লাড্‌) বাড়ায়, হৃৎস্পন্দন এবং ফুসফুসের ক্রিয়া দ্রুততর করে, স্বেদগ্রন্থির ক্রিয়া বৃদ্ধি করে এবং আরও নানা পরিবর্তন

ঘটায়। মোটের উপর, ক্যানন্ দেখাইয়াছেন যে এড্রিনেল গ্ল্যাণ্ড্ একটি জরুরী বা আপৎকালীন গ্রন্থি (এমারজেন্সি গ্ল্যাণ্ড্)। ইহা মানুষকে হয় যুদ্ধে অথবা পলায়নে প্রস্তুত করে।

এই গ্রন্থির ক্রিয়া সম্বন্ধে আরও জ্ঞান লাভ করিবার জন্য 'ব্যক্তিত্ব' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(গ) *পিটুইটারি গ্রন্থি*—পিটুইটারি গ্রন্থি একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র। ইহা আকারে একটি ডিমের এবং পরিমাণে একটি মটর দানার মত। ইহার অবস্থান মস্তিষ্কের ঠিক নীচে, অপ্‌টিক নার্ভের নিকটে।

পিটুইটারি গ্রন্থির দুইটি অংশ—সামনের অংশটিকে বলা হয় অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি এবং পেছনের অংশটিকে বলা হয় পষ্টিরিয়র্ পিটুইটারি।

এই গ্রন্থির ক্ষরিত রসকে বলা হয় পিট্যুইটিন্। অ্যান্টিরিয়র বা সাম্‌নের অংশটির ক্ষরণ কম হইলে শরীরের তাপ (বডি টেম্‌পারেচার্) কমিয়া যায়, চলন (মুভ্‌মেণ্ট্) অস্থির হয়, শীর্ণতা, উদরাময় প্রভৃতি রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। আবার ইহার ক্ষরণ অত্যধিক হইলে জাইগ্যান্টিজ্‌ম্ বা বিরাটকায়তা ঘটে। দেহের পূর্ণ বিকাশের পর ইহার ক্ষরণ বেশী হইলে এক্রমেজেলি নামক অবস্থা প্রকাশ পায়। এক্রমেজেলি ঘটিলে দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক থাকিয়া হাত, পা, নাক প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি অতিমাত্রায় বড় হয়।

আবার পিটুইটারি গ্রন্থির পেছনের বা পষ্টিরিয়র অংশটিও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। ইহা আভ্যন্তরীণ অঙ্গের (ভিসার‍্যাল্) পেশীশক্তি, মূত্রগ্রন্থি, স্তনগ্রন্থি এবং অন্যান্য গ্রন্থিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইহার রসক্ষরণ কম হইলে শরীর স্থূল হয়, মানসিক এবং যৌন বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

থাইরয়েড্ গ্রন্থির মত পিটুইটারি গ্রন্থিও শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের স্বাভাবিক বিকাশ ও আচরণ এই গ্রন্থির স্বাভাবিক-ক্রিয়ার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

পিটুইটারি গ্রন্থি যে শরীর ও মনের স্বাভাবিক বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে শুধু তাহাই নয়। ইহা কতগুলি শক্তিশালী পদার্থ বা হরমোন্ নিঃসরণ করে যাহা অন্যান্য গ্রন্থির রসক্ষরণকে সাহায্য করে বা বাধা দেয়। এই জন্য পিটুইটারি গ্রন্থিকে প্রধান বা অভিভাবক গ্রন্থি (মাস্টার গ্ল্যাণ্ড্) বলা হইয়া থাকে।

পিটুইটারি গ্রন্থি আরও কতকগুলি রসক্ষরণ করে এবং সেইগুলি শারীর বিপাকের (বডি মেটাবলিজ্‌ম্) উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। এই রসগুলির মধ্যে একটির নাম বৃদ্ধিমূলক রস (গ্রউথ্ হরমোন্)। ইহা শিশুর বৃদ্ধি-হারকে নিয়ন্ত্রিত করে। পুর্বেই বলা হইয়াছে যে এই হরমোন্-এর অভাব ঘটিলে শিশু বামন বা খর্বকায় হইয়া থাকে এবং ইহার আতিশয্য ঘটিলে শিশু বিরাটকায় হয়।

পিটুইটারি গ্রন্থি ব্যক্তিত্বকে কিরূপে নিয়ন্ত্রিত করে তাহা ব্যক্তিত্ব শীর্ষক পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

(ঘ) থাইমাস্ গ্রন্থি—থাইমাস্ গ্রন্থি আর একটি অন্তঃক্ষরা বা নলবিহীন (ডাক্ট্‌লেস্) গ্রন্থি। ইহা গলার নীচে অবস্থিত। ইহার রাসায়নিক ক্রিয়া এখনও অজ্ঞাত। তবে ইহার রসক্ষরণের উপরও যে শরীর ও মনের বিকাশ নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থির বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার ক্রিয়া শৈশবেই সীমাবদ্ধ। এই গ্রন্থিটি কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

(ঙ) পিনিয়াল্ গ্রন্থি—পিনিয়াল্ গ্রন্থিও একটি অন্তঃক্ষরা বা নলবিহীন গ্রন্থি। ইহা দেখিতে অনেকটা বেগুনী রং-এর অঙ্কুরের মত। ইহা মস্তিষ্কের পশ্চাতে অবস্থিত।

সম্ভবতঃ পিনিয়াল্ গ্রন্থির ক্ষরণ জননযন্ত্রের বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই গ্রন্থিটির ক্রিয়াও থাইমাস্ গ্রন্থির ন্যায় শৈশবে সীমাবদ্ধ, কারণ ইহা কৈশোরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

কতগুলি নিম্নস্তরের মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণীতে ইহা তৃতীয় মধ্যক চক্ষু (থার্ড মিডিয়ান আই) রূপে বর্তমান বলিয়া মনে হয়। ইহাদের মধ্যমস্তিষ্কের কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা অংশের উপর ইহা অবস্থিত। দেকার্তে মনে করেন যে আত্মার অধিষ্ঠান হইল পিনিয়াল্ গ্ল্যাণ্ড্ (লোকেশন অফ্ দি সোল)। তাঁহার মতে ইহাই আত্মা এবং দেহের সংযোগস্থল।

(চ) প্যান্‌ক্রিয়াজ্ গ্রন্থি—প্যান্‌ক্রিয়াজ্ গ্রন্থি পাকস্থলীর নিম্ন প্রাচীরে অবস্থিত। প্যান্‌ক্রিয়াজ্ গ্রন্থি দুইটি অংশে বিভক্ত। ইহার বাহিরের অংশ একটি বহিঃক্ষরা (ডাক্ট্) গ্রন্থি। কিন্তু ইহার কেন্দ্রীয় অংশ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। কেন্দ্রীয় অংশটি কতগুলি কোষ-গুচ্ছ দিয়া তৈয়ারী। ইহার নিঃসৃত হরমোন্‌কে ইন্‌সুলিন্ বলে। এই ইন্‌সুলিন্-এর আবিষ্কার চিকিৎসা-বিদ্যায় বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। যেমন ডায়াবিটিস্ রোগীর দেহে ইন্‌সুলিন্-এর অভাব হয় এবং তাহার দেহে কৃত্রিম উপায়ে ইন্‌সুলিন্ দিয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে হয়।

ইন্‌সুলিন্ কম হইলে রক্তশর্করার (ব্লাড্ সুগার) বৃদ্ধি হয়, আবার ইহা বাড়িয়া গেলে রক্তশর্করা কমিয়া যায়। স্বাস্থ্যের পক্ষে রক্তশর্করার পরিমাণ ঠিক সেইটুকুই হওয়া দরকার নার্ভতন্তুর ইন্ধন (ফুয়েল) জোগাইবার জন্য যতটুকু লাগে। শরীরে রক্তশর্করা বেশী হইলে বুঝা যায় মস্তিষ্ক উহার প্রয়োজনীয় খাদ্য পাইতেছে না। আবার শরীরে রক্তশর্করা কম হইলে বুঝায় যে ইন্‌সুলিন্ হর্‌মোন্ বাঁড়িয়া গিয়াছে।

প্যান্‌ক্রিয়াজ্-এর বহিরংশ একটি বহিঃক্ষরা গ্রন্থি। ইহার কাজ হইল হজমি রস (গ্যাস্ট্রিক্ জুস্) নিঃসরণ করা। এই রস হজম ক্রিয়ার সহায়তা করে।

(ছ) গোনাড্‌স্ বা যৌনগ্রন্থি—যৌনগ্রন্থির পারিভাষিক নাম হইল গোনাড্‌স।

পুরুষের যৌনগ্রন্থি বলিতে বুঝায় টেস্টিজ্ বা অণ্ডকোষ এবং নারীর যৌনগ্রন্থি বলিতে বুঝায় ডিম্বাশয় বা ওভারিজ্। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উহারা জোড়ায় জোড়ায় থাকে। যৌনগ্রন্থিগুলি কয়েকটি পরস্পরসম্বদ্ধ শক্তিশালী পদার্থ বা হর্‌মোন্ নিঃসরণ করে। পুরুষের যৌন হর্‌মোন্ নারীর যৌন হর্‌মোন্ হইতে পৃথক।

যৌন হরমোন শিশুতে সক্রিয় হয় না। কৈশোর আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যৌন গ্রন্থি যে রসক্ষরণ করে তাহার ফলে যৌবন লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই যৌবন লক্ষণগুলিকে গৌণ যৌনলক্ষণ (সেকেণ্ডারি সেক্সুয়াল্ ক্যারেক্টার্) বলে। গৌণ যৌনলক্ষণগুলি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের গোঁফের রেখা এবং রোম দেখা দেয়, গলার স্বর গভীরতর হয় —স্ত্রীলোকের মাসিক রজঃস্রাব আরম্ভ হয়, তাহার বক্ষস্থল প্রশস্ত হয় এবং মাথা হইতে কোমর পর্যন্ত শরীরের অংশ এবং নিতম্ব বৃদ্ধি পায়। এই পার্থক্যগুলি প্রকাশিত হইলেই কিশোর-কিশোরীর আচরণে মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

পুরুষের অণ্ডকোষ (টেস্টিজ্) হইতে যে শক্তিশালী পদার্থ বা হর্‌মোন্ নিঃসারিত হয় তাহার নাম অ্যান্‌ড্রোজেন এবং নারীর ডিম্বাশয় হইতে যে

শক্তিশালী পদার্থ বা হর্‌মোন্ নিঃসারিত হয় তাহার নাম এস্ট্রোজেন্। প্রধান অ্যান্‌ড্রোজেনকে বলে টেস্টোস্টেরোন্। ইহারই প্রভাবে বালক যুবকে পরিণত হয়, তাহার যৌনযন্ত্র পরিণত হয় এবং গৌণ যৌন লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

কাজেই অ্যান্‌ড্রোজেন্‌কে শুধু যৌন পদার্থ বা হরমোন বলা যথেষ্ট নয়। ইহা পুরুষের বিপাক (মেটাবলিজ্‌ম্) ক্রিয়াকে সাহায্য করে এবং শরীর ও মনের নানা লক্ষণ নিয়ন্ত্রিত করে। আবার নারীর এস্ট্রোজেন্ সম্পর্কেও একই কথা খাটে।

দেখা যাইতেছে যে যৌনগ্রন্থি শুধু বহিঃক্ষরা গ্রন্থিই নয় অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিও বটে। ইহার রস কতক পরিমাণে দেহযন্ত্রের বাহিরে উপচাইয়া পড়িলেও, এই রসের কিছু অংশ ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক বিকাশে ব্যবহৃত হয়।

যৌনগ্রন্থির স্বাভাবিক বিকাশের উপর দৈহিক এবং মানসিক বিকাশ যথেষ্ট নির্ভর করে। এই গ্রন্থির অল্প বা অধিক ক্ষরণ নানাপ্রকার যৌন ও সামাজিক বিকৃতি বা অসামঞ্জস্য ঘটায়। অবশ্য যৌনগ্রন্থি যে একক ভাবে কাজ করিতে পারে তাহা নয়। আরও কয়েকটি গ্রন্থিও স্বাভাবিক যৌন বিকাশে সহায়তা করে। আমরা দেখিয়াছি যে এই গ্রন্থিগুলি প্রধানতঃ পিনিয়াল্, থাইমাস্ এবং পিটুইটারি গ্রন্থি।

৩। গ্রন্থিগুলির পরস্পরসাপেক্ষতা

গ্রন্থিগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না, কিন্তু একটি দলবদ্ধ সংগঠনের মত পরস্পর সহযোগিতায় কাজ করে। প্রমাণস্বরূপ গোনাড্‌স্ এবং থাইমাস গ্ল্যাণ্ড্-এর সামঞ্জস্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। "শৈশবের গ্রন্থি" (গ্ল্যাণ্ড্ অফ্ চাইল্ডহুড্) থাইমাস্ কৈশোরের পূর্ববর্তী বৃদ্ধি অথবা বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করে। তের হইতে উনিশ বৎসর পর্যন্ত থাইমাস্ দ্রুতভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। থাইমাস্ গ্রন্থির ক্ষয়ই যৌনগ্রন্থির ক্রিয়াকে নিয়মিত করে। থাইমাস্ যদি অতি শীঘ্র ক্ষীণ হয় তবে নবযৌবন (অ্যাডোলেসেন্স্) ত্বরান্বিত হয়, আবার ইহা অপেক্ষাকৃত বিলম্বে নিষ্ক্রিয় হইলে নবযৌবন বিলম্বিত হইয়া থাকে।[১]

[১] জি. মার্ফি—জেনারাল সাইকলজি—পৃঃ ৫৫-৫৬

তাহা ছাড়া স্বাভাবিক যৌন বিকাশে যৌন গ্রন্থির (গোনাড্‌স্) সহিত পিনিয়াল এবং পিটুইটারি গ্রন্থির সহযোগিতা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।[১]

৪। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির পরিণতি বা মেচিওরেশন্

এণ্ডোক্রিন্ গ্রন্থিগুলির পরিণতি লাভে অনেক সময় লাগে ইহারা চট্ করিয়া পরিণতি লাভ করে না। ইহার আংশিক কারণ সম্ভবতঃ এই যে মাতাই ভ্রূণকে (ফিটাস্) হর্‌মোন্ বা শক্তিশালী অন্তঃক্ষরা রসগুলি পরিবেষণ করিয়া থাকেন, যাহার ফলে ভ্রূণকে স্বয়ং রসক্ষরণ করিতে হয় না। তাহা ছাড়া, বেশীর ভাগ হর্‌মোন্ই প্রাথমিক জীবনে দরকার হয় না।

যৌনগ্রন্থি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কৈশোরের পূর্বে এই গ্রন্থি পরিণতি লাভ করে না—প্রায়ই বার বৎসরের পূর্বে বালক-বালিকাদের পুরুষ ও নারীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয় না। এই সময়ে বালকদের গোঁফের উদ্গম এবং কণ্ঠস্বরের গভীরতা এবং বালিকাদের স্তনবিকাশ ঘটিয়া থাকে। এই পরিবর্তনগুলি ঘটে যৌনগ্রন্থির বিকাশের ফলে।

৫। বহিঃক্ষরা (ডাক্ট্) গ্রন্থি

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণ মন ও শরীরের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করে সন্দেহ নাই। কিন্তু বহিঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণও যে উহাদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে তাহাও স্বীকার্য। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি প্রধানতঃ এইগুলি—লালাগ্রন্থি (প্যারোটিড্, স্যালাইভারি), হজমি গ্রন্থি (গ্যাস্ট্রিক্), যকৃৎ, প্যান্‌ক্রিয়াজ্, মূত্রগ্রন্থি (কিড্‌নি), স্বেদগ্রন্থি (সোয়েট্), অশ্রুগ্রন্থি (ল্যাক্রিম্যাল্), শ্লেষ্মাগ্রন্থি (মিউকাস্), যৌনগ্রন্থি (সেক্স্) প্রভৃতি। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলিকে বলা হয় এণ্ডোক্রিন্ এবং বহিঃক্ষরা গ্রন্থিগুলিকে বলা হয় এক্সোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ড্।

১ আবার প্যানক্রিয়াজ্ গ্রন্থি পিটুইটারি গ্রন্থির ক্রিয়াকে বাধা দেয় এবং অ্যাড্রিনেল প্যান্‌ক্রিয়াজ্-এর ক্রিয়াকে ব্যাহত করে। যৌনগ্রন্থির ক্রিয়াকে যে শুধু থাইমাস্ এবং পিনিয়াল্ গ্রন্থিই ব্যাহত করে তাহা নয়, অ্যাড্রিনেল, থাইরয়েড্ এবং পিটুইটারি গ্রন্থিও যৌনবিকাশকে বাধা দেয়। অধিকন্তু থাইরয়েড্ অত্যধিক ক্রিয়াশীল হইলে অ্যাড্রিনেল্ বেশী এবং পিটুইটারি কম সক্রিয় হয়।

জি. এল্. ফ্রীম্যান—ফিজিয়লজিক্যাল সাইকলজি—পৃঃ ১২৪-১২৫

এই গ্রন্থিগুলিকে বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলা হয়, কারণ উহাদের ক্ষরিত রস নালিকা বা প্রণালী দিয়া দেহের উপর নিঃসৃত হয়। ইহারা অধিকাংশই হজমের অথবা দূষিত পদার্থ নিঃসরণের কাজ করে। অধিকাংশ বহিঃক্ষরা
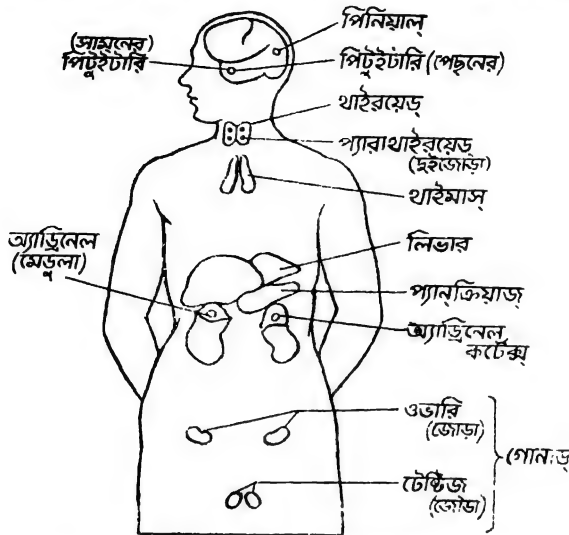
২৪নং চিত্র—প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির অবস্থান এবং নাম

গ্রন্থিই শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত বলিয়া অক্ষত দেহের উপর উহাদের গবেষণা চলে না। শুধু লালা এবং স্বেদগ্রন্থি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াই সুফল পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থির উপর প্যাভ্‌লো-এর গবেষণা প্রসিদ্ধ। তিনি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত-গবেষণায় কুকুরের লালানিঃসরণের অনুসন্ধান করিয়াছেন। হজমক্রিয়ার সহিত লালাক্ষরণের সম্বন্ধ অনস্বীকার্য। এমন কি আহার করিবার ব্যাপারেও এই ক্ষরণ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

স্বেদক্ষরণ দৈহিক বিপাকের (বডি মেটাবলিজ্‌ম্) উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। স্বাভাবিক স্বেদক্ষরণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ। গ্যাল্‌ভ্যানিক্ চর্ম—প্রতিক্রিয়া (গ্যাল্‌ভ্যানিক্ স্কিন্ রেস্‌পন্স্) স্বেদক্ষরণের উপর নির্ভর করে। গ্যাল্‌ভানোমিটার যন্ত্রের চক্র (সার্কিট্) দিয়া যে তড়িৎপ্রবাহ চর্মের উপর ক্রিয়া করে স্বেদক্ষরণের জন্যই চর্ম তাহাতে প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে। এই প্রতিক্রিয়া প্রক্ষোভের সূচক বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিয়াছে।

'ব্যক্তিত্ব' পরিচ্ছেদে বহিঃক্ষরা গ্রন্থির ক্রিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

উড্‌ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস্—সাইকলজি —ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড—এলিমেণ্ট্‌স্ অফ্ সাইকলজি—তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বোরিং, ল্যাংফেল্ড, ওয়েল্ড্—ফাউণ্ডেশনস্ অব্ সাইকলজি—দ্বিতীয় „

জি. এল্ ফ্রীম্যান্—ফিজিয়লজিক্যাল্ সাইকলজি—অষ্টম „

জি. মার্ফি—জেনার‍্যাল্ সাইকলজি— চতুর্থ „

পি. স্যাণ্ডিফোর্ড—এডুকেশন্যাল্ সাইকলজি— তৃতীয় „.

Exercise

1. What are the endocrine organs of the body ? Show their positions in the body by means of a diagram. (pp 159-160 ; 168)
2. Point out the principal ductless glands of the body. Briefly explain their functions. (pp 160-167)
3 Explain the structure, position and function of the thyroid and the parathyroid glands. (pp 160-161)
4 What do you know of the adrenal gland ? Why is it called the emergency gland ? (pp 162-163)
5. Explain the structure, position and function of the pituitary gland. Why is it called the master gland ? (pp 163-164)
6 Write short notes on the thymus, pineal and the pancreas glands. (pp 164-165)
7. Explain the function of the gonads in the development of the human organism. (pp 165-166)
8. Explain the interaction of the endocrine organs and their maturation. (pp 166-167)
9 What are the main ductless glands ? Point out their functions. What do you mean by the galvanic skin response ? (pp 167-168)
10 Distinguish between the endocrine and the exocrine organs (pp 159-160)

দশম পরিচ্ছেদ

দেহ ও মন—মাইণ্ড্ অ্যাণ্ড্ বডি

১। মনোবিদ্যায় দেহ-মন সম্বন্ধে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা

দেহ ও মনের নিবিড় সম্বন্ধ ধরিয়া লইয়াই মনোবিদ্যা মানসজীবনের শারীর ভিত্তির আলোচনা করে। আবার এইরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই মনোবিদ্যায় নার্ভ্‌তন্ত্র, গ্রন্থি, পেশী, ইন্দ্রিয়যন্ত্র প্রভৃতি দৈহিক বিষয়গুলির আলোচনা অপরিহার্য। এই সব বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

অবশ্য কোনো কোনো মনোবিৎ মন বা চেতনার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে নার্ভক্রিয়ার একক হিসাবে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধ বুঝিলেই মনোবিদ্যার সকল সমস্যা বুঝিতে পারা যায়। চেষ্টিত বা আচরণই ইহাদের মতে মনোবিদ্যার বিষয় এবং এই বিষয় আলোচনায় মন বা চেতনার বালাই নাই। সুতরাং চেষ্টিতবাদী মনোবিদ্‌গণের পক্ষে শরীর ও মনের সম্বন্ধ আলোচনা পণ্ডশ্রম মাত্র। সাম্প্রতিক কালের মনোবিদ্যাগ্রন্থগুলি খুলিলে দেহ-মনের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা চোখে পড়ে না। চেষ্টিতবাদ-প্রভাবিত মনোবিদ্যায় এই আলোচনার স্থান নাই।

কিন্তু চেষ্টিতবাদীর এই জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীই মনোবিদ্যার একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী নয়। ডবলু. কে. ক্লিফোর্ড প্রভৃতির মনোবাদ চেষ্টিতবাদের বিপরীত প্রতিক্রিয়া। ইহাদের মতে জড় পদার্থও চেতন এবং চেতনা ছাড়া কোনো আসল সত্তা নাই। এই মতেও দেহ-মনের সম্বন্ধ মনোবিদ্যার আলোচ্য নয়।

এই জাতীয় চরম মতবাদিগণের বক্তব্য গ্রহণ করিলে শরীর ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। অবৈজ্ঞানিক জড়বাদ (নেইভ্ মেটিরিয়্যালিজ্‌ম্) মনকে জড়পদার্থের বিকার বলিয়া মনে করে। যকৃৎ যেমন পিত্ত নিঃসরণ করে, তেমন মস্তিষ্কও চিন্তা নিঃসরণ করে (দি ব্রেন্ সিক্রিট্‌স্ থট্ অ্যাজ্ দি লিভার সিক্রিট্‌স্ বাইল্)। আবার এপিফেনমেনালিজ্‌ম্ নামধেয় জড়বাদ বলিয়া থাকে যে মানসঘটনাগুলি মস্তিষ্কীয় পরিবর্তনের আনুষঙ্গিক গৌণ ফল মাত্র।

কিন্তু এই সকল মতামতের প্রশ্ন মনোবিত্মার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয়। মনোবিত্মার পক্ষে চেতনা একটি স্বসংবেত্ম সত্য। অভিজ্ঞতার দিক দিয়া চেতনার বাস্তবতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তত্ত্বের দিক দিয়া মন বা চেতনার স্থান কি তাহা মনোবিত্মার বিচার্য নয়, কিন্তু তত্ত্ববিত্মার বিচার্য। বাস্তব অভিজ্ঞতাই (পজিটিভ্ এক্সপেরিয়েন্স্)—মনোবিত্মার বিষয়। সুতরাং চেতনার বাস্তবতা অস্বীকার করিবার প্রশ্ন ওঠে না। আবার চেতনা যে দেহাশ্রিত হইয়া কাজ করে তাহা অস্বীকার করাও অর্থহীন। মন বা চেতনা একটি অনুভূত সত্য এবং ইহার সহিত দেহের বাস্তব সম্বন্ধও একটি পরিচিত ঘটনা। সুতরাং খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে মনোবিত্মা প্রশ্ন তোলে যে শরীর ও মনের সম্বন্ধ কি। মনের কোনো ক্রিয়াই শরীরের উপর নির্ভর না করিয়া ঘটে না। মনোবিত্মা যে মন সম্বন্ধে আলোচনা করে তাহা অশরীরী মন নয়, কিন্তু শরীরী মন। সুতরাং শরীর ও মনের সম্বন্ধ কি এই প্রশ্ন মনোবিত্মার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

দেহ-মন-সম্বন্ধ বিষয়ে মতবাদের অন্ত নাই। সকল মতবাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে মত দুইটি মনোবিত্মায় এবং দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিয়াছে উহারা হইতেছে অন্যোন্য ক্রিয়াবাদ অথবা মিথস্ক্রিয়াবাদ (ইন্টার্যাক্‌শনিজ্‌ম্) এবং সমান্তরালবাদ বা প্যারালেলিজ্‌ম্। সুতরাং শরীর ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে এই দুইটি মতের বক্তব্য আলোচনা করা যাউক।

২। অন্যোন্য-ক্রিয়াবাদ বা ইন্টার্যাক্‌শনিজ্‌ম্

দার্শনিক ভূমিকা

অন্যোন্য-ক্রিয়াবাদ বা মিথস্ক্রিয়াবাদ (ইনটার্যাক্‌শনিজম্) মতে দেহ ও মন এই দুইটিই সত্য, কিন্তু ইহারা পরস্পরবিরুদ্ধ বিপরীত পদার্থ। শরীরের ধর্ম হইল বিস্তার (এক্সটেন্‌শন্) অথবা খানিকটা জায়গা জুড়িয়া থাকা। যেমন চেয়ার, টেবিল, বই, কলম প্রভৃতির বিস্তার বা পরিমাণ আছে, কারণ উহারা ঘরে, মেজেতে, শেল্‌ফে বা দোয়াতদানিতে কোনো না কোনো স্থান অধিকার করিয়া থাকে। উহারা জড় বা অচেতন।

পক্ষান্তরে মনের আসল ধর্ম হইল চেতনা, যাহার কোন বিস্তার নাই। চেয়ার, টেবিল, প্রভৃতি জড় বস্তুগুলি মেজে প্রভৃতি স্থান জুড়িয়া থাকিলেও উহাদের সম্বন্ধে চেতনা বা চিন্তা ঐরূপ স্থানের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং মন

জড়, অচেতন বা শারীর-পদার্থ নয়, কিন্তু চেতন, বা অশারীর পদার্থ। নেতিবাচক ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে যাহা জড়শরীর নয় তাহাই মন, আবার যাহা মন নয় তাহাই শারীর।

দেহ ও মনের উপরোক্ত বৈপরীত্য সত্ত্বেও উহাদের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে। শরীর সুস্থ থাকিলে মন সুস্থ থাকে, আবার মন প্রফুল্ল থাকিলে শরীরও সুস্থ হয়। শরীর মনের উপর ক্রিয়া করে, আবার মনও শরীরের উপর ক্রিয়া করে। অর্থাৎ শরীর ও মন উপরিলিখিত ভাবে স্বতন্ত্র ও বিপরীত হইয়াও একটি অপরটির উপর ক্রিয়াশীল। দেহ-মন-সম্বন্ধ বিষয়ে দ্বৈতবাদী হইয়াও দে কার্তে উহাদের বাস্তব সম্বন্ধের ঘটনাটি অস্বীকার করেন নাই।

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে দে কার্তে অন্যোন্য-ক্রিয়াবাদের প্রবর্তক। দেহ ও মনের মত দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থ কিরূপে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ এবং অন্যোন্য-ক্রিয়াশীল হইতে পারে দে কার্তে এই প্রশ্ন তুলিয়া উহার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে পরস্পরবিরুদ্ধ দেহ ও মন সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও মধ্য মস্তিষ্কের নীচে অবস্থিত পিনিয়াল্ গ্রন্থির মধ্যস্থতায় অর্থাৎ অপরোক্ষ-ভাবে, অন্যোন্যক্রিয়াশীল হয়। দে কার্তের অনুগামী মেলব্র্যান্স, জেলিংস্ প্রভৃতি এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া পিনিয়াল্ গ্রন্থির পরিবর্তে ঈশ্বরের মধ্যস্থতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে দেহ ও মন সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে অন্যোন্যক্রিয়াশীল হইতে পারে না। উহাদের অন্যোন্যক্রিয়াশীলতা নির্ভর করে ঈশ্বরের মধ্যস্থতার উপর। দেহের পক্ষে মনের উপর এবং মনের পক্ষে দেহের উপর ক্রিয়া করিবার দরকার হইলে ঈশ্বর একটিকে অপরটির সহিত সম্বদ্ধ করিয়া দেন। এই মতকে 'প্রয়োজন বাদ' বা অকেসন্যালিজ্ম্ বলে। আবার লাইব্‌নিজ্ দেহ ও মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে নির্ধারিত) সামঞ্জস্য (প্রি-এস্টেব্লিশ্‌ড্ হার্মনি) দ্বারা। অবশ্য লাইব্‌নিজ্ অন্যোন্যক্রিয়াবাদের পরিবর্তে দেহ-মন-সম্বন্ধ বিষয়ে সমান্তরালবাদেরই পক্ষপাতী। এই জাতীয় দার্শনিক তত্ত্ববিশ্লেষণ মনোবিদ্যার পক্ষে অনুপযোগী।

মনোবিদ্যায় অন্যোন্যক্রিয়াবাদ

দেহ ও মনের অন্যোন্যক্রিয়াশীলতা বুঝিতে হইলে উহাদের বিশ্লেষণ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। মন যদি বিস্তার এবং পরিমাণহীন পদার্থ হয়—

তবে প্রশ্ন এই বিস্তার ও পরিমাণশীল দেহ কিরূপে মনের উপর এবং মন কিরূপে দেহের উপর ক্রিয়া করিতে পারে। অথচ ইহারা যে পরস্পরক্রিয়াশীল তাহাও অনস্বীকার্য। সংবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া চিন্তা প্রভৃতি উচ্চতম মানসবৃত্তি পর্যন্ত কোনটিই দেহের সাহায্য না লইয়া ঘটিতে পারে না। যেমন চক্ষু, দর্শননার্ভ এবং মস্তিষ্কের দর্শনকেন্দ্র না থাকিলে দর্শনসংবেদন ঘটিতে পারে না। আবার মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ এলাকা (অ্যাসোসিয়েশন্ এরিয়া) স্বাভাবিক না থাকিলে, স্মরণ, কল্পনা, চিন্তা প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলিও ঘটিতে পারে না। সুতরাং দেহ যে ভাবেই মনের উপর অথবা মন যে ভাবেই দেহের উপর কাজ করুক না কেন, ইহারা যে অন্যোন্যক্রিয়াশীল তাহাও সন্দেহ নাই। ইন্দ্রিয়যন্ত্র, মেরুমজ্জা, মস্তিষ্ক এবং নার্ভ্‌তন্ত্র ক্রিয়া না করিলে মনের ক্রিয়াগুলি সংঘটিত হইতে পারে না, এই অর্থে শরীর অবশ্যই মনের উপর ক্রিয়াশীল।

মন দেহের উপর কিভাবে ক্রিয়াশীল হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। মনের বিস্তার নাই, সুতরাং শরীরের সহিত ইহার কোনো স্থূল সংস্পর্শ হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যদেহের সকল ক্রিয়াই কোনো মন-বিশিষ্ট চেতন জীবের ক্রিয়া। এই অর্থে সকল দৈহিক ক্রিয়াই যে মূলতঃ আত্ম-রক্ষা (সেল্‌ফ্‌-প্রিজার্ভেশন্) এবং আত্মপ্রজননমূলক (সেলফ্‌-রিপ্রডাক্‌শন্), দুইটি জৈবিক প্রয়োজনে সাধিত হয় এই বিষয়ে অনেকেই একমত। সুতরাং ক্রিয়াগুলি শুধু উদ্দেশ্যহীন অন্ধ ঘটনাপরম্পরা নয়, কিন্তু মন ও প্রাণবিশিষ্ট জীবের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যসাধনের সহায় বা উপায়। এই উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সম্বন্ধে জীবের চেতনা নাও থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা অচেতন হইলেই যে মনের সম্পূর্ণ বাহিরে এইরূপ মনে করিবার কোনো হেতু নাই। পক্ষান্তরে ইহা আসংজ্ঞান (প্রিকন্‌সাচ্), অন্তর্জ্ঞান (সাব্‌কন্‌সাচ্) অথবা নির্জ্ঞান (আন্‌কন্‌সাচ্) মনের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন হইতে পারে।

সুতরাং উল্লিখিত অর্থে মন শরীরের উপর ক্রিয়াশীল। তাহা ছাড়া. সংজ্ঞান (কন্‌সাচ্) উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনও শারীরক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সকল ঐচ্ছিক ক্রিয়াগুলিই (ভলাণ্টারি আক্‌শন্) কোনো না কোনো প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যসাধন করিবার জন্য সম্পন্ন হয়। কাহারও ইচ্ছা হইল বসিবার, দাঁড়াইবার, দৌড়াইবার, কথা বলিবার বা চিন্তা করিবার এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কাজগুলি সম্পন্ন হইল।

স্টাউট্, ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ উদ্দেশ্যাভিমুখিতাকেই (টেলিও-লজিক্যাল ডিটারমিনেশন্) মানসক্রিয়ার অসাধারণ লক্ষণ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কোনো মানসক্রিয়াই নিরুদ্দেশ বা উদ্দেশ্যহীনভাবে সম্পন্ন হয় না। যেহেতু স্বয়ংক্রিয় দৈহিক ক্রিয়াগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতর ঐচ্ছিক ক্রিয়া পর্যন্ত সকল দৈহিকক্রিয়াই জীবের কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধন করে, সুতরাং ইহারা মনের দ্বারা অল্পাধিক নিয়ন্ত্রিত। আবার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধন করিতে হইলে দেহের সাহায্যেই মন তাহা করিতে পারে। সুতরাং দেহ যেমন মনের উপর ক্রিয়াশীল, তেমনই মনও দেহের উপর ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ দেহ ও মন অন্যোন্যক্রিয়াশীল বা অন্যোন্যসাপেক্ষ। ইহাদের প্রত্যেকটি অপরটির উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ কোনোটিই অপরটিকে বাদ দিয়া অথবা অপরটির উপর প্রতিক্রিয়া না করিয়া সক্রিয় হইতে পারে না।

তাহা হইলে দেহ-মন-সম্বন্ধ বিষয়ে অন্যোন্য-ক্রিয়াবাদের বক্তব্য এই যে দেহ মনের উপর এবং মন দেহের উপর ক্রিয়া করে। অথবা দেহ মানসিক কার্য বা পরিবর্তন এবং মন দৈহিক কার্য বা পরিবর্তন উৎপন্ন করিয়া থাকে। দেহের বিভিন্ন পরিবর্তন মনের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটায়। দেহ সুস্থ বা অসুস্থ হইলে মন এবং মন সুস্থ বা অসুস্থ থাকিলে দেহও ঐরূপ হয়। মস্তিষ্কে আঘাতের ফলে চেতনালোপ ঘটে। দেহের নানারূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায়, যেমন অজীর্ণে বা আফিং কোকেইন প্রভৃতি ঔষধ সেবনে, মনের পরিবর্তন সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। প্রক্ষোভের দৈহিক পরিবর্তন, যেমন ক্রোধে মুষ্টিবদ্ধ করা বা দাঁতে দাঁত ঘষা, ভয়ে বক্ষস্পন্দন বা দেহকম্পন, দুঃখে অশ্রুবিসর্জন, সুখে হাসি, প্রভৃতি অন্যোন্যক্রিয়াবাদের প্রমাণ। শারীরস্থান বা অ্যানাটমি প্রমাণ করিয়াছে কিরূপে মস্তিষ্কবিকৃতি মানসিকবিকৃতি ঘটায়। এই গবেষণায় বিভিন্ন মানসবৃত্তিগুলির মস্তিষ্ককেন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া তুলনা-মূলক শারীরস্থান (কম্প্যারেটিভ্ অ্যানাটমি) প্রমাণ করিয়াছে যে দৈহিক ক্রমোন্নতির সহিত মানসিক ক্রমোন্নতির সম্বন্ধ রহিয়াছে।

সমালোচনা : দর্শন ও মনোবিদ্যার পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী

অন্যোন্য-ক্রিয়াবাদের (ইনটার‍্যাক্‌শনিজ্‌ম্) বিরুদ্ধে বিপক্ষবাদী দার্শনিক ও মনোবিদ্‌গণ প্রবল আপত্তি তুলিয়াছেন। এই অংশে দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক প্রায় একই পথের পথিক, যদিও তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ পৃথক্। দর্শন

আলোচনা করে দেহ ও মনের তাত্ত্বিক অথবা যথার্থ সম্বন্ধ। মনোবিদ্যা আলোচনা করে ইহাদের বাস্তব বা ঘটনানিষ্ঠ সম্বন্ধ, তত্ত্বের দিক দিয়া এই সম্বন্ধ যাহাই হউক না কেন। দেহ ও মনের কিরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে মনোবিদ্যার বিষয় সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—ইহাই মনোবিদ্যার প্রশ্ন। এই কারণে সাম্প্রতিক মনোবিদ্যায় দেহ ও মনের সম্বন্ধ লইয়া তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডার অবকাশ নাই, এমন কি কোনো কোনো মনোবিদ্যা গ্রন্থে এই সমস্যার উল্লেখই না থাকিতে পারে। যেমন আর. এস্. উড্‌ওয়ার্থ লিখিত মনোবিদ্যা গ্রন্থে এবং বৃহত্তর "এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকলজি" গ্রন্থে শরীর ও মনের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে অন্যোন্যক্রিয়াবাদ অথবা সমান্তরালবাদের উল্লেখ নাই, আবার সি. টি. মর্গ্যান্-এর "ইন্‌ট্রডাকৃশন্ টু সাইকলজি" অথবা এন্. এল. মান্ প্রণীত মনোবিদ্যা গ্রন্থেও এই প্রশ্নের অবতারণা নাই। পক্ষান্তরে টিশ্‌নার, কুল্পে, স্টাউট্, ম্যাক্‌ডুগ্যাল প্রভৃতি এবং তাঁহাদের পূর্ববর্তী মনোবিদ্‌গণ এই প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

সে যাহা হউক অন্যোন্যক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপত্তিগুলি উত্থাপিত হইয়াছে।

(১) অন্যোন্যক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রবল আপত্তি হইল এই যে মন ও দেহ পরস্পরবিরুদ্ধ বস্তু, সুতরাং ইহারা অন্যোন্য-ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। মন চেতন, দেহ অচেতন। আবার দেহ বিস্তার ও পরিমাণশীল, কিন্তু মন বিস্তার ও পরিমাণহীন। সুতরাং ইহাদের পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতা অযৌক্তিক হইয়া দাঁড়ায়।

এই আপত্তির প্রথম উত্তর এই যে দেহ ও মনের পার্থক্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই, অথচ ইহারা যে পরস্পরক্রিয়াশীল তাহাও অনস্বীকার্য। মনোবিদ্যা বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান (পজিটিভ্ সায়েন্স)। দেহ ও মনের অন্যোন্যক্রিয়া একটি বাস্তব ঘটনা। এই বাস্তব ঘটনাকে স্বীকার করিয়া মনোবিদ্যা ইহার আলোচনায় অগ্রসর হয়। দ্বিতীয়তঃ দেহ ও মন পৃথক হইলেও ইহারা জীবের স্বভাবে অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিত হইয়াছে। ইহার ফলে মন হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেহ এবং দেহ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে মন কাজ করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, দেহ ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে মতগুলি মনের ক্রিয়া বুঝিবার অথবা ব্যাখ্যা করিবার সূত্র বিশেষ। যে মত স্বীকার করিলে মনের ক্রিয়া সন্তোষজনকভাবে বুঝা যায় সেই মতই মনোবিদ্যাসম্মত। অন্যোন্যক্রিয়াবাদ

দেহ ও মনের যে সম্বন্ধ নিরূপণ করে তাহার সাহায্যে মানসবৃত্তিগুলিকে বুঝিবার চেষ্টা করা যায়। এই দিক দিয়া অন্যোন্যক্রিয়াবাদের মনোবৈজ্ঞানিক মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রত্যেক বিজ্ঞানই কতগুলি মূলসূত্র মানিয়া লয়। মনোবিদ্যাও অন্যোন্যক্রিয়াবাদকে মূলসূত্র হিসাবে মানিয়া লইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অগ্রসর হইতে পারে।

(২) অন্যোন্যক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে আর একটি প্রচলিত আপত্তি এই যে ইহা পদার্থবিদ্যার (ফিজিক্স্) শক্তিসংরক্ষণ সূত্র (ল' অফ্ কনজার্‌ভেশন্ অফ্ এনার্জি) লঙ্ঘন করে। শক্তির সংরক্ষণ-সূত্র অনুসারে কোনো শক্তিরই হ্রাসবৃদ্ধি নাই। একটি শক্তি আর একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা বিনষ্ট হইতে পারে না। যেমন পেশীর শক্তি (মাস্কুলার্ এনার্জি) তাড়িত (ইলেক্‌ট্রিক্যাল) অথবা রাসায়নিক (কেমিক্যাল) শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। কিন্তু বিশ্বশক্তির নানা রূপান্তরের মধ্যেও উহার পরিমাণ অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহা বাড়েও না, কমেও না।

কিন্তু মন যদি দেহের উপর ক্রিয়া করে, তাহা হইলে মনের শক্তি মন হইতে ব্যয়িত হইয়া দেহের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে দেহের শক্তি বাড়িয়া যায়। আবার দেহ মনের উপর ক্রিয়া করিলে দেহের শক্তি দেহ হইতে ব্যয়িত হইয়া মনের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই শক্তি-সংরক্ষণ সূত্র —অর্থাৎ বিশ্বশক্তির হ্রাসও নাই বৃদ্ধিও নাই, ইহার পরিমাণ অপরিবর্তনীয়— লঙ্ঘিত হয়। সুতরাং অন্যোন্যক্রিয়াবাদ অসমর্থনীয়।

এই আপত্তিটিও মনোবিদ্যার দিক হইতে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। অন্যোন্যক্রিয়াবাদ শক্তির সংরক্ষণ-সূত্রকে লঙ্ঘন করে না। প্রথমতঃ, শক্তি-সংরক্ষণসূত্র পদার্থবিদ্যার সূত্র। ইহাকে জোর করিয়া মনোবিদ্যায় টানিয়া না আনাই সঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ জড়শক্তি (মেকানিক্যাল্ এনার্জি) বা দৈহিক শক্তিই পদার্থবিদ্যার শক্তি-সংরক্ষণ সূত্রের লক্ষ্য—মানস শক্তি ইহার লক্ষ্য নয়। সুতরাং মনের উপর ক্রিয়ার ফলে দৈহিকশক্তি বাড়ুক কি কমিয়া যাউক, তাহাতে পদার্থবিদ্যায় এই সূত্রটি ক্ষুণ্ণ হয় না। তৃতীয়তঃ শক্তি-সংরক্ষণ সূত্র যদি শুধু জড় বা দৈহিক শক্তিতে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া মানস বা চেতন শক্তিতেও প্রযোজ্য হয়—অবশ্য এই প্রয়োগ পদার্থবিদ্যার অভিপ্রেত নয়—তাহা হইলেও অন্যোন্যক্রিয়াবাদ এই সূত্রের বিরোধী হয় না। শক্তি কথাটিকে এইরূপ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি প্রসঙ্গ ওঠে না। এইরূপ ক্ষেত্রে

মন শরীরের উপর অথবা শরীর মনের উপর ক্রিয়াশীল হইলে শক্তির রূপান্তর হয় মাত্র, হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। এই স্থলে মানসশক্তি দৈহিকশক্তিতে এবং দৈহিকশক্তি মানসশক্তিতে রূপান্তরিত হয় মাত্র। কোন শক্তিরই হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না।

৩। সমান্তরালবাদ—প্যারালেলিজম্

সমান্তরালবাদ মতে মন ও দেহ—কোনটিই অপরটির উপর নির্ভরশীল অথবা কোনটিই অপরটির কারণ বা কার্য নয়। দেহ মনের উপর ক্রিয়াশীল হইয়া ইহার কার্য হিসাবে কোনো মানসবৃত্তি উৎপন্ন করে না। আবার মনও দেহের উপর ক্রিয়াশীল হইয়া ইহার কার্য হিসাবে কোনো শারীর পরিবর্তন ঘটায় না। শরীর ও মন পরস্পরনিরপেক্ষ। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেহ ও মনের ক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতি বা মিল (করেস্‌পন্‌ডেন্স্) আছে, যাহার ফলে একটি অপবটির উপর নির্ভর না করিয়াও একযোগে বা সমতালে কাজ করে।

দুইটি সমান্তরাল সরলরেখার কোনোটি অপরটির উপর নির্ভর করে না, অথবা একটি আর একটিকে কোনো বিন্দুতে ছেদ করে না, অথচ উহারা সমান তালে একই দিকে প্রলম্বিত হয়। তেমন দেহ ও মন পরস্পরকে কোনো বিন্দুতেই ছেদ না করিয়া, কোনোটি অপরটির উপর নির্ভর না করিয়া অথবা অপরটির সহিত সংযুক্ত না হইয়া একযোগে অগ্রসর বা পরিবর্তিত হইতে থাকে।

নিম্নে প্রদর্শিত নক্সা দুইটির সাহায্যে এই মতবাদ দুইটির মৌলিক পার্থক্য দেখানো যাইতে পারে।
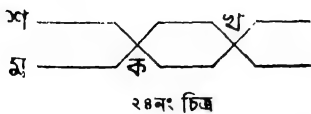
২৪নং চিত্র

২৪ নং চিত্রে 'শ' চিহ্নিত শরীর এবং 'ম' চিহ্নিত মন দুইটি সরল রেখার দ্বারা সূচিত হইয়াছে। শরীর 'ক' এবং 'খ' ছেদবিন্দুতে মনের উপর প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে।
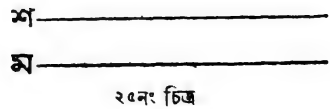
২৫নং চিত্র

২৫ নং চিত্রে 'শ' চিহ্নিত শরীর এবং 'ম' চিহ্নিত মন কোথায়ও পবস্পর মিলিত হয় নাই, কিন্তু দুইটি সমান্তরাল সরলরেখার মত পারস্পরিক ব্যবধান বা দূরত্ব সমান রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

সমান্তরাল-বাদ মতে প্রত্যেক মানসবৃত্তির সমানুপাতিক দৈহিকবৃত্তি এবং প্রত্যেক দৈহিকবৃত্তিরও সমানুপাতিক মানসবৃত্তি থাকে। এমন কোনো দৈহিকবৃত্তি ঘটে না যাহার সমানুপাতিক মানসবৃত্তি নাই, আবার এমন কোনো মানসবৃত্তিও ঘটে না যাহার সমানুপাতিক দৈহিকবৃত্তি নাই (এভ্‌রি নিউরোসিস্‌ হ্যাজ্‌ ইট্‌স্‌ করেস্‌পণ্ডিং সাইকোসিস্‌ অ্যাণ্ড্‌ এভ্‌রি সাইকোসিস্‌ হ্যাজ্‌ ইট্‌স্‌ করেস্‌পণ্ডিং নিউরোসিস্‌)। উহাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অথচ উহাদের মধ্যবর্তী পার্থক্য বা ব্যবধান অক্ষুণ্ণ থাকে।

তাহা হইলে অন্যোন্যক্রিয়াবাদের সহিত সমান্তরালবাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রথম মত অনুসারে দেহ ও মন পরস্পর-ক্রিয়াশীল, অর্থাৎ একটি অপরটিকে কোনো মিলন-বিন্দুতে ছেদ করে, অথবা উহাদের সংস্পর্শ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মত অনুসারে একটি আর একটিকে কোনো মিলন-বিন্দুতে ছেদ না করিয়াই পারস্পরিক সঙ্গতি বজায় রাখে।

দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক সমান্তরালবাদ

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে স্পিনোজাই সমান্তরালবাদের প্রবর্তক। কার্তেসীয় অন্যোন্যক্রিয়াবাদের নানা অসঙ্গতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে তিনিই সমান্তরালবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার প্রবর্তিত সমান্তরালবাদটি বৈজ্ঞানিকরূপে উপস্থাপিত হয় নাই। তাঁহার মতে ঈশ্বরই পরম সত্য এবং দেহ ও মন ঈশ্বরের অনন্ত গুণের মধ্যে দুইটি গুণ মাত্র। প্রথমতঃ স্পিনোজার সমান্তরালবাদ দার্শনিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মনোবিদ্যার ঘটনানিষ্ঠ (পজিটিভ্‌) দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার মত আধুনিক মনোবিদ্যাসম্মত সমান্তরালবাদ নয়। স্পিনোজার সমান্তরালবাদ দ্বৈতবাদ (ডুয়্যালিজ্‌ম্‌) নয়, কিন্তু একপ্রকার অদ্বয়বাদ (মনিজ্‌ম্‌), কারণ তাঁহার মতে একমাত্র সত্য ঈশ্বরের দুইটি দিক রূপেই শরীর ও মন কল্পিত হইয়াছে।

স্পিনোজার সমান্তরালবাদকে দ্বিভঙ্গী মতবাদ (ডাবল্‌-অ্যাসপেক্ট্‌ থিওরি) বলা হইয়া থাকে। দেহ ও মনের সঙ্গতিপূর্ণ সমানুপাতের মূলে রহিয়াছে উহাদের এই একাত্মতা (আইডেন্‌টিটি) যে উহারা একই পরমেশ্বরের দুইটি দিক বা গুণ মাত্র। যেহেতু উহারা একই পরমসত্যের উভয়মুখী প্রকাশ, সুতরাং একটির পরিবর্তনের সহিত অপরটির পরিবর্তন ঘটে, যদিও উহারা পরস্পরের

সহিত কোনো কার্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ নয়। এইরূপ দার্শনিক মত মনোবিদ্যার ন্যায় বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের পক্ষে গ্রহণীয় হইতে পারে না।

আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক সমান্তরালবাদ দ্বৈতবাদী। দেহ ও মন দুইটি পদার্থ। একটি অপরটি হইতে স্বতন্ত্র এবং পৃথক্। তথাপি উহারা সমান্তরাল-ভাবে সক্রিয়। এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগপদ্ধতির উপর নির্ভর করে। এই মতানুসারে দেহ ও মনের অন্তরালে কোনো পরমসত্য স্বীকার মনোবিদ্যার বিষয়বহির্ভূত।

সমালোচনা

(১) সমান্তরালবাদ মতে প্রত্যেক মানসবৃত্তির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বা সমানুপাতিক দৈহিক বৃত্তি আছে। কিন্তু অসুবিধা এই যে প্রত্যেক মানসবৃত্তির সমান্তরাল দৈহিক বৃত্তি থাকিলেও উহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যেমন নির্জ্ঞান মানসবৃত্তির সমান্তরাল দৈহিক বৃত্তি কি ? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে নির্জ্ঞান মানসবৃত্তির দৈহিক বৃত্তি অবশ্যই আছে—ইহা মস্তিষ্কের মধ্যবর্তী কোনো অস্পষ্ট সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা, যেমন মস্তিষ্কীয় কোষগুলির অবিশ্রাম স্পন্দন বা ক্রিয়া (ভাইব্রেশন্ অব্ দি ব্রেন সেল্স্), অথবা মস্তিষ্কের কোনো কোনো অংশের স্থায়ী আকার-পরিবর্তন (মডিফিকেশন্)। কিন্তু এই উত্তরের বিরুদ্ধে আপত্তি করা যাইতে পারে যে নির্জ্ঞান মনের এই জাতীয় সমান্তরাল মস্তিষ্কীয় পরিবর্তন বা স্পন্দন কোনো যন্ত্রে ধরা পড়ে না। আবার এই আপত্তির বিরুদ্ধে এবং সমান্তরালবাদের স্বপক্ষে বলা যাইতে পারে নির্জ্ঞান মনের সমান্তরাল দৈহিক বৃত্তি বাহির করা বিজ্ঞানের অগ্রগতির উপর নির্ভর করে।

(২) দ্বিতীয়তঃ সকল সংজ্ঞান বৃত্তির সমান্তরাল শারীর বৃত্তি নিরূপণ করাও যে সহজ তাহা নয়। যেমন একটি কঠিন অঙ্ক কষিবার অথবা কোনো জটিল দার্শনিক সমস্যা সমাধান করিবার জন্য যে উচ্চ চিন্তা বা ভাবনার প্রয়োজন হয় উহার সমান্তরাল শারীর বৃত্তি সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

এইরূপ আপত্তির উত্তরও পূর্বটির অনুরূপ। জটিল মানসবৃত্তির সমান্তরাল শারীর বৃত্তিও অবশ্যই জটিল হইবে। উহাদের শারীর ভিত্তি হয়ত মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ এলাকায় অবস্থিত।

(৩) তৃতীয়তঃ, আকস্মিক অভিজ্ঞতায় (সাডেন্ এক্সপিয়েরিয়েন্স্) যে মানসবৃত্তি ক্রিয়া করে উহার সমান্তরাল শারীর অবস্থা কি তাহা নির্ণয় করাও

দুঃসাধ্য। আকস্মিক অভিজ্ঞতায় উহার সমান্তরাল দৈহিক অবস্থা উৎপন্ন হইতে পারে যদি এই দৈহিক অবস্থার কারণ হিসাবে কোনো পূর্ববর্তী দৈহিক অবস্থা থাকে।[১] অথচ আকস্মিক অভিজ্ঞতায় এমন কোনো পূর্ববর্তী দৈহিক অবস্থা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহা উহার সমানুপাতিক দৈহিক অবস্থার কারণ হইতে পারে।

এই আপত্তির উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে আকস্মিক মানসবৃত্তিও যেমন কোন্ পূর্ববর্তী মানসবৃত্তির কার্য তাহা জানিতে পারা যায় না, তেমন উহার সমান্তরাল দৈহিকবৃত্তিও আকস্মিক বলিয়া উহা কোন্ পূর্ববর্তী শারীর বৃত্তির কার্য তাহা নিরূপণ করা নাও যাইতে পারে। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অনুচিত যে আকস্মিক মানস অভিজ্ঞতার বা দৈহিক অবস্থার কোনো কারণ নাই।

(৪) চতুর্থতঃ সমান্তরালবাদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করা হইয়াছে যে উহার পরিণতি সর্বমানসবাদ (প্যান্‌সাইকিজ্‌ম্)। প্যান্‌সাইকিজ্‌ম্ বলে যে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সব কিছুই মন বা আত্মা। অবশ্য সমান্তরালবাদ নিশ্চয়ই বলে না যে দেহও আত্মা বা মন। এই অর্থে সমান্তরালবাদের বিরুদ্ধে সর্বমানস-বাদের আপত্তি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যদি প্রত্যেক শারীর অবস্থারই সমান্তরাল মানস অবস্থা থাকে তবে প্রত্যেক ধূলিকণারও মন আছে, যেহেতু উহা জড় পদার্থ—এইরূপ আপত্তি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয় না।

উত্তরে বলা যাইতে পারে যে এইরূপ আপত্তি দার্শনিক দিক হইতে সমীচীন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু মনোবিদ্যায় ইহার কোনো যৌক্তিকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। মনোবিদ্যা জড়পদার্থ (ম্যাটার) এবং মানসপদার্থ (মাইণ্ড্) কিরূপভাবে সম্বদ্ধ ইহার আলোচনা করে না, কিন্তু মন ও দেহ কিরূপে সম্বদ্ধ তাহাই আলোচনা করে।

ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু[২] বলিয়াছেন যে সর্বমানসবাদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও সমান্তরালবাদ হইতে পশ্চাৎপদ হইবার হেতু নাই। বিশ্বের সকল জড় বস্তুই

১ সমান্তরালবাদ মতে মন শরীরের এবং শরীর মনের কারণ বা কার্য হইতে পারে না। প্রত্যেক পরবর্তী মানস অবস্থার কারণ উহার পূর্ববর্তী কোন মানস অবস্থা। আবার প্রত্যেক পরবর্তী শারীর অবস্থার কারণ উহার পূর্ববর্তী কোন শারীর অবস্থা।

২ ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু—কন্‌সেপ্ট্ অফ্ রিপ্রেশন্।

মনে পরিণত হউক কি না হউক তাহাতে মনোবিদ্যার বিশেষ কিছু আসে যায় না। তাঁহার মতে সমান্তরালবাদ মন ও শরীরের সম্বন্ধ সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করে। সকল বস্তুরই দৈহিক বা জড় এবং মানস এই দুইটি দিক আছে। অন্ন, পানীয় প্রভৃতি গ্রহণ করিলে দেহ ও মন উভয়েরই পরিবর্তন ঘটে, কারণ অন্নের বা পানীয়ের দৈহিক বা জড অংশ দেহের উপর এবং উহার মানস অংশ মনের উপর ক্রিয়া করে। আবার অ্যাল্‌কোহল দেহ ও মনের উপর যুগপৎ ও সমান্তরাল প্রভাব বিস্তার করে, কারণ ইহার জড় অংশ দেহের এবং মানস অংশ মনের পরিবর্তন ঘটায়।

(৫) সে যাহা হউক, সমান্তরালবাদের বিরুদ্ধে পদার্থবিদ্যার শক্তি-সংরক্ষণ-সূত্র লঙ্ঘন করিবার কোনো আপত্তি ওঠে না। এই মত শরীর ও মনকে সম-পর্যায়ভুক্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করে। এই দুইটির কোনোটিই অপরটির তুলনায় উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট, সমান্তরালবাদের এইরূপ কোনো অভিপ্রায় নাই।

কিন্তু অন্যোন্যক্রিয়াবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে স্টাউট্ প্রভৃতির মতে উদ্দেশ্যাভিমুখিতা (টেলিয়লজিক্যাল ডিটারমিনেশন) মনের একটি বিশিষ্ট ধর্ম। মনের এই ধর্ম পালন করিতে হইলে দেহকে উদ্দেশ্যসাধনের উপায় রূপে স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে মন ও দেহকে সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু এই দুইটিকে সমান্তরাল বলিলে উহাদের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করিতে হয়। আসলে এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য এবং কোন্‌টি গৌণ, অথবা দুইটিই সমভাবে মুখ্য বা গৌণ, এই সকল প্রসঙ্গ মনোবিদ্যার বিষয়ীভূত নয়।

৮। উপসংহার

উপরের আলোচনা হইতে অন্যোন্যক্রিয়াবাদ এবং সমান্তরালবাদের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয় এবং কোন্‌টি বর্জনীয় এই প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায় না। বাস্তবিকপক্ষে এইরূপ কোনো সমাধান মনোবিদ্যার পক্ষে অপরিহার্যও নয়। মনোবিদ্যা বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান। যে মত অনুসারে মানসবৃত্তিগুলিকে ভাল করিয়া বুঝা যায় মনোবিদ্যার পক্ষে সেই মতটিই গ্রাহ্য। অনেক মনোবিদ্ মনে করেন যে অন্যোন্যক্রিয়াবাদই মানসবৃত্তির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে পারে। আবার কোনো কোনো মনোবিৎ—এবং সাম্প্রতিক কালে অধিকাংশ মনোবিদ্‌ই—সমান্তরালবাদকে অধিকতর সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায়

এই প্রশ্নটির কোনো সঠিক উত্তর না দিয়া এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই মনোবিদ্যা গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, যে যে মতটি অধিকতর সন্তোষজনক বলিয়া অধিকাংশ মনোবিদ্ গ্রহণ করেন সেইটিই গ্রহণীয়। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে অন্যোন্যক্রিয়াবাদ অপেক্ষা সমান্তরালবাদই অধিক বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া মনে হয়।

সাম্প্রতিক মনোবিদ্গণের মধ্যে অনেকেই, যেমন হ্বুণ্ড্, টিশ্নার প্রভৃতি সমান্তরালবাদী। আবার ম্যাক্ডুগাল প্রমুখ মনোবিদ্গণ অন্যোন্যক্রিয়াবাদী। পক্ষান্তরে স্টাউট্ প্রভৃতি মনোবিদ্গণ কোনো মতবাদেরই পূর্ণ সমর্থক নহেন।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড	—	এলিমেন্ট্স্ অফ্ সাইকলজি	—	তৃতীয় পরিচ্ছেদ
জি. এফ্. স্টাউট্	—	ম্যানুয়্যাল্ অফ্ সাইকলজি	—	,, ,,
ই. বি. টিশ্নার	—	টেক্সট্ বুক্ অফ্ সাইকলজি	—	চতুর্থ অনুচ্ছেদ
জি. মার্ফি	—	জেনারাল্ সাইকলজি	—	অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ
ডঃ জি. বসু	—	দি কনসেপ্ট্ অফ্ রিপ্রেশন্	—	প্রাসঙ্গিক অংশ

Exercise

1. Is the problem of mind-body relation relevant to psychology? (pp 170-171)
2. What is the psychological approcah to the problem of mind-body relation? (pp. 170-171, 174-177)
3. Adduce the arguments in favour of interactionism as a hypothesis regarding the relation between body and mind (pp. 171-177)
4. Give a critical estimate of interactionism as a psychological theory of mind-body relation (pp 174-177)
5. How would you distinguish between the philosophical and the psychological theory of parallelism regarding the relation between body and mind? (pp. 178-179)
6. Explain the psychological theory of parallelism regarding mind body relation. (pp. 177-178)
7. Give a critical estimate of parallelism as a psychological theory of mind-body relation. (pp. 179-181)
8. Which of the theories of interactionism and 'parallelism regarding mind-body relation do you prefer and why? Discuss. (pp. 181-182)
9. Stout has not accepted either interactionism or parallelism as a theory of the relation between mind and body. Is he wrong? (pp. 181-182)

একাদশ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধি—ইন্‌টেলিজেন্স্

১। বুদ্ধির সাধারণ অর্থ

'বুদ্ধি' কথাটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা কঠিন, কারণ বুদ্ধি ব্যক্তির একটি মাত্র দিক্ নয়, কিন্তু তাহার সমগ্র সত্তার সহিত জড়িত। কিন্তু তবুও দৈনন্দিন জীবনে আমরা হয়ত এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির তুলনায় বেশী বা কম বুদ্ধিমান মনে করিয়া থাকি। সাধারণতঃ **সতর্কতাকে** (অ্যালার্টনেস্) আমরা বুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া মনে করি। যে ব্যক্তি কোনো বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ বা সতর্ক তাহাকে বুদ্ধিমান এবং যে সেইরূপ নয় তাহাকে বুদ্ধিহীন বলা হইয়া থাকে। অথবা বুদ্ধি বলিতে বুঝায় পর্যবেক্ষণ, ধারণা, চিন্তন, স্মরণ, কল্পনা প্রভৃতি মানস-বৃত্তিগুলি যাহারা জ্ঞানলাভে সহায়তা করে। এই অর্থে **জ্ঞান-উৎপাদনকারী মানস শক্তিই** বুদ্ধি। উড্‌ওয়ার্থ্ বলিয়াছেন যে বুদ্ধি কথাটি আকারের দিক হইতে বিশেষ্য হইলেও, অর্থের দিক দিয়া ইহা **ক্রিয়া বা ক্রিয়াবিশেষণাত্মক।** বুদ্ধি কোনো বস্তু বা পদার্থ নয়, **কিন্তু যে ভাবে বা প্রকারে কাজ করা হয়** তাহাই বুদ্ধি। কোনো ব্যক্তি যে প্রকারে একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় সেই **ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার প্রকার** বুদ্ধির বা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

২। বুদ্ধি ও ধী—ইনটেলিজেন্স্ অ্যাণ্ড্ ইনটেলেক্ট্

বুদ্ধি (ইন্‌টেলিজেন্স্) এবং ধী (ইন্‌টেলেক্ট্) একার্থক নয়। বুদ্ধি কথাটির অর্থ ধী কথাটির অর্থের তুলনায় ব্যাপক। ধী বা ইন্‌টেলেক্ট্ বলিতে বুঝায় প্রত্যক্ষ, পর্যবেক্ষণ, স্মরণ, কল্পনা, বোধ (আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং), চিন্তন প্রভৃতি জ্ঞান লাভের শক্তি বা ক্রিয়াগুলিকে। এক কথায়, জ্ঞানাত্মক মানসক্রিয়াগুলিই ধী কথাটির অর্থ।

কিন্তু বুদ্ধি (ইন্‌টেলিজেন্স্) বলিতে ধীপদবাচ্য ক্রিয়াগুলিকে তো বুঝায়ই, তদুপরি কোন কার্যকরী (প্র্যাক্‌টিক্যাল) সমস্যা সমাধানে বা লক্ষ্যে পৌঁছিবার **ক্ষমতা বা সামর্থ্যও** বুঝায়। অথবা উড্‌ওয়ার্থের ভাষায়, "ইন্‌টেলিজেন্স্ ইজ্ ইন্‌টেলেক্ট্ পুট্ টু ইউজ্"—[১]অর্থাৎ বুদ্ধি বলিতে বুঝায় এমন ধী যাহা কাজে

১—উড্‌ওয়ার্থ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস্—সাইকলজি—পৃঃ ৩২

লাগানো হইয়া থাকে। কোনো পরিস্থিতিতে কাজ করিতে গিয়া ধী বা জ্ঞানমূলক সামর্থ্যগুলির ব্যবহার করাকেই বুদ্ধি বলে। বুদ্ধি জ্ঞানের উপর নির্ভর করে সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্ঞান থাকিলেই হইল না, **জ্ঞানকে যথোপযুক্তভাবে হাতে কলমে কাজে লাগানোই বুদ্ধি**। যাহারা জানে শোনে অনেক, অথচ জ্ঞানকে কাজে লাগাইতে পারে না, তাহারা ধীমান হইলেও বুদ্ধিমান নয়। অর্থাৎ, ধী শুধু তাত্ত্বিক (থিওরেটিক্যাল) জ্ঞান, কিন্তু বুদ্ধি তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক (প্র্যাক্‌টিক্যাল) দুইই।

তাহা হইলে বুদ্ধি এবং ধী উভয়ই প্রাণী এবং মনুষ্যজীবনের একটি সাধারণ ডিজ্‌পোজিশন্ বা স্বভাব। ধী বলিতে এই স্বভাবটির বিশুদ্ধ রূপ বুঝায়, এবং বুদ্ধি বলিতে উহার সঙ্গে সঙ্গে বুঝায় এই স্বভাবের সক্রিয় প্রকাশ। ইহারা একই জ্ঞানমূলক স্বভাবের বিশুদ্ধ এবং কার্যকরী দিক। কিরূপে নূতন পরিস্থিতির সহিত আঁটিয়া উঠিতে হয় বা নিজকে মানাইয়া লইতে হয়, কোনো নূতন সমস্যার কত প্রকার সমাধান হইতে পারে তাহার উপস্থিত বুদ্ধি (প্রেজেন্স্ অব্ মাইণ্ড্), যে সমাধানটি অচল বলিয়া মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে উহার বর্জন, বাহ্য জগতে বিভিন্ন কল্পনা বা চিন্তা-নির্মাণের প্রয়োগশক্তি প্রভৃতি ক্ষমতা বা সামর্থ্যগুলি বুদ্ধির পরিচায়ক।

শারীরবৃত্তের দিক দিয়া বুদ্ধিকে দেখিলে বলা যায় যে যাহার নার্ভতন্ত্র যত সহজে এবং দৃঢ়ভাবে নূতন পরিস্থিতির সহিত উপযোজন (অ্যাডাপ্‌টেশন্) করিতে পারে সে তত বুদ্ধিমান্।

মোটের উপর বলা যায় যে বুদ্ধি এবং **শিক্ষণ সামর্থ্য** (কেপ্যাসিটি টু লার্ন) কার্যতঃ সমার্থক শব্দ। যাহার শিক্ষণসামর্থ্য আছে, অর্থাৎ যে যত সহজে শিক্ষা লাভ করিতে পারে সে তত বুদ্ধিমান।

৩। বুদ্ধির সংজ্ঞা—ডেফিনিশন অব্ ইনটেলিজেন্স্

বুদ্ধি একটি সরল বা মৌলিক (সিম্প্‌ল্) শক্তি নয়। ইহা জটিল। বুদ্ধি অনেকগুলি উপাদান দিয়া গঠিত। তাহা ছাড়া, বুদ্ধি ব্যক্তির একটি ধর্ম মাত্র নয়, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ সত্তার সহিত বিজড়িত। সুতরাং মনোবিদ্‌গণ বুদ্ধির বিভিন্ন এবং বিচিত্র সংজ্ঞা দিয়াছেন।

(১) কেহ কেহ বুদ্ধির **বিশুদ্ধ রূপ এবং সংগঠনী শক্তির** উপর জোর দিয়াছেন।

যেমন এবিংহাউস এর মতে কোনো পরিস্থিতির অংশগুলিকে "মিলিত এবং সংগঠিত করিবার সামর্থ্যই বুদ্ধি" (টু কম্‌বাইন্ অ্যাণ্ড্ ইন্‌টিগ্রেট্)।

এবিংহাউস্-এর সংজ্ঞায় বুদ্ধির সংশ্লেষণমূলক (সিন্‌থেটিক্) বৈশিষ্ট্যটি উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার বিশ্লেষণমূলক (অ্যানালিটিক্) দিক্‌টি বাদ পড়িয়াছে।

আলফ্রেড্ বিনে মনে করেন "সুষ্ঠু অবধারণা, উপযুক্ত বোধ এবং উত্তম বিচারশক্তি হইল বুদ্ধির আসল উৎস (টু জাজ্ ওয়েল্, টু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড্ প্রপার্‌লি, টু রিজ্‌ন্ ওয়েল, দিজ্ আর্ দি এসেন্‌সিয়াল্ স্প্রিঙ্গ্‌স্ **অফ্** ইন্‌টেলিজেন্স্)।"

(২) আবার কোনো কোনো মনোবিদ্ বুদ্ধির **কার্যকরী দিকটির** উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন বেশী। যেমন উইলিয়ম্ স্টার্ণ্-এর মতে বুদ্ধি হইল "জীবনের **নূতন নূতন সমস্যার এবং অবস্থার সহিত উপযোজন করিবার সাধারণ মানসিক শক্তি** (দি জেনার‍্যাল্ মেণ্ট্যাল অ্যাডাপ্‌টেবিলিটি টু নিউ প্রব্লেম্‌স্ অ্যাণ্ড্ কন্‌ডিশন্‌স্ অফ্ লাইফ্)"

সিরিল বার্ট বলিয়াছেন যে বুদ্ধি হইল "অপেক্ষাকৃত **নূতন পরিস্থিতির সহিত নূতন ভাবে প্রতিযোজন করিবার সামর্থ্য** (দি পাওয়ার অফ্ রি-অ্যাড্‌জাস্ট্‌মেণ্ট্ টু রিলেটিভ্‌লি নিউ সিচুয়েশন্‌স্)।"

ই. এল্. থর্ণডাইক বলেন, "সুষ্ঠুভাবে **প্রতিক্রিয়া করিবার ক্ষমতাই** বুদ্ধি (দি পাওয়ার অব্ গুড্ রেস্‌পন্‌সেস্)।"

ফ্রীম্যান্ মনে করেন যে "বুদ্ধি হইল **মানসশক্তির কার্যকরী ব্যবহার** (প্রডাক্‌টিভ্ ইউজ্ অফ্ মেণ্ট্যাল পাওয়ারস্)।"

থার্সস্টোন্-এর মতে "বুদ্ধি হইল সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে **সমাজের উপকারে লাগাইবার ক্ষমতা** (দি কেপ্যাসিটি ফর্ মেকিং ইন্‌স্টিংক্‌ট্‌স্ সোস্যালি অ্যাড্-ভ্যান্‌টেজিয়াস্)।"

(৩) কোনো কোনো মনোবিদ্ বুদ্ধিকে **শিক্ষণ করিবার সামর্থ্য** বলিয়া মনে করিয়াছেন। যেমন কল্‌ভিন্ বলেন যে বুদ্ধি হইল "**শিক্ষণ করিবার ক্ষমতা** (কেপ্যাসিটি টু লার্ন)।"

আবার হলিংওয়ার্থ্ মনে করেন যে "কিরূপে অভিপ্রেত বস্তুকে **শিক্ষা করা** এবং লাভ করা যায় তাহার শিক্ষণই বুদ্ধি (ইন্‌টেলিজেন্‌স্ লার্নস্ হাউ টু ডু অ্যাণ্ড্ হাউ টু গেট্ হোয়াট্ ইজ্ ওয়ান্‌টেড্)।"

(৪) কিন্তু সি. ই. স্পিয়ারম্যান-এর সংজ্ঞায় বুদ্ধির বিশুদ্ধ, কার্যকরী এবং শিক্ষণমূলক দিকগুলি মিলিত হইয়াছে। তাঁহার মতে বুদ্ধির বিশ্লেষণ করিলে এই লক্ষণগুলি পাওয়া যায়। বুদ্ধি থাকিলে, আমরা (ক) অভিজ্ঞতার কয়েকটি ধর্ম সম্বন্ধে এবং আমরাই যে অভিজ্ঞাতা সেই সম্বন্ধে সচেতন হই ; (খ) অভিজ্ঞতার বিভিন্ন অঙ্গগুলির সম্বন্ধ লক্ষ্য করি ; (গ) ইন্দ্রিয় সাহায্যে কখনও জানি নাই এমন চিন্তনের বস্তু সৃষ্টি করি ; (ঘ) যাহা অতীতে জানিতাম তাহা ভুলিয়া যাই ; (ঙ) যাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করি এবং (চ) যে সকল বস্তু সম্বন্ধে আমরা চেতন সেইগুলির বিশদতা এবং স্পষ্টতার পরিবর্তন লক্ষ্য করি।

৪। সামান্য ও বিশেষ বুদ্ধি বা সামর্থ্য
জেনার‍্যাল্ অ্যাণ্ড্ স্পেশ্যাল্ ইন্‌টেলিজেন্স অফ্ এবিলিটি-সি. স্পিয়ারম্যান্-এর আবিষ্কার

বুদ্ধি বলিতে কি আমরা এমন একটি সামর্থ্যকে বুঝিব যাহা সকল জ্ঞান-মূলক ক্রিয়ার সাধারণ বা সামান্য ধর্ম এবং সকল অবগতিমূলক ক্রিয়ায় সমভাবে প্রকাশিত ? অথবা বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ায় প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ সামর্থ্যের সমষ্টিকেই বুদ্ধি বলা উচিত ? দ্বিতীয় অর্থে বুদ্ধি হইয়া দাঁড়ায় বিশেষ সামর্থ্য-গুলির গড় বা সাধারণ মান (অ্যাভারেজ্)।

সি. স্পিয়ারম্যান্-এর মতে প্রত্যেক বুদ্ধিপ্রসূত কাজেই একটি সাধারণ বা সামান্য সামর্থ্য (জেনার‍্যাল্ এবিলিটি) এবং বিভিন্ন বিশেষ সামর্থ্য (স্পেশাল্ এবিলিটি) কাজ করে। সামান্য সামর্থ্য এবং বিশেষ সামর্থ্যের যোগফলই বুদ্ধি।

বুদ্ধির উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া স্পিয়ারম্যান উপরোক্ত দুইটি সামর্থ্য পাইয়াছেন। তিনি সাধারণ সামর্থ্যটিকে "জি" এবং বিশেষ "সামর্থ্যকে" "এস্" এই দুইটি প্রতীক সাহায্যে নির্দেশ করিয়াছেন। "জি" প্রত্যেক বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ার সাধারণ অঙ্গ বা উপাদান। কিন্তু "এস্" বিভিন্ন প্রকারের বুদ্ধিমূলক ক্রিয়া অনুসারে বিভিন্ন। যেমন একই ব্যক্তি ইংরাজী, বাংলা, দর্শন, গণিত প্রভৃতি যে কোনো বিষয় বুঝিতে গিয়া "জি" উপাদানটি ব্যবহার করিয়া থাকে। "জি" হইল ব্যক্তির সাধারণ বুদ্ধি অথবা যাহাকে বলা যাইতে পারে কমন্ সেন্স্। কিন্তু এই ব্যক্তিরই হয়ত অঙ্কে বিশেষ মাথা আছে, কাজেই সে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অঙ্কে সাফল্য লাভ করে বেশী। আবার হয়ত অন্যান্য বিষয়ে মোটের উপর

সাফল্য লাভ করিয়া সাহিত্যেই হয় তাহার সাফল্য অসাধারণ। অর্থাৎ, অঙ্কে এবং সাহিত্যে 'জি' এর অতিরিক্ত তাহার 'এস্' অথবা 'বিশেষ বুদ্ধি' রহিয়াছে।

তাহা হইলে সাধারণ সামর্থ্য বা "জি" ব্যক্তির বুদ্ধিমূলক কাজের সাধারণ ভিত্তি, কিন্তু বিশেষ সামর্থ্য বা "এস্" তাহার কোনো বিশেষ বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ার ভিত্তি। সাধারণ সামর্থ্য বা "জি" একটি, কিন্তু বিশেষ সামর্থ্য বা "এস্" বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ার বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন। ফলে সকল বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ায় একটি "জি" ক্রিয়াশীল হয়, কিন্তু প্রত্যেকটি বিশেষ বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ায় এক একটি পৃথক "এস্" কাজ করে, অথবা কোন দুইটি ক্রিয়ায়ই একই এস্ কাজ করে না।

যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া স্পীয়ারম্যান্ বুদ্ধির দ্বি-উপাদান মতবাদ (টু ফ্যাক্টর থিওরি অব্ ইন্টেলিজেন্স) আবিষ্কার করেন তাহা এই। বুদ্ধি অভীক্ষা (ইন্টেলিজেন্স্ টেস্ট্) বা পরীক্ষার ভিত্তিতে তিনি দেখিলেন যে বিভিন্ন কৃতির (পারফর্ম্যান্স্) সাফল্যাঙ্কের (স্কোর) সহিত **পারম্পর্য (কো-রিলেশন্)** আছে। কোনো ব্যক্তি একটি বিশেষ বুদ্ধিক্রিয়ায় যেমন সাফল্য লাভ করে আরও কতগুলি বিশেষ বুদ্ধিক্রিয়ায়ও হয়ত তেমনই সাফল্য লাভ করে। যাহার গণিতে পারদর্শিতা আছে তাহার হয়ত আবার পদার্থবিদ্যায়ও সমান পারদর্শিতা থাকে। অথচ গণিত এবং পদার্থবিদ্যা দুইটি বিশেষ সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল দুইটি পৃথক বিষয়। তাহা হইলে বলিতে হয় যে এই দুইটি বিষয়ের বুদ্ধিগ্রাহ্যতা যেমন দুইটি পৃথক বুদ্ধিসামর্থ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তেমন উহাদের উভয়ের মধ্যে কোনো সাধারণ বা সামান্য বুদ্ধিসামর্থ্যের উপরও প্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং স্পিয়ারম্যান্-এর মতানুসারে কোনো ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ করিতে হইলে উহার **"জি"+"এস্"** এই সমীকরণের সাহায্যে করিতে হয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির বুদ্ধি হইল তাহার **সাধারণ এবং বিশেষ বুদ্ধি-সামর্থ্যের যোগফল।**

স্পিয়ারম্যান্-এর উল্লিখিত মতবাদকে যেমন দ্বি-উপাদান মতবাদ (টু ফ্যাক্টর থিওরি অব্ ইন্টেলিজেন্স্) বলা হয় তেমন এককেন্দ্রিক (ইউনিফোক্যাল) মতবাদও বলা যাইতে পারে, কারণ তাঁহার মতে সকল বিশেষ সামর্থ্যের অন্তর্নিহিত একটি সাধারণ বা সামান্য সামর্থ্যও বিদ্যমান।

"জি" অথবা সাধারণ বুদ্ধ্যাঙ্কটিকে মনোবিদ্যার দিক দিয়া বলা যায় বুদ্ধি বা মানসশক্তি। আবার শারীরবৃত্তের দিক দিয়া ইহাকে বলা যায় এমন একটি শক্তি যাহা নার্ভতন্ত্রের নমনীয়তা, রক্তচলাচলের অবস্থা, গ্রন্থির সামঞ্জস্য,

অম্লজান (অক্সিজেন) গ্রহণ করিবার ক্ষমতা এবং অন্যান্য ক্রিয়ার উপর নির্ভর-শীল। স্পিয়ারম্যান্-এর মতে "জি" হইল এমন একটি শক্তি যাহা একটি মানস-ক্রিয়া হইতে অপর মানসক্রিয়াতে সংক্রামিত অথবা স্থানান্তরিত হইতে পারে।

৫। বুদ্ধির সংগঠন সম্বন্ধে অন্যান্য মতবাদ

(ক) থর্ণডাইক্-এর বহু-উপাদান মতবাদ মাল্টি-মোড্যাল, মাল্টিফোক্যাল বা মাল্টি-ফ্যাক্টর থিওরি অফ্ ইন্টেলিজেন্স্।

স্পিয়ারম্যান্-এর দ্বি-উপাদান মতবাদের বিরুদ্ধে থর্ণডাইক্ তাঁহার বহু-উপাদান (মাল্টি-ফ্যাক্টর্) মতবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন। থর্ণডাইক্-এর মতে কোনো ব্যক্তির সমগ্র বুদ্ধি অসংখ্য বিশেষ সামর্থ্যের দ্বারা গঠিত এবং এই সামর্থ্যগুলি কোনো সাধারণ সামর্থ্য দিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় না। এই বিশেষ সামর্থ্য-গুলির মধ্যে প্রায়ই উচ্চ পরিমাণের পারম্পর্য থাকে, আবার কখনও কখনও থাকে না। উহাদের অনেকগুলির মধ্যে সাধারণ উপাদান থাকিবার দরুণই ইহারা পারম্পর্যশীল হয়. কিন্তু সবগুলির অন্তর্নিহিত কোনো সর্বসাধারণ উপাদানের জন্য হয় না।

(খ) থার্স্টোন্-এর মৌলিক সামর্থ্যবাদ—(প্রাইমারি এবিলিটি থিওরি)

থার্স্টোনও বুদ্ধির এককেন্দ্রিক বাদ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে বুদ্ধি বলিয়া একক কোনো সামর্থ্য নাই। কিন্তু বুদ্ধি বলিতে বুঝায় সাতটি মৌলিক শক্তি। যথা (১) "ভি" (ভারব্যাল্ কম্প্রিহেন্শন্) বা কথা বুঝিবার শক্তি, (২) "এন্"—(নাম্বার্ ফেসিলিটি) বা সংখ্যা ব্যবহারের সহজ শক্তি, (৩) "এম্" —(মেমরি) বা স্মৃতিশক্তি; (৪) "আর"—(ইন্ডাক্টিভ্ রিজ্নিং-) বা আরোহ মূলক বিচারশক্তি; (৫) "পি"—(পারসেপ্চুয়্যাল্ এবিলিটি) অথবা প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি; (৬) "এস্"—(স্পেস্ কম্প্রিহেন্শন্) বা বস্তুর দৈশিক জ্ঞান এবং (৭) "ডব্ল্যু"—(ওয়ার্ড ফ্লুয়েন্সি) বা কথা বলিবার এবং লিখিবার শক্তি।

উপরোক্ত সবগুলি বুদ্ধিসামর্থ্যই যে প্রত্যেক কাজে লাগে তাহা নয়। কোনো কাজে হয়ত এই সাতটির চারটি, আবার অন্য কোনো কাজে হয়ত অন্য

কয়েকটি শক্তির প্রয়োজন হয়। মোটের উপর, থার্স্টোন্-এর বক্তব্য এই যে বুদ্ধি একাধিক মৌলিক সামর্থ্যের সমবায়ে গঠিত।

(গ) টম্‌সন্-এর 'বাছাই করিবার' তত্ত্ব—(স্যাম্‌প্লিং থিওরি)

টম্‌সনও বুদ্ধির বহুকেন্দ্রিকবাদী। তাঁহার মতে বুদ্ধি অসংখ্য শক্তিকণার সমষ্টি। প্রত্যেকটি শক্তিকণাই বুদ্ধির একক বা ইউনিট্। প্রত্যেক কাজে কত-গুলি নির্দিষ্ট শক্তিকণা সক্রিয় হয় এবং ঐ কাজে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি বলিতে এই শক্তিকণাগুলির সমষ্টি, জোট বা দল বলা যায়।

এইরূপে প্রত্যেকটি কাজের জন্যই তদনুযায়ী শক্তিকণা বাছাই হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ আকার ধারণ করে। সুতরাং টম্‌সন-এর মতটিকে বুদ্ধির **"বাছাই করিবার তত্ত্ব"** (স্যাম্‌প্লিং থিওরি) বলা হইয়া থাকে।

(ঘ) বুদ্ধি সম্পর্কে আরও কয়েকটি মতবাদ

এম্. গার্নেট্, স্পিয়ারম্যান্-এর একটি কেন্দ্রীয় উপাদানের অতিরিক্ত আব একটি কেন্দ্রীয় উপাদান স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে চতুরতা বা ক্লেভারনেস্ বুদ্ধির দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় উপাদান। গার্নেট "সি" এই প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে এই দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় উপাদানটির নির্দেশ করিয়াছেন। চতুরতা বা "সি" বলিতে বুঝায় বস্তুর সাদৃশ্য অনুসারে উহাকে অনুষক্ত করিবার প্রবণতা বা ইচ্ছা।

আবার **বিনে** মনে করেন যে বুদ্ধিতে তিনটি উপাদান বা স্তর বর্তমান—যথা (১) চিন্তনের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য গ্রহণ করা এবং বজায় রাখিবার ক্ষমতা, (২) ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে প্রতিযোজন করিবার ক্ষমতা এবং (৩) লব্ধ ফলের বিচার বা সমালোচনা করিবার ক্ষমতা।

ক্ল্যাপারেড্ও বুদ্ধিক্রিয়ায় তিনটি বিভিন্ন ধারা স্বীকার করেন যথা বুদ্ধির প্রথম আরম্ভ বা সূত্রপাত হইল কোনো প্রশ্ন উত্থাপন এবং উহার চেষ্টায় সমাধান, দ্বিতীয়টি হইল উহার অনুসন্ধান, প্রকল্পের আবিষ্কার প্রভৃতি এবং তৃতীয়টি হইল ঐ প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ কল্পিত প্রকল্পের পরীক্ষণ।

(ঙ) উপসংহার—ব্যালার্ড্-এর মত

বুদ্ধির উপাদান অথবা অঙ্গের বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে ব্যালার্ড্ বলিয়াছেন, যে সম্ভবতঃ সকল মতবাদীই কয়েকটি বিষয়ে একমত হইবেন। "বিভিন্নভাবে ক্রিয়াশীল বুদ্ধি একটি সহজাত মানসিক সামর্থ্য। ইহা নিম্নতর অপেক্ষা উচ্চতর

মানসবৃত্তিগুলিতে অধিকতর প্রকাশিত হয়। যে সকল পরিস্থিতি কতকাংশে নূতন অথবা সমাধানের জন্য সমস্যা উপস্থিত করে তাহাতেই উহা বিশেষভাবে সক্রিয়। ইহা সংবেদনগুলিকে শুধু গ্রহণ না করিয়া, প্রধানতঃ অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদানগুলির বিশ্লেষণ, গঠন এবং পুনর্বিন্যাস করে।"

উপরোক্ত বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে মোটের উপর বলা যায় যে অভীক্ষা মনোবিদ্যায় (টেস্ট্ সাইকলজি) উহাদের চূড়ান্ত বিচার হইয়া থাকে। অভীক্ষা বা পরীক্ষা সাহায্যে প্রাপ্ত বুদ্ধির কার্য বা ফল দিয়াই এই চূড়ান্ত বিচার হয়, শুধু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়া নয়।

অভীক্ষা মনোবিদ্যায় তত্ত্ববিশ্লেষণের কোনো চরম মূল্য নাই।

৬। বুদ্ধির পরিমাপ

মেজারমেণ্ট্ অফ্ ইন্‌টেলিজেন্স্

সাম্প্রতিক মনোবিদ্যায় অভীক্ষা বা পরীক্ষার ভিত্তিতে বুদ্ধির পরিমাপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার ফলে মনোবিদ্যায় অভীক্ষা মনোবিদ্যা (টেস্ট্ সাইকলজি) নামক একটি পৃথক শাখা প্রসার লাভ করিয়াছে।

প্রাচীন কাল হইতেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বুদ্ধির তারতম্য বিচারের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শারীরবিৎ গল্ মস্তিষ্কের সমুন্নত অংশ দেখিয়া কাহার কিরূপ বুদ্ধি তাহার বিচার করিতেন। কিন্তু এই বিচার ছিল বিচারকের অল্পাধিক ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বুদ্ধি নির্ণয়ের নির্ভরযোগ্য এবং নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বা পরীক্ষা উদ্ভাবিত হইয়াছে, যাহার ফলে বুদ্ধির পরিমাণ আর ব্যক্তিগত খেয়ালখুশীর ব্যাপার নাই।

স্যর ফ্র্যান্সিজ্ গ্যাল্টন্

ইংরাজ বিজ্ঞানী স্যর ফ্রান্সিজ্ গ্যাল্টন্ই তাঁহার প্রসিদ্ধ "হেরিডিটারি জিনিয়াস্" গ্রন্থে বুদ্ধি পরিমাপের বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিকে প্রথম অঙ্গুলী সঙ্কেত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম অসাধারণ বা প্রতিভাসম্পন্ন বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া জড়বুদ্ধি পর্যন্ত বুদ্ধির বিভিন্ন স্তরগুলি একটি স্বাভাবিক বণ্টন রেখায় (নর্ম্যাল্ ডিস্ট্রিবিউশন্ কার্ভ্) প্রদর্শন করেন। এই রেখার দুই প্রান্তসীমায় রহিয়াছে জড়বুদ্ধি (ইডিয়সি) এবং অসাধারণ বুদ্ধি (জিনিয়াস্)। তিনি দেখাইয়াছেন যে এই প্রান্তীয় বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির, অর্থাৎ জড়বুদ্ধি এবং অসাধারণ

বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির, সংখ্যাই অল্প। এই রেখার কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যাহাদের সংখ্যা বেশী। গ্যাল্‌টন্-এর আবিষ্কৃত বুদ্ধির স্বাভাবিক বণ্টন রেখাচিত্র (নর্ম্যাল্ ডিষ্ট্রিবিউশন্ কার্ভ) নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

জার্মাণ মনোবিদ্ **এবিংহাউসও** তাঁহার সমাপ্তি অভীক্ষায় (কম্‌প্লিশন্ টেস্ট্) বুদ্ধি পরিমাপের ভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন।

অ্যাল্‌ফ্রেড বিনে

কিন্তু বুদ্ধিপরিমাপ ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটাইয়াছেন ফরাসী মনোবিদ্ অ্যাল্‌ফ্রেড্ বিনে। প্যারীর শিক্ষা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল্ বিদ্যালয়স্থ কতগুলি ছাত্রের শিক্ষণে পশ্চাদ্‌বর্তিতায় (ব্যাক্‌ওয়ার্ডনেস্) চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা এই পশ্চাদ্‌বর্তিতার কারণ অনুসন্ধানের ভার দিলেন অ্যাল্‌ফ্রেড্ বিনেকে। তিনি দীর্ঘকাল বিশেষ বুদ্ধি বা কৃতী-সামর্থ্যের গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। এইবার সাধারণ বা সামান্য সামর্থ্যের নির্ণয় উদ্দেশ্যে তিনি অভীক্ষা (টেষ্ট্) উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ করিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাড়াই কোনো নির্দিষ্ট বয়সের স্বভাবী (নর্ম্যাল্) শিশুদের বুদ্ধি বিকাশ হওয়া উচিত ইহা ধরিয়া লইয়া তিনি প্রত্যেক বয়ঃস্তরের পরিমাপ করিবার জন্য কতগুলি সরল পরীক্ষা বা অভীক্ষা প্রস্তুত করিলেন এবং অভীক্ষার্থী শিশুদের (টেস্ট্রীজ) উপর তাহা প্রয়োগ করিলেন। এইরূপে তিনি তাহার পরীক্ষা বা অভীক্ষাগুলির মাননির্দ্ধারণ (স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন্) করিতে সমর্থ হইলেন।

২৬ নং চিত্র—স্বাভাবিক বণ্টন রেখা
নর্ম্যাল ডিষ্ট্রিবিউশন্ কার্ভ্।

অভীক্ষার মান-নির্ধারণ (স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন্ অফ্ টেস্ট্‌স্)

পরীক্ষা বা অভীক্ষার মান নির্ধারণ (স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন্) করিবার অর্থ হইল স্থির করা যে **এই এই পরীক্ষা বা অভীক্ষা এই এই বয়সের উপযোগী**। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট বয়ঃস্তরের প্রত্যেক শিশুই যে ঐ বয়সের জন্য প্রমাণিত বা নিধারিত অভীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা উহার উচ্চতর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষায়

অনুত্তীর্ণ হইল তাহা নয়। যেমন হয়তো কোনো পাঁচ বৎসরের শিশু ঐ বয়ঃস্তরের নির্ধারিত অভীক্ষায় সাফল্য লাভ করিল না। আবার হয়ত অন্য একটি পাঁচ বৎসরের শিশু ঐ বয়ঃস্তরের নির্ধারিত পরীক্ষায় তো সাফল্য লাভ করিলই, তদুপরি ছয়, এমন কি সাত বা আট বৎসরের নির্ধারিত অভীক্ষায়ও সসম্মানে উত্তীর্ণ হইল।

অর্থাৎ, বিনে দেখিলেন যে তাঁহার অভীক্ষার্থী শিশুদের মধ্যে **তিনটি শ্রেণী** রহিয়াছে। এক শ্রেণী শুধু তাহাদের জন্য নির্ধারিত অভীক্ষায়ই—নিম্নতর বয়ঃসীমার অভীক্ষায় তো বটেই—উত্তীর্ণ হইতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণী তাহাদের বয়ঃসীমা—নিধারিত অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না—উর্ধ্বতব বয়ঃসীমার অভীক্ষায় তো পারেই না—কিন্তু তাহাদের নিম্নতর বয়ঃসীমার অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর শিশুরা তাহাদের বয়ঃসীমা অথবা নিম্নতর বয়ঃসীমার নির্ধারিত অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে তো পারেই, কিন্তু তদুপরি তাহাদের উর্ধ্বতর বয়ঃসীমার নির্ধারিত অভীক্ষায়ও সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়।

দুই প্রকার বয়স—ক্রমিক এবং মানস

সুতরাং মনের বিকাশ সর্ব্বদা সমান তালে অগ্রসর হয় না। এই আবিষ্কারেব ফলে বিণে **অভীক্ষার্থীর বয়স** প্রধানতঃ **দুই প্রকারে ভাগ করিয়াছেন**। প্রথমটি হইল জন্মগত বা **ক্রমিক বয়স** (ক্রনোলজিক্যাল্ এজ্) যাহাকে শারীব বয়সও (ফিজিক্যাল এজ্) বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারের বয়স হইল মানস বয়স (মেণ্ট্যাল এজ্)। কাহারও হয়ত জন্মগত বা শারীর বয়স সাত, কিন্তু মানস বয়স পাঁচ বৎসর বা তাহারও কম। শিশু সাত বৎসর পূর্বে, জন্মগ্রহণ করিয়াও যাহারা মোটে পাঁচ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছে মাত্র তাহাদেব নিম্নতর বয়ঃসীমার জন্য নির্ধারিত অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। অর্থাৎ এই শিশুর জন্মগত বা ক্রমিক বয়স সাত বৎসর হইলেও, উহার মানস বয়স পাচ বৎসরের বেশী নয়। আবার কাহারও হয়ত জন্মগত বা ক্রমিক বয়স সাত এবং মানস বয়সও সাত, কারণ সে তাহার এবং তাহার নিম্ন বয়সের অভীক্ষায় উত্তীর্ণ, যদিও উর্ধ্বতর বয়সের অভীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়। তৃতীয়তঃ কোনো শিশুর মানস বয়স তাহার জন্মগত বা ক্রমিক বয়স অপেক্ষা বেশী হইতে পারে, কারণ সে তাহার এবং তাহার নিম্ন বয়ঃসীমা নির্দিষ্ট অভীক্ষায় তো বটেই, তদুপরি

তাহার উর্ধ্বতর বয়ঃসীমা নির্দিষ্ট, যেমন আট বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট, অভীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতে পারে।

তাহা হইলে জন্ম হইতে হিসাব করিয়া ব্যক্তির যে বয়স পাওয়া যায় তাহাই তাহার জন্মগত, শারীর বা ক্রমিক (ক্রনোলজিক্যাল এজ্) বয়স। আবার অভীক্ষার মান অনুসারে ব্যক্তির যে বয়স পাওয়া যায় তাহাই তাহার মানস বয়স (মেণ্ট্যাল এজ্)।

বিনে'র আবিষ্কার

মানস অভীক্ষার গবেষণায় বিনে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার মধ্যে চারটি প্রধান।

(১) প্রথমটি হইল বুদ্ধির সর্বাঙ্গীন পরিমাপের জন্য বিভিন্ন অভীক্ষা বা পরীক্ষার উদ্ভাবন ; (২) দ্বিতীয়টি হইল মানস অভীক্ষার প্রমাণ বা মান-নির্ধারণ (স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন), (৩) তৃতীয়টি হইল ক্রমিক এবং মানস বয়সের ভেদ নির্দেশ এবং (৪) চতুর্থটি হইল ক্রমিক ও মানস বয়সের আনুপাতিক হিসাবের ভিত্তিতে বুদ্ধ্যঙ্কের (ইনটেলিজেন্স্ কোসেণ্ট্) উদ্ভাবন।

বুদ্ধ্যঙ্ক—ইন্‌টেলিজেন্স্ কোসেণ্ট্ বা আই. কিউ.

প্রথম তিনটির আলোচনা উপরে করা হইয়াছে। চতুর্থটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। চতুর্থ আবিষ্কারটির, অর্থাৎ ক্রমিক ও মানস বয়সের আনুপাতিক হিসাবে **বুদ্ধ্যঙ্কের আবিষ্কারের** গৌরব শুধু একা বিনে'এর নয়, বা তাঁহার সহকর্মী সাইমন্-এরও নয়, কিন্তু স্টার্ন এবং প্রধানতঃ, টার্ম্যান-এরও। কিন্তু স্টার্ন বুদ্ধ্যঙ্কের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন মাত্র। বিনে-সাইমন মানকের (স্কেল্) পরিবর্তিত সংস্করণে **টার্ম্যান্ ও মেরিল্ হাতেকলমে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করিয়াছেন।**

এইবার বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় প্রণালী কি দেখা যাউক। উপরে দেখানো হইয়াছে কি প্রকারে কোনো শিশুর ক্রমিক বয়স সাত হইলেও তাহার মানস বয়স সাতের কম বা বেশী হইতে পারে। **বুদ্ধ্যঙ্ক হইল ক্রমিক এবং মানস বয়সের আনুপাতিক পার্থক্য।** যাহার ক্রমিক বয়স সাত, কিন্তু মানস বয়স ছয় বৎসর বা আরও কম, তাহার বুদ্ধির বিকাশ বা বুদ্ধ্যঙ্ক বয়সের অনুপাতে কম, অর্থাৎ এই বয়সে তাহার যেরূপ মানস বিকাশ হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। যাহার ক্রমিক বয়স সাত এবং মানস বয়সও সাত তাহার বুদ্ধির বিকাশ বা

বুদ্ধ্যঙ্ক বয়সের অনুপাতে সমান, অর্থাৎ বয়স অনুপাতে তাহার আশানুরূপ বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়াছে। আবার যাহার ক্রমিক বয়স সাত এবং মানস বয়স আট বৎসর বা আরও বেশী, তাহার বুদ্ধির বিকাশ বা বুদ্ধ্যঙ্ক বয়সের তুলনায় বেশী, অর্থাৎ সাত বৎসর বয়সে যেরূপ বুদ্ধির বিকাশ আশা করা যাইতে পারে তাহার বুদ্ধি তদপেক্ষা বেশী উন্নত।

উপরোক্ত তিনটি শিশুর মধ্যে প্রথমটির বুদ্ধি **স্বাভাবিক অপেক্ষা কম,** দ্বিতীয়টির বুদ্ধি **স্বাভাবিক** এবং তৃতীয়টির বুদ্ধি **স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী।** স্বাভাবিক বণ্টন রেখায় প্রথমটির স্থান কেন্দ্রবিন্দুর বাম দিকে, দ্বিতীয়টির স্থান কেন্দ্রবিন্দুতে এবং তৃতীয়টির স্থান হইবে কেন্দ্রবিন্দুর ডান দিকে।

বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ের গাণিতিক হিসাব

কিন্তু এইরূপ মোটামুটি ব্যাখ্যায় বুদ্ধ্যঙ্ক অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। বুদ্ধ্যঙ্ককে স্পষ্ট বা নির্দিষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য গণিত এবং পরিসংখ্যানের (স্ট্যাটিস্টিক্‌স্) সাহায্য অনিবার্য। বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ের গাণিতিক হিসাবটি এই :—

মানস বয়সকে ক্রমিক বয়স দিয়া ভাগ করিয়া ঐ ভাগফলকে ১০০ দিয়া গুণ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে বুদ্ধ্যঙ্ক বলে। যেমন প্রথম ব্যক্তির—অর্থাৎ যাহার ক্রমিক বয়স সাত এবং মানস বয়স ছয় বৎসর তাহার—বুদ্ধ্যঙ্ক হইবে $\frac{\text{মানস বয়স}}{\text{ক্রমিক বয়স}} \times ১০০ = \frac{৬}{৭} \times ১০০ = ৮৫{\cdot}৭ = ৮৬$

দ্বিতীয় ব্যক্তির—অর্থাৎ যাহার ক্রমিক এবং মানস বয়স সাত বৎসর তাহার—বুদ্ধ্যঙ্ক হইবে $\frac{\text{মানস বয়স}}{\text{ক্রমিক বয়স}} \times ১০০ = \frac{৭}{৭} \times ১০০ = ১০০$

তৃতীয় ব্যক্তির—অর্থাৎ যাহার ক্রমিক এবং মানস বয়স যথাক্রমে সাত এবং আট বৎসর—তাহার বুদ্ধ্যঙ্ক হইবে

$$\frac{\text{মানস বয়স}}{\text{ক্রমিক বয়স}} \times ১০০ = \frac{৮}{৭} \times ১০০ = ১১৪{\cdot}২ = ১১৪$$

বুদ্ধ্যঙ্ক অনুসারে বুদ্ধির বিভিন্ন স্তর

বুদ্ধ্যঙ্ক অনুসারে ব্যক্তিকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে। যেমন সর্বাপেক্ষা নিম্নবুদ্ধ্যঙ্কবিশিষ্ট ব্যক্তিকে **জড়ধী** (ইডিয়ট্) বলা হয়। জড়ধীর বুদ্ধ্যঙ্ক ২০ হইতে ২৫ এবং মানস বয়স তিন হইতে পাঁচ বৎসরের বেশী নয়।

জড়ধী অপেক্ষা অধিক বুদ্ধ্যঙ্কবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বলে **মন্দধী বা নির্বোধ** (ইম্‌বেসাইল্)। ইহার বুদ্ধ্যঙ্ক সাধারণতঃ ২৫ হইতে ৫০ এবং মানস বয়স পাঁচ হইতে আট বৎসরের বেশী নয়। মন্দধী অপেক্ষা **ক্ষীণধী** (মোরোন্) ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক এবং মানস বয়স আরও বেশী—ইহার বুদ্ধ্যঙ্ক সাধারণতঃ ৫০ হইতে ৭০ এবং মানস বয়স আট হইতে এগারো অপেক্ষা অধিক হয় না। **অল্পধী** (ডাল্) ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক ও মানস বয়স আরও বেশী—ইহার বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০ হইতে ৯০ এবং মানস বয়স এগোরো হইতে চৌদ্দ। আবার **স্বাভাবিক-বুদ্ধি** (নর্ম্যাল্) ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক এবং মানস বয়স স্বাভাবিক—ইহার বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ হইতে ১১০ এবং মানস বয়স চৌদ্দ হইতে ষোল।

উপরের দিকে, **উজ্জ্বলধী** (ব্রাইট্) ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক এবং মানসবয়স স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী। ইহার বুদ্ধ্যঙ্ক ১১০ হইতে ১২০ এবং মানস বয়স ষোল হইতে কুড়ি। **বিশেষ-উজ্জ্বলধী** (ভেরি ব্রাইট্) ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০ হইতে ১৪০ এবং মানস বয়স কুড়ি হইতে বাইশ। **প্রতিভাবান** (জিনিয়াস্) ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪০ হইতে ১৬০ এবং মানস বয়স বাইশ হইতে চব্বিশ। **অসাধারণ প্রতিভাবান** (এক্সট্রা-অর্ডিনারি) ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক হইল ১৬০-এর উর্ধ্বে এবং তাহার মানস বয়স চব্বিশ-এর উপরে।

বুদ্ধ্যঙ্ক এবং মানস বয়সের স্তরভেদগুলি নিম্ন তালিকায় দেখানো হইল।

		মানস বয়স	বুদ্ধ্যঙ্ক
(১)	অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি (এক্সট্রা-অর্ডিনারি জিনিয়াস)	২৪ এর উর্ধ্বে	১৬০ এর উর্ধ্বে
(২)	প্রতিভাবান্ ব্যক্তি (জিনিয়াস)	২২-২৪	১৪০-১৬০
(৩)	বিশেষ-উজ্জ্বলধী (ভেরি ব্রাইট্) ”	২০-২২	১২০-১৪০
(৪)	উজ্জ্বলধী (ব্রাইট্) ”	১৬-২০	১১০-১২০
(৫)	স্বাভাবিক-বুদ্ধি (নর্ম্যাল) ”	১৪-১৬	৯০-১১০
(৬)	অল্পধী (ডাল্) ”	১১-১৪	৭০-৯০

		মানস বয়স	বুদ্ধ্যঙ্ক
(৭) ক্ষীণধী (মোরোন্)	„	৮-১১	৫০-৭০
(৮) মন্দধী (ইম্‌বেসাইল্)	„	৫-৮	২৫-৫০
(৯) জড়ধী (ইডিয়ট)	„	৫ এর নীচে	২৫ এর নীচে

জড়ধী (ইডিয়ট্) ব্যক্তির বুদ্ধি গর্দভের মত। সে আত্মরক্ষামূলক কাজগুলিও করিতে পারে না। স্নান, আহার, পরিধান প্রভৃতি জীবনধারণের জন্য আবশ্যক ব্যাপারগুলিতেও সে পরমুখাপেক্ষী। **মন্দধী** (ইম্‌বেসাইল্) ব্যক্তিকে শিখাইয়া দিলে সে এই জাতীয় কাজগুলি করিতে পারে, কিন্তু লেখাপডা প্রভৃতি মাথার কাজগুলি শিখাইলেও করিতে পারে না। **ক্ষীণধী** (মোরোন্) ব্যক্তিকে শিক্ষা দিলে সে মোটামুটি লেখাপড়ার কাজ হয়ত চালাইতে পারে। **অল্পধী** (ডাল্) ব্যক্তিকে ঘষিয়া মাজিয়া হয়ত গ্র্যাজুয়েট্ পর্যন্ত করিয়া তোলা যায়। **স্বাভাবিক** বুদ্ধি সম্পন্ন (নর্ম্যাল্) ব্যক্তি সকল প্রকার বুদ্ধিক্রিয়াই সাধারণভাবে সম্পন্ন করিতে পারে। **উজ্জ্বলধী** (ব্রাইট্), **বিশেষ-উজ্জ্বলধী** (ভেরি ব্রাইট্) ব্যক্তিরা আরও সহজে এবং স্বচ্ছন্দে বুদ্ধিক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে। **প্রতিভাবান** (জিনিয়াস) এবং **অসাধারণ প্রতিভাবান** (এক্সট্রা-অর্ডিনারি জিনিয়াস) ব্যক্তিরা সকল বুদ্ধিক্রিয়ায় নিজস্ব মৌলিকতা দেখায়।

উপরে নির্দেশিত বুদ্ধ্যঙ্কগুলিকে ঐ ঐ বুদ্ধিস্তরের আদর্শমান ধরা হইলেও কার্যতঃ উহাদের অল্পাধিক তারতম্য ঘটে। যেমন জড়ধীর বুদ্ধ্যঙ্ক ২০ ধরা হইলেও উহা ২০ হইতে প্রায় ২৫-এর কাছাকাছি হইয়া দাঁড়ায়। আবার মন্দধীর বুদ্ধ্যঙ্ক ২৫ হইতে ৫০, ক্ষীণধীর ৫০ হইতে ৭০, অল্পধীর ৭০ হইতে ৯০, স্বাভাবিক বুদ্ধির ৯০ হইতে ১১০, উজ্জ্বলধীর ১১০ হইতে ১২০ দেখা যায়। অর্থাৎ বুদ্ধ্যঙ্কগুলি বিন্দু নয়, কিন্তু একটি বিন্দু হইতে আর একটি বিন্দু পর্যন্ত একটি সীমা বা রেঞ্জ।

৭। বুদ্ধ্যঙ্কের বণ্টন

বুদ্ধির বণ্টনহার সম্বন্ধে অভীক্ষা-মনোবিদ্‌গণের মধ্যে কম বেশী মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন টারম্যান্ ১০০০ অনির্বাচিত অ্যামেরিকান্ শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক বণ্টনের যে শতকরা হার পাইয়াছেন তাহা এইরূপ :—

বুদ্ধ্যঙ্ক	শতকরা শিশুর সংখ্যা
৫৬-৬৫	০·৩৩
৬৬-৭৫	২·৩
৭৬-৮৫	৮·৬
৮৬-৯৫	২০·১
৯৬-১০৫	৩৩·৯
১০৬-১১৫	২৩·১
১১৬-১২৫	৯·০
১২৬-১৩৫	২·৩
১৩৬-১৪৫	০·৫৫

টার্ম্যান ও মেরিল[১]-এর আর একটি গবেষণার ভিত্তিতে স্যাণ্ডিফোর্ড[২] কোনো দেশের জনসাধারণের মধ্যে শতকরা হিসাবে বুদ্ধ্যঙ্ক কিরূপ হারে বণ্টিত হয় তাহা নিম্ন রেখাচিত্রের (২৭ নং চিত্র) সাহায্যে দেখাইয়াছেন।
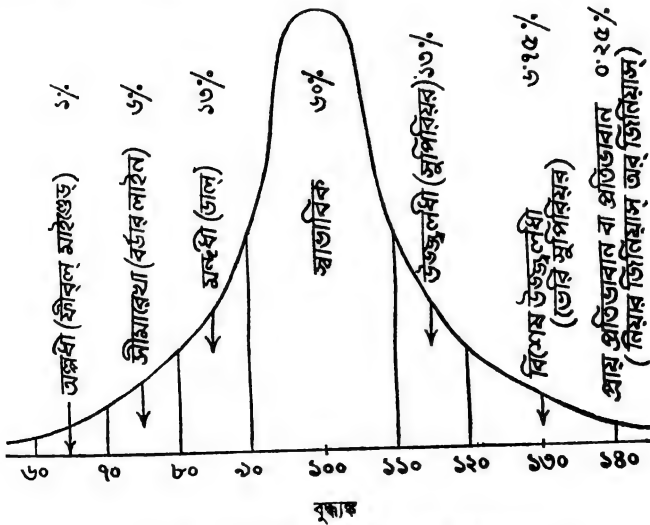
২৭ নং চিত্র—জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধ্যঙ্কের শতকরা বণ্টনহার

বণ্টনহার সম্বন্ধে অল্পাধিক তারতম্যে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বণ্টনহার দেখাইবার উদ্দেশ্য ব্যক্তিতে বিভিন্ন বুদ্ধিস্তরের অল্পতা বা আধিক্য বুঝানো।

১ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—১ম অনুচ্ছেদ

২ পিটার স্যাণ্ডিফোর্ড—এডুকেশন সাইকলজি—পৃঃ ১৬২

এই দিক দিয়া সকল অভীক্ষা-মনোবিদ্ই একমত। যেমন সকলেই বলিবেন যে স্বাভাবিক বুদ্ধি শতকরা সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে দেখা যায়। টার্ম্যান্-এর মতে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৩৩·৯% এবং স্যাণ্ডিফোর্ড-এর মতে ইহা ৬০%। কিন্তু উভয় মতেই অন্যান্য বুদ্ধিস্তরের তুলনায় ইহাই অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে বর্তমান।

৮। বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা—(কন্স্‌ট্যান্সি অফ্ দি আই. কিউ.)

বুদ্ধি একটি সহজাত শক্তি। কেহ কেহ আজন্ম জড়ভরত থাকিয়া যায়, আবার কেহ বা জন্ম হইতেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। মানুষ যে শিম্পাঞ্জীর তুলনায়, শিম্পাঞ্জী বানরের তুলনায়, বানর কুকুরের তুলনায়, কুকুর বিলাতি ইঁদুরের তুলনায়, বিলাতি ইঁদুর ব্যাং-এর তুলনায় এবং ব্যাং মাছের তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান তাহাতে সন্দেহ নাই। জন্মগতভাবে জড়বুদ্ধি ব্যক্তিকে হাজার শিক্ষা দিলেও তাহার বুদ্ধির উন্নতি হয় না, আবার প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সামান্য সুযোগ পাইলেই তাহার বুদ্ধির চরম বিকাশ ঘটে।

কিন্তু বুদ্ধি শুধু একটু সূক্ষ্ম শক্তি নয়। আচরণের মধ্য দিয়াই বুদ্ধির প্রকাশ। অর্থাৎ বুদ্ধি জন্মগত হইলেও উহার বিকাশ বা উন্নতি নির্ভর করে পরিবেশের (এন্‌ভায়রন্‌মেণ্ট্) উপর। কিন্তু শিক্ষা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি পরিবেশগত কারণ বুদ্ধির নিজস্ব রূপকে পরিবর্তিত করে না, পরিবর্তিত করে শুধু বুদ্ধির পরিসর বা প্রসার।

বুদ্ধির যেমন কোনো আসল পরিবর্তন হয় না, বুদ্ধ্যঙ্কেরও তেমন কোনো বিশেষ পরিবর্তন হয় না। যাহারা জন্ম হইতেই জড়বুদ্ধি, মন্দবুদ্ধি, ক্ষীণবুদ্ধি, অল্পবুদ্ধি, উজ্জ্বলবুদ্ধি, বা অত্যুজ্জ্বলবুদ্ধি, শিক্ষা দীক্ষা, অভিজ্ঞতা বা বয়োবৃদ্ধির ফলেও তাহাদের বুদ্ধি প্রায় ঐরূপই থাকিয়া যায়। তাহারা হয়ত অল্প বয়সে যাহা জানিত বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহা অপেক্ষা আরও বেশী জিনিস জানিতে পারে। কিন্তু তাহাদের জানিবার বা বুঝিবার আকার প্রকার অপরিবর্তিত থাকে। শিক্ষা, দীক্ষা বা **বয়োবৃদ্ধির ফলে বুদ্ধির যে উন্নতি ঘটিতে পারে তাহা বুদ্ধির বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধীয়, কিন্তু বুদ্ধির আকার বা প্রকার সম্বন্ধীয় নয়।**

বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা দুই অর্থে বুঝা যাইতে পারে। **প্রথম অর্থে** ইহা বুঝায় যে মনের উন্নতি সত্ত্বেও বুদ্ধ্যঙ্ক অপরিবর্তনীয়। **বুদ্ধ্যঙ্ক যে বয়সের**

পরিমাপক, সর্বদা সেই বয়সেরই পরিমাপক হইবে। যদি কাহারও প্রকৃত বয়স ৮, এবং মানস বয়স ১০ এবং বুদ্ধ্যঙ্ক ১২৫ হয়, তাহা হইলে এই বুদ্ধ্যঙ্কটি এইরূপ বয়সেরই পরিমাপক হইবে। এই অর্থে ইহা বুঝায় না যে কোনো ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক অপরিবর্তনীয়, কিন্তু বুঝায় যে, যে বয়সে উহা প্রযুক্ত হয় সেই বয়সে ইহার অর্থ বা তাৎপর্য অপরিবর্তনীয় থাকে।

দ্বিতীয় অর্থে বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা বলিতে বুঝায় কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা। এই অর্থ অনুসারে একই ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক আজীবন একই থাকে, শিক্ষা দীক্ষা, অভিজ্ঞতা, বয়স এবং অন্যান্য পরিবেশগত কারণে পরিবর্তিত হয় না।

তত্ত্বের দিক দিয়া বুদ্ধ্যঙ্ক অপরিবর্তনীয় হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবের দিক দিয়া বুদ্ধি অপরিবর্তনীয় হইলেও বুদ্ধ্যঙ্ক অপরিবর্তনীয় নয়। প্রথমতঃ, বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ের অভীক্ষাগুলিকে একেবারে নির্দোষ বলা যাইতে পারে না—ইহাদের মধ্যে ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে। সুতরাং ইহাদের অপরিবর্তনীয়তা যেমন বাঞ্ছনীয় নয় তেমন যথার্থও নয়। তাহা ছাড়া ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্কের হ্রাস-বৃদ্ধিও অস্বীকার করা যায় না। ফ্রীম্যান বলেন যে প্রতিভাবান শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ক স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন শিশু অপেক্ষা দীর্ঘতর কাল ধরিয়া এবং বিস্তৃততর ভাবে বদলায়। ওয়েল্‌ম্যান্‌ দেখাইয়াছেন যে বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়স হয় নাই এমন শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ক যথেষ্ট বাড়ে। পালিত এবং যমজ শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ক পরীক্ষার ভিত্তিতে ফ্রীম্যান্‌ মনে করেন যে প্রতিবেশের প্রভাবে অল্পবয়স্ক শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ক যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে।

বুদ্ধ্যঙ্ক বৃদ্ধির বা পরিবর্তনের কারণ অনেক হইতে পারে। হয়ত ইহা অভীক্ষার ত্রুটি হইতেই ঘটে। অথবা, যেমন টার্ম্যান্‌ মনে করেন, হয়ত এই পরিবর্তন বিভিন্ন শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধির হার হইতে ঘটে। আবার হয়ত অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবই বুদ্ধ্যঙ্কের পরিবর্তন ঘটায়।

৯। বুদ্ধির ক্রমবিকাশ

বুদ্ধি অচল বা স্থির নয়, কিন্তু বিকাশ বা পরিণামশীল। বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে ব্যক্তির জন্ম হইতে পরিণতি পর্যন্ত তাহার বুদ্ধি বিকাশশীল।

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি মোটামুটি ভাবে দেখায় যে শৈশবে বুদ্ধির বিকাশ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং ষোল বৎসর বয়ঃসীমার কাছাকাছি আসিয়া বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। তাহা ছাড়া, বুদ্ধিমান শিশুদের বুদ্ধির বিকাশ হয় তাড়াতাড়ি এবং ইহা স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের তুলনায় হয় বেশী দীর্ঘকাল-স্থায়ী। সম্ভবতঃ পরিণত বয়সে বুদ্ধির বিকাশ থামিয়া যায় এবং বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে ইহা কমিতে থাকে।

কোন্ নির্দিষ্ট বয়ঃসীমায় বুদ্ধি পরিণতি লাভ করে সেই বিষয়ে মতভেদ আছে। বিনে মনে করেন যে এই পরিণতি বয়স ১৫, টার্ম্যান এবং ব্যালার্ড্-এর মতে ইহা ১৬ এবং ওটিজ্ ও মানরো-এর মতে ইহা ১৮। থর্নডাইক্ মনে করেন যে উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠান্ত হইবার বয়সই বুদ্ধির পরিণতি বয়স। আবার ডল্-এর মতে এই বয়স ১৩।

উপসংহারে বলা যায় যে বর্তমান পরিমাপ পদ্ধতি অনুসারে বুদ্ধির পরিণতি বয়স ১৪ হইতে ১৬এর মধ্যে। আরও সূক্ষ্ম পরিমাপ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইলে হয়ত দেখা যাইবে যে ২৩ হইতে ২৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ চলিতে থাকে।

১০। বুদ্ধির উচ্চতা এবং বিস্তার বা আনুভূমিকতা (ভার্টিক্যাল্ অ্যাণ্ড হরাইজন্ট্যাল্ গ্রোথ্ অব্ ইন্টেলিজেন্স্)

যদি ১৪ হইতে ১৬ বৎসর বয়ঃসীমায় বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির পরিণত বুদ্ধি তাহার কিশোর অবস্থায় অপরিণত বুদ্ধির সহিত সমান হইয়া দাঁড়ায়। অথচ চল্লিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি যে তাহাব কিশোর অবস্থার তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

উত্তর এই যে বুদ্ধি-অভীক্ষার ভিত্তিতে উহাদের বুদ্ধির **উচ্চতা বা গভীরতা** সমানই বটে, যদিও চল্লিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির **বুদ্ধির বিস্তার বা ক্ষেত্র** অপেক্ষাকৃত বেশী। ষোল বৎসর বয়স্ক কিশোরের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত অল্প বিষয় সম্বন্ধে সজাগ, আবার ঐ ব্যক্তিই চল্লিশ বৎসর বয়স্ক পরিণত অবস্থায় অপেক্ষাকৃত অধিক বিষয় সম্বন্ধে সজাগ হয়। কিন্তু আসল বুদ্ধিতে অর্থাৎ বুদ্ধির উচ্চতায় বা গভীরতায় উভয়ের কোনো পার্থক্য নাই।

উপসংহারে স্মরণ করা দরকার যে বুদ্ধির উচ্চতায় উল্লিখিত অপরিবর্তনীয়তা তাত্ত্বিক দিক দিয়া গ্রহণীয় হইলেও, বাস্তবে গ্রহণীয় নয়। বাস্তব অভীক্ষার

ভিত্তিতে শুধু এইটুকু বলা যায় যে যদিও বুদ্ধির উচ্চতা এবং প্রসার এই উভয়ই পরিবর্তনশীল, প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি বেশী পরিবর্তনশীল। এই প্রসঙ্গে পূর্ব অনুচ্ছেদটি মনোযোগের সহিত দ্রষ্টব্য।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

উড্‌ওয়ার্থ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস্—সাইকলজি—চতুর্থ পরিচ্ছেদ
মেলোন অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেণ্টস্ অফ্ সাইকলজি—চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
বোরিং, ল্যাংফেল্ড্, ওয়েল্ড্—ফাউণ্ডেশন্স্ অব্ সাইকলজি—অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ
জি ডি. বোয়াজ্—জেনার‍্যাল্ সাইকলজি—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
পি. স্যাণ্ডিফোর্ড—এডুকেশন্যাল্ সাইকলজি—অষ্টম পরিচ্ছেদ
জি. মার্ফি—জেনার‍্যাল্ সাইকলজি—একবিংশ, ত্রয়বিংশ পরিচ্ছেদ
সি. টি. মর্গ্যান্—ইনট্রডাক্‌শন্ টু সাইকলজি—পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
এন্. এল্. মান্—সাইকলজি—তৃতীয় পরিচ্ছেদ
এফ্. এন. ফ্রীম্যান্—মেণ্টাল্ টেষ্ট্‌স্—চতুর্থ, একাদশ পরিচ্ছেদ
এফ্. অ্যাভেলিং—সাইকলজি দি চেঞ্জিং আউট্‌লুক্—তৃতীয়, নবম পরিচ্ছেদ

Exercise

1. What does the term 'intelligence' commonly mean ? Distinguish it from intellect. (pp. 183-184)
2. "Intelligence is intellect put to use"—Woodworth Explain. (pp. 183-184)
3. Define intelligence. (pp. 184-186)
4. Distinguish between general intelligence ('g') and special intelligence ('s'). On what grounds is this distinction based ? (pp. 186-188)
5. Is intelligence one or many ? Discuss, in this context, the different theories of intelligence. (pp. 186-190)
6. What is meant by the measurement of intelligence ? Give a short history of the measurement of intelligence (pp. 190-196)
7. Distinguish between chronological and mental age. What is the I.Q. ? How is it calculated ? (pp. 192-194)
8. What are the different grades of intelligence according to I.Q. ? (pp. 194-196)
9. Show, by a diagram (curve), how intelligence is normally distributed among the public. (pp. 196-198)
10. Is the I.Q. constant ? If so, in what sense ? (pp. 198-199)
11. What is the course of development of intelligence ? (pp. 199-200)
12. Distinguish between horizontal and vertical intelligence. (pp. 200-201)
13. Write notes on : (a) Normal Distribution Curve, (b) Standardisation of tests, (c) Intelligence Quotient, (d) Mental age, (e) 'g' and 's'. (pp. 191, 192, 193-194, 192-193, 186-187)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধির অভীক্ষা

ইন্‌টেলিজেন্স্‌ টেস্ট্‌স্‌

১। বুদ্ধির অভীক্ষা—ইন্‌টেলিজেন্স টেস্ট্‌স

বিনে-সাইমন স্কেল্‌

আল্‌ফ্রেড্‌ বিনেই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন বুদ্ধির পরিমাপক বিজ্ঞানসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। তাঁহার পুর্বে চেহারা, মস্তিষ্কের গঠন, হাতের লেখা প্রভৃতি দেখিয়া বুদ্ধি-বিচারের যে সকল পদ্ধতি প্রচলিত ছিল সেইগুলি অবৈজ্ঞানিক এবং ভ্রান্ত। বিনে এবং তাঁহার সহকর্মী সাইমন্‌ প্যারি শহরের মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয়গুলির শিশুদের বুদ্ধির মান অথবা স্তরের ভিত্তিতে উহাদের শ্রেণী-বিভাগ করিতে প্রয়াসী হইলেন।

বিনে তাঁহার অভীক্ষা প্রথম তৈয়ারী করেন ১৯০০ সালে। ১৯০৫, ১৯০৮ এবং ১৯১১ সালে বিনে সাইমন-এর সহযোগিতায় তাঁহার অভীক্ষার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংস্কার সাধন করেন। ১৯১১ সালের সংস্কারে প্রত্যেক বয়ঃসীমার জন্য (শুধু চার বৎসরের জন্য ৪টি ছাড়া) পাঁচটি করিয়া অভীক্ষা নির্দিষ্ট হয়।

বিনে-সাইমন-উদ্ভাবিত অভীক্ষা কতগুলি প্রশ্ন বা সমস্যা লইয়া গঠিত। প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি বিবিধ এবং বিচিত্র, যাহাতে ইহার সাহায্যে বুদ্ধির নানা দিক পরীক্ষিত হইতে পারে। এই স্কেল বা মানক ৫৪টি অভীক্ষা লইয়া গঠিত। ইহাদের ভিত্তিতে বিনে বুদ্ধির বহুমুখী প্রকাশগুলি পরিমাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অভীক্ষাগুলিকে মান, মানক বা স্কেল্‌ বলা হয়। সাধারণ স্কেল্‌-এর সাহায্যে যেমন ইঞ্চি, সেন্টিমিটার প্রভৃতি ভেদে সরলরেখা প্রভৃতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, বিনে-সাইমন স্কেলের সাহায্যেও তেমনই তিন বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া পনেরো বৎসর পর্যন্ত মানস বয়স নির্ধারণ করা যায়। এই স্কেলে তিন বৎসর হইতে পনেরো বৎসর পর্যন্ত মানগুলি ক্রমিকভাবে সাজানো থাকে। আবার ইহাতে প্রত্যেকটি বর্ষ—এককের মধ্যবর্তী মাস—বিভাগও থাকে। প্রত্যেক বয়ঃসীমার এককগুলি পরীক্ষণীয় প্রশ্ন বা অভীক্ষাগুলির ক্রমিক কাঠিন্য বা দুরূহতা

অনুসারে সাজানো হয়। যেমন তিন বৎসর মানস বয়সের মান-নির্ণায়ক প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি চার বৎসরের অপেক্ষা সহজ, আবার দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় কঠিন।

এই স্কেল্ বা মানকের ভিত্তিতে বিনে মানস বয়স (মেণ্ট্যাল এজ্) বাহির করিয়াছেন। যে শিশু শুধু তিন বৎসর মানের প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি শতকরা পঞ্চাশটির অধিক সমাধান করিতে পারে তাহার মানস বয়স তিন, যদিও তাহার প্রকৃত বা ক্রমিক বয়স দুই, চার, পাঁচ বা আরও কম-বেশী হইতে পারে।

বুদ্ধির-অভীক্ষার ক্ষেত্র

বিনে-সাইমন স্কেলে বুদ্ধির সর্বাঙ্গীন পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়। যেমন শিশুকে কোনো বস্তু দেখাইয়া তাহার নাম বলিতে, কোনো ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাহা স্মরণ করিতে, সংখ্যা বা বস্তু গণনা করিতে, দুইটি বস্তুর তুলনা করিতে, বোধশক্তির এবং ভাণ্ডারের ব্যবহার করিতে, বিচার, সমস্যার সমাধান প্রভৃতি নানারূপ ক্রিয়ায় বুদ্ধির প্রয়োগ করিতে বলা হয়। এইরূপ সর্বাঙ্গীন পরীক্ষায় বুদ্ধির নানা দিক প্রকাশিত হয়।

কিন্তু বুদ্ধির বিভিন্ন প্রকাশই বিনে-এর নির্ণেয় হইলেও, কার্যতঃ তিনি তাহার অভীক্ষাগুলির বিষয় (আইটেম্) নির্বাচনে একাগ্রতা বা মনোযোগ, কল্পনাশক্তি, অবধারণ-শক্তি ও বিচার-শক্তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

বিনে-সাইমন স্কেল্ শুধু তাঁহাদের ব্যক্তিগত পরীক্ষা বা অভীক্ষাতে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গবেষকেরা বিনে-সাইমন্ উদ্ভাবিত অভীক্ষাগুলির পরীক্ষা করেন। ফলে উহাদের আংশিক পরিবর্তন ঘটে।

টার্ম্যান্ ও মেরিল্ সংস্করণ

গডার্ড, কুল্‌ম্যান্, মিউম্যান্, টার্ম্যান্-মেরিল্, বার্ট প্রভৃতি গবেষকগণের এবং বিশেষ করিয়া টার্ম্যান্ এবং মেরিল কৃত "স্ট্যান্‌ফোর্ড সংস্করণ"[১] প্রধান। টার্ম্যান্ ও মেরিল দেখিলেন যে বিনে স্কেল্-এর কতগুলি দোষ আছে। এই স্কেলে নিম্ন বয়ঃসীমার পরীক্ষাগুলি অত্যধিক সহজ এবং উচ্চ বয়ঃসীমার পরীক্ষাগুলি অত্যধিক কঠিন। ফলে এই স্কেল্-এর

১ এই পরিচ্ছেদের পরবর্তী অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

অভীক্ষাগুলি সামঞ্জস্যহীন। টার্ম্যান্ ও মেরিল্ এই দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিলেন এবং স্টার্ন-এর ইঙ্গিত অনুসারে বুদ্ধ্যঙ্ক (আই. কিউ) হিসাব করিবার উপায় উদ্ভাবন এবং বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ের ভিত্তিতে তাঁহারা নিম্নলিখিত বুদ্ধিস্তরগুলি নির্দেশ করিলেন।

বুদ্ধ্যঙ্ক	জনসংখ্যার শতকরা হিসাব	মানসস্তর
১৪০এর উপরে	১	প্রতিভা
১২০—১৪০	৫	অত্যুজ্জ্বল বুদ্ধি
১১০—১২০	১৪	উজ্জ্বল বুদ্ধি
৯০—১১০	৬০	স্বাভাবিক বা গড় বুদ্ধি
৮০—৯০	১৪	অল্পধী
৭০—৮০	৫	সীমারেখা—ক্ষীণবুদ্ধি
৭০এর নীচে	১	অল্পধী

বার্ট্-এর লণ্ডন সংস্করণ

বিনে-অভীক্ষার শ্রেষ্ঠ ও সাম্প্রতিক পুনর্মার্জন বা সংস্কার সাধন করিয়াছেন সিরিল্ বার্ট্ তাঁহার লণ্ডন সংস্করণে। সাইমন্-এর সহযোগিতায় বার্ট্ বিনে-সাইমন অভীক্ষাগুলিকে লণ্ডন শিশুদের উপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি টার্ম্যান্-মেরিল্-এর মত বিনে টেস্ট্গুলিকে প্রায় অপরিবর্তিত রাখিয়া ছাড়িয়া দেন নাই। মেধাবী বা উজ্জ্বলধী শিক্ষার্থীদের অভীক্ষায় তিনি ঐ টেস্টগুলির আমূল পরিবর্তন করিয়া উহাদের পরিবর্তে নূতন টেস্ট্ উদ্ভাবন করিয়াছেন।

কুলম্যান, যারকিজ্, ব্রিজেস্, হার্ডউইক প্রভৃতির সংস্কার—বিনে-সাইমন্ স্কেল্-এর সংশোধন

বিনে-সাইমন স্কেলের পুনর্মার্জনে কুলম্যান তিন বৎসরের ছোট শিশুদের বুদ্ধি-অভীক্ষা উদ্ভাবন করেন।

আবার যারকিজ্, ব্রিজেস্, হার্ডউইক্ প্রভৃতি অভীক্ষা-মনোবিদ্গণ বিনে-সাইমন্ স্কেল্-এর কয়েকটি দোষ সংশোধন করিয়া মূল্যবান গবেষণা

করেন। বিনে-পদ্ধতির একটি দোষ হইল এই যে উহাতে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলে কোনো পরীক্ষার্থী পূর্ণ সাফল্যাঙ্ক লাভ করে, আবার না পারিলে একেবারে শূন্য পায়। ইহাতে পরীক্ষণীয় বিষয়ের বা পরীক্ষার্থীর, কাহারও প্রতি সুবিচার করা হয় না। কারণ এই পরীক্ষায় এমন অংশ দেওয়া হইতে পারে যাহাতে পরীক্ষার্থীর দখল আছে অথবা নাই। একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন সাফল্যাঙ্ক থাকিলেই এই একদেশদর্শিতা দূর করা যাইতে পারে।

বিন্দুমান (পয়েণ্ট্ স্কেল্)

উপরোক্ত দোষ পরিহারের জন্য যারকিজ্, ব্রিজেস্, হার্ডউইক্ প্রভৃতি অভীক্ষা-মনোবিদ্‌গণ বিন্দু-মান (পয়েণ্ট-স্কেল্) উদ্ভাবন করেন। ইহাতে বিনে-সাইমন স্কেল্-এর অধিকাংশ অভীক্ষাগুলিই স্থান পাইয়াছে। কিন্তু বিনে-সাইমন্ স্কেল্ অনুসারে পূর্ণ বা শূন্য সাফল্যাঙ্ক দেওয়ার পরিবর্তে পয়েণ্ট বা বিন্দুমান দেওয়া হয়, ফলে অভীক্ষার্থী আংশিক সাফল্যাঙ্ক লাভ করিতে পারে।

উপরোক্ত পরিমার্জন বা সংস্করণ ছাড়াও বিনে-সাইমন্ স্কেল্-এর আরও পরিবর্তন হইয়াছে—যেমন হেরিং সংস্করণে।

২। বিনে-সাইমন স্কেল্—টার্ম্যান্-মেরিল সংস্করণ অথবা স্ট্যান্‌ফোর্ড সংস্করণ

টার্ম্যান্-মেরিল্ সংস্করণে দুই বৎসর হইতে পাচ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতি বৎসরের জন্য বারোটি করিয়া অভীক্ষা দেওয়া থাকে, যাহার ফলে প্রতিটি অভীক্ষার জন্য এক মাস করিয়া বয়স হিসাব করা হয়। আবার ছয় বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রতি বৎসরের হিসাব নির্ণয়ে ছয়টি করিয়া অভীক্ষা থাকে, যাহার ফলে প্রত্যেকটি অভীক্ষার জন্য দুই মাস করিয়া বয়স ধরা হয়।

বিনে-স্কেল্-এর সহিত টার্ম্যান্-মেরিল্ স্কেল্-এর পার্থক্য

টার্ম্যান্ বিনে-স্কেল্-এর প্রথম সংস্কার করেন ১৯১৬ সালে এবং মেরিল্-এর সহযোগিতায় বিনে-স্কেল্-এর পরিবর্ধিত সংস্করণ বাহির হয় ১৯৩৭ সালে। টার্ম্যান্-এর প্রথম সংস্করণে ৯০টি এবং সর্বশেষ সংস্করণে প্রশ্নসংখ্যা দাঁড়ায় ১২৯-টিতে। বিনে'র স্কেল্ আরম্ভ হইয়াছিল তিন বৎসর বয়স হইতে, আর টার্ম্যান্-মেরিল্-এর নূতন সংস্করণ আরম্ভ হইয়াছে দুই বৎসর বয়স হইতে।

বিনে'র মূল স্কেল্-এ প্রশ্নসংখ্যা ছিল ৫৪টি, আর টার্ম্যান্-মেরিল্-এর নবতম সংস্করণে প্রশ্নসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১২৯-টিতে।

বিনে-অভীক্ষার ১৯১১ সালের সংশোধিত রূপ:—

৩ বৎসর বয়স—

(১) নাক, মুখ, চোখ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম বলা।

(২) দুইটি সংখ্যা শুনিয়া আবার বলা।

(৩) একটি ছবিতে কি কি জিনিস আছে তাহা বলা।

(৪) পদবী বলা।

(৫) ছয়টি পদবিশিষ্ট একটি বাক্য শুনিয়া আবার বলা।

৪ বৎসর বয়স—

(১) নিজে ছেলে কি মেয়ে তাহা বলা।

(২) চাবি, ছুরি, পয়সা প্রভৃতি দেখিয়া বলা।

(৩) তিনটি সংখ্যা শুনিয়া আবার বলা।

(৪) দুইটি সরল রেখার দৈর্ঘ্যের তুলনা করা।

৫ বৎসর বয়স—

(১) দুইটি ওজন তুলনা করা।

(২) একটি চৌকোণা ক্ষেত্র দেখিয়া ঐরূপ চিত্র অঙ্কন করা।

(৩) দশটি পদবিশিষ্ট একটি বাক্য শুনিয়া তাহা বলা।

(৪) চারটি পয়সা গণনা করা।

(৫) একটি দ্বিখণ্ডিত চতুষ্কোণকে জুড়িয়া দেওয়া।

৬ বৎসর বয়স—

(১) সকাল সন্ধ্যার মধ্যে পার্থক্য বলা।

(২) কয়েকটি প্রচলিত জানা শব্দের অর্থ বলা।

(৩) একটি রুহিতনের আকার দেখিয়া তাহা অঙ্কন করা।

(৪) তেরোটি পয়সা গণনা করা।

(৫) কয়েকটি ছবির মধ্যে কোন্‌টি সুন্দর এবং কোন্‌টি কুৎসিত তাহা বলা।

৭ বৎসর বয়স—

(১) ডান হাত ও বাঁ কান দেখানো।

(২) একটি ছবির বিবরণ দেওয়া।

(৩) একই সঙ্গে প্রদত্ত তিনটি আদেশ প্রতিপালন করা।

(৪) ছয়টি মুদ্রার মধ্যে তিনটি ডবল মুদ্রা দিয়া মোট মূল্য গণনা করা

(৫) চারটি প্রধান রং-এর নাম বলা

৮ বৎসর বয়স—

(১) স্মৃতি হইতে দুইটি বস্তুর তুলনা

(২) ২০ হইতে ০ পর্যন্ত গণনা

(৩) ছবির মধ্যে বাদ-পড়া অংশগুলি লক্ষ্য করা

(৪) বার ও তারিখ বলা

(৫) পাঁচটি সংখ্যার পুনরুক্তি করা

৯ বৎসর বয়স—

(১) মুদ্রার খুচ্‌রা হিসাব করা

(২) শব্দের অর্থ বলা

(৩) প্রচলিত মুদ্রার সব কয়টিকে চেনা

(৪) পর্যায়ক্রমে মাসের নাম বলা

(৫) সহজ প্রশ্নের ভাবার্থ বুঝিয়া উত্তর দেওয়া

১০ বৎসর বয়স—

(১) ওজন অনুসারে পাঁচটি ব্লক্ বা কাঠের টুক্‌রা সাজানো

(২) দুইটি ছবি দেখিয়া স্মৃতি হইতে অঙ্কন করা

(৩) অসম্ভব কথাগুলির অবাস্তবতা দেখানো

(৪) কঠিন প্রশ্নের ভাবার্থ বুঝিয়া উত্তর দেওয়া

(৫) তিনটি দেওয়া শব্দের প্রয়োগ দেখাইয়া বাক্য রচনা করা

১১ বৎসর বয়স—

(১) কতগুলি উক্তির অসম্ভাব্যতা বাহির করা

(২) তিনটি প্রদত্ত শব্দের সাহায্যে একটি বাক্য রচনা করা

(৩) তিন মিনিটে ষাট্‌টি শব্দ বলা

(৪) তিনটি সূক্ষ্ম বা বিমূর্ত শব্দের ভাবার্থ বলা

(৫) কয়েকটি এলোমেলোভাবে সাজানো পদের সাহায্যে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈয়ারী করা

১৫ বৎসর বয়স—

(১) সাতটি সংখ্যার পুনরুক্তি করা

(২) একটি শব্দের সহিত মিল রাখিয়া এক মিনিটে তিনটি শব্দ বলা

(৩) ছাব্বিশটি অংশযুক্ত একটি বাক্যের পুনরুক্তি করা

(৪) ছবি দেখিয়া তাহার অর্থ বলা

(৫) ভাবার্থ বলা

বয়স্কদের জন্য—

(১) কাগজ কাটার কয়েকটি সমস্যা সমাধান করা

(২) একটি ত্রিভুজকে কল্পনায় পুনর্গঠন করা

(৩) কতগুলি বিমূর্ত বা সূক্ষ্ম শব্দের পার্থক্য নিরূপণ করা

(৪) প্রেসিডেন্ট্ ও রাজার মধ্যে তিনভাবে পার্থক্য নিরূপণ করা

(৫) একটি পড়িয়া-শোনানো গদ্যাংশের সংক্ষিপ্তসার বলা

১৯১১ সালের বিনে-স্কেল্ সংস্করণের ক্রটি

উপরে বিনে-সাইমন্-স্কেল্-এর সংস্করণটি আসলে ১৯১১ সাল-এর নয় কিন্তু ইহা ১৯০৮ এবং ১৯১১ সাল সংস্করণের মিশ্রণ। এই স্কেল্-এর একটি সমস্যা এই যে ইহাতে বারো বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত তিনটি বয়ঃসীমার অভীক্ষা নাই। এই অস্পষ্টতার ব্যাখ্যা এইরূপ। ১৯০৮ সংস্করণের এগার বৎসর বয়স-নির্ধারিত অভীক্ষাটি ১৯১১ সালের সংস্করণে বারো বৎসরে এবং বারো বৎসরেরটি পনেরো বৎসরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। আবার ১৯০৮ সালের সংস্করণে যে অভীক্ষাটি তেরো বৎসরের মানক হিসাবে নির্ধারিত ছিল সেইটিই ১৯১১ সালের সংস্করণে বয়স্কদের জন্য অভীক্ষায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। অথচ এই স্থানান্তর করিয়া যে বৎসরগুলির অভীক্ষা থাকিল না সেই শূন্যস্থানগুলি আর পূরণ করা হয় নাই। ফলে, ১৯১১ সালের বিনে-সাইমন্-স্কেল্-এর চূড়ান্ত সংস্করণে এগারো, তেরো এবং চৌদ্দ বৎসরের মানক কোন অভীক্ষা নাই।[১]

সুতরাং ১৯১১ সালের চূড়ান্ত সংস্করণকে ১৯০৮ সালের দ্বিতীয় সংস্করণ অপেক্ষা উন্নত বলা যায় কিনা সন্দেহ।

৩। কৃতি অভীক্ষা—পারফর্ম্যান্স্ টেস্ট্

উল্লিখিত বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি ভাষা-ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। সুতরাং নিরক্ষর, মূকবধির বা বিদেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধি নির্ণয়ে এই

১ এফ্. এন্. ফ্রীম্যান্—মেণ্টাল টেষ্টস্—পৃঃ ৯০—৯২

অভীক্ষাগুলি অকেজো হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা ভাষার সাহায্য না লইয়া স্থুল বস্তুর নাড়া-চাড়া (ম্যানিপুলেশন্) সাহায্যে নিজ নিজ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে। এইরূপে কৃতি-অভীক্ষা প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

স্থুল বস্তু নাড়াচাড়ার সাহায্যে বুদ্ধির অভীক্ষাকে কৃতি অভীক্ষা (পারফর্ম্যান্স্ টেস্ট্) বলে। আকৃতি-পট্ট (ফর্মবোর্ড), ছবি সম্পূরণ (পিক্চার কম্প্লিশন্), ধাঁধাঁ পথ অনুসন্ধান (মেজ্ এক্সপ্লোরেশন) প্রভৃতি অভীক্ষা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

যেমন আকৃতি-পট্ট অভীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, গোল প্রভৃতি নানা আকৃতির কাষ্ঠখণ্ড (ব্লক্) দেওয়া হয়। এইসকল আকৃতি-পট্টের নানা আকৃতিতে কাটা স্থানগুলি শূন্য থাকে। নানা আকারের কাষ্ঠখণ্ড ছড়াইয়া রাখা হয়। কৃতি-অভীক্ষার্থীকে আকৃতি-পট্টের ঐ ঐ আকারীয় শূন্যস্থানগুলি যথাযোগ্য কাষ্ঠখণ্ড দিয়া নির্দিষ্ট সময়ে পূরণ করিতে বলা হয়। আবার ছবি-সম্পূরণ অভীক্ষায় কোনো বস্তুর ছবিতে—যেমন একটি চেয়ারের ছবিতে --কতগুলি অংশ অসম্পূর্ণ রাখিয়া সেইগুলি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ করিয়া দিতে বলা হয়।

শ্রেণী পরীক্ষা—গ্রুপ্ টেস্ট্স্

আবার উপরোক্ত অভীক্ষাগুলির দোষ এই যে উহারা ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ, কারণ এইগুলি এককালে একাধিক ব্যক্তিতে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে অভীক্ষণীয় ব্যক্তির সংখ্যা অনেক অথবা অভীক্ষার সময় অল্প, সেইক্ষেত্রে এক কালে অনেক ব্যক্তির অভীক্ষা আবশ্যক হয়।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রেণীগত অভীক্ষা (গ্রুপ্ টেস্ট্) উদ্ভাবিত হইয়াছে। যেমন আমেরিকান্ সেনা-মনোবিদ্গণের আর্মি অ্যাল্ফা টেস্ট এবং আর্মি বিটা টেস্টগুলি।

কিন্তু শ্রেণী অভীক্ষাগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অল্প সময়ে শ্রেণীগত অভীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্যক্তির বুদ্ধি যথাযোগ্যভাবে পরীক্ষিত হইতে পারে না। এইগুলিকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে ব্যক্তি-অভীক্ষার প্রয়োগ করিতে হয়।

মেজাজ ও চরিত্র অভীক্ষা—টেম্পারামেণ্ট্ অ্যাণ্ড্ ক্যারেক্টর টেস্ট্স্

আবার মেজাজ এবং চরিত্র অভীক্ষাগুলিও বুদ্ধি-অভীক্ষার পরিপুরক। ইহাদের সাহায্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব (পারসন্যালিটি), মেজাজ, চরিত্র, শারীরিক

গুণ—যেমন চেহারা, পরিচ্ছন্নতা, কণ্ঠস্বর, বেশভূষা, আচরণ, নেতৃত্বপ্রবণতা প্রভৃতি—নিরূপণ করা হয়।

বৃত্তি পরিচালনা এবং নির্বাচন—ভোকেশন্যাল গাইড্যান্স্ অ্যাণ্ড্ ভোকেশন্যাল সিলেক্‌শন্

চতুর্থতঃ বৃত্তি বা পেশামূলক পরিচালনা (ভোকেশন্যাল্ গাইড্যান্স্) এবং বৃত্তি বা পেশা নির্বাচন (ভোকেশন্যাল্ সিলেক্‌শ্‌ন্) সম্বন্ধে অভীক্ষা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

প্রথমটিতে অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ বা প্রয়োগ প্রণালী অনুসৃত হইয়া থাকে। কোশ্চেনেয়ার বা প্রশ্নাবলী-পদ্ধতির সাহায্যে অনুসন্ধান করা হয় কোন্ ব্যক্তি কোন্ বৃত্তি বা পেশার উপযুক্ত এবং বৃত্তিপ্রার্থীর কি কি অসুবিধা হইতে পারে। ব্যক্তির বৃত্তি-নির্বাচনকালে তাহাকে হাতে কলমে পরীক্ষা করিতে হয়।

ক্ল্যাপারিড্ দুই প্রকার বৃত্তি-নির্বাচন অভীক্ষার কথা বলিয়াছেন—যথা মানস অভীক্ষা যাহাতে বুদ্ধি, মেজাজ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির অভীক্ষাগুলি অন্তর্ভুক্ত —এবং কাজ-সংক্রান্ত অভীক্ষা। দ্বিতীয়টি চার প্রকার, যেমন নমুনামূলক, সাদৃশ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক, এবং অভিজ্ঞতামূলক। নমুনামূলক অভীক্ষায় বৃত্তিপ্রার্থীকে তাহার করণীয় কাজের নমুনা দিয়া তাহা করিতে বলা হয়। সাদৃশ্যমূলক অভীক্ষায় তাহাকে করণীয় কাজের অনুরূপ কোনো কাজ করিতে দেওয়া হয়। আবার বিশ্লেষণমূলক অভীক্ষায় কাজের অংশগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেওয়া হয় এবং কর্মপ্রার্থীকে প্রত্যেক অংশের উপর অভীক্ষা দিতে হয়। অভিজ্ঞতামূলক অভীক্ষায় এলোমেলোভাবে কতগুলি অভীক্ষা দেওয়া হয়। এবং সেইগুলিই গ্রহণ করা হয় যেগুলির সহিত কাজের সম্বন্ধ থাকে।

৪। বুদ্ধি ও আচরণ—ইন্‌টেলিজেন্স্ অ্যাণ্ড্ কন্‌ডাক্ট

বুদ্ধির সঙ্গে আচরণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। প্রত্যেক আচরণেই বুদ্ধির কিছু না কিছু পরিচয় পাওয়া যায় আবার বুদ্ধিমাত্রই আচরণের মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশ করে।

বুদ্ধি ও আচরণের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ বলিয়াই বুদ্ধির অভীক্ষা ব্যক্তিত্ব, মেজাজ এবং চরিত্রের অভীক্ষার সম্পূরক, আবার দ্বিতীয়টি প্রথমটির সম্পূরক। ইহার একটি অপরটি ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

জড়ধী, মন্দধী এবং ক্ষীণধী

ব্যক্তির আচরণ কিরূপ তাহা তাহার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। **জড়ধী** ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক যেমন অত্যন্ত অল্প তাহার আচরণও তেমন অত্যন্ত নিম্ন স্তরের। জীবনধারণের পক্ষে যে সকল আচরণ দরকার তাহাও এই ব্যক্তি করিতে পারে না। তাহার আহার, স্নান, বেশভূষা, চলাফেরা প্রভৃতি প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজে অপরের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন। তাহার আচরণ একটি গাধার তুল্য। সেই কারণেই নির্বোধ লোককে গাধা বলিয়া তিরস্কার করা হয়। **মন্দধী** বা নির্বোধ এবং **ক্ষীণধী** ব্যক্তির আচরণ জড়ধী ব্যক্তির আচরণ অপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ের, কারণ উহাদের বুদ্ধ্যঙ্কও অপেক্ষাকৃত উচ্চ। ইহারা জীবনের গতানুগতিক কাজগুলি মোটামুটিভাবে করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু কোনো জটিল বা নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে পারে না।

অল্পধী এবং স্বাভাবিক ধী

বুদ্ধ্যঙ্কের স্তরে আর একধাপ উঠিলে, অর্থাৎ **অল্পধী** ব্যক্তিদের আচরণ পর্যালোচনা করিলেও বুদ্ধ্যঙ্ক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আচরণের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আবার সাধারণ অথবা **স্বাভাবিক**-বুদ্ধি ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক যেমন আরও উচ্চ স্তরের, আচরণও তেমনই আরও উচ্চ স্তরের। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় চেতনা আরও স্পষ্ট আকার লাভ করে; সুতরাং ইহাদের আচরণে এই সকল ন্যায়-নীতি এবং আদর্শ-নিষ্ঠা বেশী প্রতিফলিত হয়। ইহারা শিক্ষার ফলে অর্জিত মার্জিত ও শিষ্ট রুচি লাভ করে এবং প্রচলিত নৈতিক আচরণের ধারক ও বাহক হইয়া দাঁড়ায়। ইহারা স্বাধীনভাবে কোনো জীবনাদর্শকে আচরণে ফুটাইয়া তুলিতে পারে।

উজ্জ্বলধী, প্রতিভাবান এবং উচ্চবুদ্ধি ব্যক্তি

তীক্ষ্ণ অথবা **উজ্জ্বলবুদ্ধি** ব্যক্তিরা যেমন বুদ্ধ্যঙ্কে উন্নত তেমনই তাহাদের আচরণও অপেক্ষাকৃত উন্নত। ইহারা নূতন পরিস্থিতির সহিত উন্নততর

সামঞ্জস্য করিতে পারে। ইহাদের আচরণ অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন এবং সজাগ। **আবার প্রতিভাবান** বা অত্যুজ্জ্বলধী ব্যক্তিরা বুদ্ধ্যঙ্কের এবং আচরণের দিক দিয়া উজ্জ্বলধী ব্যক্তির তুলনায় উন্নত। ইহাদের মধ্যে সামাজিক গুণগুলির বিকাশও বেশী। চরিত্রের দিক দিয়াও ইহাদের শ্রেষ্ঠতা অনস্বীকার্য। ইহাদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, নৈতিক দৃঢ়তা অধিকতর পরিস্ফুট। তীক্ষ্ণধী এবং প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সঙ্কল্প বা স্বাধীন ইচ্ছাও দৃঢ়তর। ন্যায়ান্যায় বোধ, আদর্শ-নিষ্ঠা এবং চরিত্রবলও ইহাদের বেশী। কিন্তু সামাজিক বা চিরাচরিত ন্যায়নীতির সহিত এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের প্রায়ই বিরোধ ঘটে। ইহারা প্রায়ই সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া চলে, কাজেই গতানুগতিক ন্যায়নীতি মানিয়া চলিতে পারে না।

উচ্চবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের আচরণ ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইলে প্রায়ই নীতিবিরোধী হইয়া ওঠে। এই কারণে ইহারা অনেক সময় সমাজের পক্ষে বিপৎসঙ্কুল হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদের দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকার হইতে পারে, কারণ ইহাদের বুদ্ধি সৃজনমূলক। আবার ভ্রান্তপথে চালিত হইলে ইহাদের দ্বারা সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে।

৫। দুষ্ক্রিয়তা—ডেলিংকোয়েন্সী

দুষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে সিরিল্ বার্ট্, হিলি, ব্রোনার, গ্লুসন প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণের গবেষণা বিশেষ মূল্যবান্।

দুষ্ক্রিয়তা বা ডেলিংকোয়েন্সী কথাটি সাধারণতঃ শিশু ও কিশোরদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণপ্রবণতা বুঝায়, যেমন ঘরপালানো, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা প্রভৃতি। ঘরপালানো শিশুর মন ঘরে টিকে না, কাজেই সুযোগ পাইলেই সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কোনো কোনো শিশু বা কিশোর কোনো প্রকারেই সত্য কথা বলে না এবং মিথ্যা কথা বলা তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। আবার কোনো কোনো শিশুর চুরি করিবার জন্য হাত নিস্‌পিস্ করে। এই জাতীয় স্বভাবের জন্য ইহারা পরিবার ও সমাজের আপদস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

অপরাধ (ক্রাইম্) এবং দুষ্ক্রিয়তা

দুষ্ক্রিয়তা সমাজজীবনের একটি উদ্বেগজনক ঘটনা। প্রত্যেক সমাজেই এক শ্রেণীর লোক থাকে যাহারা উন্মার্গগামী। তাহারা সমাজজীবনের স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা নষ্ট করে এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার পথে বাধা বা কণ্টক-

স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। অথচ তাহাদের দুষ্ক্রিয়তা আইনভঙ্গের এমন স্তরে পৌছায় না যাহাকে আইনের চোখে অপরাধ বা ক্রাইম বলা চলে। সুতরাং এই দুষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই।

বুদ্ধি ও দুষ্ক্রিয়তা

বুদ্ধি-অভীক্ষায় দেখা যায় যে দুষ্ক্রিয় শিশু বা কিশোররা প্রায়ই ক্ষীণবুদ্ধি-সম্পন্ন (ফীব্‌ল্‌-মাইণ্ডেড্) হইয়া থাকে। তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের মূল কারণ তাহাদের বুদ্ধির অভাব। স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের তুলনায় ক্ষীণবুদ্ধিদের মধ্যে দুষ্ক্রিয়তা বেশী দেখা যায়। যে স্থলে স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে শতকরা মাত্র একজন দুষ্কৃতিকারী, সেই স্থলে ক্ষীণবুদ্ধিদের মধ্যে শতকরা ১৫ হইতে ৩০ জনই দুষ্কৃতিকারী। ইহারা দুষ্ক্রিয়তার ফলাফল বুঝিতে পারে না এবং অন্যায় করিতে প্রলুব্ধ হয়। ক্ষীণ মানসিকতা (ফীবল্‌-মাইণ্ডেড্‌নেস্) এবং মানস অস্বাভাবিকতা দুষ্কৃতিকারীদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। হিলি এবং ব্রোনার মনে করেন যে ইহাদের শতকরা ১৩·৫ অংশ ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন। বার্ট্-এর মতে এই সংখ্যা মাত্র শতকরা ৮ জন। ম্যাথুজ্ এবং বার্ট্ মনে করেন যে দুষ্কৃতি-কারীদের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্য দেখা যায়। মাতীর্ মনে করেন যে ইহাদের অধিকাংশই মানসরোগগ্রস্ত।

দুষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে বার্ট্, ব্রোনার, গ্লসন প্রভৃতির প্রধান বক্তব্য মূলতঃ এক। ইঁহাদের সকলের মতেই বালিকার তুলনায় অধিকসংখ্যক বালক নানা রকমের চুরি করিয়া থাকে। আবার ঘরপালানো, ভবঘুরেমী, সম্পত্তির ক্ষতিসাধন-প্রবণতা প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়তাও বালিকাদের তুলনায় বালকদিগের মধ্যে বেশী। অপর পক্ষে, যৌন অপরাধ ঘটে বালিকাদের ক্ষেত্রেই বেশী। আবার মিথ্যা কথা বলা এবং চরিত্রের অসংশোধনীয়তাও বালকদের তুলনায় বালিকাদের মধ্যেই অধিক। অর্থাৎ বালক এবং বালিকাভেদে দুষ্ক্রিয়তার প্রকারভেদ হয় মাত্র। এইরূপ বলা চলে না যে বালিকাদের তুলনায় বালকেরাই বেশী অথবা বালকদের তুলনায় বালিকারাই বেশী দুষ্কৃতিকারী।

দুষ্ক্রিয়তার কারণ—ঘরের অবস্থা

অধিকাংশ দুষ্কৃতিকারীর ঘরের অবস্থা খারাপ। হয়ত তাহাদের সংসার ভাঙ্গা, বাপ অথবা মা অথবা উভয়েই জীবিত নাই, হয়ত বা বাপমা বিচ্ছিন্ন

জীবন যাপন করেন অথবা মা সারাদিন বাহিরে কাজ করিয়া বেড়ান। উহাদিগের গৃহশিক্ষা নাই বলিলেই চলে। বেশীর ভাগ দুষ্কৃতিকারীই দরিদ্র বা অসৎসঙ্গে লিপ্ত। আবার যে সকল দুষ্কৃতিকারী ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন তাহাদের তিরস্কার, শাসন বা দণ্ডিত করিয়াও বিশেষ ফল হয় না। তাহারা সংযম শিক্ষা করিতে বা দুষ্কার্যের ফল বুঝিতে পারে না। ফলে উহাদের মধ্যে নৈতিক বা ন্যায়-অন্যায় বোধ বিকাশ লাভ করে না।

দুষ্ক্রিয়তার প্রতি মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী

মনোবিদ্যায় দুষ্কৃতিকারীকে অপরাধী (ক্রিমিন্যাল্) মনে না করিয়া মানস দিক দিয়া অসুস্থ বা রোগী বলিয়া মনে করা হয়। মনোবিদ্যার মতে দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তি শাস্তির নয়, কিন্তু চিকিৎসার যোগ্য। অপরাধপ্রবণতার কারণ কি তাহা অনুসন্ধান করিয়া উহার দূরীকরণই মনোবিদ্যার কাম্য।

দুষ্ক্রিয়তার প্রতিকার

দুষ্কৃতিকারিতার প্রতিকারে উহাকে নির্মমভাবে দমন না করিয়া ভুল পথ হইতে ঠিক পথে পরিচালিত করাই মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য। এই কার্যে পিতামাতা বা অভিভাবকের মনোযোগ একান্ত আবশ্যক।

সকল দুষ্কৃতিকারীর জন্য একই শিক্ষা বা সংস্কারপ্রণালীর ব্যবস্থা করা যায় না। ইহাদের অবস্থা অনুসারে পরিবর্তনীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন। দুষ্কৃতি-কারিতার কারণ এত জটিল এবং ব্যক্তিভেদে উহার প্রকাশ এত বিচিত্র যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের কারণ এবং প্রতিকার এক প্রকার হইতে পারে না। দুষ্কৃতি-কারীকে নূতনভাবে এবং ঠিকপথে পরিচালিত করিবার ব্যাপারে বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

দশ বৎসর বয়সের পুর্বেই দুষ্কৃতিকারিতার প্রতিকার এবং নূতনভাবে পরিচালনার উপযুক্ত সময়।

৬। বুদ্ধি এবং বৃত্তি বা পেশা—ইন্‌টেলিজেন্স অ্যাণ্ড্ অকুপেশন্

ব্যক্তির বুদ্ধির সহিত তাহার বৃত্তি বা পেশার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে পেশায় যোগ্যতার তারতম্য ঘটে। **জড়ধী** (ইডিয়ট্)

কোনো পেশারই উপযুক্ত নয়। **ক্ষীণবুদ্ধি** ব্যক্তিরা শুধু যান্ত্রিক (মেকানিক্যাল) বা গতানুগতিক পেশার উপযুক্ত। এই সকল পেশায় শুধু নিয়মমাফিক কাজ করিয়া যাইতে হয়। আবার যাহাদের বুদ্ধি **স্বাভাবিক**, যাহাতে সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োজন এমন পেশাই তাহাদের উপযোগী। যেমন কেরাণী অথবা সাধারণ শিক্ষক বা ব্যবসায়ীর কাজই উহাদের উপযুক্ত পেশা। ইহারা নূতন উদ্ভাবন করিতে পারে না, কিন্তু সাধারণভাবে দৈনন্দিন কাজ চালাইয়া যায় মাত্র।

উজ্জ্বলধী এবং **প্রতিভাবান** ব্যক্তিগণ নূতন উদ্ভাবন বা সৃষ্টিতে সক্ষম। তাহারা সেই সকল পেশার উপযুক্ত যাহাতে উদ্ভাবন বা সৃজনমূলক বুদ্ধির প্রয়োজন। যে সকল পেশায় বুদ্ধি কম লাগে ইহারা তাহাতে উৎসাহ পায় না, অথবা অতি সহজে এবং তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়া বাকী সময় নষ্ট করে। ফলে, তাহাদের বুদ্ধির যথাযোগ্য ব্যবহার সম্ভব হয় না।

সাফল্যাঙ্কের সহিত পেশার সম্বন্ধ

আমেরিকান আর্মি অ্যাল্‌ফা অভীক্ষায় বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তির সহিত নিম্নলিখিত সাফল্যাঙ্কের তারতম্য পাওয়া গিয়াছে।[১]

বৃত্তি	অভীক্ষিত লোকের সংখ্যা	সাফল্যাঙ্ক
কৃষক	৬৮৮৬	৪৮.৩
সাধারণ কারিগর	১২৫১	৬২.৮
রেলরাস্তার কেরাণী	৩০৮	৯১.৪
পুস্তক-রক্ষক বা বুক-কীপার	৪৫৮	১০০.৯
হিসাব রক্ষক বা অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট	২০২	১১৭.৯
স্টেনোগ্রাফার বা টাইপিস্ট	৪০২	১১৫.০
যান্ত্রিক ইঞ্জিনীয়ার	৪৫	১০৯.৭
সিভিল ইঞ্জিনীয়ার	৫৩	১১৬.৮

১ এফ্. এন্. ফ্রীম্যান্—মেণ্ট্যাল টেষ্ট্‌স্—পৃঃ ৪০৫

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ তালিকা হইতে মনে হয় যে হিসাবরক্ষক বা অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট্, সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, স্টেনোগ্রাফার প্রভৃতি পেশাজীবী ব্যক্তিরাই বেশী বুদ্ধিমান, আবার কৃষক, সাধারণ কারিগর, কেরাণী প্রভৃতি পেশাজীবীরা কম বুদ্ধিমান।

বিভিন্ন পেশাজীবী পিতামাতার সন্তানদের বুদ্ধি

বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশাজীবী পিতামাতার ৫৪৮টি শিশুর অভীক্ষা করিয়া প্রেসে এবং র‍্যাল্স্টন্ নিম্নরূপ সাফল্যাঙ্ক[১] পাইয়াছেন।

পিতার পেশা	শিশুর সাফল্যাঙ্ক
ব্যবসায়	৮৫
শাসনকার্য পরিচালনা	৬৮
কারিগর	৪১
শ্রমিক	৩৯

এই হিসাব অনুসারে ব্যবসায়ীদের সন্তানেরা বেশী বুদ্ধিমান এবং শ্রমিকের সন্তানগণ কম বুদ্ধিমান।

প্রতিভাবান শিশুদের পিতা কিরূপ হারে প্রতিভাবান এবং পিতার পেশা কি তাহা অনুসন্ধান করিয়া টার্ম্যান মূল্যবান তথ্য পাইয়াছেন। তিনি লস্ এ্যাঞ্জেল্স ও সান্ ফ্রান্সিস্কো নিবাসী ১৪০ বা তদূর্ধ্ব বুদ্ধ্যাঙ্ক-সম্পন্ন শিশুদের ৫৬০ জন পিতার পেশা এবং প্রতিভা নিম্নলিখিত হারে[২] শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন।

বাইর্নস্ এবং হেন্মন্ বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের সন্তানদিগের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা উইস্কন্সিন রাষ্ট্রের উচ্চ বিদ্যালয়গুলির এক লক্ষেরও অধিক উচ্চ শ্রেণীয় ছাত্রের সাফল্যাঙ্ক লিপিবদ্ধ করিয়া বিভিন্ন পেশাজীবী পিতার সন্তানদের মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা পাইয়াছেন।

১ এফ্. এন্. ফ্রীম্যান্—মেন্ট্যাল টেষ্ট্স্—পৃঃ ৪০৫
২ এফ্. এন্. ফ্রীম্যান্—মেন্ট্যাল টেষ্ট্স্—পৃঃ ৪০৬

পেশার শ্রেণীভেদ	প্রতিভাবান শিশুর পিতার শতকরা কতজন ঐ পেশাজীবী	জনসংখ্যার শতকরা কতজন ঐ পেশাজীবী	প্রতিভাবান পিতাদের প্রতিভাবান সন্তানের শতকরা হার
ব্যবসায়ী শ্রেণী	২৯'১	২'৯	১০০৩'
চাকুরীজীবি শ্রেণী	৪'৫	৩'৩	১৩৭
বাণিজ্যিক শ্রেণী	৪৬'২	৩৬'১	১২৮
শিল্পী শ্রেণী	২০'২	৫৭'৭	৩৫

মোটের উপর বলা যায় যে কোনো কোনো পেশাজীবীর বুদ্ধ্যঙ্ক অন্যান্য পেশাজীবীর তুলনায় উচ্চ এবং বিভিন্ন পেশাজীবীর সন্তানগণ বুদ্ধিবৃত্তিতে তাহাদের পিতাদের মত বিভিন্ন। ইহার একটি কারণ হইতে পারে এই যে উচ্চতর কাজে সাধারণতঃ উচ্চবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং নিম্নতর কাজে নিম্নবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ পেশানির্বাচন বুদ্ধির কারণ না হইয়া বুদ্ধিই পেশানির্বাচনের কারণ হইতে পারে।

টার্ম্যান ও মেরিল আমেরিকান জনসাধারণের বুদ্ধি অভীক্ষা করিয়া পিতার জীবিকা অনুযায়ী শিশুদের গড় বুদ্ধির হার এইরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন।

বুদ্ধি ও পেশার সম্বন্ধ

নিম্নের গবেষণা ফলগুলি হইতে বুদ্ধি ও পেশার সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। স্বাধীন ব্যবসায়ী পিতাদের সন্তানগণ সাধারণতঃ সর্বোচ্চ বুদ্ধ্যঙ্কের অধিকারী হয় এবং সর্বনিম্ন বুদ্ধ্যঙ্ক হয় কৃষক, শ্রমিক, মজুর প্রভৃতির সন্তানদের। স্বাধীন ব্যবসায়ীর মত প্রকৃত শিক্ষক, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির সন্তানদের বুদ্ধ্যঙ্কও উচ্চ পর্যায়ের হইয়া থাকে।

ফলে জীবিকা বা পেশা নির্বাচনে বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করিতে হয়। যাহার বুদ্ধি যে পেশার উপযোগী তাহাকে সেই পেশার জন্য নির্বাচন করা উচিত; নতুবা বুদ্ধি সামর্থ্যের অযথা অপব্যয় অনিবার্য। প্রখর বুদ্ধিমান

ব্যক্তিকে দিনমজুরের কাজ অথবা সাধারণ-বুদ্ধি দিনমজুরকে কোনো কারখানা পরিচালনার কাজ দেওয়া উচিত নয়।

পিতার জীবিকা	শিশুর গড় বুদ্ধির হার
স্বাধীন ব্যবসায়ী	১১৬
অর্ধস্বাধীন ব্যবসায়ী ও পরিচালক	১১১
কেরাণী, নিপুণ কারিগর, খুচরাব্যবসায়ী	১০৭
গ্রাম্য সম্পন্ন গৃহস্থ, কৃষক ইত্যাদি	৯৫
অর্ধশিক্ষিত কারিগর, ছোটো অফিসের কেরাণী, ছোট দোকানদার ইত্যাদি	১০৪
সামান্য শিক্ষিত শ্রমিক	৯৯
সহর ও গ্রামের দিন মজুর	৯৬

পেশাপ্রার্থীর বুদ্ধি অভীক্ষা সাহায্যে নির্ণয় করিয়া দেখা উচিত। তাহা হইলেই সে কোন্ পেশার উপযুক্ত তাহা স্থির করা সহজ হয়।

৭। প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধি-অভীক্ষা

১৬ বৎসরই সর্বোচ্চ মানস বয়স

প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধি কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে ইহা একটি গুরুত্বপুর্ণ সমস্যা। প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ে মনে রাখিতে হইবে যে বুদ্ধিঅভীক্ষকগণ ১৬ বৎসরের পর প্রকৃত বুদ্ধির উন্নতিতে সাধারণতঃ বিশ্বাস করেন না। অর্থাৎ ব্যক্তির প্রকৃত বয়স ১৭ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া যত বেশীই হউক না কেন, ঐ ক্রমিক বয়সকে ১৬ বৎসর বলিয়াই ধরিতে হইবে। ব্যক্তির মানস বয়সও অনির্দিষ্টভাবে বাড়ে না বা কমে না। বুদ্ধিঅভীক্ষকেরা মনে করেন যে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তিদের মানস বয়স ১৬, অস্বভাবীদের ৩ হইতে আরম্ভ করিয়া ১১ এবং প্রতিভাবানদিগের ২০ হইতে ৩২ পর্যন্ত হইতে পারে।

কোনো স্বাভাবিকবুদ্ধি ব্যক্তির ক্রমিক বা প্রকৃত বয়স (ক্রনোলজিক্যাল এজ্) ৩৬ হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে তাহার প্রকৃত এবং মানস এই

উভয় বয়সই ১৬, সুতরাং তাহার বুদ্ধ্যঙ্ক (আই. কিউ) হইবে ১৬/১৬×১০০ =১০০।

কোনো জড়বুদ্ধি (ইডিয়ট্) ব্যক্তির প্রকৃত বয়স ৩৬ হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে উহা ১৬ এবং তাহার মানস বয়স হয়ত ৩, সুতরাং তাহার বুদ্ধ্যঙ্ক ৩/১৬×১০০=২০।

আবার কোনো অতি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রকৃত বয়স ৩৬ হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে উহা ১৬ এবং তাহার মানস বয়স হয়ত ২৪, সুতরাং তাহার বুদ্ধ্যঙ্ক হইবে ২৪/১৬×১০০=১৫০।

উপসংহার

প্রশ্ন হইতে পারে যে ১৬ বৎসর বয়স্ক কিশোরের এবং পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির মানস বয়স কিরূপে একই থাকিয়া যায়। ইহাদের উভয়েরই মানস বয়স ১৬ বলিয়া ধরিলে ১৬ বৎসর বয়স্ক কিশোরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয় না কি? প্রকৃতই কি ১৬ বৎসরের পর মানস বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির মানস বয়স ১৬ বৎসর বয়স্ক কিশোরের তুলনায় এক থাকিলেও বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায় এইরূপ কোনো ইঙ্গিত করা হইতেছে না। বুদ্ধিবিকাশ দুই দিকে হইতে পারে। প্রথমটি হইল বুদ্ধির উচ্চতা বা গভীরতার বিকাশ এবং দ্বিতীয়টি উহার বিস্তার বা প্রসারের বিকাশ। অর্থাৎ প্রথমটি হইল আসল বুদ্ধিক্রিয়ার, যেমন বিচারশক্তি ধারণা, মেধা প্রভৃতির বিকাশ এবং দ্বিতীয়টি হইল বুদ্ধি যে সকল বিষয়ে খাটানো হয় তাহার সংখ্যা বা পরিমাণের বিকাশ বা বৃদ্ধি। প্রথমটি সাধারণতঃ ১৬ বৎসর বয়সেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করে এবং পরবর্তী জীবনে বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। দ্বিতীয়টি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বাড়িতে থাকে। এই বিষয়টি এই গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদের দশম অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

উড্‌ওয়ার্থ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস্—সাইকলজি—চতুর্থ পরিচ্ছেদ
মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেণ্ট্‌স্ অব্ সাইকলজি—চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
বোরিং, ল্যাংফেল্ড, ওয়েল্ড—ফাউণ্ডেশনস্ অফ্ সাইকলজি—অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ
পি. স্যাণ্ডিফোর্ড—এডুকেশন্যাল্ সাইকলজি—অষ্টম পরিচ্ছেদ

জি. মার্ফি—জেনারাল্ সাইকলজি—একবিংশ, ত্রয়বিংশ পরিচ্ছেদ

সি. টি. মর্গ্যান্—ইন্‌ট্রডাকশন্ টু সাইকলজি—পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এন্. এল্. মান্—সাইকলজি—তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এফ্. এন্. ফ্রীম্যান্—মেণ্ট্যাল্ টেষ্ট্ স্—পঞ্চম, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এম্ কলিন্স্ অ্যাণ্ড জে. ড্রিভার—এক্সপেরিমেণ্ট্যাল্ সাইকলজি—ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জি. ডি. বোয়াজ—জেনারাল সাইকলজি—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

Exercise

1. Give a short history of intelligence tests. (pp. 202-208)
2. What improvements have been made upon the Binet-Simon scale ? (pp. 203-208)
3. What do you mean by intelligence tests. What do they measure ? (pp. 202-208)
4. Compare the Binet-Simon scale with those prepared by Terman-Merril, Burt, Yerkes, Bridges, Hardwick and Kuhlman. (pp. 202-208)
5. What are performance tests ? How do they differ from intelligence tests ? (pp. 208-209)
6. Show how intelligence and conduct interact upon each other ? (pp. 209-212)
7. Define delinquency. How does it differ from criminality ? (pp. 212-213)
8. How is intelligence related to delinquency ? Discuss. (pp. 213-214)
9. What is the attitude of Psychology to the problem of delinquency ? How is delinquency caused and what are its remedies ? (pp. 213-214)
10. Show how intelligence and occupation determine each other. Cite evidences in favour of their relation. (pp. 214-218)
11. How would you measure the intelligence of the adult ? Does intelligence cease to develop beyond a particular mental age ? Discuss. (pp.218-219)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিত্ব (পার্সন্যালিটি)

ব্যক্তিত্বের কারণ এবং জাতিরূপ (ফ্যাক্টরস্ অ্যাণ্ড টাইপস্ অফ্ পার্সন্যালিটি)

১। ব্যক্তিত্ব (পার্সন্যালিটি) কথাটির অর্থ

পার্সন্যালিটি কথাটি আসিয়াছে ল্যাটিন 'পার্সনা' হইতে। 'পার্সনা' বলিতে প্রথমে অভিনয়ে ব্যবহৃত **মুখোস** (মাস্ক্) বুঝাইত। এই অর্থে ব্যক্তিত্ব বলিতে ব্যক্তি আসলে যাহা নয় এমন ছদ্ম, মিথ্যা বা বিকৃতরূপ বুঝায়। পরবর্তীকালে 'পার্সনা'র অর্থ হইয়া দাঁড়ায় **নাটকের অভিনেতা** বা কুশীলবগণ (ড্র্যামাটিজ্ পার্সনি)। এই অর্থেও ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির আসল রূপকে না বুঝাইয়া নাটকে অভিনীত রূপ বুঝায়।

ব্যক্তিত্বের মনোবৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক অর্থের তুলনা

বর্তমানে ব্যক্তিত্ব কথাটি ব্যক্তির ভাণ না বুঝাইয়া তাহার প্রকৃত পরিচয়কে বুঝায়। দর্শন বা তত্ত্ববিদ্যা অনেক সময় ব্যক্তিত্ব বলিতে ব্যক্তির আসল সত্তা বা অন্তর্নিহিত রূপকে বুঝাইয়া থাকে। এই অর্থ অনুসারে ব্যক্তির আসল রূপ বা ব্যক্তিত্ব তাহার নানা আচরণ বা ক্রিয়ার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না, কিন্তু সকল প্রকাশের অন্তরালে অজ্ঞাত বা অনির্দেশ্যরূপে থাকিয়া যায়। ব্যক্তিত্বের এই জাতীয় দার্শনিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে ইহার সহিত আত্মার বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না।

দর্শন মনন বা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, পক্ষান্তরে মনোবিদ্যা প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণমূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর। ব্যক্তিত্বের কোনো আসল বা অন্তর্নিহিত রূপ থাকুক বা না থাকুক, এই প্রসঙ্গ মনোবিদ্যার আলোচ্য নয়, কারণ ইহা বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণ সাহায্যে নির্ণয় করা যায় না।

মনোবিদ্যা ঘটনানিষ্ঠ বিজ্ঞান। ইহা ব্যক্তিত্বের ঘটনানিষ্ঠ রূপের আলোচনা করে, কারণ এই রূপই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে পর্যবেক্ষণীয় এবং পরীক্ষণীয়।

২। ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা

ব্যক্তিত্বের স্বভাব সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত নাই। অ্যাল্‌পোর্ট ব্যক্তিত্বের প্রায় পঞ্চাশটি সংজ্ঞা উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির একটি সর্বান্তর্ভাবী স্বভাব। ব্যক্তির এমন কোনো প্রকাশ বা ধর্ম নাই যাহা তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে পড়ে না। ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা-নিরূপণ একটি দুরূহ ব্যাপার।

ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াত্মক রূপ

মনোবিদ্যার মতে ব্যক্তিত্ব একটি নিষ্ক্রিয় সত্তা মাত্র নয়। ইহা ব্যক্তির সেই স্বভাব বা পরিচয় যাহা সর্বদা আচরণ বা ক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশিত হয়। আসলে ব্যক্তি কি মনোবিদ্যা তাহা লইয়া মাথা ঘামায় না। ব্যক্তি কি করে অথবা কিরূপে সক্রিয় হয় তাহাই মনোবিদ্যায় ব্যক্তিত্বের জ্ঞাপক। **ব্যক্তিত্ব যে সকল ক্রিয়ায় বা গুণে প্রকাশিত হয় উহাদের সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব।**

উড্‌ওয়ার্থ-এর সংজ্ঞা

ব্যক্তিত্বের শেষোক্ত অর্থ বুঝাইতে গিয়া উড্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন, "**ব্যক্তির আচরণের সমগ্র রূপটিই তাহার ব্যক্তিত্ব**—(টোট্যাল্ কোয়ালিটি অফ্ অ্যান্ ইন্‌ডিভিজুয়্যাল'স্ বিহেভিয়ার)"।[১] কিন্তু আচরণের বা গুণাবলীর সমষ্টি বলিতে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কতগুলি গুণ বা ধর্মের যোগফল (অ্যাগ্রিগেট্) বুঝায় না, বুঝায় উহাদের ঐক্য বা সমগ্রতাকে। ব্যক্তিত্ব এমনই একটি বস্তু যাহা ব্যক্তির বহুমুখী প্রকাশগুলিকে একই ব্যক্তিত্বের প্রকাশরূপে গ্রথিত করে। যেমন সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তা, ভালবাসা-ঘৃণা, প্রভৃতি যে একই ব্যক্তির প্রকাশ এই একত্ববোধই ব্যক্তিত্বের আসল ধর্ম।

চেষ্টিত-মনোবিদ্যার সংজ্ঞা

ওয়াট্‌সন্ প্রভৃতি চেষ্টিত-মনোবিদ্‌গণ (বিহেভিয়রিস্টস্) উড্‌ওয়ার্থ প্রভৃতির মত ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তা স্বীকার করেন। শুধু এইটুকু স্বীকার করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট হন না, কিন্তু ব্যক্তিত্বকে উহার সক্রিয়তা বা চেষ্টিতের সহিত অভিন্ন এবং সমার্থক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে উদ্দীপকের সংস্পর্শে অঙ্গীর

১ উড্‌ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড্ মাকুইস—সাইকলজি, পৃঃ ৮৭

(অর্গ্যানিজ্‌ম্) প্রতিক্রিয়া-সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব। এই প্রতিক্রিয়ার কাজ হইল অঙ্গীর সহিত পরিবেশের উপযোজন (অ্যাডাপ্‌টেশন্) আবার উপযোজনের মধ্যস্থ (মিডিয়াম্) হইল নার্ভতন্ত্র। ওয়াটসন্-এর মতে ব্যক্তিত্ব বলিতে কোনো প্রকার মানস ঐক্য বুঝায় না, কিন্তু বুঝায় **উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন নার্ভীয় গঠন (প্যাটার্ন)।**

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্-এর মত

ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াত্মক সংজ্ঞা শুধু উড্‌ওয়ার্থ, ওয়াটসন্ প্রভৃতি মনোবিদেই সীমাবদ্ধ নয়। ম্যাক্‌ডুগ্যাল, মর্টন্ প্রিন্স্, অ্যাল্‌পোর্ট্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌ও ব্যক্তিত্বকে উহার ক্রিয়াত্মক রূপে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। যেমন ম্যাক্‌ডুগ্যাল্-এর মতে ব্যক্তিত্ব কতগুলি সহজাত প্রবৃত্তির ক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়। তিনি মনে করেন যে আত্মপ্রাধান্য (সেল্‌ফ্-অ্যাসার্শন্ বা মাস্টারি ইম্‌পাল্‌স্) এবং আত্ম-অবনমন (সেল্‌ফ্-অ্যাবেজমেণ্ট্ বা সাব্‌মিসিভ্ ইম্‌পাল্‌স্)-মূলক পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তির সামঞ্জস্যই ব্যক্তিত্ব। এই দুইটি প্রধান প্রবৃত্তির বিরোধে মানস বিকলতা ঘটে। মর্টন্ প্রিন্স্-এর মতে সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রবণতার সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব। আবাব অ্যাল্‌পোর্ট্ মনে করেন যে ব্যক্তির যে গুণগুলি তাহাকে অন্য ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ করে তাহাদের সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলির সমালোচনা

উপরের সংজ্ঞাগুলি ব্যক্তিত্বের ব্যাপক রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। উড্‌ওয়ার্থ্-এর সংজ্ঞা ব্যক্তিত্বের ব্যাপক রূপ প্রকাশ করিলেও, কিরূপে ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণগুলি সংহত বা একত্ব-সূত্রে গ্রথিত হয় তাহার ব্যাখ্যা করে না। উদ্দেশ্যমুখিতা বা উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণই এই ঐক্যের কারণ। উড্‌ওয়ার্থ্ এই দিকে মনোযোগী হন নাই। আবার ওয়াট্‌সন প্রদর্শিত সংজ্ঞা ব্যক্তিত্বের চেতন বা মানস রূপ অস্বীকার করিয়া এই উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়াছে। মর্টন্ প্রিন্স্ সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতার সমষ্টিকে ব্যক্তিত্ব বলিয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তিত্ব শুধু সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতার সমষ্টি নয় কিন্তু সংহতি বা ঐক্য ইহাতে বুদ্ধি, যুক্তি প্রভৃতি অবগতিমূলক বৃত্তিগুলির প্রভাবও অনস্বীকার্য।

অ্যাল্‌পোর্ট্‌-এর সংজ্ঞাও দূষণীয়। ব্যক্তিত্ব শুধু অন্য ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্য হইতে পারে না। ইহা গুরুস্থানীয় ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান-গুলির নিকট নতিস্বীকার করিবার সামর্থ্যও বটে।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌-এর সংজ্ঞাটি অপেক্ষাকৃত কম দূষণীয় বলিয়া মনে হয়। ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌ ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তা স্বীকার করিয়াছেন এবং উহার উদ্দেশ্য-মূলক নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত সংজ্ঞায় ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক এই দুই দিকই ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু বুদ্ধি, বিচার প্রভৃতি অবগতিমূলক দিকগুলিকে তিনি যথোপযুক্ত স্থান দেন নাই।

মোটের উপর বলিতে হয় যে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বভাব এবং আচরণ উল্লিখিত হওয়া চাই। ব্যক্তিত্বের ব্যাপক অর্থের প্রতি সুবিচার করিয়া উহার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় নাই। সুতরাং ইহাব যে সকল সংজ্ঞা এই পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনোটিই দোষমুক্ত নয়।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে শরীরী মনই (এম্‌বডিড্‌ মাইণ্ড) ব্যক্তিত্ব। মন শরীরের মধ্য দিয়া নানাভাবে ক্রিয়া করে—যেমন পরিবেশেব সহিত নিজকে মানাইয়া চলে এবং এইরূপ করিতে গিয়া, নানা শারীর এবং মানস বৃত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। সংবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া চিন্তা পর্যন্ত অবগতিমূলক মানস-ক্রিয়া, বেদনা, অনুভূতি, রস প্রভৃতি অনুভূতিমূলক মানস-ক্রিয়া এবং ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া—সকল মানসবৃত্তিগুলিই ব্যক্তিত্বের অঙ্গীভূত। তাহা ছাড়া নার্ভতন্ত্রের যেরূপ সংগঠন হইলে, এবং গ্রন্থিগুলি যেরূপ রসক্ষরণ করিলে পরিবেশের সহিত প্রতিযোজন বা মানাইয়া চলা সম্ভব, তাহাও ব্যক্তিত্বের নিয়ামক।

ব্যক্তিত্ব শুধু সত্তামাত্র নয়, আবার শুধু কতগুলি ক্রিয়া বা গুণের সমষ্টিও নয়, কিন্তু সকল ক্রিয়া ও গুণের মধ্যে প্রকাশিত একটি সত্তা যাহা উহাদের ঐক্য বা সংহতি সাধন করে। ব্যক্তিত্ব বলিতে বুঝায় ব্যক্তির শারীর, গ্রন্থীয়, মানসিক সংগঠন যাহার ফলে নানা প্রকাশ-বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ব্যক্তিত্ব অনৈক্যের মধ্যে এক-এর মত কাজ করে। ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির শরীর, মন, আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক ক্রিয়া, এক কথায় সমগ্র ব্যক্তির সাধারণ ধর্ম।

২-ক। ব্যক্তিত্বের আংশিক কারণ—(ফ্যাক্টর্‌স্ অফ্ পার্সন্যালিটি)

ব্যক্তিত্ব একটি সমগ্র বা সংহত বস্তু। কতগুলি পৃথক্ পৃথক্ উপাদানকে যোগ করিয়া ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় না। ইহার সংগঠন বুঝিতে হইলে যে সকল কারণ ব্যক্তিত্ব সংগঠনে অংশ গ্রহণ করে সেইগুলি জানা দরকার।

ব্যক্তিত্বের সংগঠনে অনেকগুলি শক্তি প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তির দেহ, প্রাণ ও মন নানাপ্রকার সামাজিক, বংশানুগতিক এবং শারীরিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্যক্তিত্বের আকার গ্রহণ করে। ব্যক্তিত্বের সংগঠনে এই জাতীয় যে সকল শক্তি প্রভাব বিস্তার করে তাহাদিগকে ব্যক্তিত্বের আংশিক কারণ (ফ্যাক্টর্‌স্ অব্ পার্সন্যালিটি) বলে।

(ক) দৈহিক কারণ

ব্যক্তির দেহসংগঠন এবং দেহরসের রসায়ন তাহার ব্যক্তিত্বের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তিত্বের একটি দৈহিক কারণ ব্যক্তির **চেহারা** (ফিজিক্)। চেহারার তারতম্যে ব্যক্তিত্বের তারতম্য ঘটিতে পারে। দীর্ঘকায় এবং সুন্দর ব্যক্তি তাহার ক্ষুদ্রকায় এবং কুৎসিত সঙ্গীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবেই এমন কোনো নিয়ম না থাকিলেও সে যে তাহার চেহারার ফলে অনেক সুবিধা ভোগ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোনো অঙ্গবৈকল্য থাকিলেও ব্যক্তিত্ব বদলাইয়া যায়। যেমন অন্ধ লোক অন্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। তোত্‌লা লোকের কথা বলিবার ভঙ্গী তাহার এই ত্রুটির দ্বারা প্রভাবিত হয়। গোল-গাল লোক প্রায়ই আমুদে, আরামপ্রিয় ও মিশুক এবং শীর্ণকায় লোক উহার বিপরীত হইয়া থাকে।

আবার **বিভিন্ন দৈহিক অবস্থার** উপর ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে। ক্লান্ত বা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি সহজেই চটিয়া যায়। যাহাদের রক্ত সঞ্চালন অস্বাভাবিক তাহাদের অক্সিজেন কমিয়া যায়, ফলে তাহারা কোনো কাজেই উৎসাহ বা প্রেরণা পায় না। অ্যাল্‌কোহল এবং অন্যান্য ঔষধের প্রয়োগে যে সকল দৈহিক পরিবর্তন ঘটে তাহার ফলে ব্যক্তিত্ব বদলাইয়া যায়। রক্তে শর্করা অংশ কমিলে বা বাড়িলে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে। পথ্যাদির পরিবর্তন, উপবাস, ব্যাধি প্রভৃতি কারণেও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আবার মস্তিষ্ক-রোগের ফলে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনও উল্লেখযোগ্য।

(খ) রাসায়নিক কারণ

উপরোক্ত শারীর কারণ ছাড়াও ব্যক্তিত্বের রাসায়নিক কারণ রহিয়াছে। ব্যক্তির দেহ যে সকল রস লইয়া গঠিত উহাদের **রাসায়নিক মিশ্রণের** উপরও ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। হিপোক্র্যাটিস্, গ্যালেন প্রভৃতি গ্রীক্ বিজ্ঞানী চারিটি প্রধান দেহরস (হিউমর্)-এর অল্লাধিক প্রাধান্য অনুসারে ব্যক্তিত্বের নিরূপণ করিয়াছেন। যাহাদের দেহে রক্তের প্রাধান্য তাহারা **আশাপ্রবণ (স্যাঙ্গুইন্)**, যাহাদের দেহে পীত পিত্ত (ইয়েলো বাইল্) প্রধান তাহারা **ক্রোধপ্রবণ (কোলেরিক্)** যাহারা কৃষ্ণ পিত্ত প্রধান (ব্ল্যাক্ বাইল্) তাহারা **বিষাদ-প্রবণ (মেলাংকোলিক)** এবং যাহারা শ্লেষ্মা-প্রধান (ফ্লেম্) তাহারা **শ্লেষ্মাপ্রবণ (ফ্লেমাটিক)**।

এই রাসায়নিক মত বর্তমানে অচল। কিন্তু ব্যক্তিত্বের সংগঠনে রাসায়নিক ক্রিয়া যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এই প্রাচীন মতটি সেই দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।

গ্রন্থির রসক্ষরণ ও ব্যক্তিত্ব

আবার গ্ল্যাণ্ড্ বা **গ্রন্থির রসক্ষরণ** ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে। গ্ল্যাণ্ড্ বা গ্রন্থি দুই প্রকার—যথা ডাক্ট্ গ্ল্যাণ্ড্ বা বহিঃক্ষরা গ্রন্থি এবং ডাক্ট্লেস্ গ্ল্যাণ্ড্ বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি যে রসক্ষরণ করে তাহা শরীরের কোনো দ্বার বা প্রণালী দিয়া বাহির হইয়া শরীরের উপরে বা বাহিরে উপচাইয়া পড়ে—যেমন লালাগ্রন্থি, স্বেদগ্রন্থি, অশ্রুগ্রন্থি, মূত্রগ্রন্থি এবং যৌনগ্রন্থির একটি প্রধান অংশ, প্রভৃতি। লালাগ্রন্থির ক্ষরিত রস সাধারণতঃ হজমক্রিয়ায় সাহায্য করে। স্বেদ, অশ্রু, মূত্র প্রভৃতি গ্রন্থি বিষাক্ত বা ক্ষয় পদার্থ শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু ব্যক্তিত্বের উপরও ইহারা ক্রিয়া করে। যদি অধিক বা অল্প পরিমাণে লালা নিঃসৃত হয়, অথবা নাসিকার শ্লেষ্মাগ্রন্থি হইতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা ঝরিতে থাকে, অথবা হজমী রসের গোলযোগ হয়, অথবা ক্ষরণের অভাবে গলা উত্তেজনাশীল বা সংবেদনশীল হয়, অথবা মূত্রগ্রন্থির অত্যধিক ক্ষরণে মূত্রাশয় পূর্ণ হইয়া থাকে, অথবা যৌনগ্রন্থি অধিক রসক্ষরণ করে তাহা হইলে ব্যক্তির আচরণ বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। এইরূপ অবস্থায় ব্যক্তির সামাজিক আচরণও বদলাইয়া যাইতে পারে, হয়ত সে তাহার বন্ধুকে আঘাত বা অপমান করিয়া বসিল, হয়ত বা কর্তৃপক্ষের সহিত রুক্ষ ব্যবহার করিয়া চাকুরী খোয়াইল।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির রসক্ষরণ ও ব্যক্তিত্ব

কিন্তু বহিঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির তুলনায় অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণ ব্যক্তিত্বের উপর আরও বেশী গুরুত্বপুর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এই গ্রন্থিগুলির ক্ষরিত রস দেহের বাহিরে নির্গত হইবার মত কোনো পথ বা দ্বার পায় না। কাজেই ইহাদের ক্ষরিত রস রক্তের সহিত মিশিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে।

মানুষের আচরণ বা ব্যক্তিত্বের উপর সকল অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির রসক্ষরণই প্রভাব বিস্তার করিলেও ইহার উপর থাইরয়েড্, এড্রিনেল এবং পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণই অধিক প্রভাবশালী। গ্রন্থিগুলির গঠন ও ক্রিয়া নবম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যক্তিত্বের উপর থাইরয়েড্ গ্রন্থির প্রভাব

থাইরয়েড্ গ্রন্থির ক্ষরিত রসকে বলে থাইরক্সিন্। এই রস কম বা বেশী পরিমাণে ক্ষরিত হইলে ব্যক্তিত্বের নানারূপ বিকৃতি ঘটে। এই বিকৃতিগুলি নবম পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। যেমন থাইরক্সিন কম ক্ষরিত হইলে ব্যক্তি বামন (ক্রেটিন) হয় এবং বেশী ক্ষরিত হইলে তাহার মাইক্সিডেমা নামক রোগ জন্মায়।

প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থির কম বা অধিক রসক্ষরণের ফল কি তাহাও ঐ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

এড্রিনেল বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি যে রসক্ষরণ করে তাহার নাম এড্রিনিন্ বা এপিনেফ্রিন্। ইহাও থাইরক্সিন্-এর মত একটি শক্তিশালী পদার্থ। ব্যক্তিত্বের উপর ইহার প্রভাব উক্ত পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

পিটুইটারি গ্রন্থির ক্ষরিত রসের নাম পিটুইটিন্। ব্যক্তিত্বের উপর ইহার প্রভাব অসীম—সেই কারণে ইহাকে মাস্টার গ্ল্যাণ্ড্ বা প্রধান গ্রন্থি বলা হয়। ইহার প্রভাবও নবম পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

প্যান্‌ক্রিয়াজ্, যৌনগ্রন্থি, থাইমাস্ গ্রন্থি এবং পিনিয়াল্ গ্রন্থি উহাদের রসক্ষরণের দ্বারা কিরূপে ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে তাহাও উক্ত পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত 'ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ'ও দ্রষ্টব্য।

(গ) সামাজিক কারণ

ব্যক্তিত্ব একটি নিষ্ক্রিয় সত্তা নয়, কিন্তু কতগুলি ক্রিয়ার সংগঠন। ব্যক্তি পরিবেশেই জন্মলাভ করে, উহাতেই বর্ধিত হয়, এবং তাহার ক্রিয়া উৎপন্ন হয় পারিবেশিক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে।

সামাজিক বিধি ও সামাজিক স্থান

সামাজিক পরিবেশের (সোশ্যাল্ এন্‌ভায়রেনমেণ্ট্) দুইটি প্রধান শক্তি হইল **সামাজিক বিধি** (সোশ্যাল্ কোড্) এবং **সামাজিক স্থান** (সোশ্যাল্ রোল্)। ব্যক্তি সমাজের বিধি-নিষেধগুলি মানিয়া চলে এবং সমাজে একটি নিজস্ব স্থান বা অংশ গ্রহণ করে।

সামাজিক বিধি-নিষেধ ব্যক্তির আচার-ব্যবহার এবং নীতিবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজের আচার-ব্যবহার, ন্যায়নীতি প্রভৃতি আদর্শ বা নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শিশুকে সমালোচনা, উপহাস, শাস্তি, এমন কি বহিষ্কারের সম্মুখীন হইতে হয়। কাজেই ঐগুলি মানিয়া চলাই সে বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া বুঝিতে পারে।

কিন্তু সমাজ বা গোষ্ঠীর বাঁধা ছাঁচে চলিতে হইলেও প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিকাশ লাভ করে। ব্যক্তিত্ব শুধু সমাজের সৃষ্টি নয়, ইহাতে সামাজিক প্রভাবের সহিত ব্যক্তির নিজস্ব স্বভাবও ক্রিয়াশীল। আবার সমাজও ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। সমাজদ্রোহী ব্যক্তি সমাজের দ্বারা তিরস্কৃত, শাসিত বা বহিষ্কৃত হয়।

সামাজিক বিধি-নিষেধগুলি শৈশবেই অর্জিত হয়। যেমন কোনো খেলায় অংশগ্রহণ করিতে হইলে শিশুকে ঐ খেলার নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। আবার মিথ্যা কথা বলিলে শাস্তি পাইতে হয় অথবা লোকে অবিশ্বাস করে। এইরূপ যুক্তিতে শিশু বুঝিতে পারে যে মিথ্যা কথা বলা ভাল নয়।

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সামাজিক জীবনে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিতে এবং ঐ স্থান অনুযায়ী কাজ করিতে হয়। এই জীবননাট্যে কেহ অভিনেতা, কেহ বা শ্রোতা, কেহ বা মঞ্চশিল্পী। খেলার মাঠে কেহ খেলোয়াড, কেহ দ্রষ্টা, আবার কেহ বা পরিচালক। আবার খেলোয়াড়দের মধ্যেও প্রত্যেকের স্থান এবং কাজ সুনির্দিষ্ট। সামাজিক জীবনে কেহ নেতা বা সমাজসংস্কারক, কেহ বা তাহার অনুগামী, আবার কেহ বা নেতার নির্দেশে

পরিচালিত সাধারণ লোক। পারিবারিক জীবনে কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ বা সন্তান। শিক্ষালয়ে কেহ শিক্ষক, কেহ বা শিক্ষার্থী। আবার একই ব্যক্তির হয়ত বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পর্কে বিভিন্ন স্থান গ্রহণ এবং তদনুযায়ী কাজ করিতে হয়। যেমন পারিবারিক জীবনে একই ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে পিতা বা মাতা, পুত্র বা কন্যা, এবং ভ্রাতা বা ভগ্নী।

সুতরাং সামাজিক জীবন বলিতে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ বা ইণ্টার-পারসন্যাল্ রিলেশনশিপ্ বুঝায়।

পরিবারে শিশুর স্থান

পরিবারে শিশুর স্থান ও কাজ তাহার ব্যক্তিত্বকে গভীরভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। শিশুর পারিবারিক স্থান ও কাজ অনেকাংশে নির্ভর করে তাহার পিতামাতার উপর, যদিও তাহার নিজস্ব স্বভাব উপেক্ষণীয় নয়। পরিবারে শিশুর প্রধান কাজ হইল বড় হইয়া ওঠা। অনেক পিতামাতা শিশুকে বড় হইয়া উঠিবার সুযোগ দেন না, বরং তাঁহারা উহার উপর নানা অন্যায় ও অবিচার করেন। কোনো পিতামাতা হয়ত অত্যধিক তত্ত্বাবধান, যত্ন ও সতর্কতার ফলে শিশুকে স্বাবলম্বী এবং দায়িত্বশীল হইতে বাধা দেন। 'আদুরে ছেলে' (স্পয়েন্ট্ চাইল্ড্), 'প্রিয় সন্তান' অথবা 'অবাঞ্ছিত সন্তান' পরিবারে যে স্থান লাভ করে তাহা উহাদের ব্যক্তিত্বের উপর স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায়।

অ্যাড্লার্-এর মত—জন্মক্রম

পরিবারস্থ প্রত্যেকটি শিশুর স্থান বিভিন্ন, কারণ পিতামাতার সমান ব্যবহার সত্ত্বেও তাহার সঙ্গী অন্য কোনো শিশু। যেমন দুটি ভাই-এর বড়টির সাথী ছোট ভাই, আবার ছোট ভাইটির সাথী বড় ভাই। কোনো কোনো মনোবিদ্, বিশেষ করিয়া অ্যালফ্রেড্ অ্যাড্লার্, শিশুর পারিবারিক স্থান অথবা জন্মগত ক্রম (বার্থ অর্ডার)-এর উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 'একমাত্র সন্তান' (ওন্‌লি চাইল্ড) কোনো বাধা না পাইয়া অথবা কাহারও অংশীদার না হইয়া পরমুখাপেক্ষী বা অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইতে পারে। জ্যেষ্ঠ সন্তান কিছুকাল একমাত্র সন্তানের স্থান গ্রহণ করিয়া পরে স্থানচ্যুত হয়—ফলে তাহার মধ্যে হিংসুক-প্রকৃতি, রক্ষণশীল, কর্তৃত্ব বা

ক্ষমতায় বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় সন্তান প্রথমটিকে 'ধরিয়া ফেলিবার' অথবা তাহার সমকক্ষ হইবার জন্য ব্যগ্র হয় এবং তাহার পক্ষে প্রচলিত রীতির বিরোধী হওয়া স্বাভাবিক। কনিষ্ঠ সন্তান চিরদিনই কনিষ্ঠ। সে প্রত্যেকের আদর-কাঙ্গাল এবং পরমুখাপেক্ষী। পরিবারটি বড় না হইলে প্রত্যেক শিশুর অদৃষ্টই যেন কোনো না কোনো দুর্দশাজনক স্থানের সহিত জড়িত।

অ্যাড্‌লার-এর মতের সমালোচনা

কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে অ্যাড্‌লার্‌-এর এই মতবাদ যথার্থ নয়। পরিবারে কোনো স্থান বা জন্মক্রমই শিশুর পক্ষে খারাপ নয়। তাহা ছাড়া বিভিন্ন ক্রমে ভূমিষ্ঠ শিশুর ব্যক্তিত্বে সাদৃশ্য দেখা যায়। জন্মক্রমের সহিত কতগুলি সুবিধা বা অসুবিধা জড়িত থাকিতে পারে। কিন্তু এইগুলি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের চূড়ান্ত নিয়ামক নয়। শিশুর গৃহ-পরিবেশ এবং সহজাত স্বভাবও তাহার ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে।

যদি মনে করা হয় যে অ্যাড্‌লার জন্মক্রমকেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের একমাত্র হেতু বলিয়া অভিমত পোষণ করেন তাহা হইলে তাঁহার উপর অবিচার করা হইবে। তিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্যান্য হেতুগুলিকেও উপেক্ষা করেন নাই। মা সন্তানকে কিরূপে সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত করেন তাহার উপর অনেকটা নির্ভর করে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ। শিশু যাহাতে পরিবারস্থ আরও পাঁচজনের একজন হইতে পারে সেই বিষয়ে মায়ের সযত্ন হওয়া উচিত। এই প্রতিযোজন ঠিক না হইলেই শিশুর নানাপ্রকার সমস্যা আসে। যেমন আদুরে ছেলে সকলেরই আকর্ষণ-কেন্দ্র হইতে চায়, আবার উপেক্ষিত শিশু দূরে দূরে সরিয়া বেড়ায়। এইরূপে অতি শৈশব হইতেই ব্যক্তির এমন একটি "জীবনপদ্ধতি" (স্টাইল অফ্ লাইফ্) গড়িয়া ওঠে যাহা আজীবন অপরিবর্তিত থাকে।

ফ্রয়েড্‌-এর মত

পারিবারিক অথবা সামাজিক স্থান ব্যক্তিত্ব-গঠনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েড্‌ও সেইদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। শিশু পিতামাতার নিকট হইতে যে ভালবাসা ও শাসন পায় তাহার ফলে তাঁহাদের প্রতি উহার একটি **উভয়বল ভঙ্গী** (অ্যাম্‌বিভ্যালেন্ট্‌ অ্যাটিচুড্‌)

গড়িয়া ওঠে—অর্থাৎ সে পিতামাতাকে যেমন ভালবাসিতে তেমন ঘৃণা করিতে শিখে। একটু বড় হইলেই শিশু পিতামাতার সহিত নিজকে অভিন্ন বলিয়া মনে করে, বিশেষ করিয়া পিতামাতার কর্তৃত্ব বা শাসনের ভূমিকার সহিত। এইরূপে শিশুর মনে বিবেক (সুপার-এগো) গড়িয়া ওঠে—অর্থাৎ সে অন্যায় করিলে পিতামাতা তাহাকে যেমন শাসন করেন সে নিজকে নিজেই তেমন শাসন করিতে শিখে। পিতামাতার প্রতি এই আনুগত্য (লয়্যাল্‌টি) আস্তে আস্তে বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়, যাহার ফলে শিশু পিতৃস্থানীয় শিক্ষক বা নেতাকে মানিয়া লইতে পারে।

ফ্রয়েড্‌-এর মতে উপরোক্ত ক্রিয়াগুলি সাধারণতঃ নির্জ্ঞান মনে সম্পন্ন হইয়া থাকে। উহাদের সম্বন্ধে প্রায়ই শিশুর কোনো চেতনা থাকে না। শিশু পিতামাতার সহিত তাহার সম্বন্ধকে কিরূপে আত্মসাৎ করিয়া লয় তাহারই উপর নির্ভর করে তাহার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের বিকাশ। যে শিশুর মধ্যে উভয়বল অথবা পরস্পরবিরোধী ভালবাসা ও ঘৃণার মধ্যে ঘৃণা প্রক্ষোভটি প্রকাশ পায় সে হইয়া ওঠে সমাজবিরোধী। আবার যে শিশুর মধ্যে ভালবাসা প্রক্ষোভটি সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত থাকে সে হয় স্বাভাবিক।

কিন্তু অ্যাড্‌লার এবং ফ্রয়েড্‌ উভয়েই শিশুর সামাজিক জীবনকে পরিবারে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। গৃহ বা পরিবারের বাহিরে বৃহত্তর সমাজের প্রভাব কিরূপে শিশুর ব্যক্তিত্বকে গঠন করে তাঁহারা সেইদিকে লক্ষ্য রাখেন নাই। অবশ্য এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর এই তথাকথিত বৃহত্তর সমাজের প্রভাব পিতামাতা এবং পরিবারস্থ আর পাঁচ জনের মধ্য দিয়াই ঘটিয়া থাকে। পিতামাতার সহিত সম্বন্ধই যে শিশুর সামাজিক জীবনের প্রথম সূত্রপাত তাহাতে সন্দেহ নাই।

দলে পড়িয়া যে শিশু বদলাইয়া যায় ইহা সত্য। সুতরাং শিশু কোন্‌ দলে মিশে, অন্যান্য কিরূপ চরিত্রের শিশুর সহিত মিলিত হয়, ইহা পিতামাতার পক্ষে মস্ত বড় উদ্বেগের বিষয়।

নবযৌবন (অ্যাডোলেসেন্স্‌)

নবযৌবন (অ্যাডোলেসেন্স্‌) শিশুর জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বয়ঃসন্ধিকাল। এই কালটিকে স্যার স্ট্যানলি হল্‌ "ঝড় ও চাপের সময়" (স্টর্ম অ্যাণ্ড্‌ স্ট্রেস্‌ পিরিয়ড্‌) বলিয়াছেন। এই সময়ে ব্যক্তি কোনো নায়ক (হিরো)

খুঁজিয়া বেড়ায়। উপযুক্ত নায়ক বা হিরো পাইলে এই সময়ের অশান্তভাব প্রায়ই গঠনমূলক প্রকাশের পথে পরিচালিত হয়।

যৌবন আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব একটি নির্দিষ্ট ধারায় আত্মপ্রকাশ করে। সে সমাজে কি স্থান গ্রহণ করিবে অথবা কি কাজ করিবে তখন তাহা অনেকটা স্পষ্ট হইয়া দাঁড়ায়।

(ঘ) জৈব কারণ—বংশ প্রভাব বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরস্—হেরিডিটি

ব্যক্তিত্ব বিকাশের কারণগুলির মধ্যে ব্যক্তি বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে যাহা পায় তাহার গুরুত্ব অত্যধিক। শারীরিক, সামাজিক প্রভৃতি কারণ-গুলি বংশগতির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। বংশগতি বা হেরিডিটি বলিতে বুঝায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের সেই কারণগুলি যাহা শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পাইয়াছে, অথবা যাহা জন্মগত।

আরও স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে জন্মের কিঞ্চিদধিক নয় মাস পূর্বে পিতৃবীজ (স্পার্মাটোজুন) এবং মাতৃকোষের (ওভাম্) মিলনে মাতার গর্ভসঞ্চার মুহূর্ত হইতে, অর্থাৎ ভ্রূণাবস্থার প্রথম সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া জন্মকাল পর্যন্ত শিশুর মধ্যে যে সকল কারণ নিহিত থাকে সেইগুলিই তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের বংশগত বা হেরিডিটারি কারণ।

অপর পক্ষে, ভূমিষ্ঠ হইবার পরবর্তী মুহূর্ত হইতে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে যে সকল কারণ ক্রিয়া করে সেইগুলিই তাহার পারিবেশিক কারণ (এন্‌ভায়রনমেণ্ট্যাল্ ফ্যাক্‌টরস্)।

বংশগতি যে ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোনো ব্যক্তি হয়ত আজন্ম চালাক বা বুদ্ধিমান, আবার কেহ হয়ত জন্ম হইতেই বোকা বা নির্বোধ। কেহ হয়ত স্বভাবতঃ সঙ্গীতপ্রিয়, আবার কেহ হয়ত প্রথম হইতেই সঙ্গীতের প্রতি উদাসীন কেহ হয়ত সহজেই বাক্‌পটু, আবার কেহ বা বহু আয়াস সত্ত্বেও ভাষার আড়ষ্টতা কাটাইয়া উঠিতে পারে না। যে সূর্যের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আর সকলে জাগিয়া ওঠে আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গেই কেহ বা ঘুমাইয়া পড়ে।

অন্যান্য উচ্চতর প্রাণীর মত মানুষের জীবন আরম্ভ হয় একটি জীবকোষ রূপে, অর্থাৎ পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের মিলিত জিগট্ রূপে। এই জিগটেই ব্যক্তির মানসিক, নৈতিক এবং দৈহিক সম্ভাবনার বীজ অব্যক্তভাবে নিহিত

থাকে। ব্যক্তির বংশগতি নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তনীয়। ইহাকে কোনো প্রকারেই বাড়ানো বা কমানো যায় না। সুতরাং বংশগতি বলিতে বুঝায় যাহা জিগটে অথবা পিতৃবীজ দ্বারা উর্বরীকৃত মাতৃকোষে অব্যক্তভাবে থাকে তাহার সমষ্টি।

বংশগতি ও পরিবেশ (হেরিডিটি অ্যাণ্ড্ এন্‌ভায়রন্‌মেণ্ট্)

বংশগতি ও পরিবেশ পরস্পর সম্বদ্ধ। কোন্ বংশগত ধর্মগুলি কি পরিমাণে বিকাশ লাভ করিবে পরিবেশ তাহা নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে **বংশগতি নির্দিষ্ট** এবং **পরিবেশ অনির্দিষ্ট** স্থান গ্রহণ করে। ব্যক্তির পরিবেশ উন্নত করিলে তাহার উৎকৃষ্ট বংশগত সম্ভাবনাগুলি বিকাশ লাভ করে। বংশগতি সূত্রে পাওয়া হয় নাই এমন কোনো শক্তি বা সামর্থ্য পরিবেশ উৎপন্ন করিতে পারে না। কিন্তু যে বংশগত সম্ভাবনাটি সুপ্ত বা অব্যক্তভাবে রহিয়াছে, অনুকূল পরিবেশ তাহাকে বাস্তবে প্রকাশিত করিতে পারে মাত্র। আবার পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তির উন্নতি সম্ভব হইলেও জাতির উন্নতি সম্ভব নয়, কারণ **পারিবেশিক উন্নতি ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ**। দুইজন একই প্রকার বুদ্ধিমান ব্যক্তির একজনকে শিক্ষা দিলে এবং অপর জনকে না দিলে, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় জনের তুলনায় বেশী উন্নত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাদের পরবর্তী বংশধরেরা একই প্রকার হইবে, অর্থাৎ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুইটির বংশধরেরা শিক্ষালাভের সম্ভাবনা লইয়া জন্মিবে, যেমন তাহাদের পিতারা জন্মিয়াছিলেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বংশগতি ব্যক্তিত্ব বিকাশের সকল সম্ভাবনার মূল কারণ। পরিবেশ শুধু এই সম্ভাবনাগুলির বাস্তব রূপায়ণে সহায়তা করে। তানসেন যদি আফ্রিকার জঙ্গলে অথবা আরবের মরুভূমিতে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে হয়ত তিনি উচ্চ সঙ্গীতজ্ঞ না হইয়া তাঁহার দল বা গোষ্ঠীর বাদ্যযন্ত্রবিশারদ হইতেন। কিন্তু কোনো মূকবধির ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ পাইলেও সঙ্গীতজ্ঞ হইতে পারে না। কোনো ক্ষীণবুদ্ধি শিশুকে হাজার শিক্ষা দিয়াও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন করা যায় না, যদিও তাহার সামর্থ্য অনুসারে তাহাকে অর্থকরী বিদ্যা শিখানো যাইতে পারে। কাজেই শুধু পরিবেশ ও শিক্ষার প্রভাবে কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে প্রতিভাসম্পন্ন করিয়া তোলা যায় না।

সমাজগত বংশগতি (সোশ্যাল্ হেরিটেজ্)

ব্যক্তিগত বংশগতির মত সমাজগত বংশগতিও (সোশ্যাল্ হেরিটেজ্) ব্যক্তিত্বের বিকাশে সাহায্য করে। শিশু যেমন পিতামাতার বংশগত সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তেমনই একটি সামাজিক উত্তরাধিকারের মধ্যেও জন্মগ্রহণ করে। পিতামাতা তাঁহাদের জ্ঞান ও শিক্ষা সন্তানের মধ্যে জন্মগত-ভাবে সংক্রামিত করিতে পারেন না। কিন্তু সমগ্র মনুষ্যজাতির জ্ঞান, রীতিনীতি, আচার-বিচার এবং ঐতিহ্য পুরুষ-পরম্পরাক্রমে শিশুতে সঞ্চারিত হয়। অগণিত পুরুষ-পরম্পরায় মনুষ্যজাতি পুস্তক, চিত্র, শিল্পকলা, আইন-কানুন ও ঐতিহ্যে তাহার জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। পূর্বপুরুষের এই সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডার পরবর্তী পুরুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে পারিবেশিক উদ্দীপকের মত কাজ করে। শিশুর ইহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে এই সামাজিক উত্তরাধিকার তাহার ব্যক্তিত্বকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত বংশগত উত্তরাধিকার জন্মগত। কিন্তু পূর্বপুরুষের শিক্ষা-দীক্ষার সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত সামাজিক উত্তরাধিকার প্রত্যেকটি পরবর্তী পুরুষকে নূতন করিয়া অর্জন করিতে হয়।

৩। ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ—(টাইপ্স্ অফ্ পার্স´ন্যালিটি)

(ক) হিপোক্র্যাটিস্ ও গ্যালেন্ প্রবর্তিত জাতিরূপ

ব্যক্তিত্ব অনেক প্রকারের বা নমুনার হইতে পারে। প্রাচীন গ্রীক্ বিজ্ঞানীরা মেজাজ (টেম্পারামেণ্ট্) অনুসারে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন নমুনাভেদ করিয়াছেন। যেমন হিপোক্র্যাটিস্, গ্যালেন প্রভৃতি মনে করেন যে দেহ প্রধানতঃ চারিটি রস (হিউমার) দিয়া তৈয়ারী যথা রক্ত, হল্‌দে পিত্ত, কালো পিত্ত এবং শ্লেষ্মা।[১]

এই রসগুলির সুষম মিশ্রণই স্বাস্থ্য এবং উহাদের বিষম মিশ্রণই রোগ। এই চারিটি রসের প্রাধান্য অনুসারে গ্যালেন ব্যক্তিত্বকে চার প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। রক্তের (ব্লাড্) প্রাধান্য ঘটিলে ব্যক্তিত্ব আশাপ্রবণ (স্যাঙ্গুইন্) হইয়া দাঁড়ায়। আশাপ্রবণ ব্যক্তি চঞ্চল এবং তেজস্বী হইয়া থাকে। আবার

১। এই পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ—পৃঃ ২২৭

শ্লেষ্মার (ফ্লেম্) প্রাধান্য ঘটিলে ব্যক্তিত্ব শ্লেষ্মাপ্রবণ (ফ্লেমাটিক্) হইয়া দাঁড়ায়। শ্লেষ্মাপ্রবণ ব্যক্তি হয় নিস্তেজ ও হিসাবী। তৃতীয়তঃ যে সকল ব্যক্তির মধ্যে কালো পিত্ত (ব্ল্যাক্ বাইল) প্রধান তাহারা বিষাদপ্রবণ (মেলাংকোলিক্) শ্রেণীর। ইহারা বলবান, কিন্তু বিষণ্ণ প্রকৃতির হইয়া থাকে। চতুর্থতঃ যে সকল ব্যক্তিতে পীত পিত্ত (ইয়েলো বাইল্) প্রধান তাহারা হয় ক্রোধপ্রবণ (কোলেরিক্)। ইহারা চট্ করিয়া রাগিয়া যায়। কিন্তু ইহাদের যথেষ্ট কর্মশক্তি থাকে।

(খ) য়্যুঙ্গ্ প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ—অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত

ব্যক্তিত্বের নমুনাভেদের মধ্যে সি. জি. য়্যুঙ্গ প্রবর্তিত ভেদ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রবর্তিত শব্দ-অনুষঙ্গ পদ্ধতির (ওয়ার্ড অ্যাসোসিয়েশন্ মেথড্) ভিত্তিতে তিনি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব নির্দেশ করিয়াছেন—যথা অন্তর্বৃত (ইন্ট্রোভার্ট্) এবং বহির্বৃত (এক্সট্রোভার্ট্)।

অন্তর্বৃত (ইন্ট্রোভার্ট) ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী অন্তর্দর্শনমূলক এবং আত্মকেন্দ্রিক। সে ভাবুক এবং আত্মলীন। এই ব্যক্তি নিজ চিন্তা বা কল্পনারাজ্যে অথবা আপনার মধ্যে আপনি আশ্রয় লইয়া থাকে। সে কর্মকোলাহলময় বহির্বিশ্বে অথবা জীবনসংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিতে চায় না। বাস্তবের বা পরিবেশের উত্তেজনা হইতে আত্মরক্ষার জন্য সে মনে মনে কতগুলি রক্ষাকবচ সৃষ্টি করিয়া লয়।

কিন্তু বহির্বৃত (এক্সট্রোভার্ট্) ব্যক্তি আপনাকে লইয়া আপনি বিব্রত থাকিতে চায় না বা পারে না। আপনার মধ্যে আপনি মগ্ন না থাকিয়া বহির্বিশ্বের কর্মকোলাহলে অংশ গ্রহণ করা বা ব্যস্ত থাকাই তাহার পক্ষে সহজ। এই ব্যক্তি আরও পাঁচ জনের ভালোমন্দ অথবা সুখদুঃখের সহিত নিজকে মিশাইয়া দেয় এবং আত্মস্বাতন্ত্র্য বলিয়া কিছু রাখে না।

ব্যক্তিত্বের এই উভয় প্রান্তিক শ্রেণীভেদ 'কাজের লোক' এবং 'কল্পনাবিলাসী লোক' এই প্রচলিত শ্রেণীভেদের অনুরূপ।

অন্তর্বৃত ব্যক্তিত্ব আত্মকেন্দ্রিক, কিন্তু বহির্বৃত ব্যক্তিত্ব বহিঃকেন্দ্রিক বা সামাজিক। প্রথমটিতে জাগতিক বিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতা থাকে না। অর্থাৎ যেরূপ জীবন যাপন করিলে যশ, মান, খ্যাতি, ধন অথবা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করা যায় সেইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী অন্তর্বৃত ব্যক্তির থাকে না, কিন্তু বহির্বৃত

ব্যক্তির থাকে। য়ুঙ্গ্-এর মতে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কামশক্তি (লিবিডো) ব্যক্তিগত শক্তি বা শ্রেষ্ঠতা লাভের চেষ্টায় নিয়োজিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির কামশক্তি নিয়োজিত হয় যৌন সামর্থ্যের প্রকাশে এবং আত্মশক্তি বা শ্রেষ্ঠতা লাভ ইহার নিকট গৌণ হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু য়ুঙ্গ্ দেখিয়াছেন যে জনসংখ্যার বেশীর ভাগ লোকই এই দুইটি চরম প্রান্তের কোনটিতেই পড়ে না। তাহারা পড়ে উহাদের মধ্যবর্তী শ্রেণীতে, যাহার নাম দিয়াছেন য়ুঙ্গ্ **উভয়বৃত্ত** (অ্যাম্বিভার্ট্)। এই শ্রেণীভুক্ত অধিকাংশ জনসাধারণ শুধু আত্মকেন্দ্রিক বা সমাজকেন্দ্রিক নয়, কিন্তু এই দুইটির সংমিশ্রণ।

য়ুঙ্গ্-এর পরবর্ত্তী মত

তাঁহার গবেষণার পরবর্তী ধাপে য়ুঙ্গ্ কামশক্তির গুরুত্ব লাঘব করিয়া ব্যক্তিত্বের চারিটি মানস গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই মত অনুসারে পরিবেশের সহিত নিজকে খাপ খাওয়াইবার জন্য চারিটি মানসক্রিয়া প্রয়োজন—যথা চিন্তন (থট্), বেদন (ফীলিং), স্বজ্ঞা (ইন্‌টুইশন্) এবং সংবেদন (সেন্‌সেশন্)। প্রত্যেক ব্যক্তিত্বেই এই চারিটি মানসক্রিয়া অল্পাধিক বর্তমান।

এই চারিপ্রকার মানস গঠনের পারস্পরিক প্রাধান্য অনুসারে ব্যক্তিত্বও চার শ্রেণীর। যাহারা প্রধানতঃ চিন্তন বা বেদনার সাহায্যে পরিবেশের সহিত নিজকে উপযোজিত করে তাহারা বিচারশীল শ্রেণীর (র‍্যাশন্যাল্ বা জাজিং টাইপস্)। ইহারা পরিস্থিতির মূল্য বা গুরুত্ব বিচার করিয়া চলে। দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব দুইটি পরিস্থিতির ভালোমন্দ বিচার করে না, কিন্তু আবেগের বশবর্তী হইয়া চলে। এই দুইটি ব্যক্তিত্বকে নির্বিচার বা অভিজ্ঞতা-নির্ভর (ইর্‌র‍্যাশন্যাল বা এম্পিরিক্যাল্ টাইপস্) বলা যায়।

অন্তর্বৃত্ত এবং বহির্বৃত্ত এই দুইটিই আবার চিন্তন, বেদনা, স্বজ্ঞা এবং সংবেদন এই চারটির প্রাধান্য অনুসারে চার রকমের হইতে পারে। সুতরাং চারটি অন্তর্বৃত্ত এবং চারটি বহির্বৃত্ত শ্রেণী লইয়া **ব্যক্তিত্ব আট রকমের হইয়া দাঁড়ায়।** আবার ইহাদের প্রত্যেকটি দুই রকমের হইতে পারে। যেমন বিচারশীল অন্তর্বৃত্ত এবং বহির্বৃত্ত ব্যক্তির বেদনা অবদমিত হইয়া শুধু চিন্তন প্রকাশিত হইতে পারে, আবার উহার চিন্তন অবদমিত হইয়া শুধু বেদনা

প্রকাশিত হইতে পারে। আবার নির্বিচার অন্তর্বৃত এবং বহির্বৃত ব্যক্তির স্বজ্ঞা প্রকাশিত এবং সংবেদন অবদমিত অথবা সংবেদন প্রকাশিত এবং স্বজ্ঞা অবদমিত হইতে পারে।

এইরূপে য়্যুঙ্গ-এর মতানুযায়ী ব্যক্তিত্বের ষোলটি নমুনাভেদ হইতে পারে।

(গ) বারম্যান্ প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের গ্রন্থীয় জাতিরূপ (গ্ল্যাণ্ডুলার টাইপস্)

হিউমর ভেদ অনুসারে চারটি প্রাচীন ব্যক্তিত্ব ভেদকে **বারম্যান্** একটি নূতন রূপ দিয়াছেন। তিনি তাঁহার মতের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করেন নাই। তথাপি বলা যায় যে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির প্রাধান্য অনুসারে তিনি ব্যক্তিত্বের কতগুলি গ্রন্থীয় জাতিরূপের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এড্রিনেল ব্যক্তিত্ব

এড্রিনেল ব্যক্তিত্বশালী লোকের এড্রিনিন বা এপিনেফ্রিন **অধিক ক্ষরিত হয়**—ফলে তাহার ত্বক পুরু, চুল রুক্ষ ও শুষ্ক এবং দাঁত বড় হইয়া থাকে। এই ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে। আবার এড্রিনেল-এর রসক্ষরণের সহিত পিটুইটিন-এর বেশী ক্ষরণ হইলে এড্রিনেল ব্যক্তিত্বশালী লোক অসীম শক্তি, উৎসাহ এবং দৃঢ়তাসম্পন্ন হইয়া থাকে। এড্রিনেল ব্যক্তিত্ব আত্মনির্ভর এবং স্থিরসঙ্কল্প হয়। এড্রিনেল ব্যক্তিত্বশালিনী নারী সাধারণ নারী অপেক্ষা অধিক পুরুষভাবাপন্ন হয়। আবার এড্রিনিন **কম ক্ষরিত হইলে** স্নায়বিক দৌর্বল্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপ ব্যক্তির শরীরের তাপ এবং রক্তের চাপ কমিয়া যায়, উত্তেজনা এবং রোগাতঙ্ক লক্ষণের সহিত অবসাদ দেখা দেয়।

পিটুইটারি ব্যক্তিত্ব

দ্বিতীয়তঃ পিটুইটারি ব্যক্তিত্ব সম্মুখের (অ্যান্টিরিয়র) এবং পশ্চাতের (পস্টিরিয়র) পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণের প্রাধান্য অনুসারে ভিন্ন হয়। **সম্মুখের পিটুইটারি প্রাধান্য লাভ করিলে,** পৌরুষ, শারীরিক বিকাশ এবং মস্তিষ্কশক্তি বাড়ে। এই গ্রন্থি বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি, বিচারশীলতা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়ায়। **কিন্তু পশ্চাতের পিটুইটারি গ্রন্থির প্রাধান্য ঘটিলে** মেয়েলী ভাব এবং ভাবোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পায়। এই দ্বিতীয় অংশটি

মাতৃত্ব, সামাজিক, সৃজনমূলক এবং যৌন প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। **সমগ্র পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণ কম হইলে** জননেন্দ্রিয়ের ক্ষুদ্রতা, চেহারায় খর্বতা, অবসন্নতা, নির্বুদ্ধিতা, উৎসাহাভাব এবং সর্বাঙ্গীন অবনতি ঘটে।

যেমন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল্-এর ব্যক্তিত্ব ছিল পিটুইটারি। তাঁহার সম্মুখের পিটুইটারি অত্যধিক ক্রিয়াশীল ছিল বলিয়াই তিনি অসাধারণ সহনশীল, সংগঠনক্ষম, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং স্থিরসঙ্কল্প ছিলেন। বারম্যান্-এর মতে নেপোলিয়ন্, নীৎসে, ডারুইন্, জুলিয়াস্ সীজার্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ পিটুইটারি ব্যক্তিত্বশালী ছিলেন।

থাইরয়েড্ ব্যক্তিত্ব

থাইরয়েড্ ব্যক্তিত্বে থাইরয়েড্ গ্রন্থিক্ষরণের প্রাধান্য থাকে। এই ব্যক্তিত্বশালী লোক প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে পুর্ণ, কামপ্রবণ, শীর্ণ, কর্মঠ, ঘনচুল-বিশিষ্ট হয়। সে চট্ করিয়া পরিস্থিতি বুঝিতে পারে। তাহার ইচ্ছাশক্তি এবং আবেগ প্রবল হয়। কিন্তু যদি থাইরক্সিন্-এর প্রাচুর্যের সহিত থাইমাস্ ক্ষরণ বেশী হয় তবে আবেগের সাম্য থাকে না।

থাইরক্সিন্ কম ক্ষরিত হইলে গৌণ যৌন লক্ষণগুলির উপযুক্ত বিকাশ হয় না। এইরূপ অবস্থায় পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের বেশভূষা, হাবভাব প্রভৃতি অনুকরণ করে, তাহার আকৃতি ক্ষুদ্র হয়, মধ্য বয়সে স্থূলতা আসে, গায়ের রং ফ্যাকাশে, চুল শুষ্ক, দাঁত খারাপ এবং রক্ত চলাচল অনিয়মিত হয়। এই ব্যক্তির মনে মন্দতা, নির্বুদ্ধিতা, উদাসীনতা, জড়তা এবং অসামঞ্জস্য আসে।

উপরোক্ত প্রধান গ্যাণ্ডীয় ব্যক্তিত্বগুলি ছাড়া থাইমাস্ ও যৌনগ্রন্থি প্রভৃতির অত্যধিক বা অত্যল্প ক্রিয়া অনুসারেও বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হইয়া থাকে।

(ঘ) ক্রেশ্মার প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ

ক্রেশ্মার্ শরীরের গঠন অনুসারে ব্যক্তিত্বের কয়েকটি জাতিরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে মনের গঠনের দিক দিয়াও অনুরূপ ব্যক্তিত্বভেদ আছে।

ক্রেশ্মার্-এর **দৈহিক ব্যক্তিত্ব** চার শ্রেণীর : যথা অ্যাথ্লেটিক্, অ্যাস্থেনিক্, পিক্নিক্ এবং ডিস্প্ল্যাস্টিক্।

অ্যাথ্‌লেটিক্ ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তির দেহের গঠন মজবুত, পেশী দৃঢ়, বুক চওড়া, ঘাড় প্রশস্ত এবং হাত পা বড়। **অ্যাস্‌থেনিক্** ব্যক্তি সাধারণতঃ রোগা, লম্বা এবং তাহার বুক চাপা। **পিক্‌নিক্** ব্যক্তির মাথা, বুক, তলপেট প্রভৃতি গহ্বরগুলি বড়। তাহার মেদবাহুল্য থাকে। এই ব্যক্তি দেখিতে গোলগাল। তাহার মুখমণ্ডল কোমল ও প্রশস্ত এবং হাত পা ছোট, কিন্তু চওড়া। **ডিস্‌প্ল্যাস্‌টিক্** ব্যক্তির গৌণ যৌন লক্ষণগুলি অবিকশিত। এই ব্যক্তির দেহ অপরিণত এবং সামঞ্জস্যহীন।

মানসিক গঠন—অস্বভাবী মানস ব্যক্তিত্ব

মানসিক গঠনের দিক দিয়া ক্রেশ্‌মার অস্বভাবী ব্যক্তিত্বের দুইটি প্রকার-ভেদ দেখাইয়াছেন। প্রথমটি হইল **সাইক্লোথিমিক্ অথবা ম্যানিক্-ডিপ্রেসিভ্ অথবা খেদোন্মত্ত বাতুলতা।** এই প্রকার অস্বভাবী ব্যক্তিত্ব আবেগ অথবা প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। ইহাতে চরম আবেগ-গুলির পুনঃপুনঃ এবং দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। হঠাৎ উত্তেজনা, আবার পরক্ষণেই অবসাদ, অথবা হঠাৎ আনন্দ, আবার পরক্ষণেই নিরানন্দ প্রভৃতি চরম আবেগ এই ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাইক্লোথিমিক্ ব্যক্তিত্বের ঘন ঘন ভাব বিপর্যয় সত্ত্বেও বাস্তব জগতের সহিত সম্পর্ক স্বাভাবিকই থাকে।

দ্বিতীয় অস্বভাবী ব্যক্তিত্বটি হইল **সিজোফ্রেনিক্ বা চিত্তভ্রংশী বাতুলতা শ্রেণীর।** ইহাতে মানসিক ঐক্যসূত্র ছিন্ন হয়, ফলে একই ব্যক্তিত্ব যেন একাধিক হইয়া পড়ে। ইহাতে ব্যক্তি তাহার নিজ সত্তায় আবদ্ধ থাকে এবং বাস্তব জগতের সহিত সম্পর্ক হারাইয়া ফেলে।

স্বভাবী মানস ব্যক্তিত্ব

উল্লিখিত দুইটি অস্বভাবী মানস ব্যক্তিত্ব ছাড়াও ক্রেশ্‌মার আরও দুই প্রকার স্বভাবী মানস ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটি হইল **সাইক্লয়েড্** এবং দ্বিতীয়টি **সিজয়েড্** শ্রেণীর। ইহারা যথাক্রমে সাইক্লো-থিমিক্ এবং সিজোফ্রেনিক্ এই দুইটি অস্বভাবী ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক অবস্থা। য়্যুঙ্গ যে ব্যক্তিত্বকে ইন্‌ট্রোভার্ট এবং এক্সট্রোভার্ট বলিয়াছেন উহারাই যথাক্রমে সিজয়েড্ এবং সাইক্লয়েড ব্যক্তিত্ব।

সিজয়েড্ ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক, কল্পনাপ্রবণ, অসামাজিক, রুক্ষস্বভাব, সহানুভূতিহীন, মাথাপাগল এবং প্রায়ই বুদ্ধিমান হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সাইক্লয়েড্ ব্যক্তি সামাজিক, সৎপ্রকৃতি, কর্মঠ, ভাবপ্রবণ, উত্তেজনাপ্রবণ এবং চঞ্চল হয়। স্বাভাবিক লোকের মধ্যে এই দুইটি শ্রেণী পরিলক্ষিত হয়।

সাইক্লয়েড্ ব্যক্তিত্ব অস্বাভাবিক হইলে উহা সাইক্লোথিমিক্ ব্যক্তিত্বের আকার গ্রহণ করে। আবার সিজয়েড্ ব্যক্তিত্ব অস্বাভাবিক হইলে উহা সিজোফ্রনিক ব্যক্তিত্বের রূপ লয়।

(ঙ) শেল্ডন্ প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ

ডব্লু. এইচ. শেল্ডন্ এবং এস্. এস্. স্টিভেন্স্ মনুষ্য দেহের কয়েকটি শ্রেণীভেদ করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে বিভিন্ন শ্রেণীর দৈহিক গঠন অনুসারে মেজাজ বা মানসিক গঠনেরও শ্রেণীভেদ ঘটে।

(১) দৈহিক কোমলতা এবং সুঠামতার প্রাধান্যকে তাঁহারা বলিয়াছেন **এণ্ডোমর্ফি।** এণ্ডোমর্ফিক্ ব্যক্তির তলপেট মেদবহুল বা থল্থলে এবং হাড ও পেশী অপরিণত। মেজাজ ও মানসিক গঠন অনুসারে এণ্ডোমর্ফিক্ ব্যক্তি আবার ভিসেরোটনিক্। ভিসেরোটনিক্ ব্যক্তি বিশ্রাম এবং আরামপ্রিয়। সে ভালবাসা, সমর্থন, খাওয়া দাওয়া, বিপদে সাহায্য প্রভৃতি পাইতে চায়। এই ব্যক্তি অত্যন্ত মিশুক, সহিষ্ণু এবং প্রেমিক প্রকৃতির হইয়া থাকে। মনের আবেগ প্রকাশ করিতে ইহার দ্বিধা নাই।

(২) যে দেহ হাড় এবং পেশী-বহুল শেল্ডন্ তাহার নামকরণ করিয়াছেন **মেসোমর্ফিক্।** মেসোমর্ফিক্ দেহ মোটাও নয় আবার পাতলাও নয়, কিন্তু দোহারা। ইহা পেশী ও হাড়বহুল। মেজাজ বা মানসিক গঠনের দিক দিয়া মেসোমর্ফিক ব্যক্তি সোমাটোটনিক্। এই ব্যক্তি কর্মঠ, বেপরোয়া, প্রতিযোগিতা ও আক্রমণপ্রিয়। সে শক্তি জাহির করিতে ভালবাসে।

(৩) চর্ম ও স্নায়ুর প্রাধান্য অনুসারে ইঁহারা দেহের ভেদকে বলিয়াছেন **এক্টোমর্ফি।** এক্টোমর্ফিক্ দেহ দুর্বল এবং ক্ষীণ। মেজাজ বা মানসিক গঠনের দিক দিয়া এক্টোমর্ফিক ব্যক্তিগণ সেরিব্রোটনিক্। সেরিব্রোটনিক্ ব্যক্তিগণের ভঙ্গী এবং চলাফেরা সংযত ও আড়ষ্ট। ইহারা আবেগ চাপিয়া রাখে, লোকের সহিত মিশিতে ভয় পায়, কখন কি করিয়া বসিবে জানে না এবং দুঃখে পড়িলে নির্জনতা খোঁজে।

ক্রেশ্‌মার-এর পিক্‌নিক্‌, অ্যাথ্‌লেটিক্‌ এবং অ্যাস্‌থেনিক্‌ দেহভেদের সহিত শেল্‌ডন্‌-এর এণ্ডোমর্ফিক্‌, মেসোমর্ফিক্‌ এবং একটোমর্ফিক্‌ ভেদের ক্রমিক সঙ্গতি আছে।

(চ) ব্যক্তিত্বের দার্শনিক জাতিরূপ

জীবনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে **ই. স্প্র্যাঙ্গার** ব্যক্তিত্বের নিম্নোক্ত শ্রেণীভেদ করিয়াছেন :

(১) তাত্ত্বিক (থিওরিটিক্যাল) ব্যক্তিত্ব মননশীল গবেষণা এবং সত্যানুসন্ধানে উৎসুক। এই ব্যক্তিত্ব দর্শন ও বিজ্ঞানে নিয়োজিত হয়।

(২) অর্থনীতিক (ইকনমিক্‌) ব্যক্তিত্ব বস্তুতান্ত্রিক হইয়া থাকে।

(৩) সৌন্দর্যপ্রিয় (ইস্‌থেটিক্‌) ব্যক্তিত্ব জীবনকে আনন্দময় ও সুন্দর করিয়া গড়িতে চায়।

(৪) সামাজিক (সোশ্যাল) ব্যক্তিত্ব মানব প্রেমিক হয়।

(৫) রাষ্ট্রনীতিক (পলিটিক্যাল্‌) ব্যক্তিত্ব ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া থাকে।

(৬) ধার্মিক (রিলিজিয়াস্‌) ব্যক্তিত্ব পরম শক্তির সাহায্যে জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে চায়।

(ছ) ই. আর. যেনেশ্‌-এর জাতিরূপ

উপরোক্ত জাতিরূপগুলি ছাড়াও ব্যক্তিত্বের আরও অনেক প্রকার জাতিরূপ আছে। আইডেটিক্‌ প্রতিরূপের[১] তারতম্য অনুসারে ই. আর. যেনেশ্‌ ব্যক্তিত্বকে বিভক্ত করিয়াছেন টি-টাইপ অথবা টিটানয়েড্‌ এবং বি-টাইপ বা বেজ্‌ডউঅয়েড্‌ এই দুই শ্রেণীতে। প্রথম জাতিরূপটিতে অনুবেদনের (আফ্‌টার-সেন্‌সেশন্‌) সহিত আসল দর্শন প্রতিরূপের সাদৃশ্য থাকে। দ্বিতীয়টিতে অনুবেদন স্মৃতি-প্রতিরূপের (মেমরি ইমেজ্‌) প্রায় অনুরূপ হয়। দ্বিতীয়টির সহিত শিল্পীর মনোভাব, থাইরয়েড্‌ গ্রন্থির বৃদ্ধি, মানসিক উদ্দীপকের ফলে তীব্র প্রতিক্রিয়া, বিশেষতঃ সমবেদী স্নায়ুতন্ত্রে, পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটিতে মানসিক উদ্দীপক অপেক্ষা সাধারণ পারিবেশিক উদ্দীপকই সমধিক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে।

[১] ষড়বিংশ পরিচ্ছেদের তৃতীয় অনুচ্ছেদে আইডেটিক্‌ প্রতিরূপের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত দুইটি বিশুদ্ধ জাতিরূপের অতিরিক্ত কয়েকটি মিশ্রিত জাতিরূপও যেনেশ্ স্বীকার করিয়াছেন—বিটি, টিবি, টিই, বি-এইচ্ প্রভৃতি। ব্যক্তিত্বের এই জাতিরূপ বিভাগটি জটিল। সুতরাং ইহা উল্লিখিত হইল মাত্র।

(জ) ফ্রয়েড্-প্রবর্তিত জাতিরূপ

শিশুর মানস-যৌন (সাইকো-সেক্সুয়্যাল্) বিকাশের স্তরভেদগুলি ফ্রয়েড্-এর মতে এই :—

সর্বপ্রথম শিশু সুখ অনুভব করে স্তন্যপানে—মুখের উদ্দীপনা হইতে। এইটি শিশুর মানস-যৌন বিকাশের **মুখ-কাম** (ওরাল-এরোটিক্) **স্তর**। এই মুখ-কাম অবস্থাটি প্রথমে থাকে **নিষ্ক্রিয়** (প্যাসিভ্), কারণ ইহাতে শিশু ভোগ্যবস্তুকে তাহার মুখে রাখিয়া দিতে চায়। এই অবস্থায় শিশুর জীবন অনেকটা পরগাছার মত—সে নিষ্ক্রিয়, নির্ভরশীল এবং আশাদীপ্ত থাকে।

মানস-যৌন বিকাশের পরবর্তী অবস্থায় শিশুর নিষ্ক্রিয় মুখ-কামিতা **সক্রিয়** হইয়া উঠে। এই সক্রিয় মুখ-কাম অবস্থাকে ফ্রয়েড্ বলিয়াছেন ধর্ষকাম **(স্যাডিস্টিক্)** মুখ-কাম স্তর। এই অবস্থায় শিশুর আক্রমণাত্মক ভাব প্রকাশ পায়—যেমন স্তনবৃন্ত শুধু মুখে পুরিয়া না রাখিয়া সে হয়ত উহা কামড়াইয়া দেয় এবং মাতার প্রতি হিংসা বা বিদ্রূপাত্মক মনোভাব ও নৈরাশ্য পোষণ করে।

শিশুর মানস-যৌন বিকাশের পরবর্তী স্তর হইল **পায়ু-কাম** (এনাল্-এরোটিক্) স্তর। এই স্তরে সুখের কেন্দ্র মুখ হইতে পায়ুতে বা গুহ্যে সরিয়া যায়। এই স্তরেরও দুইটি অবস্থা আছে। কিন্তু এইস্থলে প্রথমটি সক্রিয় বা **ধর্ষকাম** এবং পরবর্তীটি **নিষ্ক্রিয়** (প্যাসিভ্)। প্রথমটিতে মলত্যাগে গুহ্যের সঙ্কোচন, প্রসারণ প্রভৃতি ক্রিয়া হইতে শিশুর সুখ জন্মে এবং দ্বিতীয়টিতে গুহ্য এবং মলই তাহার পক্ষে সুখজনক হইয়া দাঁড়ায়। মনের দিক দিয়া শিশু এই সময়ে বেয়াড়া, একগুঁয়ে, অভিমানী এবং সুবিধাবাদী হয়।

শিশুর মানস-যৌন বিকাশের তৃতীয় স্তর হইল **উপস্থ-কাম** (জেনিট্যাল্ এরোটিক্) স্তর। ইহার প্রথম এবং দ্বিতীয় অবস্থার নাম যথাক্রমে **ফ্যালিক্ এবং জেনিট্যাল্**। প্রথমটি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট এবং অগঠিত। ইহাতে শিশু এই ধারণা পোষণ করে যে তাহার মত সকলেরই যৌন লিঙ্গ আছে। দ্বিতীয়টি মানস-যৌন বিকাশের স্বাভাবিক অবস্থা। ইহাতে লিঙ্গই যৌন-সুখের

কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। এই স্তরে শিশু সৃজনশীল, প্রতিযোজনশীল, নির্ভরযোগ্য এবং সহযোগিতাভাব-সম্পন্ন হইয়া উঠে।

উপরোক্ত স্তরগুলি শিশুর মানস-যৌন বিকাশের অবস্থা হইলেও, উহাদের সহিত শিশুর বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। এই দিক হইতে বিচার করিলে ব্যাপক অর্থে ইহাদিগকে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপও বলা যাইতে পারে।

(ঝ) এরিক্ ফ্রোম্ প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ

এরিক্ ফ্রোম্ ব্যক্তিত্বের পাঁচটি শ্রেণীভেদ করিয়াছেন—যথা গ্রহণক্ষম (রিসেপ্টিভ্), আদায়ক্ষম (এক্সপ্লয়টেটিভ্), সঞ্চয়ক্ষম (হোর্ডিং), বিনিময়ক্ষম (মার্কেটিং) এবং সৃজনক্ষম (ক্রিয়েটিভ্)। এই শ্রেণীগুলির সহিত যথাক্রমে ফ্রয়েড্-এর নিষ্ক্রিয় মুখকাম, ধর্ষ-মুখ-কাম, নিষ্ক্রিয় পায়ু-কাম, ধর্ষ-পায়ু-কাম্ এবং উপস্থকাম স্তরগুলির সঙ্গতি রহিয়াছে।

ব্যক্তিত্বের অন্যান্য জাতিরূপ

ব্যক্তিত্বের আরও নানাপ্রকার জাতিরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন **ফ্রয়েড্-এর একটি শ্রেণীভেদ** প্রসিদ্ধ—যথা কামীয় (এরোটিক্), আবেশজ (অব্সেসন্যাল) এবং স্বঃতকাম (নার্সিসিস্টিক্)। **বল্ডুইন্** ব্যক্তিত্বের ভেদ করিয়াছেন সংবেদনজ (সেন্সুরি) এবং গতিজ বা চেষ্টীয় (মোটর) শ্রেণীদ্বয়ে। **র্যাঙ্ক্** সাধারণ (অ্যাভারেজ্), অপরাধী (ক্রিমিন্যাল্), শিল্পীয় (আর্টিস্টিক্) এবং স্নায়বিক (নিউরটিক্) এই চার শ্রেণীতে ব্যক্তিত্বকে বিভক্ত করিয়াছেন। রোসানফ্ ব্যক্তিত্বের ভেদ করিয়াছেন অসামাজিক (অ্যান্টি-সোস্যাল্), সাইক্লোথিমিক, শিল্পীয় (আর্টিস্টিক্) এবং মৃগীয় (এপিলেপ্টিক্) —এই চার শ্রেণীতে।

বাহুল্য বোধে এইগুলির ব্যাখ্যা করা হইল না।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

উড্ওয়ার্থ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস্—সাইকলজি—চতুর্থ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ
বোরিং, ল্যাংফেল্ড, ওয়েল্ড—ফাউণ্ডেশনস্ অফ্ সাইকলজি—একবিংশ, দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ
জি. ডি. বোয়াজ্—জেনার‍্যাল্ সাইকলজি—একাদশ পরিচ্ছেদ
সি. টি. মর্গ্যান—ইন্ট্রডাক্শন্ টু সাইকলজি—নবম পরিচ্ছেদ

এন্. এল্. মান্—সাইকলজি—সপ্তম পরিচ্ছেদ
জি. মার্ফি—জেনারাল্ সাইকলজি—ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ
জে. ই. নিকোল্—সাইকপ্যাথলজি—নবম, ত্রয়োদশ, দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

Exercise

1. What do you mean by personality? Distinguish between the philosophical and the psychological approach to the problem of personality. (pp. 221-224)
2. Define personality. How does Woodworth define it? (pp. 222-224)
3. Give the behaviouristic explanation of personality. (pp. 223-224)
4. What seems to you to be the best definition of personality, and why? (pp. 222-224)
5. Analyse the factors of personality (pp. 225-234)
6. Explain the chemistry of personality, or what role do the glands play in the genesis of personality? (pp. 226-227)
7. What role does society play in the development of personality? (pp. 228-232)
8. How does birth-order of the child determine his personality, according to Adler? Discuss. (pp.229-233)
9. Explain Freud's view of the child's personality as it develops in relation to the parents. (pp. 230-231)
10. Explain the intreaction of heredity environment in the genesis of personality. (pp. 233-234)
11. Classify the main types of personality. (pp. 234-243)
12. Explain the endocrine types of personality. (pp. 237-238)
13. Classify the main types of personality according to C. G. Jung. (pp. 235-237)
14. Write notes on the following classifications of personality types :—
    (*a*) Athletic, asthenic, picnic, dysplastic (pp. 238-239)
    (*b*) Cyclothemic & schizophrenic (p 239)
    (*c*) Cycloid and schizoid (239-240)
    (*d*) Endomorphic, ectomorphic and mesomorphic (pp. 240-241)
    (*e*) Philosophical. (p. 241)

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ এবং পরিমাপ

ট্রেইট্স্ অ্যাণ্ড মেজারমেণ্ট্স্ অফ্ পার্স্ন্যালিটি

১। ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ—ট্রেইট্স্ অফ্ পার্স্ন্যালিটি

পূর্ব পরিচ্ছেদে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা, ইহার আংশিক কারণ এবং জাতিরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ, পরিমাপ এবং একান্তরতা আলোচিত হইতেছে।

ব্যক্তিত্বের **প্রলক্ষণ বা ট্রেইট্** বলিতে বুঝায় এমন কতগুলি চিন্তা অনুভূতি এবং ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য যাহার সাহায্যে একটি ব্যক্তিত্বকে অন্য ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক্ করিয়া দেখানো যায়। চলিত ভাষায় এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশেষণরূপে প্রকাশ করা হয়, যেমন আশাবাদী, নৈরাশ্যবাদী, আয়াসী, পরিশ্রমী, বিষণ্ণ, প্রফুল্ল, উদার, সঙ্কীর্ণ প্রভৃতি। চলিত ভাষায় এই বিশেষণের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার বা তাহারও অধিক। সহজ ভাষায়, ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ বলিতে বুঝায় উহার এমন **বিশেষ গুণ** বা ধর্ম যাহা থাকিবার ফলে উহা অন্য ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক বলিয়া জ্ঞাত হয়।

কিন্তু কোনো বিজ্ঞানের পক্ষেই ব্যক্তিত্বের এই অসংখ্য ও অনির্দিষ্ট গুণ-গুলির একটি একটি করিয়া বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইতে পারে না। এই কারণে অ্যাল্পোর্ট, ক্যাটেল্, আইসেঙ্ক্ প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব-মনোবিদেরা ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে এই অসংখ্য প্রলক্ষণগুলি স্বতন্ত্র বা পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, কিন্তু ইহাদের কয়েকটি এক একটি শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা প্রলক্ষণগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য সূত্র দেখিতে পাইয়াছেন এবং লক্ষ্য করিয়াছেন যে ইহাদের সবগুলিই সমান স্থায়ী নয়।

যেমন আশাবাদী—নৈরাশ্যবাদী, আয়াসী—পরিশ্রমী, সহিষ্ণু—অসহিষ্ণু প্রভৃতি লক্ষণগুলি জোড়াবদ্ধ। অধিকন্তু, ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণগুলি গড় সম্ভাবনা রেখাচিত্র (নর্ম্যাল্ প্রব্যাবিলিটি কার্ভ্) অনুসারে জনসংখ্যায় বণ্টিত হয়। কোনো জনসংখ্যায় বেশীর ভাগ লোকই জোড়াবদ্ধ গুণদ্বয়ের দুই চরম প্রান্তে না পড়িয়া পড়ে এই দুই প্রান্তের কোনো মধ্যবর্তী বা কেন্দ্রীয় স্থানে। যেমন

বেশীর ভাগ লোকই চূড়ান্তভাবে আশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী হয় না, কিন্তু আশা-নিরাশার মধ্যে দোলায়মান থাকে। অর্থাৎ, ইহারা অবস্থাবিশেষে যেমন আশাবাদী তেমন নৈরাশ্যবাদীও বটে। আবার বেশীর ভাগ লোকই চূড়ান্ত-ভাবে বিষণ্ণ বা প্রফুল্ল হয় না, কিন্তু এই দুই চরম প্রান্তের মধ্যবর্তী—অর্থাৎ অবস্থাবিশেষে বিষণ্ণ এবং অবস্থাবিশেষে প্রফুল্ল—হইয়া থাকে।

ক্যাটেল্-প্রদর্শিত ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণ

ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের সামঞ্জস্য দেখাইতে গিয়া ক্যাটেল্ **বাহিরের (সারফেস্)** এবং **ভিতরের (সোর্স)** প্রলক্ষণের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত প্রলক্ষণগুলি ব্যক্তির ব্যবহার বা আচরণে সোজা-সুজিভাবে দেখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রলক্ষণগুলি ব্যক্তির অন্তস্তলে থাকে। ইহারা সোজাসুজিভাবে আচরণে প্রকাশিত হয় না, কিন্তু ভিতরে থাকিয়া ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রথম লক্ষণগুলির মধ্যে প্রায়ই সামঞ্জস্য বা স্থায়িত্ব থাকে না, অর্থাৎ উহারা প্রায়ই অসংবদ্ধভাবে প্রকাশিত হয় এবং কখনও প্রকাশিত হয়, কখনও বা হয় না। যেমন আত্মবিশ্বাস ব্যক্তির একটি গভীর বা কেন্দ্রীয় গুণ যাহা চট্ করিয়া তাহার চালচলনে দেখা যায় না, অথচ যাহার উপর তাহার হাবভাব এবং চালচলন নির্ভর করে। এই ব্যক্তির ভিতর যে আত্মবিশ্বাস আছে তাহা তাহার কাজে একনিষ্ঠতা, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা প্রভৃতি বাহিরের গুণাবলীতে প্রকাশিত হয়।

ক্যাটেল্ ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের যে তালিকা দিয়াছেন তাহা এইরূপ। প্রধান বাহিরের গুণগুলি (সারফেস্ ট্রেইট্স্) তাঁহার মতে কুড়ি শ্রেণীর এবং প্রধান ভিতরের গুণগুলি (সোর্স ট্রেইট্স্) বারো শ্রেণীর।

প্রধান বাহ্যগুণ (মেইন্ সারফেস্ ট্রেইট্স্)

প্রধান বাহ্যগুণ	বিপরীত
১। চরিত্রের চমৎকারিতা	নৈতিক ত্রুটি, লাগিয়া না থাকা
(ক) সততা, পরার্থতা	অসাধুতা, নির্ভরযোগ্যতা
(খ) একনিষ্ঠ চেষ্টা	কর্মত্যাগ, অসঙ্গতি
২। বাস্তববাদ, আবেগের গঠন	স্নায়বিক দৌর্বল্য, এড়াইয়া যাওয়া, ছেলেমানুষী
(ক) বাস্তববাদ, স্থায়িতা	” ” পরিবর্তনশীলতা

প্রধান বাহ্যগুণ	বিপরীত
(খ) ব্যবহারিকতা, সঙ্কল্প	জাগর স্বপ্ন, এড়াইয়া যাইবার ভাব
(গ) স্নায়বিক দৌর্বল্য, আত্ম-প্রবঞ্চনা, অসংযত আবেগ	ইহাদের বিপরীত
(ঘ) ছেলেমানুষী, আদায়-কারিতা, আত্মকেন্দ্রিকতা	পরিণত আবেগ, ব্যর্থতাসহন
৩। সাম্যভাব, সরলতা, আশাবাদ	বিষাদ, অস্থিরতা
(ক) শান্তভাব, সামাজিক আকর্ষণ	অস্থিরতা, বিষণ্ণতা, একগুঁয়েমী
(খ) সাম্যভাব, সরলতা, খেলোয়াড়ীভাব	নৈরাশ্যবাদ, গোপনীয়তা, বাড়াবাড়ি
৪। বুদ্ধি, শিক্ষিত মন, স্বাতন্ত্র্য	বোকামী, নির্ভরযোগ্যতা, চিন্তা না করা
(ক) আবেগের পরিণতি, পরিষ্কার মন	ছেলেমানুষী, নির্ভরশীলতা
(খ) ভদ্রতা, শিষ্টতা, চিন্তাশীলতা	বহির্বৃততা, বোকামি, সঙ্কল্পের অভাব
(গ) সৃজনশীলতা, স্থিরসঙ্কল্প, বুদ্ধি	সঙ্কীর্ণ আকর্ষণ, অস্পষ্টতা
(ঘ) বুদ্ধি, প্রবেশ, সাধারণ ক্ষমতা	সাধারণ ক্ষমতার অভাব
৫। অহঙ্কার, আত্মপ্রচার, গোঁড়ামী	নম্রতা, আত্মবিলোপ, উপযোজন ক্ষমতা
৬। সাহস, স্বাতন্ত্র্য, কঠোরতা	ভীরুতা, বাধ, বেদনশীলতা
৭। সামাজিকতা	ভীরুতা, বিরোধিতা, বিষণ্ণতা
৮। সাধারণ আবেগশীলতা, চড়া মেজাজ, অসমতা	সাম্যভাব, বিবেচকতা, গোপনীয়তা।

উল্লিখিত কুড়িটি বাহিরের ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণ ছাড়াও ক্যাটেল্ বারোটি মুখ্য মূল লক্ষণ (সোর্স ট্রেইট্স্) প্রদর্শন করিয়াছেন।

	মুখ্য মূল লক্ষণ	বিপরীত
১।	সহজগতি, প্রফুল্ল, সহৃদয়, সদয়	অনমনীয়, উদাসীন, ভীরু, বিরোধী, লাজুক
২।	বুদ্ধিমান, স্বতন্ত্র, স্থির	বোকা, চিন্তাশীল নয়, চপল
৩।	স্থির আবেগ, বাস্তববাদী, দৃঢ়	স্নায়বিক দুর্বলতা, এড়াইয়া যাওয়া, চঞ্চল আবেগ
৪।	প্রাধান্যপ্রিয়, উন্নতিশীল, আত্মপ্রচারক	অনুগত, আত্মবিলোপশীল
৫।	সাম্যভাববিশিষ্ট, প্রফুল্ল, সামাজিক, বাচাল	বিষণ্ণ, অবসন্ন, নির্জনতাপ্রিয়, অস্থির
৬।	বেদনশীল, কোমল, সহানুভূতিশীল	কঠিন, স্থির, সরল, আবেগহীন
৭।	শিক্ষিত ও শিষ্টমন, সৌন্দর্যপ্রিয়	অভদ্র, অশিষ্ট
৮।	বিবেকী, দায়িত্বশীল, কষ্টসহিষ্ণু	আবেগপূর্ণ, নির্ভরতা, উত্তেজিত, দায়িত্বহীন
৯।	সাহসী, নিরুদ্বেগ, সদয়	ব্যাহত, গোপনশীল, সাবধান, আত্মমগ্ন
১০।	তেজোদৃপ্ত, উৎসাহী, স্থির, দ্রুত	অলস, শিথিল, জাগর স্বপ্নচারী
১১।	অত্যন্ত আবেগশীল, চড়া-মেজাজ, উত্তেজনা প্রবণ	শ্লেষ্মাপ্রবণ, সহিষ্ণু
১২।	সহৃদয়, বিশ্বাসকারী	সন্দেহপূর্ণ, বিরোধী।

উপরে বলা হইয়াছে যে পরস্পরবিরোধী গুণ সাহায্যে ব্যক্তিত্বের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য হয় না, কারণ জনসংখ্যার অধিকাংশ লোকই উহাদের মধ্যবর্তী গুণবিশিষ্ট হয়। কোনো ব্যক্তিতে একটি গুণ সম্পূর্ণই থাকিবে অথবা একেবারেই থাকিবে না—যেমন কোনো ব্যক্তি সর্বদা প্রফুল্ল অথবা সর্বদা বিষণ্ণ থাকিবে—এমন নয়। সুখী এবং দুঃখিত এই দুই বিপরীত মনোভাবের মধ্যবর্তী অসংখ্য কম বেশী সুখী বা দুঃখিত মনোভাব থাকিতে পারে। ধরা যাউক, যে সুখী ও দুঃখিত এই দুইটি গুণকে একই সরল রেখায় বাম ও দক্ষিণ, এই দুই বিপরীত প্রান্তে বসানো হইল। এইবার বামপ্রান্তের সুখী অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণপ্রান্তীয় দুঃখী অবস্থায় ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিলে সুখ কমিতে থাকে এবং সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ মধ্য বা কেন্দ্রীয় বিন্দু

অতিক্রম করিবার পর দুঃখের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চরমে পৌছায়। আবার দক্ষিণ প্রান্তের দুঃখী অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বামপ্রান্তীয় সুখী অবস্থায় ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিলে দুঃখ কমিতে থাকে এবং সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ মধ্য বা কেন্দ্রীয় বিন্দু অতিক্রম করিবার পর সুখের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চরমে পৌছায়।
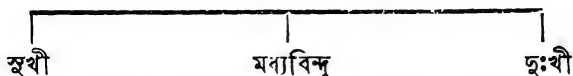
এইবার দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সুখী বা দুঃখী ইহা নির্ণয় করিতে হইলে আমরা উহাদিগকে সুখী এবং দুঃখী, এই চরম সীমায় না বসাইয়া তাহাদের মধ্যে এই দুইটি গুণের অল্পাধিক্য অনুসারে তাহাদিগকে এই সরল রেখার যে কোনো স্থানে বসাইতে পারি। যে ব্যক্তিটি বেশী সুখী তাহাকে বামে এবং যে কম সুখী তাহাকে দক্ষিণে বসাইয়া একই গুণের দিক দিয়া উহাদের বর্ণনা কবিতে পারি।

২। ব্যক্তিত্বের মাত্রা
(ডাইমেন্‌সনস্‌ অফ্‌ পার্সন্যালিটি)

উপরোক্ত ভাবে বিরোধী দুইটি গুণকে ব্যক্তিত্বের ডাইমেনসন্‌স্‌ অথবা মাত্রা বলে। ব্যক্তিত্ব কিরূপ তাহা বুঝাইতে হইলে উহা বিশেষণ দিয়া বুঝাইতে হয়—যেমন উদার, সঙ্কীর্ণ, প্রফুল্ল, বিষণ্ণ প্রভৃতি। ব্যক্তিত্ব বর্ণনায় দুইটি বিপরীত গুণাত্মক মাত্রার পরিমাণ অনুসারে উহাকে উপরোক্ত প্রকারের একটি কল্পিত সরলরেখার কোনো চিহ্নিত স্থানে বসাইতে হয়। এই সরলরেখাটিকে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের **অংশিত মানক** (গ্র্যাজুয়েটেড্‌ স্কেল্‌) বলা যায়। ইহাতে একটি মাত্রা বা ডাইমেন্‌সন্‌-এর একটি প্রলক্ষণ উচ্চতম পরিমাণ হইতে আরম্ভ হয়, ক্রমশঃ কমিতে থাকে। এইরূপে প্রলক্ষণটি ঐ অংশিত মানকের মধ্যবিন্দু অতিক্রম করিয়া বিপরীত প্রলক্ষণে রূপান্তরিত হয়। আবার বিপরীত প্রলক্ষণটি ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে শেষ প্রান্তে চরম সীমায় পৌছায়।

ধরা যাউক যে অভীক্ষিত জনসংখ্যার মধ্যে রামই সর্বাপেক্ষা প্রফুল্ল প্রকৃতির, যদু রাম অপেক্ষা কম, হরি যদু অপেক্ষাও কম প্রফুল্ল। রাম, যদু এবং হরির উপরোক্ত ক্রমিক প্রলক্ষণ-ভেদ বুঝাইতে হইলে রামকে বসাইতে

হইবে প্রফুল্ল-বিষণ্ণ মাত্রার এই অংশিত মানকের বাম প্রান্তে, যদুকে ঠিক রামের পরেই এবং হরিকে ঠিক যদুর পরেই—এইরূপ ক্রমে।

তাহা হইলে ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ বা মাত্রা বর্ণনায় ব্যক্তিকে ঐ মাত্রার অংশিত মানকে ফেলিয়া বর্ণনা করিতে হয়। সাধারণ স্কেল্ বা মানকে যেমন সেণ্টিমিটার বা ইঞ্চির পরিমাণ চিহ্নিত থাকে, প্রলক্ষণ বা মাত্রা পরিমাপেব মানককেও ঐ গুণের পরিমাণ অনুসারে চিহ্নিত করা হয়।

প্রলক্ষণ ও মাত্রা

উপরের আলোচনায় মনে হইতে পারে যে প্রলক্ষণ এবং মাত্রার মধ্যে কোনো ভেদ বা পার্থক্য নাই। প্রলক্ষণ বলিতে ব্যক্তিত্বের গুণ বুঝায়। প্রত্যেকটি গুণ উহার বিপরীত গুণের সহিত জড়িত থাকে এবং উহারা দুইটি মিলিত হইয়া এক একটি একক গঠন করে। দুইটি বিপরীত গুণের একককেই সাধারণতঃ মাত্রা বলা হইয়া থাকে। আবার কোনো গুণই উহার বিপরীত গুণটিকে বাদ দিয়া সার্থক হইতে পারে না। এই দিক দিয়া দেখিলে দুইটি বিপরীত গুণের একককে প্রলক্ষণ বা ট্রেইট্ বলা হয়।

অধিকাংশ মনোবিদ্ মাত্রা এবং প্রলক্ষণের মধ্যে ভেদ করেন নাই। কিন্তু কেহ কেহ, যেমন আইসেঙ্ক্ উহাদের ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

আইসেঙ্ক্-এর ব্যক্তিত্ব-মাত্রা

আইসেঙ্ক্-এর মতে ব্যক্তিত্বের **মাত্রা হইল উহার গঠনে প্রলক্ষণগুলির উন্নত শৃঙ্খলা বা সংগঠন।** তিনি মনে করেন যে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপের সহিত উহার মাত্রার কোনো বিরোধ নাই।

আইসেঙ্ক্-এর মতে ব্যক্তিত্ব তিনটি মৌলিক মাত্রা লইয়া গঠিত। যথা (১) অন্তর্বৃত-বহির্বৃত (ইন্‌ট্রোভার্সন্—এক্সট্রোভার্সন্), (২) স্নায়বিকতা (নিউরটিসিজ্‌ম্) এবং (৩) বাতুলতা (সাইকটিসিজ্‌ম্)। সকল ব্যক্তিত্বেই এই তিনটি মাত্রা কম বেশী পরিমাণে বর্তমান থাকে। কাজেই স্বভাবী এবং অস্বভাবী ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনো প্রকারগত বা জাতিগত পার্থক্য নাই। উহাদের পার্থক্য পরিমাণগত।

এই সাধারণ মাত্রা তিনটি ছাড়াও ব্যক্তিত্বের বিশেষ বিশেষ মাত্রা থাকিতে পারে, যেমন সরলতা—কুটিলতা, কঠোরচিত্ততা—কোমলচিত্ততা এবং রক্ষণশীলতা—প্রগতিশীলতা প্রভৃতি।

৩। ব্যক্তিত্বের মাপনা
মেজারমেণ্ট্ অফ্ পার্স্ন্যালিটি

(১) মূল্য-মানক পদ্ধতি—রেটিং স্কেল্ টেস্ট্

ব্যক্তিত্ব মাপনার অনেকগুলি পদ্ধতি আছে। মাত্রা বা প্রলক্ষণের অংশিত মানক (গ্র্যাজুয়েটেড্ স্কেল্) সাহায্যে ব্যক্তিত্ব মাপনার কথা পুর্ব দুইটি অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। এই অংশিত মানককে ব্যক্তিত্বের মূল্যমানক (রেটিং স্কেল্) বলা হইয়া থাকে। যেমন কতগুলি ব্যক্তিত্বকে আয়াসী—পরিশ্রমী মাত্রা অনুসারে মাপনা করিতে হইলে এই মাত্রামানকে চিহ্নিত বিভিন্ন পরিমাণে মাপনা করা যাইতে পারে।

	চরম আয়াসী	বেশ আয়াসী	মোটের উপর আয়াসী	মাঝামাঝি অর্থাৎ আয়াসীও নয় পরিশ্রমীও নয়	মোটের উপর পরিশ্রমী	বেশ পরিশ্রমী	চরম পরিশ্রমী
রাম	-----	------	------	×	------	------	------
শ্যাম	-----	×	------	------	------	------	------
যদু	×	------	------	------	------	------	------
মধু	-----	------	------	×	------	------	------
হরি	-----	------	------	------	------	------	×
রবি	-----	------	×	------	------	------	------
শশী	-----	------	------	------	×	------	------
তারা	-----	------	------	------	------	×	------

উপরের মূল্যমানকে সাতটি বিন্দু বা চিহ্ন আছে। কিন্তু গুণের পরিমাণ পার্থক্য অনুসারে মানকে তিনটি, পাঁচটি, এমন কি সাতটি অপেক্ষা বেশী চিহ্ন বা বিন্দুও থাকিতে পারে। রাম, শ্যাম প্রভৃতি আটজন ব্যক্তির অভীক্ষায়

দেখা যাইতেছে যে উহাদের মধ্যে দুইজন আয়াসী-পরিশ্রমী মাত্রার মধ্য-বিন্দুতে এবং এক একজন করিয়া প্রত্যেকটি বিন্দুতে স্থান পাইয়াছে।

(২) কারণ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি—ফ্যাক্টর্ অ্যানালিসিস্

ব্যক্তিত্ব মাপনার আর একটি পদ্ধতি হইল ব্যক্তিত্বের **কারণ বিশ্লেষণ (ফ্যাক্টর্ অ্যানালিসিস্)।** ব্যক্তিত্বের অভীক্ষায় যে ফলগুলি পাওয়া যায় পরিসংখ্যান (স্ট্যাটিস্টিক্স্) সাহায্যে তাহার বিশ্লেষণ করাই এই পদ্ধতির কাজ। ব্যক্তিত্বের একটি কারণ বা গুণের সহিত অপরটির পারস্পর্য (কোরিলেশন্) করিয়া উহাদের সদর্থক (পজিটিভ্) অথবা নঞর্থক (নেগেটিভ্) সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। যেমন, যে ব্যক্তি উদার সে স্বভাবতঃ সহিষ্ণু হইবে, অর্থাৎ উদারতা এবং সহিষ্ণুতার সহিত সদর্থক পারস্পর্য বা পজিটিভ্ কোরিলেশন আছে। আবার যে ব্যক্তি উদার সে সাধারণতঃ অসহিষ্ণু হয় না, অর্থাৎ উদারতা এবং অসহিষ্ণুতার সহিত নঞর্থক পারস্পর্য বা নেগেটিভ্ কোরিলেশন্ আছে। প্রথম প্রকারের পারস্পর্যকে যোগচিহ্ন (+) এবং দ্বিতীয় প্রকারের পারস্পর্যকে বিয়োগ চিহ্ন (−) দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

(৩) পেন্সিল-কাগজ সাহায্যে ব্যক্তিত্বের মাপনা—পেন্‌সিল অ্যাণ্ড্ পেপার টেস্ট্

একটি পেন্সিল ও কাগজের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের সহজ মাপনা করা যাইতে পারে।

(ক) প্রশ্নাবলী (কোয়েশ্চেনেয়ার)—একই সঙ্গে অনেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার জন্য উহাদিগকে কাগজে ছাপানো প্রশ্নাবলী দেওয়া হয়। প্রত্যেক প্রশ্নের পাশে 'হাঁ' বা 'না' লেখা থাকে। পরীক্ষণ পাত্র পেন্সিল দিয়া এই দুইটি উত্তরের একটি কাটিয়া অপরটি রাখে। প্রশ্নগুলি এমন ভাবে নির্বাচিত হয় যে উহাদের 'হাঁ' বা 'না' উত্তর হইতে ব্যক্তিত্বের নির্দেশ বা সূচনা পাওয়া যাইতে পারে। যেমন :—

আপনার কি সব কাজই তাড়াতাড়ি করিবার অভ্যাস? হাঁ—না
আপনি কি যথাসময়ে কর্মস্থলে পৌঁছান? হাঁ—না
আপনার কি মনে হয় যে সময় কোথা দিয়া চলিয়া যাইতেছে? হাঁ—না

আপনার কি স্থনিদ্রা হয় ? হাঁ—না
আপনার কি সর্বদা ক্লান্তি বোধ হয় ? হাঁ—না
আপনি কি গোলমাল সহ্য করিতে পারেন ? হাঁ—না
আপনার কি একা থাকিতে ভাল লাগে ? হাঁ—না
আপনি কি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন ? হাঁ—না

এই প্রশ্নাবলীর উত্তরে হাঁ বা না লিখিলে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ সম্বন্ধে ধারণা হইতে পারে। যেমন স্নায়বিক বা নিউরটিক ব্যক্তি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ' এবং চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম প্রশ্নের উত্তরে 'না' লিখিবে। পক্ষান্তরে সুস্থ স্নায়ুবিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রশ্নগুলির উত্তরে বিপরীত ভাবে 'না' এবং 'হাঁ' লিখিবে।

কিন্তু প্রশ্নাবলী পদ্ধতির দোষ এই যে ইহাতে 'হাঁ' এবং 'না' এর মধ্যবর্তী উত্তর দেওয়া যায় না, অথচ অধিকাংশ ব্যক্তিরই মধ্যবর্তী উত্তর দেওয়া স্বাভাবিক।

প্রশ্নাবলী নানাভাবে নির্বাচিত হইয়াছে। ফলে প্রশ্নাবলী পদ্ধতির প্রকারভেদের অন্ত নাই। যেমন মিনেসোটা মাল্‌টিফেজিক পার্সন্যালিটি ইন্‌ভেণ্টরি ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন গুণ নির্ণয়ের জন্য নির্মিত হইয়াছে। এই প্রশ্নাবলী সাহায্যে স্বভাবী এবং অস্বভাবী এই উভয় ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা করা হয়। আবার অ্যাল্‌পোর্ট-ভের্‌নন্‌ মানক সাহায্যে ব্যক্তিত্বের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনীতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সৌন্দর্য সম্বন্ধীয় মূল্যবোধ বা ভ্যালুগুলির মাপনা চেষ্টা করা হইয়াছে। অধিকন্তু ক্যাটেল্‌-লুবরস্কি পরীক্ষায় প্রশ্নাবলী সাহায্যে ব্যক্তির রসবোধ যাচাই করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব মাপনার চেষ্টা করা হয়।

(খ) পরিস্থিতিমূলক পরীক্ষা—সিচুয়েশন্যাল্‌ টেস্ট্‌

প্রশ্নাবলীর 'হাঁ' বা 'না' উত্তরের সাহায্যে মাপনায় ব্যক্তিত্বের পুরাপুরি পরীক্ষা হয় না। ব্যক্তি কিরূপে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অবস্থা বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় অথবা কিরূপ আচরণ করে তাহা দেখিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করা অধিক সমীচীন বলিয়া মনে হয়। এই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি পরিস্থিতিমূলক পরীক্ষা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

যেমন শিশুদের সততা পরীক্ষা করিবার জন্য উহাদিগকে এমন অবস্থায় ফেলা হয় যাহাতে উহারা অভীক্ষকের চোখে ধূলা দিয়া তাহাকে প্রতারিত

করিতে পারে। একটি অভীক্ষায় হয়ত সাজাইয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিবার জন্য শিশুকে অনেকগুলি মুদ্রা দেওয়া হইল। তারপর অভীক্ষক দেখিলেন শিশু কোন্ মুদ্রাগুলি রাখিয়া গিয়াছে এবং কোন্‌গুলি চুরি করিয়াছে। এই জাতীয় অভীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে সততা একটি গুণ নয়, কারণ যে শিশু একটি পরিস্থিতিতে সততা দেখায় সেই হয়ত অন্য পরিস্থিতিতে সততা না দেখাইতে পারে।

(৪) প্রায়োগিক মাপনা—এক্সপেরিমেণ্ট্যাল্ টেস্ট্

ব্যক্তিত্বের মাপনায় মনোবিদেরা প্রায়ই প্রয়োগপদ্ধতির সাহায্য লইয়া থাকেন। যেমন একটি প্রয়োগে পরীক্ষা করা হইল যে কলেজের ছাত্রদের প্রত্যক্ষ (পার্সেপ্‌শন্) কিরূপে তাহাদের আকর্ষণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রথমে এই ছাত্রদের সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় এবং এই আকর্ষণগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দ নির্বাচন করা হইল। অর্থনীতিক আকর্ষণ মাপনার জন্য "মূল্য", "ডলার" প্রভৃতি শব্দ, ধর্মীয় আকর্ষণ মাপনার জন্য "প্রার্থনা", "ঈশ্বর" প্রভৃতি শব্দ উহাদিগকে দেখানো হইল এবং উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইল এই শব্দগুলি কি। দেখা গেল যে আকর্ষণ বা উহার অভাব অনুসারে শব্দগুলি চিনিতে উহাদের কম বা বেশী সময় লাগিল। এইরূপে প্রমাণিত হইল যে কোনো বিষয়ে আকর্ষণ থাকিলে ঐ বিষয়ের শব্দ-প্রত্যভিজ্ঞান দ্রুত হইয়া থাকে।

(৫) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার—পার্সন্যাল্ ইণ্টারভিউ

উল্লিখিত সকল ব্যক্তিত্ব মাপনাগুলিই বাহ্যিক বা বিষয়গত (অব্‌জেক্‌টিভ্)। কিন্তু বাহ্যিক পরীক্ষায় ব্যক্তিত্বের সকল গুণগুলিই ধরা পড়ে না। ব্যক্তিত্বের একান্ত নিজস্বতা বা স্বাতন্ত্র্যকে প্রায়ই বাহির হইতে বুঝিতে পারা অসম্ভব। বাহ্যিক পদ্ধতির এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য সাক্ষাৎকার (ইন্‌টারভিউ) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ব্যক্তির অনুভূতি বা মনোভাব তাহার সহিত সাক্ষাৎকার কালে বুঝিবার সুযোগ পাওয়া যায়। ব্যক্তি কোন্ বিষয়ে কিভাবে কথা বলে, কোন্ বিষয়ে কথা বলিতে গিয়া কিভাবে তাহার কণ্ঠস্বর নরম অথবা কঠিন হইয়া পড়ে, অথবা সে উচ্ছ্বসিত হয় বা দমিয়া যায়—ব্যক্তিত্বের এই জাতীয় গুণগুলি সাক্ষাৎকারে ধরিবার সুবিধা হয়।

কিন্তু এই পদ্ধতির অসুবিধা এই যে সকল ব্যক্তিই সাক্ষাৎকার কালে আপনার যথার্থ পরিচয় দিতে পারে না। অনেকেই এই সময়ে আড়ষ্টবোধ করে, আবার অনেকেই হয়ত এই সময়ে আপনাকে জাহির করিবার সুযোগ সন্ধান করে। এই জাতীয় অসুবিধা দূর করিতে হইলে সাক্ষাৎকার গ্রহণ-কারী পরীক্ষকের বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার, যাহাতে পাত্রের আড়ষ্টতা দূর করিয়া তাহার আত্মীয়ভাব জাগানো যাইতে পারে।

(৬) বিক্ষেপণ বা প্রতিফলন পদ্ধতি—প্রজেক্টিভ্ টেস্ট্

বিক্ষেপণ বা প্রতিফলন (প্রজেক্শন্) পদ্ধতির উদ্দেশ্য হইল পাত্রকে না বুঝিতে দিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের গুণ বা প্রকাশ পরীক্ষা করা। পাত্রকে একটি অস্পষ্ট কাজ সম্বন্ধে কিছু করিতে বলা হয় এবং কি করিতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া হয়ত ঐ কাজে সে নিজ ব্যক্তিত্ব বিক্ষেপণ বা প্রকাশ করিয়া বসে।

বিক্ষেপণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে ররসাক্ অভীক্ষা এবং কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ (থিম্যাটিক্ অ্যাপারসেপ্শন্ টেস্ট্) অভীক্ষাই প্রধান।

(ক) **ররসাক্ অভীক্ষাকে** "কালির ছাপ অভীক্ষা" (ইঙ্ক্ ব্লট্ টেস্ট্) বলা হয়। নিম্নে প্রদর্শিত কালির ছাপ দুইটির মত বিভিন্ন রকমের দশটি কালির ছাপ সাহায্যে ররসাক্ ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করিয়াছেন। এই ছাপগুলির মধ্যে পাঁচটির রং কালো এবং ধূসর, দুইটির কালো এবং লাল এবং বাকী তিনটি সম্পূর্ণ রঙীন। পাত্রকে এক একটি করিয়া কালির ছাপ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করা হয় যে এইটি কি হইতে পারে, অথবা ইহা দেখিয়া পাত্রের কি মনে হয়।

এই পরীক্ষায় (১) কালির ছাপের সমগ্র বা কোনো অংশ পাত্রের প্রতি-ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে কিনা, (২) ছাপের কালো ছায়া, রং, আকার অথবা "গতি" তাহার প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করিয়াছে কিনা এবং (৩) প্রতিক্রিয়া-কালে পাত্র কালির ছাপে মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, উহাদের অবয়ব অথবা অন্য কোনো বস্তু দেখিয়াছে কিনা তাহা নির্ণয় করা যায়। সমগ্র ছাপের উপর প্রতিক্রিয়া সূক্ষ্ম চিন্তা বা তত্ত্বজ্ঞান প্রবণতার পরিচায়ক। আবার অংশের উপর প্রতিক্রিয়া অনুকর্ষী বায়ুর (কম্পাল্শন্ নিউরসিস্) প্রকাশ করে। দ্বিতীয়তঃ, গতি দর্শন অন্তর্বৃত্তি এবং পশুর আকৃতি দর্শন চিন্তার সঙ্কীর্ণতা সূচিত করে।

৩৬ নং চিত্র
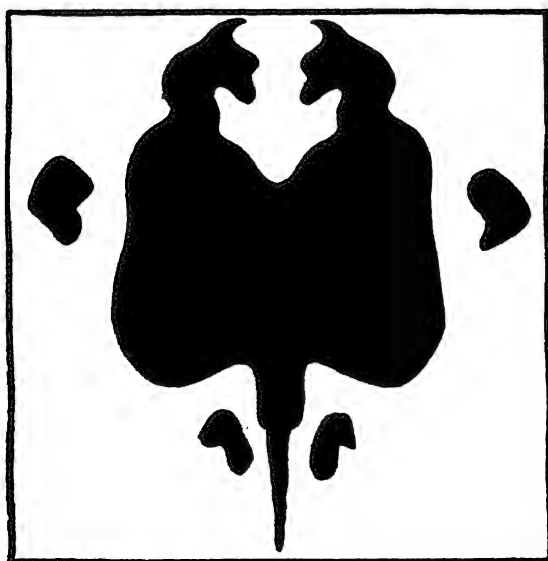
৩৭ নং চিত্র

তৃতীয়তঃ, রং-এর উপর অধিক প্রতিক্রিয়া পাত্রের আবেগশীলতা প্রকাশ করে। রং ও আকার এই উভয়ের উপর প্রতিক্রিয়া হইলে বুঝিতে হয় পাত্রের স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল আবেগ প্রকাশ।

(খ) কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষা—থিম্যাটিক্ অ্যাপারসেপ্‌শন্ টেস্ট্ (ট্যাট্)

মারে এবং মর্গ্যান্ উদ্ভাবিত কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষা (থিম্যাটিক্ অ্যাপার্সেপ্‌শন্ টেস্ট) অথবা সংক্ষেপে ট্যাট্ পদ্ধতি বলিতে কতগুলি ছবির ব্যাখ্যা বুঝায়। ঐ ছবিগুলি যে সব কাহিনী তুলিয়া ধরে সেইগুলি অস্পষ্ট। সুতরাং ইহাদের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পাত্র তাহার মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলে। নিম্নে এই অভীক্ষায় ব্যবহৃত একটি ছবি দেওয়া হইল।

ছবিটিতে কি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া পাত্রকে একটি কাহিনী রচনা করিতে বলা হয়। কি করিয়া ঘটনাটি ঘটিল অথবা ঘটনাটির ফল কি দাঁড়াইবে, কাহিনী রচনায় পাত্রকে এই সকল সমস্যার সমাধান করিতেও অনুরোধ করা হয়। এই ব্যাখ্যায় মজার ব্যাপার এই যে ছবিতে বর্ণিত কোনো না কোনো চরিত্রের সহিত নিজকে একাত্ম করিয়া ফেলে এবং তাহার কাহিনী প্রায় আত্মজীবনী হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে পাত্রের এমন অনেক অনুভূতি, আবেগ, প্রেরণা প্রভৃতি প্রকাশ পায় যাহা তাহার পক্ষে স্বেচ্ছায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

৩৮নং চিত্র

যেমন ৩৮নং চিত্রে অঙ্কিত একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এবং তাহার পাশে একটি সুগঠিত যুবকের ছবি দেওয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধাটি যুবককে দেখিয়া কি ভাবিতেছে

অথবা যুবকটি বৃদ্ধাকে দেখিয়া কি ভাবিতেছে তাহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা হইতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ধরা পড়িয়া যায়।

(৭) শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা—ওয়ার্ড অ্যাসোসিয়েশন টেস্ট্

শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষার বিস্তৃত আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে করা হইয়াছে। পাত্রকে পরপর কতগুলি ব্যক্তিত্বসূচক শব্দ বলা বা দেখানো হয়। শব্দ শুনিয়া বা দেখিয়া তাহার যে শব্দটি মনে হয় পাত্র সেই শব্দটি বলে বা লেখে। কোনো কোনো শব্দের প্রতিক্রিয়া শব্দ হয়ত অনতিবিলম্বে এবং কতগুলি বিলম্বে ঘটে। প্রতিক্রিয়া শব্দের প্রকৃতি এবং সময় অনুসারে পাত্রের নির্জ্ঞান মনে কম্‌প্লেক্স বা গূঢ়ৈষা এবং অবদমিত ইচ্ছার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষার ভিত্তিতে য়্যুঙ্গ অন্তর্বৃত, বহির্বৃত এবং উভয়বৃত[১] প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।

৪। একান্তর ব্যক্তিত্ব—অল্‌টার্নেট্ পার্সন্যালিটি

স্বাভাবিক জীবনে নানা মানসক্রিয়ার মধ্যেও ব্যক্তিত্ব একটি অখণ্ড চেতনারূপে কাজ করে। ব্যক্তিত্বের বিচিত্র এবং বিভিন্ন প্রকাশগুলি একই ব্যক্তির বলিয়া অনুভূত না হইলে স্বাভাবিক জীবন ক্ষুণ্ন হয়। নানা প্রকাশের মধ্যেও ব্যক্তিত্ব এক এবং অখণ্ড বোধরূপে ক্রিয়াশীল থাকে, কিন্তু নানা খণ্ডে বা টুকরায় পরস্পরবিচ্ছিন্ন সত্তার আকার ধারণ করে না। যে ব্যক্তি তাহার পিতার পুত্র আবার সেই ব্যক্তিই তাহার পুত্রের পিতা, যে ব্যক্তি ছাত্রের শিক্ষক আবার সেই ব্যক্তিই শিক্ষকের ছাত্র। বহুরূপে কাজ করিয়াও স্বাভাবিক জীবনে ব্যক্তিত্ব এক এবং অখণ্ড থাকে।

স্বভাবী জীবনে ব্যক্তিত্বের একান্তরতা

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিত্ব অখণ্ড এবং এক বলিয়া মনে হইলেও, একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে স্বাভাবিক জীবনেও ব্যক্তিত্বের এমন অংশ থাকিতে পারে যাহা বাকী ব্যক্তিত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন। যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ অত্যন্ত মৃদু, ধীর, স্থির এবং সহিষ্ণু, সেই ব্যক্তিই হয়ত ক্রোধান্ধ অবস্থায়

১ এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য—পৃঃ ২৩৫-২৩৭

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য এবং বেসামাল হইয়া পড়ে। হয়ত সেই ব্যক্তিই এইরূপ অবস্থায় ঘরের আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া, নিজকে অথবা অপরকে কামড়াইয়া, আঁচড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটায়। ক্রোধের এই অগ্নিশর্মা মূর্তি ঐ ব্যক্তিরই আর একটি মূর্তি যাহা তাহার ব্যক্তিত্ব-চেতনা হইতে বিচ্ছিন্ন এবং যাহার উপর তাহার কোনো ক্ষমতাই খাটে না। একদিকে স্বাভাবিক সৌম্য, শান্ত এবং সংযত মূর্তি, অপর দিকে অস্বাভাবিক, অস্থির, উচ্ছৃঙ্খল এবং উগ্র মূর্তি একই ব্যক্তির তুইটি মূর্তি। এই তুইটি মূর্তি একান্তর ভাবে—অর্থাৎ একটির পর অপরটি—আত্মপ্রকাশ করে। যখন একটি ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল হয়, তখন অপরটি নিষ্ক্রিয় থাকে।

অস্বভাবী মানসজীবনেই একান্তর ব্যক্তিত্ব প্রকাশের বিশেষ ক্ষেত্র। যেমন সমন্‌ন্যাম্‌বুলিজ্‌ম্ বা স্বপ্নচারিতায় একান্তর ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল হয়। এইস্থলে **লেডি ম্যাক্‌বেথ্**-এর নিদ্রিত অবস্থা হইতে উঠিয়া স্বপ্নচালিতের মত ডান্‌কান্-এর রক্তে লিপ্ত (কল্পিত ভাবে) রুমাল হইতে অশুভ রক্তচিহ্ন ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা প্রসিদ্ধ। আবার পি. জ্যানে বর্ণিত **আইরিন্**-এর দৃষ্টান্তও উদ্ধৃত করা যায়। আইরিন্ তাহার রুগ্না মায়ের প্রাণপণ সেবা করিয়াছিল। তাহার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও মায়ের মৃত্যুতে সে মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছিল। ফলে মায়ের মৃত্যুদৃশ্যকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মধ্যে একটি স্বপ্নচারী ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিল। আইরিন্ হয়ত সেলাইয়ে বা কথা-বার্তায় মগ্ন আছে, এমন সময় হঠাৎ সে তাহার কাজ বন্ধ করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত মায়ের মৃত্যুদৃশ্যের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অভিনয় করিতে লাগিল। এই আচরণ যেমন হঠাৎ দেখা দিত তেমনই হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইত, এবং আইরিন্ও তাহার সেলাই বা কথাবার্তায় এমন ভাবে ফিরিয়া আসিত যেন কিছুই ঘটে নাই। স্বপ্নাবিষ্ট ভাবে সে যাহা করিত তাহার কিছু কিছু মনে থাকিলেও, মায়ের মৃত্যুদৃশ্যকে কেন্দ্র করিয়া সে যাহা যাহা করিত জাগ্রত বা স্বাভাবিক অবস্থায় সে তাহার কিছুই মনে করিতে পারিত না। সুতরাং আইরিন্-এর এই দুই প্রকার পরস্পরবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব একান্তর—**অর্থাৎ উহারা একই সঙ্গে আবির্ভূত না হইয়া একটির পর অপরটি প্রকাশ পাইত।**

ডঃ অ্যাজাম্-এর **ফেলিডা** একান্তর ব্যক্তিত্বের একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। চৌদ্দ বৎসর বয়সে ফেলিডা একটি নূতন জীবন অধ্যায় আরম্ভ করিল। ফলে তাহার পুরাতন ও নূতন ব্যক্তিত্বের একন্তারতা দেখা গেল। নূতন ব্যক্তিত্বের

ক্রিয়াকালে তাহার পুরাতন ব্যক্তিত্বের কথা ফেলিডা মনে করিতে পারিত, কিন্তু পুরাতন ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকালে সে তাহার নূতন ব্যক্তিত্বের সকল ঘটনা ভুলিয়া যাইত। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহার নূতন ও পুরাতন ব্যক্তিত্বের এই একান্তরতা চলিল। কিন্তু তাহার পর ফেলিডা'র নূতন ব্যক্তিত্বই পুরাতন ব্যক্তিত্বের উপর প্রাধান্য লাভ করিল। অবশ্য এই সময়েও হয়ত ফেলিডা হঠাৎ তাহার পুরাতন ব্যক্তিত্বে ফিরিয়া যাইত এবং নূতন ব্যক্তিত্বের সকল ঘটনা বিস্মৃত হইত।

আবার মর্টন প্রিন্স্ বর্ণিত **স্যালি ব্যুক্যাম্প্** কাহিনীও একান্তর ব্যক্তিত্বের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। ব্যুক্যাম্প্ একটি স্বভাবতঃ ধর্মভীরু ও নিঃস্বার্থ যুবতী। কিন্তু মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্য সে দুষ্ট প্রকৃতি হইয়া উঠিত। দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বটি প্রথমটি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পাইত। আবার চিকিৎসাকালে তাহার মধ্যে একটি তৃতীয় ব্যক্তিত্ব দেখা দিল। এই ব্যক্তিত্বটি কিন্তু স্বার্থপর এবং উৎপীড়নকারী। এইরূপে ব্যুক্যাম্প্-এর মধ্যে বহু ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল হইল।

ডব্লু. এফ্. প্রিন্স উদ্ধৃত **ডোরিস্**-এর দৃষ্টান্তেও একান্তর ব্যক্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। শিশু ডোরিস্‌কে তাহার মাতাল পিতা মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই মুহূর্ত হইতে ডোরিস্ নিতান্ত শান্তপ্রকৃতি হইয়া গেল। তাহার মধ্যে দুইটি একান্তর ব্যক্তিত্ব দেখা দিল। একটির নাম মার্গারেট্ এবং অপরটির নাম ঘুমন্ত মার্গারেট্ (স্লীপিং মার্গারেট্)। প্রথমটি দুষ্ট, বেয়াড়া এবং দ্বিতীয়টি শান্ত, ধীর এবং পরিপক্ক। সতেরো বৎসর বয়সে তাহার মায়ের মৃত্যুর পর ডোরিস্-এর মধ্যে একটি তৃতীয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হইল—ইহার নাম রুগ্ন ডোরিস্। ডোরিস্-এর যথার্থ ব্যক্তিত্ব ইহার সহিত একান্তরভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এইরূপে ডোরিস্-এর ব্যক্তিত্ব রুগ্ন ডোরিস্, যথার্থ ডোরিস্, মার্গারেট্ এবং ঘুমন্ত মার্গারেট্ এই চারটি ব্যক্তিত্বের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইল।

জ্যানে বর্ণিত **লিওনি** একান্তর ব্যক্তিত্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। লিওনি স্বভাবতঃ একটি বোকা, বিষণ্ণ এবং ভীরু শিশু ছিল। মাঝে মাঝে তাহার মূর্ছাবেশ হইত। পরে বার বার সংবিষ্ট (হিপ্‌নোটাইজ্‌ড্) হওয়ার ফলে তাহার মধ্যে লিওন্‌টাইন্ নামে একটি দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব দেখা দিল। প্রথম লিওনি শান্ত, বিষণ্ণ, ধীর, নম্র এবং ভীরু ছিল আবার দ্বিতীয় লিওনি, অর্থাৎ

লিওনটাইন্ ছিল তেমনই অশান্ত, হাসিখুশী, বাচাল, পরিহাসপ্রিয় এবং সাহসী। দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকালে সে প্রথম লিওনিকে তাহার নিজ ব্যক্তিত্ব বলিয়া অস্বীকার করিত। কিছুকাল পরে গভীরতর সংবেশনের (হিপ্‌নোটিজম্) ফলে তাহার মধ্যে লিওনোর নামে গম্ভীর, মৃদুভাষী এবং মন্দগতি বিশিষ্ট একটি তৃতীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হইল। তৃতীয় লিওনি প্রথম এবং দ্বিতীয় লিওনিকে চিনিত এবং উহাদিগকে ছোট এবং হীন বলিয়া মনে করিত।

বহু-ব্যক্তিত্ব—মাল্‌টিপ্‌ল্ পার্সন্যালিটি

উপরে প্রদর্শিত একান্তর ব্যক্তিত্বগুলি বহু-ব্যক্তিত্বও বটে। লেডি ম্যাক্‌বেথ্, আইরিন্, ফেলিডা, স্যালি ব্যুক্যাম্প্, ডোরিস্, লিওনি—সকলের মধ্যেই একাধিক ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল।

তবে বহু-ব্যক্তিত্ব এবং একান্তর-ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। বহু-ব্যক্তিত্ব একান্তর নাও হইতে পারে। অনেকগুলি ব্যক্তিত্ব একান্তরভাবে অথবা একটির পর আর একটি আবির্ভূত না হইয়া একই সঙ্গে আবির্ভূত এবং সক্রিয় হইতে পারে। সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্ব (কো-কন্‌সাচ্ পার্সন্যালিটি) এইরূপ বহু-ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত। সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্ব বহু-ব্যক্তিত্ব হইলেও একান্তর ব্যক্তিত্ব নয়।

সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্ব—কো-কন্‌সাচ্ পার্সন্যালিটি

মর্টন্ প্রিন্স্ সহজ্ঞ ব্যক্তিত্বের (কো-কন্‌সাচ্ পার্সন্যালিটি) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। **একই ব্যক্তিত্বের মধ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিত্ব পরপর বা একটির পর আর একটি ক্রিয়া করিলে, অথবা একটি অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যে বহু-ব্যক্তিত্ব দেখা দেয় তাহাকে একান্তর-ব্যক্তিত্ব বলে। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বগুলি যদি পাশাপাশি অথবা একসঙ্গে এবং চেতনভাবে কাজ করে তাহা হইলে এই ব্যক্তিত্ব-গুলিকে সহজ্ঞ বা সহচেতন ব্যক্তিত্ব বলে।** স্বাভাবিক জীবনে এইরূপ সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্বের ক্রিয়া দেখা যায়। যেমন কাহারও সহিত কথা বলিতে বলিতে হয়ত একটি তালা খুলিবার চেষ্টাও চলিতেছে। এই ক্ষেত্রে তালা খুলিতে যে চেতনা কাজ করিতেছে তাহা কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় চেতনা হইতে পৃথক। অথচ উভয় ব্যক্তিত্বই চেতনভাবে কাজ করিতেছে, যদিও একটির চেতনা অপরটির তুলনায় স্পষ্ট বা অস্পষ্ট হইতে পারে।

অস্বভাবী জীবনে সক্রিয় সহজ-ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ বাহুল্যবোধে বর্জিত হইল।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

উড্ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড্ মাকু'ইন্—সাইকলজি—চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বোরিং, ল্যাংফেল্ড্, ওয়েল্ড্—ফাউণ্ডেশনস্ অফ্ সাইকলজি—একবিংশ পরিচ্ছেদ

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেণ্ট্স্ অফ্ সাইকলজি—পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জি. ডি. বোয়াজ্—জেনার‍্যাল্ সাইকলজি—একাদশ পরিচ্ছেদ

সি. টি. মর্গ্যান্—ইনট্রডাক্শন্ টু সাইকলজি—নবম পরিচ্ছেদ

এন্. এল্. মান্—সাইকলজি—সপ্তম পরিচ্ছেদ

জি. মার্ফি—জেনার‍্যাল্ সাইকলজি—ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

ডবলু ম্যাক্‌ডুগ্যাল্—আউট্‌লাইনস্ অফ্ অ্যাব্‌নর্ম্যাল্ সাইকলজি

Exercise

1. What do you mean by the traits of personality ? How are they measured ? (pp. 245-249)
2. Define the dimensions as distinguished from the traits of personality (pp. 245-251)
3. What are the dimensions of personality and how are they measured ? (pp. 249-251)
4. Explain the principal methods of measuring personality. (pp. 251-258)
5. Write notes on :—
(*a*) Rating Scale ; (*b*) Factor Analysis ; (*c*) Questionnaire ; (*d*) Situational Test ; (*e*) Projective Test ; (*f*) Rorschach Test ; (*g*) Thematic Apperception Test or TAT. (pp. 251-254 ; 255-258)
6. Explain, with examples, what you mean by alternate personality (pp. 258-261)
7. Define multiple personality. Cite some instances thereof. (pp. 258-262)
8. Distinguish between alternate and co-conscious personality. (pp. 261-262)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চেতনা ও মনের বিভিন্ন ক্রিয়া

১। চেতনা কাহাকে বলে—মন ও চেতনা

চেতনা (কন্‌সাচ্‌নেস্) মনের একটি স্বভাব বা ধর্ম। কোনো কোনো মনোবিদ্, যেমন দে কার্তে, লক্ প্রভৃতি, চেতনাকে মনের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু লাইব্‌নিজ্ হইতে আরম্ভ করিয়া সাম্প্রতিক মনোবিদ্‌গণের অধিকাংশই মনকে চেতনা হইতে ব্যাপক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে চেতন বা সংজ্ঞান মনের নিম্নে ইহার অন্ততঃ তুইটি স্তর রহিয়াছে, যথা আসংজ্ঞান বা সাব্‌কন্‌সাচ্ এবং নির্জ্ঞান বা আন্‌কন্‌সাচ্।

চেতনা কাহাকে বলে ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে চেতনার কোনো সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। চেতনা মৌলিক। চেতনাই চেতনার সংজ্ঞা দিতে পারে, অর্থাৎ চেতনার সাহায্যেই চেতনার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব। আবার চেতনা নিজ সম্বন্ধে চেতন হইয়াই থাকে। সুতরাং চেতনার সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে গিয়া অনুপপত্তি ঘটে।

কিন্তু চেতনার সংজ্ঞা সম্ভব না হইলেও উহার বর্ণনা সম্ভব। যেমন শারীর-বৃত্তীয় মনোবিদ্ **জি. টি. ল্যাড্** বলিয়াছেন যে চেতনা তাহা যাহা নিদ্রিত হইয়া পড়িবার পূর্বে ক্রমশঃ কমিতে কমিতে অন্তর্হিত হয়, আবার জাগরণের পূর্ব মূহূর্ত হইতে ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে স্পষ্টতম আকার ধারণ করে। অবশ্য এইরূপ বর্ণনাও কতটা যথার্থ তাহাও বিবেচ্য, কারণ নিদ্রিতাবস্থায় চেতনা একেবারে বিলুপ্ত হয় কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে।

২। চেতনার ক্ষেত্র—ফিল্ড্ অফ্ কন্‌সাচ্‌নেস্

সে যাহা হউক, চেতনার ধর্ম জ্ঞান বা প্রকাশ। চেতনার স্পর্শে সকল বস্তু আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, যেমন আলোকের স্পর্শে সকল দৃশ্যবস্তু স্পষ্ট হয়। কিন্তু চেতনার প্রকাশ সর্বদাই যে সমান স্পষ্ট হয় তাহা নয়। চেতনার মাত্রাভেদ (ডিগ্রী অব্ কন্‌সাচ্‌নেস্) আছে। চেতনা একটি বিন্দু নয়, কিন্তু একটি বৃত্ত। এই বৃত্তটি স্পষ্টতম চেতনা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া অস্পষ্টতমতায় বিলীন হয়। স্পষ্টতম চেতনাকে

চেতনাবৃত্তের (ফিল্ড্ অফ্ কন্‌সাচ্‌নেস্) বা চেতনা-ক্ষেত্রের কেন্দ্র (সেণ্টার্) বলা যায়। স্পষ্টতম চেতনা কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অস্পষ্টতম চেতনা পরিধি পর্যন্ত ক্ষেত্রকে বলা যায় চেতনা-বৃত্ত বা চেতনা-ক্ষেত্র। কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্যন্ত অগ্রসর হইলে চেতনার বস্তুগুলি স্পষ্টতম হইতে অস্পষ্টতম হইয়া দাঁড়ায়। চেতনা-ক্ষেত্রের বস্তু চেতনা-কেন্দ্রের যত নিকটবর্তী হয় উহার চেতনাও সেই পরিমাণে স্পষ্ট এবং কেন্দ্র হইতে যত দূরবর্তী হয় বা সরিয়া যায় উহার চেতনাও সেই পরিমাণে অস্পষ্ট হয়। আবার চেতনা-ক্ষেত্রের বস্তু পরিধির যত নিকটবর্তী হয় উহার চেতনা তত অস্পষ্ট এবং যত দূরবর্তী হয় উহার চেতনা সেই পরিমাণে স্পষ্ট। কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্যন্ত চেতনার মাত্রা কমিতে কমিতে প্রায় শূন্য হইয়া দাঁড়ায়। আবার পরিধি হইতে কেন্দ্র পর্যন্ত চেতনার মাত্রা বাড়িতে বাড়িতে পুর্ণ স্পষ্টতা ধারণ করে। যেমন পাঠক পুস্তক পাঠ করিতেছেন। এই স্থলে যে সকল বস্তু বা বিষয় তাঁহার চেতনা অধিকার করিয়া আছে সেইগুলি মিলিত হইয়া পাঠকের চেতনা-ক্ষেত্র গঠিত করে। আবার পাঠক পুস্তকের যে অংশটি যখন পাঠ করিতেছেন তাহাই তাঁহার চেতনা-ক্ষেত্রের কেন্দ্রে অথবা স্পষ্টতম চেতনায় আসে। তিনি যে আলোকে পড়িতেছেন তাহা, অথবা যে অংশ পড়িতেছেন তাহার আগের এবং পরের অংশটি তাঁহার স্পষ্টতম চেতনায় বা চেতনা-ক্ষেত্রের কেন্দ্রে নাই, কিন্তু আছে অস্পষ্ট চেতনায় বা চেতনা-ক্ষেত্রের পরিধিতে।

চেতনা-ক্ষেত্রের বিষয়গুলির মধ্যে সর্বদা অদলবদল বা স্থান-পরিবর্তন চলিতে থাকে। চেতনা স্থাণু বা নিশ্চল হইয়া থাকে না। উহাদের মধ্যে অনবরত ঘাত-প্রতিঘাত চলিতে থাকায় চেতনার যে বিষয়টি কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল সেইটি হয়ত কেন্দ্রের বাহিরে উহার পরিধিতে সরিয়া যায়, আবার যেটি পরিধিতে ছিল সেইটিই হয়ত উহার কেন্দ্রে স্থান অধিকার করিয়া বসে। যেমন পুস্তকটি পড়িবার কালে উহার কোনো অংশ চেতনা-কেন্দ্র অধিকার করিয়া থাকে এবং আলোক, টেবিল, চেয়ার, সামনের দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলি চেতনার পরিধিতে অবস্থিত থাকে। কিন্তু এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলির কোনো পরিবর্তন বা মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটিলেই চেতনা পুস্তকাংশ হইতে সরিয়া ঐ বিষয়গুলিতে চলিয়া যায়।

এইরূপে দেখানো যাইতে পারে যে চেতনা-ক্ষেত্রের বস্তুগুলি নিষ্ক্রিয় নয়, কিন্তু নিত্য পরিবর্তনশীল, কারণ চেতনা নিত্য প্রবহমান। জেম্‌স্ চেতনাকে

একটি প্রবাহ (স্ট্রিম্ অফ্ কন্‌সাচ্‌নেস্) বলিয়াছেন। চেতনা-ক্ষেত্রের পরিবর্তনের একটি মূল কারণ হইল মনোযোগের পরিবর্তন।

৩। চেতনার স্তর—অন্তর্জ্ঞান ও আসংজ্ঞান স্তর

সালি, স্টাউট্, এঞ্জেল্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণের মতে চেতনা-কেন্দ্রের পর হইতে আরম্ভ করিয়া চেতনা-পরিধি পর্যন্ত ক্ষেত্রকে **অন্তর্জ্ঞান** বা সাব্‌কন্‌সাচ্ বলে। তাঁহারা অন্তর্জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এইরূপে ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা বলেন যে অন্তর্জ্ঞান চেতনাবিহীন নয়, স্পষ্টতম চেতনাও নয়, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যবর্তী। ইহা অল্লাধিক চেতনা, যে চেতনা সম্বন্ধে ব্যক্তি সচেতন নয়, কিন্তু যাহা সম্বন্ধে সে সচেতন হইতে পারে। যেমন পাঠক যে আলোকে পুস্তক পাঠ করিতেছেন সে সম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্ট চেতনা নাই। কিন্তু যদি কেহ তাঁহার অজ্ঞাতে আলোক কমাইয়া দেয়, তিনি এই আলোক হ্রাস বুঝিতে পারেন। আলোক সম্বন্ধে তাঁহার অবশ্যই অস্পষ্ট চেতনা ছিল, কারণ নতুবা আলোক হ্রাস সম্বন্ধে তিনি সচেতন হইতেন না। তাহা হইলে অন্তর্জ্ঞানের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে অনুকূল অবস্থা ঘটিলেই উহা সংজ্ঞানে অথবা স্পষ্ট চেতনায় আসিতে পারে অথবা চেষ্টা করিলেই উহাকে চেতনার কেন্দ্রে আনিতে পারা যায়।
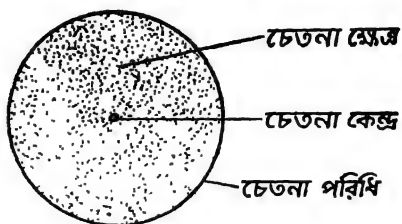
৩৯নং চিত্র

এখানে প্রশ্ন এই যে বিস্মৃত বস্তুটিকে আমরা স্মরণ করিতে পারি অথবা যে পূর্বপরিচিত ব্যক্তিকে আমরা চিনিতে পারি, স্মরণের বা চেনার (প্রত্যভিজ্ঞা) পূর্বে ঐ বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে কি আমাদের অস্পষ্ট চেতনা ছিল, অথবা, উহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোনো চেতনাই ছিল না? একথা অনস্বীকার্য যে পূর্ব পরিচয় অথবা অভিজ্ঞতা এবং উহার প্রত্যভিজ্ঞান অথবা স্মরণের মধ্যবর্তী কালে উহাদের সম্বন্ধে অস্পষ্ট চেতনাও না থাকিতে পারে। যে অভিজ্ঞতা বা পরিচয় বহু পূর্বে ঘটিয়াছিল তাহার চেতনা-ক্ষেত্রে না থাকাই স্বাভাবিক। তবে কি উহারা অন্তর্জ্ঞানে ছিল না? উহারা অবশ্যই সংজ্ঞানে ছিল না। সুতরাং উহারা যদি অন্তর্জ্ঞানে না থাকিয়া থাকে তাহা হইলে

নিশ্চয়ই নির্জ্ঞানে ছিল। অথচ উহারা নির্জ্ঞান মনেও থাকিতে পারে না, কারণ নির্জ্ঞানে সংরক্ষিত বস্তু অবিকৃত ভাবে সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয় না। পূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতি বা পূর্ব পরিচিতের প্রত্যভিজ্ঞানে বস্তুর কোনো প্রধান বিকৃতি ঘটে না।

স্মৃতরাং স্বীকার করিতে হয় যে অন্তর্জ্ঞান বলিতে স্টাউট্ প্রভৃতি যাহা বুঝেন তাহার সাহায্যে সকল স্মরণ এবং প্রত্যভিজ্ঞান ব্যাখ্যাত হয় না। আবার স্টাউট্ যাহাকে মানস সংস্কার বা প্রবণতা (মেণ্ট্যাল্ ডিস্‌পজিশন্) বলিয়া নির্জ্ঞান মনের প্রমাণ করিয়াছেন সেই নির্জ্ঞান মনও ইহা ব্যাখ্যা করিতে পারে না। কাজেই অন্তর্জ্ঞান ও নির্জ্ঞানের মধ্যবর্তী একটি অবচেতন মন বা ফ্রয়েড্ যাহাকে বলিয়াছেন আসংজ্ঞান (প্রি-কন্‌সাচ্) তাহা স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। আসংজ্ঞান চেতন-ক্ষেত্রের একটি অস্পষ্ট স্তরই শুধু নয় কিন্তু এইটি উহার বহিঃস্থ একটি অবচেতন স্তর।

হেফ্‌ডিং প্রভৃতি মনোবিদ্ অন্তর্জ্ঞান বলিতে মনের এইরূপ একটি অচেতন স্তরই বুঝিয়াছেন। আবার মনঃসমীক্ষণ প্রণেতা ফ্রয়েড্ও বলিয়াছেন যে নির্জ্ঞান ও সংজ্ঞান মনের মধ্যবর্তী স্তরটি অস্পষ্টচেতন নয় কিন্তু অচেতন। তিনি এই স্তরটির নাম দিয়াছেন আসংজ্ঞান (প্রি-কন্‌সাচ্)। সংজ্ঞানে প্রকাশিত হইতে হইলে নির্জ্ঞান মানসবৃত্তির আসংজ্ঞান স্তরটি অতিক্রম করিতে হয়। মোট কথা, যে সকল মানসবৃত্তি বর্তমানে সংজ্ঞান মনে নাই, অথচ একটু চেষ্টা করিলেই উহাদের সংজ্ঞানে প্রকাশ করা যায় আসংজ্ঞান মন সেইগুলির আশ্রয়স্থল।

নির্জ্ঞান স্তর

আবার চেতনা ক্ষেত্রের বাহিরে, অথচ মনেরই ক্ষেত্রে একটি গভীরতম স্তর আছে। উহার নাম নির্জ্ঞান (আন্‌কন্‌সাচ্) মন। এই স্তর চেতনা-ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে না, কারণ ইহা চেতনাবিহীন। কিন্তু চেতনার ক্ষেত্রে না পড়িলেও ইহা মনের ক্ষেত্রে অবশ্যই পড়ে। স্টাউট্ প্রভৃতির মতে সংজ্ঞান (কন্‌সাচ্) এবং অন্তর্জ্ঞান (সাব্-কন্‌সাচ্) মনের পার্থক্য শুধু চেতনার পরিমাণ বা মাত্রা অনুসারে। উভয় স্তরেই চেতনা থাকে—সংজ্ঞানে স্পষ্টতম ভাবে এবং অন্তর্জ্ঞানে অস্পষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া অস্পষ্টতম ভাবে। হেফ্‌ডিং-এর মতে অন্তর্জ্ঞান একটি চেতনাবিহীন স্তর। উহা নির্জ্ঞান বা

অচেতন কিন্তু অবচেতন বা অস্পষ্ট-চেতন মাত্র নয়। ফ্রয়েড্ও এইরূপ মত পোষণ করেন। তিনি অন্তর্জ্ঞান মন স্বীকার করেন না, কিন্তু আসংজ্ঞান মন স্বীকার করেন। এমন কতগুলি মানসবৃত্তি আছে যাহা সংজ্ঞান মন হইতে বিতাড়িত হইয়া মনে অবস্থান করে এবং যাহা সংজ্ঞান, অন্তর্জ্ঞান বা নির্জ্ঞান নয়। ইহারা অচেতন হইলেও নির্জ্ঞান এবং সংজ্ঞানের মধ্যবর্তী আসংজ্ঞান মনে অবস্থান করে। অন্তর্জ্ঞান, আসংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান মনের পার্থক্য পরে আলোচিত হইতেছে।

ফ্রয়েড্

নির্জ্ঞান মানসবৃত্তিগুলি প্রায়ই বাল্যজীবনের। মাতা, পিতা, শিক্ষক, ধাত্রী, পরিবার, সমাজ প্রভৃতি শাসকদের মানদণ্ডে যে সকল ইচ্ছাপূরণ অন্যায় বা অনুচিত বিবেচিত হয় সেইগুলি পূর্ণ করিলে শিশুকে কঠোর শাস্তি বা দণ্ড পাইতে হয়। শাস্তি ও দণ্ডের ভয়ে শিশুর অবৈধ বা অন্যায় কামনাগুলি অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞান মনে আশ্রয়লাভ করে। কিন্তু কামনার স্বভাবই হইল সক্রিয়তা। ইহারা নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত হইয়াও চুপ করিয়া বা নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে না, কিন্তু সর্বদা আত্মপ্রকাশের চেষ্টায় সক্রিয় থাকে। উহারা জাগরণে পুরাপুরি আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, কারণ অধিশাস্তার শাসন-ভয়ে উহারা সন্ত্রস্ত। তাই তাহারা জাগরণে ভুল-ভ্রান্তির, নিদ্রায় স্বপ্নের, এবং মানসিক রোগে রোগলক্ষণের আকারে দেখা দেয়। এই প্রকাশগুলি বিকৃত এবং উহাদের ছদ্মবেশ হইতে নির্জ্ঞান ইচ্ছাগুলির আসলরূপ বুঝা যায় না। মনঃসমীক্ষণ এই ব্যক্তরূপের মূলে যে সকল অব্যক্ত কামনা রহিয়াছে সেইগুলি বিশ্লেষণ সাহায্যে বাহির করে।

মনঃসমীক্ষণ

দেখা যাইতেছে যে অবদমিত কামনাই নির্জ্ঞান মনেব উপাদান। এই কামনাগুলি সম্বন্ধে কোনো চেতনা থাকে না। এমন কি, সাধারণতঃ ব্যক্তি তাহার আপন চেষ্টায় নির্জ্ঞান কামনাগুলি সম্বন্ধে চেতন হইতে অথবা উহাদিগকে সংজ্ঞান মনে আনিতে পারে না, কারণ উহারা তাহার আয়ত্তের বাহিরে। কোনো নিপুণ মনঃসমীক্ষকই তাঁহার বৈজ্ঞানিক অবাধ ভাবানুষঙ্গ (ফ্রী অ্যাসোসিয়েশন্) পদ্ধতির সাহায্যে মন বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের প্রকৃত

রূপ উদ্ঘাটন করিতে পারেন। এই বিষয়টি স্বপ্নশীর্ষক অনুচ্ছেদে[১] আরও সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

অন্তর্জ্ঞান আসংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান স্তরের পার্থক্য

অন্তর্জ্ঞান (সাব্‌কন্‌সাচ্) এবং নির্জ্ঞান (আন্‌কন্‌সাচ্) মনের পার্থক্য এই :—(১) অন্তর্জ্ঞান চেতন এবং চেতনাবিহীন এই উভয় স্তরেরই হইতে পারে। স্টাউট্ প্রভৃতির মতানুযায়ী অন্তর্জ্ঞান মন অস্পষ্টভাবে চেতন। কিন্তু ফ্রয়েড্ প্রভৃতির মতানুযায়ী অন্তর্জ্ঞান মন, যাহার নামকরণ ফ্রয়েড্ করিয়াছেন আসংজ্ঞান (প্রি-কন্‌সাচ্) মন, অচেতন বা চেতনাবিহীন। পক্ষান্তরে নির্জ্ঞান মন সর্বতোভাবে চেতনাবিহীন। (২) অন্তর্জ্ঞান মন অবদমন (রিপ্রেশন্)-প্রসূত নয়, যদিও ইহা নিরোধ (সাপ্রেশন্)[২]-প্রসূত হইতে পারে। পক্ষান্তরে নির্জ্ঞান মন অবদমিত বাসনার আশ্রয়স্থল। (৩) অন্তর্জ্ঞান বৃত্তিগুলির সহিত উহাদের সংজ্ঞান রূপের কোনো প্রকারগত বৈষম্য নাই, উহারা একই-জাতীয়। ইহাদের বৈষম্য চেতনার পরিমাণের বা মাত্রার। অন্তর্জ্ঞান বৃত্তিগুলি অস্পষ্টভাবে চেতন এবং উহারা যখন সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত হয় তখন স্পষ্টভাবে চেতন। অথবা অন্তর্জ্ঞান বৃত্তির সংজ্ঞান প্রকাশগুলি বিকৃত নয়, উহাদের দুইটি রূপেরই আকার প্রকার একই রকমের। পক্ষান্তরে নির্জ্ঞান ইচ্ছা এবং উহার সংজ্ঞান প্রকাশের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকিতে পারে। নির্জ্ঞান মনে অবদমিত বাসনাগুলির অব্যক্ত রূপ (লেটেণ্ট কন্‌টেণ্ট) এবং সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত উহাদের ব্যক্তরূপ (ম্যানিফেস্ট কন্‌টেণ্ট) ভিন্নজাতীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অন্তর্জ্ঞান ইচ্ছা সংজ্ঞানে নিজরূপেই প্রকাশিত হয়, নির্জ্ঞান ইচ্ছা সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয় ছদ্মবেশে (ডিজ্‌গাইজ্‌ড্)। (৪) আবার অন্তর্জ্ঞান অচেতন হইলেও (আসংজ্ঞান অর্থে) স্বয়ং অথবা বিনাচেষ্টায় নিজরূপে সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত হইতে পারে। ব্যক্তি নিজ চেষ্টায় অন্তর্জ্ঞান বৃত্তিকে সংজ্ঞান মনে আনিতে সক্ষম। পক্ষান্তরে নির্জ্ঞান বৃত্তি স্বয়ং বা ব্যক্তির নিজ চেষ্টায় নিজরূপ লইয়া সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয় না। ব্যক্তি নির্জ্ঞান বৃত্তিকে তাহার নিজস্ব চেষ্টায় সংজ্ঞান মনে আনিতে পারে না। নিপুণ মনঃসমীক্ষকই

১ কল্পনা শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২ অবদমন এবং নিরোধের পার্থক্য আছে। প্রথমটি নির্জ্ঞান ক্রিয়া, অর্থাৎ ব্যক্তির ইচ্ছা-প্রসূত নয়। কিন্তু দ্বিতীয়টি সংজ্ঞান ক্রিয়া এবং ব্যক্তির ইচ্ছামূলক।

শুধু এই রূপান্তর সাধনে সক্ষম। (৫) সর্বশেষে, অন্তর্জ্ঞান ইচ্ছা মানসব্যাধির লক্ষণরূপে আত্মপ্রকাশ করে না ; কারণ ইহাতে সেই পরিমাণের অবদমন থাকে না, যাহার ফলে ইহাকে বিকৃত অথবা ছদ্ম প্রকাশের পথ খুঁজিতে হয়। পক্ষান্তরে নির্জ্ঞান ইচ্ছা প্রায়ই হিস্টিরিয়া, ভ্রমবাতুলতা (প্যারানয়য়া), বিষাদ-বায়ু (মেলান্‌কলিয়া) প্রভৃতি মানসব্যাধির লক্ষণরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

৪। অন্তর্জ্ঞান (সাব্‌কন্‌সাচ্‌) মনের প্রমাণ

অন্তর্জ্ঞান মন একটি নানাপ্রকারে প্রমাণিত সত্য। স্মরণ (মেমরি), প্রত্যভিজ্ঞা (রেকগ্‌নিশন্‌) প্রভৃতি মানসবৃত্তি অন্তর্জ্ঞান মনের ভিত্তিতেই বোধগম্য। অতীত অভিজ্ঞতার ফল প্রতিরূপের আকারে অন্তর্জ্ঞান মনে সংরক্ষিত থাকে বলিয়াই ইহার স্মরণ এবং প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হয়। স্মরণে এবং প্রত্যভিজ্ঞায় অতীত অভিজ্ঞতার ফলে অন্তর্জ্ঞান মনে সংরক্ষিত প্রতিরূপ পুনরুদ্বোধিত (রিভাইভ্‌ড্‌) হয়। প্রত্যভিজ্ঞায় প্রমাণিত হয় যে পুনরুদ্বুদ্ধ জ্ঞানটি নূতন বা অপরিচিত নয়, কিন্তু পুরাতন বা পরিচিত। এই পরিচিতি বোধ ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রতিরূপগুলি যে কোনো না কোনো আকারে অন্তর্জ্ঞান মনে সংরক্ষিত ছিল তাহা স্বীকার করিতে হয়।

শুধু তাহাই নয়। সংবেদন, প্রত্যক্ষ, চিন্তন প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে ব্যাখ্যা করিতে হইলেও অন্তর্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন। যেমন, সংবেদনের বেলায় প্রত্যেক উদ্দীপকই (স্টিমুলাস্‌) বোধগম্য সংবেদন উৎপন্ন করে না, অথচ একটি সীমা অতিক্রম করিলে উদ্দীপক বোধগম্য সংবেদন উৎপন্ন করে। একটি সমুদ্রতরঙ্গের শব্দ শোনা যায় না, কিন্তু অনেকগুলি তরঙ্গের সমবেত শব্দ শোনা যায়। প্রত্যেকটি তরঙ্গশব্দের শ্রবণ যদি শূন্য হয় তবে কতগুলি তরঙ্গশব্দের যুক্ত শ্রবণও শূন্য হইবার কথা। আবার কতগুলি তরঙ্গের সমবেত শব্দ যদি পূর্ণ, অর্থাৎ বোধগম্য শ্রবণ সংবেদন উৎপন্ন করে, তবে ধরিয়া লইতে হয় যে প্রত্যেকটি পৃথক তরঙ্গের শ্রবণ সংবেদন শূন্য নয়, কিন্তু পূর্ণ অর্থাৎ বোধগম্য। এই বোধগম্যতা অস্পষ্ট অর্থাৎ উহার সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট চেতনা হয় না। পৃথক তরঙ্গগুলির বোধগম্যতা স্পষ্ট-চেতনার নিম্নে অন্তর্জ্ঞান স্তরে রহিয়াছে।

আবার অন্তর্জ্ঞান মন অস্বীকার করিলে প্রত্যক্ষও দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষ অতীত সংবেদনের উপর নির্ভরশীল। সংবেদনের প্রতিরূপ অন্তর্জ্ঞান

মনে সংরক্ষিত থাকিয়া পুনরায় উদ্বুদ্ধ না হইলে প্রত্যক্ষ হয় না। তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষ আরও কতগুলি ক্রিয়ার উপর—যেমন সদৃশীকরণ (অ্যাসিমিলেশন্), পৃথকীকরণ (ডিস্‌ক্রিমিনেশন্), প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি—নির্ভর করে এবং এই ক্রিয়াগুলি অন্তর্জ্ঞান মন সাহায্যেই সম্পন্ন হয়।

এইরূপে দেখানো যাইতে পারে যে আরও অন্যান্য বহু মানসক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করিতে হইলে অন্তর্জ্ঞান মন স্বীকার করা আবশ্যক হয়।

✓ ৫। নির্জ্ঞান মনের প্রমাণ

নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্বও কতগুলি যুক্তি সাহায্যে প্রমাণ করা যাইতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি (এররস্ অফ্ এভ্‌রিডে লাইফ্), স্বপ্ন, মানসব্যাধি, সম্মোহন (হিপ্‌নোটিজ্‌ম্), সংবেদন (সাজেশন্) প্রভৃতি ঘটনাগুলি নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। তাহা ছাড়া নির্জ্ঞান মনের সাহায্যে যে শুধু মানস রোগীর বা অস্বভাবী ব্যক্তির মানসক্রিয়াই বুঝা যায় তাহা নয়। নির্জ্ঞান মন সাহায্যে আমরা শুধু রোগীর মন নয়, সহজ, সুস্থ মানবের মানসিকতার গতিবৃত্তি, সাহিত্য—ললিতকলার সৃষ্টিতত্ত্ব, সামাজিক রীতিনীতির অন্তর্নিহিত উৎস, ধর্মজীবনের ভিত্তি, বিভিন্ন ধর্মাশ্রমের বিভিন্ন নিয়মাবলীর কারণ, পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গত ব্যাখ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে নূতন জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই।[১]

ফ্রয়েড তাঁহার "সাইকপ্যাথলজি অফ্ এভ্‌রিডে লাইফ্" গ্রন্থে দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পরিবেষণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে এই ভুলত্রুটিগুলি অকারণে উৎপন্ন হয় না। যদিও উহারা সংজ্ঞান মানস কারণে ঘটে না, ইহারা ঘটে নির্জ্ঞান ইচ্ছার প্রভাবে। জাগরণের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না—উহারা সমাজ-নীতি, শিক্ষা-নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধ হইলে অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত হয় এবং নানাপ্রকার ছদ্ম বা বিকৃত প্রকাশে দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে। নাম ভুলিয়া যাওয়া, সঙ্কল্প ভুলিয়া যাওয়া, নানাপ্রকার ভুল কাজ—যেমন কথার ভুল, পড়ার ভুল, লেখার ভুল, ছাপার ভুল, দেখার ভুল, শোনার ভুল, প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনের দোষত্রুটিগুলির মূলে কোনো না কোনো নির্জ্ঞান

১ মনঃসমীক্ষণ—ডঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, পৃঃ ৮০

ইচ্ছার প্রভাব বর্তমান থাকে। যেমন ডঃ ব্রিল একটি নাম ভুলিয়া যাওয়ার উদাহরণ দিয়াছেন। তাঁহার একজন সহকর্মী ডঃ বি—তাঁহার আত্মীয় ব্রাউন্-এর নামটি স্মরণ করিতে পারিতেছিলেন না। অথচ ঐ সহকর্মী তাঁহার আত্মীয়টির নিকট নানাপ্রকারে ঋণী ছিলেন। আত্মীয়টি দেড় মাস পুর্বে তাঁহার নিকট হইতে কর্জ হিসাবে কিছু অর্থ চাহিয়া একখানি পত্র দিয়াছিলেন। ডঃ বি—আত্মীয়টিকে টাকা পাঠানো দূরে থাকুক্, তাঁহার পত্রের উত্তর পর্যন্ত দেন নাই, এমন কি সেই পত্রখানি হারাইয়াও ফেলিয়াছিলেন। এই নামটি ভুলিয়া যাইবার মূলে ছিল ডঃ বি-এর মানসিক দ্বন্দ্ব। উপকারের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহাকে সাহায্য করা উচিত ছিল অথচ তিনি তাঁহাকে সেই সাহায্যটুকু করেন নাই। এই দ্বন্দ্বমূলক অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে পরিত্রাণের জন্যই উপকারীর নামটি বিস্মৃত হইয়াছেন।

জাগর স্বপ্ন

স্বপ্ন নির্জ্ঞান মনের আর একটি প্রমাণ। ইহা জাগ্রৎ এবং সুষুপ্তি বা স্বপ্নহীন নিদ্রার আর একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। আবার জাগ্রৎ এবং স্বপ্নের মধ্যেও জাগর স্বপ্ন (ডে ড্রীম্) বলিয়া আর একটি অবস্থা আছে। জাগর স্বপ্নের দৃষ্টান্তের অভাব নাই—গোয়ালিনী, ডিম-বিক্রেত্রী, ছাতুওয়ালা বা আল্নাস্কার-এর দিবাস্বপ্ন ইহার উদাহরণ। উহারা সকলেই জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল যে দুধ, ডিম, ছাতু এবং হাঁড়ি-কলসী বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া বড়লোক হইবে এবং কোনো দেশের রাজপুত্র বা রাজকন্যা উহাদের পাণিপ্রার্থী হইলে উহারা তাহাকে মাথা নাড়িয়া বা লাথি দিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে। তাহারা সত্যই মাথা নাড়িল বা লাথি দিল এবং দুধ, ডিম, ছাতু মাথা হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিল অথবা হাঁড়ি কলসী পদাঘাতে চুর্ণ-বিচূর্ণ হইল। এই প্রকার জাগর স্বপ্নের মূলে রহিয়াছে জাগরণে উহাদের আত্মমর্যাদা অথবা আত্মসাম্মুখ্য (সেল্ফ্ অ্যাসারশন্) ইচ্ছার অবদমন।

স্বপ্ন

স্বপ্নের মূলেও রহিয়াছে কতগুলি অবদমিত ইচ্ছার আত্মপ্রকাশ প্রবৃত্তি। যে সকল ইচ্ছা প্রচলিত ন্যায়-অন্যায়, সুন্দর-কুৎসিত, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি আদর্শের বিরোধী সেইগুলি জাগরণে পুর্ণ হইতে পারে না। অবদমনের ফলে

উহারা নির্জ্ঞান মনে বিতাড়িত হয়। কিন্তু নির্জ্ঞানের অজ্ঞাতবাস হইতে সংজ্ঞানের প্রকাশ্য দিবালোকে আসিবার জন্য উহারা নিরন্তর সচেষ্ট থাকে। যখন নিদ্রার প্রাথমিক অবস্থায় বিবেক বা অধিশাস্তার শাসন শিথিল হইয়া পড়ে সেই সুযোগে উহারা আত্মগোপন করিয়া ছদ্মবেশে সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত হয়। অপূর্ণ ও অবদমিত ইচ্ছার সংজ্ঞান মনে এইরূপ বিকৃত প্রকাশের নামই স্বপ্ন। বিষয়টি স্বপ্নশীর্ষক অনুচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।[১]

উচ্চতর আদর্শ—উদ্গতি

স্বপ্ন ছাড়াও ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি মানস-জীবনের উচ্চতর আদর্শ বা মূল্যগুলির এবং নানা রোগলক্ষণ বা উপসর্গের (সিম্প্টম্‌স্) মধ্য দিয়াও নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। স্বভাবী লোকের অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছা প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমটি উদ্গতি (সাব্‌লিমেশন্)—এই প্রণালীদ্বারা নির্জ্ঞান ইচ্ছা উহার স্বাভাবিক লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া কোনো কল্যাণময় লক্ষ্যপথে পরিচালিত হয়। উদ্গতির ফলে নিরুদ্ধ ও নিবিদ্ধ ইচ্ছা উহার নিষিদ্ধ লক্ষ্য হইতে নিরস্ত হইয়া কোনো শ্লাঘনীয় বা বরণীয় লক্ষ্যের দিকে চালিত হয় এবং দেশের ও দশের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। উদ্গতির ফলেই দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, জনসেবা, সমাজ-হিতৈষণা, দেশপ্রেম, সৌন্দর্যপিপাসা, ঈশ্বরানুভূতি বা ধর্ম প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শগুলির বিকাশ ঘটে। উদ্গতি বা উন্নয়ন সংজ্ঞান ইচ্ছা দ্বারা সাধিত হয় না। ইহার সাধারণ দৃষ্টান্ত হিসাবে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল্-এর মত সেবাব্রতা নার্সদিগের কথা উল্লেখ করা যায়। কোনো সেবাব্রতা নার্স হয়ত একজন বালবিধবা অথবা সন্তানহীনা। তাহার অবদমিত মাতৃত্ব কামনাই হয়ত সেবাব্রতে আত্মপ্রকাশ করে।

নির্জ্ঞান ইচ্ছার দ্বিতীয় প্রকাশ প্রণালী অভিক্রান্তি (ডিস্‌প্লেস্‌মেণ্ট) যাহার ফলে নির্জ্ঞান ইচ্ছা কোনো কল্যাণকর পথে প্রবাহিত হয় না, যেমন উদ্গতির ক্ষেত্রে হয়। যেমন কোনো বালিকার মা হইবার বাসনা অবদমিত হইয়া পুতুলখেলায় অভিক্রান্ত হয়; অথবা কোনো নিঃসন্তান মহিলার অবদমিত মাতৃত্বকামনা বিড়াল, কুকুর, অথবা পাখী পোষার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়।

১ কল্পনা শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

নির্জ্ঞান ইচ্ছার তৃতীয় প্রকাশ প্রণালী হইল বিপরীত গঠন (রি-অ্যাক্‌সান্ ফর্মেশন্)। এই ক্ষেত্রে নির্জ্ঞান ইচ্ছা উহার বিপরীত রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে। যেমন কিশোর জীন্ ভলজিন্ সাধু উদ্দেশ্যে একখণ্ড রুটি চুরি করিয়াছিল—এই লঘু পাপে গুরু দণ্ড লাভ করিয়া সে হঠাৎ দাগী চোর হইয়া দাঁড়াইল। আবার হয়ত কোনো সাধুব্যক্তি আঘাত পাইয়া বিপরীত অসাধু পথ অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় কালাপাহাড় হইয়া উঠিলেন।

সংবেশন ও অভিভাবন

সংবেশন (হিপ্‌নোটিজ্‌ম্) এবং অভিভাবন ও (সাজেশন্) নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। সংবিষ্ট ব্যক্তিকে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিবার পর কোনো কাজ করিতে আদেশ করিলে, সে ঐ আদিষ্ট কাজটি যথাবিধি সম্পন্ন করে, যদিও সংবেশকের আদেশেব কথা তাহার আদৌ মনে থাকে না। অবশ্য সংবিষ্ট অবস্থাটি সম্পূর্ণ নির্জ্ঞান অবস্থা কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। ইহা একপ্রকার লঘু অন্তর্জ্ঞান বা আসংজ্ঞান অবস্থাও হইতে পাবে, কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে সংবিষ্ট অবস্থায প্রদত্ত সংবেশকের অভিভাবন বা আদেশ সংবিষ্ট ব্যক্তির নীতি এবং ধর্মবোধের বিরুদ্ধ হইলে সে উহা পালন করে না।

উপসর্গ বা রোগলক্ষণ

আবার অস্বভাবী মনের নির্জ্ঞান ইচ্ছা বহুবিধ মানসব্যাধির উপসর্গ বা লক্ষণের (সিম্‌প্‌টম্) আকার লইয়াও প্রকাশিত হয়। আবেশিক বায়ুর (অব্‌সেশন্যাল সাইকনিউরোসিস্) মধ্যে শুচিবায়ুর (টাচ্‌ ম্যানিয়া) দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। শুচিবায়ু রোগী সদাই অশুচির ভয়ে ভীত। শরীর পবিত্র রাখিবার অছিলায় সে স্নান করিতেই থাকে, অথবা আহারের পর সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ ধুইয়াও তৃপ্ত হয় না। আবার গণনা-বায়ু (কাউন্টিং ম্যানিয়া) রোগী কোনো জিনিস গুণিতে আরম্ভ করিয়া গণনা-কার্য শেষ করিতে পারে না—সে গুণিয়াই যাইতে থাকে, কারণ তাহার আশঙ্কা এই যে গণনা হয়ত কোথায় ভুল হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার রোগলক্ষণের পশ্চাতে সর্বদাই কোনো না কোনো নিষিদ্ধ কামনা থাকে যাহা অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞান মনে অজ্ঞাতবাস করে। আবার ভয়বায়ুগ্রস্ত

(ফিয়ার্ ম্যানিয়া) রোগী নানা বস্তু হইতে অকারণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়। শৈশবে অবদমিত কোনো অন্যায় নির্জ্ঞান কামনাই ভয় ও আশঙ্কা-রূপে প্রকাশিত হয়। এইরূপে হিস্টিরিয়া, ভ্রমবাতুলতা (প্যারানয়্যা), বিষাদ-বায়ু (মেলান্কলিয়া), চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (ডিমেন্সিয়া প্রিকক্স্) প্রভৃতি মানসব্যাধির লক্ষণগুলির মূলেও কোনো অবদমিত নির্জ্ঞান কামনা থাকে।

৬। উপসংহার

উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে মন শুধু চেতন নয়। চেতনা মনের উপরকার স্তর মাত্র। সংজ্ঞান বা চেতন মনের ভিতরে ইহার আরও অন্ততঃ তিনটি স্তর আছে—যথা অন্তর্জ্ঞান, আসংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান। অন্তর্জ্ঞান স্তরটি অচেতন বা নির্জ্ঞান হয়। অন্তর্জ্ঞান একটি অস্পষ্ট-চেতন মানস স্তর। চেতনা-ক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দুটি হইল স্পষ্টতম চেতনার স্থান। ঐ কেন্দ্র হইতে চেতনাক্ষেত্রের পরিধির দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, চেতনার স্পষ্টতা ততই কমিতে থাকে। এইরূপ অস্পষ্ট-চেতনাই অন্তর্জ্ঞান। কিন্তু অন্তর্জ্ঞান মনের সাহায্যে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি মানসবৃত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ স্মৃতিতে যে বিষয় মনে পড়িয়া যায়, অথবা প্রত্যভিজ্ঞায় যে বস্তু চিনিতে পারা যায়, সেই বিষয় বা বস্তু স্মৃত বা প্রত্যভিজ্ঞাত হইবার পূর্বে অস্পষ্ট চেতন ভাবে মনে অবস্থান করিতেছিল এইরূপ ধারণা অযৌক্তিক।

উপরোক্ত মানসবৃত্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলে অন্তর্জ্ঞান স্তর হইতেও গভীরতর একটি অচেতন স্তর স্বীকার করিতে হয়, যাহার নাম আসংজ্ঞান। বস্তু স্মৃত বা অভিজ্ঞাত হইবার পূর্বে আসংজ্ঞান স্তরে অচেতন ভাবে অবস্থান করিতেছিল। চেষ্টা করিলেই এইরূপ বিষয়ের স্মরণ বা প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব; কারণ ইহা পূর্বজ্ঞাত বিষয়কে বিকৃত না করিয়াই সংজ্ঞানে বা চেতনায় আনিতে পারে।

আসংজ্ঞান অপেক্ষা গভীরতর স্তর হইল নির্জ্ঞান মন। এই স্তরটিও আসংজ্ঞানের মত অচেতন। কিন্তু আসংজ্ঞান বস্তু যেমন অবিকৃতভাবে সংজ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করে, নির্জ্ঞান বস্তু তেমন করে না। নির্জ্ঞান বস্তু বিকৃত হইয়া সংজ্ঞানে উপস্থিত হয়।

এই পার্থক্যগুলি মনে রাখিলে সংজ্ঞান, অন্তর্জ্ঞান, আসংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান মানসস্তর সম্বন্ধে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না।

৭। মনের বিভিন্ন ক্রিয়া

মনোবিদ্যা মানসক্রিয়ার বিদ্যা। কোন নিষ্ক্রিয় মানসসত্তা থাকিলেও তাহা মনোবিদ্যার বিষয় নয়। মনোবিদ্যার বিষয় হইল বিভিন্ন মানসপ্রকাশ বা ক্রিয়াগুলি। সুতরাং মানসক্রিয়া প্রধানতঃ কি কি এবং উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি তাহা জানা দরকার। এই বিষয়ে মতভেদের অন্ত নাই।

মানসবৃত্তি প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, (১) জ্ঞানাত্মক, অবগতিমূলক বা চিন্তাত্মক (কগ্‌নিটিভ্ বা থিঙ্কিং), (২) বেদনাত্মক বা অনুভবাত্মক (অ্যাফেক্‌টিভ্ বা ফিলিং) এবং (৩) ক্রিয়াত্মক বা ইচ্ছাত্মক (কোনেটিভ বা উইলিং)।

চিন্তা

সকল জ্ঞানমূলক মানসক্রিয়ার সাধারণ নাম চিন্তন বা থিঙ্কিং। **বিষয়-মুখিতা** বা অব্‌জেক্‌টিভিটি চিন্তনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোনো চিন্তাই উহার বিষয় বা অব্‌জেক্ট্‌কে ইঙ্গিত না করিয়া ঘটে না। দ্বিতীয়তঃ, **চেতনা** বা কন্‌সাচ্‌নেস্ অন্যান্য মানস-ক্রিয়ার মত চিন্তনেরও একটি বিশেষ লক্ষণ। সকল চিন্তনের সহিতই এই ক্রিয়া যে চলিতেছে এইরূপ বোধ থাকে। তৃতীয়তঃ, চিন্তন প্রধানতঃ একটি **জ্ঞাননিষ্ঠ** (থিওরেটিক্যাল্) মানসক্রিয়া। চিন্তনের প্রধান কাজ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা। চতুর্থতঃ, চিন্তন জ্ঞাননিষ্ঠ হওয়ায় **নিষ্ক্রিয়** মানসক্রিয়াও বটে। মানসক্রিয়া অর্থে চিন্তন সক্রিয় হইলেও, ইহা বিষয়ে কোন পরিবর্তন ঘটায় না, যদিও বিষয়ের জ্ঞানে পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে। চিন্তন স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইলেও ক্রিয়ার সহায়তা করিতে পারে। যেমন কেহ একটি ফুলের কথা চিন্তা করিতেছে। এই ক্ষেত্রে ফুলের চিন্তাটি ব্যক্তির নিজস্ব মানসক্রিয়া, সন্দেহ নাই। কিন্তু চিন্তার বিষয় একটি ফুল, যাহা ব্যক্তির নিজস্ব নয়। দ্বিতীয়তঃ, এই চিন্তার সচেতনতা আছে, কারণ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে উহার চেতনা রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, ফুলের চিন্তা ফুলের জ্ঞান লাভে সহায়তা করে এবং চতুর্থতঃ, ফুলের চিন্তা নিষ্ক্রিয়, কারণ ফুলের চিন্তা হইলেই যে ফুল লইবার চেষ্টা হইবে এমন কোনো কথা নাই।

চিন্তন প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বৃত্তিগুলি লইয়া গঠিত—যথা, সংবেদন বা সেন্‌সেশন্‌, প্রত্যক্ষ বা পার্সেপ্‌শন্‌, স্মরণ বা মেমরি, কল্পনা বা ইম্যাজিনেশন্‌, বিশ্বাস বা বিলিফ্‌, প্রত্যয় বা ধারণা বা কন্‌সেপ্ট্‌, অবধারণা বা জাজ্‌মেণ্ট্‌ এবং যুক্তি বা রিজ্‌নিং।

চিন্তার স্তরভেদ

সংবেদন চিন্তনক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা সরল ও সহজ বৃত্তি। উদ্দীপক (ষ্টিমুলাস্‌) ইন্দ্রিয়গোলককে (সেন্স্‌-অর্গ্যান্‌) উদ্দীপিত করিলে এবং সেই উদ্দীপনা স্নায়ুপ্রবাহ বা নার্ভপ্রবাহ (নার্ভাস্‌ ইম্‌পাল্‌স্‌) রূপে অন্তর্বাহী (এফেরেণ্ট্‌) স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে বা মেরুমজ্জায় প্রবাহিত হওয়ায় রং, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ সম্বন্ধে যে চেতনামাত্র (বেয়ার কন্‌সাচ্‌নেস্‌) ঘটে তাহাকে সংবেদন বলে।

সংবেদন বা চেতনা—মাত্র বস্তুকে বিশিষ্টভাবে জানে না। সংবেদন বিশিষ্ট আকারে ব্যাখ্যাত হইলে উহার বস্তুর বা বিষয়ের অর্থবোধ হয়। এইরূপ বিশিষ্ট বা ব্যাখ্যাত সংবেদনকে বলে **প্রত্যক্ষ**। যেমন, ফুলটি মাত্র আছে—ইহার এই চেতনাকে বলা যায় সংবেদন। কিন্তু যে বস্তুটি মাত্র আছে বলিয়া বোধ হইয়াছে সেই বস্তুটি একটি ফুল—এইরূপ বিশেষ প্রকারের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা যায়।

প্রত্যক্ষ মনে যে বিষয়ের ছাপ, সংস্কার, মূর্তি অথবা রেখা (ইম্‌প্রেশান্‌, ট্রেস্‌, কপি, ইত্যাদি) রাখিয়া যায় তাহাকে প্রতিরূপ (ইমেজ্‌) বলে। এই প্রতি-রূপকে মনে মনে জাগরূক করিবার নাম স্মৃতি (মেমরি)। প্রত্যক্ষ বিষয়ের অবিকল পুনরুদ্বোধনকে **স্মৃতি** বলে।

আবার প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতিরূপগুলিকে অবিকল ভাবে পুনরুদ্বুদ্ধ না করিয়া যদি অদলবদল করিয়া অথবা উহাদিগকে নূতন ভাবে সাজাইয়া জাগরূক করা হয় তাহা হইলে এই ক্রিয়াকে **কল্পনা** (ইম্যাজিনেশন্‌) বলে।

অনেকগুলি প্রতিরূপের সাধারণ লক্ষণকে একটি ধারণায় গ্রথিত করিবার নাম **প্রত্যয়** (কন্‌সেপ্ট্‌)। একটি প্রত্যয়ের সহিত অপর একটি প্রত্যয়কে সম্বন্ধ করার নাম **অবধারণা** (জাজ্‌মেণ্ট্‌) এবং একাধিক অবধারণাকে যুক্ত করিয়া কোনো নূতন জ্ঞান আহরণ করিবার মানসক্রিয়াকে বলা হয় **যুক্তি** (রিজ্‌নিং)।

দৃষ্টান্ত

যেমন একটি রূপ বা রং নির্বিশেষভাবে দেখার নাম উহার রূপ-সংবেদন এবং এই সংবেদনের অর্থবোধসহ রূপ দেখার নাম রূপ-প্রত্যক্ষ। রূপ-প্রত্যক্ষের ফলে উহার একটি প্রতিরূপ মনে সংরক্ষিত হয়, যে কারণে ঐ রূপ স্মরণ করা যাইতে পারে অথবা উহাকে রকমফের করিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে।

অনুভূতি

চিন্তন যেমন একটি অবগতিমূলক বৃত্তি অনুভূতি বা বেদনা সেইরূপ নয়। অবশ্য ব্যাপক অর্থে ইহাও জ্ঞানাত্মক, কারণ সকল বেদনা এবং অনুভূতিতেই চেতনা থাকে, অথবা সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বেদনা এবং ভালবাসা-ঘৃণা প্রভৃতি অনুভূতি অনুভূত বা বোধগম্য হয়। কিন্তু চিন্তন যে অর্থে জ্ঞাননিষ্ঠ মানসবৃত্তি বেদনা বা অনুভূতিকে সেই অর্থে জ্ঞাননিষ্ঠ মানসবৃত্তি বলা যায় না। চিন্তনের মত বেদনার বিষয়মুখিতা নাই, ইহা শুধু পাত্রের মানসিক অবস্থা ইঙ্গিত করে, কিন্তু উহার বাহিরে বা উহা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তুর বা বিষয়ের ইঙ্গিত করে না। অর্থাৎ বেদনা বা অনুভূতি পাত্রগত বা মনোগত (সাব্‌জেকটিভ্)। ইহা পাত্রের বা জ্ঞাতার একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা। যাহার সুখ হইয়াছে শুধু সে-ই উহার ভোক্তা, উহার প্রকৃত অংশীদার অপর কেহ নাই। তাহা ছাড়া সুখানুভূতির কোনো বিষয়মুখিতা নাই, উহা পাত্রের বা জ্ঞাতার অনুভূতিতেই পর্যবসিত। তৃতীয়তঃ, বেদনা বা অনুভূতি নিষ্ক্রিয় (প্যাসিভ্)—ইহা স্বভাবতঃ কোনো কর্মে পরিণতি লাভ করে না। চিন্তন নিষ্ক্রিয় হইলেও কর্মে সহায়তা করে। কিন্তু বেদনা বা অনুভূতি কর্মে সহায়তা করে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। গভীর সুখ বা দুঃখ ব্যক্তিকে ঐ ঐ অনুভূতি বা বেদনায় মগ্ন বা তদ্গত করে, কিন্তু কর্মে প্রবৃত্ত করে না।

অনুভূতির স্তরভেদ

ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী অনুভূতির কয়েকটি প্রধান স্তর-বিভাগ আছে, যথা **ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি** বা **বেদনা** (সেন্স্ ফীলিং), ভাবজ অনুভূতি অথবা **প্রক্ষোভ** (আইডিয়্যাল ফীলিং বা ইমোশন্) এবং আদর্শজ অনুভূতি বা **রস** (সেন্টিমেন্ট)। ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনাজনিত সংবেদনের ফলে

সুখদুঃখানুভূতি ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি। আবার ভাব বা ধারণা হইতে যে হর্ষ-বিষাদ, ভয়, ক্রোধ, ভালবাসা-ঘৃণা প্রভৃতি অনুভূতি জন্মে সেইগুলিকে বলে ভাবজ অনুভূতি। তৃতীয়তঃ, সৌন্দর্য, সত্য, চরিত্র প্রভৃতি আদর্শকে অবলম্বন করিয়া কতগুলি প্রক্ষোভের সংগঠনফলে যে সকল অনুভূতি উৎপন্ন হয় উহাদিগকে বলে রস।

যেমন সুস্বাদু খাদ্য আহার করিয়া যে সুখ হয় তাহা ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি, কোনো সুসংবাদ পাইয়া যে সুখ হয় তাহা ভাবজ অনুভূতি, আবার কোনো সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া যে সুখ জন্মায় তাহা আদর্শজ অনুভূতি।

ইচ্ছা

ক্রিয়া বা ইচ্ছা প্রধানতঃ কার্যকরী (প্র্যাক্‌টিক্যাল্) মানসবৃত্তি। ইচ্ছা সক্রিয় এবং কর্মের প্রেরকশক্তি। ইচ্ছা যেমন মনোগত (সাব্‌জেক্‌টিভ্) তেমন বিষয়গতও (অব্‌জেক্‌টিভ্) বটে। ইচ্ছার একটি অনুভববেদ্য দিক্ আছে, যাহা শুধু পাত্র বা জ্ঞাতাই জানে, আবার ইহাতে একটি কর্মে পরিণত হইবার প্রবণতা বা বিষয়মুখিতাও বর্তমান। ইচ্ছার সহিত চিন্তনের বিষয়মুখিতার সিক্ দিয়া সাদৃশ্য আছে। আবার ইচ্ছা যেমন প্রধানতঃ সক্রিয় এবং কার্যকরী, চিন্তন সেইরূপ নয়। চিন্তন ক্রিয়া বা বুদ্ধিকে স্পষ্ট বা মার্জিত করিয়া ক্রিয়া সম্পাদনে সহায়ক হইলেও, মুখ্যভাবে সক্রিয় এবং কার্যকরী মানসবৃত্তি নয়। আবার অনুভূতির সহিত ইচ্ছার পার্থক্য সকল দিক্ দিয়াই। অনুভূতি পাত্রগত, কিন্তু ইচ্ছা বিষয়গত। আবার, অনুভূতি নিষ্ক্রিয় এবং অকার্যকরী, কিন্তু ইচ্ছা সক্রিয় এবং কার্যকরী। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে মনে হয় যে ইচ্ছা এবং অনুভূতি পরস্পরবিরোধী মানসবৃত্তি, কিন্তু চিন্তন ইহাদের মধ্যে সেতুস্বরূপ। চিন্তনে অনুভূতি এবং ইচ্ছা এই উভয়ের ধর্মই আংশিকভাবে বর্তমান।

ইচ্ছার স্তরভেদ

ক্রিয়ামূলক সকল বৃত্তির (কোনেশন্) প্রকারভেদ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ক্রিয়াকে অনৈচ্ছিক (নন্-ভলাণ্টারি) এবং ঐচ্ছিক (ভলাণ্টারি) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে ক্রিয়া ইচ্ছার অভাবে অথবা সহজভাবে ঘটে তাহাকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলে। আবার যে ক্রিয়া ইচ্ছা-পূর্বক বা ইচ্ছা করিয়া করা হয় তাহাকে ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলে।

অনৈচ্ছিক ক্রিয়া নানা প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। যথা স্বতঃস্ফূর্ত (স্পন্ট্যানিয়াস), প্রতিবর্ত (রিফ্লেক্স), সহজ (ইন্‌স্টিংক্‌টিভ্), এবং ভাবনাজ (ইডিও-মোটর)। অভ্যাস (হ্যাবিট্) বস্তুতঃ অনৈচ্ছিক ক্রিয়া নয়, যদিও ইহাকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলিয়াই মনে হয়। যে ক্রিয়া কোনো বাহ্য উদ্দীপকের সাহায্য ছাড়া স্বতঃ উৎপন্ন হয় তাহাকে **স্বতঃস্ফূর্ত** ক্রিয়া বলে। শিশুর আপন মনে খেলা করা, হাত পা ছোঁড়া প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি অনৈচ্ছিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত। এই কাজগুলি বাহিরের কোনো উদ্দীপকের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা-আপনি ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, যে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া উদ্দীপকের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শমাত্র বুদ্ধি বা চেতনার উপর নির্ভর না করিয়া স্বাভাবিক-ভাবে সংঘটিত হয় তাহাকে **প্রতিবর্ত** ক্রিয়া (রিফ্লেক্স অ্যাক্‌শন) বলে। যেমন আগুনে হাত লাগিবা মাত্র হাত সরাইয়া লওয়া হয়, চক্ষুতে ধূলা বা পোকা-মাকড় ঢুকিবার উপক্রম হওয়া মাত্র চক্ষুর পাতা বুজিয়া যায়। তৃতীয়তঃ, যে ক্রিয়া-প্রবাহ (সিরিজ্ অফ্ অ্যাক্‌শন্‌স্) অজ্ঞাতভাবে অথবা শিক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া বংশগত (হেরিডিটারি) ভাবে আত্মরক্ষা (সেল্‌ফ্ প্রিজারভেশন্) বা আত্মপ্রজনন (সেল্‌ফ্ রিপ্রডাক্‌শন্)-মূলক উদ্দেশ্য সাধন করে তাহাকে বলে **সহজ প্রবৃত্তি** (ইন্‌স্টিংক্‌ট্)। বাবুই পাখী ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হইলে অতুলনীয় চাতুর্যের সহিত পুরুষ পরম্পরাক্রমে একই প্রকাব বাসা তৈযাবী করে, অথবা মাকড়সা তাহার জাল বিস্তার করিয়া পুরুষ-পরম্পরাক্রমে একই প্রকারে শিকার ধরে। এই দুইটি সহজ ক্রিয়ার উদাহরণ। চতুর্থতঃ, ভাবনা বা প্রত্যয় হইতেই যে ক্রিয়া ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে ঘটিয়া থাকে তাহাকে **ভাবনাজ (ইডিও-মোটর) ক্রিয়া** বলে। যেমন পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা করিতে করিতে বাস্তবিকই পড়িয়া যাওয়া ঘটিতে পারে।

প্রথমে ইচ্ছাপূর্বক কোন ক্রিয়া পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে পরে সহজ বা অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়। এইরূপ ক্রিয়াকে **অভ্যাস** (হ্যাবিট্) বলে। এই ক্রিয়া আংশিকভাবে ঐচ্ছিক এবং আংশিকভাবে অনৈচ্ছিক। ইহাকে মুখ্যতঃ ঐচ্ছিক কিন্তু গৌণতঃ অনৈচ্ছিক (প্রাইমাবিলি ভলান্টারি বাট্ সেকেণ্ডারিলি অটোম্যাটিক্ অ্যাক্‌শন্) ক্রিয়াও বলা হইয়া থাকে। কারণ প্রথমে ইহা ইচ্ছা করিয়াই করা হইয়াছিল, কিন্তু বার বার করিবার ফলে কাজটি আপাতদৃষ্টিতে অনৈচ্ছিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার কতগুলি স্তরভেদ রহিয়াছে—যেমন তাড়না (ইম্‌পাল্‌স্‌, অ্যাপিটাইট্‌), উদ্দেশ্য বা প্রেরণা (মোটিভ্‌), কামনা (ডিজায়ার), ইচ্ছা (উইস্‌), অভিপ্রায় (ইন্‌টেনশন্‌) এবং সঙ্কল্প (উইল্‌)। ক্ষুধার্ত শিশু ক্ষুধার **তাড়নায়** বা আবেগে হাতের কাছে যাহা পাইল তাহাই মুখে পুরিল। আবার সেই শিশুই আরও বড় হইয়া আহারের **উদ্দেশ্যে** সচেষ্ট হইল, অথবা তাহার কোন আহার্য বস্তুর **কামনা** জাগিল, অথবা সে **ইচ্ছা** করিল যে সে আহার করিবে, অথবা আহারের **অভিপ্রায়ে** সে কোনো উপায় উদ্ভাবন করিল, অথবা আহার করা উচিত কি অনুচিত এই ইচ্ছাদ্বন্দ্ব দূর করিয়া সে **সঙ্কল্প** করিল যে সে আহার করিবে।

এই স্তরগুলির মধ্যে যে কোনো নির্দিষ্ট ভেদরেখা আঁকিতে হইবে এমন নয়—ইহাদের আগের স্তরটি পরেরটিতে অস্পষ্টভাবে মিলাইয়া যায়।

উপসংহার

উপরে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত মানসবৃত্তিগুলির ধারণা না থাকিলে মনোবিদ্যা পাঠে অগ্রসর হওয়া কঠিন। চিন্তন, ইচ্ছা এবং অনুভূতিমূলক মানসক্রিয়াগুলির দ্বন্দ্বাভিঘাতেই মন কাজ করিয়া থাকে।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

মেলোন্‌ অ্যাণ্ড্‌ ড্রামণ্ড্‌—এলিমেণ্টস্‌ অফ্‌ সাইকলজি—চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জি. এফ. স্টাউট্‌—এ ম্যানুয়াল্‌ অফ্‌ সাইকলজি—ভূমিকা—প্রথম পরিচ্ছেদ, ১ম খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ

ডঃ এস্‌. সি. মিত্র—মনঃসমীক্ষণ—পৃঃ ৮/০

পি. এন্‌. ভট্টাচার্য—নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব—দর্শন ১৩৫৭।

Exercise

1. Can you define consciousness? What is the nature of consciousness? (p. 263)
2. Define the focus as distinguished from the field of consciousness. (pp. 263-264)
3. What are the different levels of consciousness? Describe their nature and inter-relation. (pp. 265-267)
4. Is mind co-extensive with consciousness? Discuss. (pp. 265-267)
5. What is meant by the sub-conscious? What are the evidences of the sub-conscious? (pp. 266-270)

6. On what grounds is the unconscious regarded as a level of mind ? (pp. 270-274)
7. Is the assumption of any unconscious mental life necessary ? Discuss. (pp. 270 274)
8. Distinguish between the sub-conscious and the unconscious levels of mind. (pp. 268-269
9. Distinguish between the sub-conscious and the pre-conscious mental life. (pp 268-269)
10. Give an analysis of the fundamental mental processes (pp. 275-250)
11. Distinguish between cognition, affection and conation (pp. 275-280)

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

প্রেষণা—মোটিভেশন্

১। প্রেষণা কাহাকে বলে

চেষ্টা বা কাজ করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। কাজ না করিয়া মানুষ এক মুহূর্তও থাকিতে পারে না। ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। কিন্তু মানুষ কাজ করে কেন? কোনো অভাববোধ হইতে উৎপন্ন অস্বস্তি দূর করিবার জন্য অথবা যে উদ্দেশ্য সাধিত হইলে অভাব দূর হয় তাহা লাভ করিবার জন্যই মানুষ কাজ করে।

প্রেষণা বা **মোটিভেশন্** বলিতে বুঝায় এমন চেষ্টা, কর্ম বা আচরণ যাহা অভাব বা প্রয়োজন বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সাধনের দিকে পরিচালিত। অর্থাৎ কোনো অভাব মিটাইবার অথবা উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আচরণ বা চেষ্টিতকেই এক কথায় প্রেষণা বা মোটিভেশন্ বলে।

অভাব বা প্রয়োজনবোধ এবং উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যাভিমুখিতা যে সর্বদা চেতন হইবে এমন কোনো কথা নাই। যেমন জৈব ক্রিয়া প্রায়ই চেতন অভাব এবং উদ্দেশ্যবোধ ছাড়াই সাধিত হয়। পাখী সহজ প্রবৃত্তির (ইন্‌স্টিংক্‌ট্) বশবর্তী হইয়া বাসা তৈয়ারী করে। তাহার বাসা তৈয়ারী করিবার পশ্চাতে নিজ এবং ভাবী সন্তানের আশ্রয় রচনার প্রয়োজনবোধ এবং উদ্দেশ্য থাকিলেও, এই প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহার স্পষ্ট চেতনা থাকে না।

প্রেষণার বিশ্লেষণ

প্রেষণার (মোটিভেশন্) বিশ্লেষণ করিলে এই স্তরগুলি পাওয়া যায়। (ক) অভাব বা প্রয়োজনবোধ (নীড্), (খ) এই অভাব মিটাইবার নোদনা (ড্রাইভ্) এবং (গ) কোনো উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা, যে উদ্দেশ্য সাধিত হইলে অভাব মিটে।

(ক) **অভাব** বা **প্রয়োজনবোধ** একটি অস্বস্তিকর অবস্থা। ইহা না মিটিলে অস্বস্তি দূর হয় না। যেমন ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হইলেই পাখী আশ্রয় বা বাসার অভাব অস্পষ্টভাবে বোধ করে। এই অভাববোধ তাহাকে অশান্ত এবং চঞ্চল করিয়া তোলে। ক্ষুধিত শিশু আহার্যের অভাব

বা প্রয়োজন বোধে অস্থির হইয়া ওঠে এবং তাহার পিতামাতাও তাহার আহার্য সংগ্রহের জন্য উৎকণ্ঠিত এবং চিন্তিত হন।

(খ) অভাববোধ একটি দুঃখকর বা অস্বস্তিকর অবস্থা। ইহা প্রাণীকে অশান্ত বা চঞ্চল করিয়া তোলে। এই দুঃখবোধ প্রাণীকে অভাব দূর করিবার জন্য তাড়িত বা প্রবৃত্ত করে। অভাববোধ শুধু একটি নিষ্ক্রিয় অনুভূতি মাত্র নয়, কিন্তু এমন একটি শক্তি যাহা প্রাণীকে সক্রিয় করে। যেমন আশ্রয়াভাবের অস্বস্তিবোধ পাখীকে বাসা নির্মাণে তাড়িত করে। ক্ষুধিত শিশু ক্ষুধার জ্বালা মিটাইবার জন্য কাঁদিয়া কাটিয়া খাদ্য আদায় করে।

(গ) অভাব মিটাইবার তাড়না যেমন প্রাণীকে পিছন হইতে ধাক্কা দেয়, যে উদ্দেশ্য সাধিত হইলে এই অভাব মিটিবে তাহা তাহাকে সম্মুখ হইতে আকর্ষণ করে। অভাববোধ একটি বাস্তব ও বর্তমানে অনুভূত অবস্থা। ইহা প্রাণীকে নানা কর্ম প্রচেষ্টায় সক্রিয় করে। কিন্তু অভাববোধ যেমন প্রাণীকে উহা মিটাইবার জন্য পিছন হইতে তাড়িত করে, তেমনই উহাকে পরিচালিত করে একটি ভাবী অবস্থাকে বর্তমানে রূপান্তরিত করিতে। অভাবের পূর্ণতাই এই ভাবী অবস্থা, এবং ইহাই কর্ম প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। ইহা বর্তমান বা অতীতের কোনো অবস্থামাত্র নয়, কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত একটি সম্মুখবর্তী বা সাম্‌নের অবস্থা। সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রাণীর কোনো স্পষ্ট জ্ঞান থাকে না, কিন্তু থাকে একটি অস্পষ্ট বা অবচেতন জ্ঞান।

প্রেষণা বা মোটিভেশন্ বলিতে এইরূপ আচরণ বা ক্রিয়া বুঝায় যাহা কোনো অভাববোধের এবং ঐ অভাববোধ দূর করিবার উদ্দেশ্যের তাড়না দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত।

সকল কাজই প্রেষিত কি না

মানুষ কাজ করে কেন অথবা মানুষের কাজের মোটিভেশন্ বা প্রেষণা কি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে মানুষ কোনো অভাবজনিত অশান্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে কাজ করে। আরও প্রশ্ন এই যে মানুষের সকল কাজই প্রেষিত (মোটিভেটেড্) কি না। উত্তরে বলা যায় যে মানুষের সকল কাজই প্রেষিত। কোনো কোনো কাজের প্রেষণা চেতন, আবার কোনো কোনো কাজের প্রেষণা অবচেতন। যেমন প্রতিবর্ত ক্রিয়া (রিফ্লেক্স্ অ্যাক্‌শন্) ইন্দ্রিয়ের সহিত উদ্দীপকের সংস্পর্শ হইবামাত্র ঘটে—যথা, হাতে আগুন

লাগিবামাত্র হাত সরাইয়া লওয়া হয়। এইরূপ ক্রিয়ায় কোনো অভাববোধ, তাহার তাড়না বা নোদনা এবং বিপদ পরিহার করিবার উদ্দেশ্য প্রভৃতি প্রেষণার স্তরগুলি স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হয় না। কিন্তু ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণের মতে এমন কি প্রতিবর্ত ক্রিয়াও প্রেষণার উপরোক্ত কারণগুলি দ্বারা উৎপন্ন হয়, যদিও উহাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট চেতনা থাকে না।

২। নোদনা—ড্রাইভ্

মোটর গাড়ী ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হয়। তেমন কর্ম বা চেষ্টা অভাববোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইঞ্জিন দ্বারা চালিত না হইলে মোটর গাড়ী নিষ্ক্রিয় এবং গতিহীন থাকে। ইঞ্জিন যেমন মোটর গাড়ীর চালক, অভাববোধও তেমন কর্ম প্রবৃত্তির চালক বা নোদক।

কোন্ কোন্ নোদক বা ড্রাইভ্ মানুষকে কর্মে চালিত করে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পুর্বে নোদক কাহাকে বলে জানা দরকার। **নোদক একটি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অথবা টিস্যু-এর অবস্থা যাহা নির্দিষ্ট আচরণ বা চেষ্টিতকে উদ্দীপিত করে।** এই উদ্দীপনাই মনে অভাব বা প্রয়োজন বোধরূপে অনুভূত হয় এবং একটি অশান্ত বা অস্থির অবস্থার সৃষ্টি করে।

নোদক এবং উদ্দেশ্য

নোদক বা ড্রাইভ্ এবং উদ্দেশ্য বা মোটিভ্-এর মধ্যে পার্থক্য বিচার্য। অনেক মনোবিদ্ ইহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে নোদকই উদ্দেশ্য, আবার উদ্দেশ্যই নোদক। তাঁহারা বলেন যে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের বা টিস্যু-এর পুষ্টি বা ক্রিয়ার পরিবর্তনই আচরণের বা চেষ্টিতের আসল নোদক এবং পরিবর্তিত অবস্থার সহিত অঙ্গীর উপযোজনই ইহার আসল উদ্দেশ্য।

কিন্তু নোদক এবং উদ্দেশ্যের এই অভিন্নতা মনোবিদ্যার দিক হইতে সম্পূর্ণ স্বীকার করা যায় না। নোদক একটি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অবস্থা অথবা উহার ফলে উদ্ভূত মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য বা অভাববোধ। কিন্তু এই যান্ত্রিক এবং মানসিক কারণটি বর্তমান অথবা অতীত হইয়াও কোনো ভবিষ্যতে পুরণীয় অবস্থার দিকে মানুষকে পরিচালিত করে। অন্ততঃ মানুষের ক্ষেত্রে চেষ্টিতের এই উদ্দেশ্যাভিমুখিতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেক চেষ্টিতেই যে

উদ্দেশ্যের কোনো স্পষ্ট জ্ঞান বা চেতনা থাকে না তাহা ঠিক, কিন্তু এই চেতনা অবশ্যই অস্পষ্টভাবে থাকে। নতুবা মানুষের সকল কর্ম এবং চেষ্টা অন্ধকারে হাত্ড়াইয়া বেড়ানোর নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়। অথচ মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িবার মত প্রণালীতে অগ্রসর হয় না, কারণ উদ্দেশ্য সাধিত না হওয়া পর্যন্ত কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে অথবা কর্মপ্রণালীর প্রয়োজন মত রদবদল ঘটিয়া থাকে।

উপরোক্ত কারণে নোদক এবং উদ্দেশ্যের পার্থক্য স্বীকার করাই সঙ্গত।

৩। নোদনার শ্রেণীভেদ

নোদনা নানা প্রকার। কয়েক প্রকার নোদনার আলোচনা করা যাউক।

যান্ত্রিক নোদনা—অর্গ্যানিক নীড্স্

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি যান্ত্রিক নোদকের দৃষ্টান্ত। ক্ষুধা এক প্রকার আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অবস্থা। উহার সঙ্গে সঙ্গে মনেরও একটি অস্থির অবস্থা ঘটে। এই অবস্থার প্রতিকার না ঘটিলে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়।

ক্ষুধা—হাঙ্গার

শারীরবৃত্তের দিক হইতে ক্ষুধা পাকস্থলীর এক প্রকার সঙ্কোচন বিশেষ। স্বাভাবিক রক্তে শর্করা বা চিনি যতটুকু থাকা দরকার তাহা অপেক্ষা কমিয়া গেলে পাকস্থলীর মসৃণ পেশী (স্মুথ্ মাস্ল্স্) সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং উহার ফলে ক্ষুধার যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়। পাকস্থলীর সঙ্কোচনে নার্ভ্-প্রবাহ ঘটিয়া উহা দৈহিক ক্রিয়া বাড়ায় এবং ক্ষুধার অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। আবার এই অস্থিরতা খাদ্য সন্ধানে এবং খাদ্য মিলিয়া গেলে আহারে প্রবৃত্ত করে।

শুধু পাকস্থলীর সঙ্কোচনই যে ক্ষুধার তাড়না জন্মায় তাহা নয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উপবাসী ইঁদুরের পাকস্থলীসঙ্কোচন নষ্ট করিয়া দিলেও সে খাদ্য খুঁজিতে থাকে এবং খাদ্য পাইলে উহা খাইতে আরম্ভ করে। তেমনই রক্তে শর্করার অভাবই যে ক্ষুধার একমাত্র কারণ তাহাও বলা যায় না। চব্বিশ ঘণ্টা অনাহারে রাখিয়া একটি মুরগীকে এক রাশি গম দিলে সে গমের

পরিমাণ অনুসারে কম বা বেশী দানা খায়। যেমন গমরাশিতে একশত গমদানা থাকিলে সে হয়ত পঞ্চাশটি দানা খায়, আবার উহাতে আরও বেশী দানা থাকিলে সে হয়ত পঁচাশীটি বা একশতটি দানা গ্রহণ করে। এই দুইটি মুরগীরই রক্তের রাসায়নিক অবস্থা একরূপ থাকে। সুতরাং এই আভ্যন্তরীণ অবস্থাই মুরগীর ক্ষুধার কারণ হইল না, কিন্তু আহার্যের পরিমাণই উহার কারণ, যেহেতু উহার অল্পাধিক্য অনুসারে আহারের পরিমাণ কম বা বেশী হয়। আবার ক্ষুধাতৃপ্তির পরও হয়ত একটি মুরগী শস্যরাশির সম্মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময় অন্য কোন ক্ষুধার্ত মুরগী যদি তাহার সম্মুখে শস্যের দানা খাইতে আরম্ভ করে তাহা হইলে সেও উহার দেখাদেখি আবার খাইতে আরম্ভ করে। এমনও দেখা যায় যে তৃপ্ত মানুষ ক্ষুধার্ত বন্ধুকে আহার করিতে দেখিয়া আবার খাওয়া সুরু করে।

এই সকল ঘটনা দেখিয়া মনে হয় যে **শুধু আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অবস্থাই ক্ষুধার একমাত্র কারণ নয়,** পরিবেশও ক্ষুধা উৎপাদনে সহায়তা করে। অপরকে খাইতে দেখিয়া আমরা খাই; খাবার খাদ্য দ্রব্য বেশী থাকিলে বেশী খাইয়া ফেলি এবং কম থাকিলে কম খাইয়া থাকি। আবার কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা স্থানে কোনো নির্দিষ্ট খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হইলে ঐ খাদ্য ঐ সময়ে বা ঐ স্থানে দেখিলেই যেন আমরা ক্ষুধাবোধ করি।

দেখা যাইতেছে যে ক্ষুধা একটি সহজাত তাড়না হইলেও, এই তাড়না কিভাবে কাজ করিবে তাহা অনেকটা নির্ভর করে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাসের উপর।

তৃষ্ণা—থার্স্ট

ক্ষুধার মত তৃষ্ণা আর একটি যান্ত্রিক নোদনা। তৃষ্ণার যান্ত্রিক কারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে মুখ ও গলা শুকাইয়া যাওয়াই তৃষ্ণার কারণ। পানীয়ের সাহায্যে গলা এবং মুখ ভিজাইলেই তৃষ্ণা দূর হয়। কিন্তু এইরূপ কারণ যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মুখ এবং গলা না ভিজাইয়া সোজাসুজিভাবে পাকস্থলী জলপুর্ণ করিলেই তৃষ্ণা মিটিয়া যায়। কাজেই তৃষ্ণার কারণ আরও গভীর বলিয়া মনে হয়। তৃষ্ণা দেহযন্ত্রে জলাভাবের সূচনা করে। অতএব রক্তে,

পাকস্থলীতে অথবা বৃহদন্ত্রে (লার্জার ইন্‌টেস্টাইনস্) জল প্রবেশ করাইলেই তৃষ্ণা মিটে।

তৃষ্ণার একটি প্রধান কারণ এই যে জলাভাবে দেহের সকল কোষগুলি উহাদের জলীয় ভাগ ত্যাগ করে। হাইপোথ্যালামাস্ কেন্দ্রে জলাভাবের প্রতি বিশেষ সংবেদনশীল কতগুলি কোষ আছে। এই কোষগুলির সহিত মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশগুলির সম্বন্ধ থাকায় উহারা দেহে জলের পরিমাণ অনুসারে পানক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে।

ক্ষুধার মত তৃষ্ণাও একটি সহজাত নোদনা। আবার ক্ষুধার মত তৃষ্ণাও পারিবেশিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। পানের নোদনা শক্তি কতখানি তাহা বুঝা যায় যাহারা মাতাল বা পানোন্মত্ত তাহাদের আচরণ দেখিয়া। বর্তমান কালে সভ্য জগতের একটি বিশেষ অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে চা-পানের আসর। আবার পান এমনই গুরুতর বিষয় হইয়া পড়িয়াছে যে কোন ব্যক্তি অপরের "স্বাস্থ্য পান করে।"

নিদ্রা—স্লীপ্

অন্ন-পানেব মত নিদ্রাও একটি শক্তিশালী নোদনা। একটু ঘুমাইবার জন্য মানুষ কত চেষ্টাই না করে। জাগরণের কর্মব্যস্ততায় যে শক্তি ব্যয়িত হয় অথবা দেহের যে ক্ষয়-ক্ষতি ঘটে নিদ্রায় তাহার সম্পূরণ হইয়া থাকে।

ঘুম রক্তের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ঘটে না। নিদ্রিত কুকুরের রক্ত জাগ্রত কুকুরের দেহে প্রবিষ্ট করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহা দ্বিতীয় কুকুরকে নিদ্রাবিষ্ট করে না। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে নিদ্রার কেন্দ্র মস্তিষ্কে অবস্থিত।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে নিদ্রা যখন একটি নিষ্ক্রিয় এবং কর্মবিরত অবস্থা, তখন ইহাকে কর্মপ্রচেষ্টার বা আচরণের নোদক বলা যায় কি করিয়া। উত্তর এই যে নিদ্রা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষভাবে কর্মজীবনের নোদক বা চালক নয়। কিন্তু ইহা কর্মের বাধা বা উহাতে আলস্য, জড়তা ও অবসাদ দূর করিয়া কর্মশক্তির খোরাক যোগায়। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও অন্ততঃ পরোক্ষভাবে নিদ্রা কর্মজীবন বা আচরণের একটি শক্তিশালী নোদক। ইহার ফলে প্রান্তীয় সন্নিকর্ষের বাধা (সাইনাপ্‌টিক্ রেজিস্ট্যান্স্) দূর হয় এবং নার্ভ প্রবাহের চলাচল সহজ হইয়া ওঠে।

কামাবেগ—সেক্সুয়্যাল্ ইম্‌পাল্‌স্

কর্মপ্রচেষ্টার বা আচরণের আর একটি মস্ত বড় নোদক হইল কামাবেগ বা সেক্সুয়্যাল ইম্‌পাল্‌স্। কাম যে একটি শক্তিশালী নোদক তাহা তন্ত্রশাস্ত্রকার হইতে আরম্ভ করিয়া ফ্রয়েড্ পর্যন্ত অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। ফ্রয়েড্-এর মতে সকল প্রেষণার মূল হইল কাম। ইহারই স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক গঠনের উপর নির্ভর করে সকল প্রকার আচরণ।

কাম বা যৌনশক্তির প্রাধান্য কতখানি তাহা বুঝা যায় যখন অত্যন্ত সাহসিক আচরণ বা কর্মশক্তিকে বলা হয় পুরুষোচিত (ম্যাস্‌কুলিন্), আবার অত্যন্ত মৃদু বা কোমল আচরণকে বলা হয় স্ত্রীসুলভ (ফেমিনিন্)। যৌন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কি স্ত্রী কি পুরুষ প্রত্যেকের আচরণেই পরিবর্তন ঘটে। গলার স্বর, চালচলন, কাজকর্ম প্রভৃতি সকল দিক দিয়াই একটি বিপ্লব আনিয়া দেয় যৌনবিকাশ।

যৌন নোদনা সহজাত এবং বংশগত নোদনা। ইহার নোদনা যে সকল বয়ঃস্তরেই সমানভাবে সক্রিয় হয় তাহা নয়। শৈশবে ইহা সুপ্ত থাকিয়া নানা আচরণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। শিশুর যৌন কামনা লিঙ্গ বা কামকেন্দ্রকে অবলম্বন করিতে না পারিয়া দেহের বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গকে অবলম্বন করে। এই কারণে শিশুকে 'বহুমুখকামী' (পলিমর্ফাস্ পার্ভার্স) বলা হয়। যৌবনে যৌন কামনা লিঙ্গে কেন্দ্রীভূত হয়। তারপর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইহা সক্রিয় থাকে এবং বিভিন্ন আচরণের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়।

কামজীবনের একটি চক্রবৎ পরিবর্তন বা ছন্দ আছে। এই চক্রবৎ পরিবর্তন বিশেষ করিয়া পরিলক্ষিত হয় স্ত্রীলোকের যৌন নোদনায়, যাহার ফলে ঋতুদর্শন অনুসারে তাহাদের এই নোদনা বাড়ে বা কমে। যৌন নোদনার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে নারীর কর্মশক্তিরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

যৌন বা কাম নোদনা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানতঃ কামগ্রন্থি বা গোনাড্ গ্রন্থির এবং পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণের দ্বারা। স্ত্রী প্রাণীর ডিম্বকোষ স্থানচ্যুত হইলে উহারা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। আবার পিটুইটারি গ্রন্থির যে অংশ যৌন-গ্রন্থিতে বা গোনাড্-এ শক্তিশালী রস সরবরাহ করে, তাহা স্থানচ্যুত করিলেও যৌন নোদনা কমিয়া যায়।

যৌন নোদনা সহজাত এবং বংশগত হইলেও ইহা অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার ফলে পরিবর্তিত হয়। শৈশবের অপ্রীতিকর যৌন অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ যৌন

আচরণের সুস্থতা এবং স্বাভাবিকতা নষ্ট করিয়া দিতে পারে। ধর্ম, নীতি, শাস্ত্র প্রভৃতি যে শিক্ষা দেয় তাহার ফলেও যৌনজীবন প্রভাবিত হইতে পারে। যৌন কামনা আচরণের একটি শক্তিশালী নোদক বলিয়া এই বিষয়ে উপদেশ এবং নির্দেশের অন্ত নাই। তাহা ছাড়া যৌন কামনা অত্যন্ত অন্ধ এবং নির্বিচার হওয়া সত্ত্বেও অভ্যাসের ফলে একই ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে। যৌন-গ্রন্থির রসক্ষরণ বন্ধ হইলেও অভ্যাসবশে যৌন আচরণ চলিতে পারে, কারণ অভ্যাসের দ্বারাই যৌন আচরণের প্রকাশ প্রণালী অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়।

কর্ম ও বিশ্রাম নোদনা

কর্ম এবং বিশ্রাম আচরণের ছন্দে ওঠানামার মত দুইটি অপরিহার্য নোদনা। কিন্তু কর্ম এবং বিশ্রামকে দুইটি নোদনা বলা যায় কি? কর্ম না করিয়া এক মুহূর্তও থাকা যায় না। কর্মপ্রবৃত্তি না থাকিলে জীবনযাত্রা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

আবার কর্মের প্রস্তুতি হিসাবে বিশ্রামও একটি আবশ্যক নোদনা। বিশ্রামের ফলে পেশী, তন্তু, নার্ভ এবং মস্তিষ্ক কর্মশক্তি ফিরিয়া পায় এবং আবার সক্রিয় হইতে পারে।

কিন্তু কর্ম এবং বিশ্রামকে পৃথকভাবে নোদনা না বলিয়া প্রধান নোদনা-গুলির সহায় বলাই অধিক সঙ্গত মনে হয়। সকল নোদনাই সক্রিয় বা ডায়নামিক্, সুতরাং ইহা কর্মেরই প্রকাশ। সুতরাং কর্মকে পৃথক নোদনা মনে করা অসঙ্গত। আবার বিশ্রামও প্রত্যেক নোদনার পক্ষে প্রয়োজনীয়, কারণ কোনো নোদনাই অবিশ্রান্তভাবে সক্রিয় থাকিতে পারে না।

জৈব নোদনা

সকল প্রাণীই বাঁচিয়া থাকিতে চায়। আত্মরক্ষার ইচ্ছা একটি মৌলিক নোদনা। আবার সকল প্রাণীই যৌন পরিণতি লাভ করিলে বংশবিস্তার বা আত্মপ্রজনন করিতে চায়। সুতরাং বংশবিস্তার করা আর একটি মৌলিক নোদনা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই পিতামাতার কাজ শেষ হইয়া যায় না। তাহাকে বড় এবং স্বাবলম্বী করিয়া তোলাই পিতামাতার পরবর্তী নোদনা—ইহার মূলে রহিয়াছে সন্তানের প্রতি অন্ধ ভালবাসা।

এইরূপে নোদনার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াইয়া চলা যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে উল্লিখিত জৈব প্রবৃত্তিগুলিকে নোদনা বলা সঙ্গত কিনা। এইগুলিকে নোদনা

বলিলে নোদনার সহিত সহজ প্রবৃত্তির (ইন্‌স্টিংকৃট্) কোনো পার্থক্য থাকে না। অথচ ইহাদের পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার্য।

৪। নোদনা এবং সহজ প্রবৃত্তি (ড্রাইভ্ অ্যাণ্ড্ ইন্‌স্টিংকৃট্)

নোদনা এবং সহজ প্রবৃত্তির পার্থক্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। নোদনা এবং সহজ প্রবৃত্তি কথা দুইটি প্রায়ই এক অর্থে ব্যবহৃত হয়—যেমন আত্মরক্ষা, বংশবিস্তার, মাতৃত্ব প্রভৃতি সহজ প্রবৃত্তি নোদনারূপেও আলোচিত হইয়া থাকে। মা সহজাত প্রবৃত্তির ফলেই সন্তানকে ভালবাসেন, অথবা পিতা জলমগ্ন পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য হয়ত জলে লাফাইয়া পড়েন।

সহজাত প্রবৃত্তির অর্থ বুঝিতে হইলে দুইটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। প্রথমতঃ ইহাতে একটি শারীরবৃত্তীয় নোদনা (ফিজিয়লজিক্যাল্ ড্রাইভ্) থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ একপ্রকার সহজাত, জটিল এবং সংগঠিত ক্রিয়া বা আচরণ ইহার নোদনাকে পূর্ণ করে। তৃষ্ণা, ক্ষুধা প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় নোদনা। উহাদের কোনো সংগঠিত এবং জটিল আচরণ থাকে না। পক্ষান্তরে সহজ প্রবৃত্তি হইল জটিল এবং সংগঠিত। সুতরাং ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতিকে নোদনাই বলিতে হয়। ইহারা সহজ প্রবৃত্তি নয়। আবার যৌন আচরণ একটি শারীর-বৃত্তীয় নোদনা। কিন্তু ইহা শুধু নোদনাই নয়, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তিও বটে, কারণ যৌন আচরণ জটিল এবং সংগঠিত।

নোদনা এবং সহজ প্রবৃত্তির উপরোক্ত পার্থক্যের ভিত্তিতে আত্মরক্ষা, বংশবিস্তার, মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব প্রভৃতিকে শুধু নোদনা বলা অসঙ্গত। কারণ, এই সকল ক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয় নোদনা তো আছেই, উপরন্তু এই নোদনাগুলিকে পূর্ণ করিবার উপযোগী জটিল এবং সংগঠিত আচরণও আছে।

৫। অভাব—নীড্‌স্

অভাব বা প্রয়োজন অনুভূত না হইলে নোদনা বা ড্রাইভ্ জন্মে না। অভাবই কর্মে তাড়িত বা নোদিত করে। দেহযন্ত্রের কোনো অপূর্ণতা বা অপ্রাচুর্যই অভাব বা প্রয়োজন এবং এই অভাবই মানসিক অস্বস্তি বা অস্থিরতারূপে অনুভূত হয়। ইহা দূর করিতে পারে এমন ক্রিয়া বা আচরণ না ঘটিলে অভাব দূর হয় না।

মুখ্য বা মৌলিক অভাব

মানুষের মৌলিক অভাবগুলি কি? খাদ্য, জল, বাতাস, আশ্রয়, সঙ্গী প্রভৃতি মানুষের কতগুলি মৌলিক অভাব। রক্তে শর্করা কমিয়া গেলে পাকস্থলীর মসৃণ পেশীর সঙ্কোচন আরম্ভ হয়, অর্থাৎ পাকস্থলী কিছু খাদ্য চায় এবং ইহা ক্ষুধার তাড়নারূপে অনুভূত হইয়া থাকে। আবার দেহকোষের জলীয় ভাগ কমিয়া গেলে দেহ জল চায় এবং দেহের এই অভাবই অনুভূত হয় তৃষ্ণারূপে। তাপ, শৈত্য, বর্ষণ প্রভৃতি দেহকে ক্লিষ্ট করে এবং এই ক্লেশই অনুভূত হয় আশ্রয়ের অভাবরূপে। মানুষ একাকী আত্মরক্ষা করিতে পারে না এবং সঙ্গী না পাইলে ব্যবহার বিনিময় করিতে পারে না, তাই সে অভাব বোধ করে সঙ্গীর।

সকল প্রকার নোদনা বা তাড়নার মূলেই থাকে কোনো না কোনো অভাব বোধ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাসক্রিয়া, কাম, কর্ম, বিশ্রাম প্রভৃতি সকল প্রকার নোদনাই কোনো না কোনো অভাব হইতে উৎপন্ন হয়। এই জৈব অভাবগুলি পুর্ণ না হইলে জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষও নিশ্বাসে প্রশ্বাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ ত্যাগ এবং অক্সিজেন গ্রহণ করে, আবার খাদ্য-গ্রহণ, জল-পান, দূষিত-পদার্থ-নিঃসরণ, দেহতাপ-সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজ করে। বিশেষ বিশেষ অভাবই এই সকল তাড়নার কারণ।

গৌণ অভাব

কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষ এই সকল অভাব মিটাইয়াই সন্তুষ্ট হয় না। এই জৈব অভাবগুলি ছাড়াও তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাস অনুসারে মানুষ বহু গৌণ অভাবও বোধ করে—যেমন ভাল ঘর বাড়ী, গাড়ী, প্রচুর টাকা, নাম, যশ, খ্যাতি প্রভৃতির অভাব।

মুখ্য ও গৌণ অভাবের তুলনা

অভাবের মধ্যে কতকগুলি প্রাথমিক বা মুখ্য। এই অভাবগুলি জৈব এবং সহজাত। ইহারা অপুর্ণ থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। এই একান্তভাবে প্রয়োজনীয় অভাবগুলি মিটিলেই নানাপ্রকার অপ্রয়োজনীয় অথবা অজৈব অভাব দেখা দেয়। ইহাদের পুরণ জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য নয়। কিন্তু শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতির মানদণ্ডে সভ্য এবং উন্নত

জীবন যাপনের পক্ষে এই অভাবগুলির পুরণও মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়। অভ্যাস ও শিক্ষার ফলে হয়ত এই গৌণ অভাবগুলিই মুখ্য বা জৈব অভাবগুলির তুলনায় অধিক প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। যেমন নাম ও যশের জন্য হয়ত মানুষ জীবন বিসর্জনও দিতে পারে। সতী স্ত্রী পতির অভাবকে প্রাণের অভাব হইতেও হয়ত বেশী অসহনীয় মনে করিতে পারেন।

দৈহিক এবং মানস অভাব

প্রাথমিক বা মুখ্য অভাবগুলিকে দৈহিক এবং গৌণ অভাবগুলিকে মানস বলা যাইতে পারে। মানস অভাবগুলিরও প্রায়ই দৈহিক ভিত্তি থাকে। আত্মপ্রাধান্যের অভাব মানসিক অভাব—ইহারও হয়ত এমন দৈহিক ভিত্তি আছে যাহা এখনও আমাদের নিকট অজ্ঞাত। আবার মানস অভাবের যেমন চেতনা থাকে, দৈহিক অভাবেরও তেমন চেতনা থাকিতে পারে। কোনো সমস্যার সমাধান, অভাবের যেমন চেতনা থাকিতে পারে খাদ্যের অভাব সম্বন্ধেও তেমন চেতনা থাকিতে পারে।

জৈব এবং সামাজিক অভাব

প্রাথমিক অভাবগুলিকে জৈব এবং গৌণ অভাবগুলিকে সামাজিকও বলা যাইতে পারে, কারণ দ্বিতীয় অভাবগুলি সামাজিক জীবনের সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই পার্থক্য চূড়ান্ত নয়, কারণ সামাজিক অভাবগুলিও জৈব। প্রধানতঃ বাঁচিবার জন্যই সামাজিক অভাবগুলির সৃষ্টি। আবার জৈব অভাবগুলিও সামাজিক, কারণ উহাদের পুরণ নির্ভর করে সামাজিক অবস্থার উপর।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অভাব দুই প্রকার—যথা প্রাথমিক, মুখ্য, প্রয়োজনীয়, দৈহিক অথবা জৈব এবং গৌণ, অপ্রয়োজনীয়, মানস অথবা সামাজিক। এই দুই শ্রেণীর অভাব পরস্পর সাপেক্ষ। সকল প্রকারের অভাবই কোন দৈহিক, জৈব, মানস বা সামাজিক অপূর্ণতার লক্ষণ। আবার সকল প্রকার অভাবেরই সাধারণ লক্ষণ এই যে উহারা মানুষকে উহাদের প্রতিকারে তাড়িত বা নোদিত করে।

৬। উদ্দেশ্য—মোটিভ্

উদ্দেশ্য ও নোদনার পার্থক্য পুর্বে আলোচিত হইয়াছে। মানুষের আচরণ উদ্দেশ্যাভিমুখী (পার্পাসিভ্)। প্রতিবর্ত প্রভৃতি অচেতন আচরণে এই

উদ্দেশ্যাভিমুখিতা থাকে অচেতন অবস্থায়। প্রতিবর্ত হইতে আরও উচ্চতর আচরণে, যেমন সহজ প্রবৃত্তিতেও আরও সুগঠিত উদ্দেশ্যাভিমুখিতা থাকিলেও তাহা অচেতন। ইচ্ছামূলক আচরণেই উদ্দেশ্যাভিমুখিতা চেতনস্তরে উন্নীত হয়।

প্রেষণার একটি প্রধান অঙ্গ হইল মোটিভ্ বা উদ্দেশ্য। প্রেষণা বলিতে ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অভাব দ্বারা তাড়িত এবং এমন কোনো উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত আচরণ বুঝায় যাহা পূর্ণ হইলে অভাব মিটিয়া যায়। যেমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্য হইল আহার করা—এই উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই ক্ষুধার তৃপ্তি হয়। আবার কামুক ব্যক্তির উদ্দেশ্য হইল যৌনসুখ—এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইলেই তাহার অভাব মিটিয়া যায়।

উদ্দেশ্য ও উদ্দীপক—মোটিভ্ অ্যাণ্ড্ স্টিমুলাস্

মানুষ কেন নির্দিষ্ট ভাবে আচরণ করে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে সে কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পৌছাইবার জন্য নির্দিষ্টভাবে আচরণ করে। আবার এই উত্তরও দেওয়া যায় যে সে কোনো উদ্দীপকের প্রভাবেই এইরূপ আচরণ করিয়া থাকে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কেন খাদ্য অন্বেষণ করে? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে সে আহার করিবার উদ্দেশ্যে খাদ্য অন্বেষণ করে, অথবা খাদ্যরূপ উদ্দীপক দেখিয়া উহার অন্বেষণ করে। উভয় ক্ষেত্রেই আচরণটি প্রথমতঃ উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং দ্বিতীয়তঃ উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন।

কিন্তু উদ্দেশ্য এবং উদ্দীপক এই উভয়েরই আচরণ উৎপন্ন করিবার শক্তি থাকিলেও উহাদের পার্থক্য জানিয়া রাখা দরকার। উদ্দেশ্য ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম। কিন্তু উদ্দীপক একটি বাহিরের শক্তি। কোনো কোনো স্থলে,—যেমন যান্ত্রিক সংবেদনে—উদ্দীপক যান্ত্রিকও হইতে পারে। এইরূপ স্থলেও উদ্দীপক ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম (সাব্জেক্টিভ্) বলিয়া অনুভূত হয় না, কিন্তু ইহা যেন বাহির হইতে আসিয়া ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে এইরূপ মনে হয়। তাহা ছাড়া, উদ্দীপকের তুলনায় উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ী, কারণ ইহা সমগ্র আচরণের পরিচালনা শক্তি। আচরণের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অব্যাহত থাকে। কিন্তু উদ্দীপকের স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত কম। ইহা একটি মুহূর্তের ঘটনা মাত্র। তৃতীয়তঃ, উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ক্ষুধার্ত ইঁদুর সহজেই খাদ্য দেখিতে পায়,

কারণ খাদ্য অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্য উহাকে খাদ্য দেখিতে পাইবার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখে।

উদ্দেশ্য ও প্ররোচনা—মোটিভ্ অ্যাণ্ড্ ইন্‌সেন্টিভ্

ক্ষুধার্ত ইঁদুর খাদ্যের সন্ধান করে কেন? উত্তরে আরও বলা যায় যে সে খাদ্য অনুসন্ধানে প্ররোচিত হইয়াছে বলিয়াই এইরূপ করে। উদ্দেশ্য এবং প্ররোচনা অথবা ইন্‌সেন্‌টিভ্-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে উদ্দেশ্য না থাকিলে প্ররোচনা কাজ করিতে পারে না, অর্থাৎ প্ররোচনা উদ্দেশ্যের পূর্ব অস্তিত্ব মানিয়া লয়। উদ্দেশ্য থাকিলে প্ররোচনা সেই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে মাত্র। যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত ইঁদুরের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য খাদ্য অনুসন্ধান করা। এইরূপ ইঁদুরের সম্মুখে, পিঞ্জরের বাহিরে খাদ্য রাখিলে এই খাদ্য উহাকে পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া খাদ্য আহার করিতে প্ররোচিত করে। আবার নিয়োগকর্তা উৎপাদন বাড়াইতে চাহিয়া শ্রমিককে অধিক পরিশ্রমে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে হয়ত তাহাকে লভ্যাংশ বা বোনাস্ দিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে শ্রমিকগণের পরিশ্রম করিবার উদ্দেশ্য পূর্বেই ক্রিয়াশীল ছিল। বোনাস্-এর প্ররোচনা শুধু এই পূর্ব হইতে ক্রিয়াশীল উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা ও ইচ্ছাকে অধিকতর শক্তিশালী করে।

৭। উদ্দেশ্যের শ্রেণীভেদ

মানুষ অসংখ্য উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করে। অসংখ্যতা সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মূল ঐক্যসূত্র রহিয়াছে।

উড্‌ওয়ার্থ-এর শ্রেণীবিভাগ

উড্‌ওয়ার্থ উদ্দেশ্যকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা (ক) যে সকল উদ্দেশ্য যান্ত্রিক প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল; (খ) জরুরী উদ্দেশ্য (এমার্জেন্সী মোটিভ্) এবং (গ) বিষয়মুখী (অব্‌জেক্‌টিভ্) উদ্দেশ্য।

(ক) যান্ত্রিক অভাব এই অভাব পূরণের যে তাড়না এবং উদ্দেশ্যরূপে দেখা দেয় তাহাকে যান্ত্রিক উদ্দেশ্য বলা যায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাসক্রিয়া, দূষিত পদার্থের নিঃসরণ প্রভৃতি যান্ত্রিক অভাবগুলির উদ্দেশ্য হইল খাদ্য, পানীয়, বাতাস ইত্যাদি। কামের উদ্দেশ্য হইল স্ত্রী পুরুষের যৌন মিলন। আবার

কর্ম এবং কর্মবিরতি বা বিশ্রামের উদ্দেশ্য হইল দেহের পেশী, স্নায়ু, তন্তু প্রভৃতির স্বাভাবিকতা বজায় রাখা।

যান্ত্রিক উদ্দেশ্য চেতন না হইয়া অচেতনও হইতে পারে। আবার ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি অভাবগুলি যে ক্রিয়া বা চেষ্টা সৃষ্টি করে উহা এক একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত বিরত হয় না। ইহারা চেতন এবং অচেতন এই উভয় প্রকারই হইতে পারে।

(খ) জরুরী উদ্দেশ্য (এমার্জেন্সী মোটিভ্) যান্ত্রিক নয়। ইহারা পারিবেশিক, অর্থাৎ পরিবেশের কোনো বিপজ্জনক অবস্থা দূর করিতে অথবা উহার সম্মুখীন হইতে চায়। যেমন পলায়ন উদ্দেশ্যের মূলে থাকে এমন কোনো বিপদ বা বিপদের সম্ভাবনা যাহার ফলে ভয় হয় এবং পলায়ন করিয়া নিরাপদ হইবার চেষ্টা জাগে। বিপদে ভয় প্রায়ই শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ফল। যেমন, হয়ত দুই বৎসরের ছোট শিশু সাপের গায়ে হাত দিতে ভয় পায় না, তিন বা চার বৎসর বয়স্ক শিশু হয়ত একটু সতর্ক হইয়া উহার গায়ে হাত দেয় এবং আরও বড় বালক বালিকারা সাপ দেখিয়া ভয় পায়।

যোধন উদ্দেশ্য

আবার, যোধন বা যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য অতি শৈশবকালেই প্রকাশিত হয়। শিশুকে তাহার অভিপ্রেত কাজে বাধা দিলে সে রাগিয়া যায় এবং হাত পা ছুঁড়িয়া, লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া এবং কাঁদিয়া কাটিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করে। বাধা অথবা স্বাধীনতা খর্ব করাই যোধন উদ্দেশ্যের প্ররোচক বা উদ্দীপক কারণ এবং ইহা দূর না কবিয়া এই উদ্দেশ্য নিরস্ত হয় না। যোধন একটি সহজাত উদ্দেশ্য। কিন্তু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে ইহার পরিবর্তন ঘটে। প্রতিপক্ষ প্রবল হইলে অপমানিত ব্যক্তি তাহাকে সোজাসুজি আক্রমণ না করিয়া তাহার সুনাম এবং সামাজিক মর্যাদা নষ্ট করিবাব জন্য সচেষ্ট হয়।

বাধা দূর করিবার উদ্দেশ্য

আবার বাধা দূর করিবার উদ্দেশ্য একটি মৌলিক উদ্দেশ্য। কাজ করিতে করিতে বাধা উপস্থিত হইলে তাহা দূর করিবার সঙ্কল্প জাগে। অবশ্য বাধ দুরতিক্রম্য মনে হইলে চেষ্টাত্যাগও ঘটিতে পারে। এই উদ্দেশ্যটি সহজাত। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই উদ্দেশ্য সাধনের নানা উপায়

উদ্ভাবিত হইতে পারে। বাধা দূর করিবার চেষ্টা নানা দৈহিক ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়। দন্ত ঘর্ষণ, মুষ্টি বদ্ধ করা, ঘাড় শক্ত করা, ভ্রূকুঞ্চন প্রভৃতি অঙ্গ-ভঙ্গী বাধা অতিক্রম করিবার স্থির সঙ্কল্প প্রকাশ করে। এই উদ্দেশ্যটিকে প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যও (মাস্টারী মোটিভ্) বলা যায়। বাধা অতিক্রম করিতে গিয়া নিজ প্রাধান্য অনুভূত হয় এবং ইহার কৃতিত্ব আনন্দদায়ক হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তি কাজে বেশী উৎসাহ বোধ করে এবং কাজের আকর্ষণ বাড়াইয়া তোলে।

অনুসরণ করিবার উদ্দেশ্য

অনুসরণ করিবার উদ্দেশ্য (পারস্যুট্ মোটিভ্) প্রকাশিত হয় শিকার বা বাঞ্ছিত বস্তু পাইবার আগ্রহে। ইহা একটি জরুরী উদ্দেশ্য, কারণ শিকার বা বাঞ্ছিত বস্তু উপস্থিত হইবা মাত্র উহা অনুসরণ না করিলে অথবা উহার পশ্চাতে না ছুটিলে উহা ফস্কাইয়া যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্য নানাপ্রকার খেলায় নানাভাবে ক্রিয়াশীল হয়, যদিও আসলে ইহা সহজাত। অনুসরণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রায়ই প্রতিযোগিতা উদ্দেশ্য (কম্পিটিটিভ্ মোটিভ্) মিলিত হয়, কারণ শিকার বা বাঞ্ছিত জিনিসটি আয়ত্তের বাহিরে গিয়া অপর ব্যক্তির করতলগত হইতে পারে।

(গ) বিষয়মুখী উদ্দেশ্য (অব্জেক্টিভ্ মোটিভ্) এবং আকর্ষণ (ইন্টারেস্ট্) ব্যক্তির পরিবেশ এবং সমাজের সক্রিয় অংশীদাররূপে বাঁচিয়া থাকিবার উদ্দেশ্য এবং আকর্ষণ। শুধু উপস্থিত বাধা অতিক্রম করা বা শিকার লাভ করাই মানুষের বৃহত্তর জীবনের সার্থকতা নয়। মানুষ চায় তাহার চারিপাশের নানা বস্তু এবং ব্যক্তিকে জানিতে এবং উহাদের সহিত সামঞ্জস্য সাধন করিয়া আদান প্রদান করিতে।

অনুসন্ধান উদ্দেশ্য

এই উদ্দেশ্যটি প্রধানতঃ প্রকাশিত হয় পরিবেশকে অনুসন্ধান (এক্স্প্লো-রেশন্) এবং নাড়াচাড়া (ম্যানিপুলেশন্) করিয়া দেখিবার মধ্য দিয়া। শৈশব হইতেই অনুসন্ধান প্রবৃত্তি দেখা দেয়। শিশু প্রথমে চোখ, কান, হাত মুখ প্রভৃতি দিয়া পরিবেশিক বস্তু বা ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে চায়। তারপর হাঁটিতে শিখিলে শিশু চলিয়া ফিরিয়া তাহার অনুসন্ধানকার্য চালায়।

নাড়াচাড়া উদ্দেশ্য

নাড়াচাড়া (ম্যানিপুলেশন্) করাও শিশুর পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার একটি প্রধান উপায়। শিশু কোনো আকর্ষণীয় বস্তুকে দেখিয়াই সন্তুষ্ট হয় না কিন্তু উহা ধরিতে বা পাইতে চায়—উহাকে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া ফেলিয়া-ছুঁড়িয়া নানাভাবে দেখিতে চায়। বস্তুর অনুসন্ধান এবং নাড়াচাড়া করিয়া শিশু পৃথিবীর সহিত পরিচিত হয়। নানারকমের খেলনা লইয়া খেলা করিয়া সে তাহার অনুসন্ধান এবং নাড়াচাড়া করিবার প্রবৃত্তি মিটায়।

আকর্ষণ (ইন্টারেস্ট্) পরিবেশিক বস্তু এবং ব্যক্তির জ্ঞানলাভের সহায়ক। অনুসন্ধান এবং নাড়াচাড়া করিবার পর অনেক বস্তু বা ব্যক্তিতেই শিশুর আকর্ষণ থাকে না। যে সকল বস্তু বা ব্যক্তি শিশুকে আকৃষ্ট করে সে উহাদের সম্পর্কে সক্রিয় হয়। কতগুলি বস্তুতে শিশুর সহজাত আকর্ষণ থাকে, যেমন উজ্জ্বল রং, মিষ্ট কণ্ঠস্বর প্রভৃতি। যে সকল বস্তু শিশুকে আনন্দিত করে সেইগুলি তাহার নিকট আকর্ষণীয়, আবার যেগুলি তাহাকে পীড়া দেয় সেইগুলি তাহার নিকট বিরক্তিকর। অথবা যে সকল বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে শিশু নিজকে মানাইয়া লইতে পারে তাহারাই তাহার নিকট আকর্ষণীয়।

৮। উদ্দেশ্যের শক্তি

সকল উদ্দেশ্যই যে সমান শক্তিশালী তাহা নয়। উদ্দেশ্যের শক্তি নানারূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি তাহার সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য কম ব্যয় করিয়া উহাদের বিলাসিতার জন্য বেশী ব্যয় করেন, তাহা হইলে প্রমাণিত হয় যে ঐ ব্যক্তির বিলাসিতার উদ্দেশ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী।

উদ্দেশ্যের শক্তি নির্ণয় করিবার পদ্ধতি

উদ্দেশ্যের শক্তি নির্ণয় করিবার জন্য নানারূপ পরীক্ষা ও প্রয়োগেব সাহায্য লওয়া হইয়াছে। যেমন **প্রতিবন্ধক পদ্ধতির** সাহায্যে ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীর উদ্দেশ্য পূরণের পথে বাধা স্থাপন করিয়া উহাদের উদ্দেশ্যের আপেক্ষিক শক্তি নিরূপণ করা হইয়াছে। কোনো উদ্দেশ্য পূরণের প্রশ্ন না থাকিলেও হয়ত এই প্রাণী বিনা কারণেই সেই বাধা কয়েকবার অতিক্রম করে। কিন্তু বিনা উদ্দেশ্যে সে যতবার এই বাধা অতিক্রম করে কোনো উদ্দেশ্য থাকিলে সে উহা অপেক্ষা

অনেক বেশী বার বাধা অতিক্রম করিয়া থাকে। যেমন অনুসন্ধানের, যৌন মিলনের, খাদ্য অন্বেষণের, পানীয় অন্বেষণের উদ্দেশ্য থাকিলে এবং মাতৃস্নেহের তাড়নায় ঐ প্রাণী বিনা কারণে বাধা অতিক্রম করিবার, বার বা সংখ্যার তুলনায় যথাক্রমে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, ছয়গুণ এবং সাতগুণ বেশী বার সেই বাধা অতিক্রম করে।

আরও দেখা গিয়াছে যে প্রাণী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের যত কাছাকাছি উপস্থিত হয় উহার গতিবেগও তত বাড়িয়া যায়। **ধাঁধাঁ বাক্সে আবদ্ধ ইঁদুর বা বিড়াল** খাদ্যের কাছাকাছি আসিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতি হয় এবং হয়ত খাদ্যের উপর লাফাইয়া পড়ে।

শিক্ষণ পদ্ধতি সাহায্যেও উদ্দেশ্যের শক্তি নিরূপণ করা যাইতে পারে। যত সহজে কোনো ক্রিয়া শিক্ষা করা যায় সেই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য তত প্রবল। ক্ষুধার্ত পিঞ্জরাবদ্ধ বিড়াল খাদ্য গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে যত তাড়াতাড়ি পিঞ্জরের বাহিরে আসিতে শিখে, তৃপ্ত বিড়াল তত তাড়াতাড়ি তাহা শিখিতে পারে না।

৯। কার্যের প্ররোচক—ইন্‌সেন্‌টিভ্

প্রতিযোগিতা

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কতগুলি প্ররোচক (ইন্‌সেন্‌টিভ্) কার্যে সহায়ক হয়। যেমন **প্রতিযোগিতা** (কম্‌পিটিশন্) কার্যের প্ররোচক। কোনো শ্রেণীর একটি ব্যক্তি কোনো কাজ করিতে পারিলে ঐ শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিও ঐ কাজ করিতে চেষ্টা করে, অবশ্য কাজটি যদি একেবারেই তাহার আয়ত্তের বাহিরে না হয়। যেমন দৌড় প্রতিযোগিতায় অন্যান্য প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইবার ইচ্ছা আরও দ্রুত দৌড়ানোর কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

আত্ম-প্রতিযোগিতা

আবার আত্ম-প্রতিযোগিতাও অনেক সময় বিশেষ কার্যকরী হইয়া দাঁড়ায়। কোনো ব্যক্তি হয়ত প্রত্যেকটি পরবর্তী চেষ্টায় পূর্ববর্তী চেষ্টার ফলকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চায়। ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় যে ফল হইয়াছে বার্ষিক পরীক্ষায় তাহা ছাড়াইয়া যাইতে হইবে—এইরূপ সঙ্কল্প অনেক ছাত্রের লেখাপড়ায় উন্নতির একটি কারণ হইতে পারে।

উদ্দেশ্য

কোন একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্মুখে থাকিলে কর্মে আত্মোন্নতি সম্ভব হয়। উদ্দেশ্যহীন কাজ অনেক সময় নীরস ও নিস্তেজ হইয়া দাঁড়ায়। যেমন পরীক্ষা আসন্ন হইলে পড়াশুনায় ছাত্রের মনোযোগ বাড়িয়া যায়। অথবা এতটা উঁচু লাফাইতে হইবে এইরূপ উদ্দেশ্য থাকিলে লম্ফনে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। উদ্দেশ্যহীনভাবে লাফাইয়া চলিলে এইরূপ উন্নতি ঘটে না।

উৎসাহদান, বিশ্রাম, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি

অন্যের নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লইতে হইলে তাহাকে নানা-প্রকারে কাজে উৎসাহ দিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিবার যোগ্যতা, উপযুক্ত স্বাস্থ্য, অন্যান্য কর্মীর সহিত সহযোগিতা, উর্ধ্বতন কর্মিগণের প্রতি বিশ্বাস, মাঝে মাঝে কর্মবিরতি বা বিশ্রাম থাকাও প্রয়োজন—সর্বোপরি থাকা চাই কর্মে সততা এবং আত্মবিশ্বাস। আবার কাজ করিবার উদ্দেশ্য কি এবং সেই উদ্দেশ্য-সাধনে লাভ বা ক্ষতি কি এই সকল বিষয়ের ধারণা না থাকিলে কার্য ফলপ্রসূ হয় না। বিশেষ করিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ কালে যোদ্ধা বা সৈনিকের এই জাতীয় গুণগুলি থাকা দরকার।

১০। উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়—মোটিভ্ অ্যাণ্ড্ ইন্‌টেন্‌শন্

উদ্দেশ্য (মোটিভ্) এবং অভিপ্রায় (ইন্‌টেন্‌শন্) প্রায়ই সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে এমন পার্থক্য রহিয়াছে যাহা লক্ষ্য করিবার মত। ব্যাপক অর্থে এই দুইটিই কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যাভিমুখী শক্তি বুঝায়। কিন্তু যথার্থভাবে অভিপ্রায় শুধু লক্ষ্যাভিমুখিতাই বুঝায় না, তদুপরি বুঝায় লক্ষ্য সম্বন্ধে দূরদৃষ্টি এবং লক্ষ্যাভিমুখী কাজের স্বেচ্ছায় দায়িত্ব গ্রহণ। অভিপ্রায়ে যেমন কোনো উদ্দেশ্য সাধন করিবার স্থির সঙ্কল্প থাকে তেমনই ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিবার উপায়ও অবলম্বিত হয়। অভিপ্রেত উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য বুদ্ধি, শক্তি এবং নিষ্ঠা থাকা আবশ্যক।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে **অভিপ্রায় উদ্দেশ্য হইলেও উদ্দেশ্য অভিপ্রায় নাও হইতে পারে।** অত্যন্ত স্পষ্ট এবং শক্তিশালী উদ্দেশ্যই

অভিপ্রায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে অভিপ্রায়ে প্রায়ই একাধিক উদ্দেশ্য থাকে। কাহাকেও সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে যেমন তাহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য থাকে, তেমনই আত্মপ্রাধান্য প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে।

১১। শিক্ষালব্ধ বা অর্জিত উদ্দেশ্য—লার্নেড্ অর্ অ্যাকোয়ার্ড মোটিভ্

উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় নয়—কিন্তু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে ইহা পরিবর্তিত হইতে পারে। দৈহিক বা জৈব প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যই মুখ্য, কিন্তু ইহার সহিত গৌণ বা উৎপন্ন (ডিরাইভ্ড্) উদ্দেশ্যও যুক্ত হয়। যেমন ক্ষুধা প্রয়োজনের উদ্দেশ্য হইল খাদ্য। কিন্তু কোনো বিশেষ খাদ্যে রুচি এবং অরুচি অভ্যাস ও শিক্ষার ফল। সুতরাং ইহা সহজাত নয় কিন্তু অর্জিত এবং গৌণ।

সামাজিক উদ্দেশ্য

অনেক প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া অপরের সহযোগিতার দরকার হয়। এই জাতীয় প্রয়োজনকে সামাজিক প্রয়োজন বলে। আইন মানিয়া চলা, পরিচ্ছন্নতা, পারিপাট্য, সততা, শিষ্টতা, চরিত্র, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি সামাজিক প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্যের দৃষ্টান্ত। সামাজিক উদ্দেশ্যকে জোরদার করিবার অনেক উপায় আছে, যেমন নানা আচার-বিচার, ন্যায়-নীতি, প্রতিষ্ঠান, বাধা-নিষেধ প্রভৃতি।

শিক্ষা এবং অভ্যাসের ফলে যে সকল উদ্দেশ্য অর্জিত হয় তাহার বেশীর ভাগই সামাজিক। মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং সে সামাজিক উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহার মধ্যে কতগুলি সামাজিক তাড়না বা নোদনা আছে। যেমন নির্ভরতা একটি সামাজিক নোদনা। একাকী অবস্থায় মানুষ নিজকে অসহায় বোধ করে। সে অন্যের সহিত সহযোগিতা অথবা অন্যের উপর নির্ভর করিতে চায়। শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া কৈশোর পর্যন্ত সে তাহার ভালোমন্দ, ন্যায় অন্যায় প্রভৃতি বুঝিতে পারে না এবং পিতা-মাতার উপর নির্ভর করে। পরিণত বয়সেও মানুষ অন্যের উপর নির্ভর করিবার অভ্যাস সহজে কাটাইয়া উঠিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ সঙ্গী অথবা সাথী এবং তাহার যৌন জীবনের অংশীদার কামনা করে। ইহাদের উপরও সে নির্ভর করিতে চায়। তৃতীয়তঃ মানুষ চায় সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান (স্টেটাস্) বা অংশ। এই চাহিদাটি মানুষকে সমাজস্থ অন্যান্য মানুষ হইতে পৃথক করিয়া দেয়। ইহাকে ব্যক্তিগত চাহিদা (ইগোইষ্টিক্ নীড্) বলা সঙ্গত হইবে না, কারণ এই চাহিদা পুরণ করিতে হইলে ব্যক্তিকে সমাজস্থ আর পাঁচ জনের সাহায্য লইতে হয়। বিশিষ্ট স্থান লাভের চাহিদার সহিত সমাজে মর্যাদা (প্রেস্টিজ্) এবং ক্ষমতা (পাওয়ার্) লাভের চাহিদাও মিশ্রিত থাকে। এইরূপ ইচ্ছার আর একটি রূপ হইল সমাজস্থ অন্যান্য লোকের তুলনায় নিজ শ্রেষ্ঠতা লাভ অথবা আত্ম-প্রাধান্য বিস্তার করা। আর একটি সামাজিক উদ্দেশ্য বা চাহিদা হইল সমাজে নিরাপদ স্থান লাভ করা যাহা হইতে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা নাই বা কম।

উপরোক্ত চাহিদা (নীড্স্) বা তাড়নাগুলি সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনে সক্রিয় হয়। সুতরাং ইহাদিগকে সামাজিক উদ্দেশ্যও (সোশ্যাল মোটিভ্) বলা যায়।

ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও সামাজিক উদ্দেশ্য পরস্পরসাপেক্ষ। ব্যক্তি সমাজের অংশ। তাই নিছকভাবে ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য সম্ভব কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। অ্যাল্পোর্ট বলিয়াছেন যে অর্জিত বা গৌণ উদ্দেশ্য প্রায়ই প্রধান বা মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পৃথকভাবে কাজ করে। কোনো দরিদ্র বালক হয়ত প্রথমে অন্নবস্ত্র সংস্থানের জন্য টাকা রোজগার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু জীবিকা সংস্থানের অভাব মিটিবার পর হয়ত সে টাকা জমানোই রোজগারের উদ্দেশ্য করিয়া বসিল। বৃদ্ধ লোক কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের পরেও হয়ত চাকুরী ছাড়িতে চাহেন না, যদিও তাহার খাওয়া পরার কোনো অভাব নাই। আবার যৌন ক্ষমতা কমিয়া যাইবার পরও হয়ত মধ্যবয়স্ক বা বৃদ্ধ লোক যৌন আকর্ষণ কাটাইয়া উঠিতে পারিল না।

আবার ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষাও (অ্যাম্বিশন্) তাহার কাজের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা (লেভেল্) এবং আস্পৃহা (অ্যাস্পিরেশন্) পরীক্ষা করিয়া বাহির করা যায়। যেমন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় কেমন করিবে বলিয়া আশা করে তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা বুঝা যাইতে পারে। পরীক্ষার্থী অতীতে যে সকল পরীক্ষা দিয়াছে তাহার সাফল্য বা কৃতিত্ব কি পরিমাণে তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমাকে

প্রভাবিত করিয়াছে তাহাও নির্ণয় করা যায়। উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা অনেকটা নির্ভর করে ব্যক্তির স্বভাব বা প্রকৃতির উপর। কোনো কোনো ব্যক্তি স্বভাবতঃ নিস্তেজ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন। উহা ব্যক্তির আত্মমর্যাদাবোধের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। তাহা ছাড়া উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা নির্ভর করে ব্যক্তি পূর্বে যে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে তাহারও উপরে।

১২। নির্জ্ঞান প্রেষণা—আন্‌কনসাচ্ মোটিভেশন্

প্রেষণার উৎস যে শুধু চেতন মনেই নিহিত থাকে তাহা নয়। নির্জ্ঞান বা অচেতন মনও প্রেষণার উৎস হইতে পারে। ব্যক্তির আচরণ যে প্রেষণার প্রকাশ তাহা তাহার অগোচরেও থাকিতে পারে। কোনো বুদ্ধিমান এবং বিবেচক ব্যক্তি হয়ত হঠাৎ রাগিয়া গিয়া কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া বসিতে পারে, এবং কেন সে অকস্মাৎ এইরূপ অগ্নিশর্মা মূর্তি ধারণ করিল তাহা তাহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিতে পারে। আবার কোনো ব্যক্তি হয়ত আজগুবি স্বপ্ন দেখিয়া কেন যে এইরূপ স্বপ্ন দেখিল তাহা একেবারেই না জানিতে পারে। আবার কেহ হয়ত সামান্য কারণেই ভীত হইয়া পড়ে, অথচ জানে না এইরূপ ভীত হইবার কারণ কি।

নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যের কারণ

নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যের একটি কারণ এই যে অনেক উদ্দেশ্যই অর্জিত হইয়া অভ্যাসে পরিণত হয়। এই সকল অর্জিত অভ্যাস অজ্ঞাতভাবে আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক মুদ্রাদোষ অথবা আচরণ মনের অজ্ঞাতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। কেহ হয়ত কথা বলিতে বলিতে নখ কামড়ায় বা খোঁটে, টেবিলে টোকা দেয়, নিজ কান টানে, ক্লাশে পড়াইতে পড়াইতে পায়চারি করিতে থাকে, অথচ সে জানে না যে সে এইরূপ আচরণ করিতেছে।

নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যের আর একটি প্রধান কারণ আছে। এই উদ্দেশ্যগুলি প্রায়ই এমন অপ্রীতিকর অবস্থায় অর্জিত হয় যাহা আমরা ভুলিতে চাই। কতগুলি অপ্রীতিকর উদ্দেশ্য আমরা সংজ্ঞান মনে অথবা চেতন ভাবে স্বীকার করিতে চাহি না। ইহারা অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞান মনে অপসারিত এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে বিস্মৃত হয়। আমরা এই নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যগুলির প্রতি চোখ বুজিয়া থাকিতে চাই। উহারা ছদ্মবেশে বা বিকৃতভাবে প্রকাশিত হয়।

যেমন আমরা প্রায়ই অপ্রিয় ব্যক্তির নাম অথবা অপ্রীতিকর কাজের বা ঘটনার কথা ভুলিয়া যাই।

নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যের বিকৃত প্রকাশ

নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যের বিকৃত প্রকাশ নানাভাবে ঘটিতে পারে। (১) কোনো নির্জ্ঞান উদ্দেশ্য হয়ত বিপরীত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যের বিপরীত প্রকাশকে ফ্রয়েড্ **"প্রতিক্রিয়া গঠন"** (রি-অ্যাক্শন ফর্মেশন্) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যেমন কোনো দুষ্ট বা দুর্বৃত্ত ব্যক্তি হয়ত রাতারাতি সাধু বনিয়া যাইতে পারে। অতি ভক্তি যে অনেক সময় চোরের লক্ষণ হইতে পারে তাহা সুবিদিত।

(২) **অভিক্ষেপ** (প্রজেক্শন্) আর একটি উপায় যাহার সাহায্যে নির্জ্ঞান উদ্দেশ্য বিকৃত উদ্দেশ্যের আকার লইয়া প্রকাশিত হয়। যেমন যে ব্যক্তি সকলের নিকট হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করে (পার্সিকিউশন্ ম্যানিয়া) সেই ব্যক্তিই হয়ত সকলের অনিষ্ট ঘটাইবার আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য অন্তরে অন্তরে পোষণ করিয়া থাকে। অথবা যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে বা করিতে চায় সে-ই হয়ত অন্যান্য নির্দোষ এবং সৎ পরীক্ষার্থী-দিগের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে। আবার অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত পুরুষ হয়ত নিজ পতিব্রতা স্ত্রীর সতীত্বে সন্দিগ্ধ হয়। এইরূপ অভিক্ষেপের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজ উদ্দেশ্যটিকে চাপা দিয়া অজ্ঞাতভাবে উহা অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিতে দ্বিধাবোধ করে না।

(৩) **অভিক্রান্তি** (ডিস্প্লেসমেণ্ট্) অস্বীকৃত নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যকে বিকৃত-ভাবে প্রকাশ করিবার আর একটি উপায়। এই উপায়ে কোনো উদ্দেশ্যের লক্ষ্যবস্তু অন্য কোন লক্ষ্যবস্তুর দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। আপিসের বড়বাবু হয়ত সাহেবের হাতে লাঞ্ছিত হইয়া গৃহে আসিয়া নিজ স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে। অথবা নবজাত ভ্রাতা বা ভগ্নীর উপর হয়ত শিশুর বিদ্বেষ প্রকাশিত হয় উহার পুতুল বা খেল্না নষ্ট করিবার মধ্য দিয়া। এই প্রক্রিয়াটি অনেকটা "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" চাপাইবার সামিল।

(৪) **যুক্ত্যাভ্যাস** (র‍্যাশন্যালাইজেশন্) সাহায্যেও নির্জ্ঞান উদ্দেশ্য অন্য আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। ছাত্র হয়ত তাহার অকৃতকার্যতার জন্য শিক্ষকের বা পরীক্ষকের পক্ষপাতিত্ব, শিক্ষার দোষ অথবা পড়ার সময়ের

অল্পতা প্রভৃতিকে দায়ী করিতে পারে। আবার মা হয়ত ছেলের স্কুল কামাই হইবে অথবা সে অসৎ সঙ্গে মিশিবে এই সকল আপত্তি তুলিয়া ছেলেকে নিজের কাছে আটকাইয়া রাখেন। আবার বাপ হয়ত নিতান্ত রাগের মাথায় ছেলেকে বেদম প্রহার করিয়া পরে নিজকে এই মনে করিয়া সান্ত্বনা দেন যে তিনি পুত্রের মঙ্গলের জন্যই তাহাকে প্রহার করিয়াছেন।

(৫) **ক্ষতিপূরণ** (কম্‌পেন্‌সেশন্) নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যকে ছদ্ম আবরণে প্রকাশ করিবার আর একটি উপায়। ইহার সাহায্যে ব্যক্তি তাহার দুর্বলতা বা ত্রুটিকে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত আচরণের দ্বারা গোপন করিবার চেষ্টা করে। যেমন কুরূপা নারী হয়ত গ্রন্থকীট (বুক্-ওয়ার্ম) হইয়া ওঠে, বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করে এবং এইরূপে সেই সম্মান বা সমাদর আদায় করিয়া লয় যাহা সে তাহার রূপের দ্বারা লাভ করিতে পারে নাই। বেঁটে লোক হয়ত মস্ত বড় যোদ্ধা হইয়া তাহার খর্বতার ন্যূনতা পোষাইয়া লয়। আবার হয়ত নিরক্ষর পিতা সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত করিয়া নিজ নিরক্ষরতার ক্ষতিপূরণ বা ত্রুটি সংশোধন করেন। অ্যাড্‌লার ব্যক্তির ত্রুটি সংশোধনের উপায় হিসাবে ক্ষতিপূরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

(৬) **উদ্গতি** (সাব্‌লিমেশন্) নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যের বিকৃত প্রকাশকে সাহায্য করে। অন্যান্য উপায়গুলির তুলনায় উদ্গতি নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যকে সমাজ ও কৃষ্টির সহায়ক কোনো ছদ্ম প্রকাশের পথে পরিচালিত করে। অর্থাৎ উদ্গতিতে কোনো নিম্নতর উদ্দেশ্য উচ্চতর উদ্দেশ্যের আবরণ লইয়া প্রকাশিত হয়। যেমন নির্জ্ঞান যৌন কামনা হয়ত বিজ্ঞান, ধর্ম, সঙ্গীত অথবা শিল্পকলা প্রভৃতি উচ্চতর দৃষ্টির মধ্য দিয়া তৃপ্তিলাভ করে। কোনো বালবিধবা হয়ত তাহার অতৃপ্ত মাতৃত্ব কামনার তৃপ্তি আস্বাদন করে সেবাব্রতের মধ্য দিয়া।

(৭) আবার **মনঃসৃষ্টির** (ফ্যান্‌ট্যাসি) মধ্য দিয়াও নির্জ্ঞান উদ্দেশ্য সংজ্ঞানে প্রকাশিত হইতে পারে। যেমন সমাজে উপেক্ষিত বা ব্যর্থতা-বিড়ম্বিত ব্যক্তি হয়ত কল্পনায় তাহার ন্যূনতা পোষাইয়া লয়।

(৮) **প্রত্যাবৃত্তি** (রিগ্রেশন্) আর একটি উপায় যাহার সাহায্যে নির্জ্ঞান উদ্দেশ্য সংজ্ঞানে চরিতার্থ হইতে পারে। প্রত্যাবৃত্তিতে ব্যক্তি বর্তমান পরিস্থিতিতে পরাস্ত হইয়া কোনো অতীত অবস্থায়—যেমন পরিত্যক্ত শৈশব অবস্থায়—ফিরিয়া যায়। যেমন নবজাত ভ্রাতা বা ভগ্নীর প্রাপ্য পিতামাতার

মনোযোগ বা আদর কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে শিশু হয়ত তাহার বাল্যাবস্থার অভিনয় করে। সে হয়ত পাঁচ বৎসরের শিশু হইয়াও তুই বৎসরের শিশুর মত আধো আধো কথা বলে অথবা কাজ্ করে।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

উড্ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস্—সাইকলজি—দশম পরিচ্ছেদ

জি. মার্ফি—জেনার‍্যাল্ সাইকলজি—চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এন্. এল্. মান্—সাইকলজি—চতুর্থ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সি. টি. মর্গ্যান—ইন্‌ট্রডাক্‌শন্ টু সাইকলজি—তৃতীয়, দশম, একবিংশ পরিচ্ছেদ

জি. ডি বোযাজ্—জেনার‍্যাল্ সাইকলজি—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

Exercise

1. What is motivation ? Analyse the factors constituting it. (pp. 282-283)
2. What are the main drives of behaviour ? Distinguish between purpose and drive (pp. 284-290)
3. Classify the principal drives of behaviour. Explain hunger, thirst, sleep and sexual impulses as drives. (pp. 284-290)
4. Explain the relation between drives and instincts. (p. 290)
5. Define need. Distinguish between primary and secondary needs. (pp. 290-292)
6. Define motive. How does it differ from stimulus and incentive ? (pp. 292-294)
7. Classify the principal motives after Woodworth. (pp. 294-295)
8. What are the methods of testing the strength of motives ? Illustrate your answer with examples. (pp. 297-298)
9. Explain the main incentives to action. (pp. 298-299)
10. Distinguish between motive and intention. (pp. 299-300)
11. How would you distinguish between learned and the unlearned motives ? Explain the main learned motives. (pp. 300-302)
12. Explain the unconscious motivation of action. What are the mechanisms through which unconscious motivation takes place ? (pp. 302-305)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ইচ্ছা—কোনেশন্

১। ইচ্ছার মৌলিকতা

মনের ক্রিয়া তিন শ্রেণীর—যথা অবগতি, অনুভূতি, এবং ইচ্ছামূলক (কগ্‌নিটিভ্, অ্যাফেক্‌টিভ্, কোনেটিভ)—এই গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের সপ্তম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

অবগতি (কগ্‌নিশন্) এবং অনুভূতির (অ্যাফেক্‌শন্) মত ইচ্ছা বা কর্মবৃত্তিও (ভলিশন্, কোনেশন্) মনের একটি প্রধান ক্রিয়া। সক্রিয়তা বা কর্মপ্রবণতা মানসবৃত্তির পরিবর্তনের কাবণ। অধ্যাপক স্টাউট্ বলিয়াছেন যে মানসিক পরিবর্তনের সোজাসুজি বোধ বা অভিজ্ঞতাই ইচ্ছা।

মানসবৃত্তির সক্রিয়তা বা কর্মপ্রবণতা বলিতে বুঝায় যে (১) বাধা না থাকিলে প্রত্যেক মানসবৃত্তি কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধন করে, অথবা ইহা হইতে কোনো ফলোদয় হয় এবং (২) এই পবিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহার নিজস্ব স্বভাব বজায় থাকে। ইচ্ছা বা কর্মবৃত্তিও উহাব উদ্দেশ্যসাধনে বা ফল-প্রাপ্তিতে সার্থকতা বা পূর্ণতা লাভ কবে।

ইচ্ছার পরিচয় ক্রিয়ায়

ইচ্ছা বা কর্মবৃত্তির পরিচয় চেষ্টা এবং স্থূল ক্রিয়ার মধ্য দিয়া। 'ইচ্ছা' একটি বিমূর্ত বা সূক্ষ্ম (অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্) পদ হইলেও, স্বভাব (ডিস্‌পজিসন), আকর্ষণ (ইন্‌টারেস্ট্), অভাব (নীড্), কামনা (উইশ্), আকাঙ্ক্ষা (ডিজায়ার্), আবেগ (ইম্‌পালস্), মনোযোগ (অ্যাটেন্‌শন্) প্রভৃতি চেষ্টাত্মক বৃত্তির মধ্য দিয়া বিশেষ বিশেষ স্থূল কর্মে প্রকাশিত হয়। আবার ইচ্ছামূলক কর্মের ফলে জ্ঞানের বা অবগতির বিশদতা (ক্লিয়ার্‌নেস্) ও স্পষ্টতা (ডিস্‌টিংক্‌ট্‌নেস্) বাড়িয়া যাইবার ক্রিয়াকেই মনোযোগ (অ্যাটেন্‌শন্) বলে।

ইচ্ছা ও মনোযোগ

ইচ্ছার তীব্রতা (ইন্‌টেন্‌সিটি) কম বা বেশী হইতে পারে। যেমন, সাধারণভাবে কোনো প্রত্যক্ষ বা ধারণায় ইচ্ছার বা মনোযোগের মাত্রা কম,

আবার কতগুলি ধারণাকে বাদ দিয়া কতগুলিতে মনকে একাগ্র করিলে ইচ্ছার বা মনোযোগের মাত্রা বেশী হয়। যে বিষয় বা বস্তুতে ইচ্ছাকে কেন্দ্রীভূত করা হয় তাহাতে মনোযোগের মাত্রা স্বভাবতঃ বেশী, আবার যে সকল বস্তু মনের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাতে উহার মাত্রা স্বভাবতঃ কম হইয়া থাকে। অধ্যাপক ওয়ার্ড-এর মতে ইচ্ছা মনোযোগের সহিত অভিন্ন এবং সমগ্র মানসজীবনে ব্যাপ্ত।

জ্ঞান ইচ্ছাত্মক

অবগতি বা জ্ঞান ইচ্ছাকে বাদ দিয়া হয় না। আবার ইচ্ছা বা যে কোনো কর্মেই জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে। নিছক জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানের চর্চা মানসজীবনের উচ্চস্তরেই সম্ভব। তাহার পুর্বে কর্মে সাফল্যলাভের জন্যই জ্ঞানের প্রয়োজন ঘটে। এই বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা ঠিক যে জ্ঞান অন্ততঃ আংশিকভাবে ইচ্ছাত্মক বা ক্রিয়াত্মক। যেমন কোনো জ্ঞানই মনোযোগ ছাড়া সম্ভব নয় এবং মনোযোগ একটি ইচ্ছামূলক বৃত্তি।

অনুভূতি ইচ্ছাত্মক

আবার অনুভূতি বা ফীলিং-এর মধ্যেও ইচ্ছা বা কর্মপ্রবৃত্তির স্থান রহিয়াছে। অভাববোধ বা অস্বস্তিকর অনুভূতি হইতেই উহা দূর করিবার ইচ্ছা জাগে। স্বাভাবিক ইচ্ছা বাধা পাইলে দুঃখ জন্মে, আবার উহা অবাধে কার্যকরী হইলে সুখ উৎপন্ন হয়। প্রথম মতানুসারে অনুভূতিই ইচ্ছার কারণ এবং দ্বিতীয় মত অনুযায়ী ইচ্ছাই অনুভূতির কারণ। অধ্যাপক ওয়ার্ড, স্টাউট্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ দ্বিতীয় মতটিকে সমর্থন করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, জ্ঞান এবং অনুভূতির মত ইচ্ছাও যে একপ্রকার মৌলিক মানসবৃত্তি তাহা উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে।

২। ইচ্ছা, অবগতি ও অনুভূতি

কোনো মানসবৃত্তিই কেবল ইচ্ছা, অবগতি বা জ্ঞান এবং অনুভূতির একক আকার লইয়া ঘটে না। যেমন বই লেখারূপ ক্রিয়াটি শুধু ইচ্ছাত্মক, জ্ঞানাত্মক অথবা অনুভূতিমূলক নয়। এই ক্রিয়াটি ইচ্ছা, জ্ঞান এবং অনুভূতির যৌগিক

ফল। বই লেখায় অসংলগ্ন বস্তু হইতে মনকে সরাইয়া লইয়া আসল বিষয়ে একাগ্র করিতে হয়। সুতরাং এই ক্রিয়ায় ইচ্ছা সক্রিয়। আবার লিখিবার বিষয়গুলিকে জানিয়া বইটি লিখিতে হয়। তৃতীয়তঃ, বইটি লিখিতে লিখিতে ইহার কোনো অংশ ভাল লাগে আবার কোনো অংশ হয়ত ভাল লাগে না। সুতরাং বই-লেখা ক্রিয়াটি কেবল জ্ঞানাত্মক, ইচ্ছাত্মক বা অনুভূতি-মূলক নয়, কিন্তু জ্ঞান, ইচ্ছা এবং অনুভূতির সমষ্টিগত ফল।

ইহাদের অবিচ্ছিন্নতা

কোন মানসবৃত্তি হইতেই এই তিনটি দিককে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করা যায় না। কিন্তু উহাদের পার্থক্য নির্দেশ বা বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন বই-লেখা-রূপ ক্রিয়ার এই দিকটি জ্ঞানাত্মক, এই দিকটি ইচ্ছাত্মক এবং এই দিকটি অনুভূতিমূলক—এইরূপে ইহার দিঙ্‌নির্ণয় করা যাইতে পারে।

অবিচ্ছিন্ন হইলেও বিভিন্ন

জানা বা চিন্তা করা, সুখ দুঃখ অনুভব করা এবং চেষ্টা বা কর্ম করা মনের অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া হইলেও, ইহারা বিভিন্ন। সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে অনুভূতি নিষ্ক্রিয় (প্যাসিভ্) এবং ব্যক্তিগত (সাব্‌জেক্টিভ্), জ্ঞান আংশিকভাবে সক্রিয় (অ্যাক্টিভ্) এবং বিষয়গত (অব্‌জেক্টিভ) বা নৈর্ব্যক্তিক, আবার ইচ্ছা সক্রিয় এবং আংশিকভাবে বিষয়গত বা নৈর্ব্যক্তিক।

উপরোক্ত পার্থক্য সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলা যায় যে **অনুভূতি জ্ঞান এবং ইচ্ছার মধ্যবর্তী সেতুস্বরূপ**। অনুভূতিকে বাদ দিলে জ্ঞান নীরস ও শুষ্ক এবং চেষ্টা দুর্বল ও প্রাণহীন হইয়া দাঁড়ায়। অনুভূতি জ্ঞানকে সরস ও প্রাণবন্ত করিয়া তোলে। আবার জ্ঞান ইচ্ছাকে বলবতী করিয়া ফলপ্রসূ হয়।

আবার **অন্য দিক দিয়া জ্ঞানকে অনুভূতি এবং ইচ্ছার সেতু বলা যায়।** ইচ্ছায় মন বহির্জগতের উপর ক্রিয়া করে। অনুভূতিতে বহির্জগৎ মনের উপর ক্রিয়া করে। কিন্তু জ্ঞানে বহির্জগৎ যেমন মনের উপর ক্রিয়া করে, তেমন মনও বহির্জগতের উপর ক্রিয়া করে। বহির্জগৎ হইতে জ্ঞানের উপাদান আহরণ করা হয়। আবার এই আহৃত উপাদানগুলি বুদ্ধি সাহায্যে সংগঠিত হইয়া থাকে।

ইচ্ছা উদ্দেশ্যমূলক

ইচ্ছা উদ্দেশ্যমূলক। অবশ্য এই উদ্দেশ্য সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান, এমনকি নির্জ্ঞানও হইতে পারে। যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচলাচল, পরিপাক, প্রতিবর্ত, সহজ প্রবৃত্তি প্রভৃতি আসংজ্ঞান ক্রিয়াগুলি দেহযন্ত্রের শৃঙ্খলা বা সামঞ্জস্যরক্ষা-রূপ উদ্দেশ্য সাধন করে। এমন কি সংবেদন প্রভৃতি যান্ত্রিক ক্রিয়াগুলিও যেন কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করে বলিয়া মনে হয়। দেখা, শোনা, স্পর্শ করা প্রভৃতি সংবেদন দেহযন্ত্রের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে কাজ করে।

সকল ক্রিয়াই জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক। আপাতদৃষ্টিতে যে সকল ক্রিয়া সম্পূর্ণ যান্ত্রিক বলিয়া মনে হয় সেইগুলিও উদ্দেশ্যমূলক।

৩। ইচ্ছা কথাটির অর্থ

ইচ্ছার তিনটি অর্থ

ইচ্ছা (কোনেশন্) কথাটি **তিনটি অর্থে** ব্যবহৃত হয়, যথা ব্যাপকতর, ব্যাপক এবং সঙ্কীর্ণ। **ব্যাপকতর অর্থে** যে কোনো ক্রিয়াই—তাহা ইচ্ছামূলক, অবগতিমূলক বা অনুভূতিমূলক, যাহাই হউক না কেন—ইচ্ছামূলক। ইচ্ছা কথাটি সাধারণতঃ এইরূপ অর্থে গৃহীত হয় না। **ব্যাপক অর্থ** অনুসারে স্বতঃ-সঞ্জাত (অটোম্যাটিক্) বা সহজ ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ স্তরের সঙ্কল্প (উইল্) বা স্পষ্ট উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া পর্যন্ত সকল ক্রিয়াই ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু **সঙ্কীর্ণ অর্থে** ইচ্ছা সহজ ক্রিয়া বুঝায় না, বুঝায় শুধু সেইসকল ক্রিয়া যেগুলি সংজ্ঞান বা স্পষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের দিকে পরিচালিত।

ব্যাপক অর্থে ইচ্ছা যে কোনো ক্রিয়াকেই বুঝায়। অনৈচ্ছিক (নন্-ভলাণ্টারি) ক্রিয়াও এই অর্থে ইচ্ছাত্মক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। সঙ্কীর্ণ অর্থে শুধু ঐচ্ছিক বা সংজ্ঞান উদ্দেশ্যমূলক এবং সঙ্কল্পিত ক্রিয়াকেই ইচ্ছা বলা যায়।

তাহা হইলে ব্যাপক অর্থে ইচ্ছা (কোনেশন্) দুইপ্রকার, যথা (১) অনৈচ্ছিক ক্রিয়া (নন্-ভলাণ্টারি য়্যাকশন্) এবং (২) ঐচ্ছিক ক্রিয়া (ভলাণ্টারি য়্যাক্শন্)।

(১) **অনৈচ্ছিক ক্রিয়া** বলিতে বুঝায় স্বতঃক্রিয়, স্বতঃবৃত্ত বা অক্রম গতি (অটোম্যাটিক্, র‍্যাণ্ডম্ অর্ স্পন্ট্যানিয়াস্ মুভ্মেণ্ট), প্রতিবর্ত গতি (রিফ্লেক্স মুভ্মেণ্ট), সহজ প্রবৃত্তি (ইনস্টিংক্ট্), ভাবগতি ক্রিয়া (ইডিওমোটর অ্যাক্শন্) এবং অভ্যাস (হ্যাবিট্)।

(২) **ঐচ্ছিক ক্রিয়া** সেই ক্রিয়া যাহা অভাব বা অস্বস্তিকর অনুভূতি হইতে জন্মে, যাহাতে ঐ অনুভূতি দূর করিতে পারে এমন কোনো বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে ধারণা থাকে এবং উহা লাভ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে। তাহা ছাড়া, অধিকাংশ স্থলেই ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় একাধিক আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব (কন্‌ফ্লিক্ট) উপস্থিত হয়। বিরোধী আকাঙ্ক্ষাগুলির দোষগুণ বিচার (ডেলিবারেশন্), একটি আকাঙ্ক্ষার নির্বাচন (সিলেক্‌শন), বাকীগুলিকে পরিত্যাগ এবং নির্বাচিত আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প (ডিটার্মিনেশন্) ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য। শুধু এইগুলিই নয়। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ধর্ম হইল বাস্তব ক্রিয়ায় পরিণত হওয়া এবং বাহিরের জগতে অথবা ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন ঘটানো।

৪। ঐচ্ছিক ক্রিয়া কাহাকে বলে

ঐচ্ছিক ক্রিয়া (ভলাণ্টারি অ্যাক্‌টিভিটি) বলিতে বুঝায় এইরূপ আত্ম-নিয়ন্ত্রিত (সেলফ্-কন্‌ট্রোল্‌ড্) এবং আত্মসচেতন (সেলফ্-কন্‌সাচ্) ক্রিয়া যাহা কোনো উদ্দেশ্যের ধারণা এবং ঐ উদ্দেশ্য লাভ করিবার ইচ্ছা লইয়া করা হয়। অথবা, স্বাধীন ইচ্ছা (ফ্রী উইল্) হইতে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, যাহা কর্তার নিজ ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং যাহা কোনো উদ্দেশ্যলাভের জন্য সজ্ঞান ভাবে সম্পন্ন হয় তাহাই ঐচ্ছিক ক্রিয়া। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার একটি প্রধান লক্ষণ হইল স্বাধীন নির্বাচন (ফ্রী চয়েস্)। কোনো ক্রিয়া স্বেচ্ছায় করিবার অর্থ, একাধিক কাজ করিবার সম্ভাবনা আছে (অল্টার্নেটিভ পসিবি-লিটিজ্ অফ্ অ্যাক্‌শন্) এমন অবস্থায় অন্যান্য সম্ভব কাজগুলি বর্জন করিয়া একটি কাজকেই কর্তব্য বলিয়া **বাছিয়া লওয়া**। অনেকগুলি **কামনার দ্বন্দ্ব** (কন্‌ফ্লিক্ট্ অফ্ ডিজায়ার্স) বা সংঘাত না থাকিলে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার কোনো অর্থ হয় না। যেমন ধরিয়া লওয়া হইল যে ক, খ এবং গ এই তিনটি কামনা অথবা সম্ভব কাজ একই সময়ে মনকে অধিকার করিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে মন একই সময়ে বিভিন্ন পথে পরিচালিত হইতে চাহিয়া সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। এই কামনাগুলি বিরোধী হইলে তো কথাই নাই। তাহা না হইলেও বিভিন্ন কামনা একত্র পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং ইহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। **বিচার শক্তির** (ডেলিবারেশন্) সাহায্যে ক, খ এবং গ এই তিনটি কামনা পরিতৃপ্তির ফলে কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হয়,

অথবা উহাদের দোষ এবং গুণ কি, এইরূপ তুলনামূলক আলোচনা করিয়া যে কামনাটি গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয় সেইটিই **নির্বাচিত** হয় এবং অন্য কামনা-গুলি বর্জিত হয়।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার আর একটি লক্ষণ হইল **দায়িত্ব-বোধ** (সেন্স্ অফ্ রেস্‌পন্‌সিবিলিটি)। যে কামনা বা ইচ্ছাটি স্বাধীন ইচ্ছায় কার্যে পরিণত করা হয়, তাহার ফলাফল যাহাই হউক না কেন, কর্তা উহার জন্য নিজকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী বলিয়া অনুভব করেন। কর্তার এই দায়িত্ব-বোধ না থাকিলে বুঝিতে হইবে যে তিনি স্বাধীন ইচ্ছায় কাজটি করেন নাই, কিন্তু বাধ্য হইয়া উহা করিয়াছেন।

আবার ইচ্ছা করিয়া কোনো কাজ করিবার অর্থ হইল ঐ কাজটিকে কর্তব্য বলিয়া মনে করা। অথবা ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত **কর্তব্যবোধ** বা বাধ্য-বাধকতাবোধ জড়িত থাকে। কোনো কাজ স্বেচ্ছায় করিবার অর্থ উহা ভাল বলিয়া মনে করা, এবং উহা ভাল বলিয়া মনে করার অর্থ উহা উচিত বলিয়া মনে করা।

আবার ঐচ্ছিক ক্রিয়ার আরও তাৎপর্য এই যে শুধু ক্রিয়াটিই যে ইচ্ছাকৃত তাহা নয়, কিন্তু ইহা করিতে হইলে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে সেইগুলিও স্বীকৃত। কেহ যদি ইচ্ছা করেন যে তিনি দেশের সেবা করিবেন, তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য-সাধনের প্রতিকূল অবস্থার বিরোধিতা করা এবং অনুকূল অবস্থার সাহায্য লওয়া এইরূপ ইচ্ছার অঙ্গীভূত।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সকল ফলই যে ভাল হয় তাহা নয়। দেশসেবার ফলে হয়ত পরিজনবর্গের ভাগ্যে অনেক লাঞ্ছনা ঘটিতে পারে। হয়ত দেশসেবকের পিতামাতা, স্ত্রী এবং পুত্রকন্যার ভাগ্যে ঘটে অনাহার। দেশসেবক হয়ত তাঁহার আত্মত্যাগের বিনিময়ে শুধু ভোগ করেন অবিচারই। এই ফলগুলি তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। তাঁহাব উদ্দেশ্য হইল দেশের কল্যাণরূপ ফললাভ।

দেশসেবক যে শুধু শেষোক্ত বাঞ্ছিত ফলই ইচ্ছা করেন তাহা নয় কিন্তু পূর্বোক্ত অবাঞ্ছিত ফলগুলিও ইচ্ছা করিয়া থাকেন।

৮। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ

অনেক মনোবিদের মতে ঐচ্ছিক ক্রিয়া একটি মৌলিক মানসবৃত্তি। এইরূপ মত সমীচীন কিনা তাহা বিবেচনা-সাপেক্ষ। কিন্তু এইরূপ মত গ্রহণীয় হইলেও

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ সম্ভব। এই বিশ্লেষণ উহার বিভাগ নয়, কিন্তু দিগ্‌দর্শন অথবা নানা দিক্ বা স্তর হইতে আলোচনা।

উৎস—অভাববোধ

(১) ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল ভিত্তি বা উৎস (স্প্রিঙ্গ্ অফ্ অ্যাক্‌শন্) অভাব বা প্রয়োজনবোধ। প্রয়োজনবোধ না থাকিলে কোনো ক্রিয়াই সম্ভব হয় না, ঐচ্ছিক ক্রিয়ার তো কথাই নাই। নিত্যতৃপ্ত অবস্থায় কর্মের প্রেরণা আসে না। অভাববোধের যান্ত্রিক কারণ হয়ত দেহযন্ত্রের পুষ্টির বা অন্য কোনো চাহিদা। কিন্তু মানস দিক হইতে অভাব একটি অস্থিরতা বা অস্বস্তির আকারে অনুভূত হইয়া থাকে। অস্বস্তি বা অস্থিরতাবোধের ধর্ম অঙ্গীকে (অর্গানিজ্‌ম্) বা মনকে উহা দূর করিবার জন্য চঞ্চল করিয়া তোলা। কর্মচাঞ্চল্য অভাববোধ হইতেই উৎপন্ন হয়। এই কারণে অভাববোধকে কর্মের উৎস বলে।

(২) অস্বস্তিবোধের অস্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর প্রাণীর, বিশেষ করিয়া মানুষের, ঐ অভাব সম্বন্ধে চেতনা থাকে। এই চেতনা হয়ত খুবই অস্পষ্ট অথবা অবচেতন । স্টাউট্ বলিয়াছেন যে এমন কি নিম্নতর প্রাণীর সহজ ক্রিয়াতেও অস্পষ্ট চেতনা থাকে। তাঁহার মতে ক্রিয়ার অন্তিম বা সুদূর (রিমোট্) উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিম্নতর প্রাণীর চেতনা না থাকিলেও উহার আসন্ন বা নিকট (প্রক্সিমেট্) উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চেতনা থাকে। যে বস্তু বা উদ্দেশ্য লাভ করিলে ঐ অস্বস্তিবোধ নিবারিত হইতে পারে তাহার ধারণা থাকা সম্ভব, বরং ঐ সকল **বস্তু বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা বা জ্ঞান** থাকা স্বাভাবিক।

(৩) অস্বস্তি বা অভাববোধ দূরীকরণে সহায়ক বস্তু বা উদ্দেশ্যের ধারণা হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহা লাভ করিবার **কামনা** (ডিজায়ার্) জাগে। কামনার একটি বিশেষ লক্ষ্য হইল অভাববোধ দূর করিবার সহায়তা করা। কামনা শুধু এই বস্তুগুলির চেতনাই নয়। কোনো বস্তুর কামনা জাগিলে উদ্দেশ্যের একটি অঙ্গরূপে উহা যে প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় এই স্পষ্টতর চেতনা জাগে।

(৪) কামনার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা অস্পষ্ট চেতনা এবং এই জন্য ইহা অন্ধভাবে নানাবস্তুর দিকে পরিচালিত হয়। ফলে একটি কামনার সহিত অনেক কামনা জাগিয়া ওঠে এবং এই **কামনাগুলির মধ্যে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব** (কন্‌ফ্লিক্ট্) দেখা দেয়।

কামনার দ্বন্দ্ব (কন্‌ফ্লিক্ট্‌ অব্‌ ডিজায়ার্স) অত্যন্ত সংশয়াকুল এবং কষ্টকর অবস্থা। একটি কামনার সহিত অপর একটির দ্বন্দ্ব ঘটিলে ক্রিয়া ব্যাহত হইয়া নিস্পন্দ এবং নিশ্চল অবস্থার উদ্ভব হয় অথবা সমস্যা উপস্থিত হয়। এই অবস্থার নিরসন বা সমাধান করিবার জন্য বিবেচনার (ডেলিবারেশন্‌) প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন কামনার মধ্যে কোন্‌টি পরিতৃপ্ত হইলে কিরূপ সুফল বা কুফল লাভ হয়, অথবা কোন্‌টির কি গুণ বা দোষ, এইরূপ **তুলনামূলক বিচারই বিবেচনা বা ডেলিবারেশন্‌**। অথবা বিবেচনা বলিতে বিভিন্ন কামনা পরিতৃপ্ত করিবার অগ্র পশ্চাৎ (প্রোজ্‌ অ্যাণ্ড্‌ কন্‌স্‌) বিচার করা বুঝায়।

(৫) বিভিন্ন কামনা-পরিতৃপ্তির দোষ গুণ বিবেচনার ফলে স্থির হইয়া যায় যে একটি কামনার পরিতৃপ্তি হইলেই বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে এবং অন্যান্য কামনাগুলির পরিতৃপ্তিতে তাহা হইবে না। এইরূপ নিশ্চয়তাবোধ হইলেই কামনাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটে এবং একটি কামনা নির্বাচিত হইয়া অন্য কামনাগুলি বর্জিত হয়।

উদ্দেশ্যসাধনের প্রতিকূল কামনাগুলি বর্জন করিয়া উহার অনুকূল কামনাটির গ্রহণকে **স্বাধীন নির্বাচন** (ফ্রী চয়েস্‌) বলে। এই স্বাধীন নির্বাচন ঐচ্ছিক ক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায়ও কামনার নির্বাচন ঘটিতে পারে। কিন্তু অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার কামনা নির্বাচন স্বাধীন নয়।

(৬) নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে কামনা-দ্বন্দ্ব দূর হইয়া সন্দেহের অবসান ঘটে। এই অবস্থায় মনের দোলায়মান অবস্থা থাকে না। কোন্‌ কামনাটি পূর্ণ করিতে হইবে তাহার নিশ্চিত মীমাংসা হইয়া যায় এবং উহাকে কার্যে পরিণত করিবার স্থির সঙ্কল্প জাগে। এই স্থির সঙ্কল্পকেই (ডিটার্মিনেশন্‌, রিজল্‌ভ্‌) ইচ্ছা (উইল্‌) বলে।

ইচ্ছার চেতনায় থাকে **স্বাতন্ত্র্যবোধ বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণবোধ।** স্বাধীন চেতনাই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সারভূত লক্ষণ। এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণবোধ বা স্বাধীন চেতনার সহিত জড়িত থাকে দায়িত্ববোধ। কর্তার ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল চেতনা এই যে তাহার স্বাধীন বিচার বা ন্যায়অন্যায় বোধের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত, অথবা এই ক্রিয়ায় সকল ফলাফলের দায়িত্ব তাহার।

স্বাধীন ইচ্ছা—মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী

ইচ্ছা আত্ম-নিয়ন্ত্রিত বা স্বাধীন কিনা এই বিষয়ে দার্শনিক মতভেদ বা সন্দেহ থাকিতে পারে। যুক্তির দিক দিয়া স্বাধীন ইচ্ছা সত্য বা মিথ্যা হইতে

পারে। কিন্তু মনোবিদ্যার বস্তুনিষ্ঠ (পজিটিভ্) দিক্ হইতে স্ব-নিয়ন্ত্রিত বা স্বাধীন ইচ্ছার বাস্তবিকতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। একটি কামনাকে অনেকগুলি কামনা হইতে বাছিয়া লওয়ার সহিত জড়িত কর্তার স্ব-নিয়ন্ত্রণ-চেতনা একটি বাস্তব ঘটনা। বস্তুনিষ্ঠ মনোবিদ্যার পক্ষে এই বাস্তব চেতনাকে অস্বীকার করা অবাস্তব, ইহার যুক্তিবিদ্যাসঙ্গত যাথার্থ্য (লজিক্যাল্ ভ্যালিডিটি) থাকুক বা না থাকুক।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার উপরোক্ত স্তরগুলি **মানস** (মেণ্ট্যাল্) বা আন্তর (ইণ্টার্ন্যাল্)। এই মানস স্তরগুলির জ্ঞান হয় অন্তর্দর্শনের সাহায্যে। বাহ্য পর্যবেক্ষণ (অবজার্ভেশন্) ইহাদের জ্ঞানলাভে সহায়তা করে না। কিন্তু ঐচ্ছিক ক্রিয়া এই মানসস্তরগুলি অতিক্রম করিয়া কার্যে পরিণত হয়। মনের বেগ বা শক্তি বাহিরে প্রকাশিত হইতে চায়। ফলে অন্তঃযন্ত্রের মধ্যে নানা পরিবর্তন ঘটে। হয়ত পেশী শক্ত ও সবল হইয়া ওঠে, গ্রন্থিগুলি উহাদের শক্তিশালী রস বা পদার্থ নিঃসরণ করিতে থাকে। হয়ত শরীরযন্ত্রে চাপ (টেন্সন্) অনুভূত হয়, যাহার ফলে শরীর আর নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু সক্রিয় হয়। শরীরের অন্যান্য অন্তঃযন্ত্র, যেমন হৃদ্‌যন্ত্র, ফুস্‌ফুস, যকৃৎ প্রভৃতি, কর্মচঞ্চল হইয়া ওঠে। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত জড়িত এইরূপ পরিবর্তনগুলিকে উহার **অন্তঃযন্ত্রীয়** (অর্গ্যানিক্, ইনট্রা-অর্গ্যানিক্) স্তর বলা যায়।

অন্তঃযন্ত্রীয় স্তরের চাঞ্চল্য বাহ্য বা বাস্তব ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রস্তুতি। এই-গুলির ফলে যে বাস্তব ঐচ্ছিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় উহাকে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার **বাহ্য** স্তর (এক্স্‌টার্ন্যাল্ বা এক্স্‌ট্রা-অর্গ্যানিক্ স্টেজ) বলা যাইতে পারে। ইহা পর্যবেক্ষণযোগ্য।

৬। প্রেষণা (মোটিভ্)

প্রেষণা বা মোটিভ সেই শক্তি যাহা ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে কার্যে প্রেরণ বা প্রেষণ করে। অথবা ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে যে শক্তি কার্যে পরিণত করে তাহাকে উহার প্রেরক বা প্রেষক বলে।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেরক বা প্রেষক কি তাহা লইয়া মতভেদের অন্ত নাই। কিন্তু এই ক্রিয়ার বিশ্লেষণ হইতে দেখা গিয়াছে যে কোনো অভাব বা প্রয়োজন বোধ এবং তজ্জনিত অস্বস্তি বা অস্থিরতাই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেরক বা প্রেষক।

প্রেষণা শুধু অনুভূতিমূলক কিনা

প্রেষকের উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুভূতিমূলক (অ্যাফেক্‌টিভ্)। ইহার ফলে প্রেষণা ব্যক্তিগত অস্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বস্তিবোধে পরিণত হয়। অথবা প্রেষণার এই ব্যাখ্যা ইচ্ছাকে ক্রিয়াত্মক না করিয়া অনুভূতিমূলক করিয়া ফেলে। অনুভূতি নিষ্ক্রিয় (প্যাসিভ্)। নিষ্ক্রিয় অনুভূতিকে সক্রিয় (অ্যাক্‌টিভ্) ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অনুভূতি বড় জোর সুখে হাসাইতে অথবা দুঃখে কাঁদাইতে পারে, কিন্তু কর্মে নিযুক্ত করাইতে পারে না। দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া শুধু বিষণ্ণ হইয়া থাকিলেই দুঃখ নিবারণ হয় না। দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করা একটি ক্রিয়া, শুধু অনুভূতি নয়। সুখ দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতিগুলি অনুভূতি হিসাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক (সাব্‌জেক্‌টিভ্) এবং নিষ্ক্রিয় (প্যাসিভ)।

তাহা হইলে শুধু অনুভূতিকে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষক বা প্রেরক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। অনুভূতি শুধু নিষ্ক্রিয় অনুভূতি মাত্র নয়, কিন্তু ক্রিয়া-প্রবণতাও বটে। ইহাকে অস্বস্তিবোধ নিবারণের ক্রিয়াপ্রবণতাও বলিতে হয়। আবার ইহা শুধু অনুভূতিমূলক এবং ক্রিয়াত্মকই নয়, কিন্তু জ্ঞানাত্মক বা অবগতিমূলকও বটে। অস্বস্তিবোধের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ বস্তু লাভ করিলে উহা দূর হইবে সেই সম্বন্ধে জ্ঞানও অনিবার্য। অর্থাৎ ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূলগত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ এবং উহা দূর করিবার কর্মপ্রবণতা অন্ধ নয়, কিন্তু আসন্ন বা নিকট ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চেতন বা সংজ্ঞানও বটে।

সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে **প্রেষক একাধারে অনুভূতি, ক্রিয়া এবং অবগতিমূলক**। অর্থাৎ অস্বস্তি-অনুভূতি, উহা দূর করিবার আবশ্যক জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানকে কার্যে পরিণত করিবার ক্রিয়া এই তিনটি মিলিত হইয়াই ইচ্ছার প্রেরক, প্রেষক বা মোটিভ্ গঠন করে।

অভাব বা অস্বস্তিবোধ না থাকিলে ঐচ্ছিক ক্রিয়া ঘটে না সত্য। কিন্তু এই অবস্থাটি শুধু অনুভূতিমূলক নয়, ক্রিয়ামূলক এবং অবগতিমূলকও বটে। ইহা একপ্রকার বাধাস্বরূপ এবং বাধা দূর করিবার জন্য কর্মপ্রবণতা স্বাভাবিক। আবার কর্মপ্রবণতা শুধু প্রবণতাই থাকিয়া যায়, যদি কি উপায়ে এই অভাব দূর হইবে তাহার চেতনা বা জ্ঞান না থাকে। সুতরাং অভাববোধের সঙ্গে সঙ্গে কি উপায়ে উহার প্রতিকার হইবে তাহার চেতনা থাকে। কিন্তু এই চেতনা অত্যন্ত অস্পষ্ট। ইহা কর্মপ্রবণতাকে বাস্তবভাবে সক্রিয় করিতে পারে না।

অস্পষ্ট চেতনাটি অনেকগুলি বস্তুর বা উপায়ের চেতনা। এই সকল বস্তুর কামনা স্পষ্টভাবে চেতন কামনায় পরিণত না হইলে কর্মপ্রবৃত্তি ঘটে না। তাই পরস্পরবিরোধী কামনাগুলির অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে হয়। বিবেচনার ফলে একটি কামনা নির্বাচিত এবং অন্যগুলি বর্জিত হয়। স্বাধীনভাবে নির্বাচিত কামনাই উহাকে কার্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প উৎপন্ন করে।

প্রেষক আসলে নির্বাচিত কামনা

সুতরাং প্রেষক বা মোটিভ্ বলিতে নির্বাচিত কামনা বুঝায়। কামনাগুলির দ্বন্দ্ব চলিতে থাকিলে নিষ্ক্রিয় অবস্থা ঘটে। নির্বাচিত কামনা নিষ্ক্রিয়তা দূর করিয়া সক্রিয়তা ঘটায়। অতএব নির্বাচিত কামনাই (চোজ্‌ন্ ডিজায়ার্) প্রেষক বা মোটিভ্।

প্রেষক ও উদ্দেশ্য

অন্য দিক দিয়া বলা যায়, উদ্দেশ্য লাভ করিলে নির্বাচিত কামনাটি পরিতৃপ্ত হইবে তাহার চেতনা বা ধারণাই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষক বা মোটিভ্। উদ্দেশ্যের ধারণাই বিবেচনা বা ডেলিবারেশন্-এর সাহায্যে স্পষ্ট হইয়া ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষণা বা প্রেরণা যোগায়।

কী অর্থে উদ্দেশ্যই প্রেষক

এই উদ্দেশ্য বা মোটিভ্ ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে এমন একটি লক্ষ্য। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ভবিষ্যতে পূরণীয় উদ্দেশ্য কিরূপে বর্তমান ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। উত্তর এই যে যদিও উদ্দেশ্যের পূর্ণতা অবস্থাটি ভবিষ্যৎ, কিন্তু এই উদ্দেশ্যের ধারণাটি বর্তমান। ইহা একটি অনুভূত অবস্থা যাহা অন্তর্দর্শনে ধরা পড়ে। কিন্তু উদ্দেশ্যটি ধারণা হিসাবে একটি অস্বস্তিকর বর্তমান অবস্থা। ধারণাগত উদ্দেশ্য বাস্তবে পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত একটি অস্থির বা চঞ্চল অবস্থারূপে থাকে যাহা বাস্তবে পূর্ণতা লাভ করিলেই শান্ত বা স্থির হয়।

তাহা হইলে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষক বা মোটিভ্ শুধু উদ্দেশ্যের ধারণাই নয়, কিন্তু এই ধারণাকে বাস্তবে পরিণত করিবার প্রবণতাও বটে। ধারণাটি পিছন হইতে ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে তাড়না করে, আবার উহাকে কার্যে পরিণত করিবার প্রবৃত্তিটি সম্মুখ হইতে উহাকে আকর্ষণ করে।

প্রেষক ও অভিপ্রায়

মোটিভ্ বা প্রেষকের সহিত অভিপ্রায়ের (ইন্‌টেন্‌শন্) পার্থক্য মনে রাখা দরকার। যে উদ্দেশ্য লাভ করিবার জন্য ঐচ্ছিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাই উহার মোটিভ্ বা প্রেষক। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছা হইলেই প্রকারান্তরে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় এবং ফলাফল স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। পিতা পুত্রের মঙ্গল কামনায় এমন উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে পারেন যাহা তাঁহার কাম্য নয়। তিনি হয়ত পুত্রকে শাস্তি দিয়া প্রকারান্তরে বা গৌণভাবে তাহার কষ্টও কামনা করেন। অস্ত্রচিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করেন সে নিরাময় হউক এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই সদুদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তিনি রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার, রক্তপাত, এমন কি গৌণভাবে রোগীর মৃত্যুও কামনা করেন। পুত্রের মঙ্গল সাধন এবং রোগীর নিরাময়ই যথাক্রমে পিতার এবং চিকিৎসকের মোটিভ্ বা উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পিতা এবং চিকিৎসক যে উপায় অবলম্বন করেন এবং সে সকল জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ফলের জন্য প্রস্তুত থাকেন সেইগুলি তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়, তথাপি অভিপ্রায়ের অঙ্গীভূত। সুতরাং যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ঐচ্ছিক ক্রিয়া ঘটে তাহাই উহার প্রেষক বা মোটিভ্, কিন্তু যে সকল বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত উপায় এবং ফলাফল ঐ উদ্দেশ্যসাধনের সহিত জড়িত থাকে তাহা উহার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু অভিপ্রায় অথবা ইন্‌টেন্‌শন্।

উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় অভিন্ন নয়। অভিপ্রায়ের একটি অংশ হইল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ উদ্দেশ্যের তুলনায় অভিপ্রায় ব্যাপক। উদ্দেশ্য বলিতে বুঝায় সেই লক্ষ্য বা বস্তু যাহা লাভ করিবার জন্য ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহাতে লক্ষ্যে পৌছাইবার জন্য অবলম্বিত উপায় এবং ফলাফল অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু অভিপ্রায় বলিতে বুঝায় যে উদ্দেশ্যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহা, উদ্দেশ্যলাভের অবলম্বিত উপায় এবং উহার ফলাফল। অথবা যে জন্য ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাই উদ্দেশ্য এবং যাহা সত্ত্বেও ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহা অভিপ্রায়ের অঙ্গীভূত।

৭। কামনা (ডিজায়ার্)

কামনা বা ডিজায়ার্ ইচ্ছার নিম্নতম স্তর। ইচ্ছায় সঙ্কল্পবোধ আছে, কিন্তু কামনায় তাহা নাই। কামনা-দ্বন্দ্বের অবসান না হইলে ইচ্ছা উৎপন্ন হয় না। সুতরাং কামনার তুলনায় ইচ্ছা উন্নততর মানসবৃত্তি।

অভাববোধ এবং কামনা

অভাব বা প্রয়োজনবোধ হইতে কামনা জন্মে। কিন্তু কামনা শুধু প্রয়োজন বা অভাববোধ মাত্র নয়। অভাববোধে উহার বস্তু সম্বন্ধে চেতনা থাকে কিনা সন্দেহ, থাকিলেও সেই চেতনা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কিন্তু কামনায় উহার বস্তু সম্বন্ধে স্পষ্টতর চেতনা থাকে। আবার কামনায় উহার বস্তু সম্বন্ধে যে চেতনা থাকে তাহা অন্ধ অভাববোধের তুলনায় স্পষ্টতর হইলেও, ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের তুলনায় অস্পষ্ট।

একই সময়ে অনেকগুলি কামনা ঘটিতে পারে। কাহারও হয়ত আহার করিবার কামনা হইয়াছে, কিন্তু সে কি আহার করিতে চায় সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান নাই। শিশু হয়তো একটি ভালো জামা চায়, কিন্তু সে ঠিক কোন্ জামাটি চায় সেই বিষয়ে তাহার স্পষ্ট জ্ঞান প্রায়ই থাকে না। নিছক অভাববোধের স্তরে দ্বন্দ্ব ঘটে না।

কামনা-দ্বন্দ্ব—ইহার কারণ

কিন্তু কাম্য বস্তু সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকায়, একটি কামনার সহিত অপর কামনার দ্বন্দ্ব বা বিরোধ ঘটে। নিছক প্রয়োজনবোধ অথবা অন্ধ আবেগে এই দ্বন্দ্ব বা বিরোধ ঘটে না। ইহার অন্ধ শক্তি ইহাকে অনিবার্য আত্মতৃপ্তির দিকে ছুটাইয়া লয়। কামনা এইরূপ অনিবার্য পরিতৃপ্তির পথে ছুটিতে পারে না। কারণ ইহাতে বস্তুর অস্পষ্ট চেতনা থাকে যাহা অন্ধ আবেগে থাকে না। ফলে কামনায় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং দ্বন্দ্বের অবসান না হওয়া পর্যন্ত কামনা কার্যকরী হইতে পারে না।

কামনা দ্বন্দ্বের কারণ এই যে কর্তা নিজেকে কোন্ কামনাটির সহিত মানাইয়া লইবেন তাহা বুঝিতে পারেন না। কামনা সমগ্র ব্যক্তিত্বের বা চরিত্রেরই অংশ। কোন্ কামনাটি ব্যক্তিত্বের বা চরিত্রের সহিত খাপ খায় সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞানের অভাবই কামনা-দ্বন্দ্বের কারণ। সন্তান সম্বন্ধে পিতৃত্ব স্বভাবটির সহিত যে কামনা শোভা পায় না তাহাতে আকর্ষণ বোধ করিলেও হয়ত পিতা তাহা চরিতার্থ করেন না। সত্যবাদী বা সদাশয় ব্যক্তি সেইরূপ কামনাকেই প্রশ্রয় দিতে পারেন যাহার পরিতৃপ্তি তাঁহার চরিত্রের সহিত মানায়। কিন্তু কামনা যে স্তরের ইচ্ছা তাহাতে চরিত্রের সহিত উহার সামঞ্জস্য আছে বা নাই এইরূপ উচ্চতর জ্ঞান থাকে না।

সেইজন্য একটি কামনার সহিত অন্যান্য কামনার দ্বন্দ্ব বা বিরোধ লাগিয়া যায়।

৮। আকাঙ্ক্ষা (উইস্)

আকাঙ্ক্ষা (উইস্), কামনা এবং ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের মধ্যবর্তী একটি ক্রিয়াত্মক অবস্থা। সুতরাং কামনার সহিত আকাঙ্ক্ষার একটু পার্থক্য আছে। অবশ্য কামনা এবং আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কামনা ও আকাঙ্ক্ষা

কামনা এবং আকাঙ্ক্ষা উভয়ই ক্রিয়াত্মক বৃত্তি। কিন্তু কামনা অন্ত-বিরোধের জন্য কার্যকরী হইতে পারে না। ইহা কার্যকরী হইতে পারে তখনই, যখন উহার সহিত অন্য কামনার বিরোধ দূর হয়। আকাঙ্ক্ষা কামনার তুলনায় উচ্চতর ক্রিয়াত্মক বৃত্তি, কারণ ইহাতে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর স্পষ্টতর জ্ঞান বা চেতনা থাকে। তাহা ছাড়া আকাঙ্ক্ষা কার্যে পরিণত হইয়া থাকে।

কোনো বস্তুর প্রতি কামনা থাকিলেও আকাঙ্ক্ষা না থাকিতে পারে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্য কামনা করে, কিন্তু পুজা বা শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে খাদ্য আকাঙ্ক্ষা করে না, কারণ এই সকল অনুষ্ঠানে সে হয়ত উপবাস বরণ করিয়া লয়। এই ব্যক্তি ধর্মকার্যকেই আকাঙ্ক্ষার বস্তু মনে করিয়া খাদ্য 'কামনাকে সংযত করিয়া রাখে।

তাহা হইলে **সকল আকাঙ্ক্ষাই কামনা, কিন্তু সকল কামনা আকাঙ্ক্ষা নয়।** সেই কামনাকেই আকাঙ্ক্ষা বলে যাহা কার্যকরী হয়, অথবা কার্যে পরিণত হয়।

মনোবিদ্যায় প্রায়ই কামনা এবং আকাঙ্ক্ষার উল্লিখিত পার্থক্য ধরা হয় না। সকল মনোবিদ্ ইহাদের পার্থক্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিপরীতভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যেমন তাঁহারা মনে করেন যে কামনা এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রথমটিই দ্বিতীয়টির তুলনায় উচ্চতর।

ফ্রয়েড্-এর মত

ফ্রয়েড্ কামনার সহিত আকাঙ্ক্ষার ভেদ গ্রহণ করেন নাই। তিনি এই দুইটিকে সমার্থকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং আকাঙ্ক্ষা (উইস্) কথাটির

প্রতি বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে আকাঙ্ক্ষার বৈপরীত্যই সকল ক্রিয়ার মূলশক্তি। একই আকাঙ্ক্ষা নির্জ্ঞান ও সংজ্ঞান মনে দুই রূপে প্রকাশ পায়। যে আকাঙ্ক্ষাটি সংজ্ঞানে ভালবাসারূপে প্রকাশিত তাহারই অন্তর্নিহিত নির্জ্ঞানরূপ ঘৃণা। তিনি বলেন যে কতগুলি আকাঙ্ক্ষা মানুষের শিক্ষা, সমাজ এবং সংস্কারের বিরোধী। ইহারা অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত হয় এবং সংজ্ঞান মনের সতর্কতা এড়াইয়া বিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে সচেষ্ট থাকে।

৯। ইচ্ছা বা সঙ্কল্প (উইল্)

আবার ইচ্ছা, সঙ্কল্প বা উইল্ আকাঙ্ক্ষা বা উইশ্ অপেক্ষা উচ্চতর ক্রিয়াত্মক বৃত্তি। আকাঙ্ক্ষায় বস্তুর স্পষ্ট জ্ঞান থাকে না। কিন্তু ইচ্ছা যে উদ্দেশ্য-সাধনে সক্রিয় হয় সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজ্ঞান থাকে। যে উদ্দেশ্যটি সাধন করিতে হইবে তাহা কর্তার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের সহিত সুসমঞ্জস কি না সেই জ্ঞান না থাকিলে ঐচ্ছিক ক্রিয়া ঘটে না ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় কর্তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। ঐচ্ছিক ক্রিয়া চরিত্রের নির্দেশক বা প্রকাশক। কর্তার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র যেরূপ তাহার ঐচ্ছিক ক্রিয়াও তদ্রূপ হইয়া থাকে। কর্তা কিরূপ উদ্দেশ্য-সাধনে ইচ্ছুক হইবেন তাহা নির্ভর করে তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের উপর।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার অন্তর্দর্শন লইলে দেখা যায় যে ইহা সেই ক্রিয়া যাহাতে কর্তা পূরণীয় উদ্দেশ্যের ভাল-মন্দ অথবা ন্যায়-অন্যায় বিচার করিয়া, উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় সম্বন্ধে চেতন হইয়া এবং উহার ফলাফলের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সক্রিয় হন।

ঐচ্ছিক ক্রিয়া সহজাত নয়। ইহা কোনো উদ্দীপকের সাক্ষাৎ বা ত্বরিত ফল নয়, কিন্তু কতগুলি মধ্যবর্তী স্তরের সাহায্যে উহার বিলম্বিত ফল। অর্থাৎ উদ্দীপনা ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গেই ঐচ্ছিক ক্রিয়া ঘটে না। উদ্দীপক ও ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মধ্যে কামনা-দ্বন্দ্ব, বিবেচনা, স্বাধীন নির্বাচন প্রভৃতি ব্যাপারগুলি ঘটিবার পর ইহা ঘটে। এই ব্যাপারগুলির উপর ঐচ্ছিক ক্রিয়া নির্ভর করে বলিয়াই উহা উদ্দীপক উপস্থিত হইবারও কিছুকাল পরে ঘটে।

ইচ্ছা অথবা উইল্‌কে সকল মনোবিৎ মৌলিক মানসবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ইঁহাদের মতে ইচ্ছা একটি যৌগিক মানসবৃত্তি। ইচ্ছাকে বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় অনুভূতি বা প্রক্ষোভেরই একটি বিশেষ আকার

বা প্রকার। যেমন হ্বুণ্ড্ মনে করেন যে ইচ্ছা অনুভূতি বা প্রক্ষোভের কালিক সংগঠন মাত্র, যাহাতে সঙ্কল্প বা সমাধানকালে প্রক্ষোভের একটি আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং এই মতে ইচ্ছা বা সঙ্কল্পকে পৃথক মানসবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

১০। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য—উড্ওয়ার্থ্‌এর মত

উড্ওয়ার্থ্ ঐচ্ছিক ক্রিয়ার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, ঐচ্ছিক ক্রিয়া উদ্দেশ্যমুখী বা পার্পাসিভ্। অর্থাৎ ঐচ্ছিক ক্রিয়া কোনো উদ্দেশ্যলাভের জন্য সাধিত হয়। এই উদ্দেশ্য সজ্ঞানভাবে অনুসরণ করাই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ধর্ম।

দ্বিতীয়তঃ, কোনো সজ্ঞান উদ্দেশ্যলাভের জন্য সঠিক উপায় অবলম্বন ঐচ্ছিক ক্রিয়ার আর একটি বৈশিষ্ট্য। উদ্দেশ্যটি উপেয় বা লক্ষ্য এবং নির্দিষ্ট উপায় অবলম্বিত না হইলে উদ্দেশ্য বা উপেয় সাধিত হয় না। ঐচ্ছিক ক্রিয়া নির্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া উদ্দেশ্যলাভের পথে পরিচালিত হয়।

তৃতীয়তঃ, সহজ বা স্বতঃবৃত্ত এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মত ঐচ্ছিক ক্রিয়া নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ নয়। আগুনে হাত লাগিলে হাত সরাইয়া লওয়া হয়। এই প্রতিক্রিয়ায় কোনো বৈচিত্র্য বা নূতনত্ব নাই—ইহা নির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ। কিন্তু ঐচ্ছিক ক্রিয়া অর্জিত এবং বুদ্ধিমূলক ক্রিয়া। নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলে ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় নূতন উপায় অবলম্বিত হয়। ঐচ্ছিক ক্রিয়া নূতন পরিস্থিতির সহিত নূতন সামঞ্জস্য বা উপযোজন স্থাপন করে।

চতুর্থতঃ, ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিস্থিতির সহিত উপযোজনের তীব্রতা নির্ভর করে ঐ পরিস্থিতির উপর। পরিস্থিতি জটিল হইলে, অথবা উদ্দেশ্যসাধনে বাধা উপস্থিত হইলে, ঐচ্ছিক ক্রিয়া তীব্র হইয়া ওঠে এবং বাধা অতিক্রম করিয়া উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হয়।

পঞ্চমতঃ, ঐচ্ছিক ক্রিয়ার উপযোজন যেমন তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে পারে, তেমনই প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইতে পারে। উদ্দেশ্য সাধনে একটি উপযোজন ব্যর্থ হইলে, আর একটি, আবার ঐটি ব্যর্থ হইলে, আর একটি উপযোজন সাধিত হইতে পারে।

অবশ্য কতগুলি অনৈচ্ছিক ক্রিয়াতেও, যেমন সহজ প্রবৃত্তিতেও, উপযোজনের প্রসারণ দেখা যায়। কিন্তু এই উপযোজন সজ্ঞানভাবে প্রসারিত হয় না। পক্ষান্তরে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার উপযোজন সজ্ঞানভাবে প্রসারিত হইয়া থাকে।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

উড্ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস্—সাইকলজি—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
বোরিং, ল্যাংফেল্ড্, ওয়েল্ড্—ফাউণ্ডেশনস্ অফ্ সাইকলজি—তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেণ্টস্ অফ্ সাইকলজি—চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম পরিচ্ছেদ
জি. এফ. ষ্টাউট্—এ ম্যানুয়াল্ অফ্ সাইকলজি—প্রথম খণ্ড—প্রথম, পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ই. বি. টিশ্নার—এ প্রাইমার্ অফ্ সাইকলজি—নবম, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

Exercise

1. Do you regard conation as a fundamental process of mind ? Discuss. (pp. 306-307)
2. Compare conation to feeling and knowing. (pp 307-309)
3. What does conation or will mean ? What are its different forms ? (pp. 309-310)
4. Define voluntary action. Explain it with an example. (pp. 310-311)
5. Give an analysis of voluntary action. Distinguish between the different stages analysed. (pp 311-313)
6. Define motive. Can feeling be the motive of voluntary action ? (pp. 314-316)
7. Distinguish between motive and purpose of voluntary action. (pp. 314-316)
8. How does motive differ from intention ? (pp. 314-317)
9. Explain the nature of desire. How does it differ from wish ? (pp. 317-320)
10. Define will. Explain its relation to character. (pp. 320-321)
11. Explain Woodworth's analysis of voluntary action. (pp. 321-322)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অনৈচ্ছিক ক্রিয়া

১। অনৈচ্ছিক ক্রিয়া কাহাকে বলে? ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত ইহার পার্থক্য

যে ক্রিয়া ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া ঘটে তাহাকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলে। যেমন হাঁচি, কাশি, হাই তোলা, চোখের পাতার স্পন্দন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত-চলাচল, নাড়ির স্পন্দন, যকৃৎ, ফুস্ফুস, হৃদ্‌যন্ত্র প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া, চোখে পোকা ঢুকিবে আশঙ্কায় চোখ বন্ধ করিয়া ফেলা, পাখীর বাসা নির্মাণ, পশুর শিকার-সন্ধান প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া ঘটে। সুতরাং ইহারা অনৈচ্ছিক।

অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায়ও ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মত অভাববোধ থাকে। কিন্তু অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অভাববোধ অস্পষ্ট। ঐ অভাব যে বস্তু লাভ করিলে দূর হইতে পারে উহাতে সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকে না। তাহা ছাড়া, ঐচ্ছিক ক্রিয়াব কর্মে দায়িত্ব, কর্তব্য বা বাধ্যবাধকতাবোধও অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় অনুপস্থিত। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় কর্মের ফলাফল সম্বন্ধেও কোনো স্পষ্ট ধারণা কাজ করে না।

অভ্যাস এবং ইচ্ছাবিরুদ্ধ ক্রিয়া কি অনৈচ্ছিক?

যে সকল ক্রিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটে সেইগুলি অনৈচ্ছিক কি? আবার যে সকল ক্রিয়া প্রথমে ইচ্ছাপুর্বক করা হয়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে অনৈচ্ছিক হইয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ অভ্যাস, অনৈচ্ছিক কি?

ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত ক্রিয়া ঐচ্ছিক। ইহাতে ইচ্ছা-অনিচ্ছামূলক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ইহা অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার মত সোজাসুজিভাবে অভাববোধ হইতেই উৎপন্ন হয় না। ইচ্ছা-বিরুদ্ধ ক্রিয়ায় কামনা-দ্বন্দ্ব থাকে। ইহাতে নির্বাচিত কামনাটি পুর্ণ না হইয়া অবাঞ্ছিত কামনা পুর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু অভ্যাস প্রথমে ঐচ্ছিক এবং অনুশীলনের ফলে অনৈচ্ছিক। ইহা প্রথমে ইচ্ছা করিয়া সম্পন্ন হইলেও ভবিষ্যতে ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়াই অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার মত সম্পন্ন হয় এবং অনৈচ্ছিক বলিয়াই অনুভূত হয়। মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এইরূপ ক্রিয়াকে অনৈচ্ছিক বলাই সঙ্গত।

২। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার গুরুত্ব

মানুষের উপর ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রভাব অসীম। মানুষের বাঁচিয়া থাকা নির্ভর করে কতগুলি অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার উপর। নিশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচলাচল, নাড়ি-প্রবাহ, হজম ক্রিয়া ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, যৌন কামনা প্রভৃতি জৈব ক্রিয়াগুলি অনৈচ্ছিক। এই ক্রিয়াগুলি ব্যাহত হইলে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ভিত্তিমূল ধ্বসিয়া পড়ে।

অনৈচ্ছিক ক্রিয়াই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ভিত্তি

অনৈচ্ছিক ক্রিয়াই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ভিত্তি। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল উৎস অভাববোধজনিত তাড়না। অভাববোধ দূর করিবার অনৈচ্ছিক তাড়না বা বেগ না থাকিলে ঐচ্ছিক ক্রিয়া সম্ভব হয় না। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল মাল-মশলা বা উপাদান সংগৃহীত হয় অনৈচ্ছিক ক্রিয়া হইতে। একটি অনৈচ্ছিক আবেগ বা কামনার সহিত আর একটির সংঘাত উপস্থিত হইলেই ঐচ্ছিক ক্রিয়া সম্পাদনের সুযোগ উপস্থিত হইতে পারে। এইরূপ সংঘাত না থাকিলে কোনো ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার গুরুত্ব কম নয়

কিন্তু উপরোক্ত কারণে কেহ যদি মনে করেন যে অনৈচ্ছিক ক্রিয়াই মনেব ইচ্ছাত্মক দিকটির সমগ্র রূপ তাহা হইলে ভুল হইবে। ইচ্ছাত্মক মানস-বৃত্তির চরম পরিণতি হইল ঐচ্ছিক ক্রিয়া।

৩। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার শ্রেণীভেদ

দেখা গিয়াছে যে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলিতে সেই ক্রিয়া বুঝায় যাহা স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া উহার নিজস্ব নিয়ম অনুসারে সংঘটিত হয়। অনৈচ্ছিক ক্রিয়া অনেক শ্রেণীর হইতে পারে। কিন্তু এইগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত শ্রেণীগুলিই প্রধান।

অনৈচ্ছিক ক্রিয়া প্রধানতঃ স্বতঃক্রিয়, স্বতঃবৃত্ত বা অক্রম গতি বা ক্রিয়া (অটোম্যাটিক, র‍্যাণ্ডম্, স্পন্ট্যানিয়াস্, মুভ্মেণ্ট অর্ অ্যাক্শন্), প্রতিবর্ত গতি বা ক্রিয়া (রিফ্লেক্স মুভ্মেণ্ট্ অর্ অ্যাক্শন্), সহজ প্রবৃত্তি (ইন্স্টিংক্ট্) ভাবগতি ক্রিয়া (ইডিও-মোটর অ্যাক্শন্) এবং অভ্যাস (হ্যাবিট্)।

স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া

স্বতঃক্রিয়, স্বতঃবৃত্ত এবং অক্রম গতি বা ক্রিয়াকে মোটামুটিভাবে সমার্থক বলিয়া ধরা হইলেও, ইহাদের পার্থক্য রহিয়াছে।

স্বতঃক্রিয় গতি

(অটোম্যাটিক অ্যাক্‌শন্) বলিতে বুঝায় কতগুলি দৈহিক জৈব ক্রিয়া। যেমন রক্তচলাচল, শ্বাসপ্রশ্বাস, পরিপাক, নাড়ির গতি, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতির কাজ, দেহমল নিঃসারণের কাজ, এককথায় আভ্যন্তরীণ দৈহিক যন্ত্রগুলির কাজ, স্বতঃক্রিয় গতির উদাহরণ। এই ক্রিয়াগুলি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে দেহযন্ত্রস্থ উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের স্বাভাবিক সম্পাদন ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। রক্তের রাসায়নিক এবং অন্যান্য যান্ত্রিক অবস্থার ফলে রক্তচলাচল, শ্বাসপ্রশ্বাস, পরিপাক প্রভৃতি স্বতঃক্রিয় গতিগুলি সাধিত হয়। ইহারা স্বভাবতঃ অচেতনভাবে কাজ করে এবং কোনো প্রকারে স্বাভাবিক হইলেই চেতন হয়। রক্তের চাপ বাড়িলে বা কমিলে, শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে, বা পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে আমরা এই সকল ক্রিয়া সম্বন্ধে চেতন হইয়া থাকি।

অনেক মনোবিৎ মনে করেন যে স্বতঃক্রিয় গতি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নামান্তর মাত্র। আবার কেহ কেহ এইগুলিকেও অস্পষ্টভাবে উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ স্বতঃক্রিয় গতি হইতে স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়াকে পৃথক বলিয়া নির্দিষ্ট করিতে চাহেন।

অক্রম বা স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া

অক্রম বা স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া (র‍্যাণ্ডম্ অর্ স্পন্ট্যানিয়াস্ মুভ্‌মেণ্ট্) পরিলক্ষিত হয় শিশুর অকারণে বা খেলাচ্ছলে হাত পা ছোঁড়া, হাসি, কান্না প্রভৃতি ক্রিয়ার মধ্য দিয়া। এই জাতীয় ক্রিয়াগুলিও সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক। কিন্তু **উপরোক্ত দুই প্রকার ক্রিয়াকেই সাধারণভাবে স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া বলা হইয়া থাকে।**

স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের উদ্দীপনা হইতে উৎপন্ন হয়। ইহারা মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। হৃদযন্ত্র, ফুস্‌ফুস্, পাকাশয় প্রভৃতির ক্রিয়া নিতান্তই যান্ত্রিক। ইহারা মনের উপর নির্ভর না করিয়া নিজ নিজ নিয়ম অনুসারে সংঘটিত হয়।

স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া মনোবিদ্যার বিষয় কি না

যেহেতু স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া সম্পূর্ণ দৈহিক ক্রিয়ার ফল, সেই কারণে ইহাকে ক্রিয়া না বলিয়া গতি বলাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কিন্তু এইরূপ হইলে স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়াকে মনোবিদ্যার বিষয় মনে না করিয়া শারীরবৃত্তের বিষয়রূপে সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। *টিশ্‌নার* বলেন যে যে গতির সহিত মানসবৃত্তি ঘটে তাহাই ক্রিয়াপদবাচ্য। তাঁহার মতে স্বতঃবৃত্ত গতির সহিত মানসবৃত্তি ঘটিয়া থাকে বলিয়া ইহাও মনোবিদ্যার বিষয়।

ইহারা যান্ত্রিক সংবেদনের দৈহিক কারণ। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের গতি অস্বাভাবিক হইলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মাথাঘোরা প্রভৃতি অসুস্থ সংবেদন অনুভূত হয়। তৃতীয়তঃ, ইহাদের ফলে বেদনা এবং অনুভূতি ঘটে। বুক ধড়ফড় করা, গলা শুকাইয়া যাওয়া, সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়া ওঠা প্রভৃতি স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়াগুলি ভয়ের সহচর। আবার কতগুলি যন্ত্রীয় স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া ক্রোধের সহকারী কারণ।

স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া অন্য দিক দিয়াও মনোবিদ্যায় গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করে। শিশুর প্রাথমিক হাত-পা ছোঁড়া বা সমগ্র-শরীর-সঞ্চালন বিশৃঙ্খল এবং উদ্দেশ্যহীন ক্রিয়া বলিয়া মনে হইতে পারে। একটি টুকটুকে লাল ফুল ধরিতে গিয়া শিশু হাত, পা এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—এলোপাথাড়িভাবে আন্দোলিত করে। সে তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া ফুলটিকে ধরিতে চায়। **এই অসংলগ্ন গতি হইতেই ক্রমে ক্রমে সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল গতি বিকাশ লাভ করে।** আবার এই অসংলগ্ন ও বিশৃঙ্খল স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়াগুলি শিশুর পেশী, স্নায়ু প্রভৃতির শক্তি ও সামর্থ্য বাড়াইয়া তোলে। স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়াই শিশুর **উন্নততর ক্রিয়ার ভিত্তি**। সুতরাং স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া অনৈচ্ছিক হইলেও ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ভূমি প্রস্তুত করে।

স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার উদ্দেশ্য

কোনো কোনো মনোবিৎ মনে করেন যে শিশুর অকারণ হাত পা ছোঁড়া, হাসি, কান্না প্রভৃতি স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক হইলেও অজ্ঞাত উদ্দেশ্যের সাধক। যেমন কেহ কেহ বলেন যে এই সকল গতি বা ক্রিয়ায় শিশুর **অতিরিক্ত শক্তি** (সারপ্লাস্ এনার্জি) ব্যবহৃত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে এই সকল গতির মধ্য দিয়া শিশু সেই সকল নিম্নস্তরীয় প্রাণীর ক্রিয়ার

পুনরাবৃত্তি (রি-ক্যাপিচুলেশন্) করে যে সকল স্তর সে ক্রমবিকাশের নিয়মে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। কাহারও কাহারও বা মতে এই সকল গতির মধ্য দিয়া শিশু ভাবী জীবনের কাজের **প্রস্তুতি** (রিহিয়ার্স্যাল্) লাভ করে।

স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া ও প্রতিবর্ত

উপরের মনোবিদ্যা সংক্রান্ত মতামত যাহাই হউক না কেন, স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার কারণ প্রধানতঃ দৈহিক। দেহযন্ত্রের সঞ্চিত শক্তিই স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার আকারে প্রকাশিত হয়. সুতরাং উহারা প্রতিবর্ত ক্রিয়ারই নামান্তর। স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার উপরোক্ত প্রতিবর্ত-মতবাদ অনেকেই স্বীকার করেন না। ইঁহারা মনে করেন যে স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার মূলে অথবা ইহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে কোনো না কোনো মানস অবস্থা। যাহাকে আমরা সুস্থ রক্তসঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস বা পরিপাক বলি সেই সকল স্বতঃবৃত্ত ক্রিযার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে মানসিক আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ এবং ইহাদের অসুস্থ ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে মানসিক অস্বস্তি বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। কেহ কেহ মনে করেন যে মস্তিষ্কের গতিকেন্দ্রে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়ের ফলে অস্বস্তি বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধই সকল প্রকার স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক লক্ষণ। সুতরাং এই ক্রিয়াকে শুধু দৈহিক না বলিয়া মানসিকও বলিতে হয়।

৪। প্রতিবর্ত ক্রিয়া—রিফ্লেক্স্ অ্যাক্শন্

প্রতিবর্ত ক্রিয়া পূর্বেই[১] সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে এবং পরেও[২] আলোচিত হইবে। **প্রতিবর্ত বাহিরের অথবা ভিতরের উদ্দীপকপ্রসূত এক প্রকার অনৈচ্ছিক ক্রিয়া, যাহাতে উদ্দেশ্যের কোনো চেতনা বা জ্ঞান থাকে না, যাহা সর্বাবস্থায় প্রায় একপ্রকার (য়্যুনিফর্ম), যাহা উদ্দীপক উপস্থিত হওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ ঘটে এবং যাহা সর্বাপেক্ষা সরল বা সহজ প্রতিক্রিয়া।** জানুর কাপালিকে আঘাতের ফলে জানুক্ষেপ (নী-জার্ক্) অথবা আগুনের সহিত হাতের সংস্পর্শ হইলে হাত সরাইয়া লওয়া প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদাহরণ। প্রতিবর্ত ক্রিয়াও আত্মরক্ষা,

---

১ এই গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদের ৭, ৮ এবং ৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২ এই গ্রন্থের উনবিংশ পরিচ্ছেদেব ৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টবা।

বংশবিস্তার প্রভৃতি জৈব উদ্দেশ্য সাধনে অংশ গ্রহণ করে, যদিও ক্রিয়া সম্পাদনকালে ইহাতে উদ্দেশ্যের কোনো চেতনা বা জ্ঞান থাকে না।

ক্রমিক প্রতিবর্ত বা প্রতিবর্ত-শৃঙ্খল[১]

প্রতিবর্ত সহজ ও সরল প্রতিক্রিয়া হইলেও, ইহা জটিল আকার ধারণ করিতে পারে। যেমন একটি উদ্দীপক উহার প্রতিবর্ত ক্রিয়া উৎপন্ন করিল। এই প্রতিবর্ত ক্রিয়াটি অপর একটি প্রতিবর্তের উদ্দীপক হইতে পারে। আবার এই দ্বিতীয় প্রতিবর্তটি হইয়া দাঁড়ায় আর একটি তৃতীয় প্রতিবর্তের উদ্দীপক। এইরূপে **উদ্দীপক→প্রতিক্রিয়া→উদ্দীপক→প্রতিক্রিয়া** ক্রমে একটি ক্রমিক প্রতিবর্ত বা প্রতিবর্ত শৃঙ্খল (চেইন্-রিফ্লেক্স্) উৎপন্ন হইতে পারে। ক্রমিক প্রতিবর্ত (চেইন্-রিফ্লেক্স্) বলিতে বুঝায় কতগুলি প্রতিবর্তের সমষ্টি। এই প্রতিবর্তগুলি এমনভাবে সম্বন্ধ যে প্রত্যেক পূর্ববর্তী প্রতিবর্ত শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী প্রতিবর্তটি ক্রিয়াশীল হয়। **লৌহশৃঙ্খলের একটি আংটির (রিং) সহিত পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী আংটির সম্বন্ধের মত ক্রমিক প্রতিবর্তে একটি প্রতিবর্তের সহিত উহার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী প্রতিবর্তের ক্রমিক বা একটানা সম্বন্ধ থাকে।** ফলে, এই প্রতিবর্ত-শৃঙ্খলের একটি প্রতিবর্ত ঘটিলেই উহার পরবর্তীটি ঘটে।

একটি উদাহরণ সাহায্যে প্রতিবর্ত শৃঙ্খলের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। **থর্নডাইক-এর বিখ্যাত উদাহরণটি** দেওয়া যাউক। পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়াল পিঞ্জরের ঠিক বাহিরে স্থাপিত খাদ্যের নিকট পৌছাইবার বারংবার চেষ্টায় অসংখ্য ভুল ক্রিয়া করিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে তাহার ভুল ক্রিয়াগুলির সংখ্যা কমিয়া আসে এবং ঠিক ক্রিয়াগুলি টিকিয়া বা থাকিয়া যায়, যাহার ফলে পরিণামে সে আর ভুল ক্রিয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করে না, কিন্তু প্রথমেই ঠিক ক্রিয়াগুলি করিয়া দ্রুত এবং অভ্রান্ত ভাবে তাহার লক্ষ্যে পৌছায়। বিড়ালটি পিঞ্জরের শিকগুলি দাঁত দিয়া কামড়াইতে, এবং থাবা দিয়া আঁচড়াইতে থাকে। সে নানাপ্রকার ক্রিয়া করিতে করিতে হঠাৎ পিঞ্জরের ছিট্‌কানিতে আঘাত করে। ফলে উহার দরজা খুলিয়া যায় এবং বিড়াল পিঞ্জরের বাহিরে আসিয়া খাদ্য আহার করে।

---

১ প্রতিবর্ত-শৃঙ্খলের নক্সা এই গ্রন্থের ১৫০ পৃষ্ঠায় খ, গ, ঘ এবং ঙ চিত্রে দেখানো হইয়াছে।

ধরিয়া লওয়া যাউক, বিড়ালটির যে ক্রিয়াগুলি উহাকে খাদ্যে পৌছাইয়া দেয় উহারা ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ। ক ক্রিয়াটির উদ্দীপক হইল খাদ্য দর্শন। ক ক্রিয়া ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা খ ক্রিয়াটির উদ্দীপক এবং খ ক্রিয়াটি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা গ ক্রিয়াটির উদ্দীপক হয়। আবার গ ক্রিয়াটি ঘ ক্রিয়ার এবং ঘ ক্রিয়াটি ঙ ক্রিয়ার উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। এইরূপে ক্রমিক প্রতিবর্তের অঙ্গীভূত প্রতিবর্তগুলি এমন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় যে উহাদের পুর্ববর্তীটি ঘটিলেই পরবর্তীটি ঘটে। বিড়াল যে সকল ক্রিয়ার সাহায্যে খাদ্যে পৌছায় উহারা প্রতিবর্ত-পরম্পরা হিসাবে গ্রথিত। ইহাদের প্রথমটি ঘটিলে দ্বিতীয়টি, আবার দ্বিতীয়টি ঘটিলে তৃতীয়টি, এইরূপ ক্রমিক ধারায় শেষ প্রতিবর্তটি ঘটিয়া উহাদের ধারাবাহিকতা শেষ করে।

প্রতিবর্ত সরল ও সহজ ক্রিয়া হইলেও অন্যান্য প্রতিবর্তের সহিত উপরোক্ত ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া জটিল আকার ধারণ করে। **অনুষঙ্গই (অ্যাসোসিয়েশন্) প্রতিবর্তের এই ক্রমিকতা বা ধারাবাহিকতার কারণ।** একটি প্রতিবর্তের পরেই আর একটি প্রতিবর্ত পুনঃ পুনঃ ঘটিলে এই দুইটি প্রতিবর্তের সহিত অনুষঙ্গ-সূত্র গঠিত হয়। ফলে প্রথম প্রতিবর্তটি ঘটিলেই দ্বিতীয়টি ঘটে। শারীরবৃত্তের ভাষায় বলা যায় যে এই দুইটি প্রতিবর্ত-চক্রের (রিফ্লেক্স্ আর্ক)[১] সহিত অনুষঙ্গ স্থাপিত হওয়ার ফলে প্রথম প্রতিবর্ত-চক্রের ক্রিয়া শেষ হইলেই দ্বিতীয় প্রতিবর্ত-চক্র ক্রিয়াশীল হয়। এইরূপে ক্রমিক প্রতিবর্ত-চক্রানুযায়ী একটি ক্রমিক নার্ভপথের ধারা বা ক্রম গড়িয়া ওঠে। পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়ালের যে ক্রিয়াগুলি উহাকে পিঞ্জরের ছিট্‌কানি খুলিয়া বাহিরে আসিতে এবং খাদ্য সংগ্রহ করিতে সাহায্য করে সেই ক্রিয়াগুলির পৌর্বাপর্য অনুসারে উহাদের মধ্যে অনুষঙ্গ গঠিত হয়। ফলে প্রথম ক্রিয়া ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার পরবর্তী দ্বিতীয় ক্রিয়াটি ঘটে, আবার দ্বিতীয়টি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার পরবর্তী তৃতীয় ক্রিয়াটি ঘটিয়া থাকে।

ক্রমিক প্রতিবর্ত ও ইনস্টিংক্‌ট্

অনেক মনোবিদ্, যেমন স্পেন্সর্, থর্নডাইক্, ওয়াটসন্ প্রভৃতি ক্রমিক প্রতিবর্তকে উচ্চতর মানসবৃত্তির ভিত্তি বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে

১ এই গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদ, নবম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সহজ প্রবৃত্তি (ইনস্টিংক্ট্) হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষা, স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি সকল উচ্চতর মানসবৃত্তি ক্রমিক প্রতিবর্তের সাহায্যে ঘটে। কিন্তু এইরূপ মতবাদ মনকে একটি যন্ত্রে পর্যবসিত করে। অথচ কোনো জ্ঞাত বা অজ্ঞাত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করা মনের বিশেষ ধর্ম। ইচ্ছা বা সঙ্কল্প প্রভৃতি ক্রিয়ায় অনেক বিকল্প সম্ভাবনা থাকিলেও, মন অন্য সম্ভাবনাগুলিকে বাতিল করিয়া একটিকে নির্বাচন করে। সঙ্কল্পের এই উদ্দেশ্যাভিমুখী স্বভাব যান্ত্রিক মতবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রতিবর্তের ধর্মই হইল এই যে ইহা একই উদ্দীপকের প্রভাবে একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রতিবর্তে বৈচিত্র্য নাই এবং স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ নাই। অথচ বৈচিত্র্য এবং স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ইচ্ছা বা সঙ্কল্পমূলক ক্রিয়ার প্রধান লক্ষণ।

স্নুতরাং ক্রমিক প্রতিবর্ত সাহায্যে নিম্ন এবং উচ্চনির্বিশেষে সকল মানস-বৃত্তির ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

ক্রমিক প্রতিবর্ত ও সহজ প্রবৃত্তির সম্বন্ধ উনবিংশ পরিচ্ছেদে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সহজ প্রবৃত্তি—ইনস্টিংক্ট্

সহজ প্রবৃত্তি (ইন্‌স্টিংক্ট্) আর একটি প্রধান অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। ইহা পরবর্তী পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হইবে।

৫। ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া—ইডিও-মোটর অ্যাক্‌শন্

যে ক্রিয়া উহার ভাব বা চিন্তা হইতেই স্বতঃবৃত্তভাবে উৎপন্ন হয় তাহাকে ভাবগতীয় বা ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া বলে।

একটি পোকা বা ধূলাবালি চোখে ঢুকিবার উপক্রম হইলেই চোখের পাতা আপনা আপনি বুজিয়া যায়। কেহ পড়িয়া যাইবে এইরূপ আশঙ্কা করিতে করিতে হয়ত বাস্তবিকই পড়িয়া যায়। কেহ হয়ত কাহাকেও আঘাত করিবে ভাবিতে ভাবিতে সত্যই আঘাত করিয়া বসে। খেলা দেখিতে গিয়া প্রিয় খেলোয়াড় কিভাবে বলটি মারিবে তদ্গতভাবে চিন্তা করিতে করিতে দর্শক হয়ত বলটি মারিবার ভঙ্গীতে পাশের লোকটিকে প্রচণ্ড লাথি মারিয়া বসিল। ধূমপায়ী ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট হইতে দিয়াশলাই লইয়া ফেরৎ না দিয়া নিজ পকেটে পুরিল।

অন্যান্য অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত পার্থক্য

এই অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত অন্যান্য অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার পার্থক্য সুস্পষ্ট। অন্যান্য অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার কারণ সংবেদন বা প্রত্যক্ষ। যেমন শিশু একটি টুক্‌টুকে লাল ফুল দেখিয়াই উহা ধরিতে চায়, অথবা যান্ত্রিক শুষ্কতা ঘটিলেই জলতৃষ্ণা অনুভূত হয়। এই জাতীয় অনৈচ্ছিক ক্রিয়া সংবেদ-চেষ্টীয় (সেন্সরি-মোটর)। ইহাদের গতি বা ক্রিয়া ঘটে সংবেদন হইতে। কিন্তু গতিভাবজ বা ভাববেষ্টীয় ক্রিয়া সংবেদন বা প্রত্যক্ষ হইতে না ঘটিয়া ঘটে কোনো ভাব বা চিন্তা হইতে।

ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া এবং অনুকরণ বা ইমিটেশন্

সংবেদ-চেষ্টীয় ক্রিয়া উৎপন্ন হয় স্থূল উদ্দীপক হইতে। পক্ষান্তরে ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া উৎপন্ন হয় ভাব বা চিন্তারূপ সূক্ষ্ম উদ্দীপক হইতে। এই দুই প্রকার চরম ক্রিয়ার মধ্যবর্তী অন্যপ্রকারের ক্রিয়াও হইতে পারে। অজ্ঞাত বা অচেতন অনুকরণ (ইমিটেশন্) এই জাতীয় মধ্যবর্তী ক্রিয়া। একাগ্রচিত্তে কাহাকেও কাজ করিতে দেখিয়া হয়ত দ্রষ্টা তাহার অজ্ঞাতসারে অথবা অনিচ্ছায় সেই কাজটি অথবা উহার কোনো অংশ স্বতঃবৃত্তভাবে করিয়া ফেলে।

ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া এবং সংবেদ-চেষ্টীয় ক্রিয়া

স্থূল উদ্দীপকপ্রসূত সংবেদ-চেষ্টীয় ক্রিয়া এবং সূক্ষ্ম ভাব বা ধারণাপ্রসূত ভাবজ ক্রিয়ার মধ্যে কোনো বিরুদ্ধতা নাই, কারণ উহাদের মধ্যবর্তী ক্রিয়াও আছে। সুতরাং ভাবচেষ্টীয় ক্রিযাকে সংবেদ-চেষ্টীয় ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিবার কারণ নাই এবং ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার মধ্যে কোনো রহস্যও নাই।

সংবেদ-চেষ্টীয় এবং ভাবজ ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ পৃথক করিবার মূলে রহিয়াছে চিন্তন ক্রিয়া (থিংকিং) সম্বন্ধে প্রাচীন বিশ্লেষণীয় মনোবিদ্যার পক্ষপাতিত্ব। এই মতে ভাব বা ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক মানসসত্তা। কিন্তু এই প্রাচীন মত ভ্রান্ত। মন একটি সমগ্র বা গোটা বস্তু। ভাব বা ধারণাকে সমগ্র সত্তা মনে করিয়া মন হইতে বিচ্ছিন্ন করা অসঙ্গত। আসলে কোনো নিছক ভাব বা ধারণাই সম্ভব নয়। প্রত্যেক ভাব বা ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে কথা বলা চলিতে থাকে এবং এই মানস বা স্বগত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভাষা বলিতে

বাগ্‌যন্ত্রের যে সকল ক্রিয়া আবশ্যক উহাদের সূক্ষ্ম কম্পন বা গতি উৎপন্ন হয়। যেমন 'বল' কথাটি চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠের কম্পন অনুভূত হয়।

অতএব গতি বা ক্রিয়ার প্রত্যেক ভাব বা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব গতি বা ক্রিয়ার, অথবা উহার জন্য যে পেশীক্রিয়া প্রয়োজন তাহার সূত্রপাত বা সূচনা ঘটে। গতি বা ক্রিয়ার চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে উহার অনুভব (ফীল্) অর্থাৎ উহার সূচনা বা সূত্রপাত হয় এবং ক্রিয়াটি প্রকাশ পায়। কাজেই শুধু ভাব বা ধারণা হইতেই ক্রিয়া ঘটে এইরূপ মনে করিবার কেনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

সকল ক্রিয়াই কি ভাবচেষ্টীয় ?

সকল ক্রিয়াই যে পুর্ব অভিজ্ঞতা-প্রসূত ভাব বা ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং এই দিক দিয়া বিচার করিলে সকল ক্রিয়াকেই ভাবচেষ্টীয় বলা যায় কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়।

কিন্তু সকল ক্রিয়াকে পুরাপুরিভাবে ভাবচেষ্টীয় বলা যায় না, কারণ ভাব কার্যে পরিণত হইবার আগেই অন্যান্য বিপরীত ভাব মনে উদিত হয় এবং কি করিতে হইবে তাহা স্থির না হওয়া পর্যন্ত ক্রিয়া স্থগিত থাকে। যদি কোনো উপায়ে বিরুদ্ধ ভাবগুলি নিবারণ করা যায় অথবা উহারা মনে উদিত হইবার পুর্বেই কার্য উৎপন্ন হয় তাহা হইলে ভাব ঘটিবামাত্র ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

আসলে ভাবচেষ্টীয় এবং সংবেদচেষ্টীয় ক্রিয়ার পার্থক্য নাই

মোটের উপর বলিতে হয় যে যাহাকে আমরা ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া বলি তাহার সহিত সংবেদন বা প্রত্যক্ষ জড়িত থাকে। ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ায় ইহার সংবেদন বা প্রত্যক্ষ অংশ পৃথকভাবে জ্ঞাত হয় না। কাজেই মনে হইতে পারে যে ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ায় ভাব বা ধারণা সংবেদন বা প্রত্যক্ষের সাহায্য না লইয়াই ক্রিয়া উৎপন্ন করিতেছে। আসলে সংবেদচেষ্টীয় এবং ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার মধ্যে কোনো ভেদ নাই। টিশ্‌নার্[১] এই দুইটিকে সমার্থকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

১ ই. বি. টিশ্‌নার—প্রাইমার অফ্ সাইকলজি—পৃঃ ১৭১

জেম্‌স্‌-প্রদত্ত উদাহরণ

ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার উদাহরণ দিতে গিয়া অধ্যাপক উইলিয়ম্‌ জেম্‌স্‌ বলিয়াছেন, "কথা বলিতে বলিতে মেজের উপর একটি আল্‌পিনে অথবা আমার আস্তিনের উপর ধূলায় নজর পড়িল। কথা চালাইতে চালাইতেই আল্‌পিনটি তুলিয়া লইলাম, অথবা ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিলাম। ইহাতে কোনো স্পষ্ট সঙ্কল্পের দরকার হইল না, কিন্তু বস্তুর প্রত্যক্ষ এবং ক্রিয়ার একটি চকিত ভাবই যেন সোজাসুজিভাবে ক্রিয়া উৎপন্ন করিল।

"আমি ভোজনের পর টেবিলে বসিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে বাদাম অথবা আঙুর তুলিয়া মুখে পূরিতেছি। ভোজন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং কথার ঝোঁকে আমি কি করিতেছি তাহাতে খেয়াল নাই কিন্তু ফলের (বিষয়ে) প্রত্যক্ষ এবং আমি উহা খাইতে পারি (ক্রিয়ার ফল) এই আচম্‌কা ভাবটি অবশ্যম্ভাবিরূপে ঐ ক্রিয়া ঘটাইল বলিয়া মনে হয়।

"যখনই ক্রিয়া কোনো ইতস্ততঃ না করিয়া সোজাসুজিভাবে উহার ভাবকে অনুসরণ করে, তখনই আমরা ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া পাই।"[১]

মেলোন্‌ এবং ড্রামণ্ড্‌ বলিয়াছেন, "হয়ত পড়ায় মগ্ন হইয়া আছি। আমার হাত হঠাৎ পাতার উপর দিয়া ঘষিয়া গেল। তখন দেখি যে সেখানে একটি মাছি বসিয়াছিল। ঘটনার ক্রম আমার এইরূপই মনে হয়। কিন্তু চিন্তা করিলে মনে হয় মাছিটির প্রত্যক্ষের ফলেই এই ক্রিয়াটি ঘটিয়া থাকিবে।"[২]

ভাব বা ভাবনার শক্তি

ভাব বা ভাবনার এমনই শক্তি যে কখনও কখনও আমাদের স্বার্থের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও ইহা কার্যে পরিণত হয়। যেমন আত্মহত্যার ইচ্ছা না থাকিলেও মানুষ গিরিশৃঙ্গের অত্যুচ্চ স্থান হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মরিয়াছে। ঐ স্থান হইতে লাফাইয়া পড়িবার ধারণা বা ভাব তাহাদের এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে এই চিন্তা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা কার্যে পরিণত হইয়াছে।

১ ডবল্যু জেম্‌স্‌—প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্‌ অফ্‌ সাইকলজি—২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২২

২ মেলোন্‌ অ্যাণ্ড্‌ ড্রামণ্ড্‌—এলিমেণ্ট্‌স্‌ অফ্‌ সাইকলজি—পৃঃ ১০৪

বদ্ধভাব

এইরূপ বদ্ধভাব (ফিক্সড্ আইডিয়া) স্বভাবী ব্যক্তির মধ্যেও দেখা যায়। অস্বভাবী ব্যক্তিকে তাহার বদ্ধভাব হয়ত এমন পাইয়া বসে যে ঐ ভাব অনুযায়ী কাজ করা ছাড়া তাহার গত্যন্তর থাকে না। আবার অভিভাব (সাজেশন্) ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার একটি বিশেষ শক্তিশালী উৎস। ইহার প্রভাবে বিরুদ্ধ ভাবগুলি মনে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ায়ও বিরুদ্ধভাব নিবারিত থাকে।

স্বাভিভাব—অটো-সাজেশন

ভাববেষ্টীয় ক্রিয়া স্বাভিভাবের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। কুই স্বাভিভাবের (অটো-সাজেশন) যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহার একটি এই। হাত মুঠ করিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত যদি কেহ বারংবার বলিতে থাকে, "আমি হাতের মুঠ খুলিতে পারি না",তাহা হইলে যতক্ষণ সে এইরূপ বলিতে থাকে, ততক্ষণ সে বাস্তবিকই হাতের মুঠ খুলিতে পারে না। এমন কি এই অসামর্থ্য-প্রকাশ বন্ধ হইবার পরও দেখা যায় যে সে অনেকক্ষণ হাতের মুঠ খুলিতে পারিতেছে না।

উপসংহার

উপরে ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার আলোচনা করা হইল। সংক্ষেপে ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে গিয়া অধ্যাপক উইলিয়ম জেম্‌স্ বলিয়াছেন, **"যখনই গতির মানসভাব হইতে তৎক্ষণাৎ এবং বিনা দ্বিধায় গতি অনুসরণ করে, তখনই আমাদের ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া হইয়াছে বলা যায়।"**[1] এম্. কলিন্‌স্ এবং জে. ড্রিভার্ বলেন, **"কোনো ক্রিয়ায় ধারণা তৎক্ষণাৎ ক্রিয়ায় পরিণত হইলে এই ক্রিয়াকে ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া বলা যায়।"**[2]

৬। ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া এবং মনোযোগ

মনোযোগ ক্রিয়া বা চেষ্টাকে প্রভাবিত করে। কোনো ক্রিয়া করিবার সামর্থ্য থাকিলে আর যাহা প্রয়োজন তাহা হইল ঐ ক্রিয়া এবং উহার উদ্দেশ্য

১ ডবল্যু জেম্‌স্—প্রিন্সিপল্‌স্ অফ্ সাইকলজি—২য় খণ্ড—পৃঃ ৫২২

২ এম্. কলিন্‌স্ অ্যাণ্ড্ জে. ড্রিভার—এক্সপেরিমেণ্টাল্ সাইকলজি—পৃঃ ১৭৮

সম্বন্ধে ঐকান্তিক চিন্তা। যে কাজ করিতে হইবে তাহার ভাবনায় চিত্ত একাগ্র হইলেই কাজটি করা যায়। জেম্‌স্ বলিয়াছেন, "তোমার আঙুল সোজা রাখিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা কর যেন তুমি তোমার আঙুল বাঁকাইতেছ। এক মিনিটের মধ্যেই আঙুলটি কল্পিত স্থান পরিবর্তনের ভাবে সুড়সুড় করিবে; অবশ্য তখনও ইহা বাস্তবিকই নড়িবে না, কারণ ইহা যে বাস্তবিকই নড়িতেছে না এই ভাবও তোমার মনে রহিয়াছে। এই ভাবটি দূর কর। শুধু সকল বাধা সরাইয়া এই গতির সহজ কথাটিই ভাব: ব্যস্! বিনা চেষ্টায়ই এই গতি ঘটিল।"[১]

স্টাউট্ ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় **থট্-রিডিং** অথবা ভাব-উদ্ধার-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভাব-উদ্ধার এক শ্রেণীর ভাব-চেষ্টীয় ক্রিয়া। কোনো ব্যক্তি হয়ত একটি ছোট জিনিস লুকাইয়া রাখিয়াছে। ঐ জিনিসটি এবং গুপ্ত স্থানটির উপর যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ করিলে অনৈচ্ছিকভাবে এবং অজ্ঞাতসারে তাহার মৃদু বিচলন ঘটে। এই বিচলন দেখিয়া অন্য লোক বুঝিতে পারে লুক্কায়িত জিনিসটি কোথায় খুঁজিতে হইবে। স্টাউট্ অভিভাব এবং সংবেশনের (হিপ্‌নোটিজ্‌ম্) কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।[২]

৭। অভ্যাস—(হ্যাবিট্)

যে ক্রিয়া প্রথমে ঐচ্ছিকভাবে করিবার ফলে অনৈচ্ছিক হইয়া দাঁড়ায় তাহাকে অভ্যাস বলে। অভ্যাস আপাতদৃষ্টিতে এক প্রকার স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া। কিন্তু অভ্যাস আসলে স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া নয়। ইহা মুখ্যভাবে (প্রাইমারিলি) ঐচ্ছিক এবং গৌণভাবে (সেকেণ্ডারিলি) অনৈচ্ছিক। অভ্যাস এক দিক দিয়া ঐচ্ছিক এবং আর এক দিক দিয়া অনৈচ্ছিক ক্রিয়া।

উদাহরণ

অভ্যাস ইচ্ছামূলক শিক্ষার ফল। ইচ্ছাপূর্বক পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে ইহা স্বাভাবিক, সহজ অথবা স্বতঃবৃত্ত হইয়া দাঁড়ায়। প্রথম অনুশীলনের কালে যে ক্রিয়া ঐচ্ছিক ছিল পুনরাবৃত্তির ফলে তাহাই অনৈচ্ছিকভাবে সম্পন্ন হয়।

---

১ ডবল্যু জেম্‌স্—প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অফ্ সাইকলজি—পৃঃ ৫২৭

২ জি. এফ্. স্টাউট্—ম্যানুয়াল্ অফ্ সাইকলজি—পৃঃ ২১৫-২১৭

যেমন মদ্যপায়ী প্রথমে ইচ্ছাপুর্বক মদ্যপান আরম্ভ করে। প্রথমাবস্থায় এই ক্রিয়াটি মুখ্য অথবা প্রধানভাবে ঐচ্ছিক থাকে এবং পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে পরবর্তী অবস্থায় উহা গৌণ বা অপ্রধানভাবে অনৈচ্ছিক (প্রাইমারিলি ভলাণ্টারি বাট্ সেকেণ্ডারিলি অটোম্যাটিক্ অ্যাকৃশন) হইয়া দাঁড়ায়।

যে ব্যক্তির সূর্যোদয়ের পুর্বেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় সে ভোরে উঠিবার অভ্যাস করিয়াছে। প্রথম অবস্থায় সূর্যোদয়ের পুর্বে উঠিবার জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ অনুশীলন অথবা ইচ্ছা করিয়া করিবার ফলে পরবর্তী অবস্থায় প্রাতরুত্থান অনৈচ্ছিক ক্রিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আবার কেহ হয়ত "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" ইত্যাদি কবিতাটি অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছে। প্রথমে তাহাকে এই কবিতাটি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে হইয়াছিল, অর্থাৎ তখন এই অভ্যাস ছিল একটি ঐচ্ছিক ক্রিয়া। কিন্তু পরে ঐ ব্যক্তি অনায়াসে বা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ না করিয়াই কবিতাটি মুখস্থ বলিতে পারে, অর্থাৎ তাহার ক্রিয়াটি অনৈচ্ছিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে অথবা অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে।

এইরূপে দেখানো যাইতে পারে যে সহজাত ক্রিয়াগুলি বাদ দিলে পরবর্তী জীবনের বহু ক্রিয়াই অভ্যাসজনিত। শিশুর বসিতে, দাঁড়াইতে, হাঁটিতে, দৌড়াইতে, খেলিতে, লিখিতে, পড়িতে, উচ্চতর চিন্তা করিতে শেখার মূলে রহিয়াছে অভ্যাস-গঠন।

৮। অভ্যাস-গঠনের প্রয়োজনীয়তা

অভ্যাস-গঠন শিক্ষার ফলে ঘটিয়া থাকে। অধ্যাপক জেম্‌স্ অভ্যাস-গঠনের উপকারিতা দেখাইয়াছেন।

(১) অভ্যাস-গঠনের ফলে ক্রিয়া সহজ এবং কম পরিশ্রমসাধ্য হয়। জেম্‌স্ বলেন, "যদি কয়েকবার করিবার ফলে কোনো কাজ সহজতর না হইত তাহা হইলে সমগ্র কর্মজীবন একটি দুইটি ক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইত এবং বিকাশ-লাভে কোনো উন্নতি ঘটিত না।"

(২) অভ্যাস-গঠনের ফলে বিনা মনোযোগেই কাজ করা যায়। পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে ভুল ক্রিয়াগুলি ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া যায় ঠিক ক্রিয়াগুলির মধ্যে অনুষঙ্গ গঠিত হয় এবং উহারা অভ্যাসে পরিণত হয়। অভ্যাস গঠনের ফলে এই ক্রিয়াগুলি বিনা মনোযোগে এবং স্বতঃবৃত্তভাবে সম্পন্ন হইতে পারে।

(৩) স্থতরাং অভ্যাস-গঠনের ফলে নিম্নস্তর কাজগুলি করিবার জন্য মনোযোগ আবদ্ধ না থাকায় উচ্চতর ক্রিয়ায় মনোযোগের অভাব হয় না। ফলে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, নীতি, সৌন্দর্য প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শগুলির অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হয়।[১]

৯। অভ্যাস-গঠনের নিয়ম

অধ্যাপক উইলিয়ম্ জেম্‌স্ ইচ্ছাকৃতভাবে অভ্যাস-গঠনের উদ্দেশ্যে চারটি নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন।

(১) নূতন অভ্যাস গঠন করিতে হইলে যতদূর সম্ভব প্রবল উদ্যম বা প্ররোচনা (ইনিশিয়েটিভ্) লইয়া সচেষ্ট হইতে হয়। সত্য সঙ্কল্প বা প্রেরণা যাহাতে অটুট থাকে বা বর্ধিত হয় সেই জন্য অনুকূল অবস্থাব সৃষ্টি আবশ্যক।

(২) নূতন অভ্যাস গঠিত বা দৃঢমূল না হওয়া পর্যন্ত কোনো প্রকাব আলস্য বা অব্যাহতিকে প্রশ্রয় দিলে চলিবে না, অর্থাৎ আজ থাক, কাল দেখা যাইবে, এইরূপ গয়ং গচ্ছ ভাব বর্জন করিতে হইবে।

(৩) অভ্যাসটির অনুশীলনের যে কোনো স্থযোগ লইতে হইবে। অভ্যাস অনুশীলনের কোনো স্থযোগই হেলায় হারাইলে চলিবে না।

(৪) চেষ্টা করিবার ইচ্ছাকে সজাগ রাখিতে হইবে। অকাবণে হইলেও, প্রত্যহ অভ্যাসেব অনুশীলন বা চেষ্টা কবিয়া যাইতে হইবে। জেম্‌স্ বলেন যে অভ্যাস অটুট রাখিতে হইলে নিষ্প্রয়োজন ছোটোখাটো বিষয়গুলি সম্বন্ধেও নিয়মিতভাবে সচেষ্ট থাকা দরকার। অভ্যাস-গঠনেব অনুকূল নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়কেও উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না[২]।

১০। অভ্যাস-গঠনের দৈহিক ভিত্তি

অভ্যাস-গঠনের দৈহিক দিক হইল নার্ভতন্ত্রের মধ্যে কতগুলি নার্ভের অনুষঙ্গ সৃষ্টি করিয়া একটি নার্ভ-পথ (নার্ভাস্ পাথ্) গঠন। একটি কাজ পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের মানসিক ক্রিয়ার সহিত ঐ কাজ করিতে গিয়া যে সকল নার্ভ সক্রিয় হয় উহাদেরও অনুশীলন ঘটে। ফলে মানসিক অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে নার্ভগুলিরও একটি অভ্যাস (নার্ভাস্ হ্যাবিট্) গঠিত হইয়া ওঠে। নার্ভাস্

১ ডবল্যু জেম্‌স্—প্রিন্সিপল্‌স্ অফ্ সাইকলজি—প্রথম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ
২ " " " " " " "

হ্যাবিট্ গঠিত হইলে একটি নার্ভ সক্রিয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার সহিত অনুষক্ত নার্ভগুলিও পর পর সক্রিয় হয়। এইরূপে মনোযোগ বা চেষ্টা ছাড়াই অভ্যাসমূলক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে।

অভ্যাস-গঠনের দৈহিক ভিত্তি এই যে উদ্দীপনার ফলে কোনো নার্ভ-প্রবাহ নার্ভতন্ত্রের কোনো পথ দিয়া প্রবাহিত হইলে উহাতে একটি ট্রেস্ বা 'রেখা' রাখিয়া যায়, যাহার ফলে ভবিষ্যতে ঐ নার্ভ-প্রবাহের পক্ষে ঐ নার্ভ-পথে প্রবাহিত হওয়া সহজতর হয়। এই ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির কারণে রেখাটি গভীর হয়। ফলে (১) কোনো উদ্দীপক ঐ পথের একটি অংশকে উদ্দীপিত করিলে অবশিষ্ট অংশগুলি উদ্দীপিত না হইয়া পারে না; (২) ভবিষ্যতে এই উদ্দীপন সৃষ্টির জন্য প্রাথমিক উদ্দীপক এবং উহার জন্য প্রয়োজনীয় মনোযোগও অত্যন্ত কম হইলে চলে।

অভ্যাসের মস্তিষ্ক-স্তর

মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার কেন্দ্র অবস্থিত। সহজাত ক্রিয়া মস্তিষ্কের গভীরতম স্তরে অধিষ্ঠিত এবং শৈশবের প্রাথমিক শিক্ষার ফলে অর্জিত প্রবণতাগুলিও (টেন্‌ডেন্‌সিস্) এই মস্তিষ্ক স্তরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে সকল অভ্যাস পরিণত বয়সে অর্জিত হয় সেইগুলির কেন্দ্র মস্তিষ্কের অপেক্ষাকৃত কম গভীর স্তরে অবস্থিত। মস্তিষ্কের সর্বাপেক্ষা কম গভীর স্তরে অবস্থিত হইল সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফলে গঠিত অভ্যাসগুলি। এই অভিজ্ঞতার স্মৃতি ক্ষীণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শেষোক্ত অভ্যাসগুলি লোপ পায়।

১১। সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস

আপাতদৃষ্টিতে অভ্যাস ও সহজ প্রবৃত্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ উভয় প্রকারের ক্রিয়াই স্বতঃবৃত্তভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু আসলে সহজ প্রবৃত্তি এবং অভ্যাস একজাতীয় স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া নয়।

সাদৃশ্য

সহজ প্রবৃত্তি এবং অভ্যাসের সাদৃশ্য এই যে উহারা উভয়েই জটিল ক্রিয়া, অর্থাৎ উহারা উভয়েই অনেকগুলি ক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন হইবার ফলে কোনো উদ্দেশ্য সাধন করে।

পার্থক্য

সহজ প্রবৃত্তি সহজাত বা জন্মগতভাবে স্বতঃবৃত্ত। কিন্তু অভ্যাস প্রাথমিক-ভাবে বা মুখ্যভাবে ঐচ্ছিক। পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলেই অভ্যাস স্বতঃবৃত্ত হইয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ অভ্যাস গৌণভাবে স্বতঃবৃত্ত। অথবা অভ্যাস প্রথমে ইচ্ছামূলক এবং পরে অনৈচ্ছিক, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি আদ্যোপান্ত অনৈচ্ছিক।

সহজ প্রবৃত্তির উপর অভ্যাসের প্রভাব একটি বিচার্য বিষয়। সহজ প্রবৃত্তি এবং অভ্যাসের সম্বন্ধ বিষয়ে জেম্‌স্ দুইটি নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন। (১) অভ্যাসের ফলে সহজ প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ (ইন্‌হিবিটেড্) হয়, অর্থাৎ উহার প্রকাশ সঙ্কুচিত (রেষ্ট্রিক্‌টেড্) হয়।

(২) সহজ প্রবৃত্তির অস্থায়িতাও অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।[১]

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ সহজ প্রবৃত্তির উপর অভ্যাসের প্রাধান্য অস্বীকার করেন। তাঁহার মতে সহজ প্রবৃত্তি অভ্যাস অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী, সুতরাং প্রথমটি দ্বিতীয়টির দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে না।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেণ্টস্ অফ্ সাইকলজি—পঞ্চম, সপ্তম পরিচ্ছেদ

জি. এফ্. ষ্টাউট্—এ ম্যানুয়্যাল্ অফ্ সাইকলজি—১ম খণ্ড, পঞ্চম ,,

২য় খণ্ড, ১ম ,,

এম্. কলিনস্ অ্যাণ্ড্ জে. ড্রিভার্—এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকলজি—৮ম, ১০ম ,,

ই. বি. টিশ্‌নার—এ প্রাইমার অফ্ সাইকলজি—নবম ,,

ডবল্যু. জেম্‌স্—প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্ অফ্ সাইকলজি—১ম খণ্ড, ৪র্থ ,,

২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২২-৫২৭

Exercise

1. Define nonvoluntary activity. Compare it to voluntary activity. (p. 323)
2. What is the importance of non-voluntary activity ? Is it more important than voluntary action ? (p. 324)
3. State the main types of non-voluntary action. (pp. 324-327)
4. Define automatic action. Is it a fit subject for psychological study ? (pp. 325-326)

---

১ ডবল্যু. জেম্‌স্—প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্ অফ্ সাইকলজি—১ম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ

5. What are the causes of automatic action ? Bring out the importance of such action. (pp. 325-326)
6. Distinguish between simple reflex and chain-reflex action. (pp. 327-329)
7. Bring out the difference between chain-reflex and instinctive action. (pp. 329-330)
8. Define ideo-motor action. Distinguish between ideo-motor and sensori-motor action. (pp. 330-332)
9. Can all action be regarded as ideo-motor ? Discuss. (pp. 332-333)
10. Explain James' theory of ideo-motor action with examples. (pp. 333-335)
11. How would you relate suggestion, auto—suggestion, hypnosis and thought-reading to ideo-motor action ? (pp. 333-334)
12. Define habit and distinguish it from voluntary action. (pp. 335-336)
13. What are the uses of forming habits ? (pp. 336-337)
14. State the rules of habit-formations. (p. 337)
15. Explain the physiological basis of habit. (pp. 337-338)
16. Briefly explain the relation of habit to instinct (pp. 338-339)

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

সহজ প্রবৃত্তি—ইন্‌স্টিংক্‌ট্‌

১। ভূমিকা—'সহজ প্রবৃত্তি' কথাটির অর্থ

সহজ প্রবৃত্তি একটি প্রধান অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। ইহার মূল অর্থ নিম্নতর প্রাণীর অন্ধ আবেগ। ইহা সাধারণভাবে স্বাভাবিক এবং সহজাত আবেগ বুঝায়। সহজ প্রবৃত্তি আচরণ বা চেষ্টিত নয় কিন্তু উহার মূলগত সহজ আবেগ। আধুনিক মনোবিদ্যায় সহজ প্রবৃত্তি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, (১) নিম্নতর প্রাণীর অন্ধ আবেগ, (২) শিক্ষালব্ধ নয় এমন জটিল প্রতিযোজক প্রতিক্রিয়া এবং (৩) বিশেষ প্রক্ষোভের উত্তেজনাযুক্ত সহজাত আবেগ।

সকল সহজ প্রবৃত্তিই সহজাত বা জন্মগত। ইহাদের মধ্যে কতগুলি **জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পরিণত** অবস্থায় থাকে। যেমন মুরগীর বাচ্চা জন্মগ্রহণ করিয়াই এক প্রকার ক্ষুদ্র বস্তু ঠোক্‌রাইতে পারে, অথবা হাঁসের বাচ্চা ডিম হইতে বাহির হইয়াই জলে সাঁতার কাটিতে পারে। কিন্তু আরও কতগুলি সহজাত প্রবৃত্তি **দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিণতি লাভ করে।** এইগুলিকে বিলম্বিত সহজ প্রবৃত্তি (ডিলেড্‌ ইন্‌স্টিংক্‌ট্‌) বলে। বিলম্বিত সহজ প্রবৃত্তির পরিণতির জন্য দেহযন্ত্রের উপযুক্ত বিকাশ দরকার, যাহার ফলে সহজ প্রবৃত্তির পরিপাক (ইন্‌স্টিংক্‌টিভ্‌ মেচিউরেশন্‌) ঘটে।

আবার কতগুলি সহজ প্রবৃত্তি আছে যেগুলি প্রাণীর **স্থায়ী ধর্ম নয়।** ইহারা প্রাণীর ক্রমবিকাশের কোনো বিশেষ অবস্থায় দেখা দিয়া পরে লোপ পায়। এই জাতীয় সহজ প্রবৃত্তিকে অস্থায়ী সহজ প্রবৃত্তি (ট্র্যান্‌জিটরি ইন্‌স্টিংক্‌ট্‌) বলে। যেমন, বৎসরের কোনো নির্দিষ্ট ঋতুতেই অভিপ্রয়াণকারী পাখী (মাইগ্রেটরি বার্ড) দেশান্তরে উড়িয়া যায়। আবার আসন্নপ্রসবা পক্ষিণী ভাবী সন্তানের আশ্রয় বা বাসা নির্মাণে ব্যস্ত হয়।

কতগুলি জটিল ক্রিয়া প্রত্যেক প্রাণীরই অন্ততঃ একবার করিতে হয়। গুটিপোকা গুটি বাহির করিবেই, পাখী বাসা তৈয়ারী করিবেই, মৌমাছি ডিম পাড়িবার উপযুক্ত জায়গা খুঁজিবেই। এই জাতীয় ক্রিয়াগুলি যান্ত্রিক, উহাদের উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং কোনো কোনো মনোবিদ্‌ সহজাত প্রবৃত্তিকে ক্রমিক বা যৌগিক প্রতিবর্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২। সহজ প্রবৃত্তির সংজ্ঞা ও উদাহরণ

কোনো সমগ্র পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমগ্র অবয়বীর বা অঙ্গীর (অর্গ্যানিজ্‌ম্) যে জটিল এবং অনৈচ্ছিক ক্রিয়া-সমষ্টি বা যৌগিক ক্রিয়া অচেতনভাবে ও অজ্ঞাতসারে আত্মরক্ষা বা বংশ বিস্তারমূলক কোনো জৈব উদ্দেশ্য সাধন করে এবং যাহা পূর্ববর্তী শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে অর্জিত হয় নাই, কিন্তু বংশগত বা সহজাতভাবে একই শ্রেণীর প্রত্যেক প্রাণীতে একই প্রকারে বর্তমান, তাহাকে সহজাত প্রবৃত্তি (ইন্‌স্টিংক্‌ট্) বলে।

সহজ প্রবৃত্তির উল্লিখিত সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করা যাউক।

(১) সহজ প্রবৃত্তি **জটিল বা যৌগিক (কম্‌পাউণ্ড) ক্রিয়া।** ইহা কতগুলি ক্রমিক বা ধারাবাহিক ক্রিয়ার সমন্বয়। একটির পর আর একটি ক্রিয়া, আবার তাহার পর আর একটি ক্রিয়া, এইরূপ ক্রমে ধারাবাহিক ক্রিয়াসমষ্টিকে সহজ প্রবৃত্তি বলে।

(২) একটি **সমগ্র বা গোটা উদ্দীপক বা পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া** হিসাবে সহজ প্রবৃত্তি ঘটিয়া থাকে।

(৩) সহজ প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া **সমগ্র অবয়বীর প্রতিক্রিয়া।** সহজ প্রবৃত্তিতে একটি গোটা পরিস্থিতি বা উদ্দীপকের প্রতি সমগ্র বা গোটা প্রাণীটি প্রতিক্রিয়াশীল হয়, অথবা ইহাতে সমগ্র জৈব ও শারীর যন্ত্রটি নিযুক্ত হয়।

(৪) সহজ প্রবৃত্তি **অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার** অন্তর্ভুক্ত। প্রাণী কোনো জৈব উদ্দেশ্যসাধনের যন্ত্রের মত জটিল ক্রিয়াগুলি করিয়া যায় এবং এই ক্রিয়ার উপর তাহার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

(৫) সহজ প্রবৃত্তির জটিল প্রতিক্রিয়া কোনো উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া ঘটে না, অথবা ইহা **চেতনভাবে বা জ্ঞাতসারে উদ্দেশ্যমূলক নয়।**

(৬) কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি চেতনভাবে উদ্দেশ্যহীন হইলেও, অচেতনভাবে উদ্দেশ্যমূলক। ইহা আত্মরক্ষা এবং বংশবিস্তারমূলক কোনো জৈব উদ্দেশ্য সাধন করে। অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তি চেতনভাবে না হইলেও **জৈবভাবে উদ্দেশ্যমূলক (বায়লজিক্যালি পার্পাসিভ)।**

(৭) সহজ প্রবৃত্তি **বংশগত** (হেরিডিটারি)। ইহা বংশপরম্পরাক্রমে একই জাতীয় প্রত্যেক প্রাণীতে সঞ্চারিত হয়।

(৮) সহজ প্রবৃত্তি **একই জাতীয় প্রত্যেক প্রাণীতে প্রায় সমভাবে বা একরূপে প্রকাশিত** হইয়া থাকে।

(৯) সহজ প্রবৃত্তি কোনো **শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে অর্জিত হয় না।** জন্মের প্রথম মুহূর্ত হইতেই অনেকগুলি সহজ প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ অথবা পরিণতভাবে প্রকাশ পায়।

(১০) কিন্তু শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে অর্জিত না হইলেও, কোনো কোনো সহজ প্রবৃত্তির বিকাশে **শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সাহায্য করিতে পারে।**

(১১) সহজ প্রবৃত্তি প্রায়ই **অস্বস্তি বোধ হইতে উৎপন্ন** হয়। কোনো অস্পষ্ট অভাব বা প্রয়োজন বোধই এই অস্বস্তির কারণ।

উদাহরণ

স্নাইডার্ সহজ প্রবৃত্তির উদাহরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে গুব্‌রে পোকা (ডাঙ্গ্ বীট্‌ল্) গলিত মাংস দেখিয়া উহার দিকে অগ্রসর হয়, উহার উপর তাহার ডিম পাড়িতে এবং উহা মাটির ভিতর পুতিয়া রাখিবার ক্রিয়াগুলি করিতে প্রবৃত্ত হয়। পাখী তাহার স্ত্রী-পাখীকে দেখিয়া উহাকে আদর করিতে, উহার চারিদিকে গর্বিতভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে, উহার সম্মুখে নাচিতে অথবা অন্য প্রকারে উহার নিকট প্রেম নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হয়। আবার বাঘ হরিণ দেখিয়া গোপনে উহার নিকট আসিতে, উহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে এবং উহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হয়।

দর্জি-মৌমাছি গোলাপ পাতা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া, ঐগুলি নোয়াইয়া গাছে গুটি পোকার গর্তে অথবা মাটিতে ইঁদুরের গর্তে লইয়া যায়; ঐ টুক্‌রায় দুই ধারের ফাঁকগুলি অন্য টুক্‌রা দিয়া ঢাকিয়া ফেলে; এইরূপে অঙ্গুস্তানা বা আঙ্গুলের টুপির মত একটি পাত্র তৈয়ারী করে এবং উহা মধুপূর্ণ করিয়া উহাতে ডিম পাড়ে। পূর্বোক্ত উদাহরণগুলির মত মৌমাছির সহজ প্রবৃত্তিও কতগুলি ধারাবাহিক ক্রিয়ার সমষ্টি। ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হইলেই দর্জি-মৌমাছিরা যন্ত্রচালিতের মত এই ক্রিয়াগুলিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে কোন গুটিপোকার বা ইঁদুরের গর্ত এবং গোলাপ পাতা দেখার সহিত উহার অন্যান্য প্রতিক্রিয়াগুলি এমনভাবে সম্বদ্ধ যে উহারা যেন স্বাভাবিকভাবেই ঘটে।

এই জাতীয় ক্রিয়াগুলি সহজাত, জটিল এবং অনৈচ্ছিক। যে পরিস্থিতিতে ইহারা উৎপন্ন হয় তাহা একটি গোটা বা সমগ্র পরিস্থিতি এবং প্রাণী

তাহার সমগ্র সত্তা দিয়াই ইহাতে প্রতিক্রিয়া করে। তাহা ছাড়া এই ক্রিয়াগুলি আপাতদৃষ্টিতে যান্ত্রিক হইলেও ইহারা আত্মরক্ষা বা বংশরক্ষামূলক জৈব উদ্দেশ্য সাধন করে, যদিও এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রাণীর কোনো স্পষ্ট চেতনা থাকে না। আবার, এই ক্রিয়াগুলি সমজাতীয় প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে সমভাবে বা একইরূপে প্রকাশিত হয়। গুব্‌রে পোকা, পুরুষ পাখী, বাঘ, বা দর্জি-মৌমাছি আবহমান কাল হইতে একই প্রকারে উল্লিখিত ক্রিয়াগুলি করিয়া আসিয়াছে। এই ক্রিয়াগুলি শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে অর্জিত নয়—ইহারা বংশানুক্রমিক। শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা ইহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও, ইহাদের আসল রূপ বদলাইতে পারে না। আবার, এই ক্রিয়াগুলি প্রায়ই কোনো অস্পষ্ট অভাব বা প্রয়োজনবোধ এবং তজ্জনিত অস্বস্তি অনুভূতি হইতে উৎপন্ন হয়। যেমন অভিপ্রয়াণকারী পাখী (মাইগ্রেটরি বার্ড) দেশান্তরে না যাইতে পারিলে অত্যন্ত অসুখী বোধ করে। ইহার অভিপ্রয়াণ একটি সহজাত, জটিল এবং অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। তাহা ছাড়া, ইহা একটি সমগ্র পরিস্থিতিতে পাখীর সমগ্র সত্তার প্রতিক্রিয়া। ইহা শীতাতপ প্রভৃতি আবহাওয়ার সহিত প্রতিযোজন ঘটাইবার জৈব উদ্দেশ্যে সাধিত হয়। এই প্রতিক্রিয়া ঐ জাতীয় সকল পাখীর মধ্যেই সমভাবে দেখা যায়। আবার এই প্রতিক্রিয়া কোনো শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফল নয়। ইহা বংশগত বা বংশানুক্রমিক।

৩। সহজ প্রবৃত্তির শ্রেণীভেদ

সহজ প্রবৃত্তি প্রাণীর জীবনযাত্রায় যে উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধন করে সেই অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর হইতে পারে। ইহা (১) খাদ্যসংগ্রহ, (২) আত্মরক্ষা, (৩) সন্তান পালন এবং (৪) বংশরক্ষা—এই চারিটি উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। উক্ত চারিটি উদ্দেশ্যকে আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষা এই দুইটি উদ্দেশ্যে সংক্ষেপিত করা যাইতে পারে। তথাপি বুঝিবার সুবিধার জন্য চারটি উদ্দেশ্য অনুযায়ী চার শ্রেণীর সহজ প্রবৃত্তি আলোচিত হইতেছে।

খাদ্য সংগ্রহ

খাদ্য সংগ্রহ একটি প্রধান সহজ প্রবৃত্তি। মুরগীর বাচ্চা প্রথম হইতেই ছোটো ছোটো জিনিস খুঁটিতে আরম্ভ করে। মানবশিশু জন্মিয়াই স্তন্যপান করে।

(১) খাদ্যসংগ্রহ সংক্রান্ত সাধারণ সহজ প্রবৃত্তি আবার নানা প্রকারের হইতে পারে। শিকার অথবা খাদ্য-সন্ধান, ওৎ পাতিয়া থাকা, শিকারের অনুসরণ করা, উহার উপর লাফাইয়া বা ঝাঁপাইয়া পড়া, শিকার ধরিয়া ফেলা, উহাকে অধিকার বা আয়ত্ত করা, ফাঁদ পাতা, শিকারকে ভয় দেখাইয়া উহার আশ্রয় হইতে তাড়া দিয়া আনা, প্রভৃতি জটিল ক্রিয়াগুলি খাদ্যসংগ্রহাত্মক সহজ প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত।

মাকড়সা সূক্ষ্মজাল বিস্তার করিয়া ফাঁদ পাতে। ডারুইন বলিয়াছেন যে কোনো বড় পোকা উহার জালে আটকাইলে বৃহৎ ইপাইরা জাতীয় মাকড়সা অতি নিপুণভাবে সূতা গুটাইয়া লয় এবং অতি সন্তর্পণে অন্য সূতা বাহির করিয়া গুটিকাধারে উহাকে জড়াইয়া ফেলে। তারপর এই মাকড়সা ধৃত পোকাটিকে খুব সাবধানে পরীক্ষা করিয়া দেখে এবং উহাকে মৃত্যুদংশন (ফেটাল্ বাইট্) করিয়া উহার উপর দংশনের বিষক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত দূর হইতে ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করে।

আত্মরক্ষা

(২) শত্রুর কাছে গুঁড়ি মারিয়া থাকা, লুকানো, পলায়ন করা, যুদ্ধ করা, উপযুক্ত জায়গায় গর্ত খোঁড়া, আশ্রয় তৈয়ারী করা, সতর্কভাবে আশ্রয় হইতে বাহিরে আসা, অজানা অথবা অপরিচিত বস্তুকে সাবধানে পরীক্ষা করা, অঙ্গভঙ্গী বা শব্দ করিয়া শত্রুর অনুকরণ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি আত্মরক্ষামূলক সহজ প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত।

প্রাণীরা বাসা বা গর্ত তৈয়ারী করিতে গিয়া বিশেষ গঠনমূলক শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। বাবুই পাখীর বাসা নির্মাণের চাতুর্য প্রসিদ্ধ। পিপীলিকা মাটির নীচে বিস্তৃত জায়গা জুড়িয়া বাসা তৈয়ারী করে। ইহাতে ঘর, উচ্চ মঞ্চ প্রভৃতি থাকে। বীবর বাঁধ নির্মাণ করে। এক জাতীয় কৌশলী মাকড়সা মাটিতে নালী তৈয়ারী করে—এই নালীর আবার প্রবেশদ্বারও থাকে। কোনো শত্রু দ্বার খুলিতে চেষ্টা করিলে এই মাকড়সা নালীর প্রাচীরে পা দিয়া বাধা দেয়।

সন্তান-পালন

(৩) সন্তান-পালনের সহিত সংশ্লিষ্ট সহজ প্রবৃত্তি বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল হয়। উপযুক্ত স্থানে ডিম পাড়িয়া উহার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, বাসা

তৈয়ারী করা, ডিমে তাপ দেওয়া, ডিম এবং গুটিকা স্থান হইতে স্থানান্তরে সরাইয়া লওয়া, বাচ্চাগুলিকে খাওয়ানো এবং পরিচ্ছন্ন রাখা, ডিম এবং বাচ্চাগুলিকে নানাভাবে লুকাইয়া রাখা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে এই সহজ প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়।

যেমন এক শ্রেণীর গুব্‌রে পোকা ডিম পাড়িয়া সন্তানের আশ্রয় এবং খাদ্য-সংস্থানের নিম্নরূপ ব্যবস্থা করে। পুরুষ এবং স্ত্রী গুব্‌রে পোকা একতাল গোবর হইতে উহার খানিকটা অংশ লইয়া পায়ের সাহায্যে গোবরের বল তৈয়ারী করে। এইবার একটি পোকা ঐ বলটিকে সামনের পা দিয়া সামনের দিক হইতে এবং অপরটি উহাকে পিছনের পা দিয়া পিছন দিক হইতে টানে এবং ঠেলে। এইরূপ টানিয়া এবং ঠেলিয়া উহারা বলটিকে নরম মাটিতে লইয়া আসে। এখানে উহারা একটি গর্ত খুঁড়িয়া লয়। স্ত্রী পোকাটি গোবরের বলের উপর একটি ডিম পাড়ে এবং দুইটি পোকা মিলিত চেষ্টায় বলটিকে গর্তের ভিতর প্রবেশ করায়। সর্বশেষে গর্তটি ভরাট করিয়া উহারা ঐ স্থান ত্যাগ করে।

বংশরক্ষা

(৪) বংশরক্ষামূলক সহজ প্রবৃত্তি প্রাণীর একটি সাধারণ বা সার্বভৌম ধর্ম। স্ত্রী-পুরুষের মিলনই এই সহজ প্রবৃত্তির স্থূল প্রকাশ। সমজাতীয় প্রাণীরা মূলতঃ একরূপভাবে মিলিত হয়। যেমন ইঁদুরের এই সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়াপদ্ধতি কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতি প্রাণী হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু প্রত্যেক পুরুষ এবং স্ত্রী প্রাণীই কোনো প্রকার শিক্ষা অথবা অভিজ্ঞতার সাহায্য না লইয়া স্বজাতির বিশেষ বিশেষ মিলন-পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই ক্রিয়াকে সহজ প্রবৃত্তি বলিতে হয়, কারণ ইহা অনেকগুলি ক্রিয়ার জটিল এবং ধারাবাহিক সমষ্টি—বংশরক্ষারূপ জৈব উদ্দেশ্য-সাধনই ইহার লক্ষ্য, একটি শারীর এবং মানস অস্বস্তি হইতে ইহার উৎপত্তি এবং একটি সমগ্র পরিস্থিতিতে সমগ্র প্রাণীর প্রতিক্রিয়াই ইহার বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য মানুষ শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তিকে পুরাপুরি সহজ প্রবৃত্তি বলা যায় কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে, কারণ শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা উহাদের এই সহজ প্রবৃত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

৪। সহজ প্রবৃত্তির জৈব মতবাদ—বায়োলজিক্যাল্ থিওরি অফ্ ইন্স্টিংক্ট্

জৈব মতবাদে সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়াগুলির উপর গুরুত্ব দিয়া মানস অভিজ্ঞতা বা অনুভূতিকে গৌণ করা হয়। সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়াগুলি জৈব প্রতিযোজনে (বায়োলজিক্যাল্ অ্যাডাপ্টেশন্) সাহায্য করে। অর্থাৎ ইহারা প্রাণীকে আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় অবস্থার সহিত মানাইয়া লইতে সাহায্য করে। এই ক্রিয়াগুলি যে সকল মানস কারণে ঘটিতে পারে সহজ প্রবৃত্তির জৈব ব্যাখ্যায় উহাদের স্থান নাই।

সহজ প্রবৃত্তির জৈব মতবাদ অনুসারে প্রাণীর সহজাত উপকরণ—যেমন মাকড়সার সূত্র বাহির করিবার অঙ্গ, অথবা কাঁকড়ার নখ বা থাবা, নার্ভতন্ত্র প্রভৃতি—এই ক্রিয়া সম্পাদন করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা উপকবণ আছে বলিয়াই একটি সমগ্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া প্রাণী ধারাবাহিকভাবে প্রতিক্রিয়া করিতে পারে।

সুতরাং জৈব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সহজ প্রবৃত্তি বলিতে বুঝায় নার্ভতন্ত্রের পূর্ব-উপযোজন (প্রি-অ্যাডাপ্টেশন্) যাহা জন্মগত এবং যাহার ফলে উপযুক্ত উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া-রূপে বিশেষ প্রকারের দৈহিক ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ক্রিয়া প্রাণীর আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষার অনুকূল, যদিও এইরূপ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহার কোনো ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকে না।

ডারুইনীয় মত

প্রশ্ন এই যে প্রাণী জীবন ধারণের পক্ষে অনুকূল উপকরণ জন্মগতভাবে পায় কি করিয়া। ইহার উত্তরে ডারুইনীয় মতবাদের প্রধান সূত্রগুলির উল্লেখ করিতে হয়। ডারুইনীয় মতবাদের প্রধান সূত্রগুলি এই। প্রকৃতির খাদ্য-ভাণ্ডারের তুলনায় প্রাণীর বংশবৃদ্ধি বেশী হইতে থাকায় প্রাণীদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যুদ্ধ অথবা **জীবন সংগ্রাম (স্ট্রাগ্ল্ ফর্ এক্সিস্টেন্স্)** দেখা দেয়। এই সংগ্রামে সেই সকল প্রাণীই **জয়লাভ করে** যাহাদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার অনুকূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা উপকরণগুলি থাকে **(সার্ভাইভ্যাল্ অফ্ দি ফিটেস্ট্)** এবং সেই সকল প্রাণী নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় যাহাদের এই যোগ্যতা নাই **(এলিমিনেশন্ অফ্ দি আন্‌ফিট্)**। ডারুইন্ মনে করেন যে আপতিক পরিবর্তনের **(অ্যাক্‌সিডেণ্ট্যাল্ ভেরিয়েশন্)** ফলে প্রাণিদেহের

নিরন্তর পরিবর্তন হয়। যে সকল প্রাণীর বাঁচিয়া থাকিবার অনুকূল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা উপকরণ থাকে তাহাদিগকেই যেন **প্রকৃতি নির্বাচন করিয়া জয়** **(ন্যাচার্যাল্ সিলেক্শন্)**। এই সকল জয়ী প্রাণীদের সন্তানসন্ততিরা উহাদের পুর্বপুরুষদের অনুকূল পরিবর্তনগুলি **বংশগতি** (হেরিডিটি) অনুসারে পাইয়া থাকে।

এইরূপ ব্যাখ্যা অনুসারে সহজ প্রবৃত্তি একপ্রকার জৈব উপযোজন। কি কাজের (ফাংশন্) কি গঠনের, (স্ট্রাক্চার) উভয় দিক দিয়া, সহজ প্রবৃত্তি আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষার উপযোগী প্রতিক্রিয়া। জীববাদীরা প্রথমে সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়াগুলিকে সম্পূর্ণ একরূপ (য়্যুনিফর্ম) বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের মতে সহজ প্রবৃত্তি বংশগতি অনুসারে বংশপরম্পরায় একই রূপে সঞ্চারিত হয়। বর্তমান জীববিদ্যার মতে সহজ প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে বহুলাংশে পরিবর্তনীয়। তাহা ছাড়া বর্তমান জীববিদ্‌দের মধ্যে অনেকেই সহজাত পরিবর্তন (কন্‌জেনিট্যাল্ ভেরিয়েশন্) স্বীকার করিয়া থাকেন। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত নার্ভতন্ত্রও অপরিবর্তনীয় নয়। প্রত্যেক প্রাণীর সহজ প্রবৃত্তি মোটের উপর তাহার জাতিগত হইলেও, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ অবশ্যই স্বীকার্য। যেমন একই পিতামাতার সন্তানদের চেহারায় পিতামাতার ছাপ থাকিলেও, প্রত্যেক সন্তানের চেহারায় এমন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকে যাহা অপর কোনো সন্তানে থাকে না। ডারুইন্ এই পরিবর্তন স্বীকার করিয়াছেন, যদিও তাঁহার মতে ইহা আপতিক বা আকস্মিক (অ্যাক্সিডেণ্টাল্)।

সহজ প্রবৃত্তির ডারুইনীয় সংজ্ঞা

ডারুইন্ স্বয়ং সহজ প্রবৃত্তির সম্পূর্ণভাবে জীব-বিজ্ঞানী ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। তিনি সহজ প্রবৃত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "কোনো কাজ হয়ত আমরা অভিজ্ঞতার ফলে করিতে পারি। সেই কাজই যখন কোনো প্রাণী, এমন কি শিশু অবস্থায়, এবং অনেক প্রাণীই অভিজ্ঞতা ছাড়া, একইভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে উহা করা হইতেছে তাহা না জানিয়া করিতে পারে তাহাকে সহজ প্রবৃত্তি বলে।"

বলা বাহুল্য যে সহজ প্রবৃত্তির উপরোক্ত ডারুইনীয় সংজ্ঞা প্রধানতঃ জীব-বৈজ্ঞানিক হইলেও ইহাতে দুইটি বিষয়ে মানসবৃত্তির ইঙ্গিত রহিয়াছে।

অর্থাৎ ইহাতে অভিজ্ঞতা এবং উদ্দেশ্যের উল্লেখ রহিয়াছে কাজে কাজেই ডারুইনীয় মতটির উপর মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাব অনস্বীকার্য।

৫। সহজ প্রবৃত্তির উৎপত্তি

বিবর্তনবাদ—ডারুইন্

সহজ প্রবৃত্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে জীববৈজ্ঞানিক মত উক্ত হইয়াছে। এই মত অনুসারে সহজ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টায়। যে সকল প্রাণীর মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার অনুকূল পরিবর্তন ঘটে তাহারাই টিকিয়া থাকে এবং তাহাদের পরিবর্তনগুলি বংশগতি অনুসারে পরবর্তী পুরুষে সংক্রামিত হয়। এইরূপে সমশ্রেণীভুক্ত প্রাণীরা অভিজ্ঞতা ছাড়াই একই রূপে যে কাজ করে তাহাই সহজ প্রবৃত্তি।

স্পেন্সার

স্পেন্সার বলেন যে সহজ প্রবৃত্তি প্রথম হইতেই সহজাত নয় কিন্তু জীবন-সংগ্রামে উপযোজন করিবার চেষ্টা হইতে প্রাপ্ত। কিন্তু যে উপযোজন জীবনসংগ্রামের অনুকূল হয় তাহা বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হয় বিনা চেষ্টায় এবং অভিজ্ঞতায়। তাহা হইলে প্রথমে যে ক্রিয়া ছিল চেষ্টা এবং অভিজ্ঞতা-লব্ধ তাহাই পরবর্তী পুরুষে হইয়া দাঁড়ায় সহজাত বা অনায়াসলভ্য। এই মতবাদকে সহজ প্রবৃত্তির বিবর্তনবাদ (এভল্যুশন্) বলে।

লুপ্ত-বুদ্ধি মতবাদ

সহজ প্রবৃত্তির উৎপত্তি বিষয়ে আর একটি মতবাদ উল্লেখযোগ্য। ইহাকে **লুপ্ত-বুদ্ধি মতবাদ** (থিওরি অফ্ ল্যাপ্স্ড্ ইন্টেলিজেন্স্) বলা হয়। এই মতানুসারে পূর্ববর্তী বা পূর্বপুরুষীয় জীবের বুদ্ধিকৃত এবং ইচ্ছাকৃত ক্রিয়াগুলিই পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে অভ্যাসে পরিণত হইয়া পরবর্তী বংশধারায় সহজাত প্রবৃত্তি হিসাবে সংক্রামিত হয়।

এই মতের সহিত স্পেন্সরীয় মতের একটি আপাতদৃশ্য মিল আছে, কারণ উভয় মতেই পূর্বপুরুষদের ক্রিয়া অভিজ্ঞতা এবং চেষ্টা সাহায্যে সম্পন্ন হয় এবং পরবর্তী পুরুষে উহা অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু প্রথম মতটি জীব-বৈজ্ঞানিক, আর দ্বিতীয় মতটি মনোবৈজ্ঞানিক।

দ্বিতীয় মতটির দুইটি প্রধান দোষ। প্রথমতঃ এই মত অনুসারে প্রাণীর পুর্বপুরুষকে বুদ্ধিমান এবং উচ্চতর মানসশক্তিসম্পন্ন মনে করা হইয়াছে। এই মত গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে প্রাণীর বুদ্ধিমান পুর্বপুরুষেরা বুদ্ধিহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এইরূপ মত বিবর্তন-বাদের বিরোধী। এই মতের দ্বিতীয় দোষ এই যে ইহা জীববিজ্ঞানের একটি মূল সত্যের অপলাপ। এই মতে প্রথমে বুদ্ধিকৃত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ ক্রিয়া অনুশীলনের ফলে অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায়, এবং এই অর্জিত অভ্যাস পরবর্তী পুরুষে সংক্রামিত হয়। কিন্তু ভাইস্‌ম্যান্ প্রমুখ জীববিজ্ঞানীর প্রামাণ্য অনুসারে অর্জিত অভ্যাস বংশগতির ফলে পরবর্তী বংশধারায় সংক্রামিত হইতে পারে না।

৬। সহজ প্রবৃত্তির মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ—সাইকলজিক্যাল্ থিওরি অফ্ ইন্‌স্টিংক্‌ট্

অন্যান্য জৈব উপযোজনের মত সহজ প্রবৃত্তির কতগুলি লক্ষণ বংশগতি, সহজাত ভেদ এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রভৃতি সূত্র দিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। কারণ অন্যান্য জৈব উপযোজনের সহিত সহজ প্রবৃত্তির পার্থক্য কি তাহা এই মতবাদের সাহায্যে বুঝা কঠিন। সহজ প্রবৃত্তির এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা অন্যান্য জৈব উপযোজনে নাই।

শারীরবৃত্তীয় মতবাদ

জীববিজ্ঞানী এবং শারীরবৃত্তীয় মতবাদ অনুসারে সহজ প্রবৃত্তি নার্ভতন্ত্রের একজাতীয় সহজাত স্বভাব। অথচ এইরূপ বলিলে সহজ প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না, কারণ প্রতিবর্তও নার্ভতন্ত্রের এক প্রকার সহজাত স্বভাব। অর্থাৎ জীববিজ্ঞানী এবং শারীরবৃত্তীয় মতানুসারে সহজ প্রবৃত্তির সহিত প্রতিবর্তের পার্থক্য থাকে না, অথচ মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাদের পার্থক্য স্বীকার্য।

সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রতিবর্ত

যে সকল জীববিৎ সহজ প্রবৃত্তিকে জৈব উপযোজন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন তাঁহারা ইহার সহিত প্রতিবর্তের কোনো গুরুত্বপুর্ণ পার্থক্য দেখেন না। তাঁহারা সহজ প্রবৃত্তিকে প্রতিবর্তের জটিল সংযোগ বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু সহজ প্রবৃত্তিকে প্রতিবর্তে পরিণত করিবার এই শারীরবৃত্তীয় এবং জীববৈজ্ঞানিক মত গ্রহণীয় নয়। এই মত যে শুধু শারীরবৃত্তীয় এবং জীব-বৈজ্ঞানিক তাহা নয়। কোনো কোনো জীববিদ্যাপ্রভাবিত মনোবিৎও এই মত পোষণ করিয়া থাকেন, যেমন স্পেন্সার্, থর্ন্ডাইক্ প্রভৃতি। সে যাহা হউক, এই দুইটি ক্রিয়ার গুরুত্বপুর্ণ পার্থক্য রহিয়াছে।

সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রতিবর্তের পার্থক্য

ইহাদের প্রধান পার্থক্য এই যে সহজ প্রবৃত্তিতে **বুদ্ধি, চেতনা, আকর্ষণ, মনোযোগ, সন্তোষজনক অথবা অসন্তোষজনক ফল অনুসারে আচরণের পরিবর্তন এবং অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা** থাকে, কিন্তু প্রতিবর্তে থাকে না।

(১) প্রতিবর্ত কোনো অনুভূতি বা সংবেদন ছাড়াও ঘটিতে পারে, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তিতে **অস্বস্তি অনুভুতি** বা সংবেদন থাকেই। যেমন জানুক্ষেপ (নী-জার্ক্) প্রভৃতি প্রতিবর্তে সাধারণতঃ কোনো অনুভূতি বা সংবেদন থাকে না, কিন্তু পাখীর বাসা নির্মাণ প্রভৃতি সহজ প্রবৃত্তিতে থাকে।

(২) **যে সকল প্রতিবর্তে অনুভুতি বা সংবেদন থাকে উহারা ঐ মানস অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।** হাঁচি দিতে যে অস্বস্তিবোধ বা সংবেদন হয় তাহা হাঁচির কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। কিন্তু সহজ প্রবৃত্তির ধারা বিভিন্ন জটিল সংবেদনের উপর নির্ভর করে এবং উহাদের সহিত উপ-যোজিত হয়। গুব্‌রে পোকার ডিম-পাড়া, বিড়ালের ইঁদুর-শিকার, পাখীর বাসা নির্মাণ, মাকড়সার সূতা-কাটা এবং পিপীলিকার খাদ্যসংগ্রহ প্রভৃতি সহজ প্রবৃত্তি এই নিয়ম মানিয়া চলে।

(৩) **মনোযোগ ছাড়া সহজ প্রবৃত্তি কাজ করিতে পারে না।** ইহাতে ইন্দ্রিয়গুলি সকল উদ্দীপকের দ্বারাই উদ্দীপিত হয় না, কিন্তু হয় সেই সকল উদ্দীপকের দ্বারা যাহারা উদ্দেশ্যসাধনের অনুকূল। শিকারী প্রাণীর শিকারের প্রতীক্ষায় থাকা, শিকার অনুসন্ধান এবং লক্ষ্য করা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি মনোযোগ-সাপেক্ষ। উপযুক্ত উদ্দীপক উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সহজ প্রবৃত্তি নিষ্ক্রিয় থাকে। ইহাতে ভাবী উদ্দীপকের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। সহজ প্রবৃত্তির পুর্বাপর ক্রিয়াগুলি একই বস্তুতে মনোযোগের একটি সূত্র দিয়া নিয়ন্ত্রিত।

(৪) চতুর্থতঃ, সহজ প্রবৃত্তিতে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লয়েড্ মর্গ্যান্-এর ভাষায় **পরিবর্তিত চেষ্টার মধ্য দিয়া দৃঢ়তা বা লাগিয়া থাকা (পার্সিস্টেন্‌সি উইথ্ ভেরিড্ এফর্ট্)** প্রকাশ পায়। যদি এক রকমের ক্রিয়া সাহায্যে উদ্দেশ্য সাধিত না হয় তাহা হইলে সাফল্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের চেষ্টা চলিতে থাকে। গুব্‌রে পোকা হয়ত গোবরের বল গড়াইয়া লইতে একটু নীচু জায়গায় আসিয়া পড়িল। এই অবস্থায় বার বার চেষ্টা করিয়াও যখন সে এই বলটিকে নীচু জায়গা দিয়া লইতে পারিল না, তখন উহার গায়ে ধাক্কা দিয়া উহাকে ঢালু করিয়া লইল, যাহাতে গোবরের বলটি গড়াইয়া লইতে আর অসুবিধা না হয়। এই সকল সহজ প্রকৃতির আচরণ হইতে দেখা যায় যে ইহা শুধু নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে জন্মগত ক্রিয়াবিন্যাসই নয়। ইহাতে এমন একটি আবেগ বা প্রক্ষোভ থাকে যাহার ফলে কোনো প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিবার জন্য কতগুলি কাজ করিতে হয়।

(৫) সহজ প্রবৃত্তি শুধু জৈব বা শারীর নয়, কিন্তু মানসও বটে। ইহা অন্ধ বা বুদ্ধিহীন ক্রিয়া নয়। বুদ্ধি ও চেতনা ইহার বিশেষ লক্ষণ। ইহাতে অতীত অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা বা অভিজ্ঞতাব ফলে যে শুধু সহজ প্রবৃত্তির ধরণ বদলায় তাহাই নয়, কিন্তু **বিশেষ প্রকারে বদলায়,** যেমন ইহাতে বস্তুকে পৃথক এবং নির্দিষ্ট করিয়া বুঝিবার এবং পুরাতন অভিজ্ঞতার সাহায্যে নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার ক্ষমতা আসে। সদ্যোজাত মুরগীর বাচ্চা—যাহার কোনো অতীত অভিজ্ঞতা নাই—সহজ প্রবৃত্তির বশে যে কোনো ক্ষুদ্র বস্তু ঠোক্‌রাইতে থাকে। কিন্তু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলেই সে সুস্বাদু এবং অখাদ্য ক্ষুদ্র বস্তুগুলির পার্থক্য বুঝিতে শিখে। ইহার ক্ষুদ্র বস্তুতে ঠোক্‌রাইবার সহজ প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ফলে কোনো কোনো ক্ষুদ্র বস্তুতে নিষিদ্ধ এবং কতগুলিতে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

আবার অভিজ্ঞতার ফলে সহজ প্রবৃত্তি যে শুধু পুরাতন বস্তু হইতে নিবারিত হইয়া সঙ্কীর্ণ হয় তাহাই নয়, কিন্তু নূতন বস্তুতে প্রসারিতও হইতে পারে। যেমন কাক বা অন্যান্য পাখীর লাঙ্গল অনুসরণ করা সহজ প্রবৃত্তি নয়। কিন্তু উহারা লাঙ্গলের পিছনে ছোটে কারণ অতীত অভিজ্ঞতা অনুসারে উহারা লাঙ্গল দেখিয়া প্রচুর খাদ্যশস্য আশা করে। আবার যে সকল মাছ জলাশয়ে খাবার পাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে তাহারা যথাসময়ে জলাশয়ের নিকট কাহাকেও

আসিতে দেখিলেই জলের উপর ভাসিয়া ওঠে এবং ছোঁ মারিয়া খাদ্য লইবার জন্য প্রস্তুত হয়।

(৬) বলা যাইতে পারে যে নিছক প্রতিবর্তেও এইরূপ অতীত অভিজ্ঞতার শিক্ষালব্ধ ফল দেখা যায়। যেমন কাতুকুতু বা সুড়সুড়ি দেওয়ার কথা বলিলেই অনেক সময় প্রকৃত কাতুকুতু বা সুড়সুড়ি দেওয়ার ফল হয়। কিন্তু এই ব্যাপারেও প্রতিবর্তের সহিত সহজ প্রবৃত্তির পার্থক্য রহিয়াছে। প্রতিবর্তে উদ্দীপকের সহিত উপযোজন নাই, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তিতে আছে। সুড়সুড়ি দেওয়ার পুর্বেই উহার প্রতিক্রিয়া, যেমন হাসিতে গড়াইয়া পড়া প্রভৃতি আরম্ভ হয়, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তিতে উদ্দীপকের জন্য প্রস্তুতি থাকিলেও উহা উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া হয় না।

উপসংহার

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রতিবর্ত এবং সহজ প্রবৃত্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকায় উহাদিগকে একাকার করা অসঙ্গত। সহজ প্রবৃত্তি ক্রমিক বা যৌগিক প্রতিবর্ত নয়, কিন্তু তদপেক্ষা উন্নততর অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। অধিকাংশ মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ ইহাদের এই পার্থক্য স্বীকার করে এবং জীববৈজ্ঞানিক বা শারীরবৃত্তীয় মতবাদ ইহা স্বীকার করে না বলিয়া প্রথমটিই গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়।

৭। সহজ প্রবৃত্তি অন্ধ কিনা—সহজ প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি—আর্ ইন্স্টিংক্ট্স্ ব্লাইণ্ড? ইন্স্টিংক্ট্ অ্যাণ্ড্ ইন্টেলিজেন্স্

সহজ প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার ফল কাজে লাগাইতে পারে, সুতরাং ইহাতে বুদ্ধি ক্রিয়াশীল। কিন্তু প্রশ্ন এই যে সহজ প্রবৃত্তি কি প্রথম হইতেই বুদ্ধিসম্পন্ন, অথবা উহা প্রথমে বুদ্ধিহীন এবং অন্ধ থাকিয়া শুধু অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ফলে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া দাঁড়ায়।

প্রথমে বুদ্ধিহীন পরে বুদ্ধিযুক্ত

অনেকের মতে সহজ প্রবৃত্তি প্রথম অবস্থায় বুদ্ধিহীন বা অন্ধ, কারণ বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ হইল ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যের জ্ঞান বা দূরদৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়া সহজ প্রবৃত্তিতে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বা দূরদৃষ্টি থাকিতে পারে না।

[illegible]-এর মত—প্রথম হইতেই বুদ্ধিযুক্ত

উপরোক্ত মতের তাৎপর্য এই যে অভিজ্ঞতা সাহায্যে শিক্ষালাভের সামর্থ্যই বুদ্ধির পরিচায়ক এবং যেহেতু সহজ প্রবৃত্তির প্রথম ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা সাহায্যে শিক্ষালাভ ঘটে না, সুতরাং ইহা অন্ধ বা বুদ্ধিহীন। কিন্তু এইরূপ মনে করা অসঙ্গত। সহজ প্রবৃত্তির প্রথম ক্রিয়ায় অতীত অভিজ্ঞতার ফল না থাকিলেও, উহাতে এমন কিছু ঘটে যাহার ফলে উহার পুনরাবৃত্তিতে শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তির প্রাথমিক ক্রিয়ায়ই শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ইহাতে শিক্ষালাভের উপযোগী যে বুদ্ধিবৃত্তি ক্রিয়াশীল হয় তাহার ফলেই সহজ প্রবৃত্তির পরবর্তী অবস্থায় শিক্ষালাভের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। বুদ্ধি প্রথমে একেবারেই নাই, হঠাৎ পরে দেখা দিল, এইরূপ যুক্তি দুর্বোধ্য।

প্রথম হইতেই সহজ প্রবৃত্তিতে মনোযোগ, আকর্ষণ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতার পার্থক্য-বোধ এবং তদনুসারে ক্রিয়ার পরিবর্তন প্রভৃতি বুদ্ধির লক্ষণগুলি বর্তমান থাকে। যেমন পাখীর প্রথম বাসা-নির্মাণই উহার উপযোগী জিনিসগুলিতে মনোযোগ, এই জিনিসগুলি লইয়া বাসা তৈয়ারী করিবার আকর্ষণ, উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য প্রভৃতি বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

স্টাউট্—উদ্দেশ্যের জ্ঞান—নিকট এবং দূর উদ্দেশ্য

সহজ প্রবৃত্তিতে প্রথম হইতেই উদ্দেশ্যের ভবিষ্যৎদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি থাকিলেও ইহা সম্পূর্ণভাবে থাকে না। কারণ এই দৃষ্টি চেতন নয়, কিন্তু অবচেতন বা অস্পষ্টচেতন। যখন পাখী তাহার বাসা তৈয়ারী করে তখন সে উহাতে ডিম পাড়িবে এবং বাচ্চাগুলিকে পালন করিবে তাহার এইরূপ দূর বা ভবিষ্যৎদৃষ্টি নাও থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া বাসা তৈয়ারী করিবার সহজ ক্রিয়ায় উদ্দেশ্যের কোনো চেতনা নাই, এইরূপ মনে করা অহেতুক। দূর (রিমোট্) উদ্দেশ্যের দিকে পাখীর দৃষ্টি না থাকিলেও নিকট (প্রক্সিমেট্) উদ্দেশ্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকা সম্ভব। পাখী তাহার বাসা তৈয়ারী করিবার কালে এই খড় বা কুটাটি গাছের উপর লইয়া যাইতে হইবে, অথবা এই কাঠিটি ঐ কাঠিটির পাশে সাজাইতে হইবে এই জাতীয় নিকট উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চেতন থাকিতে পারে। আবার বাসা তৈয়ারী হইয়া গেলে সে ইহার উপর ডিম পাড়িবে, ডিমের

উপর তাপ দিয়া শাবকগুলিকে ভূমিষ্ঠ হইতে সাহায্য করিবে, এই জাতীয় দূর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাখীর চেতনা নাও থাকিতে পারে।

মায়ার্স্-এর মত

মায়ার্স্ বলিয়াছেন যে মুরগীর বাচ্চা যখন সর্বপ্রথম যে কোনো ক্ষুদ্র বস্তু ঠোক্‌রাইতে আরম্ভ করে, অথবা হাঁসের বাচ্চা যখন সর্বপ্রথম জল দেখিয়া উহাতে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং সাঁতার কাটে, তখন তাহাদের এই ক্রিয়া সম্বন্ধে অস্পষ্ট চেতনা থাকে। মায়ার্স্-এর মতে এই ক্রিয়াগুলি প্রথম বা নূতন মনে হইলেও, একেবারে নূতন নয়, কিন্তু পূর্ব-অভিজ্ঞতাযুক্ত। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থায়ই উহাদের এই জাতীয় কতগুলি ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা ঘটে।

কিন্তু **স্টাউট্** মনে করেন যে শুধু পুর্ব-অভিজ্ঞতা এই ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিতে পারে না। বাজ পাখী দেখিয়াই অন্যান্য পাখী পালাইয়া যায় অথবা আত্মগোপন করে। পাখীরা প্রথম বাজ দেখিয়াই যে নির্দিষ্ট ক্রিয়াগুলি করে তাহা সহজাত এবং পুর্ব-অভিজ্ঞতার প্রভাবমুক্ত। তাহা ছাড়া মায়ার্স্-এর মতানুসারে কিরূপে সহজ প্রবৃত্তির প্রথম ক্রিয়ায় শিক্ষালাভ হইতে পারে তাহা দুর্বোধ্য।

আবার বুদ্ধি পুর্ব-অভিজ্ঞতার ফল হইলে অভিজ্ঞতার অল্পাধিক্য অনুসারে বুদ্ধিরও অল্পাধিক্য ঘটিবে। কিন্তু সেইরূপ ঘটে না। মনোযোগের বস্তু নির্বাচন (সিলেক্‌টিভ্ অ্যাটেন্‌শন্), ইহার ধারাবাহিকতা (কন্‌টিন্যুইটি অফ্ অ্যাটেন্‌শন), পরিবর্তিত চেষ্টা সত্ত্বেও দৃঢ়তা বা লাগিয়া থাকা (পার্সিস্‌টেন্‌সি উইং ভেরিড্ এফর্ট) প্রভৃতি বুদ্ধির লক্ষণগুলি পাখীর বাসা নির্মাণ এবং অন্যান্য সহজ প্রবৃত্তিতে আদ্যোপান্ত সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং **সহজ প্রবৃত্তির বুদ্ধি অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয় কিন্তু সহজাত**

মনোযোগের বিষয়নির্বাচন আকর্ষণের (ইন্‌টারেস্ট্) উপর নির্ভর করে। কিন্তু আকর্ষণ একটি সহজাত স্বভাব। আকর্ষণ এক জাতীয় আবেগ যাহাতে বেদনা-রাগ (অ্যাফেক্‌টিভ্ টোন্) এবং প্রক্ষোভের উত্তেজনা থাকে। আকর্ষণে ভবিষ্যৎমুখীনতা (প্রস্পেক্‌টিভ্ অ্যাটিচুড্) আছে। কিন্তু এই কারণে ইহাকে পুর্ব-অভিজ্ঞতা-নির্ভর না বলিলেও চলিতে পারে। পাখী বাসা তৈয়ারী করিবার খড়, কুটা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেছে এবং তাহাকে এইগুলি সংগ্রহ করিয়া যাইতে হইবে, এইরূপ ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিই পাখীর পক্ষে যথেষ্ট।

সহজ প্রবৃত্তি একটি অন্ধ অস্বস্তি বা অস্থিরতা বোধ হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহাতে শুধু অন্ধ অস্থিরতাই থাকে না, সুপ্ত ইচ্ছা বা ক্রিয়া-প্রবণতাও থাকে যাহা প্রাণীকে উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করে। উদ্দেশ্যসাধনচেষ্টা সহজাত কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল উপায়জ্ঞান সহজাত নয়। উদ্দেশ্যসাধনে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে সেই বুদ্ধি অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। কারণ উপায়গুলি কর্মপ্রচেষ্টার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই জানা যাইতে পারে।

উদাহরণ

বিষয়টি উদাহরণ সাহায্যে বুঝানো যাউক। নিঃসঙ্গ বোল্‌তা (সলিটারি ওয়াস্প্) উহার বাসায় মাকড়সা মজুত করিয়া রাখে, কিন্তু বাসার প্রবেশ-রন্ধ্রে মাকড়সা ঢুকাইতে গিয়া প্রায়ই অসুবিধায় পড়ে। ফলে এই বোল্‌তা উহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দৃঢ়তার সহিত নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে করিতে সাফল্য লাভ করে। এইরূপ সহজ প্রবৃত্তিতে প্রথম হইতেই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য, সাফল্য এবং ব্যর্থতার পার্থক্যবোধ, মনোযোগের ফলে বিষয়-নির্বাচন এবং আকর্ষণ প্রভৃতি বুদ্ধির লক্ষণগুলি বর্তমান থাকে। কিন্তু কি উপায়ে, অর্থাৎ কোন্ চেষ্টা বিফল হইলে অন্য কোন্ চেষ্টা করিতে হইবে এই জ্ঞান চেষ্টা করিবার ফলে অভিজ্ঞতা হইতে আসে। এই চেষ্টা "চেষ্টা ও ভুল-সংশোধন (ট্রায়াল্ অ্যাণ্ড্ এরর্)" প্রণালীতে ঘটে না। কারণ ইহাতে প্রথম হইতেই উদ্দেশ্যাভিমুখিতা, সাফল্য এবং ব্যর্থতার পার্থক্যবোধ, মনোযোগের ফলে বিষয়-নির্বাচন এবং আকর্ষণ প্রভৃতি বুদ্ধিমূলক ক্রিয়াগুলি কাজ করে।

৮। সহজ প্রবৃত্তির মানস রূপ

সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়া বুদ্ধি এবং চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চেতনা কি পরিমাণে সহজ প্রবৃত্তির অংশ এবং কি পরিমাণে ইহার প্রকাশের কারণ তাহা আলোচনা করা দরকার। মনোযোগ, অনুভূতি, অভিজ্ঞতার ফলে শিক্ষা প্রভৃতি মানসবৃত্তিগুলিই যে সহজ প্রবৃত্তি তাহা নয়। আকৃষ্ট অথবা মনোযোগী হইবার সাধারণ ক্ষমতাকে সহজ প্রবৃত্তি বলা চলে না। কিন্তু কোনো বিশেষ বস্তু বা উদ্দীপকের প্রথম উপস্থিতিতেই যে উহার সম্পর্কে বিশেষ ধরণের উত্তেজিত প্রক্ষোভ, মনোযোগ এবং আকর্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা সহজ প্রবৃত্তির ফল। বিড়ালশাবক যে অন্য অনেক বস্তু থাকা সত্ত্বেও একটি পশমী সূতার

দোলানো বল লইয়া ব্যস্ত হয়, অথবা কোনো প্রাণী যে উহার স্বভাবশত্রু দেখিবা মাত্র রাগিয়া অস্থির হয়—এইগুলি সহজ প্রবৃত্তিরই ফল।

মোটের উপর একটি ধারাবাহিক ক্রিয়া করিবার সহজাত শক্তির সহিত বিশেষ বস্তুর সান্নিধ্যে ঐ শক্তি প্রয়োগ করিবার প্রবৃত্তি থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে কোনো জন্মগত প্রবৃত্তির গুণেই এই বস্তু উহার পরিবেশ হইতে পৃথক-ভাবে এবং অনায়াসে জ্ঞাত হয়।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌ প্রদত্ত সহজ প্রবৃত্তির সংজ্ঞা

উইলিয়ম্‌ ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌ সহজ প্রবৃত্তির মানসরূপের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি সহজ প্রবৃত্তির যে সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়াছেন তাহা এই : "সহজ প্রবৃত্তি হইল সেই স্বাভাবিক প্রকৃতি যাহা প্রাণীকে কোনো শ্রেণীর যে কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে এবং উহাতে মনোযোগ দিতে, উহার সম্মুখে প্রক্ষুব্ধ উত্তেজনা এবং এইরূপ ক্রিয়ার আবেগ অনুভব করিতে বাধ্য করে, যে ক্রিয়াবেগ ঐ বস্তু সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট প্রকারের আচরণে প্রকাশিত হয়।"

এই সংজ্ঞার সমালোচনা

মনোবিদ্যার দিক হইতে ম্যাক্‌ডুগ্যাল প্রদত্ত সহজ প্রবৃত্তির উপরোক্ত সংজ্ঞাটি ব্যাপক। ইহাতে সহজ প্রবৃত্তির অবগতি, বেদনা এবং ইচ্ছামূলক, এক কথায় সকল মানস উপাদানগুলিই, উল্লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন সহজ প্রবৃত্তিতে এই মানস বৃত্তিগুলি বিভিন্ন মাত্রায় বর্তমান থাকে। যে সকল সহজ প্রবৃত্তিতে ক্রিয়ার আবেগ বেশী তাহাতে অবগতি বা জ্ঞান স্বভাবতঃ কম, এবং অধিকাংশ সহজ প্রবৃত্তিতেই বেদনা বা প্রক্ষোভের স্বভাবটি বিশিষ্টভাবে ফুটিয়া ওঠে না।

এই দিক দিয়া বিচার করিলে ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌-এর সংজ্ঞাটি জটিলতর এবং উচ্চতর সহজ প্রবৃত্তিগুলির বেলায়ই খাটে ,এবং ইহার ভিত্তিতে অধিকাংশ সহজতর এবং নিম্নতর সহজ প্রবৃত্তি কমবেশী ত্রুটিপূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। যেমন হাঁটিবার সহজ প্রবৃত্তি ক্রমবিকাশের একটি অবস্থায় দেখা দেয়। ইহাতে প্রত্যক্ষ করিবার মত কোনো স্পষ্ট বিষয় এবং প্রক্ষুব্ধ উত্তেজনার কোনো বিশেষত্ব থাকে না।

অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভকে (লার্নিং বাই এক্স্‌পিরিয়েন্স্‌) একটি সহজ প্রবৃত্তি বলিতে হয়, কারণ সহজাত স্বভাব অনুসারে কতগুলি অভিজ্ঞতার ফলে

শিক্ষা হয়, কিন্তু অন্যগুলির ফলে হয় না। প্রাণী সেই সকল অভিজ্ঞতার ফলেই শিক্ষালাভ করে যাহাতে উহার সহজাত আকর্ষণ থাকে। যেমন কুকুর এবং বিড়াল শিকার এবং যুদ্ধ প্রভৃতি স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিই সহজে আয়ত্ত করিতে পারে, কিন্তু যে সকল কেরামতি উহাদিগকে জোর করিয়া শেখানোর চেষ্টা করা হয় সেইগুলি তত সহজে শিখিতে পারে না।

যে প্রাণী যত নিম্নস্তরের তাহার অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার পরিধি তত সঙ্কীর্ণ এবং যে প্রাণী যত উচ্চস্তরের তাহার অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার পরিধি তত ব্যাপক যেমন, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীরা অভিজ্ঞতার ফলে খুব কমই শিক্ষালাভ করে, আবার কুকুর বা বানরশ্রেণীর প্রাণী উহার ফলে অনেক কিছুই শিখিতে পারে।

৯। মানুষের সহজ প্রবৃত্তি

মানুষের সহজ প্রবৃত্তির প্রাধান্য কিরূপ ইহা নির্ভর করে সহজ প্রবৃত্তি বলিতে আমরা কি বুঝি তাহার উপর।

মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পুর্বে শিক্ষা করা হয় নাই এমন কতগুলি বিশিষ্ট এবং জটিল ক্রিয়া করিবার ক্ষমতাই সহজ প্রবৃত্তির বিশেষ ধর্ম —যেমন চাতক পাখীর (সোয়্যালো) প্রথম উড়িবার চেষ্টাই সফল হয়—সে প্রথমবার উড়িতে গিয়াও মাটিতে পডিয়া যায় না বা মরে না। আবাব চডাই পাখীর প্রথম ওড়াই পরিণত পাখীর ওডার মত পরিপক্ব।

ক্রিয়া করিবার সহজাত শক্তি অর্থে মানুষের সহজ প্রবৃত্তি নগণ্য

মানুষের ক্ষেত্রে সহজ ক্রিয়া-সামর্থ্যের উপযোগী জন্মগত উপকরণ অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় কম। উত্থান পতনের মধ্য দিয়াই মানুষ প্রায় প্রত্যেকটি ক্রিয়ায় অভ্যস্ত হইয়া থাকে। “হাঁটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়”। মানুষের মাত্র একটি ক্ষমতাই সহজাত যথা, শিশুর পা মাটি স্পর্শ করে এমনভাবে তাহাকে ধরিলে সে, **পর্যায়ক্রমে দুইটি পা নাড়িতে** থাকে। মুখে কোনো জিনিস দিলে তাহা **কামড়ানো,** কোনো জিনিস ধরিয়া **মুখে দেওয়া, হামাগুড়ি দেওয়া,** স্পষ্টভাবে **নানা শব্দ করা, কাঁদিয়া, হাসিয়া, ভ্রূভঙ্গী** প্রভৃতি **করিয়া প্রক্ষোভ প্রকাশ** করা—এইগুলি শিশুর সহজ ক্রিয়া। কিন্তু সহজ প্রবৃত্তির মানদণ্ডে চাতক বা চড়াই পাখীর প্রথম ওড়ার সহিত তুলনীয় আর বিশেষ কিছু সহজাত সম্পদ মানবশিশুর বড় একটা থাকে না।

কিন্তু যদি ক্রিয়া করিবার সহজাত ক্ষমতাকে সহজ প্রবৃত্তির প্রধান লক্ষণ মনে না করিয়া **বিশেষ অবস্থার উপযোগী সহজ আচরণকে** ইহার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে মানুষের সহজ প্রবৃত্তির ক্ষেত্র প্রাণীর তুলনায় অধিক ব্যাপক হইয়া পড়ে। পলায়ন এবং আত্মগোপন ক্রিয়াগুলি অর্জিত হইতে পারে, কিন্তু কোনো ভীতিজনক বস্তুর উপস্থিতিতে এই ক্রিয়াগুলি শুধু অর্জিত নাও হইতে পারে।

আবার যদি বিশেষ অবস্থায় নির্দিষ্ট ক্রিয়া করিবার মূল স্বভাবের পরিবর্তে **নির্দিষ্ট বিষয়ে বা বস্তুতে বিশিষ্ট আকর্ষণ, মনোযোগ এবং অভিজ্ঞতার ফলে শিক্ষার ক্ষমতাকেই** সহজ প্রবৃত্তির প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে প্রাণী অপেক্ষা মানুষের সহজ প্রবৃত্তি বেশী বিচিত্র এবং জটিল হইয়া দাড়ায়। এই ধরণের সহজ প্রবণতাতেই মনুষ্যমনের বিকাশের মূল কারণ নিহিত।

সহজ প্রবৃত্তি বলিতে যদি সেই সকল ক্রিয়াই বুঝায় যেগুলি অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া চাতক পাখীর প্রথম ওড়ার মত প্রথম হইতেই পরিণত, তাহা হইলে সহজ প্রবৃত্তি কথাটি মানুষের প্রায় কোনো আচরণেই খাটিবে কিনা সন্দেহ।

আবার সহজ প্রবৃত্তি বলিতে **যদি সহজাত স্বভাবের দ্বারা প্রভাবিত ক্রিয়ামাত্রকেই বুঝায়,** তাহা হইলে সহজ প্রবৃত্তি কথাটি সর্বব্যাপক এবং অর্থহীন হইয়া পড়ে। সংবেদন, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি সকল মানসবৃত্তিগুলির সহজাত স্বভাবের উপর নির্ভর করে। এমতাবস্থায় সকল মানস বৃত্তিই সহজ প্রবৃত্তি হইয়া দাঁড়ায়।

সহজ প্রবৃত্তি কথাটিকে এই অস্পষ্টতা এবং নিরর্থকতা হইতে মুক্ত রাখিতে হইলে ইহার **অর্থসঙ্কোচন দরকার।** স্মৃতি, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলিকে সহজ প্রবৃত্তি বলা চলে না, কারণ ইহারা মুক্তভাব (ফ্রী আইডিয়া) দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত। কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি কথাটির অর্থ টানিয়া যতই বাড়ানো যাউক না কেন, মনে রাখিতে হইবে যে **উহাতে মুক্ত ভাব বা চিন্তার স্থান নাই।**

সহজ প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষের স্তরে সীমাবদ্ধ। আবার প্রত্যক্ষে সীমাবদ্ধ যে কোনো প্রতিক্রিয়াই সহজ প্রবৃত্তি নয়। বজ্রের সহিত বিদ্যুৎ দেখিবার ফলে বিদ্যুতের ভয়কে সহজ প্রবৃত্তি বলা যায় না, কারণ এই ভয় পূর্ব-অভিজ্ঞতা হইতে অর্জিত।

মানুষের সহজাত সম্পদ

অবশ্য মানুষের সহজাত সম্পদ প্রাণীদের তুলনায় কম নয়। কিন্তু ইহা নূতন প্রকাশের ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত ভেদের দ্বারা অধিক প্রভাবিত। সহজাত আকর্ষণ এবং দক্ষতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে অসাধারণ, বিশেষ করিয়া প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিলক্ষিত **প্রকৃতিদত্ত বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার** উল্লেখ করা যাইতে পারে। "যদি মোজার্ট তিন বৎসর বয়সে বিস্ময়কর কম অনুশীলনের সাহায্যে পিয়ানো না বাজাইয়া বিনা অনুশীলনে কোনো সুর বাজাইতেন," তাহা হইলে চড়াই পাখীর প্রথম উড্ডয়নের মত সহজ প্রবৃত্তিমূলক ক্ষমতা দেখাইতেন। তাঁহার সঙ্গীতে কৃতিত্ব যে সহজাত সংস্কারের ফলে ঘটিয়াছিল উহাকে সহজ প্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে। জন্মগত প্রবণতা বা ঝোঁকের জন্য সঙ্গীতে ছিল তাঁহার অনমনীয় এবং আত্মহারা আকর্ষণ এবং ইহাতে ছিল তাঁহার অভিজ্ঞতার ফলে দ্রুত, নিখুঁত এবং নিরেট শিক্ষা। গণিতে নিউটন-এর, প্রাকৃতিক ইতিহাসে (ন্যাচার্যাল্ হিস্টরি) ডারুইন-এর এবং অঙ্কনে গিয়েটো-এর ছিল একই জাতীয় আকর্ষণ এবং স্বাভাবিক দক্ষতা। সাধারণ লোকের মধ্যেও কোনো বিশেষ বিষয়ে এইরূপ আকর্ষণ এবং দক্ষতা দেখা যায়। কেহ হয়ত জলে হাঁসের মত গতিতে যথেচ্ছ সঞ্চরণ করে, আবার কেহ বা নামতার কোঠা ছাড়াইতেই গলদ্‌ঘর্ম হইয়া যায়।

সকল স্বভাবী শিশুকেই বহু পরিশ্রম করিয়া সোজাভাবে বসিতে, দাঁড়াইতে, হাঁটিতে, দৌড়াইতে, উঠিতে, নামিতে, লক্ষ্য স্থির করিয়া কোনো বস্তু ধরিতে, অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে, স্পষ্ট-উচ্চারিত শব্দ করিতে শিক্ষালাভ করিতে হয়। এই ক্ষমতাগুলি তাহারা জন্মগতভাবে অথবা বিনা অনুশীলনে আয়ত্ত করে না। কিন্তু উপযুক্ত বয়সে বা কালে তাহারা এইগুলি শিখিবার বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে এবং ধারাবাহিক মনোযোগের সাহায্যে, পরিবর্তিত চেষ্টার মধ্যে দৃঢ়তা সহকারে অগ্রসর হয়। অভিজ্ঞতার সাহায্যে এইগুলি শিখিতে গিয়াও তাহারা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়।

সহজ প্রবৃত্তি বিষয়টি স্বভাবতঃ অস্পষ্ট। মানুষের ক্ষেত্রে ইহার অস্পষ্টতা আরও বেশী। মানুষের প্রায় সকল ক্ষমতাগুলিই অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার ফলদ্বারা পুষ্ট হয়। কাজেই মানুষের সহজ প্রবৃত্তি কি কি তাহা বলা কঠিন।

যে সকল স্বাভাবিক আবেগ এবং ক্ষমতা শুধু শৈশবে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু সকল বা অধিকাংশ পরিণত মানুষের মানসজীবনে ব্যাপ্ত সেইগুলি সম্বন্ধে অধিকতর নির্ভুল গবেষণা ও বিশ্লেষণ আবশ্যক।

১০। সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভ

উপরের আলোচনা হইতে দেখা গিয়াছে যে অস্বস্তি বা অভাব-বোধ হইতে সহজ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। জেম্‌স্ বলিয়াছেন যে যে বস্তু সহজ, প্রবৃত্তি জাগায় তাহা প্রক্ষোভও জন্মাইয়া থাকে। তিনি ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি সহজ প্রবৃত্তি হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন, যদিও সহজ প্রবৃত্তিকে প্রক্ষোভের সহিত একাকার করেন নাই। তাঁহার মতে সহজ প্রবৃত্তি সেই দৈহিক ক্রিয়া যাহা প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে এমন বস্তুর সহিত সম্পর্কিত। কিন্তু প্রক্ষোভ-প্রতিক্রিয়া সহজ প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়ার তুলনায় অধিকতর সূক্ষ্ম এবং দেহে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই উভয়েরই দৈহিক প্রতিক্রিয়া একরূপ।

জেম্‌স্ ও ম্যাক্‌ডুগ্যাল্-এর মত

জেম্‌স্-এর মত ম্যাক্‌ডুগ্যাল্-এর মত অপেক্ষা স্পষ্টতর বলিয়া মনে হয়। ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ মৌলিক অথবা সবল প্রক্ষোভকে প্রধান সহজ প্রবৃত্তিগুলির ক্রিয়ার বেদনাগত দিক (অ্যাফেক্‌টিভ্ অ্যাস্‌পেক্ট) বলিয়াছেন। কিন্তু ভয়ের মত একটি প্রক্ষোভ নিশ্চয়ই অন্য কোনো সহজপ্রবৃত্তির একটি দিক মাত্র নয়। পক্ষান্তরে ইহা একটি সমগ্র মানসবৃত্তি যাহা একাধাবে অবগতি, ইচ্ছা এবং বেদনামূলক। ইহাতে দুঃখময় অনুভূতি, উহার বিষয় সম্বন্ধে চেতনা বা জ্ঞানও থাকে।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ সহজ প্রবৃত্তি এবং উহাদের অঙ্গীভূত প্রাথমিক প্রক্ষোভের নিম্নোক্ত তালিকা দিয়াছেন।

সহজ প্রবৃত্তি	প্রাথমিক প্রক্ষোভ
পলায়নী প্রবৃত্তি	ভয় „
যোধন „	ক্রোধ „
বিতাড়ন „	বিরক্তি „
পিতৃত্ব-মাতৃত্ব „	কোমল „

সহজ প্রবৃত্তি		প্রাথমিক প্রক্ষোভ	
আবেদন	,,	দুঃখ	,,
যৌন	,,	কাম	,,
কৌতূহল	,,	বিস্ময়	,,
আনুগত্য	,,	নম্রতা	,,
প্রাধান্য	,,	উৎকর্ষ	,,
যৌথ	,,	নির্জনতা	,,
খাদ্যসন্ধান	,,	ক্ষুধা	,,
সঞ্চয়	,,	স্বত্বাধিকার	,,
গঠনমূলক	,,	সৃজনী	,,
হাস্য	,,	আমোদ	,,

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌-মতের সমালোচনা

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌ প্রদত্ত প্রধান চৌদ্দটি সহজ প্রবৃত্তি ও উহাদের অঙ্গীভূত চৌদ্দটি প্রাথমিক প্রক্ষোভের তালিকা মূল্যবান। তিনি সহজ প্রবৃত্তিকে শুধু শারীর বা জৈব ক্রিয়া বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু উহার মানস রূপটিও তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই তালিকাটির মূলে যে নিয়ম রহিয়াছে তাহা ঠিক। প্রক্ষোভ অবশ্যই সহজ প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু যে সহজ প্রবৃত্তির সহিত যে প্রক্ষোভ জড়িত বলিয়া ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌ দেখাইয়াছেন তাহা ঠিক নাও হইতে পারে। যেমন ক্রোধ যে যোধন প্রবৃত্তির এবং কোমল অনুভূতি (টেণ্ডারনেস্‌) যে পিতৃত্ব-মাতৃত্ব প্রবৃত্তির সহিত সংযুক্ত হইবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। আবার কয়েকটি সহজ প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ স্পষ্ট নয়। যেমন যৌন, যৌথ, সঞ্চয় এবং গঠন প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ কাম, নির্জনতা, স্বত্বাধিকার, এবং সৃজনী অনুভূতি না হইয়া যথাক্রমে প্রেম, নিরাপত্তা বা আত্মপ্রসারণ, অধিকার বা আত্মবিস্তার এবং সাফল্য হইতে পারে। বলা যাইতে পারে যে এই প্রক্ষোভগুলির নাম উদ্ভট। কিন্তু ম্যাক্‌ডুগ্যাল-এর উল্লিখিত আনুগত্য, উৎকর্ষবোধ প্রভৃতি প্রক্ষোভের নামগুলিও কম উদ্ভট নয়।

মোটের উপর বলা যায় যে সহজ প্রবৃত্তি এবং উহার অঙ্গীভূত প্রক্ষোভের সম্পূর্ণ শ্রেণীভেদ দুঃসাধ্য।

১১। সহজ প্রবৃত্তির লক্ষণ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি মত

ড্রিভার্-এর মত

ড্রিভার্-এর মতে সহজ প্রবৃত্তির নিম্নোক্ত তিনটি ভেদলক্ষণ আছে।

(১) অন্তর্দর্শন সাহায্যে সহজ প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়াও উহাকে আরও মৌলিক উপাদানে পরিণত করা যায় না। অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তি একটি অবিভাজ্য বা মৌলিক বৃত্তি।

(২) কতগুলি নির্দিষ্ট বস্তু অথবা নির্দিষ্ট শ্রেণীর বস্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পূর্বেই উহাদের নির্দিষ্ট এবং অভ্রান্ত প্রকাশলক্ষণগুলির সহিত সহজ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ উৎপন্ন করে।

(৩) সহজ প্রবৃত্তি এবং উহার প্রক্ষোভ শৈশবের প্রথম অবস্থায়ই পরিলক্ষিত হয়।

ওয়াট্সন্[১]-এর মত

ওয়াট্সন্-এর মতে মানুষের মূল প্রকৃতিতে তিন শ্রেণীর প্রক্ষোভ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়—যথা ভয়, ক্রোধ এবং ভালবাসা। তাঁহার মতে মানুষের সহজ প্রবৃত্তির সংখ্যা নগণ্য। অভ্যাস গঠনের ক্ষমতা দিয়াই অধিকাংশ সহজ প্রবৃত্তি ব্যাখ্যা করা যায়। দৈহিক ক্রিয়ার সহিত জড়িত সহজ প্রবৃত্তি বাদ দিলে, মানুষের প্রধান সহজ প্রবৃত্তি হইয়া দাঁড়ায় আক্রমণ, প্রতিরক্ষণ এবং নাড়াচাড়া (ম্যানিপুলেশন্)।

সহজ প্রবৃত্তির অস্থায়িতা (ট্র্যান্‌জিটরিনেস্) এবং অনির্দিষ্টতা

স্পল্‌ডিং মুরগীশাবকের সহজ প্রবৃত্তির যে উদাহরণ দিয়াছেন তাহা হইতে ইহার অস্থায়িতা এবং অনির্দিষ্টতা প্রমাণিত হয়। মুরগীর বাচ্চা ডিম হইতে বাহির হইয়াই যে কোনো গতিশীল বস্তুর অনুসরণ করে, কিন্তু জন্মের প্রথম তিন চার দিন উহার চোখ ঢাকিয়া রাখিলে এইরূপ করে না। এইরূপ

১। ওয়াট্সন্ "সহজ প্রবৃত্তি" কথাটি মনোবিদ্যা হইতে তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী। তাঁহার মতে অবয়বীর সহিত পরিবেশের সম্বন্ধে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তাহার সাহায্যেই মনোবিদ্যার সকল প্রশ্ন মীমাংসা করা যায়। তিনি উগ্র পরিবেশবাদী। তাঁহার পরবর্তী কালের মত অবশ্য এতটা উগ্র নয়।

করিলে গতিশীল বস্তুর অনুসরণ প্রবৃত্তি উহার মাতাকে অনুসরণ করিবার অভ্যাসে পরিণত হইয়া অদৃশ্য হয়। তেমনই শিশুর কৌতূহল প্রবৃত্তি জ্ঞান অনুসন্ধান করিবার অভ্যাসে পরিণত হইতে পারে। সহজ প্রবৃত্তি অভ্যাস গঠনে সহায়তা করে।

যে বস্তু সহজ প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করে তাহা এক দিক দিয়া অনির্দিষ্ট। যেমন শিশুর শিকার প্রবৃত্তি খেলায় নিবদ্ধ হইতে পারে, অথবা উচ্চতর জ্ঞানের অনুসন্ধানে পরিণত হইতে পারে। অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তির বস্তুর নির্দিষ্টতা নাই। ইহা বদলাইতে (ট্রান্স্‌ফার্‌ড্‌) পারে।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

মেলোন্‌ অ্যাণ্ড্‌ ড্রামণ্ড্‌—এলিমেণ্টস্‌ অফ্‌ সাইকলজি—সপ্তম পরিচ্ছেদ

জি. এফ্‌. ষ্টাউট্‌—এ ম্যানুয়্যাল্‌ অফ্‌ সাইকলজি—তৃতীয় খণ্ড—প্রথম অংশ—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বোরিং, ল্যাংফেল্ড্‌, ওয়েল্ড্‌—ফাউণ্ডেশনস্‌ অফ্‌ সাইকলজি—তৃতীয়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উড্‌ওয়ার্থ্‌ অ্যাণ্ড্‌ মার্ক্‌ইস্‌—সাইকলজি —নবম, দশম পরিচ্ছেদ

Exercise

1. What do you mean by instinct ? Give examples of the process. (p. 341)
2. Define instinct and explain it with examples. (pp. 342-344)
3. State the main classes of instinct and give an example of each. (pp. 344-346)
4. How does instinct originate? Explain the different theories of the origin of instinct. (pp. 349-350)
5. Explain the psychological as distinguished from the biological theory of instinct. (pp. 350-353)
6. Are instincts blind ? Explain the relation of instinct and intelligence. (pp. 353-356)
7. Bring out the psychological nature of instinct. (pp. 356-358)
8. Distinguish between instincts of animals and those of man. (pp. 358-361)
9. State how McDougall defines instinct. How does he relate it to emotion ? Do you agree with his view ? (pp. 361-362)
10. Wite short notes on Drever's and Watson's view of instinct. (p. 363)
11. What do you mean by the transitoriness and transference of instincts ? (pp. 363-364)

বিংশ পরিচ্ছেদ

মনোযোগ—অ্যাটেন্‌শন্‌

১। মনোযোগের সংজ্ঞা

বিষয়ের সঙ্কোচ, অদল বদল এবং স্পষ্টতা বা বিশদতা

যে সার্বভৌম মানসক্রিয়ার ফলে চেতনার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া একটি কেন্দ্রবিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়, অপ্রাসঙ্গিক বিষয় হইতে চেতনা সরিয়া আসিয়া একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ হয় তাহাকে মনোযোগ বলে। আবার যে ক্রিয়ার ফলে চেতনার বিষয়গুলির মধ্যে অদল বদল (রি-ডিস্ট্রিবিউশন্‌) বা পুনর্বণ্টন ঘটে, একটি বিষয় চেতনার কেন্দ্রস্থ এবং স্পষ্টতম হয়, অপর বিষয়গুলি কেন্দ্র হইতে দূরে সরিয়া অস্পষ্ট চেতনার বিষয় হইয়া দাঁড়ায় তাহাকে মনোযোগ বলে। অথবা যে ক্রিয়ার ফলে চেতনার বিষয় স্পষ্ট ও বিশদভাবে ফুটিয়া ওঠে এবং ঐ সম্বন্ধে জ্ঞান সহজলভ্য হয় তাহাকে মনোযোগ বলে।

তাহা হইলে মনোযোগ চেতনার বিষয়কে সঙ্কুচিত (ন্যারোড্‌ ডাউন), পুনর্বিন্যস্ত (রি-ডিস্ট্রিবিউটেড্‌) ও বিশদ (ক্লিয়ার) করিয়া তোলে। চেতনা, সাধারণতঃ, অনেক বিষয়ে ছড়াইয়া থাকে, কাজেই উহার বিষয়গুলি অবিন্যস্ত এবং অস্পষ্ট থাকে। মনোযোগ চেতনাকে একটি বিষয়ে সংহত বা কেন্দ্রীভূত করে। ফলে অন্যান্য বিষয়গুলি চেতনাকেন্দ্রের বাহিরে চলিয়া যায় এবং কেন্দ্রীকৃত বিষয়টি সম্বন্ধে জ্ঞান স্পষ্ট ও বিশদ হইয়া ওঠে।

মনোযোগ একাধারে জ্ঞানাত্মক এবং ক্রিয়াত্মক

মনোযোগ একাধারে মনের জ্ঞানাত্মক এবং ক্রিয়াত্মক বৃত্তি। হ্যু ও প্রভৃতি মনোবিৎ মনোযোগের জ্ঞানাত্মক বা অবগতিমূলক রূপের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বস্তুর স্পষ্ট এবং বিশদ চেতনাই মনোযোগ। এফ্‌. এইচ্‌. ব্রাড্‌লে-এর মতেও মনোযোগ-ক্রিয়া কতগুলি সংবেদন এবং ধারণাসমষ্টি ছাড়া কিছু নয়। আবার কোনো কোনো মনোবিৎ, যেমন মড্‌স্‌লে, রিবো, মুয়েন্‌স্টারবার্গ্‌ প্রভৃতি, মনোযোগের ক্রিয়াত্মক রূপের উপর বেশী জোর দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কোনো বিষয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করিবার ক্রিয়াই মনোযোগ।

উপরোক্ত দুইটি মতের সমন্বয় করিয়া বলিতে হয় যে মনোযোগ শুধু অবগতিমূলক বা শুধু ক্রিয়াত্মক নয়, কিন্তু উভয়ই। মনোযোগে বস্তুর জ্ঞান স্পষ্ট এবং বিশদ হয় সত্য, কিন্তু এই ফল লাভ করিতে হইলে মনোযোগ রক্ষার চেষ্টা বা প্রয়াস করিতে হয়। লিখিবার সময় লেখাতেই মনোযোগ নিবদ্ধ। কিন্তু পাশের ঘরে রেডিওতে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত চলিতেছে সেই দিকেও মন আকৃষ্ট হইতেছে। দ্বিতীয় মনোযোগটিতে সাক্ষাৎভাবে কোনো প্রয়াস বা চেষ্টা নাই। কিন্তু প্রথম মনোযোগটি অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রয়াস অথবা চেষ্টা দরকার।

মনোযোগ অনুভূতিমূলক কিনা

কিন্তু মনোযোগ যেমন অবগতিমূলক এবং ক্রিয়াত্মক মানসবৃত্তি তেমনই বেদনা বা অনুভূতিমূলক কি? বেদনা বা অনুভূতি প্রধানতঃ নিষ্ক্রিয়, কিন্তু মনোযোগ সক্রিয় মানসবৃত্তি। কিন্তু ইহাদের এই পার্থক্য সত্ত্বেও বেদনা বা অনুভূতিহীন মনোযোগ ঘটে কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। **টিশ্‌নার** মনোযোগ ও বেদনাকে একই মনোবৃত্তির দুইটি দিক বলিয়া মনে করেন। একই কেন্দ্রীভূত চেতনার বাহিরের এবং ভিতরের দিক দুইটিই যথাক্রমে মনোযোগ এবং বেদনা। ভিতরের দিক হইতে যেমন কোনো বিষয়ের স্পষ্ট চেতনায় বেদনা, অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ অনুভূতি থাকে, তেমনই বাহিরের দিক হইতে উহাতে মনোযোগও থাকে। সুতরাং একই চেতনার দুইটি দিক হিসাবে বেদনাকে মনোযোগ হইতে অথবা মনোযোগকে বেদনা হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মনোযোগ-ক্রিয়া সহজসাধ্য হইলে সুখ এবং কষ্টসাধ্য হইলে দুঃখ অনুভূতি জন্মে। অধ্যাপক **স্টাউট্** ও বেদনা এবং মনোযোগকে সমকালীন মানসবৃত্তি বলিয়া মনে করেন।

সুতরাং মনোযোগ বলিতে বুঝায় সেই মানসবৃত্তি যাহাতে চেতনার নিজ বিষয়ে **কেন্দ্রীভূত হইবার ক্রিয়া বা চেষ্টা, বিষয়ের স্পষ্টতা বা বিশদতা জ্ঞান** এবং **কেন্দ্রীভূত হইবার** অল্পায়াস বা অধিক আয়াস অনুসারে সুখ-দুঃখ বেদনা বা অনুভূতি আছে। অথবা যে ইচ্ছাত্মক বৃত্তি জ্ঞানের স্পষ্টতা বা বিশদতা উৎপন্ন করে এবং সুখ-দুঃখ বেদনারূপে অনুভূত হয় তাহাই মনোযোগ।

২। উপরোক্ত সংজ্ঞার ব্যাখ্যা

ব্যুৎপত্তির দিক দিয়া কোনো বস্তুর সহিত মনের যোগকে মনোযোগ বলা যাইতে পারে। আশে পাশে, এমন কি সম্মুখে, অনেক বস্তু থাকিতে পারে যাহাদের সহিত মনের যোগ নাই। যে সকল বস্তুর সহিত মনের যোগ নাই উহাদের সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান বা চেতনা নাই। আবার যে সকল বস্তু সম্বন্ধে চেতনা বা জ্ঞান আছে, উহাদের সহিত অবশ্যই মনের যোগ আছে। সুতরাং **মনোযোগকে সাধারণভাবে সকল চেতনা বা জ্ঞানের সাধারণ কারণ বা রূপ বলা যাইতে পারে।** অনুভূতি, অবগতি এবং ক্রিয়া প্রভৃতি যে কোনো জাতীয় মানসবৃত্তিব সাধারণ এবং অপরিহার্য সহচর হইল মনোযোগ।

মনোযোগের সদর্থক এবং নঞর্থক দিক

মনোযোগ মনেব একটি ব্যাপক ধর্ম। কোনো না কোনো বস্তুতে মনোযোগ না দিয়া মন থাকিতে পারে কিনা সন্দেহ। মনোযোগের বস্তু অনবরত বদলাইতে পারে। এই পবিবর্তনে মনোযোগের পরিবর্তন হয় না, কিন্তু যে বস্তুতে মনোযোগ দেওয়া হয় তাহার পরিবর্তন হয়। যেমন গানে মনোযোগ না দিয়া পড়ায় মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে, অথবা খেলায় মনোযোগ না দিয়া লেখায় মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইলে অন্য বিষয় হইতে মনোযোগ সরাইয়া লইতে হয়। অর্থাৎ **মনোযোগের সদর্থক (পজিটিভ্) এবং নঞর্থক (নেগেটিভ্) এই দুইটি দিক থাকে।** কোনো বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উহার সদর্থক এবং অন্য বিষয় হইতে মনোযোগ সরাইয়া লওয়া উহার নঞর্থক দিক।

কোনো বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেতনা অন্যান্য বিষয় হইতে বিযুক্ত হইয়া উহাতেই সীমাবদ্ধ হয়। সুতরাং মনোযোগের সাক্ষাৎ ফল হইল **চেতনার ক্ষেত্র-সঙ্কোচ।** চেতনা স্বভাবতঃ অনেক বস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। মনোযোগের ফলে চেতনার ক্ষেত্র বা ব্যাপ্তি সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়—অর্থাৎ মাত্র একটি বিষয়ই চেতনাবৃত্তের কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অন্যান্য সকল বিষয় চেতনাকেন্দ্রের বাহিরে চলিয়া যায়। চেতনা আর নানা বিষয়ে ছড়াইয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয়।

মনোযোগের ফলে শুধু একটি বিষয়েরই স্পষ্ট চেতনা, কিন্তু চেতনাবৃত্তে অবস্থিত অন্যান্য বিষয়ের অস্পষ্ট বা আব্ছা চেতনা থাকে।

তাহা ছাড়া মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গে চেতনার বিষয়গুলিতে পুনর্বণ্টন বা পুনর্বিন্যাস ঘটে। ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ এই পাঁচটি বিষয় চেতনায় থাকিলে মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের মধ্যে একটি চেতনার কেন্দ্রে এবং বাকীগুলি উহার পশ্চাদ্‌ভূমিতে স্থান পরিবর্তন করে। যেমন 'ক'তে মনোযোগ নিবদ্ধ করিলে ঐটি চেতনাকেন্দ্রে আসে কিন্তু খ, গ, ঘ এবং ঙ উহার পশ্চাদ্‌ভূমিতে চলিয়া যায়। আবার 'খ'তে মনোযোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐটি চেতনার কেন্দ্রে উপস্থিত হয় এবং ক, গ, ঘ ও ঙ উহার পশ্চাদ্‌ভূমিতে অপসারণ করে।

দেখা যাইতেছে যে মনোযোগ চেতনাকে স্পষ্ট করে এবং জ্ঞানকে বিশদ করে, কারণ ইহার ফলে চেতনার বিষয়ে মন কেন্দ্রীভূত হয় এবং অন্যান্য বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। যেহেতু মনোযোগ উহার বিষয়কে চেতনার কেন্দ্রে আনিয়া উহাকে স্পষ্ট এবং বিশদ করিয়া তোলে, মনোযোগকে জ্ঞানের বিশদতার অপরিহার্য কারণ বলা যাইতে পারে।

৩। মনোযোগ এবং চেতনা (অ্যাটেন্‌শন্ অ্যাণ্ড্ কন্‌সাচ্‌নেস্)

মনোযোগ ও চেতনার সম্বন্ধ যে নিবিড় তাহাতে সন্দেহ নাই। চেতনা অনেক বিষয়কে অধিকার করিয়া থাকে। কিন্তু একই সময়ে সবগুলি বিষয়ের চেতনা স্পষ্ট থাকে না। যাহা চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে তাহাই স্পষ্ট চেতনার বিষয়। **মনোযোগ বলিতে স্পষ্ট চেতনা বুঝায়।** এই লক্ষণ অনুসারে অস্পষ্ট চেতনার বাকী বিষয়গুলি সম্বন্ধে চেতনা থাকিলেও মনোযোগ থাকে না। অর্থাৎ মনোযোগের ক্ষেত্র চেতনার ক্ষেত্রের তুলনায় সঙ্কীর্ণ। এই দিক দিয়া মনোযোগ মাত্রই চেতনা, কিন্তু চেতনা মাত্রই মনোযোগ নয়। শুধু স্পষ্ট চেতনাই মনোযোগ।

মনোযোগ এবং চেতনা সমব্যাপ্ত কিনা

কিন্তু মনোযোগ যদি চেতনার সাধারণ সহচর হয় তাহা হইলে উহাদের উল্লিখিত পার্থক্য সমর্থন করা যায় না। চেতনা যেমন উহার কেন্দ্রবিন্দুতে স্পষ্টতম, এবং ঐ বিন্দু হইতে চেতনাবৃত্তের পরিধি পর্যন্ত অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্ট-

তর হইয়া অস্পষ্টতম আকার ধারণ করে, মনোযোগেরও অনুরূপ মাত্রাভেদ ঘটিলে উহার সহিত চেতনার কোনো পার্থক্য থাকে না। যে বিষয়টিতে মনোযোগ নিবদ্ধ তাহা মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু এবং ঐ বিন্দু হইতে সরিতে সরিতে মনোযোগবৃত্তের পরিধি পর্যন্ত আসিলে উহার বিষয়গুলি ক্রমশঃ অস্পষ্টতর হইয়া অস্পষ্টতম আকার ধারণ করে। অর্থাৎ মনোযোগ ও চেতনার সহিত কোনো পার্থক্য থাকে না। সুতরাং স্পষ্ট চেতনাকে স্পষ্ট মনোযোগ এবং অস্পষ্ট চেতনাকে অস্পষ্ট মনোযোগ বলিতে হয়। এমন কোনো মানসবৃত্তি নাই যাহাতে কম বেশী পরিমাণে মনোযোগ নাই। যে মানসবৃত্তিতে মনোযোগ যত স্পষ্ট উহার চেতনা বা জ্ঞানও তত স্পষ্ট এবং যাহাতে মনোযোগ যত অস্পষ্ট তাহার চেতনাও সেই পরিমাণে অস্পষ্ট। ওয়ার্ড্ প্রভৃতিমনোবিৎ এইরূপ মত পোষণ করেন। তাহাদের মতে মনোযোগ মানসজীবনের সহিত সমব্যাপক এবং চেতনার সমার্থক।

মনোযোগ এবং চেতনাব অভিন্নতার বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে মনোযোগ ক্রিয়াত্মক বা সক্রিয় মানসবৃত্তি, কিন্তু চেতনা নিষ্ক্রিয়। চেতনা উৎপন্ন করিতে কোনো চেষ্টা বা ইচ্ছার দরকার হয় না। কিন্তু মনোযোগ একটি চেষ্টাত্মক বা ইচ্ছাত্মক ক্রিয়া।

উহারা সমব্যাপ্ত নয়

এই সকল বাদানুবাদ ছাড়িয়া মনোযোগকে স্পষ্ট চেতনা এবং উহার বিষয়কে চেতনার কেন্দ্রবিন্দুস্থ বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই পার্থক্যটুকু স্বীকার না করিলে মনোযোগেব বৈশিষ্ট্য বুঝিতে অসুবিধা ঘটে। চেতনা ও মনোযোগ মানসজীবনের সমব্যাপক অবস্থা, ওয়ার্ড্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌-গণের এই মত গ্রহণীয় নয়।

এক অর্থে সমব্যাপ্ত, আর এক অর্থে সমব্যাপ্ত নয়

মোটের উপর মনোযোগকে দুইটি অর্থে গ্রহণ করা যায়—যথা ব্যাপক অর্থ এবং সঙ্কীর্ণ অর্থ। প্রথম অর্থে মনোযোগ এবং চেতনাব কোনো পার্থক্য নাই। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে চেতনা ব্যাপক এবং মনোযোগ ব্যাপ্য। এই অর্থে কোনো বিষয়ে কেন্দ্রীভূত চেতনাই মনোযোগ। এই সঙ্কীর্ণ অর্থেই মনোযোগ কথাটি গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

৪। মনোযোগের প্রকৃতি

মনোযোগের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে ইহাতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায়। (১) মনোযোগ (ওয়ার্ড্ প্রভৃতির মতে) সমগ্র মানসজীবনের সহিত সমব্যাপক ক্রিয়া। (২) মনোযোগ উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া। ইহার উদ্দেশ্য হইল জ্ঞেয় বস্তুর অস্পষ্টতা দূর করিযা উহাকে স্পষ্ট ও বিশদ করিয়া তোলা। (৩) স্পষ্টভাবে জ্ঞেয় বস্তুর সহিত মনের উপযোজনও মনোযোগের উদ্দেশ্য। বিষয়ের জ্ঞান স্পষ্ট করিতে হইলে কিরূপে উহার সম্মুখীন হইতে হইবে অথবা কিরূপে উহার সহিত উপযোজন করিতে হইবে মনোযোগে তাহা নির্দিষ্ট হয়। (৪) মনোযোগের সহিত সুখদুঃখ বেদনা জড়িত থাকে। বাহিরের দিক হইতে যাহাকে মনোযোগ বলা হয় ভিতরের দিক হইতে তাহাই সুখ-দুঃখ রূপে অনুভূত হয়।

(৫) মনোযোগ বিষয় নির্বাচন করে। যে বিষয়টি উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল তাহাতে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যে বিষয়গুলি উহার প্রতিকূল সেইগুলি অপ্রাসঙ্গিক হিসাবে বর্জিত হয়। নির্বাচনের দিকটি মনোযোগের সদর্থক (পজিটিভ্) এবং বর্জনের দিকটি উহার নঞর্থক (নেগেটিভ্) দিক। প্রথমটিকে মনোযোগ বা অ্যাটেন্‌শন্ এবং দ্বিতীয়টিকে অমনোযোগ বা ইন্-অ্যাটেন্‌শন্ বলা হইয়া থাকে। (৬) মনোযোগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহা নিরন্তর পরিবর্তনশীল বা দোলায়মান (ফ্লাক্‌চুয়েটিং অর্ ফ্লিকারিং)। একটি দোলকের মত মনোযোগ নিয়ত আন্দোলিত হয়। ইহা অনবরত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিচালিত হয়, অথবা একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশে বিচরণ করে, কিন্তু কোনো বিষয়েই স্থিরভাবে বসিতে চায় না।

(৭) কিন্তু মনোযোগ দোলায়মান হইলেও একটি ধারাবাহিক (কন্‌টিন্যুয়াস্) বা নিরবচ্ছেদ এবং একত্ববিশিষ্ট (ইউনিফায়্ড্) ক্রিয়া। স্টাউট্ মনোযোগের ধারাবাহিকতা এবং একত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ করিলে বিষয়গুলি একটি শ্রেণী বা গুচ্ছরূপে, অথবা প্রত্যেকটি বিষয় অপরটির সহিত সম্বন্ধভাবে জ্ঞাত হয়। যেমন একসঙ্গে অনেকগুলি সংখ্যা বা বর্ণ উপস্থাপিত করিলে কতগুলি সংখ্যা বা বর্ণ জোটবদ্ধভাবে বা একত্বসূত্রে গ্রথিত এবং ধারাবাহিকভাবে দৃষ্ট হয়। (৮) উপরের বৈশিষ্ট্যটি অন্যভাবে প্রকাশ করিয়া বলা যায় যে

মনোযোগ উহার বিষয়গুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে—অর্থাৎ মনোযোগ একটি সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠাপক ক্রিয়া।

৫। মনোযোগ ও অমনোযোগ
(অ্যাটেন্‌শন্ অ্যাণ্ড্ ইন্-অ্যাটেন্‌শন্)

ব্যাপক অর্থে মনোযোগ মানসজীবনের সমব্যাপক ক্রিয়া। অর্থাৎ এমন মানসবৃত্তি নাই যাহাতে মনোযোগ নাই।

যে ব্যাপক অর্থে মনোযোগ মানসজীবনের সার্বভৌম ক্রিয়া তাহা গ্রহণ করিলে বলিতে হয় যে সংজ্ঞান তো বটেই, এমন কি সকল আসংজ্ঞান বৃত্তিতেও মনোযোগ ক্রিয়াশীল। কিন্তু সংজ্ঞান বৃত্তিতে মনোযোগের মাত্রা যত তীব্র এবং ইহার বিষয়ের জ্ঞান যত স্পষ্ট, আসংজ্ঞান বা অবচেতন বৃত্তিতে সেইরূপ নয়।

চেতনাবৃত্ত ও মনোযোগ

সঙ্কীর্ণ অর্থে স্পষ্টভাবে জ্ঞাত বিষয়ের চেতনাই মনোযোগ। মনোযোগে চেতনাবৃত্তের বহু বিষয়ের মধ্যে একটি কেন্দ্রস্থ (ফোকাস্‌ড্) হয় এবং অন্যান্য বিষয়গুলি চেতনাবৃত্তের কেন্দ্র হইতে দূরে অথবা চেতনা-পরিধির নিকট সরিয়া যায়। ফলে কেন্দ্রস্থ বস্তু তীব্র মনোযোগের এবং স্পষ্ট জ্ঞানের বিষয় হয় এবং পরিধিস্থ বস্তুগুলি কম মনোযোগের এবং অস্পষ্ট জ্ঞানের বিষয় হয়। আর যে বস্তুগুলিতে অল্পতর মনোযোগ থাকে তাহা অমনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

সুতরাং অমনোযোগ বা ইন্-অ্যাটেন্‌শন্ বলিতে মনোযোগের অভাব বুঝায় না, কিন্তু বুঝায় কম মাত্রায় বা অল্পতর মনোযোগ। পুস্তকটি লিখিতে গিয়া যে বিষয়টি বুঝানো হইতেছে তাহাই প্রকৃতপক্ষে মনোযোগের বিষয়, কারণ ইহাতেই অধিকতম মাত্রায় মনোযোগ নিবদ্ধ। লিখিবার বিষয়টি কিরূপে সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে লেখা যায়, বিষয়টি এই ভাবে না বুঝাইয়া অন্যভাবে বুঝাইলে কিরূপ হয় প্রভৃতি চিন্তাগুলিই মনোযোগের বিষয়। আবার যে কাগজে, যে ঘরে বা চেয়ারে বসিয়া, যে টেবিলে, যে আলোকে এবং যে সকল অন্য অবস্থায় লেখা চলিতেছে সেই সকল বিষয় সম্বন্ধেও চেতনা বা মনোযোগ রহিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়গুলি মনোযোগের কেন্দ্রে নাই, অথবা মনোযোগ ইহাদের উপর কেন্দ্রীভূত বা ফোকাস্‌ড্ হয় নাই।

ইহারা মনের আনাচে-কানাচে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে কিন্তু চেতনার পুরোভাগে স্পষ্টভাবে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। সুতরাং ইহাদের প্রতি মনোযোগ থাকিলেও অত্যন্ত অল্প মাত্রায় মনোযোগ অর্থাৎ অমনোযোগ আছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে অমনোযোগের অর্থ মনোযোগের অভাব নয় কিন্তু অল্পমাত্রায় মনোযোগ। চেতনার কেন্দ্রস্থ বিষয়টিই তীব্রতম মনোযোগের বিষয়, সুতরাং ইহার জ্ঞানও স্পষ্ট এবং বিশদতম। কিন্তু চেতনা-কেন্দ্রের বাহিরের বিষয়গুলি যে পরিমাণে কেন্দ্র হইতে দূরে সরিয়া পরিধির নিকটবর্তী হয় উহাদের প্রতি মনোযোগ এবং তাহার ফলে উহাদের স্পষ্টতাও ততই অল্প হইতে অল্পতর হইয়া ক্রমশঃ অল্পতম হয়।

অমনোযোগের অর্থ

তাহা হইলে অমনোযোগ বলিতে বুঝায় অল্প মাত্রায় মনোযোগ, অথবা সেই সকল বিষয়ে মনোযোগ যাহা মনোযোগের কেন্দ্র হইতে দূরে অথচ চেতনার বৃত্তে অবস্থিত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে এই বিষয়গুলিতে মনোযোগ নাই। এই বিষয়গুলিতেও মনোযোগ রহিয়াছে। কারণ ইহাদের মধ্যে একটি বিষয় মনোযোগের কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলে বিষয়টি পরিচিত বলিয়াই মনে হয়। এই পরিচিতি-বোধ প্রমাণ করে যে অমনোযোগের বিষয়গুলিতেও মনোযোগ ছিল, কারণ তাহা না হইলে উহারা যখন মনোযোগের কেন্দ্রে উপস্থিত হয় তখন অপরিচিত বলিয়া মনে হইত।

৬। মনোযোগের গোচর (রেঞ্জ্ অফ্ অ্যাটেন্‌শন্)

ব্যাপক অর্থে মনোযোগের ক্ষেত্র বা প্রসার মানসজীবনের সহিত সমব্যাপক, কিন্তু সঙ্কীর্ণ অর্থে ইহার প্রসার এইরূপ বিরাট নয়।

প্রশ্ন এই যে একসঙ্গে বা একই সময়ে কয়টি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব? কতগুলি বিষয় একসঙ্গে মনোযোগের গোচর করা যায়? একই সময়ে একাধিক বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যায় কি?

ক্ষণদৃক্ সাহায্যে পরীক্ষাফল

যদি একটি ক্ষণদৃক্ যন্ত্রের (ট্যাসিস্টোস্কোপ্) সাহায্যে পাত্রের নিকট কতগুলি সংখ্যা (ডিজিট্স্) বা বর্ণ (লেটার্স্) যুগপৎ উপস্থাপিত করিয়া

পরক্ষণেই সরাইয়া লওয়া হয় এবং পাত্রকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাহাকে কি কি সংখ্যা বা বর্ণ দেখানো হইয়াছে, তাহা হইলে পাত্র উহাদের কয়টি স্মরণ করিতে পারে? এই ক্ষেত্রে স্মরণই মনোযোগের গোচর পরীক্ষার উপায়, কারণ যে বিষয়ে মনোযোগ করা হয় তাহারই শুধু স্মরণ হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে **পাত্র সাধারণতঃ চার বা পাঁচটি হইতে ছয়টি পর্যন্ত সংখ্যা বা বর্ণের বেশী স্মরণ করিতে পারে না।** সুতরাং পরীক্ষা বা প্রয়োগ সাহায্যে নির্ণয় করা গেল যে মনোযোগের গোচর সাধারণতঃ চার হইতে ছয়টি বস্তুতে সীমাবদ্ধ থাকে। অবশ্য প্রতিভাবান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইহা যে আরও বেশী হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যুগপৎ এবং পূর্বাপর পদ্ধতি

উপরের পরীক্ষাটি **যুগপৎ পদ্ধতি** (সিমাল্‌ট্যানিয়স্ মেথড্) সাহায্যে করা হইয়াছে। অর্থাৎ, ইহাতে মনোযোগের বিষয়গুলি একই সময়ে উপস্থাপিত হইয়াছে। মনোযোগের গোচর পরীক্ষায় দ্বিতীয় পদ্ধতিটির নাম **পূর্বাপর উদ্দীপক** উপস্থাপিত করিবার পদ্ধতি (মেথড্ অফ্ সাক্সেসিভ্ স্টিমুলি)। একটি বেল্ মেট্রনোম্ বা মাত্রামাপক ঘণ্টা নির্দিষ্ট অল্প ব্যবধানে পর পর কয়েকবার দুই দফায় বাজানো হয় এবং পাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয়, প্রথম দফার ধ্বনির সংখ্যা দ্বিতীয় দফার ধ্বনি সংখ্যার সমান কি অসমান। এই পরীক্ষায়ও দেখা যায় যে পাত্র ছয়টির বেশী ধ্বনি ঠিকভাবে মনে করিতে পারে না সুতরাং এই পরীক্ষায়ও স্থির হইল যে মনোযোগ-গোচরের ঊর্ধ্বসংখ্যা ছয়টি বস্তুর বেশী নয়।

অবশ্য মায়ার্স মাত্রামাপক ঘণ্টার সাহায্যে একচতুর্থাংশ সেকেণ্ড ব্যবধানে পর পর শব্দ উপস্থাপিত করিয়া দেখিয়াছেন যে পাত্র আটটি পর্যন্ত শব্দের গুচ্ছ বুঝিতে পারে।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ

মনোযোগের গোচর বা রেঞ্জ্ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন হইতে পারে। দশ বৎসর বর্ষীয় শিশুর ক্ষেত্রে হয়ত ইহার সংখ্যা ছয়টির বেশী নয়। আবার আট বৎসর এবং চার বৎসর বয়স্ক শিশুর ক্ষেত্রে হয়ত ইহা যথাক্রমে পাঁচটি এবং চারটির বেশী নয়।

শোনা যায় যে জুলিয়াস্ সীজার্ একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারিতেন, যেমন তিনি তাঁহার লেখকদিগকে একসঙ্গে কয়েকখানি চিঠি বলিয়া যাইতেন। মহাত্মা গান্ধী এবং আরও অনেকেই এইরূপ একসঙ্গে একাধিক কাজে মন দিতে পারিতেন বলিয়া শোনা যায়।

হ্যামিল্টন্-এর পরীক্ষা

স্যার উইলিয়ম্ হ্যামিল্টন্ মনোযোগের গোচর পরীক্ষা করিবার জন্য মাটিতে কতগুলি মার্বেল ফেলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন এক পলকে কতগুলি মার্বেল দেখা যায়। এই পরীক্ষায় তিনি দেখিলেন যে মার্বেলের সংখ্যা ছয়টির বেশী না হইলে দ্রষ্টা উহাদের সংখ্যা বলিতে পারে।

আসলে মনোযোগের গোচর একটি বস্তু

সে যাহা হউক, আপাতদৃষ্টিতে মনোযোগের গোচর-সংখ্যা চার, পাঁচ, ছয়, সাত বা আট, যাহাই হউক না কেন, আসলে ইহা একটি। একই সময়ে সমান স্পষ্টভাবে একাধিক বিষয়ে মনোযোগ করা যায় কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। তবে যে উপরের পরীক্ষাগুলিতে চার, পাঁচ, ছয়, সাত বা আটটি বিষয়ে একসঙ্গে মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া দেখা গিয়াছে, উহারা আসলে অনেক-গুলি নয় কিন্তু একটি বস্তু। হ্যামিল্টন্ তাঁহার পরীক্ষায় দেখিয়াছেন যে মার্বেলগুলি একস্থানে গুচ্ছাকারে থাকিলেই একসঙ্গে দৃষ্ট হয়—উহারা পৃথক পৃথক অথবা দূরে দূরে থাকিলে একসঙ্গে দৃষ্ট হয় না। সংখ্যা, বর্ণ, শব্দ প্রভৃতি উদ্দীপকগুলি উপস্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির সাহায্যে নানাভাবে সম্বদ্ধ হইয়া একটি গুচ্ছ অথবা জোট-এর বিভিন্ন অংশরূপে জ্ঞাত হয়। ফলে উহারা একই সঙ্গে জ্ঞাত হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

দৈনন্দিন জীবনেও আমরা দেখিতে পাই যে একজন গায়ক হয়ত একই সঙ্গে গান গাহিতেছেন, বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেছেন, তবলা সঙ্গতের দিকে নজর রাখিতেছেন, আবার শ্রোতাদের দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখিতেছেন। তাহা হইলে গায়ক অবশ্যই একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন বলিয়া মনে হইতে পারে। একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে গায়কের মন আসলে কতগুলি আলাদা বস্তুতে নাই, কিন্তু রহিয়াছে একটি সমগ্র সঙ্গীতময় পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশে।

দোলকের মত মনের বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে দ্রুত সঞ্চরণ

আবার অন্য দিক দিয়াও বলা যাইতে পারে যে মনোযোগের গোচর একটি, কিন্তু একাধিক বিষয় নয়। যে ব্যক্তি একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ করিতেছেন বলিয়া মনে হয় তাঁহার মনোযোগ যে একসঙ্গে এবং সমভাবে সকল কাজগুলিতে নিয়োজিত এমন নয়। আসলে তাঁহার মনোযোগ এক সময়ে একটি বিষয়েই সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাঁহার মনোযোগ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে এত দ্রুত সঞ্চরণ করে, অথবা দোলকের মত এত তাড়াতাড়ি বিষয় বদলায় যে মনে হয় যেন তিনি একই সময়ে অনেক বস্তুতে মনোযোগী হইয়াছেন।

উপসংহার

সুতরাং মনোযোগের গোচর একসঙ্গে একটি বিষয় বা বস্তুর বেশী হইতে পারে না। একই সময়ে এবং সমান স্পষ্টভাবে একাধিক বিষয়ে মনোযোগ করা অসম্ভব। ন্যায়মতে মন অণুপরিমাণ, সুতরাং একই কালে একাধিক বস্তুতে মন দেওয়া সম্ভব নয়।

৭। মনোযোগের স্থায়িত্ব
(ডিউরেশন্ অফ্ অ্যাটেন্‌শন্)

মনোযোগ অস্থায়ী বা দোলায়মান। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে খুব অল্পক্ষণের জন্যই স্থিরভাবে মনোযোগ রক্ষা করা যায়।

মন চঞ্চল। অধ্যাপক উইলিয়ম্ জেম্‌স্ মনকে একটি চেতনা-প্রবাহ (স্ট্রীম্ অফ্ কন্‌সাচ্‌নেস্) বলিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও জ্ঞানকে একটি সন্ততি বা ধারা বলিয়াছেন। মনের নিয়ত পরিবর্তনশীলতার জন্য মনোযোগকে স্থির বা অচঞ্চল বলা যায় না। মনোযোগ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রবহমান এবং একই বিষয়ের বিভিন্ন দিকে বা অংশে সঞ্চরণশীল। ইহার স্বভাবই হইল অস্থায়িতা বা দোলায়মানতা।

কিন্তু হয়ত অনুশীলন সাহায্যে মনোযোগের ক্ষণিক স্বভাব সামান্য পরিমাণে সংশোধন করা যাইতে পারে। যোগিগণ বিষয়ে চিত্ত স্থির করিবার অভ্যাস করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের চিত্তের স্থৈর্য সাধিত হয় না। সেইজন্য তাঁহারা চিত্তবৃত্তি নিরোধকে যোগের স্বরূপ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। চিত্ত সক্রিয় থাকিলে স্ব স্ব রূপে অবস্থান-রূপ যোগ সম্ভব হয় না।

মনোযোগের স্থায়িতার উদাহরণ

মনোযোগের অস্থায়িতা কিরূপে বুঝা যাইতে পারে তাহার আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাউক। যেমন, কোনো বস্তুর গতি হয়ত অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কিন্তু উহাতে মনোযোগের হ্রাসবৃদ্ধি (ফ্লাক্চুয়েশন্) বা বিচলনের জন্য মনে হইতে পারে যেন ঐ গতির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতেছে। কান হইতে কয়েক ফুট্ দূরে একটি ঘড়ি রাখিলে মনে হয় যেন ঘড়িটির টিক্ টিক্ শব্দ কখনও স্পষ্ট, কখনও বা অস্পষ্টভাবে বাজিতেছে। ঘড়িটি কান হইতে আরও দূরে সরাইলে উহার টিক্ টিক্ শব্দ প্রথমে হয়ত ঠিক শোনা যায়, কিন্তু পরক্ষণেই উহা মিলাইয়া গিয়া আবার পরক্ষণেই ভাসিয়া ওঠে।

মনোযোগের স্থায়িতার প্রায়োগিক নির্ণয়

মনোযোগের স্থায়িত্ব বা আয়ুষ্কাল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বহু পরীক্ষা ও প্রয়োগ করা হইয়াছে। সকল পরীক্ষা বা প্রযোগের মোটামুটি ফল বা সিদ্ধান্ত এই যে একই বিষয়ে মনোযোগ স্থায়ী নয়, কিন্ত বিরামশীল মনোযোগ একই বিষয়ে একটানাভাবে চলে না, কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া চলে, অর্থাৎ একবার চলে, আবার বিরত হয়। **সামান্য কাল-ব্যবধানে উত্থান-পতন এবং হ্রাস-বৃদ্ধিই মনোযোগের স্বভাব।** কোনো সংবেদনে অত্যন্ত নিবিষ্ট মনোযোগের ফলেও ঐ সংবেদন স্পষ্ট থাকে না, কিন্তু পর্যাযক্রমে স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট হইয়া ওঠে— কারণ মনোযোগের ধর্মই হইল হ্রাস-বৃদ্ধি অথবা বিচলন।

ম্যাসন্‌স্ ডিস্ক্

এই পরীক্ষাকে বিজ্ঞান-সঙ্গত করিবার উদ্দেশ্যে **ম্যাসন্‌স্ ডিস্ক্ অথবা ম্যাসন্-এর ঘূর্ণায়মান চক্রফলক** ব্যবহৃত হইয়াছে। একটি শাদা ডিস্ক্ বা চক্রফলকের যে কোনো ব্যাসার্ধে কালো রংএর ভগ্ন রেখা আঁকিয়া উহাকে বিদ্যুৎ সাহায্যে ঘুরাইয়া দিলে প্রত্যেকটি কালো অংশ শাদা পটভূমির সহিত মিশিয়া এক একটি বৃত্তরেখার আকারে দৃষ্ট হয়। ঐ রেখাগুলির মধ্যে দূরবর্তী রেখাটিতে শাদার মিশ্রণ কম হওয়ায়, উহা অস্পষ্টতম দেখায়। সুতরাং উহা ইচ্ছামূলক মনোযোগের সাহায্যেই দেখা যায়। অন্যান্য রেখাগুলি স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, কাজেই ঐগুলিতে মনোযোগ করিবার চেষ্টা প্রয়োজন হয় না। অস্পষ্টতম রেখাটিতে মনোযোগ নিবদ্ধ করিলে মনোযোগের হ্রাস-বৃদ্ধি

(ফ্লাক্‌চুয়েশন্) ৪০ নং চিত্রে ম্যাসন্-এর ডিস্ক্ দেখানো হইল। এই পরীক্ষায় মনোযোগের হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব রাখিবার জন্য লেখনী গতিলিখ্ বা কাইমো-গ্রাফ্ যন্ত্রের উপর স্থাপন করা হয়। এই যন্ত্রে লেখনীটির সহিত বৈদ্যুতিক তার সংযোগ করিয়া উহাকে মনোযোগের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে উঠাইবার এবং নামাইবার জন্য পাত্রের নিকট যোজক-পট্ট বা কী-বোর্ড্ থাকে। রেখাটি অদৃশ্য হওয়া মাত্র পাত্র যোজক-পট্টের কী বা সুইচ্ টিপিয়া দেয়। ফলে লেখনীটি গতিলিখ্ যন্ত্রে লাগানো ধূম্রকৃষ্ণ কাগজে (স্মোক্‌ড্ পেপার) চলনশীল রেখায় মনোযোগের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে ঐ রেখার পতন এবং উত্থান লিপিবদ্ধ করে।

৪০ নং চিত্র
ম্যাসন্-এর ঘূর্ণায়মান চক্র

মনোযোগের হ্রাস-বৃদ্ধি-লিপিতে দেখা যায় যে কোনো বিষয়েই মনোযোগ একটানাভাবে চব্বিশ সেকেণ্ডের বেশী চলিতে পারে না এবং সাধারণতঃ ইহার স্থায়িত্ব পাঁচ, ছয় সেকেণ্ডের বেশী হয় না। অবশ্য টিশ্‌নার মনে করেন যে অনুশীলনের ফলে একাদিক্রমে দুই, তিন মিনিট তো বটেই, এমন কি দুই, তিন ঘণ্টা ধরিয়া মনোযোগের গতি অব্যাহত রাখিতে পারাও আশ্চর্যজনক নয়।[১]
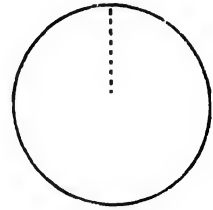
মনোযোগের অস্থায়িতার কারণ

মনোযোগের অস্থায়িতা আসলে মনোযোগেরই কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। দর্শন সংবেদনের ক্ষেত্রে মনোযোগের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ত অন্ততঃ আংশিকভাবে কনীনিকার বা চোখের পাতার স্পন্দন বা বিচলনের জন্য ঘটিতে পারে। আবার সকল ক্ষেত্রেই মনোযোগের হ্রাস-বৃদ্ধির আংশিক কারণ হয়ত রক্তের চাপ, শ্বাসক্রিয়া এবং অন্যান্য দৈহিক অবস্থা।

৮। মনোযোগের কারণ—কন্‌ডিশন্‌স্ অফ্ অ্যাটেন্‌শন্

মনোযোগ নানা কারণে ঘটে। এই কারণগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা (১) বিষয়গত (অব্‌জেক্‌টিভ্) কারণ, যাহার সাহায্যে

১ ই. বি. টিশ্‌নার—টেক্সট্ বুক অফ্ সাইকলজি—পৃঃ ২৯৩

মনোযোগের বিষয়কে অন্যান্ত বিষয় হইতে পৃথকভাবে বুঝা যাইতে পারে এবং (২) মানস বা পাত্রগত (সাব্‌জেক্টিভ্) কারণ, যাহা জ্ঞাতার মনোযোগ ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট। (৩) তাহা ছাড়া মনোযোগের দৈহিক কারণও আলোচ্য।

(১) বিষয়গত কারণ

বিষয়ের এমন কতগুলি ধর্ম থাকিতে পারে যাহার ফলে উহা মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন সংবেদনের ধর্মগুলিই অনেক সময় উহাকে মনোযাগের বিষয়রূপে উপস্থাপিত করে। উদ্দীপকের তীব্রতা (ইন্‌টেন্‌সিটি), উহাব ব্যাপকতা (এক্সটেন্‌সিটি), গুণ (কোয়ালিটি) উহাকে চেতনার কেন্দ্রে লইয়া আসে অথবা মনোযোগের বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। বাহিরের কারণগুলি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনোযোগ আকর্ষণ করে।

তীব্রতা

উদ্দীপক তীব্র হইলে চেতনা অধিকার করিতে পারে, যেমন উচ্চ শব্দ, উজ্জ্বল আলোক, তীব্র গন্ধ, স্বাদ বা স্পর্শ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সবলে মনোযোগ আকর্ষণ করে। উদ্দীপক দুর্বল হইলে উহার বেগ বা **তীব্রতার পরিবর্তনই** মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার পক্ষে যথেষ্ট হয়। কতগুলি দুর্বল উদ্দীপক হয়ত পৃথকভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না, কিন্তু একসঙ্গে যুক্ত হইলে অথবা **সমষ্টিগতভাবে** পারে। কোনো দুর্বল উদ্দীপক হয়ত চলিতে থাকাকালে মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না, কিন্তু হঠাৎ **বন্ধ হইলেই** উহা মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। একটি মৃদু টোকা অশ্রুত হইলেও, পুনরাবৃত্তির ফলে মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

ব্যাপকতা

উদ্দীপকের ব্যাপকতাও (এক্সটেন্‌সিটি) মনোযোগ আকর্ষণ করিবার কারণ হইতে পারে। যেমন **বস্তুর আকার** মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছোট বাড়ীর তুলনায় একটি বড় প্রাসাদ, অথবা ক্ষুদ্র জলাশয়ের তুলনায় বিরাট সমুদ্র বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে। **বস্তুর অবস্থান**ও মনোযোগের কারণ হয়। যেমন যে বস্তুটি চেতনার পুরোভাগে বা কেন্দ্রে

রহিয়াছে দূরের বস্তুর তুলনায় সেইটি মনোযোগ আকর্ষণ করে বেশী। অবশ্য বস্তুর চেতনা-কেন্দ্রে অবস্থানই যে উহাতে মনোযোগের সম্পূর্ণ কারণ তাহা নয়। কেন্দ্রের বাহিরে কোন গতি দেখিবামাত্র উহা মনোযোগ অধিকার করিতে পারে। সুতরাং **বস্তুর গতিও** উহাতে মনোযোগের আংশিক কারণ।

গুণ

সংবেদনের গুণ মনোযোগের একটি প্রধান কারণ। বস্তু উহার গুণের জন্য চেতনার প্রাধান্য বিস্তার করে। অন্য গুণের তুলনায় **কতগুলি গুণ** স্বভাবতঃ বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন তিক্ত স্বাদ অন্য স্বাদের তুলনায় বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু গুণ যে শুধু নিজ প্রভাবেই মনোযোগ আকর্ষণ করে তাহা নয়। **গুণের প্রাধান্য নির্ভর করে অনেকটা অন্য গুণের সহিত উহার বৈসাদৃশ্যের উপর।** যেমন কালো রং নিজ গুণে শাদা রং হইতে প্রধান না হইলেও, শাদা চাদরে কালির দাগ বা কালো বোর্ডের উপর শাদা চক্‌এর বিন্দু সহজেই মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

নূতনত্ব

পরিবর্তন বা নূতনত্ব বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে। শহরের লোক গ্রামের মুক্ত প্রান্তর অথবা শ্যামল বনরাজি দেখিয়া, আবার গ্রামের লোক শহরের চাকচিক্য দেখিয়া উহাতে মনোযোগী হয়। অথচ গ্রামের লোকের কাছে গ্রাম্য প্রকৃতি বা শহরের লোকের কাছে শহরের শোভা একঘেয়ে এবং অমনোযোগের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

নূতনের প্রতি মনোযোগের কারণ

নূতনের প্রতি মনোযোগের পিছনে জৈবিক প্রয়োজনও রহিয়াছে। নূতনের সম্মুখীন হইতে হইলে নূতন উপযোজনের এবং নূতন উপযোজন করিতে হইলে মনোযোগের দরকার। একঘেয়ে বা পুরাতন এবং অপরিবর্তিত উদ্দীপক মনোযোগ আকর্ষণ করে না, কারণ ইহার সহিত নূতন উপযোজনের প্রশ্ন নাই। মিল্‌-এর শব্দে বাহিরের লোকের কানে তালা লাগিবার উপক্রম হয়। আবার মিল্‌-কর্মীর কান ইহাতে অভ্যস্ত হওয়ায় এই শব্দ তাহার

মনোযোগ আকর্ষণ করে না। কিন্তু এই শব্দ বন্ধ হইয়া গেলেই বরং সে দিকে তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

গতি

বস্তুর গতি উহার একটি পরিবর্তন। নিশ্চল পারিপার্শ্বিক বস্তুর মধ্যে একটি বস্তুর সচলতা মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(২) মানসিক কারণ

মনোযোগ মানসিক কারণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়া থাকে। অসংখ্য উদ্দীপকের মধ্যে সবগুলিই মনোযোগ আকর্ষণ করে না, কিন্তু করে সেইগুলি যেগুলির প্রতি মনের **আকৃষ্ট হইবার মত পূর্বস্বভাব** (প্রি-ডিজ্‌পোজিশন্ টু বি ইন্‌টারেস্টেড্) আছে। মুরগী শাবক অনেক বস্তুর মধ্যে ছোট ছোট শস্যদানার প্রতি মনোযোগী হয়। বিড়াল বহু জিনিসের মধ্যে পাখীর গতিবিধিই বিশেষভাবে লক্ষ্য করে। সংবাদপত্রের বহু খবরের মধ্যেও কৃপণ টাকা পয়সার খবরগুলিই সহজে ও সর্বাগ্রে দেখে। বহু লোকের পায়ের শব্দের মধ্যেও মা তাঁহার প্রিয় সন্তানের অথবা প্রেমিকা তাহার প্রেমিকের মৃদু পদধ্বনি শুনিতে পান। আবার অনেক নামের মধ্যে নিজ নামটিই সর্বাগ্রে চোখে পড়ে। মাতা তাঁহার শিশুর সামান্য কান্নায় ঘুম হইতে জাগিয়া ওঠেন। আবার টাকার স্পর্শে কৃপণ ব্যক্তির গভীর ঘুমও ভাঙ্গিয়া যায়।

স্বাভাবিক আকর্ষণ

এই সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক আকর্ষণ মনোযোগের কারণ। বাহিরের কারণগুলি স্বাভাবিক আকর্ষণ। অথবা মানসিক কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদ্দীপকের গুণ, পরিমাণ, তীব্রতা, পরিবর্তন, নূতনত্ব, গতি প্রভৃতি বাহিরের কারণগুলি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে, কারণ ইহাদের প্রতি মনের স্বাভাবিক প্রবণতা রহিয়াছে।

(৩) দৈহিক কারণ

মনের এবং বহির্জগতের কারণগুলি ছাড়াও মনোযোগের দৈহিক কারণ উল্লেখযোগ্য। তীব্র উদ্দীপক মনোযোগ আকর্ষণ করে, কারণ উহার ফলে

নার্ভতন্ত্রে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। আবার উদ্দীপকের **কতগুলি গুণে** মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। কারণ এইগুলির প্রতি নার্ভতন্ত্রের বিশেষ প্রবণতা থাকে। যেমন কাহারও মনোযোগ হয়ত আকৃষ্ট হয় তিক্ত স্বাদে, মৃগনাভির গন্ধে, অথবা পীতবর্ণে। **পুনরাবৃত্ত উদ্দীপক** নার্ভতন্ত্রে সঞ্চিত প্রভাব বিস্তার করে। **আকস্মিক উদ্দীপকে** সেই সকল নার্ভ ক্রিয়া করে যেগুলি অন্য উদ্দীপকের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার ফলে উদ্দীপনা-প্রবণ থাকে। **গতিশীল উদ্দীপক** দ্রুতভাবে পরম্পরাক্রমে নার্ভ-অংশগুলিকে উদ্দীপিত করে, ফলে এই নার্ভ-অংশগুলির ক্লান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না এবং উদ্দীপকগুলির সঞ্চিত ফল উৎপন্ন হয়। **নূতন উদ্দীপকও** আকস্মিক উদ্দীপকের মত নার্ভতন্ত্রের উপর ক্রিয়া করে। আবার **যে উদ্দীপকের সহিত চেতনার বর্তমান অবস্থার সঙ্গতি আছে** তাহা নূতন না হইলেও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে, কাবণ ইহার ফলে যে অন্তর্বাহী নার্ভ-প্রবাহের সৃষ্টি হয় তাহা পূর্ব হইতে সক্রিয় নার্ভ-প্রবাহেব সহিত যুক্ত হইয়া উহার শক্তি বাড়ায়।

অনুষঙ্গ এলাকা

মনোযোগের দৈহিক কারণ আসলে মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ এলাকায় (অ্যাসো-সিয়েশন্ এরিয়া) নিহিত। এই দিক দিয়া দেখিলে, কোনো বস্তুতে বা ধারণায় মনোযোগ বলিতে বুঝায় সেই সকল নার্ভ-পথের ক্রিয়া যেগুলি ঐ বস্তুর জ্ঞান বা ধারণার অনুষঙ্গ এলাকার সহিত যুক্ত এবং সেই সকল নার্ভ-পথের নিষ্ক্রিয়তা যেগুলি উহার সহিত যুক্ত নয়। মস্তিষ্কের শক্তি সীমাবদ্ধ। ফলে, কোনো মস্তিষ্ক এলাকাব শক্তি বাড়িলে অন্যান্য এলাকার শক্তি কমিয়া যায়।

ক্রিয়াজ পরিবর্তন

উপরোক্ত দৈহিক কাবণগুলি ছাড়াও মনোযোগের আরও দৈহিক কারণ আছে। এইগুলিকে মনোযোগের কারণ না বলিয়া ইহার সহকারীও বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক মনোযোগক্রিয়ার সহিত কতগুলি **ক্রিয়াজ (মোটর) পরিবর্তন** ঘটে। যেমন, কোনো শব্দ শুনিতে হইলে ঐ শব্দের সহিত কান একই সুরে বাঁধা (অ্যাটিউণ্ড্) হয়, দেহ সটান (টেন্স্) হয়, রক্ত-সঞ্চালনের এবং শ্বাসক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে। শ্বাসক্রিয়ায় পরিবর্তন

শ্বাসলিখ্ (নিউমোগ্রাফ্) যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। এই লিপি হইতে দেখা যায় যে গভীর মনোযোগের ফলে স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। যেমন, ইহাতে শ্বাসক্রিয়া অগভীর (শ্যালো) এবং দ্রুত হয়, অথবা কখনও কখনও শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। আবার মনোযোগের ফলে নাড়ীর গতি ধীর হয় এবং রক্তসঞ্চালন ও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া নিয়মিত হয়।

প্রতিন্যাস্ এটিচুড্

মনোযোগের প্রস্তুতি হিসাবে দৈহিক ভঙ্গী অথবা প্রতিন্যাস (অ্যাটিচুড্) প্রয়োজন। ড্রিলিং বা স্কাউটিংএ শিক্ষার্থীকে "অ্যাটেন্শন!" বলিবামাত্র সে প্রস্তুতির দৈহিক ভঙ্গী অবলম্বন করে। সে কোনো বিষয়ে মনোযোগী হইবার প্রস্তুতি হিসাবে হাত, পা, ঘাড়, মাথা প্রভৃতির দৃঢ় ভঙ্গী গ্রহণ করে। যৌগিক আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি অঙ্গসংস্থানগুলিও মনোযোগের প্রস্তুতি।

৯। মনোযোগের মানসিক ফল

মনোযোগ কিরূপে চেতনা-বৃত্তে পরিবর্তন সাধন করে তাহা আলোচিত হইয়াছে। মনোযোগের ফলে চেতনার বৃত্ত কেন্দ্রে সঙ্কুচিত হয়। চেতনাবৃত্তের সঙ্কোচ-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে চেতনার বিষয়গুলি পুনর্বিন্যস্ত হয়, অর্থাৎ যে বিষয়টি কেন্দ্রের বাহিরে ছিল সেইটি কেন্দ্রে এবং যেটি কেন্দ্রে ছিল সেইটি কেন্দ্রের বাহিরে স্থানান্তর করে।

দুইটি প্রধান মানসিক ফল

মোটের উপর বলা যায় যে মনোযোগের প্রধান মানস ফল দুইটি। মনোযোগের গোটা জিনিসটির অংশগুলি, একটি অপরটি হইতে, পৃথকরূপে জানা যায়। অংশগুলি পরস্পর পৃথকরূপে জ্ঞাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি তাহাও স্পষ্টতরভাবে জ্ঞাত হয়। তাহা হইলে বিষয়কে সমগ্র বা একটি হিসাবে জানিতে পারা যেমন মনোযোগের ফল, তেমনই এই সমগ্র বিষয়ের অংশগুলিকে এবং উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে জানিতে পারাও মনোযোগের ফল।

বস্তুর বিশদতা ও স্পষ্টতা

সমগ্র বস্তুটি এবং উহার অংশগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ জানিতে পারিলেই বস্তু স্পষ্ট ও বিশদ আকার ধারণ করে। মনোযোগের ফলে বস্তু চেতনার কেন্দ্রে অবস্থিত হয় বলার অর্থ এই যে উহা স্পষ্ট এবং বিশদভাবে জ্ঞাত হয়। বস্তুর স্পষ্টতা বলিতে বুঝায় ইহার সামগ্রিক স্বচ্ছতা এবং বস্তুর বিশদতা বলিতে আরও বুঝায় চেতনাক্ষেত্রের পশ্চাদ্‌ভূমির (ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড্) পরিপ্রেক্ষিতে একটি নির্দিষ্ট আকাররূপে বস্তুর জ্ঞান। সবুজ গাছের পাতার আড়ালে একটি সবুজ পাখী বসিয়া থাকিলে উহাকে স্পষ্ট ও বিশদভাবে দেখা যায় না। এই ক্ষেত্রে পাখীটি পরিপ্রেক্ষির পশ্চাদ্‌ভূমিতে কেন্দ্ররূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে না, কারণ ইহাতে পশ্চাদ্‌ভূমিব সহিত কেন্দ্র একাকাব হইয়া রহিয়াছে এবং উহাদের পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্য কম।

অন্যান্য মানসিক ফল—বস্তুর একত্বজ্ঞান

সুতরাং মনোযোগের ফলে বস্তুর একত্ব (ইউনিটি) ফুটিয়া ওঠে। অবশ্য এই একত্ব মনোযোগের সৃষ্টি নয়। ইহা বস্তুরই ধর্ম। মনোযোগের ফলে বস্তুর অন্তর্নিহিত একত্ব স্পষ্ট ও বিশদভাবে জ্ঞাত হয়। বস্তুর অংশগুলির মধ্যে একত্ব পৃথকভাবে থাকে না। অংশগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ জানিবাব ফলেই বস্তুকে একটি বলিয়া মনে হয়। ত্রিভুজের তিনটি সরলরেখার কোনোটিই পৃথকভাবে ত্রিভুজ নয়। কিন্তু উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধে উৎপন্ন আকারটি ত্রিভুজ। তিনটি সরলরেখার বেষ্টনী একটি সম্পূর্ণ আকার (ক্লোজ্‌ড্ ফিগার) রূপে জ্ঞাত হয়, কিন্তু কোনো সরলরেখাই পৃথকভাবে একটি সমাপ্ত আকার নয়।

প্রতিরূপের সংরক্ষণ—স্মরণে সাহায্য

মনোযোগের ফলে বস্তুর স্পষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সুতরাং বস্তুর প্রতিরূপ (ইমেজ্) মনে দৃঢ়ভাবে ধৃত বা সংরক্ষিত হয়। প্রতিরূপের সুষ্ঠু ধারণ বা সংরক্ষণ (রিটেন্‌শন্) মনোযোগের একটি ফল। সুষ্ঠু ধারণের ফলে ঐ প্রতিরূপের স্মরণও সহজসাধ্য হয়। মনোযোগে বস্তুর অংশগুলির সম্বন্ধ জ্ঞাত হয়। এই অংশগুলির সম্বন্ধ জানিবার অর্থ উহাদের অনুষঙ্গ-সূত্রগুলি জানা। আবার অনুষঙ্গ-সূত্রে সম্বন্ধ প্রতিরূপ অল্পায়াসে স্মরণ করা যায়। সুতরাং মনোযোগ স্মরণ ক্রিয়াকেও সাহায্য করে।

আকর্ষণবৃদ্ধি

মনোযোগ যেমন আকর্ষণের উপর নির্ভর করে তেমন আকর্ষণও মনোযোগের উপর নির্ভর করে। মনোযোগের বিষয়টি স্পষ্ট এবং বিশদভাবে জানিবার ফলে উহার প্রতি আকর্ষণ বাড়ে।

উচ্চতর মানসবৃত্তির বিকাশ

মনোযোগের ফলে উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলির বিকাশ ঘটে। কোন বিষয়কে বুঝিবার উপায় হইল উহাতে মনোযোগ। বিষয় না বুঝিলে ধারণ বা সংরক্ষণ, স্মৃতি, কল্পনা, ধারণা, অবধারণ, যুক্তি প্রভৃতি অবগতিমূলক মানসবৃত্তিগুলির বিকাশ হয় না।

মানস বিকাশের ভিত্তি

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মনোযোগ মানস বিকাশের ভিত্তি। সংবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া যুক্তি পর্যন্ত সকল জ্ঞানাত্মক মানসক্রিয়ার মূল ভিত্তি হইল মনোযোগ।

১০। মনোযোগের প্রকারভেদ
(টাইপ্‌স্‌ অফ্‌ অ্যাটেন্‌শন্‌)

মনোযোগ নানা প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, যেমন তাত্ত্বিক (থিওরেটিক্যাল্‌) ব্যবহারিক (প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌), সংবেদীয়—বুদ্ধিমূলক প্রভৃতি।

(১) তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক মনোযোগ

উদ্দেশ্যের দিক দিয়া মনোযোগ দুই প্রকার, যথা তাত্ত্বিক (থিওরেটিক্যাল্‌) এবং ব্যবহারিক (প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌)। যে মনোযোগের উদ্দেশ্য উহার বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ও বিশদ জ্ঞান লাভ করা তাহাকে তাত্ত্বিক মনোযোগ বলে। এইরূপ মনোযোগ উহার বিষয়ে কোনো পরিবর্তন সাধন করিতে চায় না, কিন্তু উহার জ্ঞান লাভেই পরিসমাপ্ত হয়। যেমন নিছক জানিবার জন্যই পর্বতের উচ্চতা লক্ষ্য করিয়া দেখার নাম তাত্ত্বিক মনোযোগ।

আবার যে মনোযোগ শুধু বিষয়ের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে পরিসমাপ্ত না হইয়া বিষয়ের পরিবর্তন সাধনকে উহার উদ্দেশ্য করে, অথবা কোনো কার্যকরী ফল লাভ করিতে চায়, তাহাকে ব্যবহারিক বা কার্যকরী (প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌)

মনোযোগ বলে। যেমন পর্বতে আরোহণ করিবার উদ্দেশ্যে মনোযোগ দিয়া উহার উচ্চতা দেখার নাম ব্যবহারিক বা কার্যকরী (প্র্যাকৃটিক্যাল্) মনোযোগ।

(২) সংবেদীয়, বুদ্ধিমূলক এবং উহাদের মিশ্রিত মনোযোগ

আবার **বিষয়ের দিক দিয়াও** মনোযোগের প্রকারভেদ হইতে পারে। কোনো বিষয় অবলম্বন করিয়াই মনোযোগ ঘটে। এই দিক দিয়া মনোযোগ সংবেদীয় (সেন্‌সরিয়্যাল্), বুদ্ধিমূলক (ইন্‌টেলেকচুয়্যাল্) এবং এই উভয়ের মিশ্রণভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। মনোযোগের বিষয় সংবেদন হইলে উহাকে সংবেদীয় মনোযোগ বলা যায়। যেমন কোনো দর্শন, শ্রবণ সংবেদনে, অথবা রং বা শব্দে মনোযোগ সংবেদীয় মনোযোগের উদাহরণ। আবার মনোযোগের বিষয় কোনো ধারণা বা চিন্তা হইলে উহাকে বুদ্ধিমূলক মনোযোগ বলে—যেমন সূক্ষ্ম চিন্তাধারায় মনোযোগ। তৃতীয়তঃ, মনোযোগ এই দুইটির মিলিত ফলও হইতে পারে—যেমন শতরঞ্চ খেলায় মনোযোগ। এইস্থলে মনোযোগের বিষয় হইল দাবা খেলা। ইহাতে চিন্তন ও কল্পনায় মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয় শতরঞ্চ খেলার বিভিন্ন বলগুলির সংবেদন দ্বারা। এই তিন শ্রেণীর মনোযোগের মধ্যে দ্বিতীয়টিই সহজ, তৃতীয়টি তদপেক্ষা এবং প্রথমটি সর্বাপেক্ষা শক্ত।

(৩) ঐচ্ছিক, প্রতি-ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক মনোযোগ

আবার মনোযোগ প্রতিকূল অবস্থা বা বাধা অতিক্রম করিয়া উহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। **বাধা অতিক্রম করিয়া মনোযোগ** ঘটে কিনা তদনুসারে মনোযোগকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা ঐচ্ছিক (ভলাণ্টারি), প্রতি-ঐচ্ছিক (ইন্-ভলাণ্টারি) এবং অনৈচ্ছিক (নন্-ভলাণ্টারি) মনোযোগ।

যে মনোযোগ ইচ্ছাপূর্বক সাধিত হয় তাহাকে ঐচ্ছিক (ভলাণ্টারি অ্যাটেন্‌শন্) মনোযোগ বলে। ঐচ্ছিক মনোযোগ ইচ্ছা করিয়া অথবা সজ্ঞানভাবে কোনো উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ঘটে। কোনো বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ না থাকিলেও চেষ্টা করিয়া তাহাতে মন স্থির করিবার নাম ঐচ্ছিক মনোযোগ। যেমন তর্কবিদ্যার কোন শক্ত বিষয় বুঝিবার জন্য

হয়ত স্বাভাবিক আকর্ষণ নাই। ইহা বুঝিতে হইলে ইহাতে চেষ্টা করিয়া অথবা ইচ্ছাপূর্বক বা ঐচ্ছিক মনোযোগ করিতে হয়।

ঐচ্ছিক এবং প্রতি-ঐচ্ছিক মনোযোগের প্রভেদ

স্টাউট্ ঐচ্ছিক মনোযোগের আর একটি প্রকারভেদ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাকে তিনি বলিয়াছেন প্রতি-ঐচ্ছিক (ইন্-ভলাণ্টারি অ্যাটেন্‌শন্) মনোযোগ। এই মনোযোগ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটে। মনোযোগ করিবার ইচ্ছা নাই এমন অবস্থায় জোর করিয়া যে মনোযোগ করা হয় তাহাকে বলে **প্রতি-ঐচ্ছিক** মনোযোগ। যেমন তর্কবিদ্যার সমস্যাটি সমাধান করিবার যে স্বাভাবিক আকর্ষণ নাই শুধু তাহাই নয়, তদুপরি ইহাতে অনিচ্ছা আছে। এইরূপ বিপরীত ইচ্ছাকে অনুকূল ইচ্ছার দ্বারা পরাভূত করিয়া ঐ সমস্যা সমাধানে মনোযোগকে বলা যায় প্রতি-ঐচ্ছিক মনোযোগ।

তাহা হইলে ঐচ্ছিক এবং প্রতি-ঐচ্ছিক মনোযোগ উভয়ই স্বেচ্ছাকৃত মনোযোগ—অর্থাৎ উভয়ই ব্যাপক অর্থে ঐচ্ছিক বা ইচ্ছাকৃত মনোযোগের দুইটি প্রকারভেদ। ইহাদের পার্থক্য এই যে প্রথমটিতে কোনো বিপরীত ইচ্ছার সম্মুখীন হইয়া উহার বাধা অতিক্রম করিতে হয় না, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে হয়। অর্থাৎ, ঐচ্ছিক মনোযোগে ইচ্ছা ও অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নাই, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে আছে। প্রথমটিতে বিষয়ের প্রতি ইচ্ছা বা চেষ্টা করিয়া মনোযোগ করিতে হয়।

ঐচ্ছিক মনোযোগের তুলনায় প্রতি-ঐচ্ছিক মনোযোগ উচ্চতর

এখন প্রশ্ন এই যে ঐচ্ছিক মনোযোগে যদি বিপরীত ইচ্ছা নাই থাকে তবে মনোযোগের জন্য ইচ্ছা বা চেষ্টার প্রয়োজন কি। উত্তর এই যে ঐচ্ছিক মনোযোগের স্তরে বিপরীত ইচ্ছাটি সজ্ঞান বা চেতন স্তরে পৌছায় না, অর্থাৎ, সদর্থক ইচ্ছা নঞর্থক অনিচ্ছার মুখোমুখী দাঁড়ায় না, অথবা ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব থাকিলেও তাহা অস্পষ্ট বা অবচেতন থাকে। কিন্তু প্রতি-ঐচ্ছিক মনোযোগে সদর্থক ইচ্ছাটি যেমন প্রবল নঞর্থক ইচ্ছাটিও তেমনই প্রবল। এই ক্ষেত্রে নঞর্থক বা বিপরীত ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছা সদর্থক ইচ্ছাকে প্রবলভাবে বাধা দেয় এবং প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে বাধা দিয়া পরাভূত করে। সুতরাং

দেখা যাইতেছে যে ঐচ্ছিক বিকাশের ধারায় প্রতি-ঐচ্ছিক মনোযোগ ঐচ্ছিক মনোযোগের তুলনায় উচ্চতর স্থান গ্রহণ করে।

তাহা হইলে **ঐচ্ছিক মনোযোগকে বলা যায় ইচ্ছা-সহ মনোযোগ** অথবা যে মনোযোগ ইচ্ছার সহিত বর্তমান (অ্যাটেন্‌শন্ উইথ্ উইল্) এবং **প্রতি-ঐচ্ছিক মনোযোগকে বলা যায় ইচ্ছা-বিরুদ্ধ মনোযোগ** (অ্যাটেন্-শন্ এগেইন্‌স্ট্ উইল্)।

অনৈচ্ছিক মনোযোগ

এই দুইটি ঐচ্ছিক মনোযোগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক একটি তৃতীয় প্রকারের মনোযোগ হইতে পারে—যাহাকে বলা হয় অনৈচ্ছিক বা স্বতঃবৃত্ত মনোযোগ (নন্-ভলাণ্টারি অর্ স্পন্‌ট্যানিয়াস্ অ্যাটেন্‌শন্)। বিষয়ের নিজ শক্তিতে যে মনোযোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে বলে অনৈচ্ছিক মনোযোগ। এমন কতগুলি বস্তু আছে যাহা সবলে মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই বস্তুগুলিতে মনোযোগ না দেওয়ার অথবা উহাদিগকে বাধা দেওয়ার শক্তি নাই। তীব্র উদ্দীপক, যেমন উচ্চ শব্দ, উজ্জ্বল আলো, তীব্র স্বাদ ও গন্ধ, কঠিন চাপ, চরম তাপ, তীব্র বেদনা প্রভৃতি উদ্দীপকগুলি আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়া মনোযোগ অধিকার করে। বাধা যত প্রবলই হউক না কেন, ইহারা নিজ শক্তিতে মনোযোগের কেন্দ্রে উপস্থিত হয়—যাহার ফলে ইহাদিগের প্রতি মনোযোগী না হইয়া উপায় নাই। আবার উদ্দীপকের এমন কতগুলি গুণ আছে যেগুলি অনিবার্যরূপে মনোযোগ কাড়িয়া লয়। একই উদ্দীপক পুনরা-বৃত্ত হইলেও মনোযোগ অধিকার করে। আকস্মিক, গতিশীল, নূতন এবং বর্তমান অবস্থার সহিত সঙ্গতিশীল উদ্দীপক ও নিজশক্তিতে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে।

মুখ্য (প্রাইমারি) এবং পরোক্ষ মনোযোগ

এই জাতীয় অনৈচ্ছিক, স্বতঃবৃত্ত বা নিষ্ক্রিয় মনোযোগকে মুখ্য বা সাক্ষাৎ (প্রাইমারি অর্ ইমিডিয়েট্) মনোযোগ বলা যায়। ইহার বিষয়—তাহা সংবেদনই হউক অথবা চিন্তাই হউক—সবলে মনোযোগ কাড়িয়া লয়। অনৈচ্ছিক মনোযোগ মুখ্য বা সাক্ষাৎ না হইয়া পরোক্ষ, বা উৎপন্নও (মিডিয়েট্ অর্ ডিরাইভ্‌ড্) হইতে পারে। এই মনোযোগের বিষয় নিজস্ব শক্তিতে

মনকে আকর্ষণ করে না, কিন্তু করে অন্যান্য এমন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধের ফলে যেগুলির স্বাভাবিক আকর্ষণ বর্তমান। যেমন খেলার প্রতি পিতামাতার সাক্ষাৎ মনোযোগ না থাকিলেও, যেহেতু তাঁহাদের সাক্ষাৎ মনোযোগের বিষয়ীভূত পুত্র খেলিতেছে, সুতরাং তাঁহারা পুত্রের খেলায় পরোক্ষভাবে মনোযোগী হইতে পারেন।

১১। মনোযোগের স্তর

টিশ্‌নার প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণের মতে মনোযোগের তিনটি স্তর আছে। যথা—

অনৈচ্ছিক মনোযোগ—(প্রাইমারি) স্তর

প্রাথমিক (প্রাইমারি) মনোযোগের বিষয়ে মন স্বতঃবৃত্তভাবে আকৃষ্ট হয়। যেমন বজ্রনির্ঘোষ স্বাভাবিকভাবে মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। ইহা স্ব-বলে মনোযোগ আকর্ষণ করে বা কাড়িয়া লয়। সুতরাং অনৈচ্ছিক মনোযোগই মনোযোগের প্রাথমিক স্তর।

ঐচ্ছিক মনোযোগ—গৌণ (সেকেণ্ডারি) স্তর

ঐচ্ছিক মনোযোগ মনোযোগের দ্বিতীয় স্তর। ইহাতে বিষয় নিজস্ব শক্তিতে মনোযোগ কাড়িয়া লইতে পারে না। যেমন তর্কবিদ্যার কোনো সমস্যা স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণীয় নয় বা প্রাথমিক অনৈচ্ছিক মনোযোগের বিষয় নয়। তর্কবিদ্যার সমস্যা সমাধানে জোর করিয়া মনোযোগ প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে মনোযোগ করিবার তাগিদের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃ আকর্ষণীয় বস্তুতে মন সরাইয়া লইবার প্রবল আকর্ষণ থাকে। ঐচ্ছিকমনোযোগে মনোযোগী ব্যক্তি স্বাভাবিক আকর্ষণগুলি হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া ঈপ্সিত বস্তুতে মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে গিয়া সক্রিয় হয়। এই কারণে ঐচ্ছিক মনোযোগ হইল মনোযোগ বিকাশের দ্বিতীয় স্তর। টিশ্‌নার এই মনোযোগকে বলিয়াছেন গৌণ মনোযোগ (সেকেণ্ডারি অ্যাটেন্‌শন্)।

উৎপন্ন বা পরোক্ষ (ডিরাইভ্‌ড্, মিডিয়েট্)—অনৈচ্ছিক স্তর

উৎপন্ন বা পরোক্ষ (ডিরাইভ্‌ড্, মিডিয়েট্) স্বতঃবৃত্ত মনোযোগ মনোযোগের তৃতীয় স্তর। ইহা গৌণ বা ঐচ্ছিক মনোযোগের ফল। পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের

ফলে ঐচ্ছিক মনোযোগ অভ্যাসে পরিণত হইয়া স্বতঃবৃত্ত বা মুখ্য মনোযোগের আকার ধারণ করে। যেমন তর্কবিদ্যার সমস্যা সমাধানে ঐচ্ছিক মনোযোগের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে উহা স্বতঃবৃত্ত বা অনৈচ্ছিক মনোযোগে পরিণত হয়। এই অনৈচ্ছিক মনোযোগ মুখ্য বা প্রাথমিকভাবে স্বতঃবৃত্ত নয় কিন্তু ঐচ্ছিক ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন অথবা উহার পরোক্ষ ফল হিসাবে (ডিরাইভড্ প্রাইমারি)।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মনোযোগের তিনটি স্তর যথা অনৈচ্ছিক প্রাথমিক বা আসল স্বতঃবৃত্ত মনোযোগ, ঐচ্ছিক বা ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগ এবং ঐচ্ছিক মনোযোগ হইতে উৎপন্ন বা পরোক্ষভাবে অনৈচ্ছিক মনোযোগ। প্রথমটি সহজ ; দ্বিতীয়টি জটিল এবং আবার তৃতীয়টি সহজ।

১২। মনোযোগ ও আকর্ষণ (অ্যাটেন্‌শন্ অ্যাণ্ড্ ইন্‌টারেস্ট্)

মনোযোগ উহার বিষয়ের আকর্ষণের উপর নির্ভর করে। কতগুলি বিষয় স্বভাবতঃ মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু বিষয়ের আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা থাকিলেই হয় না। মনোযোগেরও আকৃষ্ট হইবার প্রবণতা থাকা চাই। যেমন অতি ক্ষুদ্র শস্যের দানা মুরগী শাবকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ইহারা প্রথমে যে কোনো ক্ষুদ্র বস্তুতেই আকৃষ্ট হইয়া উহা ঠোকরায়, কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে ইহারা ক্রমশঃ বিস্বাদ ক্ষুদ্র বস্তুগুলিকে বর্জন করিয়া, সুস্বাদু ক্ষুদ্র বস্তুগুলিতে ঠোক্‌রাইতে শিখে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ক্ষুদ্র বস্তুতে ঠোক্‌রানো মুরগী শাবকের মানস-স্বভাব। এই মানস-স্বভাবই তাহাকে ক্ষুদ্র বস্তুর প্রতি মনোযোগে প্রবৃত্ত করে।

ইচ্ছা ঐচ্ছিক মনোযোগের একটি প্রধান প্রেষক। ইচ্ছা অচেতন বা অবচেতন হইলে মনোযোগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চেতনা থাকে না। ঐচ্ছিক ইচ্ছা মনোযোগে স্পষ্ট এবং চেতনরূপ ধারণ করে। কিন্তু অনৈচ্ছিক মনোযোগের ইচ্ছা অজ্ঞাত প্রেষণা বিশেষ। এই অজ্ঞাত প্রেষণা বিভিন্ন স্তরে কাজ করিতে পারে, যেমন প্রেরণা, আবেগ, কামনা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি।

বেদনা (ফীলিং) ও আকর্ষণ

সুখ-দুঃখ অনুভূতিও মনোযোগের আকর্ষক। সুখবাদীরা (হিডনিস্ট্‌স্) বলিয়া থাকেন যে সুখ-দুঃখ বেদনাই আকর্ষণ বা ইন্‌টারেস্ট্। সুখ স্বতঃই

মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু দুঃখ হয়ত স্বয়ং সদর্থকভাবে (পজিটিভ্লি) মনোযোগ আকর্ষণ করে না, কিন্তু নঞর্থকভাবে (নেগেটিভ্লি) করে। অর্থাৎ মনোযোগ দুঃখে আকৃষ্ট হয় দুঃখ নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে। যেমন মাথাধরা মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই ক্ষেত্রে মনোযোগের উদ্দেশ্য হইল মাথাধরার প্রতিকার করা। কিন্তু সুখে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় উহাকে স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু একমাত্র বেদনাই মনোযোগের আকর্ষক হইতে পারে না। বেদনা নিক্রিয় (প্যাসিভ্) এবং পাত্রগত (সাব্জেক্টিভ্) অবস্থা, কিন্তু মনোযোগ সক্রিয় (অ্যাক্টিভ্) এবং বিষয়গত (অব্জেক্টিভ্) অবস্থাও বটে। সুখ-দুঃখ বেদনার মত নিক্রিয় এবং পাত্রগত অবস্থা মনোযোগের মত একটি ক্রিয়াত্মক এবং বিষয়গত অবস্থার আকর্ষণ হইতে পারে না।

আকর্ষণে সুখদুঃখ বেদনা অবশ্যই আছে, কিন্তু উহার সহিত ক্রিয়াপ্রবণতা বা সক্রিয়তাও আছে। শুধু সুখদুঃখ কর্মে প্রবৃত্ত করে না, কিন্তু নিক্রিয়ভাবে আকর্ষণ করে মাত্র। আবার সুখদুঃখ বেদনা অত্যন্ত তীব্র হইলে মনোযোগ অসম্ভব করিয়া তোলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আকর্ষণ শুধু বেদনাত্মক নয়, ইচ্ছাত্মকও বটে।

আকর্ষণ ও মনোযোগ সমার্থক নয়

কোনো কোনো মনোবিৎ আকর্ষণকে মনোযোগের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে আকর্ষণ থাকিলেই মনোযোগ ঘটে, আবার মনোযোগ থাকিলেই আকর্ষণ থাকে। কিন্তু আকর্ষণ এবং মনোযোগের এই সমীকরণ ঠিক বলিয়া মনে হয় না। আকর্ষণ থাকিলে মনোযোগ ঘটে ইহা সত্য। যে বস্তুতে আকর্ষণ আছে তাহাতে মনোযোগ হয় সন্দেহ নাই। যেমন সদ্যোজাত হংস শাবক জলের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করে বলিয়া জল দেখিলেই সে উহাতে মনোযোগী হয়। কিন্তু বিপরীত কথাটি সত্য নয়। অর্থাৎ এইরূপ বলা যায় না যে মনোযোগ থাকিলেই আকর্ষণ থাকিবে। বস্তুতঃ অনেক বিষয়ে আমরা ঐচ্ছিক মনোযোগ দিয়া থাকি যাহাতে আমাদের কোনো স্বাভাবিক আকর্ষণ নাই। যেমন চাকুরী করিতে গিয়া হয়ত অনেক নীরস অথবা স্বভাবতঃ আকর্ষণহীন বস্তুর প্রতি মনোযোগী হইতে হয়। যাহার অঙ্কে স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা থাকে তাহারও হয়ত বড় বড় যোগ বা গুণ অঙ্ক করিতে হয়।

বলা যাইতে পারে যে নীরস অঙ্কে মনোযোগ আকর্ষণ ছাড়া হয় না। আসল আকর্ষণ হয়ত জীবিকা অর্জন এবং ইহার সহিত চাকুরী অনুষক্ত হওয়ায় চাকুরীর অঙ্গ হিসাবে অঙ্কেও আকর্ষণ উৎপন্ন হয়।

এই ব্যাপক অর্থে আকর্ষণ পূর্ব স্বভাব (প্রি-ডিস্‌পজিশন্ টু বি ইন্‌টারেস্টেড্) এবং মনোযোগের সহিত অভিন্ন।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড—এলিমেণ্ট্‌স্ অফ্ সাইকলজি—৪র্থ, ৫ম পরিচ্ছেদ

জি. এফ্. ষ্টাউট্—এ ম্যানুয়্যাল্ অফ্ সাইকলজি—১ম খণ্ড—৩য়, ৫ম পরিচ্ছেদ

ই. বি. টিশ্‌নার্—এ টেক্সট্‌বুক্ অফ্ সাইকলজি—৭৫—৮৪ অনুচ্ছেদ

ঐ এ প্রাইমার্ অফ্ সাইকলজি—৫ম পরিচ্ছেদ

উড্‌ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড্ মাকু´ইস্—সাইকলজি—১১শ পরিচ্ছেদ

Exercise

1. Define attention. Analyse its nature with examples. (pp. 365-368)
2. Explain the relation of attention to consciousness. (pp 368-369)
3. What are the characteristics of attention ? (pp. 370-371)
4. What is inattention, psychologically speaking ? (pp. 371-372)
5. What is the range or span of attention ? Discuss some of the experimental methods employed in determining it. (pp. 372-375)
6. Is attention durable or does it fluctuate ? Explain the fluctuation of attention citing experimental evidences thereof. (pp. 375-377)
7. Why does attention fluctuate ? Discuss.
8. Explain the conditions of attention. What are the psychological, biological and physiological conditions of attention ? (pp. 377-382)
9. What are the bodily and mental effects of attention ? (pp. 382-384)
10. Explain and illustrate the different kinds of attention. (pp. 384-388)
11. Distinguish between voluntary, involuntary and non-voluntary attention. (pp. 385-387)
12. What are the different levels of attention ? Distinguish between voluntary, involuntary and non-voluntary attention. (pp. 388-389)
13. Explain the relation between attention and interest. (pp. 389-391)

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সংবেদন—গুণ ও পরিমাপ

১। সংবেদন কাহাকে বলে

সংবেদন একটি মৌলিক মানস বৃত্তি। **উদ্দীপক (স্টিমুলাস্) ইন্দ্রিয়ের (সেন্স্ অর্গ্যান্) সংবেদীয় বা অন্তর্মুখী (সেন্সরি, এফেরেণ্ট্) নার্ভের বহিঃপ্রান্তকে উত্তেজিত করিলে এবং সেই উত্তেজনা নার্ভ-প্রবাহের আকারে ঐ নার্ভ দিয়া মস্তিষ্ক বা মেরুমজ্জার কেন্দ্রে পৌঁছিলে ঐ উদ্দীপক সম্বন্ধে যে নিম্নতম চেতনা বা চেতনামাত্র (সিম্প্ল্ অর্ বেয়ার্ কন্‌সাচ্‌নেস্) ঘটে তাহাকে সংবেদন (সেন্‌সেশন্) বলে।**

সংবেদনের বিশ্লেষণ

সংবেদন ঘটিতে হইলে নিম্নলিখিত অংশ বা ফ্যাক্টরগুলি থাকা চাই। (১) উদ্দীপক (ষ্টিমুলাস্) যাহা ইন্দ্রিয়ের সংবেদীয় বা অন্তর্মুখী (সেন্সরি, এফেরেণ্ট) নার্ভের বহিঃপ্রান্তকে (পেরিফেরাল্ এক্স্‌ট্রিমিটি) উত্তেজিত বা উদ্দীপিত করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত। (২) ইন্দ্রিয়ের প্রান্তীয় যন্ত্র (এণ্ড্-অর্গ্যান্) অথবা সংবেদীয় নার্ভের বহিঃপ্রান্ত যাহা উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপিত হয়। (৩) সংবেদীয় নার্ভ যাহা নার্ভ-প্রবাহের (নার্ভাস্ ইম্‌পাল্‌স্) আকারে উত্তেজনা বহন করে। (৪) মস্তিষ্কে বা মেরুমজ্জায় অবস্থিত নার্ভকেন্দ্র, যেখানে সেন্সরি নার্ভের অন্তঃপ্রান্ত (সেন্‌ট্র্যাল্ এক্সট্রিমিটি) রহিয়াছে এবং যেখানে নার্ভপ্রবাহ শেষ হইয়া উত্তেজক বস্তু সম্বন্ধে সংবেদন জন্মায়। (৫) প্রতিক্রিয়া (রেস্‌পন্স্) যাহা উত্তেজনার ফলে ঘটে। প্রত্যেক সংবেদনেই ইন্দ্রিয় উদ্দীপকের সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া করে। যেমন একটি আলোক দর্শন সংবেদনের উদ্দীপক হইলে, চোখ ঐ আলোকের তীব্রতা বা ক্ষীণতা অনুসারে যথাক্রমে সঙ্কুচিত এবং প্রসারিত হয়।

(১) উদ্দীপক (ষ্ট্রিমুলাস্)

পর্যাপ্ত এবং অপর্যাপ্ত উদ্দীপক

উদ্দীপক সাধারণতঃ একটি শক্তি বিশেষ যাহা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ঘটাইতে সমর্থ। উদ্দীপক আবার দুই প্রকারের হইতে পারে, যথা পর্যাপ্ত উদ্দীপক

এবং অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক। যে উদ্দীপক ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিয়া একটি বিশেষ সংবেদন উৎপন্ন করিবার পক্ষে স্বভাবতঃ যথেষ্ট তাহাকে ঐ ইন্দ্রিয়ের এবং সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক (অ্যাডিকোয়েট্ স্টিমুলাস্) বলে। যেমন, ইথর-তরঙ্গ চক্ষুকে উত্তেজিত করিয়া দর্শন সংবেদন, বায়ুতরঙ্গ কর্ণকে উত্তেজিত করিয়া শব্দ সংবেদন, কোনো দ্রবণীয় পদার্থ (সলিউব্‌ল্ সাব্‌স্ট্যান্স্) জিহ্বার সংস্পর্শে আসিয়া স্বাদ সংবেদন এবং গ্যাসীয় উপাদান নাসিকাস্থ ঝিল্লীকে উত্তেজিত করিয়া ঘ্রাণ সংবেদন ঘটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত উদ্দীপক।

পক্ষান্তরে যে উদ্দীপক স্বভাবতঃ কোনো সংবেদন ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয় অথচ উহা উৎপন্ন করে, সেই উদ্দীপক ঐ সংবেদনের অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক (ইন্যাডিকোয়েট স্টিমুলাস্)। যেমন আঘাত বা আঘাতের আশঙ্কা ব্যথা সংবেদনের (পেইন্ সেন্‌সেশন্) পর্যাপ্ত উদ্দীপক। কিন্তু চক্ষুগোলকে (আই-বল্) আঘাত লাগিলে ঐ আঘাত চক্ষুতে শুধু ব্যথা সংবেদনই উৎপন্ন করে না, কিন্তু আলোক সংবেদনও উৎপন্ন করে। এই স্থলে আঘাত আলোক সংবেদনের অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক। আবার চর্মকে সূচীবিদ্ধ করা উহার ব্যথা সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক। কিন্তু চর্মের কোনো চাপবিন্দুকে (প্রেসার্ স্পট্) সূচীবিদ্ধ করিলে ঐ স্থানে ব্যথা সংবেদন না ঘটিয়া চাপ সংবেদন ঘটে। অথচ চাপ সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক ইহা নয়। চাপ সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক হইল চর্মের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ। সুতরাং এই স্থলে সূচীভেদ চাপ সংবেদনের অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক।

প্রত্যেক নার্ভ-এর বিশিষ্ট শক্তি—জোহানেস্ মুয়েলার

মোটের উপর বলা চলে যে, যে নার্ভের যে কাজ করিবার শক্তি আছে উহা উত্তেজিত হইলে ঐ বিশিষ্ট কাজই করে—উত্তেজক পর্যাপ্তই হউক অথবা অ-পর্যাপ্তই হউক। যেমন দর্শন-নার্ভের (অপ্‌টিক্ নার্ভ) উত্তেজনা যে উদ্দীপকের দ্বারাই হউক না কেন, উহা উত্তেজিত হইলে আলোক সংবেদনই উৎপন্ন করে। আবার কর্ণস্থ শ্রবণ-নার্ভ (অডিটরি নার্ভ্) যে কোনো উদ্দীপকের দ্বারাই উদ্দীপিত হউক না কেন, উহা উদ্দীপিত হইলে শ্রবণ সংবেদনই উৎপন্ন করে। অর্থাৎ প্রত্যেক নার্ভের এইরূপ একটি বিশিষ্ট ক্ষমতা থাকে যাহার গুণে উহা উহার বিশিষ্ট স্বভাব অনুযায়ী এক প্রকারের সংবেদনই উৎপন্ন করে। সংবেদনের নিয়ামক শুধু উদ্দীপক নয়, কিন্তু উদ্দীপিত নার্ভের

শক্তিও বটে। নার্ভের এই বিশেষ শক্তি বা ক্ষমতাকে জোহানেস্ মুয়েলার্-এর থিওরী অব্ স্পেসিফিক্ এনার্জি অব্ নার্ভস্ অথবা নার্ভ-এর বিশেষ শক্তির মতবাদ বলে।

২। সংবেদনের গুণ
(অ্যাট্রিবিউট্স্ অফ্ সেন্সেশন্)

সংবেদন বলিতে বুঝায় এক প্রকারের সহজতম চেতনা। এইরূপ চেতনার গুণ বা ধর্ম বুঝিলে উহা আর চেতনামাত্র বা সেন্সেশন্ থাকে না কিন্তু বিশিষ্ট চেতনা বা পার্সেপ্শন্ হইয়া দাঁড়ায়।

সংবেদন যে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার ফলে ঘটে অথবা যে উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহার ক্ষীণতা বা স্পষ্টতা, ব্যাপ্তি, স্থায়িত্ব প্রভৃতি গুণ অনুসারে উহার কতগুলি গুণ উৎপন্ন হয়।

সংবেদনের গুণ (অ্যাট্রিবিউট্) প্রধানতঃ দুইটি, যথা প্রকার (কোয়ালিটি) এবং পরিমাণ (কোয়াণ্টিটি)। দ্বিতীয় গুণটি আবার তিন প্রকার হইতে পারে—যথা, গভীরতা (ইন্টেন্সিটি), স্থায়িত্ব (প্রটেন্সিটি, ডিউরেশন্) এবং ব্যাপ্তি (এক্স্টেন্সিটি)। তাহা হইলে, সাকুল্যে সংবেদনের গুণ চারটি হইয়া দাঁড়াইল—যথা প্রকার, গভীরতা, স্থায়িত্ব এবং ব্যাপ্তি।

প্রকারগত গুণ (কোয়ালিটি)

যে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইবার ফলে সংবেদন ঘটে তাহার প্রকারের উপর উহার প্রকারগত গুণ (কোয়ালিটি) নির্ভর করে। যেমন চক্ষু উত্তেজিত হইলে দর্শন সংবেদন, কর্ণ উত্তেজিত হইলে শ্রবণ সংবেদন, ত্বক্ উত্তেজিত হইলে স্পর্শ সংবেদন, নাসিকা উত্তেজিত হইলে ঘ্রাণ সংবেদন এবং জিহ্বা উত্তেজিত হইলে স্বাদ বা রস সংবেদন উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রকারগত গুণের দিক হইতে সংবেদন কয়েক শ্রেণীর হইতে পারে। যত প্রকারের ইন্দ্রিয় আছে সংবেদনও তত প্রকারের।

সাধারণ (জেনারিক্) প্রকারগত গুণ

সংবেদনের উপরোক্ত প্রকারগত গুণকে সাধারণ (জেনারিক্) প্রকারগত গুণ বলা হয়, কারণ এই সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রকারগত গুণই অপরটির

তুলনায় জাতিতে বা প্রকারে ভিন্ন। এই ভিন্নতা নির্ভর করে যে ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হইবার ফলে ইহা ঘটে উহার প্রকার বা জাতিগত ধর্মের উপর। এইরূপে দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্বাদ এবং ঘ্রাণ সংবেদনগুলির সাধারণ প্রকারগত গুণ ভিন্ন, কারণ উহারা ভিন্নজাতীয় ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনার ফলে ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু একটি ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হইবার ফলে একই প্রকার সংবেদন উৎপন্ন হইলেও ঐ সাধারণ শ্রেণীর বা জাতির সংবেদন আবার নানা জাতির হইতে পারে। একই ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপিত হইবার ফলে যে একই জাতির বিভিন্ন উপজাতীয় সংবেদন ঘটে উহাদের ভেদ সাধারণ জাতিগত (জেনারিক্ ডিফা-রেন্স্) ভেদ নয় কিন্তু বিশেষ উপজাতীয় অথবা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপজাতির ভেদ। সংবেদনের এই উপজাতীয় গুণগত ভেদকে বিশেষ প্রকার-গত ভেদ (স্পেসিফিক্ ডিফারেন্স্) বলে।

একই চক্ষু ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপিত হইবার ফলে লাল, নীল, সবুজ, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণের সংবেদন হইতে পারে। সাধারণ (জেনারিক্) ভাবে এর বর্ণ-সংবেদনগুলি একজাতীয় অর্থাৎ দর্শনজাতীয় হইলেও, উহারা নানা প্রকারের দর্শন সংবেদন। সুতরাং ইহারা সাধারণ গুণের দিক দিয়া অভিন্ন হইলেও বিশেষ গুণের (স্পেসিফিক্ কোয়ালিটি) দিক দিয়া ভিন্ন। আবার একই শ্রবণ সংবেদনের বিভিন্ন উপজাতিগুলি, যেমন বেহালার শব্দ, তানপুরার শব্দ, সেতারের শব্দ প্রভৃতি সাধারণভাবে (জেনারিক্) সমজাতীয় হইলেও বিশেষ-ভাবে (স্পেসিফিক্) ভিন্ন, কারণ উহারা একই শব্দজাতীয় সংবেদনের বিভিন্ন উপজাতি।

পরিমাণগত গুণ (কোয়ান্টিটি)

সংবেদনের পরিমাণগত (কোয়ান্টিটেটিভ্) পার্থক্যও রহিয়াছে। একটি সংবেদন আর একটি হইতে শুধু জাতিতে বা প্রকারে নয়, কিন্তু পরিমাণেও পৃথক হইতে পারে। যেমন শব্দ সংবেদন মৃদু বা তীব্র হইতে পারে। মেঘ-গর্জন তীব্র, ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলা মৃদু শব্দ সংবেদন।

আবার পরিমাণগত পার্থক্যটিও নানাপ্রকার—যথা গভীরতা বা তীব্রতা (ইন্টেন্সিটি), স্থায়িত্ব (প্রটেন্সিটি বা ডিউরেশন্) এবং ব্যাপ্তি বা ব্যাপকতা (এক্সটেন্সিটি)।

(১) গভীরতা বা তীব্রতা

পরিমাণের প্রথম দিক্ হইল সংবেদনের তীব্রতা বা গভীরতা (ইন্‌টেন্‌সিটি)। দুইটি একজাতীয় সংবেদনের মধ্যে একটি তীব্র এবং অপরটি মৃদু হইতে পারে। যেমন প্রখর সূর্যালোক তীব্র এবং স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক মৃদু আলোক সংবেদন উৎপন্ন করে। আবার উত্তপ্ত এবং নাতিশীতোষ্ণ জলের সংস্পর্শ বজ্রের এবং ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ, সন্দেশের এবং মিষ্ট দধির মিষ্টতা স্বাদ, রজনীগন্ধার এবং গোলাপের ঘ্রাণ যথাক্রমে তীব্র এবং মৃদু আলোক, তাপ, শব্দ, স্বাদ এবং ঘ্রাণ সংবেদন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সংবেদনের পরিমাণগত গভীরতা বা তীব্রতা নির্ভর করে উহার উদ্দীপকের গভীরতার উপর। উদ্দীপক তীব্র হইলে সংবেদনও তীব্র হয় এবং উহা মৃদু হইলে সংবেদন মৃদু হইয়া থাকে।

(২) স্থায়িত্ব বা স্থিতিশীলতা

সংবেদনের দ্বিতীয় পরিমাণগত গুণ উহার স্থায়িত্ব বা স্থিতিশীলতা (ডিউরেশন্, প্রটেন্‌সিটি)। প্রত্যেক সংবেদনই কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ঘটিয়া কিছুক্ষণ স্থায়ী হয় এবং পরে বিলুপ্ত হয়। বর্তমানতা সংবেদনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু বর্তমান বিন্দুমাত্র নয়। ইহা ভবিষ্যতের গর্ভ হইতে আবির্ভূত হয় এবং অতীতের অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়। সংবেদনের বর্তমানতাবোধ কাল-জ্ঞানের ভিত্তি।

সংবেদনের স্থায়িত্ব বা স্থিতিকাল নির্ভর করে উহার উত্তেজকের স্থায়িত্বের উপর। যে গানটি অনেকক্ষণ চলিতে থাকে তাহার শব্দ সংবেদন অনেকক্ষণ স্থায়ী। আবার যে গানটি আরম্ভ হইয়াই থামিয়া যায় তাহার শব্দ সংবেদন অল্পক্ষণ স্থায়ী। বিদ্যুতের ঝলক একবার চমকাইয়া থামিয়া যায়, সুতরাং ইহার দর্শন সংবেদন অল্পক্ষণ স্থায়ী। আবার সূর্যালোক সূর্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকে, সুতরাং ইহার দর্শন সংবেদন বেশীক্ষণ স্থায়ী। অন্যান্য জাতীয় সংবেদনেরও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

(৩) ব্যাপকতা বা বিস্তার

সংবেদনের পরিমাণগত তৃতীয় গুণটি হইল ব্যাপকতা বা বিস্তার (এক্সটেন্‌সিটি)। সংবেদনের যে শুধু গভীরতা এবং স্থায়িত্বরূপ পরিমাণগত ভেদই

আছে তাহা নয়, কিন্তু ব্যাপকতা বা বিস্তাররূপ পরিমাণগত ভেদও রহিয়াছে।

স্পর্শ ও দর্শন সংবেদনের ব্যাপকতা

উত্তেজকের অথবা উত্তেজিত দেহাংশের বেশী বা কম ব্যাপ্তি অনুসারে সংবেদনেরও বেশী বা কম ব্যাপ্তি ঘটে। যেমন লাল রং-এর একটি ছোট টুক্‌রা দেখিয়া যে দুইটি বর্ণ বা রং-সংবেদন উৎপন্ন হয় উহার প্রথমটি কম এবং দ্বিতীয়টি বেশী বিস্তার বা ব্যাপকতা—(এক্সটেন্‌সিটি)—বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। আবার, প্রথমে মাত্র অঙ্গুলীর অগ্রভাগ এবং পরে ঐ অংশ হইতে কনুই পর্যন্ত সমস্ত হাতটি গরম জলে ডুবাইলে পর পর যে দুইটি তাপ-সংবেদন হয় তাহার প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা ব্যাপ্তিতে কম, আবার দ্বিতীয়টি প্রথমটি হইতে ব্যাপ্তিতে বেশী।

অন্যান্য সংবেদনের ব্যাপকতা

স্পর্শ এবং দর্শন সংবেদন যে এই ব্যাপ্তি বা এক্সটেনসিটি গুণের বিশেষ অধিকারী তাহাতে মতভেদ নাই। কিন্তু অন্যান্য সংবেদনের ব্যাপ্তি আছে কিনা এই বিষয়ে মতভেদ আছে। অধ্যাপক উইলিয়ম্‌ জেম্‌স্‌-এর মতে সকল সংবেদনেরই ব্যাপকতা গুণটি আছে। তিনি বলেন যে প্রসার (ভলিউম্‌ স্প্রেড্‌-আউট্‌নেস্‌) বা বিস্তৃতি (ম্যাসিভ্‌নেস্‌) প্রত্যেক সংবেদনেরই ধর্ম। যেমন **শব্দ সংবেদনের** এই গুণ আছে, কারণ শব্দ খানিকটা জায়গা জুড়িয়া থাকে বা পরিব্যাপ্ত করে। ষাঁড়ের ডাক, অথবা সিংহ ও বাঘের গর্জন বহুদূর পর্যন্ত স্থানে ব্যাপ্ত হয়। আবার চড়াই পাখীর আওয়াজ অত্যন্ত অল্প স্থানেই ব্যাপ্ত হয়।

ঘ্রাণ বা গন্ধ এবং রস বা **স্বাদ** সংবেদনও অল্পাধিক স্থান ছড়াইয়া থাকে। সন্ধ্যায় বাগানে ঢুকিলে হাস্‌নাহানা বা রজনীগন্ধার গন্ধ অনেক দূর হইতেই পাওয়া যায়, আবার কোনো কোনো ফুল নাকের খুব নিকটে না আনিলে উহার গন্ধ পাওয়াই যায় না। কোনো কোনো আস্বাদনে মুখের ভিতরকার সবটাই ভরিয়া যায়, আবার কোনো কোনো আস্বাদন জিহ্বার ডগা স্পর্শ করে মাত্র।

এইরূপে জেম্‌স্‌-এর মতে ব্যাপ্তি বা বিস্তার সকল সংবেদনেরই একটি সাধারণ গুণ।

অপর পক্ষে আধুনিক প্রয়োগ—মনোবিদ্যার (এক্স্‌পেরিমেণ্ট্যাল্‌ সাইকলজি) গৃহীত মত অনুসারে জেম্‌স্‌-এর উপরোক্ত যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়। এই মতানুসারে দর্শন এবং স্পর্শ, বিশেষ করিয়া চাপ-সংবেদন ছাড়া, অন্য কোনো সংবেদনের ব্যাপ্তি বা বিস্তার নাই। টিশ্‌নার প্রভৃতি প্রায়োগিক মনোবিদ্‌-গণের মতে প্রধানতঃ এই দুইটি সংবেদনেরই ব্যাপ্তি আছে, কিন্তু শ্রবণ, স্বাদ এবং ঘ্রাণ সংবেদনের নাই।

অন্যান্য গুণ

অনেকের মতে উপরোক্ত গুণগুলি ছাড়াও সংবেদনের আরও কতগুলি গুণ আছে। এই গুণগুলির মধ্যে স্পষ্টতা (ক্লিয়ারনেস্‌) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কোনো কোনো মনোবিৎ মনে করেন যে স্পষ্টতা সংবেদনের একটি প্রধান গুণ। স্পষ্টতা সেই গুণ যাহার ফলে সংবেদন চেতনায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। সংবেদনের স্পষ্টতা আছে বলিয়াই উহা চেতনার উপর প্রাধান্য স্থাপন করে অথবা মনোযোগ আকর্ষণ করে। অথবা সংবেদনে মনোযোগ করার ফলে উহার যে পরিবর্তন ঘটে তাহাই উহার স্পষ্টতা।

৩। সংবেদনের প্রকারভেদ

উদ্দীপিত ইন্দ্রিয় অনুসারে ভেদ

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য অনুসারে সংবেদন নানাপ্রকার। যেমন চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা হইতে যে সংবেদন ঘটে তাহার নাম দর্শন-সংবেদন, কর্ণেন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা হইতে যে সংবেদন ঘটে তাহার নাম শ্রবণ-সংবেদন। অনুরূপভাবে ত্বক, জিহ্বা এবং নাসিকা এই তিনটি ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা হইতে যে সংবেদনগুলি উৎপন্ন হয় উহার যথাক্রমে স্পর্শ, স্বাদ এবং ঘ্রাণ সংবেদন।

উদ্দীপক অনুসারে ভেদ

আবার উপরোক্ত পাঁচটি সংবেদনের শ্রেণীবিভাগ উহাদের উদ্দীপকের তারতম্য অনুসারেও করা যাইতে পারে। যেমন যে সংবেদন ইথর তরঙ্গের উদ্দীপনায় ঘটে তাহার নাম দর্শন সংবেদন এবং যে সংবেদন বায়ুতরঙ্গের

উদ্দীপনায় ঘটে তাহার নাম শ্রবণ সংবেদন। তেমনই তাপ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, চর্মের ক্ষতি বা ক্ষতির আশঙ্কা, যথাক্রমে তাপ, চাপ ও ব্যথা নামক স্পর্শ সংবেদন উৎপন্ন করে এবং দ্রবণীয় বস্তু ও গ্যাসীয় কণা যথাক্রমে স্বাদ এবং ঘ্রাণ সংবেদন জন্মায়।

বাহ্য এবং আন্তর ভেদে সংবেদন-ভেদ

আবার অন্য দিক দিয়া উপরোক্ত পাঁচটি বিশেষ সংবেদন (স্পেশ্যাল সেন্‌সেশন্) ছাড়াও সংবেদনের আরও বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীভেদ করা যাইতে পারে। যেমন উদ্দীপকটি বাহ্য অথবা আন্তর এই ভেদ অনুসারে সংবেদনকে বাহ্য (এক্স্‌টার্ন্যাল্), এবং আভ্যন্তর (ইন্টার্ন্যাল্) অথবা যান্ত্রিক (অর্গ্যানিক্), এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যে সকল সংবেদন বাহ্য উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন হয় উহাদিগকে **বাহ্য সংবেদন** বলে ; আবার যে সকল সংবেদন আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক সাহায্যে উৎপন্ন হয় উহাদিগকে আভ্যন্তরীণ বা **যান্ত্রিক সংবেদন বলে।** যেমন দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্বাদ ও ঘ্রাণ বাহ্য সংবেদন, কারণ উহারা ইথর-তরঙ্গ, বায়ু-তরঙ্গ, তাপাদি, দ্রবণীয় পদার্থ, গ্যাসীয় কণা প্রভৃতি বাহ্য উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ক্লান্তি, মাথাঘোরা প্রভৃতি যান্ত্রিক সংবেদনগুলি দেহযন্ত্রের নানা আভ্যন্তরীণ উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অন্যান্য সংবেদন

উপরোক্ত সংবেদনগুলির অতিরিক্ত আরও কতগুলি সংবেদন আছে, যেমন পেশী সংবেদন (মাস্কুলার্ সেন্‌সেশন্), সন্ধি সংবেদন (জয়েন্ট, টেন্‌ডিনাস্ সেন্‌সেশন্), বন্ধনী সংবেদন (আর্টিকুলার সেন্‌সেশন্) প্রভৃতি।

আবার কোনো কোনো ইন্দ্রিয় একাধিক সংবেদন উৎপন্ন করিতে পারে। যেমন কর্ণ শুধু যে শ্রবণ-সংবেদনই উৎপন্ন করে তাহা নয়, কি অন্যান্য সংবেদনও উৎপন্ন করে। কর্ণের আভ্যন্তরীণ অংশ, যাহাকে অর্ধবৃত্তনালী (সেমিসার্কুলার কেন্যাল্) বলে, তাহা উত্তেজিত হইলে মাথাঘোরার (ভার্টিগো) উৎপত্তি হয়। এই কর্ণাংশটিকে স্থিরতা সংবেদনের ইন্দ্রিয়ও (স্ট্যাটিক্ সেন্স্) বলা হইয়া থাকে, কারণ ইহার উত্তেজনা দেহের সাম্যবোধ (সেন্স্ অফ্ ইকুইলিব্রিয়াম্)

উৎপন্ন করে। কেহ কেহ অর্ধবৃত্তনালীর এই সংবেদনকে যান্ত্রিক সংবেদনও বলিয়া থাকেন।

৪। সংবেদনের ব্যাপ্তি—স্থানীয় সঙ্কেত (লোক্যাল্ সাইন্)

ব্যাপ্তি গুণটি প্রধানতঃ স্পর্শ এবং দর্শন সংবেদনেরই ধর্ম। স্পর্শ সংবেদনে চর্মের যে বিন্দুগুলি (স্পট্‌স্) উদ্দীপিত হয় উহাদের প্রত্যেকটির সংবেদন অপরটির সহিত যুক্ত হইয়া একটি সমষ্টিগত চর্ম-সংবেদন উৎপন্ন করে। কিন্তু এই সমষ্টিগত স্পর্শ সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি চর্মবিন্দুর সংবেদন পৃথকভাবেও ঘটিয়া থাকে। এইরূপ ঘটিবার মূলে থাকে প্রত্যেকটি চর্মবিন্দুর স্থানীয় বা দৈশিক স্বাক্ষর বা চিহ্ন (লোক্যাল্ সিগ্‌নেচার্, লোক্যাল্ সাইন্)। **উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়ের যে ধর্ম থাকিবার ফলে উহা উদ্দীপিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় তাহাকে উহার স্থানীয় সঙ্কেত বলে।**

যেমন পায়ের আঙুলের কোনো বিন্দু উদ্দীপিত হইলে যে সংবেদন হয় তাহার সহিত আমরা হাতের আঙুলের কোনো বিন্দুর উদ্দীপনা-প্রসূত সংবেদনকে একাকার করিয়া ফেলি না। আমরা প্রথম সংবেদনটিকে পায়ের আঙুলের কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুর এবং দ্বিতীয়টিকে হাতের আঙুলের কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুর সংবেদন রূপে পৃথকভাবে বুঝিয়া থাকি। প্রত্যেক চর্মবিন্দুর নিজস্ব দৈশিক সংবেদন বা বোধ আছে এবং তাহা আছে বলিয়াই ঐ স্থানের সংবেদনকে অন্য স্থানের সংবেদন হইতে পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। চর্ম সংবেদনের এই দৈশিক নির্দেশ বা সঙ্কেতই দেশ বা স্থান প্রত্যক্ষের মৌলিক ভিত্তি। বিষয়টি প্রত্যক্ষ শীর্ষক পরিচ্ছেদে আরও স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইবে।

আবার দর্শন সংবেদনেরও এইরূপ দৈশিক নির্দেশ বা স্থানীয় সঙ্কেত আছে। ইহা থাকিবার ফলেই কোনো বস্তু দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি উহা কোন্ স্থানে অবস্থিত। বস্তুর যে অংশ অক্ষিপটস্থ পীতবিন্দুর ডান দিকে প্রতিবিম্বিত হয় উহা ডান দিকে, এবং যে অংশ উহার বাম দিকে প্রতিবিম্বিত হয় উহা বামদিকে দৃষ্ট হয়। আবার বস্তুর যে অংশ ঐ বিন্দুর উপরিভাগে এবং নিম্নভাগে প্রতিবিম্বিত হয় তাহা যথাক্রমে উপরে এবং নীচে দেখা যায়।

বলা যাইতে পারে যে অক্ষিপটে বস্তুর বিপরীত প্রতিবিম্ব পড়িবার দরুন দক্ষিণ, বাম, উপর, নীচ উল্টাইয়া যায়। উত্তর এই যে শারীরবৃত্তের দিক দিয়া

ইহা সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু দর্শন-সংবেদনে এমন মানসক্রিয়া ঘটে যাহার ফলে বস্তুকে বিপরীত না দেখিয়া যথার্থরূপে দেখা যায়।

৫। সংবেদনের গভীরতা বা তীব্রতা—মাত্রাভেদ বা পরিমাপ (মেজার্‌মেণ্ট্‌)

একই প্রকারের সংবেদন গভীরতা বা মাত্রাভেদে কমবেশী হইতে পারে। স্পর্শ-সংবেদন, যেমন চাপ বা ওজন, এক ছটাক বা এক সের, দর্শন-সংবেদন, যেমন—লাল বর্ণ, ফিকে বা টকটকে, স্বাদ-সংবেদন, যেমন—মিষ্ট, মৃদু বা তীব্র, শব্দ-সংবেদন, যেমন—স্বর, উচ্চ বা নিম্ন, এবং ঘ্রাণ-সংবেদন, যেমন—ফুলের গন্ধ, তীব্র বা মৃদু হইতে পারে। এই স্থলে চাপ, লাল বর্ণ, মিষ্ট স্বাদ, স্বর এবং গন্ধ সংবেদনদ্বয়ের মধ্যে প্রকারগত (কোয়ালিটেটিভ্‌) পার্থক্য নাই, কিন্তু আছে মাত্রাগত বা পরিমাণগত (কোয়াণ্টিটেটিভ্‌) পার্থক্য।

সংবেদনের মাত্রা—পরিমাপের অসুবিধা

দুইটি স্থূল বস্তুর মাত্রাভেদ যেমন ঐ বস্তুদ্বয়কে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া নির্ণয় করা যায়, উহাদের ওজন-সংবেদনকে (ওয়েইট্‌ সেন্‌সেশন্‌) এইরূপ তুলাদণ্ডে ফেলিয়া ওজন করা যায় না। এক সের চিনি হাতে তুলিলে যে ওজন বা ভার সংবেদন অনুভূত হয় সেই সংবেদনের ওজন এক সের নয়, অথবা দুই সের চিনি হাতে তুলিলে যে ভার-সংবেদন হয় উহার মাত্রা দুই সের অথবা পূর্ব সংবেদনটির তুলনায় দ্বিগুণ নয়। সুতরাং সংবেদনের মাত্রাভেদ নির্ণয় করা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

সমস্যার এইরূপ মীমাংসা করা যাইতে পারে। এক, দুই এবং তিন সের ওজনের তিনটি ক্ষেত্রে চিনির ওজন সংবেদনকে পৃথকভাবে পরিমাপ করিতে না পারিলেও **দ্বিতীয়টি প্রথমটি হইতে যেরূপ মাত্রায় বেশী, তৃতীয়টিও দ্বিতীয়টির তুলনায় সেইরূপ মাত্রায় বেশী**, সাধারণভাবে এইরূপে সংবেদনের গভীরতা বা মাত্রাভেদ করা যাইতে পারে।

সংবেদনের গভীরতা বা মাত্রাভেদ গুণটিকে প্রয়োগ (এক্স্‌পেরিমেণ্ট্‌) সাহায্যে নির্ণয় করিবার চেষ্টা হইয়াছে। প্রশ্নটি দাঁড়াইয়াছে এই যে **উদ্দীপকের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে সংবেদনের যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তাহা কি সমপরিমাণ বা সমানুপাতিক অথবা অসমান।** অর্থাৎ, উদ্দীপক যে মাত্রায় বা পরিমাণে

বাড়ে বা কমে উহার ফলে সংবেদনও কি সেই মাত্রায় বাড়ে বা কমে, অথবা উহাদের হ্রাস-বৃদ্ধি ভিন্ন মাত্রায় ঘটিয়া থাকে ? এক সের চিনি তুলিতে যে ভার-সংবেদন অনুভূত হয়, দুই সের চিনি তুলিবার ভার-সংবেদন অবশ্যই উহার তুলনায় বেশী বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে প্রথম সংবেদনটির তুলনায় দ্বিতীয়টি কি দ্বিগুণ বলিয়া অনুভূত হয়, অথবা দ্বিগুণ অপেক্ষা কম-বেশী বলিয়া অনুভূত হয় ?

হ্বেবার্, ফেক্‌নার প্রভৃতি মাত্রা-মনোবিদ্‌গণ (কোয়ান্টিটেটিভ্ সাইকলজিস্ট) এই প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং সংবেদনের পরিমাণ বা মাত্রার পরিমাপ করিতে গিয়া হ্বেবার্ এবং ফেক্‌নার্ যে সূত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাই বর্তমানে আলোচ্য।

৬। হ্বেবার্-সূত্র (হ্বেবার্'স্ ল)

ভূমিকা

হ্বেবার-এর সূত্র বুঝিতে হইলে এই কয়টি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে।

সংবেদনের নিম্ন সীমা

(১) যদিও প্রত্যেক উদ্দীপকই সংবেদন উৎপন্ন করে উদ্দীপকের গভীরতা একটি নির্দিষ্ট সীমার কম হইলে উহার ফলে উৎপন্ন সংবেদন বোধগম্য (পার্শেপ্টিব্‌ল্) হয় না। যেমন, মাথার চুলের ওজন থাকিলেও উহা বোধগমা হয় না। আবার চুলের সহিত একটি তুলার আঁশ লাগিয়া থাকিলে চুলের ওজন বাড়িয়া যায়, অথচ এই ওজন-বৃদ্ধি বোধগমাভাবে কোনো সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটায় না। **সংবেদন-বৃদ্ধি যে সীমা অতিক্রম করিলে ঠিক বোধগম্য (জস্ট্ পার্সেপ্টিব্‌ল্) হয় তাহাকে সংবেদনের আরম্ভসীমা (থ্রশ্‌হোল্ড্ অফ্ সেন্‌সেশন্) বলে।** সংবেদনবৃদ্ধির ঠিক বোধগম্যতার এই সীমাকে **নিম্নসীমা**-ও (লোয়ার্ লিমিট্) বলা হয়।

সংবেদনের উচ্চ সীমা

(২) ঠিক বোধগম্য সংবেদনের নিম্ন সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া যদি উদ্দীপকটিকে ক্রমে ক্রমে বাড়ানো হইতে থাকে তাহা হইলে সংবেদনও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। এই বৃদ্ধির একটি উচ্চ সীমাও (আপার্ লিমিট্) আছে, যাহা

ছাড়াইয়া যাইবার পর কোনো উদ্দীপক-বৃদ্ধিই বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি উৎপন্ন করে না। তাহা হইলে, **যে সীমাকে অতিক্রম করিলে কোনো বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে না, তাহাকে বলে সংবেদনের উচ্চসীমা।**

সংবেদন-ক্ষেত্র

(৩) এই দুই সীমার মধ্যবর্তী ক্ষেত্রকে বলে সংবেদন—ক্ষেত্র (রেঞ্জ্ অফ্ সেন্সিবিলিটি)। সংবেদন-ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মাত্রায় উদ্দীপক-বৃদ্ধি বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি উৎপন্ন করে। উদ্দীপক-বৃদ্ধি যদি এইরূপ মাত্রায় ঘটে যাহার ফলে একটি ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি অনুভূত হয় তাহা হইলে সংবেদনটি নিম্নসীমার ঊর্ধ্বে এবং উচ্চসীমার নিম্নে অর্থাৎ সংবেদনীয়তার সীমায় বা রেঞ্জ্ অফ্ সেন্সিবিলিটিতে আসিল।

(৪) এইবার প্রশ্ন হইল এই যে প্রত্যেক উদ্দীপক-বৃদ্ধিই কি বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটায়? হেবার্-এর আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছে যে তাহা ঘটায় না। একটি ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি (অর্থাৎ এমন বৃদ্ধি যাহা একটুও কম হইলে বোধগম্য হইত না) ঘটাইতে হইলে উদ্দীপকটিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে বাড়াইতে হইবে এবং উদ্দীপক-বৃদ্ধির হার বা অনুপাত হইবে বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির হার বা অনুপাত অপেক্ষা বেশী। প্রত্যেকটি বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধিই সমান। কিন্তু প্রত্যেকটি উদ্দীপক-বৃদ্ধিই সমান নয়।

হেবার্ সূত্র

এইবার হেবার্-এর মতটিকে দৃষ্টান্ত সাহায্যে বুঝানো যাউক।

একটি তুলাদণ্ডের একদিকে এক সের বাটখারা চাপাইয়া অপর দিকে এক সের চিনি ওজন করা হইল। ঐ এক সের বাটখারার সহিত আর এক সের বাটখারা যোগ করিয়া তুলাদণ্ডের পাল্লা সমান করিতে হইলে অপরদিকে আরও এক সের চিনি চাপাইতে হইবে। এই ক্ষেত্রে বাটখারার ওজন যেমন দ্বিগুণ করা হইল উহার বিপরীত দিকে চাপানো চিনির ওজনও তেমন দ্বিগুণ দাঁড়াইল।

ধরা যাউক যে চর্মের উপর স্থাপিত এক সের ওজনের উদ্দীপকটি 'উ' এবং ইহার ফলে যে চাপ-সংবেদন উৎপন্ন হয় তাহা 'চ'। সুতরাং দুই সের ওজনের বর্ধিত উদ্দীপকটি উ+উ এবং ইহার ফলে যে বর্ধিত ভার-সংবেদন ঘটে তাহা

চ+চ; আবার তিন সের ওজনের বর্ধিত উদ্দীপকটি উ+উ+উ এবং ইহার ফলে উৎপন্ন বর্ধিত ভার-সংবেদনটি চ+চ+চ।

উ	–	চ
উ+উ	–	চ+চ
উ+উ+উ	–	চ+চ+চ

উদ্দীপক-বৃদ্ধি এবং সংবেদন-বৃদ্ধি এইরূপ নয়।

কিন্তু চিনির পরিবর্তে চিনির চাপ বা ভার-সংবেদনের পরিমাপ ব্যাপারটি অন্যরূপ দাঁড়ায়। হ্বেবার্-এর সূত্র অনুসারে উদ্দীপকের উল্লিখিত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংবেদনের সমানুপাতিক বৃদ্ধি হইবে না। তাঁহার উদ্দীপকের সহিত উহার সমান বা পরিমাণ যোগ করিলে সংবেদনের সহিত সমান পরিমাণ যোগ হইবে না। উদ্দীপক-বৃদ্ধির তুলনায় সংবেদন-বৃদ্ধির পরিমাণ কম। সংবেদনের **ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি** উৎপন্ন করিতে হইলে উদ্দীপককে সংবেদন অপেক্ষা বেশী পরিমাণে বাড়ানো দরকার।

প্রথম উদ্দীপকটি 'উ' এবং প্রথম সংবেদনটি 'চ' হইলে প্রথম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি উৎপন্ন করিবার জন্য **উদ্দীপককে উহা অপেক্ষা বেশী উহার একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করা আবশ্যক।** অথবা যতবার একটি ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে ততবারই বর্তমান উদ্দীপককে উহা অপেক্ষা অধিক কোনো নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিতে হয়। সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে উহার একটি ন্যূনতম বোধগম্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে এই আকারে। কিন্তু উদ্দীপক-বৃদ্ধি ঘটে উহাকে উহা অপেক্ষা বেশী উহার কোনো নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিয়া। যেমন আঙুলের অগ্রভাগে **ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য চাপ-সংবেদনবৃদ্ধি ঘটাইতে হইলে উদ্দীপককে অন্ততঃ উহা অপেক্ষা বেশী উহার ১/২০ ভগ্নাংশ অর্থাৎ ১ ১/২০ বা ২১/২০ দিয়া গুণ করিতে হইবে।**

চাপ উদ্দীপক-বৃদ্ধি—ন্যূনতম চাপ-সংবেদনবৃদ্ধি

উ	—	চ
উ × ২১/২০	—	চ-এর প্রথম ন্যূনতম বোধগম্য বৃদ্ধি
উ × ২১/২০ × ২১/২০	—	প্রথমবার ন্যূনতমভাবে বর্ধিত চ-এর দ্বিতীয় ন্যূনতম বৃদ্ধি
উ × ২১/২০ × ২১/২০ × ২১/২০	—	দ্বিতীয়বার ন্যূনতমভাবে বর্ধিত চ-এর তৃতীয় ন্যূনতম বৃদ্ধি

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে **ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি অথবা হেববার্-এর ভাষায় 'জাস্ট্ নোটিসিয়েব্ল্ ডিফারেন্স্ ইন্ সেন্সেশন্' (সংক্ষেপে জে. এন্. ডি.) উৎপন্ন করিতে হইলে উদ্দীপককে উহা অপেক্ষা বেশী উহার একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিয়া বাড়াইতে হইবে।**

এই **নির্দিষ্ট ভগ্নাংশটি বিভিন্ন উদ্দীপকের ক্ষেত্রে ভিন্ন।** যেমন আঙুলের ডগার বা অগ্রভাগের চাপ-সংবেদনের ন্যূনতম বোধগম্য বৃদ্ধি করিতে হইলে বর্তমান উদ্দীপককে উহা অপেক্ষা বেশী ১/২০ অর্থাৎ ২১/২০ ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিতে হয়। আবার আলোকের উজ্জ্বলতা-সংবেদনের ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি ঘটাইতে হইলে উহাকে উহা অপেক্ষা বেশী ১/১০০ অর্থাৎ ১০১/১০০ ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিতে হইবে। আবার শব্দ-সংবেদনের ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি উৎপন্ন করিতে হইলে উদ্দীপককে উহা অপেক্ষা বেশী ১/৩ অর্থাৎ ৪/৩ ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিতে হইবে।

এইরূপে দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ এবং স্বাদ প্রভৃতি সকল সংবেদনের ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটাইতে হইলে উহাদের উদ্দীপকগুলিকে পরীক্ষালব্ধ বিভিন্ন ভগ্নাংশ দিয়া বাড়াইতে হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একটি নির্দিষ্ট সংবেদনের বেলায় উহার ন্যূনতম বোধগম্য বৃদ্ধি ঘটাইতে হইলে উহার উদ্দীপককে একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন সংবেদনে এই ভগ্নাংশ বিভিন্ন হইয়া থাকে। কোন্ সংবেদনের প্রয়োজনীয় ভগ্নাংশটি কি তাহা পরীক্ষা সাহায্যে নির্ণয় করিতে হয়।

আরও দেখা যাইতেছে যে ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির নির্দিষ্ট ভগ্নাংশটি নিরপেক্ষ (অ্যাব্সল্যুট্) নয় কিন্তু সাপেক্ষ (রিলেটিভ্)। অর্থাৎ উদ্দীপক-বৃদ্ধির হার নির্ভর করে বর্তমান উদ্দীপকের পরিমাণ বা মাত্রার উপর। ন্যূনতম অথবা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধিও নির্ভর করে যে সংবেদন আছে তাহার উপর।

কোনো প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারীর বেতনই যদি পাচ টাকা বাড়ানো হয় তবে আপাতদৃষ্টিতে এবং নিরপেক্ষভাবে সকল কর্মচারীরই একই মাত্রার বেতনবৃদ্ধি ঘটিল বলিয়া মনে হইলেও, বস্তুতঃ সেইরূপ ঘটে না। যে কর্মচারীর মাসিক বেতন এক শত টাকা তাহার পাঁচ টাকা বেতনবৃদ্ধি এবং যে কর্মচারীর

মাসিক বেতন পাঁচ শত টাকা তাহার পাঁচ টাকা বেতনবৃদ্ধি নিরপেক্ষ বা অ্যাব্‌সল্যুট্‌ভাবে সমান হইলেও, যত টাকা বেতনের উপর এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার তুলনায় অথবা সাপেক্ষ বা রিলেটিভ্‌ ভাবে সমান নয়। কারণ পাঁচ টাকা এক শত টাকার কুড়ি ভাগের একভাগ, কিন্তু পাঁচ শত টাকার এক শত ভাগের এক ভাগ। সুতরাং এই বৃদ্ধি এককভাবে সমান হইলেও তুলনাগতভাবে অসমান।

উল্লিখিত বিষয়টি পরবর্তী অনুচ্ছেদে আরও বিশদভাবে বুঝা যাইবে।

৮। ফেক্‌নার্‌-এর সূত্র

হ্বেবার্‌-এর সূত্রে উদ্দীপকের মাত্রা বৃদ্ধির গাণিতিক পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সংবেদনের বৃদ্ধিকে ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি অথবা 'জাস্ট্‌ নোটিসিয়েব্‌ল্‌ ডিফারেন্স্‌ ইন্‌ সেন্‌সেশন্‌' বা জে. এন্‌. ডি. বলিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ হ্বেবার্‌ উদ্দীপক-বৃদ্ধির গাণিতিক সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সংবেদন-বৃদ্ধির গাণিতিক সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দেশ করেন নাই। প্রত্যেকটি ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধিকে সাধারণভাবে সমান বলিয়া ইঙ্গিত করিলেও উহার মাত্রা বা পরিমাণ হ্বেবার্‌ কর্তৃক নির্দিষ্ট হয় নাই।

হ্বেবার্‌-সূত্রের এই অসমাপ্ত অংশটি সমাপ্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন ফেক্‌নার। এই কারণে **এই সূত্রটিকে যুগ্মভাবে হ্বেবার্‌-ফেক্‌নার্‌ সূত্র বলা হইয়া থাকে।** ইহার পরিপূর্ণ রূপ শুধু হ্বেবার্‌-এর একার নয়, কিন্তু উভয়ের।

জি. টি. ফেক্‌নার প্রমাণ করিলেন যে প্রত্যেকটি ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধিই যখন সমান তখন উহাকে **এককরূপে** প্রকাশ করা যাইতে পাবে। যেমন এক সের চাপ-উদ্দীপক হইতে যে চাপ-সংবেদন উৎপন্ন হয় তাহাকে যদি 'চ' বলা হয় তবে ঐ এক সের ওজনের উদ্দীপককে $১\frac{১}{২০}$ অথবা $\frac{২১}{২০}$ দ্বারা গুণ করিয়া বাড়াইলে প্রথম ন্যূনতম বা ঠিক সংবেদন-বৃদ্ধি অর্থাৎ 'চ' এর সহিত একটি একক যুক্ত হইবে। সুতরাং উদ্দীপকের সহিত সংবেদনের সম্বন্ধ দাঁড়াইবে $উ \times \frac{২১}{২০} = চ + ১$। আবার $\frac{২১}{২০}$ উ-কে উহার $\frac{২১}{২০}$ দিয়া গুণ করিয়া বাড়াইলে দ্বিতীয় ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন বৃদ্ধি, অর্থাৎ পূর্ব সংবেদনের সহিত দ্বিতীয় একক যুক্ত হইবে। সুতরাং উদ্দীপকের সহিত সংবেদনের সম্বন্ধ দাঁড়াইবে $উ \times \frac{২১}{২০} \times \frac{২১}{২০} = চ + ১ + ১$। আবার $\frac{২১}{২০} \times \frac{২১}{২০}$ উ-কে উহার

$\frac{২১}{২০}$ দিয়া গুণ করিয়া বাড়াইলে তৃতীয় ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির তৃতীয় একক পূর্ব সংবেদনের সহিত যুক্ত হইবে। ফলে উদ্দীপকের সহিত সংবেদনের সম্বন্ধ দাঁড়াইবে উ $\times \frac{২১}{২০} \times \frac{২১}{২০} \times \frac{২১}{২০} =$ চ $+ ১ + ১ + ১$।

উদ্দীপক-বৃদ্ধি	ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি
উ	চ
উ $\times \frac{২১}{২০}$	চ $+ ১$
উ $\times \frac{২১}{২০} \times \frac{২১}{২০}$	চ $+ ১ + ১$
উ $\times \frac{২১}{২০} \times \frac{২১}{২০} \times \frac{২১}{২০}$	চ $+ ১ + ১ + ১$

উদ্দীপক-বৃদ্ধি এবং উহার ফলে ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির সম্বন্ধ বুঝাইতে গিয়া ফেক্‌নার গাণিতিক ধারা (এরিথ্‌মেটিক্যাল্ প্রোগ্রেশন্) এবং জ্যামিতিক ধারার (জিওমেট্রিক্যাল্ প্রোগ্রেশন্) সম্বন্ধের আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে সংবেদন-বৃদ্ধি উদ্দীপক-বৃদ্ধির লগারিথ্‌ম্‌রূপে ঘটিয়া থাকে (সেন্‌সেশন্ ভেরিজ্ অ্যাজ্ দি লগারিথ্‌ম্ অফ্ দি ষ্টিমুলাস্)। এক হইতে আরম্ভ করিয়া, এক-কে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়া গুণ করিয়া, দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়া গুণ করিয়া, আবার তৃতীয় সংখ্যাটিকেও ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়া গুণ করিয়া, যে ধারাবাহিক সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় উহারা জ্যামিতিক গতি বা ধারায় অগ্রসর হয় (জিওমেট্রিক্যাল্ প্রোগ্রেশন্)—যেমন, ১, ৩, ৯, ২৭, ৮১ ইত্যাদি। আবার এক হইতে আরম্ভ করিয়া উহাকে ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যার সহিত যোগ করিয়া, দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যার সহিত যোগ করিয়া, আবার তৃতীয় সংখ্যাটিকেও উহার সহিত যোগ করিয়া যে ধারাবাহিক বা ক্রমিক সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় উহারা গাণিতিক গতি বা ধারায় অগ্রসর হয় (এরিথ্‌মেটিক্যাল্ প্রোগ্রেশন্)। যেমন ১, ৪, ৭, ১০ ইত্যাদি সংখ্যাগুলি গাণিতিক ক্রমে অগ্রসরমাণ সংখ্যা।

ফেক্‌নার্-এর মতে এক একটি ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি হয় বর্তমান সংবেদনের সহিত নির্দিষ্ট এক যোগ করিয়া এবং ইহা উৎপন্ন করিতে হইলে যে হারে উদ্দীপক-বৃদ্ধি প্রয়োজন তাহাও ঘটে বর্তমান উদ্দীপকের সহিত উহা অপেক্ষা বেশী উহার একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ গুণ করিয়া। সুতরাং উদ্দীপক-বৃদ্ধি অগ্রসর হয় অনেকাংশে জ্যামিতিক ধারায় এবং সংবেদন-বৃদ্ধি অগ্রসর হয় অনেকাংশে গাণিতিক ধারায়।

তাহা হইলে উদ্দীপক-বৃদ্ধির মানকে একটি অপরিবর্তিত (কন্‌স্ট্যাণ্ট্ বা 'সি') ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিতে থাকিলে যে ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদনবৃদ্ধি-গুলি পাওয়া যায় উহাদের যথাক্রমে জ্যামিতিক বা জি. পি. ধারা এবং গাণিতিক বা এ.·পি. ধারা বলা যায়। উদ্দীপক-বৃদ্ধির বেলায় সি বা অপরিবর্তিত গুণনীয়ক হইল ঐ উদ্দীপকের একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ এবং ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদনবৃদ্ধির যোজক সর্বদা একটি একক বা ইউনিট্।

ফেক্‌নার ইহাদের সম্বন্ধকে গাণিতিক সমীকরণের (ইকোয়েশন্) সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত সমীকরণ সূত্রটি এই :—

এস্ = সি. লগ্ আর্

এই সমীকরণে 'এস্' বলিতে বুঝায় সংবেদন বা সেন্‌সেশন্, 'সি'-এর অর্থ হইল অপরিবর্তিত ভগ্নাংশ, 'লগ্' অর্থ হইল গুণ করা এবং 'আর্' এর অর্থ হইল উদ্দীপক।

মাতৃভাষায় এই সমীকরণটিকে এইরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে—

সংবেদন = অপরিবর্তনীয় ভগ্নাংশ × উদ্দীপক।

এখানে প্রথম ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদনকেই ধরা হইয়াছে।

৯। হ্বেবার্-ফেক্‌নার সূত্রের সমালোচনা

প্রথমেই স্বীকার করিতে হয় যে হ্বেবার্-ফেক্‌নার সূত্র মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বিজ্ঞানের বিজ্ঞানত্ব নির্ভর করে উহাকে গাণিতিক আকারে প্রকাশ করিবার সাফল্যের উপর। হ্বেবার্-ফেক্‌নার উদ্দীপক ও সংবেদনকে পরিমাণগত মনোবিদ্যার (কোয়াণ্টিটেটিভ্ সাইকলজি) ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। হ্বেবার্ শুধু উদ্দীপককে গাণিতিক সংখ্যায় পরিণত করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন। তিনি সংবেদন-বৃদ্ধিকে শুধু ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি বলিয়াই ছাড়িয়া দিয়া উহার গাণিতিক রূপায়ণে অগ্রসর হন নাই। কিন্তু ফেক্‌নার উদ্দীপক-বৃদ্ধির মত ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির পরিমাণও গাণিতিক সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।

(২) কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা যতই সাধু হউক না কেন, ইহার কতগুলি গুরুত্বপুর্ণ এবং অসংশোধনীয় ত্রুটি আছে বলিয়া মনে হয়।

উদ্দীপক এবং সংবেদনের পার্থক্য মনে রাখা দরকার। হ্বেবার্ এই পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই হয়ত সংবেদনকে সংখ্যায়ত করেন নাই।

আবার ফেক্‌নার্ ইহা লক্ষ্য না করিয়াই বোধ হয় সংবেদনকেও সংখ্যায়িত করিয়াছেন।

উদ্দীপক এবং সংবেদনের পার্থক্য

উদ্দীপক জড় পদার্থ বিশেষ। ইহা যান্ত্রিক বা রাসায়নিক। ইহাকে যে কোনো যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক শক্তির মত বাড়ানো বা কমানো যাইতে পারে। সুতরাং উদ্দীপককে গাণিতিক সংখ্যার মত বাড়াইবার বা কমাইবার চেষ্টা সমর্থনযোগ্য। এই অংশে যে হ্বেবার্-ফেক্‌নার্-এর চেষ্টা বিজ্ঞান-সম্মত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংবেদন উদ্দীপকের মত কোনো যান্ত্রিক বা রাসায়নিক শক্তি মাত্র নয়। সংবেদন আসলে একটি মানসবৃত্তি। যোগ অঙ্কের সাহায্যে ইহার পরিমাণ বা মাত্রা বাড়ানো বা কমানো যায় কিনা তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। এই দিক দিয়া হ্বেবার্-এর সূত্র ফেক্‌নার্-এর সূত্র অপেক্ষা সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয়। হ্বেবার্ সংবেদনকে সংখ্যায়িত করেন নাই, ফেক্‌নার্ করিয়াছেন।

একটি দৃষ্টান্ত সাহায্যে উদ্দীপক ও সংবেদনের এই পার্থক্য দেখানো যাউক। দুইটি রসগোল্লা ওজনে হয়ত একটির দ্বিগুণ। কিন্তু দুইটি রসগোল্লার স্বাদ-সংবেদন একটির তুলনায় দ্বিগুণ না হইয়া কম বা বেশীও হইতে পারে। রসগোল্লার সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত উহার ওজন কমিয়া যাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, কিন্তু স্বাদ-সংবেদনের আছে। এই কারণে হ্বেবার্-এর সূত্রটি ফেক্‌নার্-সূত্রের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নির্দোষ।

(৩) তাহা ছাড়া হ্বেবার্-ফেক্‌নার্-সূত্রের আর একটি দোষ হইল উহার একদেশদর্শিতা। ফেক্‌নার্ উদ্দীপক-বৃদ্ধির ভগ্নাংশকে যেমন আপেক্ষিক (রিলেটিভ্) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সংবেদন-বৃদ্ধির এককেকে তেমন আপেক্ষিক বলিয়া নির্দেশ করেন নাই। তিনি হ্বেবার্-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রথম উদ্দীপকের সহিত দ্বিতীয় উদ্দীপকের পার্থক্যের অনুপাত (রেশিও) নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু প্রথম ন্যূনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির সহিত দ্বিতীয় ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির অনুপাত দেখান নাই। ফেক্‌নার সংবেদন-বৃদ্ধির একককে সমান, নির্দিষ্ট বা নিরপেক্ষ (অ্যাব্‌সলুট্) রূপে নির্ধারণ করিয়াছেন।

সংবেদন-বৃদ্ধির এককগুলি একক হিসাবে সমান বা নিরপেক্ষ হইলেও পূর্ববর্তী সংবেদন-বৃদ্ধির তুলনায় দ্বিতীয় সংবেদন-বৃদ্ধিতে উহা আর একক

থাকিতে পারে না। সংবেদন ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে কিন্তু অল্প সংবেদনের একক বৃদ্ধি কখনও বর্ধিত সংবেদনের একক বৃদ্ধির সমান হইতে পারে না। চ+১ সংবেদন-বৃদ্ধিতে যে অনুপাতে +১ 'চ'কে বাড়ায়, চ+১+১ সংবেদন-বৃদ্ধিতে নিশ্চয়ই +১, সেই অনুপাতে চ+১-কে বাড়ায় না। আবার চ+১+১ যে অনুপাতে চ+১-কে বাড়ায়, চ+১+১+১ সেই অনুপাতে চ+১+১-কে বাড়ায় না।

অর্থাৎ, সংবেদনের একক বৃদ্ধিকে নিরপেক্ষ বা অ্যাব্সল্যুট্ না করিয়া সাপেক্ষ বা রিলেটিভ্ করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

(৪) চতুর্থতঃ একটি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির ব্যবধানে বা মধ্যে যেন কোনো সংবেদন-বৃদ্ধিই ঘটে না হ্বেবার্-ফেক্‌নার সূত্র এইরূপ কোনো ইঙ্গিত করে কি? কিন্তু একটি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সংবেদন-বৃদ্ধির মধ্যেও যে বোধের অগম্য অথবা অবচেতন সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে তাহাতে সন্দেহ নাই। সংবেদনকে ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকিলে একটি সংবেদন ঠিক বাড়িয়াছে বলিয়া বোধগম্য হওয়ার পূর্বে উহা বাড়ে নাই অথবা উহার বৃদ্ধি একেবারেই বোধগম্য হয় নাই এইরূপ বলা যায় না। এইরূপ বলিলে ন্যূনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধিটি একেবারেই আকস্মিক এবং অকারণ বলিয়া মনে হইতে পারে।

এই সমস্যার সমাধান এই। সংবেদনীয় নিম্নসীমারও নিম্নে যে সকল সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে তাহা ঠিক বোধগম্য হয় না, যদিও তাহার অস্পষ্ট বোধ বা চেতনা থাকে। এইরূপ যুক্তির ভিত্তিতে হ্বেবার্-ফেক্‌নার সূত্র সংজ্ঞান মনের অন্তস্তলে অসংজ্ঞান বা অবচেতন মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

(৫) হ্বেবার্-ফেক্‌নার সূত্রের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রটুকু মনে রাখা দরকার। এই সীমাবদ্ধতা এই সূত্রের দোষ বা ত্রুটি নয়, কারণ ইহা স্বীকার করিয়াই ইঁহারা ইঁহাদের সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার সীমাবদ্ধতা এই। হ্বেবার্-ফেক্‌নার্ সূত্র সংবেদনের নিম্নসীমায় (লোয়ার্ লিমিট্) এবং উচ্চসীমায় (আপার্ লিমিট্) প্রযোজ্য নয়। ইহা শুধু এই দুইটি সীমার মধ্যবর্তী সংবেদনক্ষেত্রেই (রেঞ্জ্ অব্ সেন্‌সিবিলিটি) প্রযোজ্য।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

জি. এফ্. ষ্টাউট্— এ ম্যানুয়্যাল্ অফ্ সাইকলজি—১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ
২য় খণ্ড ১ম, ৬ষ্ঠ ,,

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড—এলিমেণ্ট্স্ অফ্ সাইকলজি—৯ম পরিচ্ছেদ
ই. বি. টিশ্নার—টেক্সট্ বুক্ অফ্ সাইকলজি—৩য় পরিচ্ছেদ

Exercise

1. Define sensation. Give an analysis of the processes involved in sensation. (p. 392)
2. What is the stimulus ? Distinguish between adequate and inadequate stimulus. What do you mean by the Doctrine of Specific Energy of Nerves ? (pp. 392-394)
3. State and explain the attributes of sensation. Does extensity characterise all sensation ? Discuss. (pp. 394-398)
4. Classify sensation and explain the principle on which you classify it. (pp. 398-400)
5. Define local sign. Explain the local sign of sight and touch. (pp. 400-401)
6. What do you mean by intensity of sensation ? How, if at all, does sensation admit of measurement ? (pp. 401-402)
7. State the fundamental concepts involved in Weber's measurement of sensation (pp. 402-403)
8. How does Weber formulate his law of sensation ? Discuss. (pp. 403-406)
9. State Fechner's improvement upon Weber in the measurement of sensation. Is it really an improvement at all ? (pp. 406-408)
10. State and explain the Weber-Fechner law of sensation. (pp. 408-410)
11. "Sensation varies as the logarithm of the stimulus"—Explain. (pp. 408-410)

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

দর্শন ও শব্দ সংবেদন

(ভিস্যুয়্যাল্ অ্যাণ্ড্ অডিটরি সেন্‌সেশন্)

১। দর্শন সংবেদনের স্বরূপ এবং প্রকার

দর্শন সংবেদনের উৎপত্তি

দর্শন সংবেদনের উদ্দীপক ইথর-তরঙ্গ বা আলোক এবং ইন্দ্রিয় চক্ষু। ইথর-তরঙ্গের কম্পন চক্ষুগোলকের (আই-বল্) বিভিন্ন অংশ, যথা অচ্ছোদ পটলের (কর্ণিয়া) মধ্য দিয়া কনীনিকার (আইরিস্) মধ্যবর্তী তারারন্ধ্র (পিউপিল্) এবং অক্ষিমুকুর (লেন্স্) দিয়া তৎপরবর্তী স্বচ্ছ তরল পদার্থ (ভিট্রিয়াস্ হিউমর্) অতিক্রম করে এবং অক্ষিপটস্থ (রেটিনা) পীতবিন্দুতে (ইয়েলো স্পট্, ম্যাকুলা লুটিয়া, ফোভিয়া সেণ্ট্রালিস্) প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলন অক্ষিপটের কোষগুলিকে (সেল্‌স্) উদ্দীপিত করে। সর্বশেষে এই উদ্দীপনা দর্শন-নার্ভের (অপ্‌টিক্ নার্ভ) বহিঃপ্রান্তকে উদ্দীপিত করে এবং এই উদ্দীপনা নার্ভ-প্রবাহের আকারে মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রস্থ (অক্সিপিট্যাল্ লোব্) দর্শন-নার্ভের অন্তঃপ্রান্তে পৌঁছায়। ফলে দর্শন সংবেদন উৎপন্ন হয়।

দর্শন সংবেদনের প্রকার

দর্শন সংবেদন প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর—যথা আলোক বা অ-বর্ণ (লাইট্, এক্রোম্যাটিক্) এবং বর্ণ (ক্রোম্যাটিক্) সংবেদন। আবার আলোক-সংবেদন দুই শ্রেণীর—যথা আলোক ও অন্ধকার সংবেদন (লাইট্ অ্যাণ্ড্ ডার্কনেস্ সেন্‌সেশন্)। কিন্তু বর্ণ সংবেদন অসংখ্য, যদিও ইহা প্রধানতঃ চার শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে—যথা লাল (রেড্), পীত বা হলুদ (ইয়েলো), সবুজ (গ্রীন্) এবং নীল (ব্লু)।

মৌলিক বর্ণ (প্রাইমারি কালার্স্)

আলোক সংবেদনগুলিকে উহাদের গভীরতা বা মাত্রার অল্পাধিক্য অনুসারে একটি সরলরেখায় সাজানো যাইতে পারে। এই সরলরেখার প্রথম প্রান্তে শুভ্র বা শাদা থাকিলে ইহা ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্ষীণতর এবং ক্ষীণতম অন্ধকার বা

কালো হইয়া যায়। এই রেখার প্রথম প্রান্তে রহিয়াছে শুভ্র বা শাদা (হোয়াইট্) এবং অপর প্রান্তে রহিয়াছে কালো (ব্ল্যাক্)। ইহার মধ্যবিন্দুটি আলোকান্ধকার বা শাদাকালোর মাঝামাঝি (নিউট্র্যাল্)। এই সরলরেখার মধ্যবিন্দু হইতে কালো প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইলে বর্ণরেখাটি ক্রমশঃ ধূসর (গ্রে) হইতে ধূসরতর হইয়া শেষ প্রান্তে সম্পূর্ণ কালো হইয়া দাঁড়ায়। শাদাকালোর মধ্যবর্তী অন্ততঃ ছয় শত হইতে সাত শত আলোক-সংবেদন আছে।
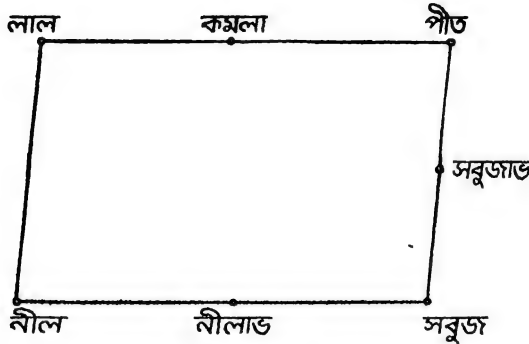
৪১নং চিত্র

কিন্তু আলোক-সংবেদনের তুলনায় বর্ণ-সংবেদনগুলি জটিল। বর্ণের সংখ্যা অনন্ত। যেমন টিশ্‌নার বলেন যে বর্ণেব সংখ্যা অন্ততঃ কয়েক হাজার। ইহাদিগকে একটি সরলরেখায় আলোক-সংবেদনের মত সাজানো যায় না। বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র (কালার্ প্রিজ্‌ম্) সাহায্যে সূর্যের আলোক দেখিলে, ঐ আলোক সৌর বর্ণালীতে (স্পেক্ট্রাম্) বিশ্লিষ্ট হয়। এই বর্ণালীর বাম দিকে দেখা যায় লাল। লাল হইতে ডান দিকে অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে লাল ক্রমশঃ পীতাভ (ইয়েলোইশ্), তাবপর কমলা-রং (অরেঞ্জ্) হইয়া খাঁটি পীত বর্ণে পরিণত হয়। এইখানেই লাল-পীত প্রথম সরলরেখাটির শেষ। তারপর সৌর বর্ণালীর দিক পরিবর্তন ঘটে। পীতবর্ণ দ্বিতীয় সরলরেখায় সবুজাভ (গ্রীনিশ্) অবস্থা অতিক্রম করিয়া খাঁটি সবুজ বর্ণে পরিবর্তিত হয়। এইস্থানে দ্বিতীয় সরলরেখাটির শেষ। এই পীত-সবুজ সরলরেখাটি আবার দিক পরিবর্তন করে। সবুজ বর্ণ নীলাভ (ব্লুইশ্) অবস্থা অতিক্রম করিয়া খাঁটি নীল বর্ণে পরিণত হয়। এইস্থানে তৃতীয় সবুজ-নীল সরলরেখাটির শেষ

এবং চতুর্থ সরলরেখার আরম্ভ। চতুর্থ সরলরেখায় নীল রক্তিমাভ (রেডিশ্) অবস্থা অতিক্রম করিয়া রক্ত বা লাল বর্ণে ফিরিয়া আসে।

লাল, পীত, সবুজ ও নীল, এই চারটি বর্ণকে মুখ্য, মূল বা মৌলিক (প্রাইমারি) বর্ণ বলে। কিন্তু নিউটন্-এর মতে মৌলিক বর্ণ সাতটি। তিনি মনে করেন যে রামধনুর সাতটি বর্ণ—যথা বেগুনী (ভায়োলেট্), নীল (ইন্ডিগো), আসমানী (ব্লু), সবুজ (গ্রীন্), পীত (ইয়েলো), কমলা (অরেঞ্জ্) এবং লাল (রেড্), যাহাদের সংক্ষেপে বলা হয় ভিব্জিঅর্ (ভ্+ই+ব্+জ্+ওয়াই+ অর্)। মাতৃভাষায় এই সংক্ষেপণের অনুকরণে সাতটি রংকে বলা যায় বেনীআসহকলা (বেগুনী, নীল, আস্মানী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল)।

বর্ণালীর এই সাতটি বর্ণকে মুখ্য বা মৌলিক বর্ণ বলা চলে না, কারণ ইহাদের অনেকগুলিই একাধিক মুখ্যবর্ণের মিশ্রণ-ফল। যেমন কমলা রং লাল ও হলুদ রং-এর, আবার বেগুনী রং আসমানী ও লাল রং-এর সংমিশ্রণ।

হেরিং প্রভৃতির মতে মুখ্য বা মূল বর্ণ চারটি, যথা লাল, হলুদ, সবুজ এবং আস্মানী নীল। কিন্তু হেল্ম্হোল্জ ও ইয়ংএর মতে মূল বর্ণ তিনটি, যেমন লাল, সবুজ এবং নীল। এই মতানুসারে হলুদ মুখ্য বর্ণ নয়, কারণ লাল ও সবুজকে নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশাইলে হলুদ রং পাওয়া যায়।

পদার্থবিদ্যা ও মনোবিদ্যার বর্ণসংবেদন

মনোবিদ্যায় গৃহীত বর্ণগুলি পদার্থবিদ্যা-গৃহীত বর্ণগুলির সহিত অন্ততঃ দুইটি বিষয়ে পৃথক। মনোবিদ্যার বর্ণশ্রেণী সম্পূর্ণ, কিন্তু বর্ণালীর বর্ণগুলি অসম্পূর্ণ। যেমন উল্লিখিত চতুর্থ সরলরেখাটিতে নীল লালে পরিণত হইবার আগে বেগুনী-লাল (পার্প্ল্) এবং লাল-বেগুনী (কার্মাইন্) এই দুইটি স্তর অতিক্রম করে। বর্ণালীতে কিন্তু এই দুইটি বর্ণের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না, কারণ বর্ণালী ভায়োলেট্ বা বেগুনীতেই থামিয়া যায়। কিন্তু মনোবিদ্যা এই সরলরেখাকে প্রসারিত করে এবং বেগুনী অতিক্রম করিয়া বেগুনী-লাল এবং লাল-বেগুনীর মধ্য দিয়া লালে ফিরিয়া আসে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ণালীর লাল রংটি বিশুদ্ধ বা খাঁটি লাল নয়, কিন্তু উহাতে পীত বা হলুদ বর্ণের মিশ্রণ থাকে। বিশুদ্ধ লাল বর্ণালীর বাহিরে, কিন্তু মনোবিদ্যার অন্তর্গত।

বর্ণের বৈশিষ্ট্য

বর্ণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। (১) **বর্ণমাত্র বা হিউ**—বর্ণের এই বৈশিষ্ট্যটি নির্ভর করে উহার উৎপাদক ইথর-তরঙ্গের **দৈর্ঘ্যের** উপর। লাল বর্ণের হিউ সর্বাধিক, কারণ ইহার উৎপাদক ইথর-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সর্বাধিক।

হেল্ম্‌হোল্‌জ্‌-এর বর্ণালী-বিশ্লেষণ অনুযায়ী ইথর-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুসারে প্রধান কয়েকটি বর্ণ উল্লিখিত হইল। তিনি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মাইক্রোমিলিমিটার হিসাবে নির্ণয় করিয়াছেন। মাইক্রোমিলিমিটার বলিতে বুঝায় মিলি-মিটার-এর দশ লক্ষ ভাগ।

তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য		বর্ণ
৭৬০·৪০ মাইক্রোমিলিমিটার		শেষ প্রান্তের লাল
৬৮৬·৮৫৩	”	লাল
৬৫৬·৩১৪	”	লাল-কমলা
৫৮৯·৬২৫	”	সোনালী পীত
৫২৬·৯৯০	”	সবুজ
৪৮৬·১৬৪	”	সবুজ-নীল
৪৩০·৮২৫	”	বেগুনী, নীল-বেগুনী
৩৯৬·৮৭৯	”	বেগুনী

(২) বর্ণের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার **উজ্জ্বলতা** (ব্রাইট্‌নেস্‌) **অথবা আভা** (টিণ্ট্‌)। এই বৈশিষ্ট্যটি নির্ভর করে বর্ণের প্রকাশ (লুমিনসিটি) বা তীক্ষ্ণতার (ইন্‌টেন্‌সিটি) উপর। পীত বর্ণ সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এবং বেগুনী সর্বাপেক্ষা অনুজ্জ্বল। বর্ণের আভা উদ্দীপক ইথর-তরঙ্গের **উচ্চতা** (অ্যাম্‌-প্লিচুড্‌) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৩) বর্ণের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার **সংপৃক্তি** (স্যাচুরেশন্‌)। বর্ণের সহিত আলোকের মিশ্রণ যত কম উহা তত বেশী সংপৃক্ত (স্যাচুরেটেড্‌) এবং এই মিশ্রণ যত বেশী উহা তত কম সংপৃক্ত।

২। অনুসংবেদন (আফ্‌টার্‌-সেন্‌সেশন্‌) বা অনু-প্রতিরূপ (আফ্‌টার্‌-ইমেজ্‌)

ইন্দ্রিয়ের উপর উদ্দীপকের ক্রিয়ার ফলে সংবেদন ঘটে। উদ্দীপক একবার সক্রিয় হইয়া নিষ্ক্রিয় হইলেও অনেক সময় উহার পূর্বক্রিয়ার রেশ বা প্রতিক্রিয়া

চলিতে থাকে। **উদ্দীপকের অপসরণ বা নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও উহার পূর্ব ক্রিয়ার বা সংবেদনের প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকার ফলে যে মানসবৃত্তি ঘটে তাহাকে অনুবেদন** (আফ্‌টার্‌-সেন্‌সেশন্‌) বা অনু-প্রতিরূপ (আফ্‌টার-ইমেজ্‌) বলে।

সবর্ণ এবং অসবর্ণ অনুসংবেদন[১]

অনুবেদনটি যদি সংবেদনের সমজাতীয় হয় তবে উহাকে সবর্ণ বা সমজাতীয় অনুসংবেদন বলে (পজিটিভ্‌ আফ্‌টার্‌-সেন্‌সেশন্‌)। আবার অনুসংবেদনটি যদি সংবেদনের বিপরীত অথবা বিজাতীয় হয় তবে উহাকে বলে অসবর্ণ বা বিপরীত অনুসংবেদন (আফ্‌টার্‌-সেন্‌সেশন্‌)। অনুবেদন প্রায় সকল প্রকার সংবেদনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঘটিতে পারে। বর্তমানে বর্ণসংবেদনের (দর্শন) সবর্ণ এবং অ-সবর্ণ অনু-সংবেদনই আলোচ্য।

সবর্ণ অনুসংবেদন

তীব্র আলোকের দিকে ১৫ হইতে ২০ সেকেণ্ড কাল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার পর চক্ষু বন্ধ করিলে অথবা কোনো বর্ণহীন পশ্চাদ্‌ভূমিতে (কালার্‌লেস্‌ ব্যাক্‌-গ্রাউণ্ড্‌), যেমন শাদা দেওয়ালে, দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে সবর্ণ আলোক অনুসংবেদন ঘটে। আবার একটি জলন্ত দিয়াশলাই-এর কাঠি ঘুরাইলে যে অগ্নিবৃত্ত উৎপন্ন হয় তাহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চক্ষু বুজিলে বা কোনো বর্ণহীন পশ্চাদ্‌-ভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে উহার উপর অগ্নিবৃত্তটি দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় অগ্নিবৃত্তটি সবর্ণ অনুসংবেদন। আবার দুই চোখ হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার পর খুলিয়া একটি উজ্জ্বল আলোকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আবার দুই চোখ বন্ধ করিলে অথবা কোনো বর্ণহীন পশ্চাদ্‌ভূমিতে দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিলে ঐ উজ্জ্বল আলোকটি দেখা যাইতে থাকে।

সবর্ণ অনুসংবেদন চঞ্চল অথবা ক্ষণস্থায়ী (ফ্লিকারিং)। উহা একবার দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ দৃশ্য ও অদৃশ্য হইবার পর ইহা ক্রমশঃ মিলাইয়া যায়।

১ ষড়বিংশ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

অসবর্ণ অনুসংবেদনঃ

যদি একটি রঙ্গীন কাগজের মধ্যস্থলে ১৫ হইতে ২০ সেকেণ্ড কাল স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার পর একটি বৃহত্তর বর্ণহীন বা ধূসর পটভূমিতে (কালারলেস্ অর্ গ্রে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড্) দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়, উহাতে একটি বর্ণখণ্ড (প্যাচ্ অফ্ কালার) দৃষ্টিগোচর হয়। এই দ্বিতীয় বর্ণখণ্ডটির আকার উদ্দীপক বর্ণখণ্ডটির অনুরূপ, কিন্তু উহা প্রথমটির বিপরীত (নেগেটিভ্) বা পরিপূরক (কম্‌প্লি-মেণ্টারি)। উদ্দীপক অপসৃত হইলেও উহার সমাকৃতি অথচ বিপরীত এই প্রতিক্রিয়াকে অসবর্ণ অনুসংবেদন (নেগেটিভ্ আফ্‌টার-সেন্‌সেশন্) বলে।

যেমন, উদ্দীপক বর্ণটি যদি যথাক্রমে লাল, সবুজ, পীত ও নীল হয়, তবে উহার উপর ১৫ হইতে ২০ সেকেণ্ড কাল স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দৃষ্টি সরাইয়া লইলে এবং তাহার পর একটি বৃহত্তর বর্ণহীন বা ধূসর দেওয়াল, বস্ত্রখণ্ড, শাদা কাগজ অথবা কালো বোর্ডে দৃষ্টিপাত করিলে, ঐ পটের উপর উদ্দীপক বর্ণখণ্ডের সমাকার কিন্তু বিজাতীয় বা পরিপূরক যথাক্রমে সবুজ, লাল, নীল ও পীত বর্ণখণ্ড দেখা যাইবে। অর্থাৎ লাল রং সংবেদনের অসবর্ণ অনুসংবেদন সবুজ এবং সবুজের লাল পীত বা হলুদের নীল এবং নীলের পীত বা হলুদ। অসবর্ণ অনু-সংবেদন উহার 'সংবেদনের পরিপূরক (কম্‌প্লিমেণ্টারি)। লাল অসবর্ণ অনুসংবেদন সবুজের সংবেদনের এবং সবুজ লালের পরিপূরক। আবার পীত অসবর্ণ অনুসংবেদন নীলের সংবেদনের এবং নীল পীতের পরিপূরক। পরিপূরক বর্ণ বা রং বলিতে এমন দুইটি বর্ণ বা রংকে বুঝায় যাহাদের মিশ্রণ ফল শাদা বা আলোক-সংবেদন—অর্থাৎ **যে দুইটি রংকে যথাযোগ্য পরিমাণে মিশাইলে শাদা বা আলোক-সংবেদন উৎপন্ন হয় উহাদিগকে পরিপূরক বর্ণ বা রং বলে।**

অসবর্ণ অনুসংবেদন সবর্ণ অনুসংবেদনের মত অস্থির এবং ক্ষণিক। ইহা একবার আসে আবার চলিয়া যায়। এই পরিবর্তন (ফ্লাক্‌চুয়েশন্) ২০ হইতে ৩০ বার পর্যন্তও ঘটিতে পারে। অনুসংবেদনের ক্ষণিকতার কারণ কি? কাহারও কাহারও মতে চক্ষুর অজ্ঞাত সঞ্চালন বা আন্‌কন্‌সাচ্ মুভ্‌মেণ্ট্‌ই অনুসংবেদনের গতিশীলতার কারণ। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে অনুসংবেদনের গতিশীলতা উহার নিজস্ব নিয়ম এবং স্বভাব।

অনুসংবেদন উৎপন্ন করিতে হইলে (১) উদ্দীপক বস্তুর প্রতি বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক, (২) আবার উহার প্রতিক্রিয়ার উপর মনকে কেন্দ্রীভূত

করাও আবশ্যক। চক্ষুর সামান্যতম ইচ্ছাকৃত সঞ্চালনও দর্শন অনুসংবেদনের প্রতিবন্ধক হইতে পারে। অনিচ্ছাকৃত চক্ষুসঞ্চালন প্রতিবন্ধক হইলেও ইহার প্রতিকার নাই।

অনু-প্রতিরূপ

অনু-সংবেদনকে অনেকেই অনু-প্রতিরূপ (আফ্‌টার-ইমেজ্‌) বলিয়াছেন। তাঁহাদের এই নামকরণ সহজবোধ্য। সংবেদন উদ্দীপকের উপস্থিতিতেই ঘটিয়া থাকে। উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে যে মানসবৃত্তি ঘটে তাহাকে সংবেদন বলা চলে না, কিন্তু প্রতিরূপ বলিতে হয়। সুতরাং উদ্দীপকের উপস্থিতিতে যে সংবেদন হয় তাহা অপসৃত হইলে উহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে মানসবৃত্তি ঘটে তাহাকে অনু-সংবেদন না বলিয়া অনু-প্রতিরূপ বলা সঙ্গত।

এই মতভেদের মীমাংসা প্রসঙ্গে বলিতে হয় যে উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে ঘটিলেও, অনু-সংবেদন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ারূপেই ঘটিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, স্পষ্টতার দিক দিয়াও অনু-সংবেদন সংবেদনের অনুরূপ। উপরন্তু ইহা পাত্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, যেমন অল্পাধিকরূপে প্রতিরূপ করে। ইহা উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে ঘটিলেও সংবেদনের মতই জ্ঞাত হয় এবং ইহাকে সংবেদন বলা হয় না, কিন্তু বলা হয় অনু-সংবেদন অথবা সংবেদনের একটি পশ্চাদ্বর্তী অবস্থা। সুতরাং ইহাকে অনু-সংবেদন বলা অসঙ্গত নয়।

৩। পরিপূরক বর্ণ (কম্‌প্লিমেণ্টারি কালার্‌)

যে দুইটি বর্ণকে মাত্রানুযায়ী মিশ্রণ করিলে শাদা বা বর্ণহীন আলোক উৎপন্ন হয় উহাদের একটিকে অপরটির পরিপূরক বা কম্‌প্লিমেণ্টারি বর্ণ বলে। ইহাদের একটি অপরটির বিপরীত। যেমন পীত এবং আস্‌মানী নীল পরস্পর পরস্পরের বিপরীত বা পরিপূরক বর্ণ। বর্ণালীর লাল সবুজের পরিপূরক নয়, কিন্তু ইহা একপ্রকার নীলাভ-সবুজের পরিপূরক, কারণ বর্ণালীর লাল বিশুদ্ধ লাল নয়, কিন্তু পীতাভ লাল। বর্ণালীর বাহিরে যে বিশুদ্ধ লাল কল্পিত হয় এবং যাহা মনোবিদ্যার দিক হইতে বিশুদ্ধ লাল, তাহার পরিপূরক অবশ্যই সবুজ। বর্ণালীর বিশুদ্ধ নীলের সহিত বিশুদ্ধ পীতের মাত্রানুযায়ী মিশ্রণ ফলেও বর্ণহীন আলোক উৎপন্ন হয়। আবার বিশুদ্ধ লাল এবং বিশুদ্ধ সবুজ মিশ্রিত করিলেও অনুরূপ-ভাবে শাদা এবং বর্ণহীন আলোক পাওয়া যায়।

সুতরাং লাল-সবুজ এবং পীত-নীল বর্ণগুলির এক এক জোড়ার এক একটি অপরটির পরিপুরক বর্ণ। প্রত্যেক বর্ণেরই পরিপুরক আছে। শুধু তাহাই নয়। শাদা এবং কালো বর্ণ নয়, কিন্তু আলোক এবং আলোকাভাব। ইহাদেরও একটি অপরটির পরিপুরক।

৪। বর্ণ-বৈসাদৃশ্য (কালার্ কন্‌ট্র্যাস্ট্)

দেখা গিয়াছে যে বর্ণ-সংবেদনের প্রতিক্রিয়ারূপে উহার অসবর্ণ অনুসংবেদন ঘটে। এই ঘটনা বা ফেনোমেননকে বলে বর্ণ-বৈসাদৃশ্য বা কালার্ কন্‌ট্র্যাস্ট্। যেমন পীতবর্ণ সংবেদনের প্রতিক্রিয়ারূপে উহার বিপরীত নীল বর্ণের অসবর্ণ অনুসংবেদন ঘটে। এই ঘটনাটি একটি বর্ণ-বৈসাদৃশ্যের ঘটনা।

বর্ণ-বৈসাদৃশ্য দুই প্রকার, যথা সমকালীন বা যুগপৎ (সিমাল্‌ট্যানিয়াস্) এবং পরবর্তীকালীন বা অনুবর্তী (সাক্সেসিভ্) বৈসাদৃশ্য।

সমকালীন বা যুগপৎ বৈসাদৃশ্য

দুইটি রং একই সময়ে পাশাপাশি বা একটির উপরে বা নীচে আর একটি থাকিলে, উহার একটি অপরটির পরিপূরক রং-এর দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়। এই বর্ণ-বৈসাদৃশ্যের নাম সমকালীন বৈসাদৃশ্য। যেমন একটি শাদা কাগজের উপর একটি লাল রং-এর খণ্ড বা টুক্‌রা স্থাপন করিয়া উহাদিগকে একটি শাদা টিস্যু কাগজ দিয়া ঢাকিলে, শাদা রং-এর কাগজটি নীলাভ সবুজে অনুরঞ্জিত (টিন্‌জ্‌ড্) দেখা যায়।

অথবা নিম্নলিখিত নক্সার অনুরূপ একটি চক্রফলক বা ডিস্ক্ কাটিয়া লওয়া যাউক—ইহাতে শাদা অংশগুলি শাদার, কালো অংশগুলি কালোর এবং মলিন বা ছায়াচ্ছন্ন (শেডেড্) অংশগুলি কোনো রং-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।
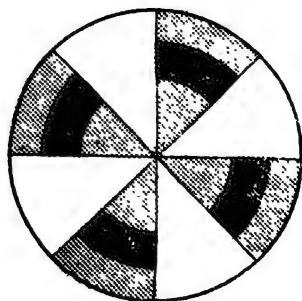
৪২নং চিত্র

এইবার এই চক্রফলকটিকে বর্ণচক্রে (কালার হুইল্) ঘুরানো যাউক। এইক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান চক্রফলকটির উপরিভাগ (সারফেস্) দেখা যাইবে ধূসর যাহাকে ঘিরিয়া থাকিবে একটি শাদাভ ঘের (রিং)। আবার কালোর পরিবর্তে রংটি

কমলা হইলে, চক্রফলকের উপরিভাগ দেখা যাইবে পীতাভ, যাহার চারি-দিকে রহিয়াছে একটি নীলাভ ঘের। রংটি সবুজ হইলে, দেখা যাইবে একটি ফিকে সবুজ বা সবুজাভ উপরিভাগ যাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে একটি লাল-বেগুনী (পার্প্লিশ্) ঘের বা রিং।

অনুবর্ত্তী বৈসাদৃশ্য

অনুবর্তী বর্ণ-বৈসাদৃশ্য (সাক্সেসিভ্) অসবর্ণ অনুসংবেদনের অনুরূপ। কিন্তু ইহারা অনুরূপ হইলেও অভিন্ন নয়। অসবর্ণ অনুসংবেদনে উহার সহিত প্রথম সংবেদনের কোনো সুস্পষ্ট পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্য জ্ঞান নাও থাকিতে পারে। যেমন লাল রংটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার পর উহা হইতে দৃষ্টি অপসরণ করিয়া একটি বর্ণহীন পটে তাকাইলে লাল রং-এর বিজাতীয় যে সবুজ রং দেখিতে পাওয়া যায় উহা অসবর্ণ অনুসংবেদনের দৃষ্টান্ত। এই অনুসংবেদনে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী রংটিকে তুলনামূলকভাবে দেখা হয় না। এই দুইটি রং বিসদৃশ হইলেও উহাদের বৈসাদৃশ্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। কিন্তু অনুবর্তী বর্ণবৈসাদৃশ্যে উহাদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

৫। বর্ণান্ধতা (কালার্ ব্লাইণ্ড্নেস্)

সাধারণভাবে বলিতে গেলে বর্ণদর্শনে অক্ষমতাই বর্ণান্ধতা। বর্ণান্ধ ব্যক্তি বিশ্বের বর্ণবৈচিত্র্য উপভোগ করিতে আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ণান্ধতা একটি বংশগত এবং দুরারোগ্য রোগ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ণান্ধতা চিকিৎসা-সাধ্য। নারী অপেক্ষা পুরুষই বেশী বর্ণান্ধতা-প্রবণ।

বর্ণান্ধতার প্রকার

(১) স্বভাবী বর্ণান্ধতা (নর্ম্যাল্ কালার্ ব্লাইণ্ড্নেস্)

বর্ণান্ধতা প্রথমতঃ দুই প্রকার—যথা স্বভাবী (নর্ম্যাল্) এবং অস্বভাবী (অ্যাব্নর্ম্যাল্)। স্বভাবী বর্ণান্ধতা সর্বসাধারণের মধ্যেই থাকে, কারণ ইহা রেটিনা বা অক্ষিপটের নিজস্ব ধর্ম। অক্ষিপটের সকল অংশই সমানভাবে বর্ণ-সংবেদনশীল নয়। ইহার তিনটি স্তর আছে—যথা বাহিরের, মধ্যের ও ভিতরের। অক্ষিপটের প্রথম বা বাহিরের স্তরটি (আউটারমোস্ট্ জোন্)

সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ (কম্প্লিট্‌লি কালার্‌-ব্লাইণ্ড্‌)। ইহাতে শুধু শাদা এবং কালো অর্থাৎ আলোক এবং অন্ধকারের সংবেদনশীলতা আছে। অক্ষিপটের দ্বিতীয় বা মধ্যম স্তরটি (ইণ্টার্‌মিডিয়েট্‌ জোন্‌) আংশিক বর্ণান্ধ (পার্শিয়্যালি কালার্‌-ব্লাইণ্ড্‌)। ইহা শাদা এবং কালো অথবা আলোক এবং অন্ধকারে সংবেদনশীল তো বটেই, তদতিরিক্ত নীল ও পীতবর্ণেও সংবেদনশীল। কিন্তু অক্ষিপটের এই মধ্যম স্তরটি লাল এবং সবুজ বর্ণ। অক্ষিপটের তৃতীয় বা ভিতরের স্তরটি (ইনার্‌মোস্ট্‌ জোন্‌) সম্পূর্ণ বর্ণ-সংবেদনশীল। অর্থাৎ, ইহা শাদা-কালো এবং নীল-পীত সংবেদন গ্রহণ করিতে পারে তো বটেই, তদতিরিক্ত লাল-সবুজ বর্ণ-সংবেদনও গ্রহণ করিতে পারে। এক কথায়, অক্ষিপটের তৃতীয় স্তরটি সকল প্রকার আলোক ও বর্ণ-সংবেদনে সক্ষম।

(২) অস্বভাবী (অ্যাব্‌নর্ম্যাল্‌) বর্ণান্ধতা

অস্বভাবী বর্ণান্ধতা সকলের অক্ষিপটে থাকে না। যাহাদের অক্ষিপট রোগগ্রস্ত তাহারাই অস্বভাবী বর্ণান্ধ।

অস্বভাবী বর্ণান্ধতা প্রথমতঃ দুই শ্রেণীর—যথা **আংশিক** (পার্শিয়্যাল্‌) এবং **সম্পূর্ণ** (কম্প্লিট্‌) আংশিক বর্ণান্ধতা আবার দুই শ্রেণীর—যথা লাল-সবুজ (রেড-গ্রীন্‌) এবং নীল-পীত (ব্লু-ইয়েলো)

আংশিক বর্ণান্ধতা

(১) লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা (রেড্‌-গ্রীন্‌ ব্লাইণ্ড্‌নেস্‌) দুই দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, এই বর্ণান্ধতায় আক্রান্ত লোকের সংখ্যা বেশী। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু লাল-সবুজ বর্ণ দুইটি জলে ও স্থলে সঙ্কেতরূপে (সিগ্‌ন্যাল্‌) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাদের বর্ণান্ধতা আত্মরক্ষা এবং দেশরক্ষার কাজে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। শতকরা প্রায় চার জন পুরুষ এবং একজন নারীর মধ্যে এই বর্ণান্ধতা দেখা যায়। ইহা বংশগত এবং দৈহিক। লাল-সবুজান্ধ ব্যক্তিকে বর্ণালী দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তাহার বর্ণ-সংবেদন নীল-পীত এই দুইটি বর্ণে সীমাবদ্ধ। কেহ কেহ লালকে কালো এবং সবুজকে ঘোর ধূসর দেখিয়া থাকে।

লাল-সবুজ বর্ণান্ধতার আবার দুইটি প্রকারভেদ রহিয়াছে। প্রথম প্রকারে লাল-সবুজান্ধ ব্যক্তি বর্ণালীকে স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যে দেখিতে পায়, কিন্তু লাল-

সবুজের পরিবর্তে নীল-পীত দেখিয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকার লাল-সবুজান্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বর্ণালীর দৈর্ঘ্য ছিন্ন হইয়া যায় যাহার ফলে লাল এবং বেগুনী রং কালো দেখায়। ভন্ ক্রজ্ এই দুই প্রকার লাল-সবুজান্ধ ব্যক্তিকে যথাক্রমে ডিউটারেনোপ্স্ এবং প্রোটেনোপ্স্ আখ্যা দিয়াছেন। প্রথমোক্ত প্রকারে পীতবর্ণ এবং দ্বিতীয়োক্ত প্রকারে সবুজবর্ণ উজ্জ্বলতম দেখায়। রিভার্স এই দুই শ্রেণীর নামকরণ করিয়াছেন যথাক্রমে ফটেরিথ্রাস এবং স্কটেরিথ্রাস্।

(২) নীল-পীত বর্ণান্ধতা পূর্বোক্ত বর্ণান্ধতার তুলনায় অনেক অল্পসংখ্যক ব্যক্তিতে ঘটিয়া থাকে। ইহা অক্ষিপটের কোনো রোগের সহিত জড়িত। ইহা বংশগত নয়, কিন্তু অর্জিত। নীল-পীত বর্ণান্ধতায় এই দুইটি বর্ণের মধ্যে গোলমাল ঘটে। রিচার্ডসন্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কোনো কোনো নীল-পীতান্ধ ব্যক্তি নীল বর্ণকে উজ্জ্বল শাদারূপে দেখিয়া থাকে। ভন্ ক্রজ্ এই বর্ণান্ধতার নামকরণ করিয়াছেন ট্রাইটানোপিয়া।

পূর্ণ বর্ণান্ধতা (কম্‌প্লিট্ কালার্-ব্লাইণ্ড্‌নেস্)

সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতা হইলে কোনো বর্ণই দেখা যায় না। এই জাতীয় বর্ণান্ধতা খুব কমই ঘটিয়া থাকে। সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ ব্যক্তির বর্ণালী কতগুলি বর্ণহীন অংশের সমষ্টি এবং এই ব্যক্তি বর্ণালীর অংশগুলির পার্থক্যকে শুধু আলোক বা উজ্জ্বলতার পার্থক্যরূপে দেখিতে পায়।

সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতাও দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি বর্ণালীর পীত স্থানটিকে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি ইহার সবুজ স্থানটিকে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পায়। সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতাকে এক্রোমোটোপিয়া বলা হয়। এই বর্ণান্ধতায় অক্ষিপটের পীতবিন্দুতে (কোভিয়া স্যেণ্ট্রালিস্) আলোক এবং বর্ণ এই উভয়েই অন্ধতা ঘটে। অবশ্য পীতবিন্দুর বাহিরে দর্শন-সংবেদন স্বাভাবিক থাকে।

৬। অন্ধ-বিন্দু (ব্লাইণ্ড্ স্পট্)

অক্ষিপটের একটি অংশ স্বভাবতঃ অন্ধ। ইহাকে অন্ধ-বিন্দু (ব্লাইণ্ড্ স্পট্) বলে। দর্শন-নার্ভ্ (অপ্‌টিক্ নার্ভ) মস্তিষ্ক হইতে আসিয়া অক্ষিগোলকের যে স্থানে প্রবেশ করিয়াছে ঐ স্থানটিই অন্ধ-বিন্দু। এই বিন্দুতে কোনো বস্তু প্রতিফলিত (ফোকাস্‌ড্) হইলে উহা অদৃশ্য থাকে।

x

পরীক্ষা

যদি বাম দিকের ক্রশ্ চিহ্নটিতে ডান চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায় এবং বাম চোখটি বন্ধ রাখা হয়, তবে চোখের সাত, আট ইঞ্চি দূরে বইখানি ধরিলে অন্ধ-বিন্দু প্রমাণিত হইতে পারে। বইখানি আস্তে আস্তে সামনের ও পিছনের দিকে সঞ্চালন করিলে কোনো সময়ে ডান দিকের বিন্দুটি অদৃশ্য হইয়া যায়। পাতাটিকে ঘুরাইয়া ধরিলে বাম চোখের অন্ধ-বিন্দুও অনুরূপভাবে নিরূপণ করা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ আমরা অন্ধ-বিন্দুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হই না, কারণ চারিপাশের সংবেদনশীল স্থানগুলির সংবেদন দিয়া আমরা অন্ধ-বিন্দুর শূন্য-সংবেদন স্থানটি মনে মনে পূর্ণ করিয়া লই।

৭। বর্ণ সংমিশ্রণ (কালার্ মিক্সিং)

বর্ণের বর্ণমাত্রত্ব (হিউ) নির্ভর করে অক্ষিপটের উদ্দীপক অথবা ইথর-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর। হেলম্‌হোল্‌জ্-প্রদত্ত বর্ণতালিকায় ইহা দেখানো হইয়াছে। ইথর-তরঙ্গের নানা দৈর্ঘ্য মিশ্রিত করিলে কি ফল হয় দেখা যাউক।

পীত বর্ণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সবুজ বর্ণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সহিত মিশ্রিত হইলে পীতাভ-সবুজ বর্ণের সংবেদন ঘটে। এই নিয়ম অনুসারে নিম্নরূপে বর্ণসংমিশ্রণ করা যাইতে পারে। বর্ণগুলিকে চক্ষুর উপর যুগপৎ বা একসঙ্গে না ফেলিয়া পর পর অথচ এত তাড়াতাড়ি ফেলা হয় যে উহারা যেন যুগপৎ বা একই সময়ে অক্ষিপটকে উদ্দীপিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অক্ষিপটের প্রতিক্রিয়া-প্রণালী অনুসারে প্রত্যেক উদ্দীপনক্রিয়া উদ্দীপকটির পরেও কিছুক্ষণ চলিতে থাকে। বর্ণগুলির ঘূর্ণন ক্রিয়া বাড়াইলে মিশ্রণ ঘটে।

পরীক্ষা প্রণালী

বর্ণচক্রকে (কালার্-হুইল্) উপযুক্ত আলোকে স্থাপন করিতে হয়। যে বর্ণের মিশ্রণ ঘটাইতে হইবে মাত্রা অনুসারে উহাদের চক্রফলক কাটিয়া লইয়া বর্ণচক্রে বসাইয়া দিতে হয়। তারপর বর্ণচক্র বেগে ঘুরাইয়া দিলেই বর্ণগুলির মিশ্রণ ঘটে এবং অনেকগুলি বর্ণের পরিবর্তে উহাদের মিশ্রিত একটি বর্ণ দেখা যায়। যেমন লাল এবং পীত বর্ণ সমানভাবে মিশাইলে কমলা রং পাওয়া

যায়। মিশ্রণের ফলে দেখা যায় যে বর্ণালীর সাতটি বর্ণই লাল, সবুজ, পীত এবং নীল এই চারটি বর্ণের বিভিন্ন মাত্রায় সংমিশ্রণ হইতে উৎপন্ন। এমন কি লাল, সবুজ এবং নীল এই তিনটি বর্ণের সংমিশ্রণেই সকল বর্ণ পাওয়া যাইতে পারে। এই কারণে এই তিনটিকেই অনেকে মুখ্য বা মৌলিক বর্ণ বলিয়াছেন।

বর্ণহীন সংবেদন উৎপাদনের বিভিন্ন প্রণালী

শাদা আলোক নানাপ্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে। (১) যে বর্ণচক্রে বর্ণালীর সকল বর্ণগুলিই মাত্রানুসারে বসানো হইয়াছে তাহা ঘুরাইলে বর্ণহীন শাদা সংবেদন উৎপন্ন হয়। (২) দ্বিতীয়তঃ, উপরোক্ত চারটি বর্ণ মিশ্রণ করিলেও বর্ণহীন বা শাদা আলোক উৎপন্ন হয়। (৩) তৃতীয়তঃ, তিনটি মুখ্য বা প্রধান বর্ণকেও মাত্রানুযায়ী মিশাইলে বর্ণহীন আলোক পাওয়া যায়। (৪) চতুর্থতঃ, পরিপূরক বর্ণের (কম্‌প্লিমেণ্টারি) সংমিশ্রণেও বর্ণহীন শুভ্র আলোক পাওয়া যাইতে পারে।

৮। দর্শন উপযোজন (অ্যাকোমোডেশন্) এবং প্রতিযোজন (অ্যাডাপ্‌টেশন্)

উপযোজন যান্ত্রিক

দর্শন উপযোজন বা অ্যাকোমোডেশন্ এবং প্রতিযোজন বা অ্যাডাপ্‌টেশন্-এর সাধারণ অর্থ একই। "পুনঃ পুনঃ উদ্দীপনার ফলে সংবেদন-প্রতিক্রিয়ার যে পরিবর্তন ঘটে তাহাকে উপযোজন এবং প্রতিযোজন বলে।" **এই দুইটি দর্শন প্রক্রিয়ার অর্থ হইল চক্ষুকে দৃশ্য বস্তুর সহিত মানাইয়া বা খাপ খাওয়াইয়া লওয়া।** তবে প্রথম প্রক্রিয়াটি চক্ষুর বিভিন্ন অংশকে—বিশেষ করিয়া অক্ষিমুকুর বা লেন্‌স্‌কে দৃশ্যবস্তুর ক্ষুদ্রতা বা বিশালতা, দূরত্ব বা নৈকট্য অনুসারে পরিবর্তিত করা বুঝায়। যেমন একটি নিকট বা দূরের বস্তুকে দেখিতে হইলে লেন্‌স্-এর কার্ভেচার্ বা বক্রতার পরিবর্তন করিতে হয়। নিকট বস্তু দেখিতে হইলে ইহা কম এবং দূরের বস্তু দেখিতে উহা বেশী হয়। এই বক্রতার পরিবর্তন সাধিত হয় সিলিয়ারি পেশীর (সিলিয়ারি মাস্‌ল্‌স্) সাহায্যে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে **উপযোজন ক্রিয়াটি প্রধানতঃ যান্ত্রিক অথবা চক্ষুযন্ত্রের।**

প্রতিযোজন মানসিক

প্রতিযোজন বলিতে বুঝায় পুনঃ পুনঃ উদ্দীপনার ফলে প্রতিক্রিয়ার ক্রমিক পরিবর্তন এবং সামঞ্জস্য বিধান—যেমন, প্রখর দিবালোক হইতে আসিয়া সাধারণ আলোকিত ঘরে প্রবেশ করিলে প্রথমে ঘরের আসবাবপত্র প্রভৃতি আব্ছা এবং অস্পষ্ট দেখায়। কারণ প্রখর দিবালোকে প্রতিযোজিত (লাইট্ অ্যাডাপ্টেড্) হওয়ায় চক্ষু অন্ধকারে অপ্রতিযোজিত (ডার্ক্নেস্ নন্-অ্যাডাপ্-টেড্) হইয়াছে। কিন্তু ঘরে কিছুক্ষণ থাকিলেই উহার আস্‌বাবপত্র স্পষ্টতর হইতে থাকে। কারণ এইবার চক্ষু অন্ধকারের সহিত প্রতিযোজিত (ডার্ক্নেস্ অ্যাডাপ্টেড্) হইয়াছে এবং হঠাৎ দিবালোকে গেলে ঐ আলোক তুঃসহ লাগিবে, অথবা চক্ষু ঝল্সাইয়া যাইবে। আবার রঙীন চশমা পরিলে চক্ষু প্রথমে চশমার রং-এ অপ্রতিযোজিত থাকে—ফলে সকল দৃশ্যবস্তুই চশমার রং অনুসারে রঙীন দেখায়। আবার ব্যবহারের ফলে চক্ষু চশমায় অভ্যস্ত হইয়া গেলে দৃশ্যবস্তুগুলি আর রঙীন দেখা যায় না।

প্রতিযোজনের ফলে উহার বস্তু সম্বন্ধে আর কোনো অসুবিধা থাকে না—উহাবা একপ্রকার 'গা-সওয়া' হইয়া যায় এবং উহাদের বৈচিত্র্য বা চমকপ্রদতা কমিয়া যায়। নূতন দেশের নৈসর্গিক শোভা দেখিয়া কোনো বিদেশী হয়ত ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠেন। কিন্তু উহা ঐ দেশের স্থায়ী বাসিন্দাদের মনে হয়ত কোনো রেখাপাত করে না। এইরূপ পার্থক্যের কারণ এই যে বিদেশী এই দেশের দৃশ্যের সহিত উপযোজিত হন নাই। কিন্তু দেশের বাসিন্দাগণ ইহার দৃশ্যদর্শনে উপযোজিত হইয়াছেন।

৯। গোধূলি দর্শন (টোয়াইলাইট্ ভিশন্)

ফোভিয়া বা পীতবিন্দুই স্পষ্টতম আলোক দর্শনের স্থান। কিন্তু অন্ধকারে প্রতিযোজিত অবস্থায় এই পীতবিন্দুই হইয়া দাঁড়ায় সর্বাপেক্ষা কম আলোক-সংবেদনশীল অক্ষিপটের অংশ। পীতবিন্দুকে রাত্র্যন্ধ বলা যাইতে পারে। অক্ষিপটের বহিঃপ্রান্ত (পেরিফেরি) পীতবিন্দু অপেক্ষা গোধূলি বা রাত্রিদর্শনে অধিকতর প্রতিযোজিত। পীতবিন্দু শঙ্কু (কোন্)-প্রধান এবং শঙ্কু দিবালোক দর্শনের সহিত প্রতিযোজিত। অপর পক্ষে অক্ষিপটের বহির্মণ্ডল রড্ বা দণ্ড-প্রধান এবং দণ্ড অন্ধকার দর্শনের সহিত প্রতিযোজিত। নিশাচর পক্ষীরা, যেমন পেচক অথবা বাদুড়, দিবালোকে দেখিতে পায় না। উহারা

দিবান্ধ। উহারা রাত্রির অন্ধকারে দেখিতে পায়, কারণ উহাদের অক্ষিপটে শুধু দণ্ডই (রড্) আছে, কিন্তু শঙ্কু নাই। আবার বিড়াল, বাঘ, কুকুর প্রভৃতি পশুরা দিবালোকে এবং রাত্রির অন্ধকারে সমান দেখিতে পায়। উহাদের অক্ষিপটে দণ্ড এবং শঙ্কু হয়ত সম-পরিমাণে আছে। কিন্তু মানুষ দিবালোকেই দেখিতে পায়। উহারা রাত্রির কন্ধকারে দৃষ্টিহীন, .কারণ মানুষের অক্ষিপটে শঙ্কুই প্রধানভাবে এবং দণ্ড অপ্রধানভাবে রহিয়াছে।

১০। পার্‌কিন্‌জে ব্যাপার (পার্‌কিন্‌জে ফেনোমেনন্)

ধরিয়া লওয়া যাউক, যে চক্ষু অন্ধকার-প্রতিযোজিত (ডার্ক্‌নেস্ অ্যাডাপ্‌টেড্) হইয়া রহিয়াছে। যদি এই অবস্থায় একটি অস্পষ্ট আলোকিত ঘরে প্রবেশ করিয়া বর্ণালী দেখা যায় তাহা হইলে উহা বর্ণহীন দেখাইবে। তাই বলিয়া বর্ণালীর সকল অংশগুলিই সমানভাবে আলোকিত অথবা উজ্জ্বল দেখা যাইবে না, কিন্তু বিভিন্ন অংশগুলি বিভিন্ন মাত্রায় আলোকিত বা উজ্জ্বল দেখাইবে। বর্ণালীর লাল প্রান্ত অস্বাভাবিক অন্ধকার, নীল প্রান্ত অধিক উজ্জ্বল দেখা যাইবে এবং উহার উজ্জ্বলতম প্রান্ত পীত বা হলুদ স্থান হইতে সবুজ স্থানে পরিবর্তিত হইবে।

অন্ধকার এবং আলোকে প্রতিযোজন অনুসারে উজ্জ্বলতম বর্ণের এইরূপ স্থানান্তর বা স্থান পরিবর্তন আবিষ্কার করিয়াছেন অস্ট্রীয় গবেষক পার্‌কিন্‌জে। তাঁহার নাম অনুসারে উল্লিখিত পরিবর্তনের নাম হইয়াছে পার্‌কিন্‌জে ফেনোমেনন্।

১১। ইয়ং-হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌-এর দর্শন-মতবাদ—ইয়ং-হেল্‌ম্‌হোল্‌জেস্ থিওরি অফ্ ভিশন্

দর্শন সংবেদনের বিভিন্ন ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইয়ং এবং হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্ যে মত উপস্থাপিত করিয়াছেন উহার নাম ইয়ং-হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্ দর্শন-মতবাদ। এই মতবাদের প্রথম সূত্রপাত করিয়াছিলেন টমাস্ ইয়ং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে এবং উহার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে।

এই মতে মৌলিক বর্ণের সংখ্যা তিনটি—যথা, নীলাভ লাল (কার্মাইন্ রেড্), পীতাভ সবুজ (ইয়েলোইশ্ গ্রীন্) এবং সমুদ্রপারস্থিত নীল (আল্‌ট্রামেরিন্ ব্লু)।

অক্ষিপটে (রেটিনা) তিনটি নার্ভ আছে যাহা উল্লিখিত তিনটি বর্ণ-সংবেদনের উপযোগী। ইহাদের প্রত্যেকটি এক একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য (লেন্থ্ অফ্ ইথর্ ওয়েইভ্স্) দ্বারা উদ্দীপিত হয়। বর্ণালীর দীর্ঘতম তরঙ্গপ্রান্ত প্রথমটিকে, উহার মাঝামাঝি দীর্ঘ তরঙ্গপ্রান্ত দ্বিতীয়টিকে এবং হ্রস্বতম তরঙ্গপ্রান্ত উহার তৃতীয়টিকে উদ্দীপিত করে।

এই মতবাদের আধুনিক সংস্করণে তিন প্রকার 'আলোক-রাসায়নিক' পদার্থ (ফটোকেমিক্যাল্ সাব্স্ট্যান্স্) এই তিনটি নার্ভ-এর স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

উক্ত তিনটি নার্ভ বা আলোক-রাসায়নিক পদার্থের সমান উদ্দীপনা হইলে বর্ণহীন সংবেদন এবং ভিন্ন মাত্রায় হইলে বর্ণালীর সকল বর্ণগুলি উৎপন্ন হয়। আবার যখন ইহারা একেবারেই উদ্দীপিত হয় না, তখন উৎপন্ন হয় কালো বা অন্ধকারের সংবেদন।

সমালোচনা

বর্ণ মতবাদের যাথার্থ্য নির্ভর করে উহার বর্ণ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ঘটনা ব্যাখ্যা করিবার উপযোগিতার উপর। ইয়ং-হেল্ম্‌হোল্জ্-এর দর্শন-মতবাদ এইরূপ অনেকগুলি ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিযাছে আবার কতগুলির করে নাই।

প্রথমতঃ **বর্ণ-সংমিশ্রণ** (কালার্ মিক্সিং) মোটের উপর সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যাত হয় তিনটি মৌলিক বর্ণের সংমিশ্রণ দ্বারা। কিন্তু **বর্ণবৈসাদৃশ্য** (কালার্ কনট্র্যাস্ট্) ব্যাখ্যায় এই মতবাদের দোষ প্রকট হইয়া পড়ে। এই মতানুসারে অনুবর্তী (সাক্সেসিভ্) বৈসাদৃশ্যের ব্যাখ্যা এইরূপ। **সবর্ণ অনু-সংবেদন অক্ষিপটীয় জড়তা** (রেটিন্যাল্ ইনার্শিয়া) বিশেষ। "লাল" পদার্থটি (রেড্ সাব্স্ট্যান্স্) একবার উদ্দীপিত হইলে উদ্দীপক অপসারিত হওয়া সত্ত্বেও এই উদ্দীপনা থামে না, কিন্তু চলিতে থাকে। ফলে একটি লাল সবর্ণ অনুসংবেদন ঘটে। আবার **অসবর্ণ অনুসংবেদন** ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই মতবাদ **অক্ষিপটীয় ক্লান্তির** (রেটিন্যাল্ ফেটিগ্) আশ্রয় লয়। যেমন "লাল" নার্ভ বা পদার্থটি উদ্দীপনার ফলে ক্লান্ত বা অবসন্ন হইয়া পড়ে, ফলে বাকী দুইটি, বিশেষ করিয়া সবুজ পদার্থ ক্রিয়াশীল হয়, সুতরাং সবুজ সংবেদন ঘটে। কিন্তু ক্লান্তি বা অবসাদকে অসবর্ণ অনুসংবেদনের সন্তোষজনক কারণ বলা যায় না, কারণ অসবর্ণ অনুসংবেদন উৎপন্ন করিবার জন্য উদ্দীপকের

প্রতি অল্পকালস্থায়ী মনোযোগ দরকার হয়, সুতরাং কোনো নার্ভ বা পদার্থের ক্লান্ত হইবার কথা নয়।

আবার **যুগপৎ বা সমকালীন বর্ণ-বৈসাদৃশ্যের** (সিমাল্‌ট্যানিয়াস্‌ কন্‌ট্র্যাস্ট্‌) **ব্যাখ্যাটি** হেলম্‌হোলজ্‌-এর কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়। সবুজ পটভূমির উপর স্থাপিত একটি ধূসর বর্ণখণ্ডকে কেন রক্তিমাভ দেখা যায়? হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌ বলেন যে আমরা সবুজের একটু অংশকে স্বচ্ছ বলিয়া কল্পনা করি এবং এই কল্পিত সবুজের মধ্য দিয়া ধূসর দেখি। অতীত অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের জানা আছে যে সবুজের মধ্য দিয়া ধূসরকে ধূসর দেখিতে হইলে ইহা অবশ্যই রক্তিমাভ হইবে। সমালোচনায় বলা যাইতে পারে যে সাধারণতঃ অতীত অভিজ্ঞতার ফলে বৈসাদৃশ্য না বাড়িয়া ব্যাহতই হইয়া থাকে।

এই মত **বর্ণান্ধতার ব্যাখ্যা** এইরূপে করে। সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতার কারণ তিনটি আলোক—রাসায়নিক পদার্থেরই অভাব বা বিকৃতি। আবার আংশিক বর্ণান্ধতার কারণ কোনো একটি নার্ভ বা পদার্থের অভাব বা বিকৃতি। এইরূপ ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে বর্ণান্ধতা এক বা একাধিক পদার্থের অভাবজনিত হইলে বর্ণান্ধ ব্যক্তির আলোক-সংবেদন অসম্ভব হইয়া পড়ে, কারণ এই সংবেদন তিনটি মৌলিক বর্ণের সংমিশ্রণ ফল।

তাহা ছাড়া এই মতবাদের প্রধান অসুবিধা এই যে ইহা শাদা বা বর্ণহীন আলোক সংবেদনের গ্রাহক কোনো নার্ভ বা পদার্থ স্বীকার করে নাই।

১২। হেরিং-এর দর্শন-মতবাদ
(হেরিং'স থিওরি অফ্‌ ভিশন্‌)

হেরিং এবং লিওনার্ডো-এর মতবাদটি ইয়ং-হেল্‌ম্‌হোলজ্‌ মতবাদ হইতে পৃথক।

হেরিং এবং লিওনার্ডো দর্শন সংবেদনের যে মতবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা এই।

দর্শন যন্ত্রে বা অক্ষিপটে অথবা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্কের অংশে তিনটি রাসায়নিক পদার্থ আছে। ইহারা ইথর তরঙ্গ দ্বারা বিভিন্নরূপে উদ্দীপিত হয়।

প্রত্যেকটি পদার্থের উদ্দীপনায় ভাঙন ও গড়ন (ডি-কম্পোজিশন্‌ অ্যাণ্ড্‌ রি-কম্পোজিশন্‌ বা অ্যানাবলিজম্‌ অ্যাণ্ড ক্যাটাবলিজম্‌)—এই দুইটি বিপরীত

ক্রিয়া চলিতে থাকে, যাহার ফলে বিপরীত বর্ণ-সংবেদন উৎপন্ন হয়। একটি পদার্থের ভাঙন ও গড়ন হইতে যথাক্রমে শাদা ও কালো, দ্বিতীয়টির অনুরূপ ক্রিয়ার ফলে হলুদ ও নীল এবং তৃতীয়টির ঐ প্রকার ক্রিয়ায় লাল ও সবুজ সংবেদন ঘটে। এইরূপে অক্ষিপটে মোটের উপর তিন জোড়ায় ছয়টি রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে শাদা-কালো, হলুদ-নীল এবং লাল-সবুজ, এই ছয় প্রকার দর্শন-সংবেদন ঘটে।

প্রত্যেকটি রাসায়নিক পদার্থের ভাঙন (ডি-কম্পোজিশন্, ডিসিমিলেশন্ অর্ ক্যাটাবলিজম্) এবং গড়ন (রি-কম্পোজিশন্, অ্যাসিমিলেশন্ অর্ অ্যানাবলিজম্) হইতে নিম্নরূপ সংবেদন ঘটে :—

লাল সংবেদন উৎপন্ন হয় লাল-সবুজ যন্ত্রের ভাঙন দ্বারা

কমলা " " " " " এবং হলুদ-নীল " " "

হলুদ " " " ———— " " " " "

সবুজ " " " লাল-সবুজ ———— " গড়ন "

নীল " " " ———— হলুদ-নীল " " "

বেগুনী " " " লাল-সবুজ যন্ত্রের ভাঙন এবং " " " " "

শাদা " " " শাদা-কালো " " ———————— "

কালো " " " " " " গড়ন ———————— "

ব্যাখ্যা

শাদা-কালো পদার্থটি প্রত্যেক আলোকের দ্বারাই উদ্দীপিত হয় বলিয়া সকল প্রকার বর্ণই অল্পবিস্তর উজ্জ্বল রূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু অপর দুইটি পদার্থ উদ্দীপিত হয় উহাদের বিশেষ উদ্দীপক ইথর-তরঙ্গের দ্বারা।

লাল-সবুজ অথবা হলুদ-নীল আলোক অক্ষিপটের একই অংশে পতিত হইলে এই বর্ণ দুইটি ভাঙন এবং গড়ন এই পরস্পর-বিরোধী ক্রিয়ার দ্বারা বিধ্বস্ত (ক্যান্‌সেল্‌ড্) হইয়া বর্ণহীন শাদা বা ধূসর সংবেদন উৎপন্ন করে।

অক্ষিপটের একই অংশে এবং একই সময়ে শাদা-কালো আলোক পতিত হইলে ইহারা পরস্পর পরস্পরকে বিধ্বস্ত করিলেও উহাদের মিশ্রণ ফলে ধূসর সংবেদন থাকে। উদ্দীপক থাকুক বা না থাকুক, অপ্‌টিক্ নার্ভ-এর সহিত সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্কের কোষগুলি (কর্টিক্যাল্ সেল্‌স্) সর্বদা উদ্দীপিত থাকে এবং অক্ষিপটের নিজস্ব আলোকরূপে (রেটিনা'জ্ অউন্ লাইট্) এই ধূসর সংবেদন

ঘটায়। হেরিং-এর মতে কালো বা অন্ধকারও একটি সদর্থক সংবেদন (পজিটিভ্ সেন্‌সেশন্)।

হেরিং হেল্‌মহোল্‌জ্-এর মতই বর্ণসংমিশ্রণ ব্যাখ্যা করেন। পরিপূরক বা বিপরীত বর্ণ-সংমিশ্রণে বর্ণহীন বা আলোক-সংবেদন ঘটে একই রাসায়নিক যন্ত্রের—যেমন লাল-সবুজের—বিপরীত ক্রিয়ায় একটি অপরটিকে বিধ্বস্ত (ক্যান্‌সেল্) করিবার ফলে।

সমালোচনা

কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যার অসঙ্গতি ধরা পড়ে **সাদা-কালোর সংমিশ্রণ ক্ষেত্রে।** শাদা-কালো যন্ত্রটি উদ্দীপিত হইলে উহার একটি অপরটিকে বিধ্বস্ত করে না, কিন্তু উৎপন্ন করে উহাদের মধ্যবর্তী ধূসর সংবেদন।

হেরিং **অনুসংবেদন** ব্যাখ্যা করেন নিম্নোক্তরূপে। সবর্ণ অনুসংবেদন ঘটে গঠনাত্মক প্রক্রিয়ায় ক্লান্তি বা অবসাদের জন্য, যাহার ফলে ভাঙন ক্রিয়া চলিতে থাকে। এই ব্যাখ্যাও অসঙ্গত। সবর্ণ অনুসংবেদনের অসবর্ণ অনু-সংবেদনে রূপান্তর ঘটে, যদি যে পটভূমিতে দৃষ্টিনিবদ্ধ করা হয় তাহা অনু-সংবেদনের পটভূমি অপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল হয়।

তাঁহার মতে **অসবর্ণ অনুসংবেদন** উৎপন্ন হয় দর্শন যন্ত্রগুলির সাম্যাবস্থা (ইকুইলিব্রিয়াম্) রক্ষা করিবার প্রবণতা (টেন্‌ডেন্‌সি) হইতে। যেমন 'লাল' ক্রিয়া উদ্দীপিত হইলে সাম্যাবস্থা ফিরিয়া আসিবার পূর্বে 'সবুজ' ক্রিয়াটিও উদ্দীপিত হয়। ফলে অসবর্ণ অনুসংবেদন ঘটে।

যুগপৎ বা সমকালীন বৈসাদৃশ্য (সিমাল্‌ট্যানিয়াস্ কনট্র্যাস্ট্) সম্পর্কে হেরিং-এর ব্যাখ্যা হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্-এর কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যার তুলনায় অধিক সন্তোষজনক। হেরিং বলেন যে অক্ষিপটের কোনো অংশের ক্রিয়া হইলে উহার বিপরীত ক্রিয়াটি নিকটবর্তী অংশে ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া সমকালীন বৈসাদৃশ্য ঘটে। হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্-এর মানস ব্যাখ্যার স্থলে হেরিং-এর ব্যাখ্যাটি শারীরবৃত্তীয়।

হেরিং-এর মতে **বর্ণান্ধতার** কারণ হইল অক্ষিপটে একটি বা একাধিক দর্শনযন্ত্রের অভাব। যেমন, লাল-সবুজ যন্ত্রটির অভাব হইলে লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা ঘটে, আবার হলুদ-নীল যন্ত্রটির অভাব হইলে হলুদ-নীল বর্ণান্ধতা ঘটিয়া থাকে। উপরন্তু এই দুইটিরই অভাব ঘটিলে সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতা উৎপন্ন হয়।

চক্ষুর বিভিন্ন স্তর

হেরিং-এর মতে সকল চক্ষুই অক্ষিপটের বহির্মণ্ডলে (পেরিফেরাল্, আউটার্‌মোস্ট্ জোন্) সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ, কারণ এই প্রান্ত বা স্তরটি শুধু শাদা এবং কালো বা বর্ণহীন আলোকের প্রতি সংবেদনশীল। আবার সকল চক্ষুই অক্ষিপটের মধ্যমণ্ডলে (মিড্‌ল, ইণ্টার্‌মিডিয়েট্ জোন্) আংশিক বর্ণান্ধ, কারণ ইহা শুধু শাদা-কালো এবং হলুদ-নীলের সংবেদনশীল। তৃতীয়তঃ, সকল চক্ষুই অক্ষিপটের কেন্দ্রীয় মণ্ডলে (সেণ্ট্র্যাল্ জোন্) সম্পূর্ণ বর্ণ-সংবেদনশীল। কারণ ইহার দ্বারা শাদা-কালো, হলুদ-নীল এবং লাল-সবুজ, হেরিং-প্রদর্শিত এই ছয়টি বর্ণ এবং আলোক সংবেদনই গৃহীত হয়।

১৩। ল্যাড্-ফ্র্যাঙ্ক্লিন্ মতবাদ

উপরোক্ত কোনো মতই অক্ষিপটের সংগঠনের প্রতি, বিশেষ করিয়া ইহাতে দণ্ড ও শঙ্কু (রড্‌স্ অ্যাণ্ড্ কোন্‌স্) কি পরিমাণে আছে তাহার প্রতি অবহিত হয় নাই। ল্যাড্-ফ্র্যাঙ্ক্লিন-এর মতে সকল বর্ণ সংবেদনের মূল কারণ হইল অক্ষিপটের একটি আদিম ধূসর পদার্থ যাহা অপরিণত অবস্থায় শুধু আলোক-সংবেদনই জন্মায়। ক্রমপরিণতির নিয়ম অনুসারে এই আদিম পদার্থটিই দণ্ড এবং শঙ্কুতে বিভক্ত হয়। দণ্ডগুলি শুধু আলোক সংবেদন এবং শঙ্কুগুলি এতদতিরিক্ত হলুদ এবং নীল সংবেদন উৎপন্ন করে। আবার ক্রমপরিণতির দ্বিতীয় স্তরে হলুদ উৎপাদক শঙ্কুগুলি লাল এবং সবুজ সংবেদন উৎপাদক দুইটি স্তরে পৃথকীকৃত হয়।

এই মতবাদটির দৃষ্টিভঙ্গী শারীরবৃত্তীয়। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা বৈজ্ঞানিক পরিণাম-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইহার অসুবিধা এই যে অক্ষিপটে শঙ্কুর উল্লিখিত পৃথকীকৃত অংশগুলি পাওয়া যায় না।

১৪। শব্দ-সংবেদনের (অডিটরি সেন্‌সেশন্) রূপ ও প্রকার

শব্দ সংবেদনের উৎপত্তি

শব্দ সংবেদনের উদ্দীপক, বায়ুতরঙ্গ (এয়ার্ ভাইব্রেশন্)। বায়ুতরঙ্গ কর্ণের বহিরংশ, যথা কক্ষা (অরিকল্) দ্বারা সংগৃহীত, কর্ণবিবর (অডিটরি মিয়েটাস্) দ্বারা কর্ণের অভ্যন্তরে প্রেরিত, কর্ণ-পটহ (টিম্পানিক্ মেম্‌ব্রেন্)

দ্বারা গৃহীত, ম্যালিয়াস্, ইন্‌কাস্, স্টেপিস্, এই তিনটি অস্থি দ্বারা নিয়মিত এবং অর্ধবৃত্তাকার নালীর (সেমি-সার্কুলার্ কেন্যাল্‌স্) মধ্য দিয়া চালিত হইয়া, কক্‌লিয়ার অর্গ্যান্ অব্ কর্ট্ অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ কর্ণের কেশ-কোষকে (হেয়ার্ সেল্‌স্) উদ্দীপিত করে। এই উদ্দীপনার ফলে কক্‌লিয়া-এর নিকটবর্তী শ্রবণ-নার্ভ (অডিটরি নার্ভ) উদ্দীপিত হইয়া বায়ুতরঙ্গকে নার্ভ-প্রবাহের আকারে মস্তিষ্কের শ্রবণ-কেন্দ্রে প্রেরণ করে। ফলে শ্রবণ-সংবেদন উৎপন্ন হয়।

নিয়মিত এবং অনিয়মিত বায়ুতরঙ্গ—স্বন এবং রব

বায়ুতরঙ্গ দুই শ্রেণীর—যথা নিয়মিত (পিরিয়ডিক্ অর্ রেগুলার্) এবং অনিয়মিত (এ-পিরিয়ডিক্ অর্ ইর্‌রেগুলার্)। নিয়মিত বায়ুতরঙ্গ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এবং অ-নিয়মিত বায়ুতরঙ্গ অনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কর্ণপটহে আঘাত করে। প্রথম বায়ুতরঙ্গের আঘাতে শোনা যায় স্বন বা সুর (মিউজিক্যাল্ সাউণ্ড্) এবং দ্বিতীয় বায়ুতরঙ্গের আঘাতে শোনা যায় রব বা গোলমাল (নয়েজ্)।

পীচ বা স্বনতীক্ষ্ণতা

বায়ুতরঙ্গের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য শব্দের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। বায়ুতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে শব্দের পীচ্ বা তীক্ষ্ণতা। বায়ুতরঙ্গগুলি যত তাড়াতাড়ি একটির পর আর একটি আসে, ইহারা দৈর্ঘ্যে তত ছোট হয় এবং স্বনও (টোন্) তত বেশী তীক্ষ্ণ হয়। আবার বায়ুতরঙ্গগুলি যত ধীর-গতিতে আসে, ইহাদের দৈর্ঘ্য তত বড় এবং স্বন-এর তীক্ষ্ণতাও তত কম হয়। এই **স্বনতীক্ষ্ণতাকে শব্দের পীচ্ বলে। স্বনতীক্ষ্ণতা নির্ভর করে নির্দিষ্ট সময়ে কতগুলি বায়ুতরঙ্গ কর্ণকে আঘাত করে তাহার উপর।**

স্বন-গভীরতা

দ্বিতীয়তঃ, স্বন-এর তীক্ষ্ণতা বা পীচ্ অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও ইহা গভীরতায় বা তীব্রতায় (ইন্‌টেন্‌সিটি) ভিন্ন হইতে পারে। গভীরতা বা তীব্রতার উপর **শব্দের উচ্চতা বা অনুচ্চতা** (লাউড্-নেস্ অর্ ফেইন্ট্‌নেস্) নির্ভর করে। **বায়ুতরঙ্গের উচ্চতা বা অনুচ্চতা (অ্যাম্‌প্লিচুড্) শব্দের গভীরতা বা তীব্রতার কারণ।**

উপস্বনতা বা টিম্বার্

তৃতীয়তঃ, শব্দের আর এক প্রকার পার্থক্যও লক্ষ্য করিবার মত। শব্দের এই গুণকে বলা হয় ইহার উপস্বনতা (টিম্বার্)। **উপস্বনতার কারণ হইল বায়ুতরঙ্গের গঠন (কম্পোজিশন্)।** উপস্বনতা প্রত্যেকটি বাদ্যযন্ত্রের সেই শব্দবৈশিষ্ট্য যাহা উহাকে অন্য বাদ্যযন্ত্রের শব্দ হইতে পৃথক বলিয়া বুঝায়। টিম্বার্-এর দ্বারাই আমরা একটি মানুষের কণ্ঠস্বরকে আর একটি মানুষের কণ্ঠস্বর হইতে পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারি।

ঝঙ্কার (ক্ল্যাঙ্গ্)—মূল স্বন এবং উচ্চ স্বন

উপস্বনতা বা টিম্বার্-এর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে সুর বা স্বন মৌলিক নয়, কিন্তু যৌগিক শব্দ। ইহাতে একাধিক স্বন বা টোন্ থাকে। এই **জটিল শব্দটিকে সমগ্ররূপে বলা হয় ঝঙ্কার** (ক্ল্যাঙ্গ্)। প্রত্যেক স্বন-এরই **একটি মূল স্বন** (ফ্যাণ্ডামেণ্ট্যাল্ টোন্) এবং **একাধিক উচ্চ স্বন** (ওভার-টোন্) থাকে। যেমন যদি একটি স্বন-এর কম্পন (ভাইব্রেশন্) প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০ হয়, তাহা উহার সহিত প্রতি সেকেণ্ডে ৬০০, ৯০০, ১২০০ প্রভৃতি কম্পন-বিশিষ্ট উচ্চ স্বন উৎপন্ন হয়। এই উচ্চ স্বনগুলিকে বলে ওভার্টোন্।

কাহারও কাহারও মতে শব্দের পীচ্, তীব্রতা, উপস্বনতা এই তিনটি গুণের অতিরিক্ত একটি চতুর্থ গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় শব্দের বিস্তার (ভলিযুম্)। যেমন সমুদ্র-গর্জনের বিস্তার (ভলিউম্) তীরে ক্রীড়ারত শিশুদের রব বা গোলমালের বিস্তার অপেক্ষা বেশী।

যুক্তস্বন, পার্থক্যস্বন এবং যোজিত স্বন

শব্দের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইতেছে। যদি এমন দুইটি স্বন, যাহাদের পীচ্ খুব নিকটবর্তী নয়, একসঙ্গে বাজিতে থাকে, তাহা হইলে মূল স্বন (ফাণ্ডামেণ্ট্যাল টোন্) এবং উচ্চ স্বন (ওভার-টোন) ছাড়াও, উহার সহিত অন্যান্য স্বন শ্রবণগোচর হয়। এই অতিরিক্ত স্বনগুলিকে বলা হয় যুক্ত-স্বন (কম্বিনেশন্ টোন্)।

যুক্তস্বন আবার বিভিন্ন শ্রেণীর হইতে পারে—ইহাদের মধ্যে পার্থক্য-স্বন (ডিফারেন্স্ টোন্) উল্লেখযোগ্য। দুইটি স্বন-এর মূল-স্বন-এর পার্থক্যকে পার্থক্য-স্বন বলে। যেমন ধরা যাউক যে উচ্চ এবং নিম্ন স্বন দুইটির মূল-স্বন-

এর কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে যথাক্রমে ৩০০ এবং ২০০; এই স্থলে উহাদের পার্থক্য-স্বন ৩০০ − ২০০ = ১০০ হইবে।

আবার পার্থক্য-স্বন-এর অতিরিক্ত আর এক প্রকার যুক্ত-স্বনও পাওয়া যাইতে পারে। ইহার নাম **যোজিত স্বন** (সামেশন্ টোন্)। যোজিত স্বন হইবে মূল-স্বনদ্বয়ের কম্পনের যোগফল। সুতরাং এই ক্ষেত্রে ৩০০ + ২০০ = ৫০০ কম্পন-বিশিষ্ট স্বনই যোজিত স্বন।

অধিকম্প (বিট্‌স্)

সাধারণতঃ স্বন-শূলের (টিউনিং ফর্ক্) সাহায্যেই শব্দ পরীক্ষা বা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ধরা যাউক যে দুইটি স্বন-শূলের স্বনকে সেকেণ্ডে ২৫৬ কম্পনবিশিষ্ট করা হইল। ঐ স্বন-শূল দুইটিকে একটি অনুনাদক বোতলের (রেজনেটিং বট্‌ল্) উপর ধরিলে উহাদের দুইটি স্বন মিশ্রিত বা একীকৃত হইবে। এইবার একটি স্বন-শূলের কাঁটার (প্রঙ্গ্) সহিত ভার যুক্ত করিয়া উহার স্বননকে প্রতি সেকেণ্ডে ২৫৫ কম্পনবিশিষ্ট করা হইল। এখন এই ২৫৫ এবং ২৫৬ কম্পনবিশিষ্ট দুইটি স্বন-শূলকে একত্র বাজানো হইলে, প্রতি সেকেণ্ড অন্তর এই দুই তরঙ্গ পরস্পর পরস্পরকে বর্ধিত (রি-এন্‌ফোর্স্) করিবে, যখন উহাদের চূড়া (ক্রেস্ট্[১]) মিলিত হইবে, অথবা কো-ইন্‌সাইড্ করিবে, আবার বিরোধিতা করিবে, যখন একটির চূড়া আর একটির খাঁজের (ট্রাফ্) সহিত মিলিত হইবে। উল্লিখিত **মিলন ও বিরোধের ফলে স্বন-এর গভীরতা বা তীব্রতার নিয়মিত উত্থান-পতনকে বলা হয় অধিকম্প (বিট্‌স্)।**

১৫। শ্রবণ মতবাদ (থিওরিজ্ অফ্ হিয়ারিং)

(ক) হেলম্‌হোল্‌জ্-এর মতবাদ

বিখ্যাত জার্মান্ মনীষী হেল্‌ম্‌হোলজ্ উপরোক্ত শব্দবৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া একটি প্রসিদ্ধ মতবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই শ্রবণ মতবাদকে প্রতিধ্বনিবাদ, অনুরণনবাদ, প্রতিনাদবাদ অথবা পিয়ানোবাদ

১ বায়ুতরঙ্গেরও সাধারণ জল-তরঙ্গের মত ওঠা-নামা অথবা উচ্চতা-নীচতা থাকে। একটি তরঙ্গের উচ্চ অংশকে উহার চূড়া (ক্রেস্ট্) এবং নিম্ন অংশকে উহার খাঁজ (ট্রাফ্) বলে।

(সিম্প্যাথেটিক্, রেজোন্যান্স, ভায়োলিন্ অর্ পিয়ানো থিওরি) প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করা হয়। একটি ধ্বনি কোনো স্থানে বাধাপ্রাপ্ত বা আহত হইয়া সেই স্থান হইতে প্রায় অবিকলভাবে ফিরিয়া আসে—এই প্রত্যাগত ধ্বনিকে প্রতিধ্বনি বলে। হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্ মনে করেন যে বাহিরের শব্দ-তরঙ্গও কর্ণের কোনো যন্ত্রাংশে অনুরূপভাবে প্রতিধ্বনিত বা অনুরণিত হয় অথবা উহাতে সহানুভূতিসূচক কম্পন সৃষ্টি করে।

হেল্‌ম্‌হোলজ্-এর মতে বেহালাদণ্ডের উপর যেমন তার বা তন্ত্রী থাকে এবং ঐ তারে বা তন্ত্রীতে যেমন আঘাত করা যায় সেইরূপ স্বর বাজিয়া ওঠে, তেমন আভ্যন্তরীণ কর্ণের বেসিলার্ মেম্‌ব্রেন্-এর উপর অসংখ্য কম্পনশীল তন্তু বা ফাইবার্ আছে যাহা বায়ুতরঙ্গের দ্বারা আহত হইয়া উহার সহিত সহানুভূতিশীল ভাবে কম্পিত হইতে থাকে এবং সেইজন্যই ঐ শব্দ শোনা সম্ভব হয়। বেসিলার্ মেম্‌ব্রেন-এর উপস্থিত প্রত্যেকটি তন্তু বা ফাইবার্-এর নিজস্ব কম্পন-তাল আছে। উহা শুধু ঐ কম্পনতালবিশিষ্ট বায়ুতরঙ্গের দ্বারা উদ্দীপিত হয় এবং অন্যান্য কম্পনতালবিশিষ্ট বায়ুতরঙ্গে সাড়াই দেয় না।

যেমন ধরিয়া লওয়া যাউক যে ২০০, ৩০০ এবং ৪০০ কম্পনবিশিষ্ট তিনটি শব্দতরঙ্গের সমষ্টি একটি শব্দ একই সময়ে কর্ণে প্রবেশ করিল। এই তিনটি শব্দতরঙ্গ কর্ণের একই যন্ত্রাংশ দ্বারা গৃহীত হইবে না। যে তিনটি তন্তুর কম্পনতাল যথাক্রমে ২০০, ৩০০ এবং ৪০০, উহারা এই তিনটি তন্তুর দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে গৃহীত হইবে। তাহা ছাড়া কোনো প্রধান স্বন-এর উচ্চ-স্বন, যুক্ত-স্বন, পার্থক্য-স্বন, যোজিত-স্বনও পৃথকভাবে গৃহীত হইবে সেই সকল তন্তু দ্বারা যাহাদের কম্পনতাল উহাদের কম্পনতালের অনুরূপ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে বেসিলার্ মেম্‌ব্রেন্-এর তন্তুগুলির দ্বারা একটি সমগ্র বা জটিল স্বন সমগ্রভাবে গৃহীত হয় না, কিন্তু হয় পৃথকভাবে। শব্দ সংবেদনের ব্যাপারে কর্ণের একটি প্রধান কাজ হইল সমগ্র শব্দটিকে বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেক শব্দাংশকে উহার সমধর্মী তন্তু দ্বারা গ্রহণ করা।

প্রমাণ

হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্-এর মতবাদ কয়েকটি প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়। স্বন-বধিরতা (টোন্ ডেফ্‌নেস্) ইহার অন্যতম প্রমাণ। পরীক্ষা করিয়া দেখা

গিয়াছে যে কুকুরের ককলিয়া-এর নিম্নাংশ নষ্ট করা হইলে উহা উচ্চ-স্বন শুনিতে পায় না। আবার উহার ককলিয়া-এর সর্বোচ্চ অংশ নষ্ট করা হইলে উহা নিম্ন-স্বন শুনিতে পায় না। এইরূপ ঘটনা শুধু হেল্ম্হোলজ্-এর মত দিয়াই ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষের ক্ষেত্রেও স্বন-বধিরতা এবং "স্বন-দ্বীপ" (আয়ল্যাণ্ড্ অফ্ হিয়ারিং) অথবা "স্বন-শূন্যতা" (টোনাল্ গ্যাপ্) এই মতবাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়। কোনো কোনো ব্যক্তি কতগুলি শব্দ বা স্বন শুনিতে পায় না, অথচ উহার উচ্চ বা নীচ গ্রামের শব্দ বা স্বন শুনিতে পায়।

সমালোচনা

কিন্তু হেল্ম্হোল্জ্-এর মতটির বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। (১) প্রথমতঃ, বেসিলার্ মেম্‌ব্রেন্-এর তন্তুগুলির দৈর্ঘ্য ·০৪ হইতে ·৪৯ মিলিমিটার হওয়ায় উহাদের পরিধি অত্যন্ত স্বল্প-পরিসর। পক্ষান্তরে যে সকল বায়ুতরঙ্গ শ্রবণযোগ্য শব্দ উৎপন্ন করে তাহাদের ব্যবধান বা পরিধি অন্ততঃ ১৬ হইতে ২২০০ কম্পন। এইরূপ বিশাল্ পরিধিবিশিষ্ট বায়ুতরঙ্গ কিরূপে পূর্বোক্ত স্বল্প-পরিসর তন্তুর দ্বারা গৃহীত হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। অনেকগুলি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কম্পনের ভার যদি এক একটি তন্তুর উপর চাপানো হয় শুধু তাহা হইলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ হইলে হেল্ম্হোলজ্-এর মতবাদন অচল হইয়া পড়ে, কারণ এই মত অনুসারে প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট বায়ুতরঙ্গ গ্রহণ করিবার উপযোগী একটি করিয়া তন্তু বেসিলার্ মেম্‌ব্রেনে রহিয়াছে।

(২) দ্বিতীয়তঃ তন্তুগুলি যেমন বেসিলার্ মেম্‌ব্রেন্-এর উপরে রহিয়াছে, তেমনই কেশ-কোষ (হেয়ার্ সেল্স্), যাহাকে রড্স্ অফ্ কর্টি অথবা অর্গ্যান্ অফ্ কর্টি বলা হয়, তাহাও উহাতে রহিয়াছে। সুতরাং তন্তুগুলির পক্ষে এই কেশ-কোষগুলি বোঝাস্বরূপ হইয়া পড়িতে পারে। ফলে উহাদের কম্পন-ক্ষমতাও অনেকাংশে কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

উপরোক্ত আপত্তি দুইটির কথা বাদ না দিলেও, ইহা স্বীকার করিতে হয় যে হেল্ম্হোলজ্-এর শ্রবণ-মতবাদ স্বন সম্বন্ধীয় অধিকাংশ ঘটনার ব্যাখ্যা করিতে পারে।

(খ) ইওয়াল্ড্-এর মতবাদ

ইওয়াল্ড্-এর শ্রবণ-মতবাদকে বলা হয় **শব্দ-চিত্র (সাউণ্ড-পিক্চার্) মতবাদ**। তিনি বলেন যে কৃত্রিম বেসিলার্ মেম্ব্রেন্-এর উপর একটি স্বন-শূল কম্পিত করিলে প্রত্যেকটি স্বন উহার উপর শব্দ-চিত্রাবলী গঠন করে। স্বন বেসিলার্ মেম্ব্রেন্-এর উপর ইহার সমগ্র শব্দ-চিত্র উৎপন্ন করিয়া কেশ-কোষগুলিকে উদ্দীপিত করে, যাহার ফলে স্বনশ্রবণ উৎপন্ন হয়।

(গ) ম্যাক্স্ মেয়ার্-এর মতবাদ

ম্যাক্স্ মেয়ার্ বলিয়াছেন সে স্বন-এর উচ্চতা নির্ভর করে বেসিলার্ মেম্ব্রেন্-এর উপর স্টেপিস্-এর আঘাতের ফলে। এই আঘাতের ফলে বেসিলার্ মেম্ব্রেন্ অবনমিত হয় বা নোয়াইয়া পড়ে। উল্লিখিত অবনমনই স্বন-এর উচ্চতা বা নিম্নতা সংবেদন উৎপন্ন করে। তাঁহার মতে স্বন-এর পীচ্ নির্ভর করে উক্ত অবনমনের পৌনঃপুনিকতার (ফ্রিকোয়েন্সি) উপর।

(ঘ) ওয়ায়েট্-এর মতবাদ

ওয়ায়েট্ সম্পূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাঁহার শ্রবণ মতবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি হেল্ম্হোল্জ্-এর শ্রবণ মতবাদ একেবারেই গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে শব্দের একটি বিশেষ গুণ হইল উহার বিস্তার (ভলিউম্)। তিনি আরও বলেন যে স্বনতীক্ষ্ণতা বা পীচ্ স্বন-এর নিজস্ব গুণ নয়, কিন্তু একাধিক স্বন-এর স্থানীয় পার্থক্য মাত্র।

ওয়ায়েট্-এব মতে শব্দ-সংবেদন যেরূপে উৎপন্ন হয় তাহা এই। শব্দ-তরঙ্গ কক্লিয়া-এর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার পথে বেসিলার্ মেম্ব্রেন্-এর উপর চাপ সৃষ্টি করে। ঐ চাপ বেসিলার্ মেম্ব্রেন্কে অবনমিত করে বা নোয়াইয়া দেয়। অবনমন বা নোয়াইবার মাত্রা নির্ভর করে শব্দ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যেব উপর। এই অবনমনের ফলে শব্দ-সংবেদনের ব্যাপ্তি, বিস্তার বা পরিমাণ (ভলিউম্) গুণটি উৎপন্ন হয়।

(ঙ) রাদারফোর্ড্-এর মতবাদ

রাদারফোর্ড্-এর মত অনুসারে কর্ণের বহিঃপ্রান্তীয় যন্ত্রগুলি টেলিফোন প্লেট-এর মত কাজ করে। উহারা কম্পনের নানা নক্সা বা প্যাটার্ণ গ্রহণ করে

এবং উহাদিগকে শ্রবণ-নার্ভ দিয়া মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। মস্তিষ্কে এই প্যাটার্ণ-গুলির বিশ্লেষণ ঘটে।

এই মতকে শব্দ শ্রবণের **টেলিফোন মতবাদ** বলে।

১৬। কর্ণের চেষ্টা-সংবেদন (কাইনেস্-থেটিক্ সেন্‌সেশন্)

কর্ণের সব কয়টি যন্ত্রই যে শ্রবণ-সংবেদন উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে তাহা নয়। অন্তঃকর্ণের ককলিয়াই শ্রবণ সংবেদনে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার অন্তর্ভুক্ত ভেস্‌টিবিউল্ এবং অর্ধবৃত্তাকার-নালীর (সেমি-সার্কুলার্ কেন্যাল্) কার্য অন্যরূপ। ভেস্‌টিবিউল্ এবং সেমি-সার্কুলার কেন্যাল্ শ্রবণ-সংবেদনে অংশ গ্রহণ করে না কিন্তু করে প্রধানতঃ শারীরিক অবস্থান (বডি পজিশন্) অথবা দেহ-সাম্য (ইকুইলিব্রিয়াম্) সংবেদনে। এই কারণে ইহাদিগকে ইকুইলিব্রিয়াম্ সেন্স্ এবং স্ট্যাটিক্ সেন্স্ বলা হইয়া থাকে।

অ্যাম্‌পুলার্ সেন্‌সেশন্

পায়ের গোড়ালীর উপর ভর দিয়া উপর্যুপরি কয়েকবার ঘুরপাক খাইয়া চোখ বন্ধ করিয়া স্থির হইলে মস্তিষ্কে একটি সঞ্চারণ সংবেদন (সুইমিং সেন্-সেশন্) অনুভূত হয়। ইহাকে মাথা-ঘোরা বোধও (সেন্স্ অফ্ গিডিনেস্) বলা হইয়া থাকে। এই সংবেদন উৎপন্ন হয় অর্ধবৃত্তাকার নালীতে সংগ্রাহক কোষ (রিসেপ্টর্ সেলস্) অ্যাম্‌পুলা-এর অংশ ক্রিস্টি-এর উদ্দীপনা হইতে। নানা জন্তুর উপর পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে অর্ধবৃত্তাকার নালীগুলির এইরূপ উদ্দীপনাই মস্তিষ্কের অবস্থান ও গতি সংবেদনের (হেড্ পজিশন্ অ্যাণ্ড্ মুভ্‌মেণ্ট্) কারণ। এই সংবেদনকে **ল্যাবিরিন্থাইন্ সেন্‌সেশন্**ও বলা হইয়া থাকে।

ম্যাক্-ব্রয়ের্-ব্রাউন্ মতবাদ অনুসারে মস্তিষ্কের যে কোনো গতি অর্ধ-বৃত্তাকার নালীগুলিকে প্রভাবিত করে, কারণ ইহারা উভয় কর্ণেই সমানভাবে দেশ অথবা স্পেস্-এর তিনটি মাত্রায় (ডাইমেন্‌শন্) স্থাপিত রহিয়াছে। তিন প্রকারে দেহ-সাম্য বোধ নষ্ট হইতে পারে, যথা উপরের সহিত নীচের, সম্মুখের সহিত পশ্চাতের এবং ডান দিক হইতে বাম দিকের সম্বন্ধ ভুল করিয়া। উপরে-নীচে, ডান-বামে এবং সম্মুখে-পশ্চাতে জোরে মাথা নাড়িলে সাময়িক মাথাঘোরা (গিডিনেস্) সংবেদন উপস্থিত হয়।

ঘুরপাক্ খাইলে অর্ধবৃত্তাকার নালীর তরল পদার্থ (ফ্লুইড্ সাব্স্ট্যান্স্) পিছনে পড়িয়া থাকে। এই তরল পদার্থের পশ্চাৎ অভিঘাতে ক্রিস্টা-এর কুপুলা নোয়াইয়া পড়ে। ফলে ক্রিস্টা-এর উপরে অবস্থিত সংগ্রাহক নার্ভ উদ্দীপিত হয় এবং মাথায় সুড়সুড়ির মত সঞ্চারণ সংবেদন অনুভূত হয়। ঘুরপাক খাওয়া বন্ধ করিয়া থাকিলে ঐ পিছনে অপসৃত তরল পদার্থ সাম্‌নের দিকে অগ্রসর হয় এবং কুপুলাকে বিপরীত দিকে নোয়াইয়া দেয়। ইহার ফলে সুড়সুড়ি বা সঞ্চারণ সংবেদনের (সুইমিং সেন্‌সেশন) গতি উল্টাইয়া যায়।

ভেস্‌টিবুলার্ সেন্‌সেশন্

ভেস্‌টিবুলার্ সেন্‌সেশন্ সমস্ত শরীরের অবস্থান সম্বন্ধে অনুভূতি উৎপন্ন করে। ইহা শরীরের ভার-সাম্যবোধ জাগায় এবং ইহার সাম্যাবস্থা (ইকুইলিব্রিয়াম্) রক্ষা করিতে সাহায্য করে। চক্রাকারে দোল খাইয়াও যে দেহের সাম্যবোধ বজায় থাকে তাহার কারণ কর্ণের ভেস্‌টিবিউল্ অংশ। জলে সাঁতার কাটিবার সময় এই অংশই গতির দিক (ডিরেক্‌শন) সম্বন্ধে চেতনা অক্ষুণ্ণ রাখে। যাহারা মূক-বধির (ডেফ্-মিউট্) তাহাদের ভেস্‌টিবিউল্ কার্যক্ষম থাকে না। ফলে তাহারা উক্ত সংবেদন হইতে বঞ্চিত।

কর্ণের চেষ্টা-সংবেদন নামক **উপরোক্ত সংবেদনগুলি শ্রবণ-সংবেদন নয়।** কিন্তু যেহেতু ইহারা কর্ণেরই কয়েকটি অংশের উদ্দীপনা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই কারণে শ্রবণ-সংবেদন অনুচ্ছেদেই উহাদের আলোচনা করা হইল। চেষ্টা-সংবেদন নামক সংবেদনের সহিত শ্রবণ-সংবেদনের কোনো সম্বন্ধ নাই।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেন্ট্স্ অফ্ সাইকলজি—নবম পরিচ্ছেদ

জি. এফ্. ষ্টাউট্—এ ম্যানুয়্যাল্ অফ্ সাইকলজি—দ্বিতীয় খণ্ড—চতুর্থ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এম্. কলিন্‌স্ অ্যাণ্ড্ জে. ড্রিভার্—এক্সপেরিমেণ্ট্যাল্ সাইকলজি—প্রথম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ই. বি. টিশ্‌নার—এ প্রাইমার্ অফ্ সাইকলজি—তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উড্‌ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস্—সাইকলজি—চতুর্দশ, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বোরিং, ল্যাংফেণ্ড, ওয়েল্ড্—ফাউণ্ডেশন্‌স্ অফ্ সাইকলজি—দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

Exercise

1. How does visual sensation take place? Point out the stages involved in this process. (p. 412)

2 What are the different kinds of visual sensation? Distinguish between the primary and the secondary colours. (pp. 412 414)

3. Distinguish between the psychological and physical treatment of colour. (p. 414)

4. What are the main characteristics of colour ? Distinguish between colour-hue, colour-tint and colour-saturation. (p. 415)

5. Define after-sensation. Distinguish between positive and negative after-sensation. (pp. 415-418)

6. What do you mean by complementary colours ? (pp 418-419)

7. Define colour-contrast. Distinguish between simultaneous and successive colour-contrast. (pp. 419-420)

8. Explain colour-blindness. Distinguish between its different types.

9. Write notes on : (a) blind spot ; (b) colour-mixing. (pp. 422-424)

10. Write notes on :—
 (a) The different methods of producing colourless sensation;
 (b) accommodation; (c) adaptation; (d) Purkinje phenomenon;
 (e) twilight vision. (pp. 424-426)

11. Distinguish between light accommodation and light adaptation. (pp. 424-425)

12. Give a critical exposition of Young-Helmholtz theory of colour vision. (pp. 426-428)

13. Critically expound Hering's theory of colour-vision (pp. 428-431)

14 Map out the *zones* of the retina. (p. 431)

15. Write short notes on the following theories of colour-vision :
 (a) Ladd-Franklin's ; (b) Young-Helmholtz's ; (c) Hering's. (pp. 426-431)

16. Explain how auditory sensation originates. What are the main properties of sound ? (pp. 431-434)

17. Distinguish between (a) pitch and intensity of sound and (b) tone and noise. (p 432)

18. Write notes on : (a) timbre ; (b) clang ; (c) fundamental tone (d) overtone ; (e) combination tone ; (f) difference tone ; (g) summation tone ; (h) beats. (pp. 432-434)

19. Give a critical exposition of Helmholtz's theory of Hearing. (pp. 434-436)

20. Explain and criticise the Resonance Theory of Hearing (pp.434-436)

21. Write notes on (a) Tonal island or gap ; (b) Ewald's Theory of Hearing ; (c) Max Meyer's Theory of Hearing ; (d) Wyatt's theory of Hearing and (e) Rutherford's Theory of Hearing. (pp. 436-438)

22. What do you mean by (a) Kinaesthetic sensation ; (b) Labyrinthine sensation and (c) Vestibular sensation. (pp. 438-439)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক, পেশীয়, এবং অন্যান্য সংবেদন—গাস্টেটরি, অল্‌ফ্যাক্টরি, কিউট্যানিয়াস্ অর্গ্যানিক্, মাস্কুলার্ অ্যাণ্ড্ আদার্ সেন্‌সেশন্‌স্

১। স্বাদ সংবেদন (গাস্টেটরি অর্ টেইস্ট্ সেন্‌সেশন্)

ইন্দ্রিয় এবং উদ্দীপক

জিহ্বাস্থ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলির উদ্দীপনা হইতে যে সংবেদন উৎপন্ন হয় তাহাকে স্বাদ সংবেদন (গাস্টেটরি অর্ টেইস্ট্ সেন্‌সেশন্) বলে।

স্বাদ সংবেদনের **ইন্দ্রিয়** জিহ্বার উপরিস্থিত স্বাদ কোরক (টেইস্ট্ বাড্‌স্ প্যাপিলি) গুলি। এই কোরকগুলি আঁচিলের মত জিহ্বার উপরিভাগে গুচ্ছে গুচ্ছে অবস্থান করে। জিহ্বার পশ্চাতে অবস্থিত প্যাপিলিগুলিকে সার্কাম্‌ভ্যালেট্ এবং উহার আশে পাশে অবস্থিত প্যাপিলিগুলিকে ফাঙ্গিফর্ম প্যাপিলি বলা হয়। এই কোরকগুলির ভিতরে স্বাদ-কোষ (টেইস্ট্ সেল্‌স্) অবস্থিত। ইহাদের সন্নিহিত টেইস্ট্-নার্ভ উত্তেজিত হইলে এবং ঐ উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছিলেই স্বাদ-সংবেদন ঘটে।

আবার স্বাদ-সংবেদনের উদ্দীপক কোনো দ্রবণীয় পদার্থ (সলিউব্‌ল্ সাব্‌স্ট্যান্স্)। এই পদার্থ লালার সহিত দ্রবীভূত হইয়া স্বাদ-ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে।

সাধারণভাবে জিহ্বা স্বাদেন্দ্রিয় হইলেও উহার সকল অংশই যে সকল প্রকার স্বাদ উদ্দীপকের প্রতি সংবেদনশীল তাহা নয়। বিভিন্ন রকম স্বাদ-সংবেদনে জিহ্বার বিভিন্ন অংশ ক্রিয়াশীল হয়।

স্বাদ-সংবেদন প্রধানতঃ চার প্রকার, যথা মধুর (সুইট্), অম্ল (সাওয়ার্), তিক্ত (বিটার্) এবং লবণ (সল্ট্)—যেমন চিনি, লেবুর রস, কুইনাইন এবং লবণের স্বাদ।

জিহ্বার বিশেষ বিশেষ অংশ এই স্বাদগুলির প্রতি বিশেষ বিশেষ ভাবে সংবেদনশীল। যেমন জিহ্বার অগ্রভাগ প্রধানতঃ মধুর ও লবণ স্বাদগ্রহণে সংবেদনশীল, উহার পশ্চাদ্ভাগ বা গোড়া তিক্তরস গ্রহণে এবং উহার দুই পার্শ্ব, অথবা কাহারও কাহারও মতে মধ্যভাগ, অম্লরস গ্রহণে সংবেদনশীল। কিন্তু প্রয়োগ-মনোবিদ্যার (এক্স্‌পেরিমেণ্ট্যাল্ সাইকলজি) মতে জিহ্বার মধ্যভাগের কোনো স্বাদসংবেদনশীলতা নাই। উপরোক্ত চারিটি স্বাদগ্রহণে সক্ষম চারিটি স্বাদ-কোরক বা স্বাদ-মুকুল রহিয়াছে এবং প্রত্যেক মুকুল-গুচ্ছে (ক্লাস্টার্ অফ্ বাড্‌স্ বা প্যাপিলি) উহাদের একাধিক মুকুল থাকিতে পারে।

স্বাদ সংবেদনের প্রকার

উপরে বলা হইয়াছে যে স্বাদ **চার প্রকার**—যথা মধুর, অম্ল, তিক্ত এবং লবণ। এই চারিটিই মৌলিক স্বাদ (সিম্প্‌ল্ টেইস্ট্) এবং অন্যান্য স্বাদগুলি যৌগিক (কম্‌পাউণ্ড), অর্থাৎ ইহাদেরই বিভিন্ন মাত্রায় সংমিশ্রণের ফল। যেমন ধাতুজ (মেটালিক্) স্বাদ মধুর ও লবণ রসের সংযোগ ফল। আবার তৈলাক্ত (অয়েলি) স্বাদ, পান্‌সে (পান্‌জেণ্ট্), মসৃণ (স্মুথ্), উগ্র (অ্যাস্ট্রিন্‌জেণ্ট্) প্রভৃতি স্বাদগুলিকেও ঐরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

লিনিয়াস্ উপরোক্ত স্বাদগুলির সহিত ধাতুজ, তৈলাক্ত, পান্‌সে, মসৃণ, উগ্র প্রভৃতি আরও ছয়টি যুক্ত করিয়া মৌলিক স্বাদের সংখ্যা বাড়াইয়া দশটি করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ চারিটি প্রধান স্বাদকে মধুর ও তিক্ত, এই **দুইটি** মূল স্বাদ সংবেদনে পরিণত করিয়াছেন। কাহারও কাহারও, যেমন **জোহানেস্ মুয়েলার্**-এর মতে বিবমিষা (নসিয়া) স্বাদেরই একটি গুণ। কোনো কোনো আধুনিক মনোবিৎ ক্ষারজ (অ্যাল্‌কেলিন্) এবং ধাতুজ (মেটালিক্) স্বাদকেও মূল স্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

অধিকাংশ মনোবিদের মতে মধুর, অম্ল, তিক্ত এবং লবণ এই চারিটিই প্রধান বা মূল স্বাদ এবং অন্যান্য প্রদর্শিত স্বাদগুলি এই চারটির রূপান্তর, নতুবা স্বাদ-সংবেদনের সহিত যান্ত্রিক (অর্গ্যানিক্), স্পর্শ (কিউট্যানিয়াস্) এবং ঘ্রাণ (স্মেল্) সংবেদনের যৌগিক ফল। যেমন উগ্র স্বাদের মৌলিকতা নাই, ইহা অম্লের রূপান্তর, কারণ অম্ল প্রথমে উগ্র বা সঙ্কোচক, পরে জ্বালাময় (বার্নিং) এবং সর্বশেষে বেদনাদায়ক। লবণের সহিত প্রথমে জ্বলন থাকে, পরে উহা বেদনাদায়ক হয়। মধুরের সহিত মসৃণতা ও কেমলতা থাকে, কিন্তু প্রবল

হইলে উহা বিদ্ধ করে অথবা তীক্ষ্ণ ব্যথার মত অনুভূত হয়। তিক্ত স্বাদ চর্বিময় বা তৈলাক্ত কিছু বুঝায় এবং প্রবল হইলে জ্বালাময় হইয়া দাঁড়ায়।

স্বাদের কয়েকটি ধর্ম

স্বাদ সংমিশ্রণ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য। কতগুলি স্বাদ অল্প-বিস্তর পরস্পর-বিরোধী। কফি-এর তিক্ত স্বাদ চিনির স্বাদে উপশমিত হয়। আবার অম্ল এবং লবণ একটি অপরটিকে নিউট্র্যালাইজ্ করে, অর্থাৎ একটি অপরটির বিরুদ্ধতা নষ্ট করে।

কতগুলি স্বাদ **পাশাপাশি থাকিতে পারে,** যেমন তিক্ত এবং লবণ।

উদ্দীপকের তীব্রতা বেশী হইলে দুইটি স্বাদ **দোলায়মান ভাবে চলিতে থাকে,** অথবা অসিলেট্ করে। কিন্তু ইহার তীব্রতা কম হইলে একটি আর একটির আংশিক**ক্ষতিপূরণ করে** অথবা উহাকে কম্পেন্সেট্ করে।

স্বাদ-সংবেদনের **প্রতিযোজন** (অ্যাডাপ্টেশন্) উল্লেখযোগ্য নয়, কারণ স্বাদযন্ত্রগুলি উদ্দীপকের সহিত নিজেদের মানাইয়া লইতে পারে না। বেশী মিষ্টি খাইলে মিষ্টির তীব্রতা না কমিয়া বাড়িয়াই যায়, যাহার ফলে আরও বেশী মিষ্টি খাওয়া যায় না।

কোনো কোনো স্বাদ-সংবেদনের **বৈসাদৃশ্য ফল** (কনট্র্যাস্ট্ এফেক্ট) উল্লেখযোগ্য—যেমন হরীতকী, আমলকী প্রভৃতির তিক্ত-অম্ল স্বাদ উহাদের বিপরীত মধুর স্বাদে রূপান্তরিত হইতে পারে।

স্বাদ-সংবেদন ও ঘ্রাণ, স্পর্শ এবং যান্ত্রিক-সংবেদন

স্বাদ-সংবেদনের সহিত যান্ত্রিক-সংবেদনের (অর্গ্যানিক্ সেন্সেশন্) সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। স্বাদ শারীরিক স্বাস্থ্যের সূচক। ইহার বিশৃঙ্খলা যান্ত্রিক-সংবেদনের বিশৃঙ্খলার সহিত জড়িত। যেমন অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, পেটব্যথা, বিবমিষা প্রভৃতি যান্ত্রিক-সংবেদনের তারতম্যে স্বাদ-সংবেদনের তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

তাহা ছাড়া স্বাদ-সংবেদনের সহিত ঘ্রাণ-সংবেদনেরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। নাকে সর্দি থাকিলে খাদ্যের স্বাদ পাওয়া যায় না। নাক বন্ধ থাকিলে আলুর, আপেলের এবং পেঁয়াজের স্বাদে পার্থক্যবোধ নষ্ট হয়।

তৃতীয়তঃ, স্বাদ-সংবেদনের সহিত স্পর্শ-সংবেদনের সম্বন্ধও খুব ঘনিষ্ঠ। মধুর স্বাদের সহিত সাধারণতঃ মসৃণতা বা কোমলতার স্পর্শবোধ যুক্ত থাকে। তীক্ষ্ণ বা রুক্ষ স্বাদের, যেমন ঝালস্বাদের, সহিত জ্বালাবোধ (বার্নিং সেন্‌সেশন্) যুক্ত থাকে।

২। ঘ্রাণ-সংবেদন (অল্‌ফ্যাক্‌টরি অর্ স্মেল্ সেন্‌সেশন্)

ইন্দ্রিয় এবং উদ্দীপক

ঘ্রাণ-সংবেদনের **ইন্দ্রিয়** স্থূলভাষায় নাসিকা, কিন্তু আসলে নাসিকাগহ্বরের ঝিল্লীর (নেজ্যাল্ মেম্‌ব্রেন্) উপরিভাগে অবস্থিত ঘ্রাণকোষগুলি। ইহারা নার্ভকোষ দ্বারা (নার্ভ-সেল্‌স্) নির্মিত। এই স্নায়ু দুই প্রকার। একটির কাজ হইল গন্ধ বহন করা এবং অপরটির কাজ হইল সুড়সুড়ি-সংবেদন (টিক্‌লিং সেন্‌সেশন্) সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়টির সহিত ঘ্রাণ-সংবেদনের কোনো সংস্রব নাই। ঘ্রাণ-নার্ভ উদ্দীপিত হইয়া ঘ্রাণ-নার্ভ-প্রবাহের আকারে মস্তিষ্কে বাহিত হয় এবং ঘ্রাণ-সংবেদন উৎপন্ন করে।

ঘ্রাণ-সংবেদনের **উদ্দীপক** গ্যাসীয় রেণু (গ্যাসিয়াস্ পার্টিক্‌ল্‌স্), যাহা আঘ্রাত বস্তু হইতে বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া নাসিকাস্থ ঘ্রাণকোষগুলিতে পৌঁছায়, উহাদের সন্নিহিত ঘ্রাণ-নার্ভকে উদ্দীপিত করে এবং এই নার্ভ-প্রবাহ মস্তিষ্কের ঘ্রাণকেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ঘ্রাণ-সংবেদনের প্রকার

স্বাদ-সংবেদনের তুলনায় ঘ্রাণ-সংবেদন অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এবং জটিল। ঘ্রাণ-নার্ভের ঘ্রাণ সংবেদনশীলতা স্বাদ-নার্ভের সংবেদনশীলতা অপেক্ষা ২৪০০০ গুণ বেশী। স্বাদ-সংবেদনকে মোটের উপর চারটি শ্রেণীতে পরিণত করা হইয়াছে। কিন্তু ঘ্রাণ-সংবেদনের সংখ্যা এই তুলনায় অনেক বেশী। **লিনিয়াস** ঘ্রাণ-সংবেদনকে সাত শ্রেণীতে এবং বিখ্যাত ডাচ্ শারীরবৃত্তবিৎ **জোয়ারদে মেকার** ঘ্রাণ-সংবেদনকে নয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই নয়টি শ্রেণী নিম্নপ্রকার।

(১) ইথেরিয়েল **গন্ধ**—যেমন যাবতীয় ফল, মদ্য, ইথর, মৌচাক প্রভৃতির

(২) অ্যারোমেটিক গন্ধ বা সৌরভ—যেমন কর্পূর, মসলা, গোলাপ প্রভৃতির

(৩) ফ্র্যাগ্র্যাণ্ট বা বাল্‌সামিক্‌ সুগন্ধ—যেমন কমলালেবু, ফুল, চা প্রভৃতির

(৪) অ্যাম্‌ব্রসিয়াক্‌ বা অমৃত গন্ধ—যেমন মৃগনাভি, তৈলস্ফটিক, অম্বর, চন্দন প্রভৃতির

(৫) অ্যালিয়েসিয়স্‌ বা রশুন জাতীয় গন্ধ—যেমন হিঙ্গ্‌, মৎস্য, আয়োডিন্‌ প্রভৃতির

(৬) বার্নিং বা দাহজনক গন্ধ—যেমন টোস্ট্‌, বেঞ্জল্‌, তামাকের ধোঁয়া প্রভৃতির

(৭) হিরসাইন্‌ গন্ধ—যেমন পনীর, ঘাম প্রভৃতির

(৮) ভিরুলেণ্ট্‌, ফাউল্‌, তীব্র বা বদ গন্ধ—যেমন আফিং, ছারপোকা প্রভৃতির

(৯) নসিয়েটিং বা বমনজনক গন্ধ—যেমন গলিত বা পচা প্রাণিদেহ, বিষ্ঠা প্রভৃতির

জোয়ার্দেমেকার-এর উপরোক্ত শ্রেণীভেদ মূল্যবান সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো গন্ধ মৌলিক নয়—ইহারা জটিল। **হেনিং** ইহার বিশ্লেষণ করিয়া যাবতীয় গন্ধকে ছয়টি মৌলিক গন্ধে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার নির্দেশিত ছয়টি মৌলিক গন্ধ এই

(১) ফ্লাওয়ারি স্মেল্‌ বা পুষ্পগন্ধ
(২) স্পাইসি স্মেল্‌ বা মশলা গন্ধ
(৩) রেজিনাস্‌ স্মেল্‌ বা ধুনা-গন্ধ
(৪) ফ্রুটি স্মেল্‌ বা ফল-গন্ধ
(৫) পিউট্রিড বা ফাউল স্মেল্‌ বা গলিত বা পচা গন্ধ
(৬) বার্নট্‌ বা স্কর্চ্চ্‌ড্‌ স্মেল্‌ বা পোড়া গন্ধ

হেনিং উপরোক্ত ছয়টি মৌলিক গন্ধকে একটি ত্রিভুজ প্রিজ্‌মে সাজাইয়াছেন। ইহার নাম "হেনিংস্‌স্মেল প্রিজ্‌ম্‌"। ইহার একদিকের তিন কোণে তিনটি গন্ধ, যথা—ফ্লাওয়ারি, ফ্রুটি এবং ফাউল এবং বিপরীত দিকের তিন কোণে বাকী তিনটি গন্ধ, যথা—স্পাইসি, রেজিনাস্‌ এবং বার্নট্‌ রহিয়াছে।

ঘ্রাণ-সংবেদনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

নিম্নে "হেনিং'স স্মেল্ প্রিজ্ম্"-এর চিত্র দেখানো হইল

হেনিং স্মেল্ প্রিজ ম্
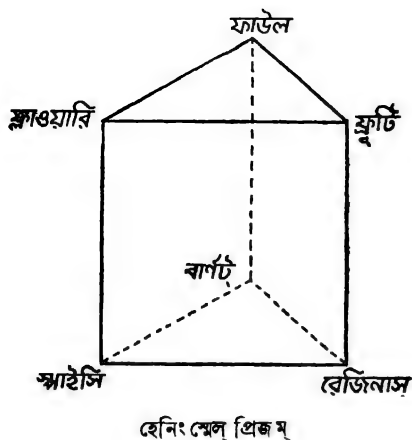
ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। একটি ফুলের সুগন্ধ এক মিনিট ধরিয়া আঘ্রাণ করিলে ঐ সুগন্ধ কমিতে কমিতে লুপ্ত হইয়া যায়।

ঘ্রাণ-সংবেদনেরও প্রতিযোজন (অ্যাডাপ্টেশন্) হয়। যেমন তীব্র গন্ধের প্রতিও ঘ্রাণেন্দ্রিয় সহনশীল হইয়া যাইতে পারে।

আবার দুইটি গন্ধ একই সময়ে উপস্থিত থাকিলে একটি অপরটির ক্ষতিপূরণ (কম্পেন্সেশন্) করিতে পারে।

৩। রাসায়নিক ইন্দ্রিয়—কেমিক্যাল্ সেন্স্

রাসায়নিক ইন্দ্রিয় বলিতে বুঝায় এমন ইন্দ্রিয় যাহা উহার সংগ্রাহক যন্ত্রের (রিসেপ্টর্ অর্গ্যান্) উপর কোনো উদ্দীপক পদার্থের প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে। নিম্নতর প্রাণীর ক্ষেত্রে স্বাদ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পৃথক বিকাশ ঘটে না, কিন্তু ইহারা অবিভক্ত বা মিলিত অবস্থায় থাকে। ইহাদের এইরূপ অবিভক্ত বা স্বাদ ও ঘ্রাণের মিলিত ইন্দ্রিয়কে রাসায়নিক ইন্দ্রিয় (কেমিক্যাল্ সেন্স্) বলে। সংগ্রাহক যন্ত্রের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যে প্রতিবর্ত ঘটে তাহাকে রাসায়নিক প্রতিবর্তও বলা হয়।[১]

স্বাদ ও ঘ্রাণকে রাসায়নিক ইন্দ্রিয় বলা হইয়া থাকে। স্বাদের উদ্দীপক কোনো দ্রবণশীল পদার্থ (সলিউব্ল্ সাব্স্ট্যান্স্)। আবার ঘ্রাণের উদ্দীপক কোনো গ্যাসীয় পদার্থ (গ্যাসিয়াস্ সাব্স্ট্যান্স্)। এই উদ্দীপক দুইটির রাসায়নিক উপাদান কতগুলি অনু (মলেকিউল্) দিয়া গঠিত। অণুগুলির আকার প্রকার অনুসারে ইহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং স্বাদেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া

১ জেম্স্ ড্রিভার্—এ ডিক্শনারি অফ্ সাইকলজি—পৃঃ ৩৬

করে। জলাভূমির গ্যাস্ গন্ধ উৎপন্ন করে না, কারণ ইহার অণুগুলির আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাহা ছাড়া উদ্দীপকের রাসায়নিক উপাদানগুলি গন্ধ নাই।

এই পদার্থগুলির রাসায়নিক স্বভাব বা গঠন আসলে মনোবিত্যার বিষয় নয়। ইহারা যে ইন্দ্রিয়কে রাসায়নিক ভাবে উদ্দীপিত করে তাহাতে সংন্দেহ নাই। ইন্দ্রিয়ের উপর উদ্দীপকগুলির রাসায়নিক প্রক্রিয়াই মনোবিত্যার বিষয়।

দ্রবণশীল পদার্থ লালার সহিত মিশিয়া স্বাদ-নার্ভকে উদ্দীপিত করে। আবার গ্যাসীয় পদার্থ গন্ধহীন হইয়াও নাসিকা-গহ্বরের হাইড্রোজেন-এর সহিত রাসায়নিক ভাবে মিশিয়া ঘ্রাণ-নার্ভকে উদ্দীপিত করে। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার স্বভাব কি তাহা সঠিকভাবে নিরূপিত হয় নাই। কিন্তু ইহা ঠিক যে ঘ্রাণ-সংবেদনের তারতম্য হয় উহার উদ্দীপক পদার্থেব রাসায়নিক উপাদানের গঠন অনুসারে।

৪। স্পর্শ-সংবেদন—কিউট্যানিয়াস্ সেন্‌সেশন্

ইন্দ্রিয় এবং উদ্দীপক

স্পর্শ-সংবেদনের ইন্দ্রিয় চর্মের নিম্নে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকারের অন্তর্মুখ বা সংবেদীয় নার্ভ এবং ইহার উদ্দীপক তাপ, শৈত্য, চর্মের আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং চর্মের আঘাত বা আঘাতের ভয়।

চর্মের বিভিন্ন অঞ্চল—স্পর্শবিন্দু

চর্মের সকল অংশই সমানভাবে স্পর্শসংবেদনশীল নয়। পক্ষান্তবে চর্মকে বিভিন্ন এলাকা বা অঞ্চলে (জোন্‌স্) ভাগ করা হইয়াছে বিভিন্ন প্রকারের সংবেদনশীলতা অনুসারে। তীক্ষ্ণাগ্র উদ্দীপক (পাঙ্কটেট্ স্টিমুলি) সাহায্যে পরীক্ষা ও প্রয়োগের ফলে দেখা গিয়াছে যে চর্মে চার শ্রেণীর বিন্দু (স্পট্‌স্) পাওয়া যায়—যথা তাপ, শৈত্য, চাপ ও ব্যথাবিন্দু।

স্পর্শ-সংবেদনের প্রকার

তাপ, শৈত্য, চাপ ও ব্যথাবিন্দুগুলির উদ্দীপনায় চার প্রকার স্পর্শ-সংবেদন উৎপন্ন হয়, যথা তাপ (হিট্), শৈত্য (কোল্ড্), চাপ (প্রেসার) এবং ব্যথা (পেইন্ সংবেদন)।

তাপ ও শৈত্য-সংবেদন—হিট্ অ্যাণ্ড্ কোল্ড্ সেন্‌সেশন্

তাপ ও শৈত্য-সংবেদনকে মিলিতভাবে তাপ (হিট্, টেম্‌পারেচার্ সেন্‌সেশন্) সংবেদন বলা হয়, কারণ ইহারা তাপ বা টেম্‌পারেচার্-এর অধিক বা অল্প পরিমাণের উপর পির্ভর করে। তাপ উদ্দীপক একতরফা অথবা নিরপেক্ষভাবে তাপ-সংবেদন উৎপন্ন করে না। কি পরিমাণের তাপ (টেম্‌পারেচার্) তাপ-সংবেদন উৎপন্ন করিবে তাহা আংশিকভাবে নির্ভর করে চর্মের তাপের উপর (বডি টেম্‌পারেচার), অথবা কোন্ মাত্রার তাপের সহিত চর্ম প্রতিযোজিত (অ্যাডাপ্‌টেড্) হইয়া আছে তাহার উপর।

সাধারণতঃ ১২° হইতে ১৫° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ তাপ শৈত্য-সংবেদনের এবং ৩৭° হইতে ৪০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ তাপ-সংবেদনের নিম্নসীমা। সুস্থ চর্মের তাপ সাধারণতঃ ৩৫° সেন্টিগ্রেড্ হইয়া থাকে এবং জরাক্রান্ত ব্যক্তির দেহে তাপ সংবেদন উৎপন্ন করিতে হইলে তাপ-উদ্দীপকের মাত্রা বেশী হওয়া চাই। আবার শীতল দেহতাপবিশিষ্ট ব্যক্তির দেহে তাপ-সংবেদন উৎপন্ন করিতে হইলে তাপ-উদ্দীপকের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হইলেও চলে।

তাপ ও শৈত্য সংবেদনের প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকারের হইতে পারে—যথা প্রথমটি তাপ (হিট্) ও উষ্ণতা (ওয়ার্ম্‌থ্) এবং দ্বিতীয়টি শৈত্য (কোল্ড) ও শীতলতা (কুল্‌নেস্)।

শৈত্যবিন্দু দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমে ছড়াইয়া থাকে। ইহারা অনিয়মিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয় (ক্লাস্টার্‌ড্) এবং কখনও গুচ্ছাকারে, আবার কখনও বা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। পেরেকের অথবা পেনসিলের অগ্রভাগ দিয়া চর্মে অনুসন্ধান করিলে উহাতে শৈত্যবিন্দুগুলি বাহির করা যায়। ইহারা দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া থাকে, কিন্তু প্রধানতঃ কপালেই অধিক সংখ্যায় বিরাজ করে। শৈত্য-সংবেদনের ইন্দ্রিয় হইল ভন্ ক্রজ্ আবিষ্কৃত প্রান্তীয় বাল্বগুলি। এই ইন্দ্রিয়ের গঠন সপ্তম পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।

শৈত্যবিন্দুর তুলনায় তাপ-বিন্দুর সংখ্যা কম। চর্মের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে তাপবিন্দু থাকে গড়ে দুইটি করিয়া, কিন্তু শৈত্যবিন্দু থাকে গড়ে তেরোটি করিয়া। শৈত্যবিন্দুর মত তাপবিন্দুও দেহের সকল অংশে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু গণ্ডদেশেই তাপবিন্দু থাকে বেশী সংখ্যায়। শৈত্যবিন্দুর তুলনায় তাপবিন্দু নিরূপণ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। কারণ ইহাতে তাপ-উদ্দীপক, যেমন ৩৭° সেন্টিগ্রেড় অথবা এতদপেক্ষা অধিক তপ্ত মেটাল সিলিণ্ডার প্রয়োগ করিবার

অব্যবহিত পরেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তাহা ছাড়া, শৈত্য-সংবেদন অপেক্ষা তাপ সংবেদন নিস্তেজ এবং কম প্রবল।

তাপ-সংবেদনের ইন্দ্রিয় রাফিনি আবিষ্কৃত প্রান্তীয় যন্ত্র (এণ্ড্ অর্গ্যান্) অথবা কর্পাস্‌ল্‌স্ বা রক্তকণিকাগুলি। ইহারা শৈত্য-সংবেদনের ইন্দ্রিয় ক্রজ্-এর প্রান্তীয় বাল্বগুলির তুলনায় চর্মের গভীরতর তলদেশে অবস্থিত। এই কারণে ইহাদের প্রতিক্রিয়া কাল (রি-অ্যাক্‌শন টাইম) শৈত্য-সংবেদন অপেক্ষা অধিক।

তাপ ও শৈত্য-সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক (অ্যাডিকোয়েট স্টিমুলাস)

তাপ-সংবেদনের পর্যাপ্ত (অ্যাডিকোয়েট্) উদ্দীপক কম পক্ষে ৩৭° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ তাপ। আবার শৈত্য-সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক কম পক্ষে ১২° সেন্টিগ্রেড্ তাপ। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত (ইন্-অ্যাডিকোয়েট্) উদ্দীপক দ্বারাও শীতবিন্দু উদ্দীপিত হইতে পারে। যেমন চর্মের তাপ ও শৈত্যবিন্দু অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা যায় যে কোনো কোনো শৈত্যবিন্দু ৪৩° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ হইতে ৫০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ উদ্দীপকের সংস্পর্শে তাপ-সংবেদন উৎপন্ন না করিয়া শৈত্য-সংবেদন উৎপন্ন করে। এই তাপ উদ্দীপক তাপ-সংবেদনের পর্যাপ্ত কিন্তু শৈত্য-সংবেদনের অপর্যাপ্ত উদ্দীপক। এইরূপ অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক-প্রসূত শৈত্য-সংবেদনকে—অর্থাৎ কোনো শৈত্যবিন্দুকে ৪৩° সেন্টিগ্রেড্ তাপ উদ্দীপকের সাহায্যে উদ্দীপিত করিবার ফলে তাপ-সংবেদনের পরিবর্তে উৎপন্ন শৈত্য-সংবেদনকে—উড্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন **আপাত-বিরুদ্ধ শৈত্য-সংবেদন** (প্যারাডক্সিক্যাল্ কোল্‌ড্ সেন্‌সেশন্)।

প্যারাডক্সিক্যাল কোল্‌ড্ সেন্‌সেশন্ বা আপাত-বিরুদ্ধ শৈত্যসংবেদনের মত **আপাত-বিরুদ্ধ তাপ-সংবেদন**ও (প্যারাডক্সিক্যাল ওয়ার্ম্‌থ্ সেন্‌সেশন্) কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। দেহতাপ অপেক্ষা কম তাপ-উদ্দীপকের সংস্পর্শে স্বভাবতঃ শৈত্যসংবেদন ঘটা উচিত। কিন্তু এই উদ্দীপক যদি তাপ-বিন্দুকে স্পর্শ করে তাহা হইলে কখনও কখনও উষ্ণতা সংবেদন উৎপন্ন হয়। এইরূপ আপাত-বিরুদ্ধ উষ্ণতা সংবেদনকে বলা হয় প্যারাডক্সিক্যাল্ ওয়ার্ম্‌থ্ সেন্‌সেশন্।

চাপ সংবেদন (প্রেসার্ সেন্‌সেশন্)

চাপ-সংবেদনের ইন্দ্রিয় হইল মিস্‌নার এবং প্যাসিনি এর কর্পাসল্‌স্ বা রক্তকণিকা এবং চর্মরোমের মূলে অবস্থিত নার্ভ-প্রান্ত অথবা উহাতে অবস্থিত সংগ্রাহক কোষ। চাপ-সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক হইল চর্মের উপরিভাগকে ঠেলা বা ধাক্কা দেওয়া অথবা টানা বা আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ করা। কোনো বস্তু যান্ত্রিকভাবে (মেকানিক্যালি) চর্মকে উদ্দীপিত করিলে অথবা চর্মরোম স্পর্শ করিলে চাপ-সংবেদন উৎপন্ন হয়। দেহের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগে চাপবিন্দু অধিক সংখ্যায় অবস্থান করে। জে. বি. ওয়াট্‌সন্ বলেন যে চর্মের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে নীচের দিকে ৭টি এবং উপরের দিকে ৩০০টি পর্যন্ত এবং গড়ে ২৫টি করিয়া চাপ-বিন্দু থাকে।

চাপ-সংবেদনের অনুসন্ধানে উষ্ট্রের অথবা ঘোড়ার রোম দ্বারা নির্মিত ব্রাস্ ব্যবহৃত হয়। চর্মের প্রত্যেক রোমমূলে, রোমহীন হাতের বা পায়ের পাতায়, বিশেষ করিয়া হাতের আঙ্গুলের ডগায় চাপ বিন্দু পাওয়া যায়। অচ্ছোদপটলে (কর্ণিয়া) চাপ-বিন্দুর অভাব পরিলক্ষিত হয়।

চাপ-সংবেদনে প্রতি-যোজন বা অ্যাডাপ্‌টেশন্ উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যায়। যেমন পরিধানের কাপড়-চোপড় বা পোষাক-পরিচ্ছদের চাপ অনুভূত হয় না, কারণ প্রতি-যোজনের ফলে পরিহিত পোষাক-পরিচ্ছদের ওজন গা-সওয়া হইয়া যায়। চশমা চোখে দিয়া চশমা খুঁজিয়া বেড়ানো অথবা জুতা পায়ে দিয়া জুতা খুঁজিয়া বেড়ানো চাপ প্রতি-যোজনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

চাপ-সংবেদনের অনু-সংবেদনও ঘটিয়া থাকে। সবর্ণ (পজিটিভ্) অনু-সংবেদনের উদাহরণ—যথা ব্যবহৃত আংটি খুলিয়া ফেলিলেও বোধ হইতে থাকে যেন আংটিটি হাতেই রহিয়াছে।

আবার স্থান-নির্দেশ (লোক্যালাইজেশন্) চাপ-সংবেদনের একটি বিশেষ লক্ষণ। ইহাকে দেশ-সংবেদন (স্পেস্ সেন্স্) বলা হইয়া থাকে। অধিকাংশ চাপ-বিন্দুরই এই নির্দেশ ক্ষমতা নির্ভুল হইয়া থাকে।

ব্যথা-সংবেদন (পেইন্ সেন্‌সেশন্)

ব্যথা-সংবেদনের সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় চর্মের নানাস্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। কতগুলি মুক্ত নার্ভ-প্রান্তই (ফ্রী-নার্ভ-এণ্ডিংস্) ব্যথা সংবেদনের

সংগ্রাহক।[১] আঙ্গুলে খোঁচা বা ফোঁড় লাগিলে, আগুনে ছ্যাঁকা লাগিলে, অথবা পায়ের আঙ্গুলে ঘষা লাগিলে যে ব্যথা অনুভূত হয় তাহার কারণ ঐ সংগ্রাহকগুলির উদ্দীপনা। চর্মের নীচে গভীর নার্ভ-সূত্রগুলিও ব্যথা সংবেদনের আংশিক কারণ হইতে পারে।

ব্যথা-বিন্দু

ব্যথা-বিন্দু (পেইন্ স্পট্স্) চর্মের সর্বত্র অল্পাধিক সংখ্যায় পরিব্যাপ্ত। চর্মের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে গড়ে ১০০ হইতে ২০০টি ব্যথা-বিন্দু আছে। সুতরাং অন্যান্য স্পর্শবিন্দুর—যেমন তাপ, শৈত্য এবং চাপ বিন্দুর তুলনায় ব্যথা-বিন্দুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। মুখ-গহ্বরে ব্যথা-বিন্দু নাই বলিলেই চলে। কিন্তু ওষ্ঠ, দাঁতে এবং জিহ্বাগ্রে ব্যথা-বিন্দু আছে। সর্বাপেক্ষা ব্যথা-সংবেদনশীল অচ্ছোদপটল (কর্ণিয়া)। ইহাতে ব্যথাবিন্দুর অস্তিত্ব সর্বাধিক।

উদ্দীপক

ব্যথা-সংবেদনের উদ্দীপক আঘাত বা আঘাতের আশঙ্কা (ড্যামেজ্ অর্ থ্রেটেন্ড্ ড্যামেজ্) অথবা চর্মকে বিদ্ধ করা বা কাটা। অত্যধিক তাপ, শৈত্য বা চাপেও ব্যথা-সংবেদন উৎপন্ন হইতে পারে।

পরীক্ষা প্রণালী

ব্যথাবিন্দুগুলির অনুসন্ধান চর্ম কামাইয়া লইতে হয়, সাবানজল দিয়া চর্মকে নরম করিয়া লইতে হয়। তারপর ঘোড়ার রোম (হর্স হেয়াব) সূক্ষ্মাগ্র করিয়া চর্মের বিভিন্ন অংশে লাগাইলেই ব্যথা-বিন্দু বাহির করা যায়।

ব্যথা-সংবেদনের আরও কয়েকটি দিক

ব্যথা-সংবেদনের প্রতিযোজন (অ্যাডাপ্টেশন্) ঘটে বলিয়া মনে হয় না। ব্যথাবিন্দুকে পুনঃ পুনঃ উদ্দীপিত করিলে, ব্যথা 'গা-সওয়া' হয় না, কিন্তু

১ এই নার্ভ প্রান্ত চর্মের বহিস্তরে (এপিডার্মিস্) চালিত হইয়া বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। আবার এই শাখাগুলি এপিডার্মিস্-এর কোষে (সেল্স্) আসিয়া শেষ হয়, কখনও বা উহার ভিতরে প্রবেশ করে।

পুনঃপুনঃ ব্যথা-সংবেদনই উৎপন্ন হইতে থাকে এবং ঐ ব্যথা-বিন্দুর চারিপাশ আহত ও উত্তেজিত অনুভূত হয়।

ব্যাথার অনু-সংবেদন দীর্ঘস্থায়ী এবং সকল ব্যথা-সংবেদনই দুঃখকর।

আবার ব্যথা-সংবেদনের অন্তর্দর্শনে উহার তিনটি অবস্থা বা স্তর পাওয়া যায়। প্রথমে ব্যথা-সংবেদন অনুভূত হয় স্পষ্ট (ব্রাইট্) এবং চুল্‌কানো (ইচিং) সংবেদনের আকারে। মধ্যবর্তী অবস্থায় ব্যথা-সংবেদন দেখা দেয় কণ্টকিত শিহরণের (প্রিকৃলি থ্রিল্) আকারে এবং শেষ অবস্থায় ইহা অনুভূত হয় বিদ্ধ হইবার ব্যথার (পাঙ্ক্‌টিফর্ম পেইন্) আকারে।

সুড়সুড়ি সংবেদন (টিক্‌লিং সেন্‌সেশন্)

রোম-বিহীন ত্বকের উপরিভাগকে মৃদু ঘর্ষণ (ব্রাশ্) করিলে সুড়সুড়ি (টিক্‌লিং) সংবেদন উৎপন্ন হয়। উপত্বক্ (এপিডার্মিস্)-এর নার্ভ-প্রান্ত উদ্দীপিত হইলেই এই সংবেদন ঘটে।

সুড়সুড়ি সংবেদন মৌলিক সংবেদন নয়, কিন্তু কয়েকটি সংবেদনের সমষ্টি। ইহার মধ্যে হাল্কা চাপ (লাইট্ প্রেশার্) সংবেদন, তাপ সংবেদন, যেমন উষ্ণতার শিহরণ বা শৈত্যের মৃদু কম্পন, রক্তসঞ্চালনের পরিবর্তন-জনিত সংবেদন, পেশীয় চাপ সংবেদন উল্লেখযোগ্য।

৫। স্পর্শ-সংবেদনের দুই প্রকার সংস্থান

প্রটোপ্যাথিক্ অ্যাণ্ড্ এপিক্রিটিক্ সেন্‌সেশন্

স্পর্শ সংবেদনের উপর ডঃ হেড্ এবং রিভার্স্ প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের প্রসিদ্ধ গবেষণা স্পর্শ-সংবেদনের উপর নূতন জ্ঞানের আলোকপাত করিয়াছে।

বিভিন্ন স্পর্শ সংবেদনের সংগ্রাহক নার্ভ বা যন্ত্র কি তাহা নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্যে ডঃ হেড্ তাঁহার কনুই পর্যন্ত বাহুর (র‍্যাডিয়্যাল্) এবং বাহ্য-স্পর্শীয় নার্ভগুলি ছিন্ন করিলেন। এই নার্ভগুলি উপত্বকের (এপিডার্মিস্) তাপ, শৈত্য চাপ ও ব্যথা সংবেদন নিয়ন্ত্রণ করে জানা থাকিলেও, কোন্ নার্ভ কোন্ বিশিষ্ট স্পর্শ সংবেদনকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহা জানা ছিল না। ডঃ হেড্ নিজ নার্ভ ছেদ করিলেন এই অজ্ঞাত বিষয়টি জানিবার জন্য।

ছেদনের সঙ্গে সঙ্গেই কর্তিত স্থানের প্রান্তীয় যন্ত্রগুলির (এণ্ড্ অর্গ্যান্‌স্) দ্বারা উৎপন্ন সকল স্পর্শ সংবেদনই—যেমন তাপ, শৈত্য, চাপ এবং ব্যথা

—সম্পূর্ণ বন্ধ বা রহিত হইয়া গেল। সুতরাং সমগ্রভাবে বুঝা গেল যে ঐ প্রান্তীয় যন্ত্রগুলিই সাধারণভাবে সকল প্রকার স্পর্শ সংবেদনের কারণ, যেহেতু উহাদের উত্তেজনায় এই সংবেদনগুলি ঘটে এবং উহাদের উত্তেজনার অভাবে ইহারা ঘটে না।

কিন্তু ডঃ হেড্ দেখিলেন যে সকল স্পর্শ-সংবেদন রহিত হওয়া সত্ত্বেও একপ্রকার **"গভীর সংবেদনশীলতা" (ডীপ্ সেন্‌সিবিলিটি)** অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কর্তিত স্থানের চর্মের উপর গভীর চাপ দিয়া তিনি এই গভীর সংবেদনশীলতা অনুভব করিলেন। কিন্তু পশম বা তুলা জাতীয় মৃদু উদ্দীপকের সামান্য চাপ এবং ব্যথা সংবেদন অনুভব করিলেন না। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল যে গভীর সংবেদনশীলতা উপত্বকের স্পর্শ-সংবেদন উৎপন্ন করে এইরূপ কর্তিত নার্ভগুলির উদ্দীপনায় ঘটে নাই, কিন্তু ঘটিয়াছে উহাদের গভীরতর তলদেশে অবস্থিত অন্যান্য নার্ভগুচ্ছের উদ্দীপনায়, যে নার্ভগুচ্ছ পেশী, সন্ধি এবং কণ্ডরায় নার্ভতন্তু প্রেরণ করে।

তাহা হইলে, ডঃ হেড্-এর বাহুর র‍্যাডিয়াল্ নার্ভ কর্তিত হইবার ফলে সকল স্পর্শ-সংবেদন তিরোহিত হইবার পরও যে সংবেদনশীলতা অবশিষ্ট রহিল তাহার নাম "গভীর সংবেদনশীলতা" (ডীপ্ সেন্‌সিবিলিটি), এবং ইহার সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় কর্তিত নার্ভগুলি নয়, কিন্তু ইহাদের তলদেশে অবস্থিত অন্যান্য নার্ভ। গভীর সংবেদনশীলতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে আপেক্ষিক স্থান-নির্দেশ ক্ষমতা (রিলেটিভ্ লোক্যালাইজেশন্) নাই. যদিও নিরপেক্ষ স্থান-নির্দেশের (অ্যাব্‌সল্যুট্ লোক্যালাইজেশন্) ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ, ইহাতে একটি কম্পাস্ বা এস্‌থেসিওমিটার-এর দুই প্রান্ত এই চর্মের উপর স্থাপন করিলে একটি চর্মবিন্দু হইতে অপর চর্মবিন্দুটির দূরত্ব বা সম্বন্ধ (রিলেটিভ্ লোক্যালাইজেশন্ বা আপেক্ষিক স্থান-নির্দেশ) অনুভূত হয় না, কিন্তু প্রত্যেকটি চর্মবিন্দুর পৃথক পৃথক স্থান-নির্দেশ (আব্‌সল্যুট্ লোক্যালাইজেশন্ বা নিরপেক্ষ স্থান-নির্দেশ) ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

নষ্ট স্পর্শ-সংবেদনগুলির পুনঃপ্রাপ্তি

ডঃ হেড্-এর আহত স্থানটি ক্রমশঃ নিরাময় হইতে লাগিল এবং উহার স্পর্শ-সংবেদনগুলি একে একে ফিরিয়া আসিল। সর্বপ্রথম ফিরিয়া আসিল বেধন (প্রিকিং)-এর ফলে উৎপন্ন ব্যথা-সংবেদন। কিন্তু এই ব্যথা-

সংবেদনে নির্ভুলভাবে স্থান-নির্দেশ ক্ষমতা পাওয়া গেল না। ব্যথার স্থানটি চতুষ্পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িল বা র‍্যাডিয়েট্ করিল এবং উদ্দীপিত ব্যথা-বিন্দু হইতে অনেক দূরবর্তী স্থানের বলিয়া (রেফার্‌ড্) অনুভূত হইল। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে আসল ব্যথা-উৎপাদক নার্ভ বা সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় আহত নার্ভগুলির উপরিভাগে অবস্থিত। দ্বিতীয়তঃ অর্থাৎ প্রথম অনির্দিষ্ট ব্যথা-সংবেদনের পরে ফিরিয়া আসিল অত্যুষ্ণ বা অধিক তাপ-সংবেদনের এবং অতিশীতল বা অধিকশৈত্য-সংবেদন, যাহা যথাক্রমে ৫০° সেন্টিগ্রেড্ তাপের এবং বরফের দ্বারা উৎপন্ন হইল, কিন্তু মাঝামাঝি তাপ বা শৈত্য উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন হইল না। এই তাপ ও শৈত্য সংবেদনের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে উহাদের ক্রমিক মাত্রায় সংবেদন (গ্র্যাজুয়েটেড্ সেন্‌সেশন্) পাওয়া গেল না। তাহা ছাড়া, এই দ্বিতীয় সংবেদন-প্রত্যাবর্তনের স্তরে চর্মরোমের (হেয়ার্-রুট্‌স) সঞ্চালনে এক প্রকার স্পর্শ-সংবেদনও পাওয়া গেল। কিন্তু কি ব্যথা, কি তাপ ও শৈত্য, কি স্পর্শ বা চাপ, কোনো সংবেদনেই স্থান-নির্দেশ সম্ভব হইল না।

অস্ত্রোপচার সত্ত্বেও যে গভীর সংবেদনশীলতা অক্ষুণ্ণ ছিল তাহাতে বিনিশ্চয়তা বোধ (সেন্স্ অফ্ ডিস্ক্রিমিনেশন্) অথবা সাপেক্ষ স্থান-নির্দেশ ক্ষমতা না থাকিলেও, নিরপেক্ষ স্থান-নির্দেশ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু নিরাময়ের বা কর্তিত নার্ভ জোড়া লাগিবার প্রথম অবস্থায় যে সংবেদনগুলি পাওয়া গেল—যেমন ব্যথা, অত্যুষ্ণতা এবং অতিশৈত্য এবং গভীর চাপ সংবেদন, উহাদের মধ্যে এই সাধারণ স্থান-নির্দেশ ক্ষমতাও রহিল না। ডঃ হেড্ এই প্রাথমিক স্তরের সংবেদনকে বলিয়াছেন **অবিলক্ষ্য বেদিতা (প্রটোপ্যাথিক্ সেন্‌সেশন্)**।

নিরাময়ের পরবর্তী অবস্থায় আর একটি সংবেদনের আবির্ভাব হইল নার্ভ-কর্তিত চর্মের একটি ত্রিভুজাকৃতি স্থানে। ডঃ হেড্ ইহার নামকরণ করিয়াছেন **বিলক্ষ্য বেদিতা (এপিক্রিটিক্ সেন্‌সিবিলিটি)**। এই স্থানে গভীর ব্যথা এবং চাপ সংবেদন অনুভূত হইল, কিন্তু অবিলক্ষ্য বেদিতাগুলি অনুভূত হইল না। হাল্কা বা মৃদু স্পর্শ (লাইট্ টাচ্), ২৬° হইতে ৩৭° সেন্টিগ্রেড্ তাপের সংস্পর্শে শীতলতা (কুল্‌নেস্) এবং উষ্ণতা (ওয়ার্ম্‌থ্) সংবেদন দেখা দিল। এই সংবেদনগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিনিশ্চয়তা বোধ (সেন্‌স অব্ ডিস্ক্রি-মিনেশন্)। ঐ ত্রিভুজাকৃতি স্থানে কম্পাস্ বা এস্‌থেসিওমিটার-এর দুই বিন্দু স্থাপন করিলে এই দুইটি বিন্দুর পারস্পরিক দূরত্ব বা ব্যবধান (রিলেটিভ্

অ্যাপার্ট্‌নেস্) অনুভূত হইল। অর্থাৎ আপেক্ষিক স্থান-নির্দেশ (রিলেটিভ্ লোক্যালাইজেশন্) ক্ষমতা, যাহা একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, একটি সীমাবদ্ধ স্থানে ফিরিয়া আসিল। আবার নার্ভকর্তিত চর্ম নিরাময় হইবার শেষ স্তরে এই সীমাবদ্ধ স্থানটিতেও অবিলক্ষ্য বেদিতা (প্রটোপ্যাথিক সেন্‌সিবিলিটি) ফিরিয়া আসিল।

দেখা গেল যে চর্মতলস্থ (সাব্‌কিউট্যানিয়াস্) গভীর সংবেদনশীলতা (ডীপ্ সেন্‌সিবিলিটি) ছাড়া চর্ম-সংবেদনের দুইটি সংস্থান রহিয়াছে। উহাদের প্রথমটির নাম অবিলক্ষ্য বেদিতা (প্রটোপ্যাথিক্ সেন্‌সিবিলিটি) এবং দ্বিতীয়টির নাম বিলক্ষ্য বেদিতা (এপিক্রিটিক্ সেন্‌সিবিলিটি)। প্রথমটিতে পরিমাণ বা মাত্রা ভেদে ব্যথা, অত্যুষ্ণতা, অতিশৈত্য এবং গভীর চাপ সংবেদন থাকিলেও ইহাদিগের স্তরবিন্যাস (গ্রেডেশন্), সঠিক স্থান-নির্দেশ এবং স্পষ্টতা নাই। ইহা সব-অথবা-কিছুনা (অল্ অর্ নান্ ক্যারেক্টার) নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টিতে আছে লঘু তাপ, শৈত্য এবং চাপ সংবেদন। আবার ইহাতে আছে সংবেদনের স্তরবিন্যাস (গ্রেডেশন্), আপেক্ষিক স্থান-নির্দেশ, স্পষ্টতা এবং মৃদু উদ্দীপকে সংবেদনশীলতা।

তাহা হইলে, স্পর্শ-সংবেদনবাহী নার্ভতন্তুও দুই প্রকারের। প্রথম প্রকারের নার্ভতন্তু অবিলক্ষ্য বেদিতায় এবং দ্বিতীয় প্রকারের নার্ভতন্তু বিলক্ষ্য বেদিতায় উদ্দীপিত হয়। এই দুইটি নার্ভ-সংস্থানের পার্থক্য মেরুদণ্ড পর্যন্ত প্রসারিত হয়। কিন্তু মস্তিষ্কের সংবেদনকেন্দ্রে উহারা আর পৃথক থাকে না।

ডঃ হেড্ এবং রিভার্স্ প্রভৃতির উপরোক্ত গবেষণাফল সাম্প্রতিক কালের অনেক গবেষকই গ্রহণ করেন নাই। যেমন বোরিং ও শেফার এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন নাই।

৬। পেশী-সংবেদন (মাস্‌ল্ সেন্‌স্, মাস্কুলার্ সেন্‌সেশন্)

পেশী-সংবেদন কোন্ শ্রেণীর সংবেদন?

পেশীসংবেদনকে (মাস্কুলার সেন্‌সেশন্) কেহ কেহ যান্ত্রিক (অর্গ্যানিক্) সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, কারণ এই দুই সংবেদনেই উদ্দীপক আভ্যন্তরীণ দেহের কোনো অংশকে উদ্দীপিত করে এবং উভয় ক্ষেত্রেই সংবেদন নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনার ফলে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু পেশী সংবেদনকে যান্ত্রিক

সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন নয়, কারণ এই সাধারণ সাদৃশ্য সত্ত্বেও উহাদের পার্থক্যই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পেশী সংবেদন বাহ্য জগতের জ্ঞানলাভে বিশেষ সহায়তা করে, কিন্তু যান্ত্রিক সংবেদন ঐরূপ করে না।

উপরোক্ত কারণে স্টাউট্ প্রভৃতি মনোবিৎ পেশী সংবেদনকে একটি বিশেষ (স্পেশ্যাল) সংবেদনের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে করেন। এইরূপ অভিমত গ্রহণ করিলেও পেশী-সংবেদন কোন্ সংবেদনের শ্রেণীভুক্ত, স্টাউট্ তাহার উল্লেখ করেন নাই। টিশ্‌নার প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ পেশী-সংবেদনকে চেষ্টা-বেদন (কাইনেস্থেটিক্ সেন্‌সেশন্) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহা সন্ধি-সংবেদন (টেন্‌ডিনাস্ সেন্‌সেশন্) এবং বন্ধনী-সংবেদনের (আর্টিকুলার সেন্‌সেশন্) সমগোত্রীয়, অর্থাৎ এই দুইটির মত চেষ্টা-বেদন শ্রেণীর সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত।

পেশী-সংবেদনের উৎপাদন প্রণালী ও প্রকৃতি

পেশী-সংবেদন নিম্নপ্রকারে পাওয়া যাইতে পারে। বাহুর এবং তন্তুর (টীস্যু) উপরকার চর্ম কোকেইন ইন্‌জেক্‌শন্ অথবা ইথর সাহায্যে অসার করিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে চর্মের কণ্ডরার এবং সন্ধির সংবেদন অপসারিত হয়। এইবার অসার বাহুটিকে একটি বিশ্রাম স্থানের (সাপোর্ট) উপর রাখিয়া উহার পেশীর উপর চাপ দেওয়া হয়। চাপের মাত্রা বাড়াইবার ফলে পেশী সংবেদনের পরিবর্তন অনুভূত হয়।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রথমে একটি নিস্তেজ (ডাল্) এবং বিস্তৃত (ডিফিউজ্) সংবেদন ঘটে। উদ্দীপকের, অর্থাৎ চাপের, মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা একটি টান-সংবেদনের (সেন্‌সেশন্ অফ্ স্ট্রেইন্) মত অনুভূত হয়। কখনও কখনও মনে হয় যেন পেশীতে একটি শক্ত এবং নিশ্চল পিণ্ড রহিয়াছে, আবার কখনও বা মনে হয় যেন পেশীতন্তুগুলির একটি আর একটির সহিত ঘর্ষণ করা অথবা জড়াইয়া ফেলা হইতেছে। উদ্দীপিত অঙ্গটিকে ক্লান্ত বলিয়া মনে হয় এবং শেষ পর্যন্ত টান-সংবেদনটি আঘাত বা ব্যথা সংবেদনে পরিণত হইয়া নিস্তেজ ও বিস্তৃত বেদনার আকার ধারণ করে।

ইন্দ্রিয়

পেশী-সংবেদনের ইন্দ্রিয় হইল ফেসিয়্যাল্ রক্তকণিকা (ফেসিয়্যাল্ কর্পাস্‌ল্‌স্) এবং পেশীদণ্ড (স্পিণ্ড্‌ল্‌স্)। উদ্দীপনার ফলে রক্তকণিকাগুলি

সম্ভবতঃ একপ্রকার চাপ-সংবেদন উৎপন্ন করে। উপরোক্ত নিস্তেজ ও বিস্তৃত সংবেদনটিকে উহাদেরই কাজ বলা যাইতে পারে। টান, ব্যথা ও ক্লান্তি, যাহা বেদনার আকার ধারণ করে, হয়ত পেশীদণ্ডগুলিরই কাজ।

নার্ভ-সংস্থান বোধ (ইনার্ভেশন্ সেন্স্)

পেশী-সংবেদনের সহিত সন্ধি (টেন্ডিনাস্) এবং বন্ধনী (আর্টিকুলার্) সংবেদন প্রায়ই মিশ্রিত থাকে। যাহাকে নার্ভ-সংস্থান বোধ (ইনার্ভেশন্ সেন্স্) বলা হয় তাহা আসলে পেশীর কার্য নয়, কিন্তু উপরোক্ত দুইটি সহকারী সংবেদনের কার্য।

কোনো গুরুভার তুলিবার সময় যেন একটি শক্তি প্রয়োগ করিবার (পুটিং ফোর্থ অফ্ এনার্জি) অনুভূতি জন্মে। ইহাকেই নার্ভ-সংস্থান বোধ বা ইনার্ভেশন্ সেন্স্ বলা হইয়াছে। এই ইনার্ভেশন্ সেন্স্ সম্বন্ধে অনেক মনোবিৎ বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন। হ্বুণ্ড্ প্রভৃতি মনোবিৎ এই শক্তি প্রয়োগের বোধটির কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে শক্তি প্রয়োগ করিবার ফলে মস্তিষ্কের চেষ্টীয় কেন্দ্র (মোটর এরিয়া) হইতে নার্ভ-প্রবাহ উপচাইয়া পড়িয়া উহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পেশীতে প্রবাহিত হওয়ার ফলেই এই শক্তি বা চেষ্টা প্রয়োগের বোধ জন্মে।

কিন্তু ডঃ কুশিং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে মস্তিষ্কের চেষ্টীয় কেন্দ্রকে মৃদু তড়িৎপ্রবাহ (মাইল্ড্ ইলেক্ট্রিক্ কারেন্ট্) দিয়া উদ্দীপিত করিলেই অঙ্গ-সঞ্চালন ঘটে, কিন্তু এই সঞ্চালনে কোনো শক্তি বা চেষ্টা-প্রয়োগ বোধের উৎপত্তি হয় না।

জেম্স্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণের মতে এই বোধটিকে চেষ্টীয় সংবেদন এবং কল্পনার দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে এবং ইহাকে একটি স্বতন্ত্র সংবেদন বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।

স্টাউট্ এবং ম্যাকডুগ্যাল প্রভৃতির মতে শক্তি বা চেষ্টা প্রয়োগের বোধটি কোনো সংবেদন নয়। আসলে ইহা পেশী সংবেদনের সহিত সংশ্লিষ্ট ইচ্ছামূলক শক্তি।

উপসংহারে বলা যায় যে পেশী সংবেদন সক্রিয় নয়, কিন্তু নিষ্ক্রিয়। সক্রিয়তা বোধ এই সংবেদনের নিজস্ব ধর্ম নয়, কিন্তু ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংবেদনের যেমন সন্ধি ও বন্ধনী সংবেদনের ধর্ম। আধুনিক প্রয়োগ-মনোবিদ্যার সিদ্ধান্তও এইরূপ।

৭। সন্ধি সংবেদন (টেন্‌ডিনাস্ সেন্‌সেশন্)

একটি পেশীর সহিত আর একটি পেশীর অথবা অস্থির সংযোজক সূত্রকে (কনেক্‌টিভ্ টীস্থ) টেন্‌ডন্ বা সন্ধি বলে। সন্ধিতে অবস্থিত সংগ্রাহক যন্ত্রের উদ্দীপনার ফলে যে সংবেদন হয় তাহাকে বলে **সন্ধি-সংবেদন** (টেন্‌ডিনাস্ সেন্‌সেশন্)। এক পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে, অথবা হাত প্রসারিত করিয়া সেই হাতে একটি ভার ধারণ করিলে, যথাক্রমে পায়ের এবং হাতের পেশীদ্বয়ে অথবা পেশীর সহিত অস্থির সংযোজক সন্ধিতে ক্লান্তি উৎপন্ন হইয়া একপ্রকার চাপ-কষ্ট (স্ট্রেইন্) সংবেদন সৃষ্টি করে। এই সংবেদনের নাম সন্ধি-সংবেদন।

কুস্তি করা, ঠেলা দেওয়া, টানাটানি করা, ভার উত্তোলন করা প্রভৃতি সক্রিয় চেষ্টায় যে সন্ধি-সংবেদন হয় তাহাকে বলা যায় চেষ্টা বা পরিশ্রম।

গল্‌গি আবিষ্কৃত পেশী-দণ্ডগুলিই (স্পিণ্ড্‌ল্‌স্) সম্ভবতঃ সন্ধি-সংবেদনের ইন্দ্রিয়। উদ্দীপক প্রবল হইলে, পেশীর টানিয়া-ধরা সংবেদনের মত এই সংবেদনও একঘেয়ে (ডাল্) ব্যথায় পরিণত হইতে পারে।

৮। বন্ধনী সংবেদন (আর্টিকুলার্ সেন্‌সেশন্)

হাতের আঙ্গুল ছড়াইয়া অথবা চক্ষু বন্ধ করিয়া হাতের কব্জি (রিস্ট্) আস্তে আস্তে সাম্‌নের ও পিছনের দিকে নাড়াইলে যে সংবেদন হয় তাহাকে **বন্ধনী সংবেদন** (আর্টিকুলার সেন্‌সেশন্) বলে।

নানাপ্রকার চর্ম-সংবেদন—যেমন হাতের পাতায় শির্ শির্ বা ঠাণ্ডা বোধ, কখনও অঙ্গুলি-সন্ধির অস্থিতে, কখনও বা তর্জনীর সম্মুখভাগে অথবা অঙ্গুলির পার্শ্বে বিস্তৃত চাপ-বোধ এই সংবেদনের লক্ষণ।

ইহাতে চর্মতল-সংবেদন (সাব্‌কিউট্যানিয়াস্ সেন্‌সেশন্) থাকিলেও অত্যন্ত ক্ষীণভাবে থাকে এবং চাপ-কষ্ট (স্ট্রেইন্ সেন্‌সেশন্) এবং পেশী-সংবেদন একেবারেই থাকে না। শুধু কব্জির সন্ধি-বন্ধনীতে একটি বিস্তৃত এবং জটিল সংবেদন হয় যাহার গুণ চর্মের চাপ-সংবেদন হইতে পৃথক বলিয়া বোধ হয় না। এই সংবেদন প্রধানতঃ সন্ধি-বন্ধনীতে (আর্টিকুলার লিগামেণ্ট্‌স্) অবস্থিত প্রান্তাঙ্গের (এণ্ড্-অর্গ্যান্) উদ্দীপনা হইতে উৎপন্ন হয়।

৯। দেহ-বেদিতা (সোমেস্থেসিস্)

দেহ-বেদিতা (সোমেস্থেসিস্) বলিতে দেহের, বিশেষতঃ চর্মের, সংবেদনশীলতা বুঝায়। চর্মে, গভীরতর তন্তুতে এবং আভ্যন্তরীণ দেহ-যন্ত্রে (ভিসারা) চাপ, ব্যথা, তাপ এবং শৈত্য সংবেদনগুলির মিলিত নাম **সোমেস্থেসিস্ বা দেহবেদিতা।**

দেহ-বেদিতা ইন্দ্রিয়গুলি (সোমেস্থেটিক্ সেন্স্) তিন প্রকার কার্য করে। প্রথমতঃ, উহারা বাহ্যজগতের জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ, দেহে ও দেহাভ্যন্তরে যে সকল অবস্থা ঘটে সেই সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া নিজ (সেল্ফ্) এবং দেহ প্রতিরূপ (বডি ইমেজ্) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সহাযতা করে। তৃতীয়তঃ, ইহারা অনেক নোদনা (ড্রাইভ্) এবং উদ্দেশ্যের (মোটিভ্) যোগসূত্ররূপে কাজ করে।

দেহ-বেদিতা অঞ্চল (সোমেস্থেটিক্ এরিয়া)

দেহ-বেদিতা অঞ্চল বা সোমেস্থেটিক্ এরিয়া মস্তিষ্কের মধ্য-চির (সেণ্ট্র্যাল ফিসার্)-এর পশ্চাতে শিরকুম্ভাঞ্চলে (প্যারায়েটেল্ লোব) অবস্থিত।

দেহবেদিতা বলিতে বুঝায় চর্মে, গভীরতর তন্তুতে এবং দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্রে (ভিসারা) চাপ, ব্যথা, তাপ এবং শৈত্য সংবেদনগুলি। চর্মসংবেদন পুর্বেই আলোচিত হইয়াছে। দেহের আভ্যন্তরীন সংবেদন (ভিসার‍্যাল্ সেন্সেশন্) ব্যাখ্যা করিলেই দেহ-বেদিতার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হইবে।

১০। দেহাভ্যন্তরীণ-অঙ্গ-সংবেদন (ভিসার‍্যাল্ সেন্সেশন্)

দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্রের সংবেদনকে ভিসার‍্যাল্ সেন্সেশন্ বলে। দেহাভ্যন্তরীণ সংবেদনকে মোটের উপর তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা—(১) অস্থি, পেশী ও কণ্ডরা বা সন্ধি সংবেদন; (২) পৌষ্টিক নালী বা মহাস্রোতদেশীয় (অ্যালিমেণ্টারি কেন্যাল্) সংবেদন; এবং (৩) ফুসফুস্, রক্তবাহ (ব্লাড্ ভেসেল্) এবং বস্তি (ব্লাডার্) দেশীয় সংবেদন।

(১) অস্থি, পেশী ও সন্ধি সংবেদন পুর্বেই আলোচিত হইয়াছে। অস্থিগুলি পেশীর সাহায্যে সঞ্চালিত এবং পেশীগুলি উহাদের সহিত স্নায়ু এবং কণ্ডরা

(টেণ্ডন্) দ্বারা যুক্ত থাকে। সুতরাং অস্থির কোনো পৃথক সংবেদন ঘটে কিনা তাহাতে সন্দেহ কাছে।

(২) দেহ নিরেট নয়। পৌষ্টিক নালী (অ্যালিমেণ্টারি কেন্যাল্) ইহাকে বিদীর্ণ করিয়াছে। এই নালীর কাজ হইল খাদ্য গ্রহণ করা এবং খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় (ওয়েইস্ট্) অংশগুলি নিঃসারিত করা। এই নালীর উপরের অংশ হইতে তিন প্রকারের সংবেদন হয়—যথা, মুখগহ্বরের শেষ পশ্চাদংশ এবং কণ্ঠের উপরাংশ তৃষ্ণা-সংবেদন, মুখগহ্বর হইতে পাকস্থলী পর্যন্ত চালিত অংশ বিবমিষা (নসিয়া) অথবা অসুস্থতা (সিক্‌নেস্) সংবেদন এবং পাকস্থলী স্বয়ং ক্ষুধা সংবেদন উৎপন্ন করে। অন্ত্র (ইন্‌টেস্টাইন্) হইতে কোনো নূতন সংবেদন উৎপন্ন হয় না।

(৩) ফুস্‌ফুস্, রক্তবাহ এবং বস্তি প্রদেশ হইতে সম্ভবতঃ নূতন সংবেদন পাওয়া যায়। ফুস্‌ফুস্ হইতে সতেজ (ব্রেসিং) এবং রুদ্ধশ্বাস (স্টাফি) সংবেদন জন্মে। আবার রক্তবাহ হইতে সুড়সুড়ি বা টিঙ্গ্‌লিং, চুলকনা বা ইচিং এবং বেধন (পিন্‌স্ অ্যাণ্ড্ নিড্‌ল্‌স্) সংবেদন উৎপন্ন হয়। তৃতীয়তঃ, ভয়ে প্রক্ষুব্ধ হইলে সম্ভবতঃ বস্তিদেশ হইতে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির উত্তেজিত হওয়ার (স্টার্‌ড্ আপ্) সংবেদন ঘটে।

কাইনেস্‌থেসিস্ (চেষ্টা বেদন)

কাইনেস্‌থেসিস্ বলিতে পেশী, কণ্ডরা বা সন্ধি সংবেদনগুলির সমষ্টি বুঝায়। এই সংবেদনগুলি গতি (মুভ্‌মেণ্ট্) এবং অবস্থানের (পজিশন্) দূরত্ব (ডিস্‌ট্যান্স্) এবং দেহের সাম্যবোধ (সেন্স্ অব্ বডি ইকুইলিব্রিয়াম্) প্রভৃতি সম্বন্ধে ঘটে।

এইগুলির আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।

১১। বাহ্যেন্দ্রিয় (এক্স্‌টারোসেপ্টর্), মধ্যেন্দ্রিয় (ইণ্টারোসেপ্টর্) এবং আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় (প্রপ্রায়োসেপ্টর্)

শেরিংটন্ উদ্দীপক সংগ্রাহক যন্ত্রগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

(১) প্রথমটি দেহের উপরিভাগে অথবা উহার নিকটে অবস্থিত। এই সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্য পরিবেশের উদ্দীপক দ্বারা উদ্দীপিত হয়, যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, চর্ম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংগ্রাহক যন্ত্রগুলি।

(২) দ্বিতীয়টি দেহের অভ্যন্তরের উপরিভাগে অবস্থিত, যেমন মুখগহ্বর, পৌষ্টিক নালী এবং উহার সহিত সংস্পৃষ্ট উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপিত হয়।

(৩) তৃতীয়টি দেহের কলায় (টীস্যু) অবস্থিত এবং টীস্যু-এর পরিবর্তিত অবস্থার দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত তিন শ্রেণীর সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টিকে শেরিংটন্ বলিয়াছেন যথাক্রমে বাহ্যেন্দ্রিয় (এক্স্‌টারোসেপ্টর্), মধ্যেন্দ্রিয় (ইণ্টারোসেপ্টর্) এবং আভ্যন্তরীণ (প্রপ্রায়োসেপ্টর্) ইন্দ্রিয়।

প্রপ্রায়োসেপ্টর্ গুলির মধ্যে যেগুলি গতি-সংবেদন উৎপন্ন করে প্রধানতঃ সেইগুলিই প্রায়োগিক মনোবিৎকে আকৃষ্ট করে। এই গতি সংবেদনগুলি সাধারণতঃ পেশীয়, চেষ্টীয় অথবা চেষ্টা-বেদনীয় সংবেদনে বিভক্ত। ব্যক্তির জ্ঞান ও নৈপুণ্য বিকাশে ইহারা বিশেষ সহায়ক। গতি সংবেদনগুলির নানা শ্রেণীবিভাগ পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহা ছাড়া এক্স্‌টারোসেপ্টর্ অর্থাৎ বিশেষ সংবেদনের এবং ইণ্টারোসেপ্টর্ অর্থাৎ যান্ত্রিক সংবেদনের সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে।

১২। যান্ত্রিক সংবেদন (অর্গ্যানিক্ সেন্‌সেশন্)

যান্ত্রিক সংবেদন কাহাকে বলে

যে সকল সংবেদনের সংগ্রাহক যন্ত্র (রিসেপ্টর্ অর্গ্যান্‌স্) দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত উহাদিগের সমষ্টিকে যান্ত্রিক-সংবেদন (অর্গ্যানিক্ সেন্‌সেশন্) বলে। যান্ত্রিক সংবেদন ব্যাপক ও সঙ্কীর্ণ, এই দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যাপক অর্থে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের সকল, সংবেদনই এমন কি চেষ্টা-বেদন (কাইনেস্‌থেটিক্) সংবেদন এবং পেশী-সংবেদনও যান্ত্রিক-সংবেদনের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু সঙ্কীর্ণ অর্থে, **যে সকল আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের সংবেদন দেহের পুষ্টি (ন্যুট্রিশন্) বা স্বাস্থ্যের নিয়ামক—যেমন পৌষ্টিক নালীর (অ্যালিমেণ্টারি কেন্যাল্) সংবেদন, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, নিদ্রা, মাথাধরা, ক্লান্তি, বিবমিষা প্রভৃতি—উহাদের সমষ্টিই যান্ত্রিক সংবেদন।** সাধারণতঃ এই দ্বিতীয় অর্থেই যান্ত্রিক সংবেদন কথাটি গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু গতিসংবেদন অথবা বিশেষ চেষ্টাবেদনগুলিকে যান্ত্রিক সংবেদন হইতে বাদ দিলেও, ইহারা উহার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

যান্ত্রিক ও বিশেষ সংবেদনের পারস্পরিক প্রভাব

(১) যান্ত্রিক সংবেদন বিশেষ **জটিল,** কারণ ইহার সহিত পেশীর, স্নায়ুগ্রন্থি এবং সন্ধির সংবেদন ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। তাহা ছাড়া যান্ত্রিক সংবেদনের সহিত প্রায় সবগুলি বিশেষ (স্পেশাল্) সংবেদনই সংশ্লিষ্ট থাকে। যেমন, ঘ্রাণ বা স্বাদ বিবমিষা (নসিয়া) সংবেদনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার বিবমিষা খাদ্যের স্বাদ ও ঘ্রাণকে পরিবর্তিত করে, অথবা সমগ্র দেহে শিহরণ এবং তাপ, শৈত্য প্রভৃতি বিশেষ স্পর্শ সংবেদনের সৃষ্টি করিতে পারে। আবার কোনো শব্দ বা কণ্ঠস্বর হয়ত বিতৃষ্ণা বা একপ্রকার দৈহিক অস্বস্তি জন্মায়। শ্লেটএর উপর পেন্সিল ঘষিলে যে তীক্ষ্ণ ও কর্কশ শব্দ হয় তাহা শুনিয়া দাঁতে দাঁত লাগিতে পারে। কোনো দৃশ্য, যেমন ময়লা, আবর্জনা, বমি, আরশুলা, কেঁচো, প্রাণীর গলিত দেহ, বিবমিষা বা অন্য দৈহিক অস্বস্তি জন্মাইতে পারে। স্পর্শ সংবেদন, যেমন চাপ, উত্তাপ, শৈত্য, ব্যথা প্রভৃতির সহিতও যান্ত্রিক সংবেদন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কর্কশ ভূমিতে বা ঘরের মেজেতে হাত বুলাইলে সমস্ত শরীরে কণ্টকিত বোধ বা শিহরণ জাগিতে পারে।

যান্ত্রিক সংবেদনও বিশেষ সংবেদনগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। ক্ষুধা বা রুচি থাকিলে খাদ্যের স্বাদ ও গন্ধ অপেক্ষাকৃত ভাল লাগে, এমন কি শাকান্নও অমৃত বলিয়া মনে হয়। আবার অক্ষুধায় বা অরুচিতে উপাদেয় খাদ্যও বিস্বাদ লাগে।

. . .

যান্ত্রিক ও বিশেষ সংবেদনের পার্থক্য

(২) কিন্তু যান্ত্রিক সংবেদন আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক-প্রসূত এবং বিশেষ সংবেদন বাহ্য উদ্দীপক-প্রসূত, দুই সংবেদনের উল্লিখিত ভেদটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বাহ্য উদ্দীপকও যান্ত্রিক সংবেদন ঘটাইতে পারে। যেমন কোনো আঘাত বা ক্ষত হইতে উৎপন্ন ব্যথা সংবেদন বাহ্য উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন হইলেও যান্ত্রিক সংবেদন। সুতরাং যান্ত্রিক সংবেদনকে শুধু বহিরুদ্দীপক-প্রসূত (ইণ্টারন্যালি ইনিসিয়েটেড্ সেন্সেশন্) সংবেদন রূপে ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না।

(৩) বিশেষ সংবেদন হইতে যান্ত্রিক সংবেদনের পার্থক্য গভীর। যান্ত্রিক সংবেদন সেই সকল দৈহিক ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত হয় যেগুলি প্রাণীর পুষ্টি (নিউট্রিশন্) এবং বৃদ্ধিকে (গ্রউথ্) প্রভাবিত করে। উহার উদ্দীপক পাওয়া

যায় রক্তসঞ্চালনের বা রক্তসরবরাহের বিভিন্ন অবস্থায়, খাদ্যের পরিপাক-ক্রিয়ায়, গ্রন্থির রসক্ষরণে, অক্সিজেন সরবরাহে অথবা শ্বাসকার্যে—এক কথায়, সেই সকল দৈহিক ক্রিয়ায় যাহারা দেহতন্তুগুলিকে (নার্ভাস্ টীস্যু) তাহাদের প্রধান ক্রিয়া-সম্পাদনে সহায়তা করে। অপর পক্ষে, বিশেষ সংবেদন উৎপন্ন হয় বাহ্য উদ্দীপকের সংস্পর্শে। ইহা মুখ্যভাবে প্রাণীর পুষ্টি বা বৃদ্ধির সহায়তা করে না।

যান্ত্রিক সংবেদন দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পরিমাপক

(৪) যান্ত্রিক সংবেদনকে **দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পরিমাপক** যন্ত্র (ব্যারোমিটার) বলা যায়। এই সংবেদনগুলি স্বাভাবিক হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রাণীর স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক এবং উহাদের গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা হইলে বুঝিতে হইবে যে অসুস্থতা ঘটিয়াছে। তৃষ্ণা, ক্ষুধা, ক্লান্তি, নিদ্রা প্রভৃতি যান্ত্রিক সংবেদনের আধিক্য বা অল্পতা অসুস্থতার এবং উহাদের যথাযথ ক্রিয়া সুস্থতার সূচক। যান্ত্রিক সংবেদনগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতার ফলে সমগ্র দেহে যে **একতানতা বা সাম্যবোধ** হয় অধ্যাপক স্টাউট্ তাহার নাম দিয়াছেন **সমগ্র-সংবেদন (কো-এনেস্থেসিস্)**, অথবা **সাধারণ সংবেদনশীলতা (কমন্ সেন্‌সিবিলিটি)**। ইহাকে **জীবনীশক্তিবোধও (ভাইট্যাল ফীলিং)** বলা যায়। একটি যান্ত্রিক সংবেদন বিশৃঙ্খল হইলেই এই সাধারণ বা সমগ্র সংবেদন ব্যাহত হয়। এই সমগ্র সংবেদনের মূলে রহিয়াছে যাবতীয় আভ্যন্তরীণ যন্ত্র-গুলির সুশৃঙ্খল ক্রিয়া যাহা প্রাণীর যান্ত্রিক সুস্থতার (অর্গ্যানিক্ ওয়েলফেয়ার্) নির্ণায়ক। এই সতেজ অথবা সুস্থসবল বোধ নষ্ট হইয়া যায়, যদি সামান্য একটি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রও বিকল হইয়া পড়ে, যেমন যদি হঠাৎ মাথা ধরে বা ঘুম পায়, বা পেট ব্যথা করে। জলাশয়ের নিস্তরঙ্গ জলরাশির উপর একটি ঢিল ছুঁড়িলেই যেমন উহা তরঙ্গায়িত এবং চঞ্চল হইয়া ওঠে, তেমন একটি যান্ত্রিক সংবেদন বিশৃঙ্খল হইলেই সাধারণ বোধ বা সমগ্র সংবেদন বিশৃঙ্খল হয়।

স্থান নির্দেশ

(৫) যান্ত্রিক সংবেদন, বিশেষ সংবেদনের তুলনায় অস্পষ্ট। কতগুলি যান্ত্রিক সংবেদন এতই অস্পষ্ট যে উহাদের স্থান-নির্দেশ (লোক্যালাইজেশন্) একেবারেই অসম্ভব। যেমন বিবমিষা বা বমি-বমি ভাব সমগ্র দেহে বিস্তৃত

হয় এবং ঠিক করিয়া বলা যায় না এই সংবেদনটি দেহের কোন্ বিশেষ অংশে অবস্থিত। আবার কতগুলি যান্ত্রিক সংবেদনের অস্পষ্ট স্থান-নির্দেশ সম্ভব। যেমন, পাকস্থলী, ফুস্‌ফুস্, যকৃৎ প্রভৃতির যান্ত্রিক সংবেদনের মোটামুটিভাবে স্থান নির্দেশ করা যায়। তৃতীয়তঃ, আরও কতগুলি যান্ত্রিক সংবেদনের স্পষ্ট স্থান নির্দেশ করা যায়। যেমন আঘাত বা ক্ষত হইতে যে যান্ত্রিক সংবেদন ঘটে উহা আঘাত বা ক্ষতস্থানকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

(৬) যান্ত্রিক সংবেদনের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা সর্বাপেক্ষা **আদিম সংবেদন।** ক্ষুদ্র কীট এবং পতঙ্গেরও এই সংবেদন আছে। (৭) আবার বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের ক্ষমতা যান্ত্রিক সংবেদনের নাই বলিলেই চলে। ইহারা দেহাভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সহায়তা করে মাত্র। (৮) তাহা ছাড়া যান্ত্রিক সংবেদন সহজ প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, অনুভূতি প্রভৃতি মানসক্রিয়ার ভিত্তি। সহজ প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছার মূলে যে অস্বস্তি বোধ থাকে তাহা একপ্রকার যান্ত্রিক সংবেদন। (৯) আবার অনুভূতিতে যান্ত্রিক সংবেদনের স্থানও অনস্বীকার্য।

১৩। কয়েকটি যান্ত্রিক সংবেদন

ক্লান্তি, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বিবমিষা প্রভৃতি, যান্ত্রিক সংবেদনের উল্লেখযোগ্য প্রকারভেদ। এই সংবেদনগুলি ষোড়শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

ক্লান্তি উৎপন্ন হয় পেশীর অবিশ্রাম ক্রিয়ার ফলে। ইহার সহিত জড়িত থাকে নানাবিধ যান্ত্রিক সংবেদন, যেমন সাধারণ অবসন্নতা বোধ, স্থানীয় চাপবেদন (স্ট্রেইন্, পেইন্)।

নিদ্রায় বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। জীবদেহের বিপাকের (মেটাবলিজ্‌ম্) দুইটি দিক, যথা উপচিতি (অ্যানাবলিজ্‌ম্) এবং অপচিত (ক্যাটাবলিজ্‌ম্)। উপচিতি এবং অপচিতির মধ্যে তাল (রিদ্‌ম্) রক্ষাই নিদ্রা এবং জাগরণের লক্ষ্য। জাগরণে নিয়ত কর্মপ্রচেষ্টা বা ব্যস্ততার ফলে জীবদেহের যে ভাঙ্গন বা অপচিতি ঘটে তাহার ক্ষতিপুরণ হয় নিদ্রায় বিশ্রাম হইতে উৎপন্ন গড়ন বা উপচিতির মধ্য দিয়া। নিদ্রায় ইন্দ্রিয়গুলি পরিপুর্ণ বিশ্রাম পাইয়া জাগরণের ক্লান্তি হইতে মুক্ত হয় এবং আবার সতেজ হইয়া জাগরণের কর্মব্যস্ততার জন্য প্রস্তুত হয়। এই কারণে জীবদেহের স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং বৃদ্ধির পক্ষে নিদ্রা একটি অপরিহার্য প্রয়োজন।

পুষ্টিনালীর সহিত সংশ্লিষ্ট সংবেদনগুলির মধ্যে **ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বিবমিষা এবং অজীর্ণের ব্যথা** প্রধান। অবশ্য ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আংশিকভাবে পাকস্থলী এবং গলবিল-এর (ফ্যারিংস্) অবস্থা হইতে উদ্ভূত। এই দুইটি যান্ত্রিক সংবেদনেই একপ্রকার দংশন বা কামড়ানো (নয়িং) সংবেদন অনুভূত হয় এবং আহার্য ও পানীয় পাইলেই এই কষ্টকর অনুভূতি দূর হয়। গলদেশের শুষ্কতা **তৃষ্ণার** একটি প্রধান লক্ষণ।

ক্ষুধা দেহের কোনো অভাব হইতেই উদ্ভূত, যদিও ক্ষুধাবোধ পাকস্থলীতে নির্দিষ্ট। প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষুধায় ব্যথা অনুভূত হয় না. এবং ইহা শুধু খাদ্য অনুসন্ধানের আবেগরূপেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু ক্ষুধা পরিতৃপ্ত না হইলে পাকস্থলীতে বিশেষ কষ্ট এবং দেহযন্ত্রের অভাব-জনিত দুর্বলতা ও আচ্ছন্নতা অনুভূত হয়।

ক্ষুধার প্রধান ভিত্তি শুধু পাকস্থলীর অবস্থাই নয়, কারণ পাকস্থলী অপসারিত হইলেও কুকুরের ক্ষুধা বোধ থাকে। রাত্রিতে সুনিদ্রা হইলে দশ ঘণ্টা উপবাসে যে ক্ষুধা হয় তাহা কর্মকোলাহলে থাকিয়া চার ঘণ্টা উপবাসজনিত ক্ষুধা অপেক্ষা কম অনুভূত হয়। দেহকলা তন্তুর (টীসু) ক্ষয় ও পুরণের উপর এই পার্থক্য নির্ভর করে। ইন্‌জেক্‌শন করিয়া শিরায় পুষ্টিকর পদার্থ প্রবিষ্ট করিলে পাকস্থলীতে খাদ্য না দিয়াই ক্ষুধার উপশম হয়। খাদ্য রক্তের সহিত মিশিবার পুর্বেই ক্ষুধা দূর হয় এবং তৃপ্তিবোধ জন্মে।

ক্ষুধার অনুরূপ তৃষ্ণাও দেহযন্ত্রের জলাভাব বোধ হইতে উদ্ভুত হয়। প্রথমে জিহ্বার ও গলদেশের শুষ্কতারূপে ইহার অনুভূতি ঘটে।

বিবমিষা (নসিয়া) অজীর্ণতার একটি প্রধান লক্ষণ। কখনও কখনও ইহা স্নায়বিক কারণেও উৎপন্ন হয়, যেমন সমুদ্র-পীড়ার (সী-সিক্‌নেস্) ক্ষেত্রে। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের জৈব ক্রিয়ার উপর প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার ফলে বিবমিষা জন্মে।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

মোলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেণ্ট্‌স্ অফ্ সাইকলজি—পঞ্চম, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জি. এফ্. স্টাউট্—এ ম্যানুয়্যাল্ অফ্ সাইকলজি—দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এম্. কলিন্‌স্ অ্যাণ্ড জে. ড্রিভার—এক্সপেরিমেণ্ট্যাল সাইকলজি—তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উড্‌ওয়ার্থ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস্—সাইকলজি—পঞ্চদশ „

ই. বি. টিশ্‌নার—এ টেক্স্‌ট্‌বুক্ অফ্ সাইকলজি—তৃতীয় „

বোরিং, ল্যাংফেল্ড্ —ওয়েল্ড্—ফাউণ্ডেশন্‌স্ অফ্ সাইকলজি—পঞ্চদশ, ষোড়শ „

Exercise

1. Explain the psychology of taste and smell. State also the physiology of the sense organs involved in these sensations. (pp. 441-444)
2. Explain the importance of taste and smell sensations in health and disease. (p. 433)
3. Discuss the question of the number of the fundamental tastes and smells. (pp. 442-446)
4. What do you mean by "Chemical sense" ? Why are taste and smell called so ? (pp. 446-447)
5. Explain the different classes of cutaneous sensation with their sense-organs. (pp. 447-452)
6. Write short notes on (a) Paradoxical cold sensation, (b) the sensation of tickling. (pp. 449, 452)
7. Distinguish between protopathic and epicritic sensation. State the results of Dr. Head's experiment in this connection. (pp. 452-455)
8. Give an analysis of muscular sensation. Is there an 'innervation sense' ? Discuss. (pp. 455-458)
9. Write short notes on (a) innervation sense, (b) Tendinous sensation, (c) Articular sensation (pp. 457-458)
10. Define Somaes thesis. Give a brief analysis of the somaesthetic sensations. (pp. 459-460)
11. Bring out the difference between exteroceptors, interoceptors and proprioceptors. (pp. 460-461)
12. Define organic sensation. Explain the character of organic sensation. (pp. 461-464)
13. Explain the relation between organic and special sensation. (pp. 462-463
14. Explain the organic sensations of hunger, thirst, sleep and fatigue (pp. 464-465

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যক্ষ (পার্‌সেপ্‌শন্‌)

১। প্রত্যক্ষ কাহাকে বলে

সংবেদন বস্তুর চেতনা-মাত্র (বেয়ার্‌ অ্যাওয়্যার্‌নেস্‌)। এই চেতনা-মাত্র হইতে যে বিশেষ প্রকারের চেতনা জন্মে, যেমন সংবেদিত বস্তু এই প্রকার বা ঐ প্রকার, এইরূপ বিশেষ প্রকারক চেতনা বা জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে।

একটি নীল ফুল দেখিতেছি। ফুলের নীল বর্ণ ইথর তরঙ্গের আকারে চক্ষুগোলকের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া অক্ষিপটের পীতবিন্দুতে প্রতিফলিত হইল, ফলে পীতবিন্দুর সন্নিহিত দর্শন-নার্ভ উদ্দীপিত হইল, উদ্দীপনা নার্ভ-প্রবাহের আকারে ঐ নার্ভ দিয়া মস্তিষ্কের দর্শনকেন্দ্রে (অক্সিপিটাল্‌ লোব্‌) পৌঁছিল, এইরূপে নীলবর্ণের একটি চেতনা জন্মিল। কিন্তু এই চেতনা চেতনা-মাত্র বা সংবেদন। নীল বর্ণটি যে নীল ফুলটিরই একটি গুণ অথবা নীলত্ব নামক সামান্য গুণেরই একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত—প্রভৃতি বিশেষ আকারের জ্ঞান বা চেতনা এই সংবেদনে নাই।

নীল ফুলের জ্ঞান শুধু সংবেদন নয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ। এই স্থলে নীলত্ব-জ্ঞানটি একটি বিশেষ প্রকারের জ্ঞান। এই জ্ঞানে অন্যান্য নীল বস্তুর সহিত নীল ফুলটির সাদৃশ্য, নীল-অতিরিক্ত অন্য বস্তু হইতে ইহার পার্থক্য, যে নীল ফুল পূর্বে প্রত্যক্ষ হইয়াছে ইহা তজ্জাতীয় এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা (রি-কগ্‌নিশন্‌), যে নীল ফুলটি প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহা বস্তুতঃ নীল এইরূপ বিশ্বাস, নীল ফুলটি বাহ্য জগতের একটি অংশ, এবং ইহা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বা দেশে এবং বর্তমান কালে প্রত্যক্ষ বা জ্ঞাত হইতেছে এইরূপ চেতনা রহিয়াছে।

প্রত্যক্ষে সদৃশীকরণ (অ্যাসিমিলেশন্‌), পৃথকীকরণ (ডিস্ক্রিমিনেশন্‌), পূর্ব অভিজ্ঞতার পুনরুদ্দীপন (রিপ্রডাকশন্‌), বিশ্বাস (বিলিফ্‌), বহিঃক্ষেপণ (অব্‌জেক্‌টিফিকেশন্‌) এবং স্থান ও কাল নির্দেশ (লোক্যালাইজেশন্‌) —এই সকল লক্ষণগুলি বর্তমান। **যে মানসবৃত্তিতে অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুৎপাদন, উহার সহিত বর্তমান অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য ও পার্থক্য জ্ঞান, বহিঃক্ষেপণ এবং স্থানকাল নির্দেশ সাহায্যে উপস্থাপিত বিষয়ের সংবেদনের (সেন্‌সেশন্‌) বিশ্বাসযুক্ত অর্থব্যাখ্যা (ইণ্টার্‌প্রেটেশন্‌)**

ঘটে তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। সংক্ষেপে প্রত্যক্ষকে সংবেদনের ব্যাখ্যা অথবা সংবেদন+ব্যাখ্যাও (সেন্‌সেশন্ প্লাস্ ইট্‌স্ ইণ্টার্‌প্রেটেশন্) বলা হইয়া থাকে।

নীল ফুলটির প্রত্যক্ষে উহা উপস্থাপিত (প্রেজেণ্টেড্) হইয়াছে। কিন্তু উহা যে শুধু উপস্থাপিত হইয়াছে অথবা বর্তমানে প্রদত্ত বস্তুরূপেই জ্ঞাত হইতেছে তাহা নয়। উপস্থাপিত নীল ফুলটির প্রত্যক্ষে অস্পষ্ট স্মৃতির আকারে অতীতে জ্ঞাত উহার সমজাতীয় বা বিজাতীয় বস্তুর পুনরুপস্থাপনও (রি-প্রেজেণ্টেশন্) আবশ্যক। নীল ফুল কাহাকে বলে তাহার পূর্বজ্ঞান না থাকিলে উপস্থাপিত নীল ফুলটির সংবেদন (সেন্‌সেশন্) হইতে পারে, কিন্তু উহার প্রত্যক্ষ (পারসেপ্‌শন্) হইতে পারে না। উহার প্রত্যক্ষ হইতে হইলে নীল ফুলের অতীত অভিজ্ঞতার সহিত বর্তমানে উপস্থাপিত নীল ফুলটির সম্বন্ধ থাকা চাই। নীল ফুলটির উপস্থাপিত রূপ দেখিবা মাত্র অতীতে উপস্থাপিত এবং বর্তমানে অনুপস্থিত নীল ফুলগুলির প্রতিরূপের পুনরুৎপাদন সাহায্যে অস্পষ্ট স্মরণ ঘটে এবং এইরূপেই উহার প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়।

এই কারণে বলা যাইতে পারে যে **প্রত্যক্ষ একটি উপস্থাপন পুনরুপ-স্থাপন কূট (প্রেজেণ্টেটিভ্-রিপ্রেজেণ্টেটিভ-কম্‌প্লেক্স্)।**

প্রত্যক্ষ একাধারে বিশ্লেষণাত্মক এবং সংশ্লেষণাত্মক ক্রিয়া। প্রত্যক্ষ উহার বিষয়কে বিজাতীয় বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া জানে। এই দিক্ দিয়া প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণাত্মক (অ্যানালিটিক্), কারণ পৃথকীকরণ (ডিফারেন্সিয়েশন্) ইহার একটি বিশেষ ধর্ম। আবার প্রত্যক্ষ সংশ্লেষণাত্মকও (সিন্‌থেটিক্) বটে, কারণ ইহা বস্তুকে সমজাতীয় বস্তুর সহিত সদৃশীকরণের (অ্যাসিমিলেশন্) সাহায্যে জানে।

কিন্তু প্রত্যক্ষের সংশ্লেষণাত্মক লক্ষণটিই প্রধান বা মুখ্য বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ প্রত্যক্ষে পৃথক্ পৃথক্ রূপে কল্পিত সংবেদনগুলি গ্রথিত বা সংশ্লেষিত হয়। টেবিলের প্রত্যক্ষে কোনো বর্ণ, যেমন বাদামী, কোনো স্পর্শ, যেমন কাঠিন্য, শীতলতা, মসৃণতা প্রভৃতি গুণগুলি দ্বারা বিশিষ্ট টেবিল জ্ঞাত হয়। প্রত্যক্ষে আমরা এইগুলিকে টেবিল হইতে পৃথক রূপে জানি না, কিন্তু জানি উহার সহিত সংযুক্তভাবে—অর্থাৎ একটি বাদামী-কঠিন-শীতল-মসৃণ টেবিল জানি। সুতরাং প্রত্যক্ষ কতগুলি পৃথক সংবেদনের সমষ্টি মাত্র নয়, কিন্তু ইহা একটি গোটা বা সম্পূর্ণ বস্তুর জ্ঞান। অতীত অভিজ্ঞতার সহিত বর্তমান জ্ঞানের মিলন বা সংশ্লেষণ প্রত্যক্ষের প্রধান বা মুখ্য ধর্ম।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যক্ষে পূর্ব অভিজ্ঞাত বস্তু পুনরুপস্থাপিত বা পুনরুদ্দীপিত হয় এবং পুনরুপস্থাপিত বস্তুর প্রত্যভিজ্ঞা ঘটে। স্মরণক্রিয়ায়ও (মেমরি) অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্দীপন বা পুনরুপস্থাপন এবং প্রত্যভিজ্ঞা ঘটিয়া থাকে। তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে **প্রত্যক্ষের সহিত স্মরণের পার্থক্য কি।** উত্তর এই যে এই দুইটি ক্রিয়ায় পুনরুদ্দীপন বা পুনরুৎপাদন থাকিলেও, ভিন্নভাবে থাকে। এই পার্থক্যটি পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত হইবে।

প্রত্যক্ষ সংবেদনের বিশেষ প্রকারক জ্ঞান। অর্থাৎ নীল ফুলটির সংবেদনে ঐ বস্তুর একটি চেতনামাত্র থাকে। কিন্তু নীল ফুলটির প্রত্যক্ষে ঐ নির্বিশেষ জ্ঞান বিশিষ্ট আকার লাভ করে। ফুলটি যে নীল, উহা যে নীলত্বগুণ-বিশিষ্ট ফুলের সমশ্রেণীভুক্ত এবং নীলত্বভিন্নগুণবিশিষ্ট বস্তুর পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত এই জ্ঞান নীল ফুলের প্রত্যক্ষে ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ নীল ফুলের প্রত্যক্ষ ঐ বস্তুর অর্থব্যাখ্যা বিশেষ। সুতরাং **প্রত্যক্ষকে বলা যায় সংবেদনের ব্যাখ্যা বা অর্থগ্রহণ—(পার্সেপশন্ ইজ্ দি ইণ্টার্‌প্রেটেশন্ অফ্ সেন্‌সেশন্)।**

তাহা ছাড়া নীল ফুলের প্রত্যক্ষে শুধু উপস্থিত ফুলটিই উহার জ্ঞাত অর্থের সবটুকু নয়। উপস্থিত ফুলটির প্রত্যক্ষ হয় সেইরূপ একটি বস্তুর আকারে যাহা পূর্বে জ্ঞাত হইয়াছিল। বস্তুটি উহার পুনঃপরিচিতির স্বাক্ষর লইয়া জ্ঞাত হয়। অর্থাৎ **প্রত্যভিজ্ঞা** বা **রি-কগ্‌নিশন্** প্রত্যক্ষের একটি বিশেষ লক্ষণ। প্রত্যভিজ্ঞা ঘটিতে হইলে প্রত্যভিজ্ঞাত বস্তুর অতীত জ্ঞানের স্মরণ আবশ্যক। এই স্মরণ অস্পষ্ট বা অব্যক্ত হইলেও ইহাতে পূর্ব প্রত্যক্ষের ফল হিসাবে বস্তুর প্রতিরূপ পুনরুপস্থাপিত হইয়া থাকে।

অর্থাৎ প্রত্যক্ষে যে শুধু উহার বস্তুটি প্রদত্ত বা উপস্থাপিত (প্রেজেণ্টেড্) হয় তাহাই নয়। এই উপস্থিত বা প্রদত্ত বস্তু ব্যাখ্যাত হয় উহার অতীত প্রত্যক্ষফলের, অর্থাৎ প্রতিরূপের পুনরুপস্থাপনের মধ্য দিয়া। উপস্থিত নীল ফুলটি এবং উহার অতীত প্রত্যক্ষফলের বা প্রতিরূপের পুনরুপস্থিতি মিলিত হইবার ফলেই নীল ফুলের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়।

এই কারণে প্রত্যক্ষকে **উপস্থাপিত-পুনরুপস্থাপিত বস্তুকূট (প্রেজেণ্টেটিভ্-রিপ্রেজেণ্টেটিভ্ কম্‌প্লেক্স্)** বলা হইয়া থাকে।

উপসংহার

সুতরাং প্রত্যক্ষের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ এই :—

(১) প্রত্যক্ষে উপস্থাপিত এবং পুনরুপস্থাপিত এই দুই প্রকার উপাদান মিলিত হয়।

(২) প্রত্যক্ষে উপস্থাপিত বা প্রদত্ত বস্তুর উহার সমশ্রেণীভুক্ত বস্তুর সহিত **সদৃশীকরণ** (অ্যাসিমিলেশ্‌ন্) এবং ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত বস্তু হইতে **পৃথকীকরণ** (ডিস্ক্রিমিনেশন্) ঘটে।

(৩) ইহাতে যে বস্তুটি জ্ঞাত হয় তাহার **স্থানীয়** (স্প্যাশাল্) এবং কালিক (টেম্পোরাল্) **নির্দেশ** থাকে। বস্তুটি কোথায় এবং কখন প্রত্যক্ষ হইতেছে সেই জ্ঞান প্রত্যক্ষের বিশেষ লক্ষণ।

(৪) আবার বস্তুটি যে বাহিরে রহিয়াছে এবং উহা যে মানস নয় এইরূপ **বিক্ষেপণও** (অব্‌জেক্‌টিফিকেশন) প্রত্যক্ষের বিশেষ ধর্ম।

(৫) তাহা ছাড়া **অস্পষ্ট স্মরণ** এবং **প্রত্যভিজ্ঞাও** প্রত্যক্ষের পরিচায়ক। যে বস্তুটি প্রত্যক্ষ হইতেছে উহাকে চিনিতে পারা এবং উহাকে চিনিতে গিয়া উহার পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করা প্রত্যক্ষের বিশেষ ধর্ম।

২। প্রত্যক্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ক্রিয়া

প্রত্যক্ষে পুনরুপস্থাপন ও প্রত্যভিজ্ঞার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষে এই ক্রিয়াগুলি সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে (অটোম্যাটিক) নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে স্মৃতিতে এই ক্রিয়া দুইটি সচেষ্ট এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে সম্পন্ন হয়।

এই পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষকে সচেষ্ট (ভলাণ্টারি) স্মৃতি না বলিয়া **অস্পষ্ট স্মৃতি** (ইম্‌প্লিকেট্ মেমরি) এবং **স্বতঃস্ফূর্ত** (ফ্রী) স্মৃতি বলিতে হয়। তাহা ছাড়া প্রত্যক্ষে যে সদৃশীকরণ এবং পৃথকীকরণ ঘটে তাহাও স্বতঃস্ফূর্ত এবং সহজভাবে সম্পন্ন হয়। এই কারণে কেহ কেহ প্রত্যক্ষকে **সহজ সদৃশীকরণ** (অটোম্যাটিক্ অ্যাসিমিলেশন্) বলিয়াছেন। আবার প্রত্যক্ষে বহু সংবেদন মিশ্রিত হওয়ার ফলে একটি সম্পূর্ণ বা গোটা বস্তু জ্ঞাত হইয়া থাকে। এই জন্য কেহ কেহ প্রত্যক্ষের সংশ্লেষণকে মিশ্রণ (ফিউসন্) বলিয়া থাকেন।

প্রত্যক্ষ ও অভ্যাস

প্রত্যক্ষকে একপ্রকার **অভ্যাস** (হ্যাবিট্) বলা চলে। পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিবার ফলে ক্রিয়া অভ্যাসে পরিণত এবং সহজসাধ্য হয়। তেমন

পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে কোনো বস্তু সংবেদিত হইবামাত্র প্রত্যক্ষ হয়। যেমন পরিচিত বস্তু বা ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হয় উহার পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে উহাতে অভ্যস্ত হইবার জন্য। এই নিয়মেই নিত্যব্যবহৃত বস্তু বা পরিচিত ব্যক্তির সহজ প্রত্যক্ষ ঘটে। আপন পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, বন্ধু, প্রভৃতি অথবা নিজ কলম, টেবিল, বই প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিতে কাহারও বিলম্ব বা কষ্ট হয় না। সুতরাং প্রত্যক্ষ এক প্রকার অভ্যাস গঠনেরই নামান্তর। অবশ্য অভ্যাস-গঠন প্রধানতঃ চেষ্টাত্মক ক্রিয়া, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রধানতঃ অবগতিমূলক ক্রিয়া। এই পার্থক্যটি মনে রাখা দরকার।

প্রত্যক্ষ ও জটিলীকরণ (কম্‌প্লিকেশন্‌)

প্রত্যক্ষের বিষয় একটি গোটা বা সমগ্র বস্তু। এই বস্তুর অংশগুলি সংশ্লেষিত হইয়া এমন ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ হয় যে পরবর্তী অভিজ্ঞতায় ঐ বস্তুর এক বা একাধিক অংশ প্রত্যক্ষ করিলেই অন্য অংশও প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ প্রত্যক্ষকূটকে বলে **জটিলীকরণ** (কম্‌প্লিকেশন্‌)। এই প্রত্যক্ষকূটে বস্তুর বর্তমানে প্রত্যক্ষ কোনো দিকের সহিত সংশ্লিষ্ট উহার অতীত-প্রত্যক্ষ অপর কোনো দিক্‌ সম্বন্ধে স্মরণ বা উহার প্রতিরূপ সাহায্যে পুনরুৎ-পাদন হইয়া থাকে। যেমন "সুগন্ধ চন্দন দেখিতেছি" "শীতল বরফ দেখিতেছি" অথবা "শুভ্র বরফ স্পর্শ করিতেছি", এই জাতীয় প্রত্যক্ষে চন্দনের সুগন্ধ, বরফের শীতলতা দর্শন প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না অথবা বরফের শুভ্রতারও স্পার্শন প্রত্যক্ষ ঘটিতে পারে না, কিন্তু যথাক্রমে ঘ্রাণ, স্পর্শ এবং দর্শন প্রত্যক্ষেরই বিষয় হইতে পারে। অথচ অতীতে যখন চন্দন বা বরফ দেখিয়াছি, তখন চন্দনের সুগন্ধ ঘ্রাণ করিয়াছি এবং বরফের শীতলতা স্পর্শ করিয়াছি। সুতরাং চন্দনের দর্শন ও ঘ্রাণ সংবেদন, বরফের দর্শন ও স্পর্শ সংবেদন অনুষক্ত (অ্যাসোসিয়েটেড্‌) হইয়া এক একটি প্রত্যক্ষ-কূট বা জটিল প্রত্যক্ষ গঠন করিয়াছে, যাহার ফলে ঐ বস্তুর কোনো দিক্‌ সংবেদিত হইলেই অপর দিকের স্মরণ হইয়া থাকে। কিন্তু এই স্মরণ স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্পষ্টভাবে ঘটে বলিয়া মনে হয় যেন স্মৃত বিষয়টি প্রত্যক্ষ হইতেছে। চন্দন বা বরফের দর্শন প্রত্যক্ষ উহার সুগন্ধের বা শীতলতার **পূর্বানুভব** (ফোর-ফীল্‌) উৎপন্ন করে। এই কারণে ওয়ার্ড্‌, স্টাউট্‌ প্রভৃতি মনোবিৎ এই জটিল প্রত্যক্ষের নাম দিয়াছেন পূর্ব-প্রত্যক্ষ (প্রি-পার্সেপ্‌শন্‌)।

এই প্রকার জটিলীকরণকে নৈয়ায়িক যথার্থ প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে করেন। নৈয়ায়িক ইহার নামকরণ করিয়াছেন জ্ঞান-লক্ষণা প্রত্যক্ষ। নৈয়ায়িক ইহাকে অলৌকিক প্রত্যক্ষের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

সহ-সংবেদন (সিন্-এস্থেসিয়া)

প্রত্যক্ষকূট বা জটিলীকরণের অনুরূপ আর এক প্রকার প্রত্যক্ষকে সহ-সংবেদন (সিন্-এস্থেসিয়া) বলা হইয়াছে। টিশ্নার প্রভৃতি প্রায়োগিক মনোবিদ্গণ সহ-সংবেদন সম্বন্ধে প্রয়োগ ও পরীক্ষা করিয়াছেন।

সাধারণতঃ প্রত্যেক ইন্দ্রিয় উহার নির্দিষ্ট স্বভাব অনুসারে নির্দিষ্ট সংবেদন উৎপন্ন করিয়া থাকে। যেমন, চক্ষু উদ্দীপিত হইলে দর্শন সংবেদন এবং কর্ণ উদ্দীপিত হইলে শ্রবণ সংবেদন ঘটে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটি ইন্দ্রিয় শুধু উহার স্বাভাবিক এবং নির্দিষ্ট সংবেদনই উৎপন্ন করে না, কিন্তু অন্য ইন্দ্রিয়ের নির্দিষ্ট সংবেদনও উৎপন্ন করিতে পারে। কর্ণের নির্দিষ্ট সংবেদন হইল শ্রবণ, অথচ এই ইন্দ্রিয়টি রঙীন বা বর্ণযুক্ত শব্দ শুনিতে পায়। একই শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণের সহিত বর্ণের এই সহ-সংবেদনকে (সিন্-এস্থেসিয়া) **বর্ণযুক্ত শ্রবণ** (কালার্ড হিয়ারিং বা সাইকো-ক্রোমেস্থেসিয়া) বলে। ইহা আবার দুই শ্রেণীর। উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়ের সংবেদনের সহিত অন্য ইন্দ্রিয়ের সংবেদনের সাহচর্য বা অনুষঙ্গ প্রথম ক্ষেত্রে সোজাসুজি (ডিরেক্ট) এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরোক্ষ (ইন্ডিরেক্ট)। প্রথমটির বেলায় শব্দ সোজাসুজি দর্শন সংবেদন ঘটায় এবং দ্বিতীয়টির বেলায় পরোক্ষভাবে অথবা কোনো যান্ত্রিক সংবেদনের মধ্যস্থতায় এইরূপ করে। যেমন কেহ হয়ত ইংরাজী ব্যঞ্জনবর্ণগুলি পৃথকভাবে গভীর বেগুনীরূপে, স্বরবর্ণগুলি হলুদ বর্ণবিশিষ্টরূপে, কিন্তু শব্দের অংশ হিসাবে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি হলুদবর্ণবিশিষ্টরূপে শোনে।

রঙীন শ্রবণের মত **শ্রুত দর্শনও** (টোন্যাল্ ভিশন্) ঘটিতে পারে। যেমন কোনো কোনো ব্যক্তি সকল প্রকারের নীল রং, গভীর এবং নিস্তেজ আবার সকল প্রকারের হলুদ রং উচ্চ এবং ঝঙ্কৃত শব্দরূপে শুনিয়া থাকে। **স্বাদ-শ্রবণের** (গাস্টেটরি অডিশন্) ক্ষেত্রও পাওয়া গিয়াছে, যেমন 'ইন্টেলিজেন্স' কথাটি শ্রবণ করিয়া কোনো ব্যক্তি হয়ত কাঁচা টম্যাটো-এর স্বাদ-সংবেদন অনুভব করে। গ্রন্থকার কর্তৃক স্বাদ-শ্রবণের একটি ক্ষেত্র পরীক্ষিত হইয়াছিল। এই ব্যক্তি শান্তিপুরের কথ্য ভাষা শুনিয়া আপেলের স্বাদ অনুভব করিতেন।

নানা অঞ্চলের নানা কথ্যভাষাই ভিন্ন রকমের স্বাদবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার দ্বারা শ্রুত হইত।

আবার **দৃষ্ট স্বাদও** (ভিস্যুয়াল্ টেইস্ট্) ঘটিতে দেখা গিয়াছে। যেমন লবণের ফিকে লাল, তিক্ত স্বাদের বাদামী, অম্লের সবুজ বা সবুজাভ নীল এবং মিষ্ট স্বাদের উজ্জ্বল নীল বর্ণ-সংবেদন ঘটিতে পারে।

সহ-সংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষকূটের পার্থক্য

সহ-সংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষকূটের পার্থক্য এই যে প্রথমটি সংবেদন এবং দ্বিতীয়টি প্রত্যক্ষ। ইহাদের আর একটি পার্থক্য এই যে প্রত্যক্ষকূট যথার্থ প্রত্যক্ষ, কিন্তু সহ-সংবেদন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকূট ছাড়া কিছু নয়। তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ-কূট একটি সর্বসাধারণ জ্ঞান—ইহা একটি স্বাভাবিক মানস অবস্থা। পক্ষান্তরে সহ-সংবেদন সর্ব-সাধারণ এবং স্বাভাবিক মানস জ্ঞান নয়। কিন্তু ইহা স্বাভাবিক সংবেদনের ব্যতিক্রম।

৩। শুদ্ধ সংবেদন (পিওর্ সেন্‌সেশন্)

চেতনা-মাত্র বা নির্বিশেষ চেতনাকে সংবেদন বলে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে এইরূপ বিশুদ্ধ বা নিছক সংবেদন সম্ভব কিনা, যাহা নিষ্প্রকারক চেতনা-মাত্র। বাস্তব অভিজ্ঞতায় এইরূপ নিছক বা বিশুদ্ধ সংবেদন ঘটে না। (পরিণত (অ্যাডাল্ট্) অভিজ্ঞতায় শুদ্ধ সংবেদন পাওয়া যায় না। পরিণত মনের সকল জ্ঞানই পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে লব্ধ) শুধু 'নীল' সংবেদন, যাহাতে নীলটি নীল এইরূপ জ্ঞানও ঘটে না, অথবা যে নীল-জ্ঞানে পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রভাব বা ক্রিয়া নাই, এইরূপ সংবেদন যে সাবালক বা পরিণত মনে ঘটিতে পারে না। শিশুর মনেও এইরূপ নির্বিশেষ চেতনা ঘটে কিনা সন্দেহ। শিশুও তাহার নিকট উপস্থাপিত বস্তুকে পুনরুপস্থাপন বা অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্দীপন সাহায্যে জানিয়া থাকে। অবশ্য পরিণত বা সাবালক ব্যক্তির জ্ঞান হইতে শিশুর জ্ঞানের পার্থক্য এই যে প্রথমটির ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার পরিধি দ্বিতীয়ের তুলনায় অধিক। শিশুর জীবনের প্রথম সজ্ঞান মুহূর্তের চেতনা হয়ত বিশুদ্ধ সংবেদনের মত হইয়া থাকিতে পারে। এই চেতনা অবশ্যই নিষ্প্রকারক চেতনা-মাত্র হইয়া থাকিবে, কারণ এই অবস্থায় শিশুর এমন কোনো অভিজ্ঞতাভাণ্ডার সঞ্চিত হয় নাই যাহা হইতে আহৃত উপাদান

তাহার চেতনা বা জ্ঞানকে কোনো বিশেষ আকারে আকারিত করিতে পারে। এই কল্পিত প্রথম সজ্ঞান মুহূর্তে শিশুর সম্মুখে নীল ফুলটি ধরিলে হয়ত সে উহাকে নিষ্প্রকারভাবে জানিতে পারে অথবা তাহার বিশুদ্ধ সংবেদন হয়ত কোনো প্রত্যক্ষের আলোকে আলোকিত নাও হইতে পারে।

শিশু-চেতনার এই প্রথম মুহূর্তটিকে মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্তর বলা যায় না, কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতা বা চেতনাই মনোবিদ্যার বিষয় এবং শিশুর এইরূপ কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে কি না তাহা সে বলিতে পারে না।

স্টাউট্ বলিয়াছেন যে শুদ্ধ সংবেদনের অনুরূপ স্বাভাবিক বা বাস্তব চেতনা অসম্ভব হইলেও, অন্তর্জ্ঞান (সাব্-কন্‌সাচ্) স্তরে ইহা সম্ভব হইতে পারে। অন্যমনস্ক বা চিন্তামগ্নভাবে রাস্তায় চলিতেছি, এমন সময় হয়ত কোনো পরিচিত ব্যক্তির সম্ভাষণের উত্তরে প্রতি-সম্ভাষণ করিলাম নিতান্ত সংস্কারের বা অভ্যাসের বশবর্তী হইয়া। ঐ পরিচিত ব্যক্তিকে স্পষ্টভাবে পরিচিত বলিয়া না বুঝিয়াই যে প্রতিসম্ভাষণ করা হইল সেই অস্পষ্ট জ্ঞানকে বিশুদ্ধ সংবেদনের অনুরূপ বলা যাইতে পারে।

বিশুদ্ধ সংবেদনের অনুরূপ চেতনার আরও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। জাগ্রৎ অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে নিদ্রামগ্ন হইবার ঠিক পূর্বের অবস্থাটি, যাহাকে নিদ্রাও বলা যায় না, আবার জাগরণও বলা যায় না, তাহা হয়ত শুদ্ধ সংবেদনের অনুরূপ। আবার নিদ্রিত অবস্থা হইতে জাগিয়া উঠিবার মধ্যবর্তী অবস্থাটিকেও ইহার দৃষ্টান্তস্থল বলা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, অস্মার রোগে (অ্যাম্-নেশিয়া) পূর্বস্মৃতি লুপ্ত হইলে সকল উপস্থাপিত বস্তুই অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। অস্মার রোগীর উপস্থাপিত বস্তুর যে জ্ঞান হয় তাহাকে হয়ত বিশুদ্ধ সংবেদনের অনুরূপ বলা যাইতে পারে।

উপসংহারে বলা যায় যে মনোবিদ্যার অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিশুদ্ধ সংবেদনের অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ। তথাপি প্রত্যক্ষ ঘটিবার পূর্বে অবশ্যই বিশুদ্ধ সংবেদন ঘটিয়া থাকিবে, অথবা কোনো বস্তুর সপ্রকারক বা বিশিষ্টাকারীয় জ্ঞান ঘটিবার পূর্বে অবশ্যই উহার কোনো নির্বিশেষ বা নিষ্প্রকারক জ্ঞান হইয়া থাকিবে। নীল ফুলটি এই প্রকার বা ঐ প্রকার এইরূপ জ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে উহার বস্তুমাত্ররূপে জ্ঞান অবশ্যই ঘটিয়া থাকিবে। এই জাতীয় যুক্তির সাহায্যে বলা যাইতে পারে যে বিশুদ্ধ সংবেদন অবশ্যই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পূর্ববর্তী একটি প্রকৃত অবস্থা। যুক্তিবিদ্যার

দিক হইতে এইরূপ অনুমানের যাথার্থ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু মনোবিদ্যার দিক হইতে প্রত্যক্ষের পূর্বে সংঘটিত এইরূপ বিশুদ্ধ চেতনা-মাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার বাহিরে, সুতরাং অবাস্তব।

৪। প্রত্যক্ষ ও সংবেদন

প্রত্যক্ষ ও সংবেদনের পার্থক্য[১]

(১) উপরে দেখানো হইয়াছে যে প্রত্যক্ষ একটি উপস্থাপন-পুনরুপস্থাপন কূট। প্রত্যক্ষে বস্তুর উপস্থাপন এবং উহার অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুপস্থাপন ঘটে। সংবেদনে জ্ঞাত বস্তু উপস্থাপিত হয়, কারণ প্রদত্ত বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ না ঘটিলে সংবেদন উৎপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষে জ্ঞাত বস্তু শুধু উপস্থাপিতই হয় না, কিন্তু এই বস্তুর পূর্ব-অভিজ্ঞতা প্রতিরূপের (ইমেজ্) আকারে পুনরুপস্থাপিত হয়।

(২) সংবেদিত বস্তু চেতনামাত্র, অথবা নির্বিশেষ চেতনার আকারে জ্ঞাত হয়। সংবেদনে উহার অর্থ (মিনিং) জ্ঞাত হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষে সংবেদিত বস্তু অর্থপূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হয়। অথবা অর্থপূর্ণ (মিনিংফুল্) সংবেদনই প্রত্যক্ষ।

(৩) প্রত্যক্ষকে জ্ঞান বলা যায়, কিন্তু সংবেদনকে জ্ঞান (নলেজ্) বলা চলে না। জ্ঞানে বস্তুর অর্থপ্রতীতি থাকে, যেমন নীল ফুলের জ্ঞানে ফুলটিকে নীল বলিয়া জানা যায়। সংবেদনে বস্তুর এইরূপ অর্থপ্রতীতি থাকে না, সুতরাং ইহাকে জ্ঞান বলা যায় না। অথবা অধ্যাপক উইলিয়ম জেম্স্-এর ভাষায়, সংবেদনে বস্তুর পরিচিতি মাত্র (অ্যাকোয়েণ্ট্যান্স্) ঘটে, কিন্তু প্রত্যক্ষে এই পরিচিত বস্তুর জ্ঞান সম্ভব হয়।

(৪) সংবেদনে বস্তুর গুণ জানিতে পারা যায়, কিন্তু গুণবিশিষ্ট বস্তুকে জানা যায় না। যেমন, সংবেদনে নীল ফুলটির জ্ঞান হয় না, কিন্তু হয় ফুলের নীলত্ব গুণটির, সুগন্ধ ফুলের জ্ঞান হয় না, কিন্তু হয় ফুলের সুগন্ধ গুণটির। পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষ সাহায্যে গুণবিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয়, অর্থাৎ শুধু ফুলের নীলত্ব বা সৌগন্ধ্য গুণেরই জ্ঞান হয় না, কিন্তু হয় নীল অথবা সুগন্ধ ফুলের।

১ প্রচলিত (ট্রেডিশন্তাল্) মনোবিদ্যার মতের, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের পূর্বে সংবেদন ঘটিয়া থাকে এই মতের ভিত্তিতে বর্তমান অনুচ্ছেদের আলোচনা করা হইয়াছে।

(৫) সংবেদনে একটি বিষয়গত (অব্‌জেক্‌টিভ্‌) চেতনা থাকে, সন্দেহ নাই। সংবেদন, যে শুধু মনের কল্পিত নয়, কিন্তু মন-নিরপেক্ষ কোনো বস্তুর দ্বারা সংঘটিত মানসবৃত্তি ইহাতে এইরূপ একটি চেতনা অবশ্যই থাকে। কিন্তু সংবেদনের এই বিষয়গত চেতনা সত্ত্বেও ইহাতে বিষয়ের বাস্তব সত্তায় বিশ্বাস ফুটিয়া ওঠে না। যে নীল ফুলটি প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহা যে বাস্তবিকই আছে এইরূপ স্পষ্ট বিশ্বাস প্রত্যক্ষের অঙ্গীভূত লক্ষণ। কিন্তু সংবেদিত নীল ফুলের অস্তিত্বে স্পষ্ট বিশ্বাস নাই, কারণ সংবেদন চেতনা-মাত্র এবং বিশ্বাসের জন্য মনের যে উচ্চতর অবস্থা আবশ্যক সংবেদনে তাহার বিকাশ ঘটে না।

(৬) সংবেদন অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় (প্যাসিভ্‌) এবং প্রত্যক্ষ অপেক্ষাকৃত সক্রিয় (অ্যাক্‌টিভ্‌) মানসবৃত্তি। সংবেদিত বস্তু এমন একটি উদ্দীপক-শক্তি যাহা সবলে চেতনাকে অধিকার করে। এই চেতনায় মন বস্তুর প্রতি গ্রহণশীল (রিসেপ্‌টিভ্‌) থাকে। পক্ষান্তরে, প্রত্যক্ষে মনের অনেক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়, যেমন সদৃশীকরণ, পৃথকীকরণ, স্মরণ, প্রত্যভিজ্ঞা, বিশ্বাস প্রভৃতি। সংবেদন নিষ্ক্রিয় চেতনামাত্র, কিন্তু প্রত্যক্ষ সংবেদনের সক্রিয় অর্থাবধারণ (ইণ্টার্‌প্রেটেশন্‌)।

(৭) আবার প্রত্যক্ষের বিষয় একটি সম্পূর্ণ বা গোটা বস্তু যাহার জ্ঞান অনেক প্রকার সম্বন্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। নীল ফুলের প্রত্যক্ষে, ফুল, এবং উহার নীল গুণ পৃথক বা বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞাত হয় না, কিন্তু হয় নানা গুণবিশিষ্ট একটি সম্পূর্ণ বা গোটা বস্তুরূপে। তাহা ছাড়া নীল ফুল যে গাছে ফুটিয়াছে বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে এই জাতীয় পারিপার্শ্বিক বস্তুগুলির সহিত সম্বন্ধরূপেই নীল ফুল প্রত্যক্ষ হয়। পক্ষান্তরে সংবেদনের বিষয় সম্পূর্ণ বা গোটা বস্তু নয়, কিন্তু ঐ বস্তুর গুণ বা অংশ। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ সম্পূর্ণ বস্তুর জ্ঞান, কিন্তু সংবেদন আংশিক বস্তুর জ্ঞান।

(৮) সুতরাং সংবেদন কোনো বস্তুর বাস্তব বা মূর্ত (কংক্রিট্‌) মানসবৃত্তি নয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ ইহার বাস্তব বা মূর্ত মানসবৃত্তি। সংবেদনের বিষয় সম্পূর্ণ বস্তু নয়, কিন্তু উহার বিচ্ছিন্ন অংশ। সমগ্র বস্তু হইতে উহার অংশকে বিচ্ছিন্ন করিলে উহা কাল্পনিক বা অবাস্তব হইয়া দাঁড়ায়। সংবেদন এইরূপ কাল্পনিক বা অবাস্তব বিষয়কে অবলম্বন করিয়া ঘটিয়া থাকে।

(৯) জ্ঞানব্যাপারে উহাদের কার্য বা স্থানের দিক দিয়াও প্রত্যক্ষ এবং সংবেদন ভিন্ন। সংবেদন জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদানগুলি সংগ্রহ করে, কিন্তু প্রত্যক্ষ এইগুলিকে সম্বদ্ধ করে।

[উল্লিখিত পার্থক্য আলোচনায় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, সম্পূর্ণ বস্তুর প্রত্যক্ষের পুর্বে উহার বিভিন্ন গুণগুলির সংবেদন আবশ্যক এবং সংবেদিত উপাদানগুলির সম্বন্ধ স্থাপন ও অর্থবোধের ফলে প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। চিরাচরিত মনোবিদ্যার এই মামুলী ধারণা প্রায়োগিক মনোবিদ্যার মতে অগ্রাহ্য। অনুষঙ্গবাদী (অ্যাসোসিয়েশনিস্ট্) বা পরমাণবিক মনোবিদ্‌গণের (অ্যাটমিক্ সাইকলজিস্ট্) মতে পৃথক পৃথক সংবেদন সম্বদ্ধ হইযা প্রত্যক্ষের আকার ধারণ করে, অথবা প্রত্যক্ষের উপাদান পরস্পর বিচ্ছিন্ন মৌলিক সংবেদন। মিল্, বেইন্ প্রভৃতি এইরূপ মতবাদের সমর্থক। কিন্তু অধ্যাপক জেম্‌স্ এইরূপ মতবাদকে ইট-চুন মনোবিদ্যা (ব্রিক্ অ্যাণ্ড্ মর্টার্ সাইকলজি) বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। গেস্ট্যাল্ট মনোবিদ্‌গণও প্রত্যক্ষের এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষ একটি সম্পূর্ণ মানসবৃত্তি।]

৩। গেস্টাল্ট্ প্রত্যক্ষবাদ (দি গেস্টাল্ট্ থিওরি অফ্ পার্সেপ্‌শন্)

গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্‌গণ মনে করেন যে প্রত্যক্ষই সকল জ্ঞানের মূল ভিত্তি। প্রত্যক্ষই বাস্তব এবং মূর্ত জ্ঞান। ইহা তথাকথিত মৌলিক সংবেদনের সংযোজন নয়, কিন্তু সকল জ্ঞানের মূল একক (ইউনিট্)। সংবেদন এই মৌলিক জ্ঞানের বিশ্লেষিত দিগ্‌দর্শন মাত্র। হিউম্ হইতে মিল্ পর্যন্ত যে সকল মনোবিৎ সংবেদনকে মানস জীবনের মূল উপাদান মনে করিয়া এই সংবেদনগুলির সংমিশ্রণ বা মানস রসায়নের (মেণ্ট্যাল্ কেমিস্ট্রি) উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছেন তাঁহার ভ্রান্ত। যেমন ব্রাউন্, মিল্ প্রভৃতি রসায়নে যেমন মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তেমন মনোবিদ্যায়ও মৌলিক সংবেদনের সংমিশ্রণে যৌগিক, অর্থাৎ উচ্চতর মানসবৃত্তি উৎপন্ন হয়।

পশ্চাদ্‌ভুমি (গ্রাউণ্ড্) এবং আকার (ফিগার্)

গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্‌গণ মনের এইরূপ ব্যাখ্যাকে বিকৃত বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে মানস রসায়নের ধারণা অমূলক। তাঁহারা নানা প্রয়োগ ও

পরীক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রত্যক্ষই সকল উচ্চতর মানসবৃত্তির মৌলিক অথবা একক ভিত্তি। তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষ একটি এবং সমগ্র বস্তুর জ্ঞান।

বেড়া অথবা ফেন্স্ ফেনমেনন্ সাহায্যে প্রত্যক্ষের এই একক ও সমগ্র রূপ বুঝা যায়। নীচের ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, এই আটটি সরলরেখা এইরূপভাবে আঁকা হইয়াছে। যে ক হইতে খ, গ হইতে ঘ, ঙ হইতে চ এবং ছ হইতে জ-এর দূরত্ব ক হইতে গ, খ হইতে ঘ, গ হইতে ঙ ইত্যাদি সরলরেখাগুলির দূরত্ব অপেক্ষা কম।
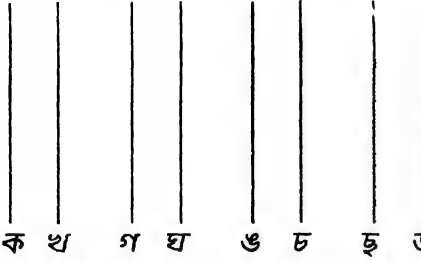
৪৩নং চিত্র—বেড়া অথবা ফেন্স্ ফেনমেনন

সংবেদনের দিক দিয়া বিচার করিলে এই বেড়া ব্যাপারটিতে আমাদের জোড়াবদ্ধ আটটি সরলরেখার এবং উহাদের ব্যবধানগুলি পুস্তকের শাদা পৃষ্ঠার অংশ হিসাবে এবং মাত্র চওড়ায় বা প্রশস্ততায় ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান হওয়া উচিত। কিন্তু বস্তুতঃ আমাদের জ্ঞান হইতেছে শাদা পৃষ্ঠার পশ্চাদ্‌ভূমিতে (ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড্) প্রতি জোড়ার ব্যবধান সহ চার জোড়া সরলরেখার একটি আকারের (ফিগার্, গেস্টাল্ট্)। কখ, গঘ, ঙচ এবং ছজ এই চার জোড়া লাইন-এর ব্যবধানগুলি ফিগার্ বা আকারের অংশ। পক্ষান্তরে খগ, ঘঙ, চছ ব্যবধানগুলি পশ্চাদ্‌ভূমি বা ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড্-এর অংশ। আকারের অন্তর্গত সাদা ব্যবধানগুলি সংবেদনরূপে অন্য ব্যবধানগুলি হইতে ভিন্ন নয়, অথচ প্রত্যক্ষজ্ঞানে নিশ্চিতরূপে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞাত হয়।
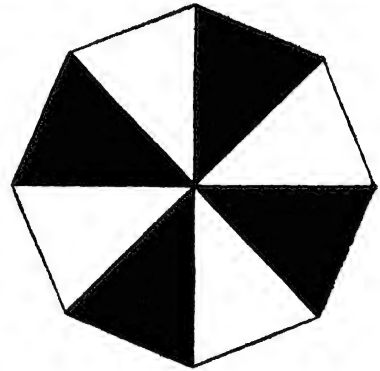
৪৪নং চিত্র

৪৪নং চিত্রের কালো অংশে মনোযোগ করিলে উহা সাদা অংশের পশ্চাদ্‌-ভূমিতে আকাররূপে ফুটিয়া ওঠে, আবার সাদা অংশে মনোযোগ করিলে উহা কালো অংশের পশ্চাদ্‌ভূমিতে আকাররূপে ফুটিয়া ওঠে।[১]

১. এম্. কলিন্‌স্ অ্যাণ্ড্ জে. ড্রিভার্—এক্সপেরিমেণ্টাল্ সাইকলজি—পৃঃ ১০৮-১১০

এইরূপে গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্‌গণ বুঝাইতে চাহেন যে প্রত্যেক প্রত্যক্ষেই আকার (ফিগার্, গেস্টাল্ট্) এবং পশ্চাদ্‌ভূমির (গ্রাউণ্ড) পার্থক্য আছে। আকারের তুলনায় পশ্চাদ্‌ভূমি অস্পষ্ট।

প্রত্যক্ষের বিষয় একটি সমগ্র বস্তু

প্রত্যক্ষের বস্তু একটি একক বা সমগ্র এবং ইহার অংশগুলির মধ্যে সংগঠন (ইন্‌টিগ্রেশন) থাকে, যাহার ফলে ইহা অবিভাজ্য। অবশ্য পরবর্তী বিশ্লেষণে অংশগুলি পৃথকভাবে নির্দেশিত হইতে পারে। প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতাই একটি সমগ্র বা গোটা বস্তু। এই সমগ্রের কতক অংশ স্পষ্ট আকাররূপে (ফিগার্) ফুটিয়া ওঠে এবং বাকী অংশ ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি (গ্রাউণ্ড্) রূপে আকারের স্পষ্টতায় সহায়তা করে। প্রত্যেক পরবর্তী অভিজ্ঞতাই উহার পুর্ববর্তী অভিজ্ঞতা হইতে আবির্ভূত হয়, অর্থাৎ ঐটি কোনো নূতন অভিজ্ঞতা নয়, কিন্তু উহার পরিবর্তিত রূপ বা আকার।

সুতরাং প্রত্যক্ষের বিষয় একটি বিচ্ছিন্ন বস্তু নয় কিন্তু এমন একটি সমগ্র পরিস্থিতি (সিচুয়েশন্) যাহা বর্তমান এবং পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সহিত সম্বদ্ধ। মনোযোগের ফলে এই সমগ্র পবিস্থিতি বা অবস্থা হইতে এক বা একাধিক অংশ পৃথকভাবে নির্বাচিত হইতে পারে। আবার এই নির্বাচিত অংশটিও একটি সমগ্র পরিস্থিতি যাহা উহার পশ্চাদ্‌ভূমিতে আকার বা গেস্টাল্ট্‌রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মোটের উপর বলা যায় যে আকার এবং পশ্চাদ্‌ভূমির সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ বিষয়ের অপরিহার্য লক্ষণ।

ফাই-ব্যাপার (ফাই-ফেনমেনন্)

হ্বার্‌দাইমার্-এর পরীক্ষিত ফাই-ব্যাপার (ফাই ফেনমেনন্) গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। যদি দুইটি বিন্দুকে প্রায় ০'৬ সেকেণ্ড ব্যবধানে পুর্বাপরভাবে আলোকিত করা হয় তাহা হইলে বিভিন্ন স্থানে দুইটি আলোকবিন্দু দেখা যায় না, কিন্তু দেখা যায় এক স্থান হইতে আর এক স্থানে চলনশীল একটি আলোকবিন্দু। এইরূপ দর্শন শুধু গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার ভিত্তিতেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। পুর্ববর্তী আলোকের সবর্ণ অনুসংবেদন শেষ না হইতেই পরবর্তী আলোক দর্শন হয়ত ইহার কারণ।

সমগ্র-বস্তু-গঠনের আকার-বিষয়ক নিয়ম

সমগ্র বস্তু গঠনের আকার (অর্গ্যানাইজেশন্) যে নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা বুঝাইতে গিয়া হ্বার্‌দাইমার্ বিন্দু এবং রেখার সাহায্য লইয়াছেন। কতকগুলি বিন্দু **কাছাকাছি** থাকিলে অথবা **একই প্রকারের** হইলে উহাদিগকে একটি সংগঠন বা শ্রেণীবদ্ধরূপে দেখায়। পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক আকারের বা বর্ণের বিন্দু থাকিলে একজাতীয় বিন্দু-গুলিকে এক একটি সংগঠন বা শ্রেণীবদ্ধ দেখায়। আবার বিন্দুগুলিকে একই সংগঠন বা শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রত্যক্ষ করিবার আর একটি অনুকূল অবস্থা হইল উহারা বদ্ধ (ক্লোজ্‌ড্) অথবা মুক্ত (ওপ্‌ন) কিনা তাহা। এই **বন্ধন সূত্র** (প্রিন্‌সিপ্‌ল্ অফ্ ক্লোজার্) গেস্টাল্ট্ মতবাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শূন্যস্থান (গ্যাপ্) বিশিষ্ট আকারের শূন্যস্থানগুলি স্বভাবতঃই উপেক্ষিত এবং পূর্ণ বা আবদ্ধ (ক্লোজ্‌ড্) হইয়া থাকে।

সমগ্র বস্তু গঠনের আকার নিয়ন্ত্রিত হয় তিনটি নিয়মের দ্বারা, যথা নৈকট্য, সাদৃশ্য এবং বন্ধন। নিম্নপ্রদর্শিত তিনটি চিত্রে এই নিয়ম দেখানো হইল।
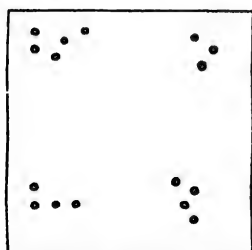
৪৫নং চিত্র—নৈকট্য
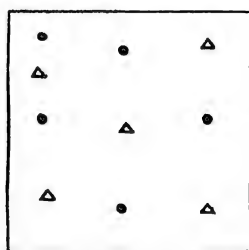
৪৬নং—সাদৃশ্য চিত্র

নৈকট্য যে সংগঠন বা শ্রেণীবদ্ধতার একটি কারণ তাহা কতগুলি বিন্দুকে পরস্পরের কাছাকাছি আঁকিয়া ৪৫ নং চিত্রটিতে দেখানো হইয়াছে। এই চিত্রের নিকট বিন্দুগুলিকেই এক একটি বিন্দুশ্রেণী অথবা সংগঠনরূপে দেখা যাইতেছে। আবার দূরের বিন্দুগুলিকে এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ বা সংগঠন রূপে দেখা যাইতেছে না।

সাদৃশ্য

৪৬ নং চিত্রটিতে একই বা সদৃশ আকার, আকৃতি বা বর্ণের বিন্দুগুলিকে এক শ্রেণী বা সংগঠনভুক্ত এবং বিভিন্ন বা বিসদৃশ আকার, আকৃতি বা বর্ণের বিন্দুগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণী বা সংগঠনভুক্ত বলিয়া দেখা যাইতেছে।

বন্ধন

৪৭নং চিত্রটিতে বক্ররেখার অংশগুলি মুক্ত বা বিচ্ছিন্ন থাকিলেও গঠনের অন্তর্নিহিত বন্ধনপ্রবণতা অনুসারে উহাদের ফাঁক বা শূন্যতা (গ্যাপ্) যেন দেখিয়াও দেখা যাইতেছে না, কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি যেন একটি ছেদহীন আকার (ফিগার্) রূপে দৃষ্ট হইতেছে।
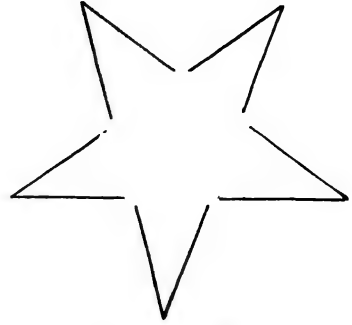
৪৭ নং চিত্র—বন্ধন

সংগঠন-প্রবণতা (প্রাগ্ন্যান্জ্)

সংগঠনের (অর্গ্যানাইজেশন্) স্থায়ী, সহজ এবং নিয়মিত রূপ লাভ করিবার প্রবণতাকে "প্রাগ্ন্যান্জ্" বলা হয়। এই প্রবণতার ফলেই বন্ধন, শূন্যস্থানের পূরণ ("ক্লোজার্") ঘটিয়া থাকে। বদ্ধ স্থানের সংগঠন স্থায়ী এবং প্রতিকূল শক্তিগুলিকে বাধা দিতে সক্ষম।

৬। সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ (ইলিউসারি পার্সেপ্শন্)

ভ্রমপ্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী

সর্পে রজ্জুভ্রম একটি পরিচিত ভ্রমপ্রত্যক্ষ। বস্তুটি রজ্জু হইলেও, অন্ধকারে অল্প আলোক বা অন্য কোনো অবস্থায় উহা সর্প বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এইরূপ স্থলে কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ হইতেছে সত্য, তাহা সর্পই হউক বা রজ্জুই হউক। বাস্তব মানসবৃত্তি বা অভিজ্ঞতা হিসাবে ভ্রমপ্রত্যক্ষ মনোবিদ্যায় যথার্থ প্রত্যক্ষের মতই বাস্তব। যাথার্থ্য বা অযাথার্থ্য, সত্যতা বা মিথ্যাত্ব প্রভৃতি মান নির্ধারক (নর্ম্যাটিভ্) অবধারণ মনোবিদ্যার আলোচ্য নয়। যাহাই চেতনার বিষয় তাহাই বাস্তব ঘটনারূপে মনোবিদ্যার বিচার্য। ঘটনানিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যা সত্যমিথ্যা অথবা যথার্থ-অযথার্থ নির্বিশেষে সকল মানস ঘটনারই আলোচনা করিয়া থাকে। সত্য-মিথ্যা, প্রমা-অপ্রমা প্রভৃতি প্রশ্নগুলি জ্ঞানবিদ্যার (এপিষ্টিমোলজি) বিচার্য। ঘটনা বা বস্তুরূপে মনোবিদ্যা উহাদিগকে সমভাবে গ্রহণ করে।

ভ্রমপ্রত্যক্ষ একটি বাস্তব ঘটনা

কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে, এইরূপ ক্ষেত্রে মনোবিদ্যায় ভ্রমপ্রত্যক্ষের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক কিনা। উত্তর এই যে এই আলোচনা মনোবিদ্যার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক নয়, বরং বাস্তব ঘটনা হিসাবে ইহার আলোচনা মনোবিদ্যার অপরিহার্য অঙ্গ। তাহা ছাড়া ভ্রমপ্রত্যক্ষের সহিত যথার্থ প্রত্যক্ষের বিরোধিতা একটি বাস্তব ঘটনা। যে বস্তুটিকে একবার সর্প বলিয়া দেখা হইল তাহাই হয়ত পুনরায় রজ্জু বলিয়া দেখা হইল। এই দুইটি দর্শন প্রত্যক্ষের বিরোধিতা-জ্ঞানও একটি বাস্তব মানস ঘটনা। সুতরাং **ভ্রম-প্রত্যক্ষের বস্তুনিষ্ঠ বা ঘটনানিষ্ঠ বিশ্লেষণ মনোবিদ্যার পক্ষে অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারে না।**

ভ্রমপ্রত্যক্ষ কাহাকে বলে

যে প্রত্যক্ষে বস্তুর যথার্থ জ্ঞান না হইয়া অযথার্থ জ্ঞান হয় তাহাকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলে। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে যথার্থ বস্তুটি রজ্জু, কিন্তু উহার অযথার্থ অথবা ভাসমান রূপটি, অথবা যে রূপে রজ্জু প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা সর্প। আবার, শুক্তিতে বা বালুকায় রজতভ্রম স্থলে যথার্থ বস্তু শুক্তি বা বালুকা, কিন্তু উহার অযথার্থ অথবা ভাসমান রূপটি, অথবা যে রূপে উহা প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা রজত বা রৌপ্য। আবার, জলমগ্ন একটি সোজা লাঠিকে বাঁকা দেখা যায়। এই স্থলে প্রত্যক্ষ বিষয়ের যথার্থ রূপটি সোজা লাঠি এবং উহার অযথার্থ বা ভাসমান রূপ বাঁকা লাঠি।

বাস্তব ভিত্তি

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ভ্রমপ্রত্যক্ষের কোনো **বাস্তব ভিত্তি থাকা চাই**—অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ বস্তুটি শুধু মানসসৃষ্টি নয়। **শূন্যে দুর্গ নির্মাণকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলে না।** রজ্জু, শুক্তি অথবা সোজা লাঠি প্রভৃতি বস্তু না থাকিলে ভ্রমপ্রত্যক্ষ ঘটে না। এই **যথার্থ বস্তুকে উহা যাহা নয় তাহা বলিয়া প্রত্যক্ষ করাকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলে।** অথবা প্রত্যক্ষে **যে উদ্দীপকগুলি ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে তাহাদের অপব্যাখ্যা বা ভুল অর্থগ্রহণ** (ফল্‌স্ ইণ্টারপ্রেটেশন্ অফ্ সেন্স্-ষ্টিমুলি) **করার নাম ভ্রমপ্রত্যক্ষ** (ইলিউসারি পার্সেপ্‌শন্)। ভ্রমপ্রত্যক্ষে বাস্তব সংবেদন-

ভূমি (সেন্সরি বেসিস্) থাকে। কিন্তু উহা যথার্থরূপে প্রত্যক্ষ না হইয়া একটি মন-গড়া বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ হয়। ইহার সহিত আসল বস্তুর মিল থাকে না। সুতরাং ভ্রমপ্রত্যক্ষের একটি **সংবেদনলব্ধ বস্তুগত দিক** এবং আর একটি অপব্যাখ্যা বা **ভুল অর্থগ্রহণরূপ মানস দিক** আছে।

ভ্রমপ্রত্যক্ষের শ্রেণীভেদ—ব্যক্তিগত ভ্রমপ্রত্যক্ষ

ভ্রমপ্রত্যক্ষ **প্রথমতঃ দুই শ্রেণীর** হইতে পারে—যথা ব্যক্তিগত (ইন্‌ডিভিজুয়্যাল্) এবং সার্বজনীন (য়্যুনিভার্স্যাল্)। ভীতু লোক হয়ত অন্ধকারে স্তম্ভকে চোর বলিয়া অথবা দেওয়ালে ঝুলানো স্যুট্ বা জামাকে ভূত বলিয়া ভ্রম করে। প্রুফ্-রিডার-এর ভ্রমও একপ্রকার ব্যক্তিগত ভ্রম। লেখক স্বয়ং তাহার নিজ লেখায় মুদ্রিত প্রুফ্ সংশোধনে প্রায়ই ভুল-ছাপা শব্দটির স্থানে তাঁহার পরিচিত বা প্রত্যাশিত শব্দটি পড়িয়া যান, সুতরাং ছাপার ভুল আর সংশোধন হয় না। আবার সংবাদপত্রের শিরোনামাগুলিকে আমরা অনেক সময় ভুল পড়িয়া যাই, কারণ হয়ত আমরা কোনো বিশেষ সংবাদের জন্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত বা আশান্বিত হইয়া থাকি।

নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা এবং অভ্যাসের প্রভাব—সার্বজনীন ভ্রমপ্রত্যক্ষ

সার্বজনীন ভ্রমপ্রত্যক্ষের মূলে কোনো **নির্দিষ্ট** (ফিক্সিটি অফ্ ইণ্টার্‌-প্রেটেশন্), **ব্যাখ্যা বা অভ্যাসের প্রভাব** থাকিতে পারে। যেমন মধ্যমা এবং তর্জনীর মধ্যস্থলে একটি পেন্সিল অগ্রপশ্চাৎভাবে চালাইলে ঐ একটি পেন্সিলকে দুইটি বলিয়া ভ্রম হয়। আবার একটি মটর দানা অনুরূপভাবে দুইটি আঙ্গুলের মধ্য দিয়া চালনা করিলেও উহা দুইটি বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। একটি আঙ্গুলের উপর এবং আর একটি আঙ্গুলের নীচ অংশ সাধারণতঃ দুইটি বস্তুই স্পর্শ করিতে পারে, এইরূপ ব্যাখ্যায়ই আমরা অভ্যস্ত বলিয়া উপরোক্ত ভ্রমপ্রত্যক্ষ ঘটিয়া থাকে। আবার আকার-ওজনের ভ্রম (সাইজ্-ওয়েট্ ইলিউসন্) উল্লেখযোগ্য। পূর্বাভ্যাসের ফলে একই ওজনের অথচ বিভিন্ন আকারের বাক্সকে বিভিন্ন ওজনের, অর্থাৎ ছোটটিকে বেশী এবং বড়টিকে কম ওজনের, বলিয়া ভ্রম ঘটে। এই ভ্রম

এমনই অসংশোধনীয় যে দুইটি বাক্সের ওজন সমান দেখিয়া বা জানিয়াও এই ভ্রম হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না।[১]

দৃষ্টিবিভ্রম সকলেরই ঘটিয়া থাকে। একটি ধাবমান ট্রেন দেখিবার পর অন্যদিকে তাকাইলে দেখা যায় যে নিশ্চল ঘর, বাড়ী, গাছপালা প্রভৃতি বিপরীত দিকে ছুটিতেছে। ইহার কারণ এই যে গাড়ীটিকে ছুটিতে দেখিবার সময় চোখ যে দিকে ঘুরিতেছিল, গাড়ীটি চলিয়া যাইবার পরই চোখের সেই গতি থামিয়া যায় না এবং নিশ্চল বস্তুগুলিকে দেখিবার জন্য চোখের গতিকে বিপরীত দিকে ফিরাইতে হয়। আংশিকভাবে একই কারণে পায়ের গোড়ালীর উপর ভর করিয়া ঘুরিবার পর থামিলে আশে পাশের সকল বস্তুগুলিই ঘুরিতেছে দেখা যায়। ইহার কারণ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।[২]

জ্যামিতিক দর্শন-ভ্রম (জিওমেট্রিক্যাল্ অপ্‌টিক্যাল্ ইলিউসনস্)

সংবেদনলব্ধ বস্তুর মানস বিকৃতিকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলা যায়। জ্যামিতিক দর্শনভ্রমে কোনো জ্যামিতিক রেখাচিত্র (ফিগার্) বৈজ্ঞানিক বা গাণিতিক মান অনুসারে যেরূপ প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত সেইরূপ হয় না। যেমন একটি যথার্থ সম-চতুষ্কোণের (স্কোয়ার) উচ্চতা এবং প্রস্থ সমান হইলেও উহার উচ্চতা প্রস্থ অপেক্ষা দীর্ঘ বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়।

জ্যামিতিক দর্শন-ভ্রমকে **প্রধানতঃ** তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) দ্ব্যর্থবোধক বা প্রত্যাবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ-মূলক ভ্রম (অ্যাম্‌বিগুয়াস্ রিভার্সিব্‌ল্ পারস্পেক্‌টিভ্); (২) পরিমাণ অথবা দূরত্ব সম্বন্ধে ভ্রম (এক্সটেণ্ট্, ডিস্‌ট্যান্স্); (৩) দিক (ডিরেক্‌শন্) সম্বন্ধে ভ্রম বা দিক্‌ভ্রম্।

(১) দ্ব্যর্থবোধক বা প্রত্যাবর্তনীয় দৃষ্টিকোণের ভ্রম

এই ভ্রম উৎপাদন করিতে হইলে জ্যামিতিক রেখাচিত্র শাদা বা কালো পশ্চাদ্‌ভূমিতে আঁকিতে হয়। এই রেখাচিত্রের কোনো নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ নাই, ইহাকে দুইদিক হইতেই দেখা যাইতে পারে। দুই দিক হইতে রেখাচিত্রটি

১ এম্. কলিন্‌স্ অ্যাণ্ড জে. ড্রিভার্—এক্স্‌পেরিমেণ্টাল্ সাইকলজি পৃঃ ১০২

২ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ—ষোড়শ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

দেখিলে একবার উহার একটি এবং আর একবার উহার অপরটি দিক দ্রষ্টার নিকটবর্তী বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। এই ভ্রমপ্রত্যক্ষের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল স্রোয়েডার্-এর সিঁড়ি রেখাচিত্র এবং স্ক্রিপ্‌চার-এর খণ্ডপুঞ্জ (ব্লক্‌স্)। এই দুইটিকে যথাক্রমে ৪৮নং এবং ৪৯নং রেখাচিত্রে দেখানো হইল।
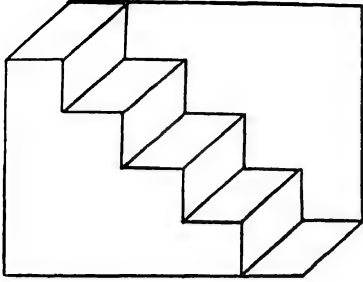
৪৮ নং চিত্র

স্রোয়েডাবের সিঁড়ি রেখাচিত্র
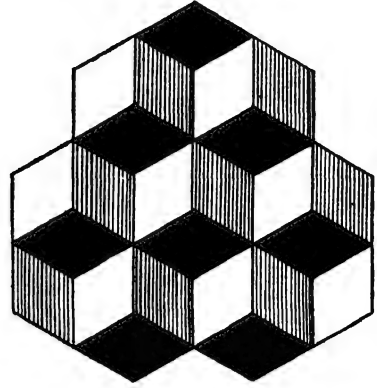
৪৯ নং চিত্র

স্ক্রিপ্‌চাব্-এর প্রত্যাবর্তনীয় খণ্ডপুঞ্জ। এই চিত্রে কতগুলি খণ্ড প্রত্যক্ষ হইবে তাহা নির্ভর করে প্রত্যক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর।

স্ক্রিপ্‌চার্-এর খণ্ডপুঞ্জে কতগুলি ঘনক (কিউব্) এমনভাবে সাজানো থাকে যে উহাদিগকে গুণিতে আরম্ভ করিলেই উহারা ফিরিয়া আসে। ইহাতে প্রত্যক্ষ ঘনকের সংখ্যা নির্ভর করে উহাদিগকে কোন্ দিক হইতে দেখা হইতেছে তাহার উপর। আবার এই রেখাচিত্রকে কতগুলি পুঞ্জীকৃত খণ্ডরূপে দেখা যায় যাহাদের খোলামুখগুলিও অনুরূপ ভ্রম উৎপাদন করে।
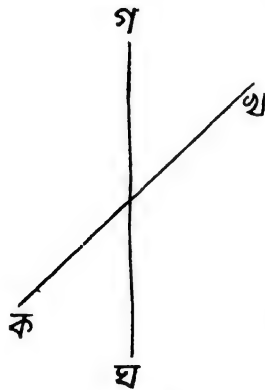
৫০ নং চিত্র

ক্রশ্ বা কাটা চিত্র
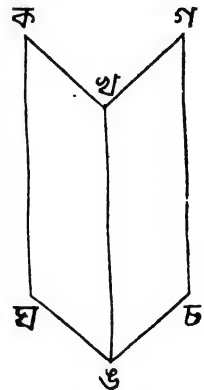
৫১ নং চিত্র

ম্যাক্-এর পুস্তক

স্রোয়েডার্-এর সিঁড়ি রেখাচিত্রটিও একই প্রকার ভ্রমপ্রত্যক্ষের অবস্থা ঘটায়

আবার ম্যাক্-এর পুস্তক (ম্যাক্স্ বুক্) এই জাতীয় ভ্রমপ্রত্যক্ষের একটি সরল রেখা চিত্র।

এই চিত্রটিতে একখানি বই দেখানো হইয়াছে। মধ্য অর্থাৎ খ ঙ রেখাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে অথবা উহার শেষ প্রান্ত হইতে দৃষ্টি বাহিরের দিকে চালিত করিলে বইখানির পশ্চাদ্ভাগ দেখা যায়। আবার বাহিরের কোনো রেখায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে অথবা উহার শেষ প্রান্ত হইতে দৃষ্টি ভিতরের দিকে চালাইলে বইখানির সম্মুখভাগ দেখা যায়। আসলে কিন্তু এই চিত্রটি দুইটি সামান্তরিকের (প্যারালেলোগ্রাম্) সমষ্টি মাত্র।

প্রত্যাবর্তনীয় দৃষ্টিকোণের ভ্রম পাশের ৫০নং রেখাচিত্রটিতেও ঘটে। উপরের ক্রশ্ বা কাটা চিহ্নটির ক'তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে ঐ বিন্দু গ ঘ হইতে সম্মুখে চলিয়া আসে এবং কখ রেখাটি দূরের দিকে চালিত হয়। আবার খ'তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে খ সম্মুখে চলিয়া আসে এবং খ ক সরল রেখাটি দূরের দিকে চালিত হয়।

(২) পরিমাণ বা দূরত্ব সম্বন্ধে ভ্রম

দূরত্ব, পরিমাণ অথবা দৈর্ঘ্যের হ্রাসবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ভ্রম নানাপ্রকারে উৎপন্ন হয়। যেমন একটি বর্গক্ষেত্রের (স্কোয়ার্) উচ্চতা প্রস্থ অপেক্ষা বেশী
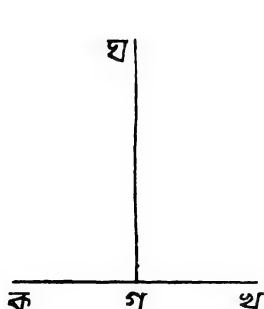
৫২ নং চিত্র
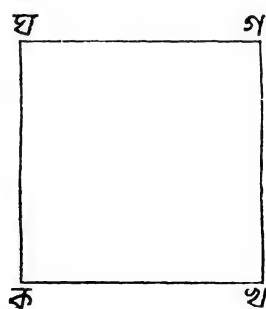
৫৩ নং চিত্র

খাড়া সরলরেখাকে (ভার্টিক্যাল্ লাইন) উহার সমান অনুভূমিক (হরাইজন্টাল্) সরলরেখার তুলনায় বড় দেখায়।

দেখা যায়। ইহাকে অনুভূমিক খাড়া ভ্রম (হরাইজন্টাল্ ভার্টিক্যাল্ ইলিউসন্) বলে। ইহাতে একটি খাড়া সরলরেখাকে (ভার্টিক্যাল্ লাইন্) উহার

সমান অনুভূমিক সরলরেখা (হরাইজণ্টাল্ লাইন্) হইতে বড দেখায়। ৫২ এবং ৫৩ চিত্র দ্রষ্টব্য।

দৈর্ঘ্য ভ্রমের একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ হইল মুয়েলার-লায়ার ভ্রম। ৫৪ নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

একটি চিত্রে পরিমাণ বা দৈর্ঘ্য অনুসারে ক খ=খ গ, এবং অন্য চিত্রটিতে ক খ=গ ঘ। অথচ কার্যতঃ ক খ রেখাকে খ গ এবং ক খ-কে গ ঘ অপেক্ষা বড দেখায়।
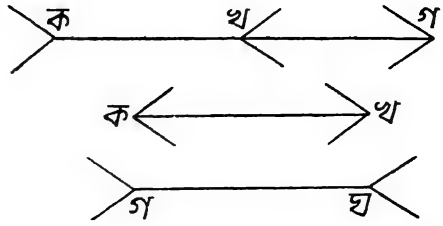
৫৪ নং চিত্র

মুয়েলার-লায়ার ভ্রম রেখাচিত্র

ক গ সরলরেখা খ বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু ক খ অংশটি খ গ অংশ হইতে বড দেখায়।

আবার ক খ এবং গ ঘ সরলরেখা দুইটি সমান হওয়া সত্ত্বেও গ ঘকে ক খ অপেক্ষা বড় দেখায়।

(৩) দিক্‌ভ্রম

কোনো কোনো অবস্থায় সরলরেখা বক্র, নোয়ানো বা ছিন্ন দেখা যায়। এই ভ্রমটি ৫৩ নং চিত্রে দেখানো হইয়াছে।

(খ)

(গ)

(ক)
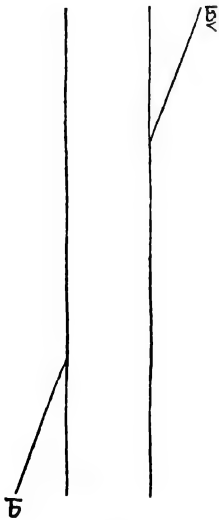
পগেনডর্ফ চিত্র
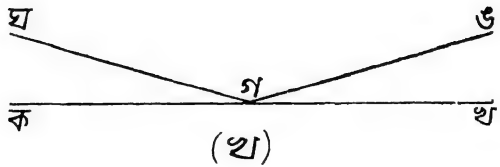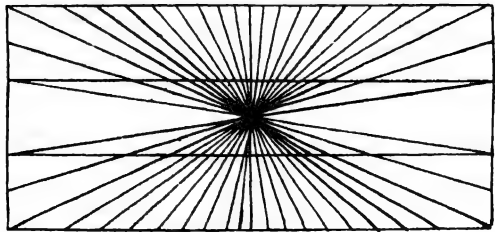
৫৫নং চিত্র—দিক্‌ভ্রম

ক চিত্রে লম্বালম্বি সরলরেখা দুইটি সমান্তরাল, কিন্তু উহারা বক্র বা বাঁকা দেখাইতেছে। আবার খ চিত্রে ক গ খ সরলরেখাকে গ বিন্দুতে
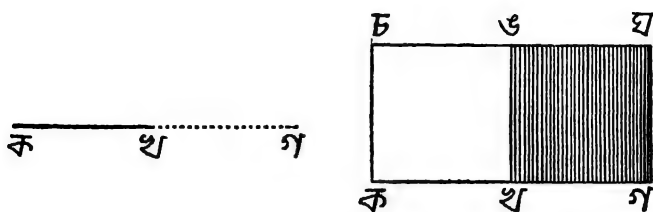
৫৬নং চিত্র—শূন্যস্থানের তুলনায় পূর্ণ বা খণ্ডিত সমান স্থান বড় দেখায়

নোয়ানো বলিয়া দেখায়। গ চিত্রে চ ছ সরলরেখাকে দুইটি ভিন্ন সরল-রেখার অংশ বলিয়া দেখায় অথবা দেখায় যেন ছ সরলরেখা চ সরলরেখার সহিত অবিচ্ছিন্ন নয়।

এইগুলি ছাড়াও শূন্যস্থানের তুলনায় পূর্ণ বা খণ্ডিত সমান স্থান বড় দেখায়। ৫৬নং চিত্রে দ্রষ্টব্য।

৭। ভ্রমপ্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা

সংবেদন ও অনুমানমূলক ব্যাখ্যা

ভ্রমপ্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় উহার দুই জাতীয় কারণ নির্দেশ করা হইয়া থাকে। প্রথম কারণটি সংবেদনমূলক এবং দ্বিতীয় কারণটি অনুমানমূলক। **সংবেদন-মূলক ব্যাখ্যায়** বলা হয় যে অক্ষিপটীয় প্রতিরূপ (রেটিন্যাল্ ইমেজ্) অথবা চক্ষুসঞ্চালনের অভিজ্ঞতাই অধিকাংশ ভ্রমপ্রত্যক্ষের কারণ। যেমন খাড়া রেখাটিকে উহার সমান অনুভূমিক রেখা হইতে বড় দেখায়, কারণ প্রথমটিকে দেখিতে গিয়া দ্বিতীয়টির তুলনায় চক্ষুসঞ্চালনের শ্রম বেশী হয়। অবশ্য এইরূপ ব্যাখ্যার সমালোচনায় বলা যায় যে যদি চক্ষুসঞ্চালনের কোনো সুযোগ না দিয়াই রেখা দুইটি অতি অল্প কালে দেখানো হয়, তখনও এই দৃষ্টিভ্রম ঘটিয়া থাকে। আবার শূন্যস্থানের তুলনায় পূর্ণস্থানের পরিমাণ বা দৈর্ঘ্যের আধিক্য ভ্রম ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলা হয় যে যেহেতু পূর্ণস্থানের বিন্দু বা সরলরেখা দেখিতে চক্ষুর কাজ বাধা পায়, এবং শূন্যস্থান দেখিতে উহার কাজ অবাধে চলিতে পারে, সেই কারণে প্রথমটি বেশী এবং দ্বিতীয়টি কম দীর্ঘ দেখা যায়।

এই মতে **মুয়েলার্-লায়ার্ ভ্রমের ব্যাখ্যা** এইরূপ। এই ভ্রম অক্ষি-পটের উপর ব্যাপ্ত কতগুলি বৃত্ত প্রতিফলিত হইবার জন্যই ঘটিয়া থাকে। এই বৃত্তগুলি স্পষ্টতম দর্শনের স্থান, অর্থাৎ পীতবিন্দু (ইয়েলো স্পট্) হইতে বাহিরে পড়ে। ফলে তীরপ্রান্ত (অ্যারো-এণ্ড্) এবং পালক-প্রান্তের (ফেদার্-এণ্ড্) প্রতিরূপ আব্ছা বা অস্পষ্ট হয়। ফলে এই দুই প্রান্তবিশিষ্ট সরল রেখাটি ছোট দেখায়।

মুয়েলার্-লায়ার্ ভ্রমপ্রত্যক্ষের উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণীয় নয়, কারণ চিত্রটি চক্ষু হইতে যত দূরে স্থাপিত হয়, অর্থাৎ উহার প্রতিরূপ যে পরিমাণে স্পষ্ট দর্শনস্থানে পড়ে, এই ভ্রম সেই পরিমাণে বাড়িয়া যায়।

আবার প্রত্যাবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ হইতে যে সকল ভ্রমপ্রত্যক্ষ ঘটে সেইগুলিও অনেক সময় চক্ষুসঞ্চালনের অভাবে ঘটিয়া থাকে এবং উহা বর্তমান থাকিলে ঘটে না।

মোটের উপর ভ্রমপ্রত্যক্ষের সংবেদনমূলক ব্যাখ্যার দোষ এই যে চক্ষু-সঞ্চালন না থাকিলেও উপরোক্ত ভ্রমপ্রত্যক্ষগুলি ঘটিয়া থাকে।

সংবেদনমূলক ব্যাখ্যার তুলনায় **সম্বন্ধ বা অনুমানমূলক ব্যাখ্যাই** বেশী সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয়। গেস্টাল্ট্ মতবাদ স্বীকার না করিলেও, ইহা স্বীকার্য যে সকল ভ্রমপ্রত্যক্ষেই একটি নির্দিষ্ট সংগঠন (প্যাটার্ণ) এবং উহার নিজস্ব স্বভাব ও সক্রিয়তা থাকে। তাহা ছাড়া, কোনো কোনো ভ্রমপ্রত্যক্ষ যে অনুশীলন এবং দীর্ঘকালীন দৃষ্টিনিবেশের ফলে দূর হইতে থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধু সংবেদনই ভ্রমের কারণ হইলে, ভ্রমপ্রত্যক্ষ এইরূপে কমিতে পারে না। সুতরাং সম্বন্ধ অথবা অনুমানমূলক দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই ভ্রমপ্রত্যক্ষের অধিকতর সঙ্গত ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয়।

৮। অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ (হ্যালিউসিনেশন্)

অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ 'কল্পনা' পরিচ্ছেদে আরও বিশদভাবে আলোচিত হইবে।[১] কিন্তু অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের সহিত সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের পার্থক্য বুঝা দরকার। সুতরাং সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের পরই অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

[১] উনবিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

যে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বাস্তব ভিত্তিমূলক না হইয়া সম্পূর্ণ মানস বা যান্ত্রিক কারণে ঘটে তাহাকে অমূল প্রত্যক্ষ (হ্যালিউসিনেশন্) বলে। যেমন অন্ধকারে কোথায়ও কিছু নাই, অথচ একটি অশরীরী ছায়ামূর্তির দর্শন হইল। অথবা যেমন মত্ত অবস্থায় চাবিদিকে ইঁদুর ছুটাছুটি করিতেছে এইরূপ দেখা গেল। অথবা যেমন ঘুমের ঘোরে লেডি ম্যাক্‌বেথ্ রক্তাক্ত কৃপাণ দেখিলেন। অবশ্য ঘুমের ঘোরে রক্তাক্ত কৃপাণ দেখাকে অমূল প্রত্যক্ষ না বলিয়া স্বপ্ন বলাই ভাল।[১]

অমূল এবং সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের **সাদৃশ্য** এই যে উহারা উভয়ই ভ্রম-প্রত্যক্ষের প্রকারভেদ। কিন্তু ইহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রহিয়াছে।

সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের মূলে যেমন কোনো বাস্তব ঘটনা বা পদার্থ থাকে, অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষে সেইরূপ থাকে না। অর্থাৎ, বাস্তব জগতের অথবা সংবেদনের দিক হইতে দেখিলে অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ নিতান্ত অমূলক। পক্ষান্তরে সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ সমূল, অর্থাৎ ইহার মূল বা বাস্তব ভিত্তি রহিয়াছে। সমূল ভ্রম-প্রত্যক্ষ বাস্তব সংবেদনের মানস বিকৃতি বা অপব্যাখ্যা (রং ইন্‌টারপ্রেটেশন্ অফ্ সেন্‌সেশন্)। কিন্তু অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ পুরাপুরিভাবে বাহ্য সংস্পর্শহীন মানসপ্রত্যক্ষ, কারণ ইহা কোনো বাহ্যবস্তুর দ্বারা উৎপন্ন নয়, ইহা সম্পূর্ণভাবে মনের ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত।

অমূল ভ্রম-প্রত্যক্ষের কারণ

অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ যে কোনো ইন্দ্রিয়েই আরোপিত হইতে পারে, যদিও ইহা প্রধানতঃ দর্শন এবং শ্রবণেই আরোপিত হয় বেশী। ভ্রান্তদর্শন, ভ্রান্তশ্রবণ প্রভৃতি অমূল প্রত্যক্ষ স্বভাবী এবং অস্বভাবী সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ঘটিয়া থাকে। দূরদর্শন বা টেলিভিশন এবং দূরশ্রবণ বা ক্লেয়ার-অডিয়েন্স্-প্রসূত অধিকাংশ প্রত্যক্ষই অমূল প্রত্যক্ষ।

অমূল প্রত্যক্ষ প্রধানতঃ মানসিক এবং যান্ত্রিক কারণে ঘটিয়া থাকে। সংবেদন (হিপনোসিস্) দ্বারা এই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করা যায়। এইরূপ অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ সদর্থক (পজিটিভ্) এবং নঞর্থক (নেগেটিভ্) হইতে পারে। সদর্থক অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষে বাস্তবভিত্তিহীন সংবেদন জন্মে, যেমন সংবেশিত

১ স্বপ্ন ও অমূল প্রত্যক্ষের পার্থক্য ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে।

ব্যক্তি তাহার সম্মুখে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে দেখিতে পায় এবং তাহার সহিত কথাবার্তা বলে। নঞর্থক অমূল প্রত্যক্ষে যে সকল সংবেদন বাস্তবিকই ঘটিতেছে তাহা অনুভূত হয় না। যেমন, সংবেশিত ব্যক্তি তাহার নিজ নাম, ধাম, পরিচয় প্রভৃতি ভুলিয়া যাইতে পারে।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেণ্ট্স্ অফ্ সাইকলজি— একাদশ, ত্রয়োদশ, পরিচ্ছেদ

জি. এফ্ স্টাউট্—এ ম্যানুয়াল্ অফ্ সাইকলজি—তৃতীয় খণ্ড—প্রথম অংশ, প্রথম পরিচ্ছেদ
তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উড্ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড্ মার্ক্ইস্—সাইকলজি— ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বোরিং, ল্যাংফেল্ড্, ওয়েল্ড্—ফাউণ্ডেশনস্ অফ্ সাইকলজি— দশম পরিচ্ছেদ

জি. মার্ফি—জেনারাল সাইকলজি— একাদশ পরিচ্ছেদ

এম্. কলিন্স্ অ্যাণ্ড্ জে. ড্রিভার্—এক্সপেরিমেণ্টাল্ সাইকলজি— ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উড্ওয়ার্থ্—কনটেম্পোরারি স্কুল্স্ অফ্ সাইকলজি— পঞ্চম পরিচ্ছেদ

Exercise

1. Define Perception and explain its nature with an example. (pp. 467-470)
2. Give an analysis of the process of Perception. (pp. 467-470)
3. How can Perception be called implicit memory and habit ? Distinguish between Complication and Synesthesia. (pp. 470-473)
4. Write short notes on (a) Complication and (b) Synaesthesia. (pp. 471-473)
5. Is pure sensation possible ? Discuss. (pp. 473-475)
6. Distinguish between sensation and perception. Which is more fundamental of the two ? (pp. 475-477)
7. Expound the Gestalt theory of Perception. Distinguish between 'figure' and 'ground ' (pp 477-479)
8. What are the principles of Configuration ? Discuss with examples. (pp 480-481)
9. Write short notes on (a) Figure, (b) Ground, (c) Pragnanz. (pp 477-481)
10. Define illusory perception How is it relevant to psychological study ? (pp 481-482)
11. Classity the main types of illusory perception and illustrate them. (pp. 483-488)
12. Write notes on (a) Geometrical optical illusions, (b) Muller-Lyer illusions. (pp. 484-488)

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ

(পার্সেপ্‌শন্‌ অফ্‌ স্পেস্‌ অ্যাণ্ড্‌ টাইম্‌)

১। সাধারণভাবে দেশ প্রত্যক্ষ

(পার্সেপ্‌শন্‌ অফ্‌ স্পেস্‌ ইন্‌ জেনার‍্যাল্‌)

পুর্ব পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষের সাধারণ রূপ ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে বিভিন্ন প্রত্যক্ষক্রিয়া কিরূপে সংঘটিত হয় তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

দেশপ্রত্যক্ষ আলোচনায় মনোবিত্থার দৃষ্টিভঙ্গী

দেশ বা স্থানের আসল স্বরূপ কি তাহা মনোবিত্থার আলোচ্য নয়। দেশ বা স্থান যাহাই হউক না কেন, ইহার জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হয়, অথবা জ্ঞাতার মনের দিক হইতে দেশ বা স্থান কি তাহাই মনোবিত্থার আলোচ্য।

মনোবিত্থায় দেশ বলিতে কি বুঝায়

দেশ সম্বন্ধে নানারূপ জ্ঞান হয়। শূন্য স্থান বা দেশ (এম্‌প্‌টি স্পেস্‌) বলিতে মনোবিৎ বুঝিবেন অব্যাহত বা বাধাহীন অঙ্গসঞ্চালন (আন্‌রেজিস্টেড্‌ মুভ্‌মেণ্ট্‌)। ঘরের শূন্যস্থান দেখিতে বা উহাতে চলিতে গিয়া কোথায়ও চক্ষুর বা হস্তপদের সঞ্চালন বাধা পায় না। এইরূপ অবাধ অঙ্গচালনার বাহন (মিডিয়াম্‌) শূন্যস্থান। আবার পূর্ণস্থান (ফিল্‌ড্‌ আপ্‌ স্পেস্‌) বলিতে মনোবিৎ বুঝিবেন ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত অঙ্গসঞ্চালন (রেজিস্টেড্‌ মুভ্‌মেণ্ট্‌)। ঘরে চক্ষু বা হস্তপদ সঞ্চালন করিতে গিয়া ঘরের আসবাবপত্রে অথবা দেওয়ালে এই গতি ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত হইল। স্থতরাং এই গতির বাধাদানকারী স্থানগুলি পুর্ণ। **ব্যাহত গতি-সংবেদন হইতে পূর্ণস্থানের এবং অব্যাহত গতি-সংবেদন হইতে শূন্যস্থানের প্রত্যক্ষ ঘটে।**

বস্তুর বিভিন্ন দৈশিক ধর্মগুলিও মনোবিত্থায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে নির্ণীত হয়। বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ঘনত্ব, পরিমাণ, ওজন, আকার, আকৃতি

মসৃণতা, কর্কশতা, দূরত্ব, নিকটত্ব, এক কথায়, উহার সকল দৈশিক ধর্মগুলিই, বুঝিতে হয় প্রত্যক্ষের মানদণ্ডে।

মনোবিদ্যার দিক হইতে দেশ বা স্থান কতগুলি বিন্দুর সমষ্টি। একটি বড জিনিসের সহিত একটি ছোট জিনিসের পার্থক্য নির্ভর করে উহারা যে দৈশিক বিন্দুগুলি লইয়া গঠিত তাহাদের সংখ্যার উপর। এই বিন্দুগুলি উপরে-নীচে, ডাইনে-বাঁয়ে, সম্মুখে-পশ্চাতে, দূরে-নিকটে প্রভৃতি নানা অবস্থানে, দিকে ও দূরত্বে পরস্পর-সম্বদ্ধ। দেশ বা স্থান বলিতে বুঝায় অনেকগুলি বিন্দুর সহাবস্থান (কো-এক্সিজ্‌টেন্স্ অফ্ পয়েন্ট্‌স্)।

জড়পদার্থের মুখ্য এবং গৌণ গুণ

বাহ্য জগৎ বা জড় পদার্থই দেশ জুড়িয়া থাকে। সুতরাং দেশপ্রত্যক্ষ বলিতে জড়পদার্থের বা বহির্জগতের প্রত্যক্ষ বুঝায়। জড়পদার্থের (ম্যাটার্) দেশ জুড়িয়া থাকা ছাড়া ওজন, পরিমাণ, ঘনত্ব, সংখ্যা, গতি প্রভৃতি গুণগুলিকে বলা হয় মুখ্য গুণ (প্রাইমারি কোয়ালিটিজ্)। দেকার্তে, লক্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণের মতে এই মুখ্যগুণগুলি জড়পদার্থের নিজস্ব গুণ। ইহারা প্রত্যক্ষ হউক বা না হউক, ইহারা বাস্তব সত্য। আবার এই মুখ্য বা প্রাথমিক গুণগুলি ছাড়াও জড়পদার্থের আরও কতগুলি গুণ আছে যাহাদের বলা হয় গৌণ গুণ (সেকেণ্ডারি কোয়ালিটিজ্), যেমন রং, শব্দ, কাঠিন্য, গন্ধ, স্বাদ প্রভৃতি। ইহারা জড়বস্তুর নিজস্ব বা আসল গুণ নয় কিন্তু চক্ষু, ত্বক্, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত বস্তুর সংযোগ-হেতু উৎপন্ন গুণ।

জড়পদার্থের বা বহির্জগতের প্রত্যক্ষ বলিতে কি বুঝায়

দেশপ্রত্যক্ষ বলিতে শূন্য ও পূর্ণভেদে দুই প্রকার দেশের প্রত্যক্ষ বুঝায়। পূর্ণ দেশপ্রত্যক্ষ বলিতে আবার বহির্বিশ্বের বিভিন্ন জড়পদার্থের প্রত্যক্ষ বুঝায়। আবার জড়পদার্থের প্রত্যক্ষ বলিতে বুঝায় উহা যে সকল দৈশিক বিন্দু লইয়া গঠিত উহাদের নানা অবস্থান, দিক, দূরত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধগুলির প্রত্যক্ষ। অধিকন্তু, জড়পদার্থের প্রত্যক্ষ হইল উহার মুখ্য ও গৌণ গুণগুলির প্রত্যক্ষ। তাহা ছাড়া, ইহাও মনে রাখা দরকার যে প্রত্যক্ষ একটি কালিক ঘটনা। ইহা কোনো কালে সংঘটিত হয়। সুতরাং বাহ্য জড়পদার্থের দৈশিক প্রত্যক্ষের সহিত উহার কালিক প্রত্যক্ষও বুঝিতে হইবে।

২। দেশের স্পর্শ প্রত্যক্ষ
(ট্যাক্‌চুয়্যাল্ পার্সেপ্‌শন্ অফ্ স্পেস্)

স্বাদ ও ঘ্রাণ সংবেদনের বাহ্য জগৎ বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা কম। আবার শ্রবণ সংবেদন সাহায্যে বাহ্য জগতের যে জ্ঞান হয় তাহাও সামান্য। এই জ্ঞান উৎপন্ন করিবার সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষমতা স্পর্শ ও দর্শন সংবেদনের।[১] স্পর্শ ও দর্শন প্রত্যক্ষই বহির্বিশ্বকে জানিবার দুইটি প্রধান দ্বার।

কাহারও কাহারও মতে দর্শন অপেক্ষা স্পর্শই জড়জগৎকে প্রত্যক্ষ করিবার প্রকৃষ্টতর উপায়। যাহারা জন্মান্ধ, সুতরাং দর্শন সাহায্যে বহির্বিশ্বের জ্ঞানলাভে বঞ্চিত, তাহাদের পক্ষে স্পর্শই এই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। জন্মান্ধের বহির্জগৎপ্রত্যক্ষ স্পর্শ প্রত্যক্ষ। পক্ষান্তরে যাহারা চক্ষুষ্মান্ বা দর্শনক্ষম, তাহারা স্পর্শের সহিত দর্শন এবং দর্শনের সহিত স্পর্শ মিলিত করিয়া এই জ্ঞানলাভের সুবিধা পায়।

জন্মান্ধ ব্যক্তির জগৎপ্রত্যক্ষ

জন্ম হইতেই যাহার দর্শন ক্ষমতা নাই তাহার, অর্থাৎ জন্মান্ধ ব্যক্তির, জগৎপ্রত্যক্ষ কিরূপে সংঘটিত হয়, তাহা আলোচ্য।

নিষ্ক্রিয় স্পর্শ (প্যাসিভ্ টাচ্)

হাতের কাছে টেবিলটিকে জন্মান্ধ ব্যক্তি কিরূপে প্রত্যক্ষ করে তাহা দেখা যাউক। এই ব্যক্তি তাহার ডান হাতটি টেবিলটির উপর রাখিল এই একটি স্পর্শনক্রিয়ায় টেবিলের যতটুকু অংশ তাহার ডান হাতের সংস্পর্শে আসিল টেবিলটি যে অন্ততঃ ততটুকু তাহা সে প্রত্যক্ষ করিল। টেবিলটি যদি তাহার করতলের মত ছোট হইত, তাহা হইলে এই একটি স্পর্শনেই মোটের উপর গোটা টেবিলটিকে সে প্রত্যক্ষ করিতে পারিত এইরূপ স্পর্শপ্রত্যক্ষে হাত চালাইবার বা সঞ্চালন করিবার, অর্থাৎ সক্রিয় স্পর্শের, দরকার নাই, কারণ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে টেবিলটির আকার এই জন্মান্ধ ব্যক্তির দক্ষিণ করতলের সমান। এইরূপ স্পর্শের নাম **নিষ্ক্রিয় স্পর্শ (প্যাসিভ্ টাচ্)।**

১ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

টেবিলটি করতলাকার বলিতে মনোবিদ্যার দিক হইতে বুঝায় যে, করতলের যে স্পর্শবিন্দুগুলি (টাচ্ স্পট্স্) টেবিলের সংস্পর্শে আসিয়া উদ্দীপিত হইয়াছে উহার আকার ঐগুলির সমান। প্রত্যেকটি স্পর্শবিন্দুরই একটি স্থানীয় সঙ্কেত (লোক্যাল্ সাইন্) আছে, যাহার ফলে উহা উদ্দীপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য স্পর্শবিন্দুর সহিত তুলনায় উহা কোথায় অবস্থিত তাহা প্রত্যক্ষ হয়। ধরিয়া লওয়া গেল যে টেবিলের সংস্পর্শে আসিয়া করতলের যে স্পর্শবিন্দুগুলি উদ্দীপিত হইয়াছে উহারা ক', খ', গ', ঘ', এবং ঙ', এবং টেবিলের উদ্দীপক দেশ-বিন্দুগুলি যথাক্রমে ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ। ক' বিন্দু উদ্দীপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ হয় যে ইহা অন্যান্য বিন্দুগুলির বাম দিকে। আবার খ' বিন্দু উদ্দীপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ হয় যে উহা ক' বিন্দুর ডান দিকে এবং অন্যান্য বিন্দুগুলির বামদিকে। অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি বিন্দুরই নিজস্ব স্থানীয় সঙ্কেত রহিয়াছে। তাহা হইলে টেবিলটির ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ এই উদ্দীপক দেশ-বিন্দুগুলি যথাক্রমে করতলের ক', খ', গ', ঘ', এবং ঙ', বিন্দুগুলি উদ্দীপিত করিয়াছে এবং করতলের উদ্দীপিত বিন্দুগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ যেরূপ, টেবিলের উদ্দীপক বিন্দুগুলির সম্বন্ধও সেইরূপ, এই প্রকার প্রত্যক্ষ ঘটিল।

সক্রিয় স্পর্শ (অ্যাক্টিভ্ টাচ্)

টেবিলের আকৃতি করতলের সমান ধরিয়া লইলেও, হয়ত উহার প্রকৃত আকৃতি করতল অপেক্ষা বড়। সুতরাং গোটা টেবিলের দৈশিক পরিমাণ বা আকার করতলের একটি মাত্র নিষ্ক্রিয় স্পর্শ দ্বারা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি নিষ্ক্রিয় স্পর্শ অথবা স্পর্শের সহিত করতলসঞ্চালন দরকার হইবে। এইরূপ অঙ্গসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শনকে **সক্রিয় স্পর্শ** (অ্যাক্টিভ্ টাচ্) বলে। সক্রিয় স্পর্শের সাহায্যে টেবিলের বিভিন্ন অংশগুলিকে পূর্বাপরভাবে স্পর্শ করিয়াই এই বস্তুটির পূর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ সম্ভব। এইরূপ পুনঃ পুনঃ এবং পর পর টেবিলের অংশগুলি গতি বা হস্ত সঞ্চালনের সাহায্যে স্পর্শ করিয়া, অর্থাৎ স্পর্শ সংবেদনের সহিত পেশী সংবেদন যুক্ত করিয়া, টেবিলের আকার এবং আয়তন প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। বস্তুর বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্ অংশের সম্বন্ধে কোথায়, কোন্ দিকে এবং কতদূরে বা নিকটে অবস্থিত, প্রত্যক্ষের এই সকল জ্ঞাতব্য

বিষয় সক্রির স্পর্শের সাহায্যে জানা যায়। কিন্তু নিষ্ক্রিয় স্পর্শের সাহায্যে কোনো ক্ষুদ্র বস্তুকে কতগুলি বিন্দুর সহাবস্থান (কো-এক্সিজ্‌টেন্স্‌ অফ্‌ পয়েণ্ট্‌স্‌) রূপেই জানা যায় মাত্র। ঐ বিন্দুগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ, যেমন অবস্থিতি, দিক এবং দূরত্ব বা নিকটত্ব প্রভৃতি, প্রত্যক্ষ করিতে হইলে শুধু নিষ্ক্রিয় স্পর্শই যথেষ্ট নয়, কিন্তু উহার সহিত সক্রিয় স্পর্শের অর্থাৎ গতি-স্পর্শ সংবেদনের (ট্যাক্‌চু-মাস্কুলার্‌ সেন্‌সেশন্‌) প্রয়োজন হয়।

সক্রিয় স্পর্শের পরিমাণ ভেদ

কিন্তু সক্রিয় স্পর্শেরও ভেদ রহিয়াছে, যেমন পরিমাণগত (কোয়াণ্টি-টেটিভ্‌) এবং প্রকারগত (কোয়ালিটেটিভ্‌) ভেদ। টেবিলটির দৈর্ঘ্য কোন্‌টি এবং প্রস্থ কোন্‌টি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে জন্মান্ধ ব্যক্তি টেবিলের উপর হস্তসঞ্চালন করিয়া দেখিবে যে উহার কোন্‌ প্রান্ত হইতে কোন্‌ প্রান্ত পর্যন্ত হস্ত সঞ্চালন করিয়া উহাকে স্পর্শ করিতে সক্রিয় স্পর্শ, অর্থাৎ পেশী ও স্পর্শ সংবেদনের পরিমাণ বেশী হয়। বলা বাহুল্য, যে প্রান্ত হইতে যে প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে স্পর্শ ও পেশী সংবেদনের পরিমাণ বেশী হয়, তাহাই টেবিলের দৈর্ঘ্য এবং যে প্রান্ত হইতে যে প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে স্পর্শ ও পেশী সংবেদনের মাত্রা হয় কম, তাহাই টেবিলের প্রস্থ। এইরূপে টেবিলটি কত বড় তাহার প্রত্যক্ষ নির্ভর করে উহাতে হস্তসঞ্চালন করিতে কি পরিমাণ পেশীয় ও স্পর্শ বা সক্রিয় স্পর্শ সংবেদন লাগে তাহার উপর।

সক্রিয় স্পর্শের প্রকারভেদ

সুতরাং জন্মান্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে টেবিলের অথবা অন্য যে কোনো বাহ্য প্রত্যক্ষ বস্তুর পরিমাণ বুঝিতে হইলে উহাকে সক্রিয় স্পর্শের মাত্রা বা পরিমাণ দিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু সহাবস্থিত বিন্দুগুলির পারস্পরিক অবস্থিতি এবং দিক, প্রত্যক্ষ করিতে হইবে সক্রিয় স্পর্শ সংবেদনের গুণ (কোয়ালিটি) দ্বারা। টেবিলের ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ বিন্দুগুলির একটি অপরটির সহিত কিরূপে সম্বদ্ধ, একটি অপরটির কোন্‌ দিকে অবস্থিত, ইহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সক্রিয় স্পর্শ সংবেদনের প্রকার বা গুণের উপর নির্ভর করিতে হয়। ডান দিক হইতে বাম দিকে হস্তসঞ্চালন করিতে হইলে যে জাতীয় সক্রিয় স্পর্শ করিতে হয়, বাম দিক হইতে ডান দিকে, উপর হইতে নীচে, নীচ হইতে

উপরে, সম্মুখ হইতে পশ্চাতে এবং পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে হস্তসঞ্চালনের সক্রিয় স্পর্শ উহার তুলনায় ভিন্ন জাতীয়, এমন কি বিপরীতও, হইতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সক্রিয় স্পর্শ সংবেদনে বিভিন্ন প্রকারের পেশী সংবেদন জন্মে এবং এই ভিন্নজাতীয় সক্রিয় স্পর্শ ই সহাবস্থিত বিন্দুগুলির দিক এবং পারস্পরিক অবস্থান প্রত্যক্ষ করিতে সাহায্য করে। পাখাটি যে মাথার উপরে এবং টেবিলটি পাখার নীচে, ইহা বুঝিতে পারা যায় উহাদিগকে স্পর্শ করিতে হইলে যে বিপরীত সক্রিয় স্পর্শ প্রয়োজন, তাহার সংবেদন দ্বারা। হাত তুলিবার সক্রিয় স্পর্শ যে হাত নামাইবার সক্রিয় স্পর্শের তুলনায় বিপরীতজাতীয় তাহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়ই ধরা পড়ে।

সুতরাং, জন্মান্ধ ব্যক্তি **পেশীয় ও স্পর্শ সংবেদনের পরিমাণ বা মাত্রাভেদ অনুসারে বস্তু পরিমাণ, যেমন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ, দূরত্ব, নিকটত্ব প্রভৃতি, প্রত্যক্ষ করে, এবং এই সংবেদনের প্রকার বা গুণভেদ অনুসারে বস্তুর অবস্থিতি, দিক, পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করে।**

৩। দেশের দর্শন প্রত্যক্ষ
(ভিস্যুয়্যাল্ পার্সেপ্‌শন অফ্ স্পেস্)

চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির দেশ প্রত্যক্ষ

জন্মান্ধ ব্যক্তি পেশী ও স্পর্শ সংবেদন সাহায্যে দেশ প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির দেশপ্রত্যক্ষে দর্শন সংবেদনও প্রধান অংশ গ্রহণ করে। স্বাভাবিক দেশপ্রত্যক্ষে স্পর্শের তুলনায় দর্শনের গুরুত্ব কম নয়।

নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় দর্শনপ্রত্যক্ষ

স্পর্শ সংবেদনের মত, দর্শন সংবেদনও পেশী সংবেদনের সাহায্যে অথবা উহার সাহায্য না লইয়া, অর্থাৎ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ভাবে, ঘটিতে পারে। নিষ্ক্রিয় দর্শন সংবেদনে চক্ষুসঞ্চালন থাকে না, কিন্তু সক্রিয় দর্শন সংবেদনে চক্ষুপেশীর ক্রিয়ার ফলে চক্ষু সঞ্চালিত হয়। যেমন এক দৃষ্টিতে, অথবা একটি চোখের পলকে টেবিলটি দেখিয়া লইলাম। টেবিলটি ছোট হইলে অবশ্যই উহাকে এক পলকে অথবা চক্ষুসঞ্চালন না করিয়াই দেখা যায়। এই একটি দৃষ্টিতে দেখার নাম নিষ্ক্রিয় দর্শন (প্যাসিভ্ সাইট্)। আবার টেবিলটি যদি প্রকাণ্ড

হয়, তাহা হইলে উহাকে এক পলকে দেখিয়া লওয়া যায় না, কিন্তু চক্ষু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, অর্থাৎ সক্রিয় দৃষ্টির (অ্যাক্‌টিভ্ সাইট্) সাহায্যে দেখিতে হয়।

দর্শন-সংবেদনের পরিমাণ ও প্রকারভেদ

স্পর্শ সংবেদনের মত দর্শন সংবেদনেরও পরিমাণ অনুসারে দৈশিক পরিমাণ, দূরত্ব প্রভৃতি গুণ প্রত্যক্ষ হয়, এবং ইহার প্রকার বা গুণভেদ অনুসারে দৈশিক অবস্থিতি অথবা অন্য বস্তুর সহিত উহার সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হয়। চর্মে স্পর্শবিন্দুর মত অক্ষিপটেও দর্শনবিন্দু আছে। আবার স্পর্শ সংবেদনের মত দর্শন সংবেদনের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ বস্তুর অবস্থিতি, সম্বন্ধ প্রভৃতি ধর্মগুলি অক্ষিপটের কোন্ বিন্দুতে বস্তুটি প্রতিফলিত হয়, তাহার উপর নির্ভর করে। অক্ষিপটের দর্শনবিন্দুগুলি, অর্থাৎ যে বিন্দুতে প্রত্যক্ষ বস্তু প্রতিফলিত হয়, যেমন ডান-বাম, উপর-নীচ, সম্মুখ-পশ্চাৎ প্রভৃতি, যে ক্রমে সম্বদ্ধ, উহাদের উপর প্রতিফলিত বস্তুর বিন্দুগুলিও সেই ক্রমানুসারে সম্বদ্ধ।

বস্তুর পরিমাণ, অর্থাৎ বস্তুটি ছোট কি বড় তাহাও, নির্ভর করে দৃষ্টিবিন্দু বা দৃষ্টিকোণের (অ্যাঙ্গ্‌ল্ অফ্ ভিসন্) উপর। দৃষ্টবস্তু হইতে প্রসৃত আলোকরশ্মি অক্ষিমুকুর প্রভৃতি চক্ষুগোলকের স্তর অতিক্রম করিবার কালে প্রতিসৃত (রিফ্র্যাক্‌টেড্) হইয়া অক্ষিপটে বিপরীতভাবে প্রতিফলিত হয়। ফলে অক্ষিপটের সহিত দৃষ্টবস্তুর একটি কোণ গঠিত হয়। এই কোণের পরিমাণ অনুসারে দৃষ্ট বস্তুর আকার বা পরিমাণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।
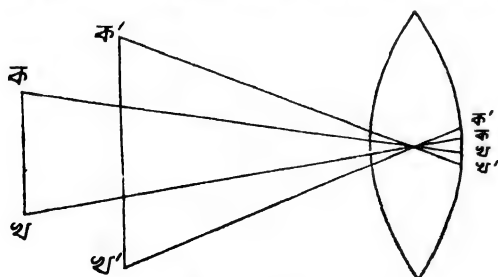
৫৭নং চিত্র—প্রতিসরণ (রিফ্র্যাক্‌শন্)

একই আকারের দুইটি বস্তু যথা ক খ এবং ক' খ' চক্ষুর দূরে ও নিকটে অবস্থিত হইলে উহারা অক্ষিপটে যথাক্রমে ছোট এবং বড় দৃষ্টিকোণ গঠন করে এবং ঐ কারণে দূরের বস্তুটি ছোট ও নিকটের বস্তুটি বড় দেখায়। উপরের প্রতিসরণ (রিফ্র্যাক্‌শন্) চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে।

অবশ্য দর্শন প্রত্যক্ষের এই ব্যাখ্যা যতটা শারীরবৃত্তীয় ততটা মনোবৈজ্ঞানিক নয়। সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যে অনেকাংশে শারীর-বৃত্তীয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ এই দুইটি মানসবৃত্তিতেই ইন্দ্রিয়-যন্ত্র এবং কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়া স্থূলভাবে প্রকট। মনোবিদ্যার দিক হইতে বলা যায় যে, সক্রিয় দর্শনপ্রত্যক্ষের সংশ্লিষ্ট চক্ষুর পেশী-সংবেদন দৃষ্টবস্তুর প্রত্যক্ষে প্রভাব বিস্তার করে। একটি বস্তুকে দেখিতে হইলে উহাকে স্পষ্ট দর্শন-রেখায় (ক্লিয়ার্ লাইন্ অফ্ ভিসন্) আনিতে হয় এবং এই ক্রিয়ায় চক্ষুকে ডান-বামে, উপরে-নীচে, সম্মুখে-পশ্চাতে সঞ্চালিত করিতে হয়। চক্ষু-সঞ্চালনের এই বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াগুলি দৃষ্টবস্তুর অবস্থিতি, সম্বন্ধ, দিক্ প্রভৃতির নির্ণয়ে সহায়তা করে।

মোটের উপর, স্পর্শ প্রত্যক্ষের মূলনীতি দর্শন প্রত্যক্ষেও প্রযোজ্য। এই দুই প্রত্যক্ষের পার্থক্য এই যে, চক্ষু উহার বিবর হইতে দৃশ্যবস্তুর নিকট ছুটিয়া যায় না, কিন্তু ত্বগিন্দ্রিয় পেশীর সাহায্যে প্রত্যক্ষ বস্তুর নিকট যাইয়া উহার স্পর্শজ্ঞান লাভ করে। চক্ষু উহার বিবরে অবস্থিত হইয়াই দৃশ্যবস্তুর বিভিন্ন ধর্মগুলি প্রত্যক্ষ করে। অবশ্য ন্যায় প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনমতে চক্ষুও স্পর্শেন্দ্রিয়েব ন্যায় দৃশ্যবস্তুর নিকট আলোকরশ্মির মধ্য দিয়া গমন করে এবং ঐ আলোকরশ্মি বস্তুর আকারে আকারিত হওয়ার ফলে প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়।

৪। এক-চাক্ষুষ (মনোকুলার্) এবং দ্বি-চাক্ষুষ (বাইনকুলার্) প্রত্যক্ষ

প্রত্যক্ষ

সাধারণতঃ দুই চক্ষুর সাহায্যেই দর্শনপ্রত্যক্ষ ঘটে, অর্থাৎ সাধারণ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে দ্বি-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ (বাইনকুলার্ পার্সেপ্শন্) বলা যায়। এক-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ (মনোকুলার্ পার্সেপ্শন্) সাধারণ নয়। কিন্তু যাহাদের এক চক্ষু নিষ্ক্রিয়, অথবা যাহারা প্রয়োগশালায় এক চক্ষু বন্ধ করিয়া দর্শনপ্রত্যক্ষের অনুশীলন করে, তাহাদের দর্শনপ্রত্যক্ষ এক-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। অবশ্য এই ক্ষেত্রেও এক-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ প্রায়ই অতীত দ্বি-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এক চক্ষু দিয়া দূরত্ব দর্শন হইলেও অস্পষ্ট বা আবছা ভাবে হয়। যাহারা একটি চক্ষুর সাহায্য হইতে বঞ্চিত, তাহাদের দূরত্বজ্ঞান যে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক চক্ষুর সাহায্যে দূরত্বপ্রত্যক্ষ কতগুলি দর্শনেন্দ্রিয়

সূচক বা চিহ্নের (ভিস্যুয়াল্ সাইন্‌স্) সাহায্যে সাধিত হইয়া থাকে। যেমন, কোনো বস্তুর আকার উহার পরিচিত আকার অপেক্ষা **ছোট দেখাইলে,** বুঝা যায় যে উহা দূরে অবস্থিত। আবার তুইটি সমান্তরাল রেখা একস্থানাভিমুখী হইতেছে (কন্‌ভার্জেন্স্) দেখিলেও, ঐ রেখা তুইটির দূরত্ব বুঝা যায়। তৃতীয়তঃ, বস্তুর **অস্পষ্টতা** এবং উহাতে অবস্থিত গাছপালা প্রভৃতির **রং-এর পরিবর্তন** প্রভৃতি দেখিয়াও বুঝা যায় যে উহা দূরে অবস্থিত। চতুর্থতঃ, **'আলো-ছায়ার খেলা'** (প্লে অফ্ লাইট্ অ্যাণ্ড্ শেইড্) দেখিয়াও ছায়াময় অংশ দূরে এবং আলোকময় অংশ নিকটে বলিয়া দেখা যায়। পঞ্চমতঃ, গতিশীল দ্রষ্টার **দৃষ্টিবিন্দুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর আপাতদৃষ্ট স্থান পরিবর্তন দেখিয়াও** (প্যারালাক্স্) দূরত্ব বা নিকটত্বের দর্শন প্রত্যক্ষ হয়। ধাবমান রেলগাড়ীতে বসিয়া নিকটবর্তী বস্তুগুলি বিপরীত দিকে এবং দূরবর্তী বস্তুগুলি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতেছে দেখা যায়। অধিকন্তু, এক-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেও নিকট এবং দূরবর্তী বস্তুর সহিত চক্ষুকে উপযোজিত (অ্যাকোমোডেটেড্) করিতে হয় এবং এই উপযোজনে বস্তুর নিকটত্ব বা দুবত্ব অনুসারে অক্ষিমুকুরকে বেশী বা কম ন্যুব্জ (কন্‌ভেক্স) করিতে হয়। এই ক্রিয়ায় চক্ষুপেশীর যে শ্রম বা টান (স্ট্রেন্) অনুভূত হয়, তাহাই বস্তুর নিকটত্ব বা দূরত্বের পরিমাপ করে।

উপরোক্ত লক্ষণগুলির সাহায্যে এক-চাক্ষুষ দর্শনেও দৃষ্টবস্তুর দূরত্ব বা নিকটত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

দ্বি-চাক্ষুষ দর্শনে উপরের লক্ষণগুলি ছাড়া আরও কতগুলি দর্শনের সূচক-চিহ্ন বর্তমান থাকে। যেমন, দুই চক্ষু দিয়া একই বস্তুকে দেখিলে, দুই চক্ষু একটি দর্শন-যন্ত্ররূপে কাজ করে এবং উহাদের দুইটি অক্ষকেই (অ্যাক্সিস্), অর্থাৎ পীতবিন্দু হইতে অক্ষিমুকুরের মধ্য দিয়া দৃষ্টবস্তু পর্যন্ত কল্পিত রেখাকে, কমবেশী একস্থানাভিমুখী (কন্‌ভার্জ্) করিতে হয়। দুইটি অক্ষিমুকুরের অক্ষদ্বয়কে এইরূপ করিতে হইলে চক্ষুপেশীগুলির যে শ্রম হয় তাহার পরিমাণ অনুসারে দৃষ্টবস্তুর দূরত্ব বুঝা যাইতে পারে। বস্তুটি অত্যন্ত নিকটবর্তী হইলে এই পেশীর শ্রম অত্যধিক হয়। আবার উহা যত দূরে হয়, চক্ষুর পেশীয় শ্রম তত কম হইয়া থাকে।

দ্বি-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে একটি বস্তু দর্শন

দুইটি চক্ষু দিয়া একই বস্তুকে দেখিলে, দুই অক্ষিপটের দুইটি পীতবিন্দুতে বস্তুর দুইটি প্রতিরূপ (ইমেজ্) প্রতিফলিত হয়। এই অবস্থায় বস্তুটিকে

দুইটি বস্তুরূপে দেখা উচিত। কিন্তু বস্তুতঃ এই অবস্থায়ও একটি বস্তু দুইটি রূপে দৃষ্ট না হইয়া একটি রূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে **চক্ষু দুইটি হইলেও উহারা একটি দর্শনেন্দ্রিয়রূপে কাজ করে।** প্রশ্ন এই যে **কিরূপে দুইটি চক্ষু একটি বস্তুদর্শনে একটি ইন্দ্রিয়রূপে কাজ করিয়া একটি বস্তুর প্রত্যক্ষ জন্মায়।**

মনে করা যাউক যে, দুইটি অক্ষিপটের একটিকে অপরটির উপর এইরূপভাবে স্থাপন করা হইল যে উহারা সর্বসম হয়। এইবার একটি পিন দিয়া উহাদের যে স্থানই বিদ্ধ করা হউক না কেন উহারা **সদৃশ বিন্দুতে** (সিমিলার্ বা করেস্‌-পন্‌ডিং পয়েন্ট্‌স্‌) বিদ্ধ হইবে। এই সদৃশ বিন্দুগুলি ছাড়া অন্যবিন্দুগুলি **বিসদৃশ** (ডিস্‌-সিমিলার্ বা নন্‌-করেস্‌পন্‌ডিং) বিন্দু। দুই চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট একটি বস্তু তখনই একটি বস্তু বলিয়া দৃষ্ট হয়, যখন উহা দুই পীতবিন্দুর সদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু ঐ বস্তু কোনো কারণে দুই পীতবিন্দুর বিসদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হইলে উহা একটি বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ না হইয়া দুইটি বস্তুরূপে প্রত্যক্ষ হয়।

বস্তুর একত্ব এবং দ্বিত্বদর্শন

একটি সাধারণ পরীক্ষা দ্বারা বস্তুর একত্ব বা দ্বিত্বদর্শন সহজবোধ্য হইতে পারে। তর্জনী আঙ্গুলটি সম্মুখে ধরিয়া উহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাউক। এইবার তর্জনী ও চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে অপর কোনো বস্তু, যেমন একটি পেন্সিল, ধরা হইল। এইরূপ অবস্থায় পেন্সিলটি দুইটি দেখা যায়। এই স্থলে একটি তর্জনী একটিই এবং একটি পেন্সিল দুইটি দৃষ্ট হয় কেন? উত্তর এই যে দুই চক্ষুই দূরবর্তী তর্জনীতে নিবদ্ধ থাকায়, উহার প্রতিরূপ দুই অক্ষিপটের সদৃশ বিন্দুতে প্রতি-ফলিত হয় বলিয়া তর্জনীটি একটি রূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু চক্ষু দুইটি দূরবর্তী তর্জনীতে নিবদ্ধ থাকায়, চক্ষু এবং তর্জনীর মধ্যবর্তী পেন্সিলের প্রতিরূপ দুই অক্ষিপটের বিসদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় এবং একটি পেন্সিল দুইটি রূপে দৃষ্ট হয়।

৫। ঘনত্ব বা স্থূলত্ব প্রত্যক্ষ (পার্সেপ্‌শন্ অফ্ সলিডিটি)

ঘনত্ব বলিতে আমরা বস্তুর সেই দৈশিক গুণ বুঝি যাহার ফলে বস্তুর একটি প্রান্ত চক্ষুর নিকটে আর একটি প্রান্ত দূরে দেখায়। ইহা বস্তুর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ হইতে পৃথক একটি তৃতীয় গুণ।

আমরা দেখিয়াছি যে বস্তু দুই অক্ষিপটের সদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হইলে একটি এবং বিসদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হইলে দুইটি দেখায়। এইরূপও হইতে পারে যে বস্তু দুই অক্ষিপটের ঠিক সদৃশ বা বিসদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত না হইয়া উহাদের নিকটবর্তী বিন্দুতে প্রতিফলিত হইল। এইরূপ ক্ষেত্রে বস্তুটি যে একটি রূপে প্রত্যক্ষ হইবে তাহা নয়, আবার ইহা যে দুইটি রূপে প্রত্যক্ষ হইবে তাহাও নয়, কিন্তু বস্তুটির প্রত্যক্ষ এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষের মাঝামাঝি হইবে, অর্থাৎ বস্তুটি ঘনত্ববিশিষ্ট বলিয়া প্রত্যক্ষ হইবে। তাহা হইলে বস্তুর একত্ব এবং দ্বিত্ব দর্শনের মাঝামাঝি বা উহাদের আপোষমূলক দর্শনই বস্তুর ঘনত্ব (সলিডিটি) দর্শন।[১]
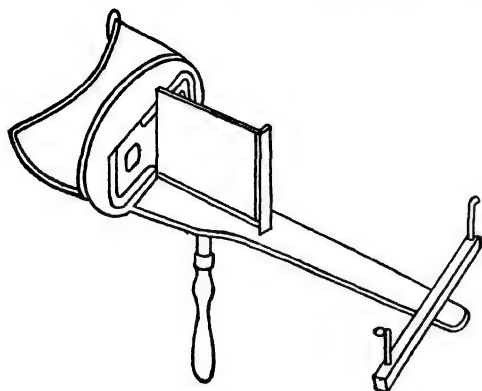
৫৮নং চিত্র

ক্রাস্টার্-এর প্রতিসারক (রিফ্রাক্টিং) স্টিরিয়স্কোপ্। দুই চক্ষুতে একই বস্তুর সামান্য পরিমাণে ভিন্ন দুইটি প্রতিরূপ প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিরূপ দুইটি ৫৭, ৫৮নং চিত্র—ঘনদৃক্ যন্ত্র মিলিত হইয়া ঘনত্ব-প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে।
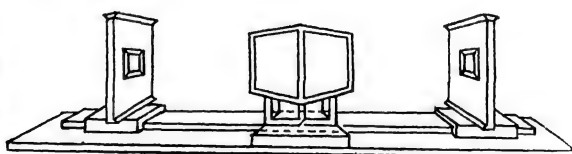
৫৯নং চিত্র ঘনদৃক্‌যন্ত্র

হোয়েট্‌স্টোন্-এর প্রতিভাসক (রিফ্লেক্টিং) স্টিরিয়স্কোপ্।

ঘনদৃক্‌দর্শন (স্টিরিওস্‌কপিক্) ভিসন্

ঘনদৃক্ (স্টিরিওস্কোপ) সাহায্যে উপরোক্ত ঘনত্ব দর্শনের পরীক্ষা করা যাইতে পারে। ঘনদৃক্ যন্ত্রে একই বস্তুর দুইটি ছবি মিলিত হইয়া ঘনত্বের প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। বস্তুর এই ছবি দুইটি যথাক্রমে ডান এবং বাম চক্ষু দিয়া বস্তুটিকে

১. ই. বি. টিশ্‌নার—এ টেক্সট্‌বুক্ অফ্ সাইকলজি—পৃঃ ৩১০

যেরূপ দেখা যায় তাহার ছবি। পৃথকভাবে কোনো ছবিতেই বস্তুর ঘনত্ব দেখা যায় না, ইহাতে শুধু বস্তুর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দেখা যায়। কিন্তু ডান চক্ষু দিয়া বস্তুর ডান দিক প্রত্যক্ষ হয় এবং বাম চক্ষু দিয়া উহার বাম দিক প্রত্যক্ষ হয়। দুইটি চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট এই সামান্য পৃথক ছবি দুইটি দৃক্‌যন্ত্রে মিলিত হইয়া যে বস্তুর প্রত্যক্ষ ঘটায় তাহা দুইটিও নয় বা একেবারে একটিও নয়, কিন্তু এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষের মাঝামাঝি একপ্রকারের প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ বস্তুর ঘনত্ব প্রত্যক্ষ।

যেমন দৃক্‌যন্ত্রের সাহায্যে একটি দেওয়ালের ঘনত্ব প্রত্যক্ষ এইরূপে বুঝানো যাইতে পারে। বাম চক্ষু দিয়া দেওয়ালটি যেরূপ দেখা যায় তাহার একটি ছবি এবং ডান চক্ষু দিয়া উহা যেরূপ দেখা যায় তাহার আর একটি ছবি, এই দুইটি ছবির একত্র মিলন ঘটানো হয় দৃক্‌যন্ত্রে। এই মিলনের ফলে, যে ঘনত্ব দেওয়ালের ডান চক্ষু এবং বাম চক্ষু দ্বারা পৃথকভাবে দৃষ্ট দুইটি ছবিতে নাই, তাহার প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ ঘনত্ব প্রত্যক্ষের নাম ঘনদৃক্‌দর্শন (স্টিরিওস্কোপিক্ ভিসন্)।

৬। দূরত্বের মূল এবং অর্জিত প্রত্যক্ষ—ডিরেক্ট (অরিজিন্যাল্) অ্যাণ্ড্ ইন্‌ডিরেক্ট (অ্যাকোয়ার্ড্) পার্সেপ্‌শন্ অফ্ ডিস্‌ট্যান্স্

কোনো কোনো মনোবিৎ মনে করেন যে স্পর্শ সংবেদন সাহায্যে দূরত্বের যে প্রত্যক্ষ হয় তাহাই উহার মূল বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ স্পর্শ সংবেদনজ দূরত্ব-প্রত্যক্ষ অন্য কোনো প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর না করিয়াই সোজাসুজি বা মুখ্যভাবে দূরত্বের জ্ঞান উৎপন্ন করে। পক্ষান্তরে, এই সকল মনোবিদের মতে, সোজাসুজি বা সাক্ষাৎভাবে দূরত্বের দর্শন প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু হয় স্পর্শ সংবেদনের মধ্যস্থতায়। সুতরাং দূরত্বের দর্শন-প্রত্যক্ষ আসলে এক প্রকারের পরোক্ষ জ্ঞান। উহা স্পর্শ সংবেদনের সাহায্যে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে অর্জিত (অ্যাকোয়ার্ড্) হইয়া থাকে।

বার্ক্‌লে-প্রবর্তিত দূরত্বের অর্জিত বা পরোক্ষ দর্শনপ্রত্যক্ষবাদ—(বার্কলেজ্ ইন্‌ডিরেক্ট্ থিওরি অব্ ভিসন্)

বার্ক্‌লে বলিয়াছেন যে সক্রিয় স্পর্শ, অর্থাৎ পেশীয়-স্পর্শ সংবেদনের সাহায্যে যে দূরত্ব প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই উহার মুখ্য বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ। তাঁহার মতে, দূরত্বের দর্শন-প্রত্যক্ষ আসলে প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু পরোক্ষ বা অর্জিত। দর্শন-

সংবেদনজ দূরত্বপ্রত্যক্ষ শিক্ষালব্ধ, অর্জিত বা গৌণ প্রত্যক্ষ। উহা অর্জিত হয় উহার সহিত অনুষক্ত (অ্যাসোসিয়েটেড্) দূরত্বের সক্রিয় স্পর্শপ্রত্যক্ষ সাহায্যে। সক্রিয় স্পর্শই সাক্ষাৎভাবে দূরত্ব-প্রত্যক্ষের একমাত্র উপায়। সক্রিয় স্পর্শই এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইয়া সাক্ষাৎ দূরত্বজ্ঞান বা উহার প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। কিন্তু দেশ হইতে দেশান্তরে পৌছিবার সাক্ষাৎ সক্রিয়-স্পর্শজ প্রত্যক্ষের সহিত দর্শন সংবেদনও জড়িত থাকে। দর্শন সংবেদন সক্রিয় স্পর্শের সহকারীরূপে ক্রিয়াশীল হয়। সক্রিয় স্পর্শ-প্রত্যক্ষ করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সময় আমরা গন্তব্য পথ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইয়া থাকি। যেমন, যে বস্তুটিকে এই স্থান হইতে ছোট দেখাইতেছে, উহাই বড় দেখায়, যখন পেশীয় স্পর্শ সাহায্যে ঐ স্থানে পৌছানো যায়। যে সমান্তরাল রেল লাইন দুইটি এক স্থানে দাঁড়াইলে মিলিত দেখাইতেছে তাহা নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে অনেক দূরে অবস্থিত, কারণ ঐ স্থানে পৌছাইতে হইলে এই স্থান হইতে অনেকটা পথ হাঁটিয়া যাইতে হয়। আবার, যে পাহাড়টি এই স্থান হইতে ছোট, আব্ছা এবং অস্পষ্ট দেখায়, তাহা অবশ্যই অনেক দূরে অবস্থিত, কারণ ঐ পাহাড পর্যন্ত হাঁটিয়া অথবা পেশীয় স্পর্শ-প্রত্যক্ষ সাহায্যে জানা গিয়াছে, যে পাহাড়টি আসলে বড এবং স্পষ্ট।

এইরূপে দূরত্বের স্পর্শ-প্রত্যক্ষ হইতে উহার পরোক্ষ দর্শন-জ্ঞান অর্জিত হয়। পর্বতে ধূম দেখিয়া পূর্ব-প্রত্যক্ষ ধূম-বহ্নির সহচার দর্শনের সাহায্যে পর্বতে বহ্নির অনুমান হইয়া থাকে। তেমন দূরত্বের অতীত স্পর্শ-প্রত্যক্ষেব সহকারী দর্শনের ভিত্তিতে পরবর্তী দর্শনকালে স্পর্শজ লক্ষণগুলির স্মরণ হয় এবং শুধু দর্শনই যেন স্পর্শনিরপেক্ষভাবে দূরত্বেব প্রত্যক্ষ ঘটাইতেছে বলিয়া মনে হইয়া থাকে।

দূরত্বের অর্জিত দর্শন-প্রত্যক্ষের পক্ষে যুক্তি

দূরত্বের অর্জিত দর্শন-প্রত্যক্ষবাদের সমর্থনে বার্ক্‌লে কতগুলি যুক্তি দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ, দূরত্বের সাক্ষাৎ দর্শনপ্রত্যক্ষ ঘটিতে পারে না, কারণ চক্ষু উহার বিবরে বা কোটরে থাকিয়াই দূরত্ব দেখিয়া থাকে। সক্রিয় স্পর্শে পা' যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে, চক্ষু তেমন উহার কোটর হইতে ছিট্‌কাইয়া বা ঠিক্‌রাইয়া পড়িয়া দৃষ্ট দূরবর্তী স্থানে চলিয়া যায় না, অথবা সশরীরে উপস্থিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, বলা যাইতে পারে যে,

যাহারা জন্মান্ধ তাহারা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলে নিকট ও দূরবর্তী বস্তুর পার্থক্য প্রত্যক্ষ করে না। যাহাদের দর্শন স্পর্শ সংবেদনের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পায় নাই, অথবা যাহাদের শুধু দর্শনশক্তি আছে কিন্তু সক্রিয় স্পর্শন-শক্তি নাই তাহাদের দূরত্বের প্রত্যক্ষশক্তিও নাই। যেমন, শিশু বহু দূরে অবস্থিত চাঁদের দিকে হাত বাড়াইয়া উহাকে ধরিতে চায়। আবার নবজাত গোবৎস বা বাছুর ভূমিষ্ঠ হইয়াই সমতল মাটির উপরও লাফাইতে থাকে। এইরূপ আচরণের কারণ এই যে নবজাত গোবৎস সক্রিয় স্পর্শ সাহায্যে উঁচু-নীচু, দূর-নিকট প্রভৃতি দৈশিক ভেদ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পায় নাই। আবার বিড়ালশিশু যে অনেক উঁচু হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া মারা পড়ে, এইরূপ ঘটনার ব্যাখ্যাও এই যে, তাহার দর্শন সংবেদনেব সহিত সক্রিয় স্পর্শ সংবেদন যুক্ত হইতে পারে নাই—কাজেই সে দূর ও নিকটের পার্থক্য জানে না।

তৃতীয়তঃ, বস্তুর ছবি দেখিয়া উহাতে আমরা দূরত্ব নিকটত্ব অথবা ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। অথচ ছবিতে আঁকা বস্তুগুলির আসলে কোনো ঘনত্ব নাই, কারণ উহারা সমতল কাগজে বা স্থানে অঙ্কিত। ছবিতে ঘনত্ব দর্শন সম্ভব হয় কতগুলি দর্শন-প্রতীক বা চিহ্নের (ভিসুয়্যাল্ সাইন্স্) সাহায্যে যাহাদের জ্ঞান বা শিক্ষা অর্জিত হইয়াছে সক্রিয় স্পর্শসংবেদনের মধ্যস্থতায়।

বার্ক্লে-এর অর্জিত দর্শন প্রত্যক্ষবাদের সমালোচনা

অর্জিত দর্শন-প্রত্যক্ষবাদের পক্ষে বার্ক্লে-প্রদর্শিত উপরোক্ত যুক্তিগুলি অনেক মনোবিৎই গ্রহণ করেন নাই। দেশের দর্শন প্রত্যক্ষ আলোচনায় আমরা দেখিযাছি যে ইহাও মৌলিক, প্রাথমিক বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ। অনেকেই মনে করেন যে ঘনত্ব বা দূরত্ব প্রত্যক্ষে স্পর্শের তুলনায় দর্শনের গুরুত্ব বেশী, কারণ দর্শন-প্রত্যক্ষ স্পর্শ-প্রত্যক্ষের তুলনায় সূক্ষ্মতর। বহুদূরবর্তী বস্তু, যেমন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদি সক্রিয়স্পর্শ-প্রত্যক্ষের বাহিরে, অথচ দর্শন সাহায্যে এই সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়। দ্বিতীয়তঃ, দেশ তিনটি মাত্রাবিশিষ্ট। দেশের প্রত্যক্ষ হয় বলিলে বুঝায় যে উহার তিনটি মাত্রারই—যথা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ঘনত্বের—প্রত্যক্ষ হয়। দর্শন সাহায্যে মাত্র উহার দুইটি মাত্রার—অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের—প্রত্যক্ষ ঘটে বলার অর্থ এই যে উহার একেবাবেই প্রত্যক্ষ হয় না।

৭। বস্তুর বিপরীত দর্শন হয় না কেন ?

কোনো বস্তু অক্ষিপটে প্রতিফলিত হইবার পূর্বে ঐ বস্তু হইতে প্রসৃত আলোকরশ্মি অক্ষিমুকুর, ভিট্রিয়াস্ হিউমর্ প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করিতে গিয়া প্রতিসৃত (রিফ্র্যাক্টেড্) হয়। ফলে ঐ বস্তুটির প্রতিরূপ অক্ষিপটে প্রতিফলিত হয় উল্টা বা বিপরীতভাবে। ক্যামেরার নেগেটিভে ছায়ামূর্তিগুলি দেখিলেই ব্যাপারটি বুঝা যাইবে—এই ছায়ামূর্তিগুলি আসল ব্যক্তি বা বস্তুর বিপরীত ক্রমে দেখা যায়, যেমন ডান হাতটি বাঁ দিকে এবং বাঁ হাতটি ডান দিকে।

অথচ, অক্ষিপটে এই বিপরীত প্রতিফলন সত্ত্বেও আমরা দৃষ্ট বস্তুগুলিকে যথার্থ ক্রমেই দেখিয়া থাকি। বলা যাইতে পারে যে নেগেটিভের বিপরীত ক্রম সত্ত্বেও যেমন ফটোতে যথার্থক্রমে বস্তু দেখা যায় ফটো তুলিবার রাসায়নিক ক্রিয়ানুসারে, তেমন চক্ষুতে বিপরীতভাবে প্রতিফলিত বস্তু বা ব্যক্তিকে যথার্থক্রমে দেখা যায় দর্শনের রাসায়নিক ক্রিয়া অথবা উহার নিজস্ব স্বভাব অনুসারে। আরও বলা যাইতে পারে, অক্ষিপটে প্রতিফলন একটি শারীর ক্রিয়া, পক্ষান্তরে দর্শন একটি মানস ক্রিয়া। এই পার্থক্যের ফলেই বস্তুর বিপরীত প্রতিফলন সত্ত্বেও উহার যথার্থ ক্রমে দর্শন ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে দর্শন সাহায্যে দেশের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ অথবা মৌলিক। কিন্তু বার্ক্‌লে-প্রদর্শিত অর্জিত দর্শনপ্রত্যক্ষবাদ অনুসারে, অক্ষিপটে বস্তুর বিপরীত প্রতিফলন সত্ত্বেও যে ইহা স্বাভাবিকরূপে প্রত্যক্ষ হয় তাহার কারণ এই যে, দেশপ্রত্যক্ষে দর্শন সংবেদন স্পর্শ সংবেদনের উপর নির্ভর করে। বার্ক্‌লে বলেন যে দৃষ্ট বস্তুর অক্ষিপটে প্রতিফলন-ক্রম বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও যে বস্তু যথার্থ ক্রমে দৃষ্ট হয়, তাহার মুখ্য কারণ দর্শন প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু সক্রিয় স্পর্শ প্রত্যক্ষ। স্পর্শ-বিবর্জিত দর্শনই যদি দেশ প্রত্যক্ষের একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ বস্তুর ক্রম আসল বস্তুর বিপরীতই থাকিয়া যাইত। কিন্তু দেশের দর্শন প্রত্যক্ষ অর্জিত বা পরোক্ষ জ্ঞান এবং ইহার স্পর্শ প্রত্যক্ষই মুখ্য বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান। দর্শনে বস্তুর বিপরীত ক্রম সক্রিয় স্পর্শ সাহায্যে সংশোধিত হয়, এবং এই সংশোধনের ফলে দর্শনেও বস্তুর যথার্থ ক্রম প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

বার্ক্‌লে-সমর্থিত মতটি জি. এম্. স্ট্র্যাটন্-এর পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি এক জোড়া চশমা এমনভাবে তৈয়ারী করেন, যাহা ধারণ

করিবার ফলে প্রথমে সকল দৃষ্টবস্তুই বিপরীত বা উল্টাভাবে প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। ফলে দক্ষিণ-বাম, উঁচু-নীচু বস্তুগুলি যথাক্রমে বামে-দক্ষিণে, নীচুতে উঁচুতে দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, যে বস্তুটিকে দক্ষিণে বা বামে এবং উঁচুতে বা নীচুতে দেখা যাইতেছে, উহার নাগাল পাইতে হইলে যথাক্রমে বামে বা দক্ষিণে এবং নীচুতে বা উঁচুতে অবস্থিত বস্তুর নাগাল পাইবার উপযোগী সক্রিয় স্পর্শপ্রত্যক্ষ ঘটে। এইরূপে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, যে বস্তুটিকে ডানদিকে দেখা গিয়াছিল, তাহা আসলে বামদিকে এবং যে বস্তুটিকে উঁচুতে দেখা গিয়াছিল, তাহা আসলে নীচে। এইরূপে স্ট্র্যাটন্-এর দৈশিক দর্শনপ্রত্যক্ষের ভ্রম সক্রিয় স্পর্শ প্রত্যক্ষ দ্বারা সংশোধিত হইল। তাঁহার দর্শনলব্ধ দেশপ্রত্যক্ষের বিপরীত ক্রম সক্রিয় স্পর্শ সংবেদনের সাহায্যে যথার্থ ক্রমে পরিণত হইল।

এই পরীক্ষার দ্বারা স্ট্র্যাটন্ দেখাইলেন যে, দেশপ্রত্যক্ষ মুখ্য বা সাক্ষাৎভাবে সক্রিয় স্পর্শপ্রত্যক্ষ এবং মাত্র পরোক্ষ বা অর্জিতভাবে দর্শনপ্রত্যক্ষ। স্ট্র্যাটন্-এর পরীক্ষায় বার্ক্‌লে-প্রবর্তিত দেশের মুখ্য স্পর্শপ্রত্যক্ষবাদ এবং গৌণ বা অর্জিত দর্শনপ্রত্যক্ষবাদ সমর্থিত হইল।

উপসংহার

উপসংহারে বলিতে হয় যে, সক্রিয় স্পর্শপ্রত্যক্ষ দেশের সাক্ষাৎ বা মুখ্য জ্ঞান অবশ্যই উৎপন্ন করে। যাহারা জন্মান্ধ তাহাদের পক্ষে দেশপ্রত্যক্ষের একমাত্র উপায় সক্রিয় স্পর্শসংবেদন। কিন্তু বার্ক্‌লে-এর মতানুযায়ী এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই যে, দর্শন সাহায্যে দেশের সাক্ষাৎ বা মৌলিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যাহারা জন্মান্ধ, স্পর্শসংবেদন সত্ত্বেও, তাহাদের পক্ষে অতি-দূরবর্তী সৌরপিণ্ডগুলি প্রত্যক্ষ করিবাব কোনো উপায় নাই, কারণ তাহারা দর্শনসংবেদন হইতে বঞ্চিত। পক্ষান্তরে, ঐগুলির দর্শন-প্রত্যক্ষ ঘটিয়া থাকে। মোটের উপর বলা যায় যে, স্বাভাবিক প্রত্যক্ষে সক্রিয় স্পর্শ এবং দর্শন ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত থাকে। ইহার কোনোটিই অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা স্বাভাবিক দেশপ্রত্যক্ষ ঘটায় না। প্রত্যক্ষ সমগ্র দ্রষ্টার ক্রিয়া এবং ইহাতে দ্রষ্টার সকল প্রকার প্রত্যক্ষই অংশগ্রহণ করে, যদিও শ্রবণ, স্বাদ ও ঘ্রাণ সংবেদনের তুলনায় স্পর্শ এবং দর্শন সংবেদনই এই ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

৮। গৌণ দৈশিক প্রত্যক্ষ (সেকেণ্ডারি স্পেস্ পার্সেপ্শন্)

সংবেদন পরিচ্ছেদে দেখা গিয়াছে যে স্বাদ, গন্ধ এবং শ্রবণ সংবেদনের বিস্তার (এক্স্টেন্সিটি) নাই, যদিও জেম্স্ প্রভৃতি মনোবিদ্গণ শ্রবণ সংবেদনের বিস্তারে সন্দেহ পোষণ করেন না।

গন্ধের দৈশিক প্রত্যক্ষ

গন্ধ সংবেদনগুলির বিস্তার না থাকিলেও, স্থানীয় নির্দেশ (লোক্যালাইজেশন্) সম্ভব। ইহার উৎপত্তি হয় কোনো বাহ্য দেশে বা স্থানে। স্পর্শ অথবা দর্শন প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বা স্থানে উহার স্থাননির্দেশ করা যায়। গন্ধ যে দিক হইতে আসিতেছে সেইদিকে মাথা ফিরাইয়া অথবা গন্ধের তীব্রতা অনুভবের ফলে, আমরা উহার কিঞ্চিৎ স্থাননির্দেশ করিতে পারি, যদিও এইরূপ স্থাননির্দেশ প্রায়ই ভ্রান্ত হইতে পারে।

স্বাদের দৈশিক প্রত্যক্ষ

আবার স্বাদের স্থাননির্দেশ ক্ষমতা গন্ধ অপেক্ষাও কম। স্বাদের উৎপত্তি-স্থল বাহ্যদেশীয় নয়, কিন্তু জিহ্বার মধ্যবর্তী স্বাদমুকুলগুলি (টেইস্ট্ বাড্স্)। সুতরাং বহির্বিশ্বের কোন্ স্থান হইতে স্বাদ আসিতেছে সেই প্রশ্ন ওঠে না। স্বাদের স্থান নির্দেশ মুখগহ্বরের অভ্যন্তরেই থাকে।

শ্রবণের দৈশিক প্রত্যক্ষ

গন্ধ এবং স্বাদ এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের তুলনায় শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের স্থান-নির্দেশ এবং দেশপ্রত্যক্ষের ক্ষমতা অধিক। সাধারণতঃ, শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের স্থান-নির্দেশ যথেষ্ট নিখুঁতভাবে ঘটিয়া থাকে। শ্রবণের স্থাননির্দেশ তিনটি অবস্থার সহযোগিতায় সাধিত হয়। প্রথমতঃ, দুইটি কর্ণের দ্বারা শ্রুত শব্দের আপেক্ষিক (রিলেটিভ্) তীব্রতা বা গভীরতা এবং দ্বিতীয়তঃ, ঐ শব্দের নিজস্ব বা নিরপেক্ষ (অ্যাব্সল্যুট্) তীব্রতা বা গভীরতা। বিভিন্ন দিক হইতে আগত শব্দের তীব্রতায় স্বাভাবিক পার্থক্য থাকে। তৃতীয়তঃ, শব্দের জটিলতাও (কম্প্লেক্সিটি) উহার স্থাননির্দেশে সহায়তা করে। যেমন, তানে (মিউজিক্যাল্ টোন্), মানুষের কণ্ঠস্বরে এবং কোলা-

হলে, শুদ্ধ শব্দ (পিওর টোন্) অপেক্ষা নিখুঁতভাবে স্থান নির্দেশিত (লোক্যালাইজ্‌ড্) হয়।

জন্মান্ধ ব্যক্তির ত্রৈমাত্রিক (ট্রাই-ডাইমেন্‌সন্তাল্) দেশপ্রত্যক্ষ সক্রিয় স্পর্শ প্রত্যক্ষ। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই ব্যক্তি শ্রবণপ্রত্যক্ষজ্ঞাত গৌণ দেশেই বাস করে। টিশ্‌নার একজন অন্ধ গ্রন্থকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যাঁহার দেশজ্ঞান স্পর্শসংবেদন অপেক্ষা শ্রবণসংবেদনের উপরই অধিক নির্ভরশীল। এই গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, দৈশিক নমনীয়তা এবং কাঠিন্যের স্পর্শজ্ঞান অন্ধ-দেশ-প্রত্যক্ষের একটি আনুষঙ্গিক অংশ মাত্র।

'সাবধানী-সংবেদন' (ওয়ার্নিং সেন্স্)

আবার জন্মান্ধ ব্যক্তিদের একপ্রকার সংবেদন হয় যাহার নাম 'সাবধানী-সংবেদন' (ওয়ার্নিং সেন্স্)। সাবধানী-সংবেদনের সাহায্যে জন্মান্ধ ব্যক্তি তাহার নিকটবর্তী কোনো কঠিন বা ঘন বস্তুর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়া সাবধান হয়। এইরূপ প্রত্যক্ষও মুখ্য বা গৌণভাবে শ্রবণপ্রত্যক্ষ। কিন্তু এই শ্রবণ-প্রত্যক্ষ কিরূপে ঘটিতে পারে? হয়ত ঐ বস্তুর উপরিভাগ হইতে শব্দতরঙ্গ আসিয়া সোজাসুজিভাবে জন্মান্ধ ব্যক্তির কর্ণে আঘাত করে। হয়ত আভ্যন্তরিক কর্ণের চেষ্টা-বেদন যন্ত্রে ঐ শ্রবণ উদ্দীপকগুলি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যে কারণে এই সাবধানী সংবেদনকে ভেষ্টিবুলার্ সংবেদন বলা যাইতে পারে। এই সংবেদন এমন সূক্ষ্ম যে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা ইহা ধরিতে পারে না।

'সাবধানী সংবেদন' বধির এবং অন্ধ শ্রবণক্ষম ব্যক্তির কর্ণ বন্ধ করিলেও ঘটিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে ইহার কারণ হয়ত তাপের অথবা বায়ুচাপের পরিবর্তন। অন্ধ ব্যক্তিরা ইহার উৎপত্তিস্থলরূপে মুখমণ্ডল নির্দেশ করে।

'সাবধানী সংবেদন' যে একটি ইন্দ্রিয়যন্ত্রেই সীমাবদ্ধ, এইরূপ মনে করিবার হেতু নাই। অন্ধের দেশপ্রত্যক্ষ হয়ত প্রয়োজন অনুসারে কক্‌লিয়া, ভেষ্টিবিউল্, চাপবিন্দু এবং তাপবিন্দু প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারাই সাধিত হয়।

৯। অক্ষিপটীয় দ্বন্দ্ব বা বৈরূপ্য এবং ঐক্য বা একরূপতা (রেটিন্যাল্ রাইভ্যালরি অ্যাণ্ড্ ইউনিটি)

দুইটি ভিন্ন বর্ণ বা আকার একই সময়ে দুই চক্ষুকে উদ্দীপিত করিলে ইহারা পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে থাকে, অর্থাৎ কখনও

উহাদের একটি, কখনও উহাদের অপরটি পর্যায়ক্রমে দৃষ্টিক্ষেত্রকে অধিকার করে। এই ঘটনাকে বলে অক্ষিপটীয় দ্বন্দ্ব (রেটিন্যাল্ রাইভ্যাল্রি)।

কিন্তু দুইটি একই জাতীয় বর্ণ বা আকার একই সময়ে দুই চক্ষুকে উদ্দীপিত করিলে, উহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না, কিন্তু মিলিত হইয়া একটি বর্ণ বা আকাররূপে দৃষ্ট হয়। এই ঘটনাকে বলে অক্ষিপটীয় ঐক্য (রেটিন্যাল্ ইউনিটি)।

প্রথম ঘটনাটি ঘটিবার কারণ এই যে ভিন্ন বর্ণ বা আকারদ্বয় অক্ষিপটের বিসদৃশ বিন্দুতে (ডিস্-সিমিলার্ পয়েন্ট্স্) প্রতিফলিত হয় বলিয়া, একটি বর্ণ বা আকারের রূপ ধারণ করিতে পারে না। আবার দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটিবার কারণ এই যে সমজাতীয় বর্ণ বা আকারদ্বয় অক্ষিপটের সদৃশ বিন্দুতে (সিমিলার্ পয়েন্ট্স্) প্রতিফলিত হয় বলিয়া, একটি বর্ণ বা আকারের মিলিত রূপ ধারণ করে। নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্যে এই ঘটনা দুইটি বুঝা যাইতে পারে।

অক্ষিপটীয় ঐক্য

অক্ষিপটীয় দ্বন্দ্ব

৬০নং চিত্র

১০। দেহাবস্থানের (বডি-পজিশন্) প্রত্যক্ষ

আমাদের দেহ কোথায় এবং কিভাবে অবস্থিত রহিয়াছে তাহা সাধারণতঃ দর্শনের দ্বারাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যেমন আমরা দেখিতে পাই কোথায় কিভাবে আমরা বসিয়া, শুইয়া বা দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। এমন কি অন্ধকারে থাকিয়া আমরা কল্পনানেত্রে আমাদের দেহাবস্থান বুঝিয়া থাকি এবং এই কল্পনা দর্শন-প্রতিরূপ (ভিস্যুয়্যাল্ ইমেজ্) সাহায্যেই ঘটিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, স্পর্শ এবং সন্ধি সংবেদনেও আমরা আমাদের দেহাবস্থান প্রত্যক্ষ করি। পায়ের তলদেশ অসার হইয়া গেলে ঠিকভাবে হাঁটা অসম্ভব হয়। আবার দেহের ভার সম্বন্ধে কোমর অসাড় হইয়া পড়িলেও, দেহাবস্থান সম্পর্কে ভুল হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ, দেহাবস্থানপ্রত্যক্ষে কর্ণও সাহায্য করে। কর্ণের ভেস্টিবিউল অথবা শেইক্ অর্গ্যান্ সাহায্যে দেহাবস্থানের প্রত্যক্ষ ঘটে। দেহের ভারসাম

কোনোপ্রকারে নষ্ট হইলেই এই অংশটি সেই সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করে। সংবেদন পরিচ্ছেদে ভারসাম্যবোধ (ইকুইলিব্রিয়াম্ সেন্স্) দ্রষ্টব্য।

১১। গতি-প্রত্যক্ষ (পার্সেপ্‌শন্ অফ্ মুভ্‌মেণ্ট্)

গতি-প্রত্যক্ষ দুই প্রকারে ঘটিতে পারে, যথা—স্পর্শ সংবেদন এবং দর্শন সংবেদন সাহায্যে।

স্পর্শসংবেদন সাহায্যে গতি-প্রত্যক্ষ

(১) কোনো স্থানে একই বা সমান বেগে এবং বিনা বাধায় বাহিত হইয়া গেলে গতি-প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন, কামরার সকল আলোকপথ বা জানালা বন্ধ করিয়া চলন্ত রেলগাড়ীতে বাহিত হইলে, যতক্ষণ গাড়ীর গতি পরিবর্তিত না হয়, অথবা বাহিরের কোনো বস্তু দৃষ্টিগোচর না হয়, ততক্ষণ আমরাও যে গাড়ীর সহিত ছুটিয়া চলিয়াছি, তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। আবার একই কারণে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর নিরন্তর গতি বা আবর্তনও আমরা প্রত্যক্ষ করি না, কারণ এই গতি একই প্রকার বা অব্যাহত। কিন্তু ভূমিকম্প হইলেই পৃথিবীর গতিপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়।

মোটর গাড়ী একই গতিতে চলিতে থাকিলে এবং যাত্রীর দৃষ্টি বন্ধ থাকিলে, তাহার এই গতিপ্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু হঠাৎ গাড়ীটির ব্রেক্ কষিয়া দিলে যাত্রী তৎক্ষণাৎ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ে, আবার উহার গতি হঠাৎ বাড়াইয়া দিলে, যাত্রী তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে কুশন-এর গায়ে হেলিয়া পড়ে। এইরূপ সম্মুখে বা পশ্চাতে পড়িয়া যাইবার কারণ দেহভারের স্থানপরিবর্তন, চর্মে তাপ-সংবেদন, কতগুলি পেশীর এবং কণ্ডরার প্রসারণ অথবা সঙ্কোচন, কোনো সন্ধির আবদ্ধ এবং অপরটির উন্মুক্ত হইয়া যাওয়া প্রভৃতি। এই সকল ত্বক্, সন্ধি, পেশী, কণ্ডরা প্রভৃতির সংবেদনগুলির মিলিত ক্রিয়ায় গতিপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়।

একটি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ, যেমন বাহু, পা প্রভৃতির গতিপ্রত্যক্ষ শুধু সন্ধি-সংবেদন দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে। হয়ত বাহুটি নাড়ানো হইল। এই গতির সঙ্গে সঙ্গে বাহুর সন্ধি (জয়েণ্ট্) উহার বিবর (সকেট্) হইতে বিচলিত হইয়া বাহুর গতিপ্রত্যক্ষ ঘটায়। অন্ধ এবং স্পর্শ-পেশী-কণ্ডরা-সংবেদনবিহীন ব্যক্তিও এইরূপে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিপ্রত্যক্ষ করে।

উপরোক্ত কারণে স্পর্শ, সন্ধি, কণ্ডরা এবং পেশীর সংবেদনগুলিকে মোটর সেন্‌সেশন্ বা চেষ্টীয় সংবেদন বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ বলা ঠিক নয়, কারণ গতির সংবেদন হয় না এবং গতিসংবেদনের কোনো নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ও নাই। গতির প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু সংবেদন হয় না।

দর্শন সংবেদন সাহায্যে গতি-প্রত্যক্ষ

(২) একটি বস্তুকে 'এককালে দুই স্থানে' দেখিয়া গতির প্রাথমিক দর্শন-প্রত্যক্ষ ঘটে। আকাশ হইতে তীরবেগে একটি তারকার পতন হইল। স্পষ্ট দেখা গেল, জ্যোতির রেখা পশ্চাতে রাখিয়া তারকাটি এক স্থানে যাত্রা আরম্ভ করিল এবং আর এক প্রান্তে অদৃশ্য হইল। এইরূপে তারকাটির গতির দর্শন-প্রত্যক্ষ ঘটিল। গতিপ্রত্যক্ষ স্মরণ সাহায্যে ঘটিয়া থাকে। তারকাটি বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করিয়া উহার যাত্রাশেষ করিল। এই গতিপথের প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষ স্মরণ না থাকিলে, উহার গতি যে এক স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া আর এক স্থানে শেষ হইল, এই প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। রেলগাড়ীটি ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহা আমরা দেখিতে পাই, কারণ আমাদের স্মরণ আছে যে এক মুহূর্ত পূর্বে উহা এই বৃক্ষটির নিকট ছিল এবং আর একটি মুহূর্ত পুর্বে ইহা ছিল অপর একটি বৃক্ষের নিকট। **প্রত্যক্ষ চলনশীল বস্তুর তুলনায় দ্রষ্টা কম চলনশীল বা নিশ্চল না থাকিলে গতিপ্রত্যক্ষ ঘটে না।** যদি গাড়িটির গতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দাঁড়াইবার স্থান এবং সমগ্র দৃশ্যজগৎসহ আমরা বাস্তবিকই গতিশীল হইতাম, তাহা হইলে গতির দর্শনপ্রত্যক্ষ সম্ভব হইত না।

সৌরজগৎ অনন্ত শূন্যে সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমাদের এই গতি-প্রত্যক্ষ হয় না, কারণ এই গতি একরূপ এবং অপরিবর্তিত এবং এই গতির সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই সমভাবে গতিশীল। গতির স্পর্শ প্রত্যক্ষের বেলায় যেমন উহার বেগপরিবর্তন আবশ্যক, তেমন গতির দর্শন প্রত্যক্ষের বেলায়ও অন্যান্য স্থির বস্তুর পশ্চাদ্‌ভূমিতে কোনো বস্তুর স্থান পরিবর্তন আবশ্যক।

১২। ভার ও বাধা প্রত্যক্ষ (পার্সেপ্‌শন্ অফ্ ওয়েট্ অ্যাণ্ড্ রেজিস্ট্যান্স্)

একটি ভার বা ওজন তুলিবার কালে ভার-প্রত্যক্ষ হয়। ভার-প্রত্যক্ষ বলিতে বুঝায় কোনো বিপরীত শক্তি, যথা—মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পরাজ

করিবার ক্লেশ বা টান-প্রত্যক্ষ। ভারটি বেশী হইলেই ইহা স্পষ্ট হয়; অনুভূত হয় যেন হাতটি নামিয়া আসিতেছে এবং বহু ক্লেশে হাতটিকে উপরে উঠাইয়া ভার উত্তোলন করা হইতেছে।

বাধা (রেজিস্ট্যান্স্) প্রত্যক্ষও ভারপ্রত্যক্ষের সহিত একজাতীয় বলিয়া মনে হয়। বাধা অতিক্রম করিবার প্রত্যক্ষেও একটি বিপরীত বা প্রতিকূল শক্তিকে পরাজিত করিবার অনুভূতি হইয়া থাকে।

এই দুইটি প্রত্যক্ষের ইন্দ্রিয় প্রথমতঃ সন্ধির সংবেদনশীল উপরিভাগ। টানপ্রত্যক্ষ (স্ট্রেন্), কণ্ডরার (টেণ্ডন্) দণ্ডের (স্পিন্ড্ল্) উদ্দীপনায় ঘটিয়া থাকে।

ভারপ্রত্যক্ষ নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় ভেদে দুই প্রকার। টেবিলের উপর হাতটি রাখা হইল। এইবার এই নিশ্চল হাতের উপর একটি ভারী বস্তু রাখিলে নিষ্ক্রিয় ভারপ্রত্যক্ষ হয়। এই নিষ্ক্রিয় ভারপ্রত্যক্ষের ইন্দ্রিয় হইল চর্মের চাপবিন্দু এবং চর্মতলস্থ সংযোজক সূত্রের প্যাসিনীয় রক্তকণিকা। জিহ্বা এবং ওষ্ঠ দ্বারা গতিপ্রত্যক্ষের মত এইরূপ প্রত্যক্ষেও ঠিকমত ভার-বিনিশ্চয় (ওয়েট্ ডিস্ক্রিমিনেশন্) হয় না। ভারবিনিশ্চয় হয় সক্রিয় ভারপ্রত্যক্ষে অথবা ভাব উত্তোলনের অনুভূতিতে।

১৩। বস্তুর পরিমাণ ও আকার প্রত্যক্ষ—(পার্সেপ্শন্ অফ্ ম্যাগ্নিচুড্ অ্যাণ্ড্ ফর্ম্)

বস্তুর পরিমাণ বলিতে উহা কত বড় বা ছোট বুঝায়। বস্তুর আকাব বলিতে বুঝায় উহা গোল, লম্বা, ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ প্রভৃতি।

বস্তুর পরিমাণ এবং আকার স্পর্শ এবং দর্শন এই দুই প্রকারেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। একটি বস্তুর প্রথম প্রান্ত হইতে শেষ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ঘনত্ব স্পর্শ করিতে বা দেখিতে কি পরিমাণ স্পর্শ এবং দর্শন সংবেদনের প্রয়োজন হয় তাহার উপর নির্ভর করে উহার পরিমাণ কি, তাহার প্রত্যক্ষ। এই বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

কোনো বস্তুর আকার কিরূপ, ইহা গোল, লম্বা, ত্রিকোণ অথবা চতুষ্কোণ কিনা, তাহার স্পর্শ এবং দর্শন প্রত্যক্ষ নির্ভর করে এই সংবেদনের পরিমাণ এবং গুণের উপর। বস্তুটি যে গোল তাহা বুঝা যাইবে তখন, যখন দেখা যাইবে যে যে স্থান হইতে উহার উপর দিয়া হস্ত বা চক্ষু-সঞ্চালন আরম্ভ হইয়াছিল,

অনবরত এই গতির দিক পরিবর্তন করিয়া পুনরায় সেই হস্ত বা চক্ষু সেই স্থানে ফিরিয়া আসে। আবার বস্তুটি যে লম্বা তাহা বুঝা যাইবে তখন যখন হস্ত বা চক্ষু সঞ্চালনের দিক পরিবর্তিত হইতেছে না। ত্রিকোণ আকার প্রত্যক্ষ হইবে তখন যখন প্রথম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া আরও দুইটি দিক পরিবর্তনের পর হস্ত বা চক্ষু প্রথম স্থানে ফিরিয়া আসে।

১৪। কালপ্রত্যক্ষ—পার্সেপ্‌শন্ অফ্ টাইম্

সংবেদনের স্থায়িত্ব (ডিউরেশন্) গুণটি কালপ্রত্যক্ষের ভিত্তি। সকল সংবেদন হইতেই উহাদের স্থায়িত্ব বা কালপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে।

দেশ ত্রিমাত্রিক, কিন্তু কাল একমাত্রিক। দেশের মাত্রা তিনটি, যথা—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধ বা ঘনত্ব। কিন্তু কালেব মাত্রা একটি, যথা—পৌর্বাপর্য (সাক্সেশন্)। কাল একটি রৈখিক পরিমাণ বিশিষ্ট (ইউনি-লিনিয়ার্) কালিক ঘটনাগুলি ক্রমিক ধারায় পূর্বাপরভাবে ঘটিয়া যায়।

কালের ধারাবাহিকতা বা কালপ্রবাহের মধ্যে ছেদ টানিযা আমরা বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ এই তিনটি কালিক অংশ কল্পনা করি। এই তিনটি কালাংশের মধ্যে **বর্তমান** প্রত্যক্ষ হয় সংবেদনে। সংবেদন ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বর্তমানে প্রদত্ত বা উপস্থাপিত একটি বস্তুর চেতনা। আবার স্মৃতিতে প্রত্যক্ষ হয় **অতীত**। যে বস্তুটিকে স্মরণ করা হইতেছে তাহা অতীত বস্তু যাহা বর্তমানে উপস্থিত নাই কিন্তু পুনরুৎপন্ন (রি-প্রডিউস্‌ড্) হইতেছে। **ভবিষ্যৎ** প্রত্যক্ষ হয় প্রতীক্ষা (এক্স্‌পেক্‌টেশন্) বা অগ্রসূচনার (অ্যান্টিসিপেশন্) সাহায্যে।

কালের ক্ষণিকতা আমরা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করি। মনোযোগ এবং সংবেদনের হ্রাসবৃদ্ধি, ইচ্ছার সাফল্য এবং ব্যর্থতা, সুখ-দুঃখ, আলোক-অন্ধকার প্রভৃতি বিচিত্র অনুভবের মধ্য দিয়া কালের ক্ষণিকতার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়া থাকে।

তথাকথিত বর্তমান (স্পিশাচ্ প্রেজেণ্ট্)

প্রত্যক্ষ ক্ষণিকতাবোধই কাল-প্রত্যক্ষের মূল ভিত্তি। যাহাকে বর্তমান কাল বলা হইয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ ক্ষণিকতাবোধ হইতেই সঞ্জাত বর্তমান বলিতে বাস্তবিকভাবে উপলব্ধ সংবেদন, সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-প্রক্ষোভ,

কল্পিত প্রতিরূপ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বুঝায়। যাহা বাস্তব অভিজ্ঞতায় নাই তাহাই অতীত বা ভবিষ্যৎ। কিন্তু বর্তমান কাল শুধু কালের অনন্ত-প্রবাহকে ছিন্ন করিয়া ফেলে এমন কোনো ছুরির শাণিত প্রান্ত (নাইফ্-এজ্) নয়। ইহা শুধু একটি অবিভাজ্য বিন্দুমাত্র নয়, কিন্তু একটি প্রসার। যে বর্তমানকে আমরা 'এখন', 'এইমাত্র' প্রভৃতি রূপে বর্ণনা করি তাহার আবির্ভাব হয় 'এখনও নয়' (নট্ ইয়েট্) সূচক ভবিষ্যতের গর্ভ হইতে এবং তাহার লয় ঘটে 'আর নাই' (নো মোর্) এইরূপ চেতনাত্মক অতীতের অন্ধকারে। বর্তমান বলিতে আমরা প্রত্যক্ষ করি একটি 'তথাকথিত বর্তমান' (স্পিশাচ্ প্রেজেণ্ট্) যাহার একপ্রান্ত রহিয়াছে ভবিষ্যতে এবং অপর প্রান্ত অতীতে।

কালপ্রত্যক্ষ ও মনোযোগ

কালপ্রত্যক্ষ মনোযোগের সহিত সংযুক্ত। বর্তমান বলিতে বুঝায় সেই বাস্তব সংবেদন যাহা মনোনিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে। অতীত বলিতে বুঝায় মনোনিবেশের সঞ্চিত ফল যাহা বর্তমান মনোনিবেশকে প্রভাবিত করে। আবার ভবিষ্যৎ বলিতে বুঝায় মনোনিবেশের প্রতীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে।

কালাতিক্রম প্রত্যক্ষ—পরীক্ষা প্রণালী

কালাতিক্রমের (ল্যাপ্স্ অফ্ টাইম্) পরিমাপচেষ্টা হইয়াছে। এই প্রয়োগে প্রধানতঃ দুইটি প্রণালী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমটিতে প্রয়োগকর্তা পাত্রের নিকট একটি কাল-ব্যবধান (টাইম্ ইণ্টার্ভ্যাল্) উপস্থাপিত করিয়া তাহাকে যথার্থভাবে ঐ ব্যবধানের পুনরুৎপাদন করিতে বলেন। দ্বিতীয়টিতে প্রয়োগ-কর্তা পাত্রের নিকট দুইটি কাল-ব্যবধান উপস্থাপিত করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন এই দুইটি ব্যবধান সমান, বেশী, না কম। এই প্রয়োগের ভিত্তিতে মায়ার্স্ বলিয়াছেন যে পাত্র অল্প ব্যবধানকে বাড়াইয়া এবং বেশী ব্যবধানকে কমাইয়া বলিয়া থাকে। এই দুইটির মধ্যবর্তী একটি **"উদাসান্তর" (ইন্-ডিফারেন্স্ ইণ্টার্ভ্যাল্)** আছে। উদাসান্তর ব্যবধানটি এক সেকেণ্ডের ৭০০ এবং ৮০০ সহস্রাংশের মধ্যবর্তী। উদাসান্তর অপেক্ষা কম এবং বেশী কাল-ব্যবধানকে পাত্র যথাক্রমে বাড়াইয়া এবং কমাইয়া বলে। মায়ার্স্ আর একটি তথ্য আবিষ্কার করেন যে "পূর্ণ" ব্যবধান—(অর্থাৎ যে কাল-

ব্যবধানে কোনো মানস ঘটনা ঘটে) "শূন্য"ব্যবধান (অর্থাৎ যে কাল ব্যবধানে কোনো মানস বৃত্তি ঘটে না) অপেক্ষা বিলম্বিত বা দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়।

কালের বিভিন্ন স্থায়িত্ববোধ নিয়ন্ত্রিত হয় মনোনিবেশের দ্বারা। মনোনিবেশ অবিরামভাবে চলিতে থাকিলে ক্রমিক অভিজ্ঞতাগুলি ধৃতির (রিটেন্টিভ্‌নেস্) সঞ্চিত ফলের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যতক্ষণ ধরিয়া মনোনিবেশ চলিতেছে, কালের স্থায়িত্ব ততক্ষণ। মনোনিবেশ ক্রিয়া একঘেয়ে বা ব্যাহত হইলে কালের স্থায়িত্ব বেশী বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। আবার উহা সহজ এবং অব্যাহত হইলে কালের স্থায়িত্ব কম বলিয়া অনুভূত হয়।

১৫। ছন্দের (রিদ্‌ম্) প্রত্যক্ষ

শব্দ অথবা গতি দ্বারা চিহ্নিত নির্দিষ্ট সময়ান্তরের নিয়মিত পৌর্বাপর্যকে ছন্দ বলে। ছন্দ প্রত্যক্ষের জন্য দুই শ্রেণীর সংবেদন বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথমটি হইল চর্ম, পেশী, কণ্ডরা, সন্ধি প্রভৃতির সংবেদন লইয়া গঠিত স্পর্শ সংবেদন, এবং দ্বিতীয়টি হইল স্পর্শ-শ্রবণ সংবেদন যাহা উপরোক্ত সংবেদনগুলির সহিত শ্রবণ সংবেদন সংযুক্ত হইয়া গঠিত।

(১) দেহরূপ কাণ্ডের সহিত দুই হাত-পা যেন চারিটি দোলকের মত সংযুক্ত হইয়া থাকে। দৌড়াইবার বা হাঁটিবার সঙ্গে সঙ্গে দুই পা' এবং প্রত্যেক পা'য়ের সহিত উহার বিপরীত বাহু দোল খায়। এই দোলন-প্রত্যক্ষই ছন্দ প্রত্যক্ষের মূল ভিত্তি।

(২) উপরোক্ত গতিচ্ছন্দ ছন্দ প্রত্যক্ষে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু গতি ও শ্রবণের যুগ্ম ছন্দ শুধু গতিচ্ছন্দ অপেক্ষা অধিক উন্নত। কারণ, উপরোক্ত চারিটি অঙ্গ দেহের সহিত আবদ্ধ। উহারা সম্মুখে-পশ্চাতে এবং উপরে-নীচে দোলায়মান হইবার অতিরিক্ত আর কিছু করিতে পারে না। পক্ষান্তরে শব্দ এইরূপ দেহবন্ধন হইতে মুক্ত।

১৬। প্রত্যক্ষ এবং সং-প্রত্যক্ষ (পার্সেপ্‌শন্ অ্যাণ্ড্ অ্যাপার্সেপ্‌শন্)

সংবেদনের স্পষ্ট চেতনাকে যেমন প্রত্যক্ষ বলা যায়, তেমন প্রত্যক্ষের স্পষ্ট চেতনাকে বলা যায় সং-প্রত্যক্ষ (অ্যাপার্সেপশন্)।

কিন্তু সংপ্রত্যক্ষ শুধু স্পষ্ট প্রত্যক্ষই নয়। ইহার অর্থ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ অপেক্ষা ব্যাপক। **নূতন জ্ঞানকে পূর্বলব্ধ অথবা পুরাতন-সঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে স্পষ্টভাবে জানিবার নাম সংপ্রত্যক্ষ।**

প্রত্যক্ষে যেমন উপস্থাপিত (প্রেজেণ্টেটিভ্) এবং পুনরুপস্থাপিত (রিপ্রেজেণ্টেটিভ্) অংশ থাকে, সংপ্রত্যক্ষেও সেইরূপ থাকিতে পারে। কিন্তু সংপ্রত্যক্ষে পুনরুপস্থাপিত ভাবকেও আমরা অন্য পুনরুপস্থাপিত ভাবের সাহায্যে স্পষ্টভাবে জানিতে পারি। তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষের পুনরুপস্থাপিত অংশ যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থাপিত অংশের সহিত যুক্ত হয়। কিন্তু সংপ্রত্যক্ষের পুনরুপস্থাপিত অংশ উহার সহিত ঐচ্ছিকভাবে সংযুক্ত হয়। আবার প্রত্যক্ষের সদৃশীকরণ (অ্যাসিমিলেশন), পৃথকীকরণ (ডিফারেন্সিযেশন্), স্থাননির্দেশ (লোক্যালাইজেশন্), বিক্ষেপণ (অব্জেক্টিফিকেশন্) প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি ঘটে অনৈচ্ছিক বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে। পক্ষান্তরে সংপ্রত্যক্ষে এই ক্রিয়াগুলি ঘটে ঐচ্ছিকভাবে। অধিকন্তু, প্রত্যক্ষ শুধু সংবেদনকেই স্পষ্টতরভাবে জানিয়া থাকে, কিন্তু সংপ্রত্যক্ষ শুধু প্রত্যক্ষকেই নয়, ভাব বা যুক্তিকেও স্পষ্টভাবে জানিতে পারে।

সংপ্রত্যক্ষে যে অতীত জ্ঞানভাণ্ডার নূতন জ্ঞানকে চেতনায় স্পষ্ট করিয়া তোলে তাহাকে বলা হয় **সংপ্রত্যক্ষক পিণ্ড (অ্যাপার্সিভিং মাস্),** অতীত এবং নূতন জ্ঞানের মিলিত ফলকে বলে **সংপ্রত্যক্ষ পিণ্ড (অ্যাপার্সেপ্শন্ মাস্)** এবং যে নূতন জ্ঞানটি সংপ্রত্যক্ষের ফলে স্পষ্ট হইয়া চেতনায় ফুটিয়া ওঠে তাহাকে বলে **সংপ্রত্যক্ষকৃত পিণ্ড (অ্যাপার্সিভড্ মাস)।**

১৭। প্রত্যক্ষের প্রণালী বা দ্বাররূপে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-গুলির তুলনা—(কম্পারিজন্ অফ্ দি সেন্সেস্ অ্যাজ্ চ্যানেল্স্ অফ্ পার্সেপ্শন্)

সব কয়টি বিশেষ ইন্দ্রিয়ই বস্তুপ্রত্যক্ষের দ্বার। চক্ষু-সাহায্যে আলোক-অন্ধকার, কর্ণ সাহায্যে শব্দ, ত্বক সাহায্যে তাপ, শৈত্য, চাপ এবং ব্যথা, নাসিকা সাহায্যে গন্ধ এবং রসনা সাহায্যে স্বাদ প্রত্যক্ষ হয়। জগৎ বলিতে এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞাত বস্তু বা বস্তুনিচয় বুঝায়।

এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ এবং ত্বক অবশ্যই নাসিকা এবং জিহ্বার তুলনায় উন্নত। বিশেষ করিয়া চক্ষু ও ত্বক বহির্জগতের জ্ঞান উৎপাদনে

অন্যান্য ইন্দ্রিয়যন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বহির্জগতের বিভিন্ন গুণাবলী প্রত্যক্ষ হয়। বাহ্য বা জড় পদার্থের মুখ্য এবং গৌণ গুণগুলি, যেমন—অবস্থান, ঘনত্ব, পরিমাণ, আকার, ওজন, সংখ্যা, গতি প্রভৃতি মুখ্য গুণ এবং বর্ণ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি গৌণ গুণ—দর্শন এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া জড়পদার্থের ব্যাপ্তি বা অবস্থান প্রভৃতি মুখ্য গুণগুলি জানিবার একমাত্র উপায় এই ইন্দ্রিয় দুইটি। দূরত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানও এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই ঘটিয়া থাকে।

শ্রবণ-সংবেদন সাহায্যে শব্দ প্রত্যক্ষ হয়। ইহা ছাড়া, এই সংবেদনের সাহায্যে বাহ্যবস্তুর অবস্থান, পরিমাণ, দিক, দূরত্ব প্রভৃতির যতটুকু জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা নিতান্তই নগণ্য। অবশ্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের একটি অংশ, অর্থাৎ ভেস্টিবিউল্ দেহসাম্য এবং দেহাবস্থান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জন্মায়। কাজে কাজেই, শ্রবণও দর্শন এবং স্পর্শের মত উচ্চতর ইন্দ্রিয়গুলির অন্তর্ভুক্ত।

স্বাদসংবেদন বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ প্রত্যক্ষ জন্মায় না। ইহার কাজ হইল কোনো দ্রবণীয় বস্তু জিহ্বার সংস্পর্শে আসিলে, উহার স্বাদ-সংবেদন উৎপন্ন করা। কিন্তু স্বাদ-সংবেদন বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান উৎপন্ন করে না।

আবার গন্ধ সংবেদনের প্রধান কাজ হইল গন্ধ বা ঘ্রাণ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করা। গন্ধ সংবেদনের স্থাননির্দেশ ক্ষমতা থাকিলেও তাহা নির্ভরযোগ্য নয়; গন্ধটি কোথা হইতে আসিতেছে ইহার সন্ধান করিতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় অপারগ।

সুতরাং, যদিও সকল ইন্দ্রিয়েরই বাহ্যজগতের জ্ঞান উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা আছে, এই ক্ষমতা দর্শন ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের সর্বাপেক্ষা বেশী, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অপেক্ষাকৃত কম, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আরও কম, এবং স্বাদেন্দ্রিয়ের সর্বাপেক্ষা কম।

১৮। দেশাভিজ্ঞান (লোক্যাল্ সাইন্) এবং নির্দেশ (লোক্যালাইজেশন্)

স্পর্শ ও দর্শন প্রত্যক্ষ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে যে ত্বক ও অক্ষিপটের দেশাভিজ্ঞান (লোক্যাল্ সাইন্) আছে। দেশাভিজ্ঞান বলিতে বুঝায় ত্বকের বা অক্ষিপটের সেই গুণ, যাহা থাকিবার জন্য উহার যে কোনো বিন্দু উদ্দীপিত হইলে, প্রত্যক্ষ জন্মে যে ঐ বিন্দুই উদ্দীপিত হইয়াছে। অথবা দেশাভিজ্ঞান ত্বাচ্ বা অক্ষিপটীয় বিন্দুর সেই পরিচিতি জ্ঞান, যাহার ফলে উহার উদ্দীপনা উহাকে অন্যান্য বিন্দু হইতে পৃথক রূপে চিহ্নিত করে

সংক্ষেপে বলা যায় যে, দেশাভিজ্ঞান চর্মের বা অক্ষিপটের কোন্ বিন্দু উদ্দীপিত হইয়াছে, তাহার দৈশিক জ্ঞান। এই জ্ঞানটি ঐ উদ্দীপিত বিন্দুর পরিচায়ক চিহ্ন, সঙ্কেত বা নির্দেশ। ইহার ফলে আমরা বুঝিতে পারি,একটি বিশেষ বিন্দুই উদ্দীপিত হইয়াছে, অন্য কোনো বিন্দু উদ্দীপিত হয় নাই।

নির্দেশ বলিতে বুঝায় সেই মানস ক্রিয়া যাহা দ্বারা সংবেদন কোথায় অথবা কখন ঘটিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ হয়। নির্দেশ দুই প্রকার, যথা—স্থান-নির্দেশ এবং কাল-নির্দেশ। স্থানীয় নির্দেশ বলিতে বুঝায় কোন্ দেহস্থ সংবেদন কোন্ উদ্দীপিত বিন্দুতে ঘটিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করা। এইরূপ স্থান-নির্দেশকে আভ্যন্তরীণ স্থান-নির্দেশ (ইণ্ট্রা-অর্গ্যানিক্ লোক্যালাইজেশন্) বলে। দেহস্থ স্থান-নির্দেশ সম্ভব হয় দেশাভিজ্ঞান বা দেহস্থ বিন্দুগুলির নিজস্ব স্থানীয় বোধের দ্বারা। দেহাভ্যন্তরীণ স্থাননির্দেশের সাহায্যেই দেশজ্ঞান ঘটে। একটি বস্তু স্পর্শ বা দর্শন করিতে ত্বকের বা অক্ষিপটের যে যে বিন্দু উদ্দীপিত হয়, উহার প্রত্যেকটির দেশাভিজ্ঞান ফলে বুঝা যায় যে উহারা উদ্দীপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এই বিন্দুগুলি যে ক্রমে দেহে অবস্থিত প্রত্যক্ষ বস্তুটির স্পৃষ্ট বা দৃষ্টবিন্দুগুলিও সেই ক্রমে অবস্থিত। যেমন, টেবিলটি স্পর্শ করিতে গিয়া যে চাপবিন্দু উদ্দীপিত হয়, তাহা দ্বারা বুঝা যায় যে টেবিলের যে স্থানটি ঐ চাপবিন্দুকে উদ্দীপিত করিয়াছে উহা মসৃণ নয়, কিন্তু কর্কশ বা উঁচু নীচু।

এইরূপে দেহাভ্যন্তরীণ স্থাননির্দেশ সাহায্যে বাহ্য স্থাননির্দেশ বা বিক্ষেপণ (প্রোজেক্সন্) প্রত্যক্ষ হয়। টেবিলের ক বিন্দু খ বিন্দুর দক্ষিণে বা বামে অবস্থিত, কারণ উহার স্পর্শ বা দর্শন করিতে ত্বকের বা অক্ষিপটের যে ক' খ' বিন্দু উদ্দীপিত হইয়াছে উহারা একটি অপরটির দক্ষিণে বা বামে অবস্থিত।

কাল-নির্দেশও (লোক্যালাইজেশন্ ইন্ টাইম্) প্রত্যক্ষের একটি অবিচ্ছেদ্য ধর্ম। কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রত্যক্ষ হয় যে বস্তুটির প্রত্যক্ষ বর্তমানে ঘটিয়াছে, যাহা এক মুহূর্ত পুর্বেও ভবিষ্যৎ ছিল এবং মুহূর্ত পরে অতীত হইয়া যাইবে।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেণ্ট্স্ অফ্ সাইকলজি—একাদশ, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
জি এফ্. স্টাউট্—এ ম্যানুয়াল্ অফ্ সাইকলজি—দ্বিতীয় খণ্ড—প্রথম হইতে পঞ্চম পরিচ্ছেদ
উড্ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস্—সাইকলজি—চতুর্দশ, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
বোরিং, ল্যাংফেল্ড্, ওয়েল্ড্—ফাউণ্ডেশনস্ অফ্ সাইকলজি—দশম পরিচ্ছেদ

এম কলিন্‌স্‌, জে. ড্রিভার্‌—এক্সপেরিমেণ্ট্যাল্‌ সাইকলজি—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
ই. বি. টিশ্‌নার্‌—এ প্রাইমার্‌ অফ্‌ সাইকলজি—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
ই. বি. টিশ্‌নার্‌—এ টেক্স্‌ট্‌ বুক্‌ অফ্‌ সাইকলজি—ছিয়াশী অনুচ্ছেদ—পৃঃ ৩০৬—৩১৬
সি. এস্‌ মায়ার্স্‌—এ টেক্স্‌ট্‌ বুক্‌ অফ্‌ এক্স্‌পেরিমেণ্ট্যাল্‌ সাইকলজি—ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

Exercise

1. Explain the process of space perception in general What is the psychological problem of the perception of space ? (pp 492-493)
2. How would a congenitally blind person perceive space ? Discuss (pp 494-497)
3. Explain the tactual perception of space How is filled space, as distinguished from empty space, perceived ? (pp. 494-497)
4. Distinguish between visual and factual perception of space. (pp 497-499)
5. Distinguish between monocular and binocular perception of space. (pp. 499-501)
6. How is solidity perceived ? Explain the stereoscopic vision of solidity (pp 501-503)
7. Distinguish between the original and acquired perception of distance. (pp 503-506)
8. How is an object perceived as single with two eyes ? (pp. 500-501)
9. Why are not objects seen inverted in space ? (pp. 506-507)
10. Distinguish between secondary and primary perception of space (p 508)
11. Write notes on (a) 'Warning sense', (b) Retinal unity and rivalry (pp 509-510)
12. How is body-position perceived ? (pp. 510-511)
13. Explain the perception of movement. (pp. 511-512)
14. Explain the perception of resistance and weight. (pp. 512-513)
15. How are magnitude and form of objects perceived ? (pp. 513-514)
16. Analyse temporal perception. What is the 'specious present' ? (pp. 514-516)
17. Distinguish between perception and apperception. (pp 516-517)
18. Compare the different senses as means of space-perception (pp. 517-518)
19. Write notes on :—(a) Perception of rhythm, (b) Local sign, (c) Localisation. (pp. 516 ; 518-519)

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতিরূপ (ইমেজ্‌)

স্মৃতি প্রতিরূপ ও কল্পনা প্রতিরূপ

১। প্রত্যক্ষ-ফল (পার্সেপ্ট্‌) এবং প্রতিরূপ (ইমেজ্‌)

প্রত্যক্ষফল, প্রতিরূপ এবং কল্পনা

প্রতিরূপের (ইমেজ্‌) সংযোজন বা বিযোজনের ফলে যে মানসবৃত্তি উৎপন্ন হয় তাহাকে কল্পনা (ইমেজিনেশন্‌) বলে। কল্পনা প্রতিরূপের সম্বন্ধ। সুতরাং কল্পনা বুঝিতে হইলে প্রতিরূপ বুঝিতে হয়। সংবেদনের ফলে যেমন প্রত্যক্ষ, তেমন প্রত্যক্ষের ফলে হয় প্রতিরূপ এবং প্রতিরূপের সংযোজন বিযোজন হইতে উৎপন্ন হয় কল্পনা। প্রত্যক্ষের ফল প্রতিরূপের আকারে মনে থাকিয়া যায়। প্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতিরূপগুলিকে সংযুক্ত বা বিযুক্ত করিয়া উহার কল্পনা ঘটে।

সংবেদন, প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ, কল্পনা

সংবেদন উদ্দীপক বস্তুর চেতনামাত্র। ইহার বস্তুগত ভিত্তি সর্বাপেক্ষা স্থূল। সংবেদন অপেক্ষা প্রত্যক্ষ অধিকতর সূক্ষ্ম। আবার কল্পনা প্রত্যক্ষ অপেক্ষা সূক্ষ্ম। কল্পনায় সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মত উপস্থাপিত বিষয় থাকে না, কিন্তু ইহা শুধু পুনরুপস্থাপিত প্রতিরূপের (ইমেজ্‌) মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ঘটে।

প্রত্যক্ষ-ফল (পার্সেপ্ট্‌) কাহাকে বলে

প্রত্যক্ষের ফলকে বলে প্রত্যক্ষ-ফল (পার্সেপ্ট্‌)। **প্রত্যক্ষ শেষ হইয়া গেলে উহার যে ফল উৎপন্ন হয় তাহাই প্রত্যক্ষ-ফল।** যেমন, নীল ফুলের প্রত্যক্ষে, প্রত্যক্ষ নীল ফুলটিই ইহার প্রত্যক্ষ-ফল। অতীত-প্রত্যক্ষ বস্তুকে আবার প্রত্যক্ষ করিলে বস্তুটি পরিচিত বলিয়া জ্ঞাত হয়, কারণ ইহাতে যে অতীত প্রত্যক্ষ-ফল প্রতিরূপের আকারে মনে রহিয়াছে, তাহার স্মরণ ঘটে এবং প্রত্যক্ষ বস্তুটি যে নূতন নয়, কিন্তু অতীতে প্রত্যক্ষ বস্তুটির সদৃশ, এইরূপ অস্পষ্ট স্মরণ (ইম্‌প্লিকেট্‌ মেমরি) হয়।

প্রতিরূপ কাহাকে বলে

প্রত্যক্ষ ফলের (পার্সেপ্ট্) রেখা (ট্রেস্), ছায়াপাত (ইম্প্রেশন্) বা নকলকে (কপি) প্রতিরূপ (ইমেজ্) বলে। প্রত্যক্ষ শেষ হইয়া গেলেও প্রত্যক্ষ বিষয় উহার প্রতিরূপ মনে রাখিয়া যায়। প্রতিরূপ প্রত্যক্ষফলের আসল রূপ নয়, কিন্তু উহার ভাসমান রূপ।

২। প্রত্যক্ষ ফল এবং প্রতিরূপের মধ্যবর্তী স্তর অথবা প্রত্যক্ষ ফলের প্রতিরূপে পরিণতি (ট্র্যান্‌জিশন্ ফ্রম্ পার্সেপ্ট্ টু ইমেজ্)

প্রত্যক্ষফল ও উহার প্রতিরূপের মধ্যবর্তী কতগুলি স্তরকে প্রত্যক্ষফল বা প্রকৃত প্রতিরূপ, কোনোটিই বলা যায় না। ইহারা এই দুইটির মধ্যবর্তী অবস্থা বা স্তর। একটি রং দেখিলাম, শব্দ শুনিলাম, কোনো বস্তুর স্পর্শ, গন্ধ বা স্বাদ গ্রহণ করিলাম। এই এই প্রত্যক্ষের ফলগুলি প্রতিরূপের আকারে মনে সংরক্ষিত হইবার পূর্বে নিম্নলিখিত স্তরসকল অতিক্রম করে :

(১) অনুসংবেদন (আফ্‌টার্ সেন্‌সেশন্) বা অনুপ্রতিরূপ (আফ্‌টার্ ইমেজ্)[১]

সংবেদন বা প্রত্যক্ষের উদ্দীপক বিষয় অপসৃত হইবার পরও, উহার প্রতিক্রিয়া কিছুক্ষণ চলিতে থাকে। যেমন একটি রং দেখা বা শব্দ শোনা শেষ হইলেও, চক্ষু বা কর্ণের উপর উহার প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। এই প্রতিক্রিয়ার নাম অনু-সংবেদন (আফ্‌টার্-সেন্‌সেশন্) বা অনু-প্রতিরূপ (আফ্‌টার্ ইমেজ্)।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে অনুসংবেদনের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। অনুসংবেদন উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে ঘটে। সুতরাং ইহা সংবেদন নয়। আবার ইহা প্রতিরূপও নয়, কারণ ইহা সংবেদনের শক্তির ফলেই স্বতঃবৃত্তভাবে ঘটিয়া থাকে।

(২) পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ (রেকারেন্ট্, রেসিলিয়েন্ট্ ইমেজ্)

পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের মধ্যবর্তী দ্বিতীয় স্তর। একটি সুর থামিয়া যাইবার পরও যেন থাকিয়া থাকিয়া কানে বাজিয়া ওঠে।

---

১ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

একখানি সুন্দর মুখ দেখিবার পরও যেন উহা থাকিয়া থাকিয়া চোখে ভাসিয়া ওঠে বা মনে পড়ে। **প্রত্যক্ষ বস্তু তিরোহিত হইবার পর এইরূপ বার বার উহা যে আকারে মনে পড়ে তাহার নাম পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ।**

অনুসংবেদনের সহিত পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের পার্থক্য

অনুসংবেদনের সহিত পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের পার্থক্য এই যে প্রথমটি অবিরাম বা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি মনে হয় থাকিয়া থাকিয়া, সবিরাম বা বিচ্ছিন্নভাবে। অনুসংবেদনের আবির্ভাব ও তিরোভাব স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না, কিন্তু পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হয়, কারণ প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টিতে আবির্ভাব ও তিরোভাবের সময় ব্যবধান বেশী। দ্বিতীয়তঃ, অনুসংবেদনের তুলনায় পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ আসল প্রতিরূপের দিকে আর একটি ধাপ অগ্রসর হয়। তৃতীয়তঃ, অনুসংবেদন পশ্চাদ্‌ভূমির উপর ফুটিয়া ওঠে, কিন্তু পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ পশ্চাদ্‌ভূমির উপর ফুটিয়া ওঠে না। অনুসংবেদন পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের তুলনায় অধিক উদ্দীপকসাপেক্ষ এবং মন-নিরপেক্ষ।

উড্‌ওয়ার্থ পূর্বে মনে করিতেন[১] যে পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের মূলে রহিয়াছে উহার ভাসিয়া ওঠার (র‍্যাযেন্‌সি) প্রবণতা বা অধ্যবসায় শক্তি (পার্সিভারেশন্)। অবশ্য উড্‌ওয়ার্থ্ এই প্রবণতাকে পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ বলিয়া অভিহিত করেন নাই। তাঁহার "সাইকলজি" গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণে এই মতবাদের উল্লেখ নাই।

(৩) প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ (প্রাইমারি মেমরি ইমেজ্)

প্রত্যক্ষ এবং আসল প্রতিরূপের মধ্যবর্তী শেষ স্তরটিকে বলা হয় প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ (প্রাইমারি মেমরি ইমেজ্)। বাস্তবে ইহা প্রতিরূপই বটে, অথচ ইহাকে আসল প্রতিরূপও বলা যায় না। শেষ হইয়া যাইবার পরও, প্রত্যক্ষের যে রেখা বা ছায়াপাত মনে সংরক্ষিত হয়, অথচ যাহা আপনা আপনি স্মরণপথে আসে এবং যাহা স্মরণ করিতে ঐচ্ছিক চেষ্টার দরকার হয় না, এইরূপ প্রতিরূপকে বলে প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ। একটি ভার তুলিবার

১ আর্ এস্ উড্‌ওয়ার্থ্—সাইকলজি (ত্রয়োদশ সংস্করণ)—পৃঃ ৩৪২

ঠিক পরক্ষণে আর একটি ভার তুলিয়াই বুঝা গেল যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় বেশী হাল্কা বা ভারী। দ্বিতীয় ভারটির বেশী হাল্কা বা ভারী বলিয়া প্রত্যক্ষে প্রথম ভারটির ওজনপ্রত্যক্ষের প্রতিরূপ অবশ্যই সাহায্য করে। অথচ এই প্রতিরূপ কোনো ঐচ্ছিক চেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া, স্বয়ং মনে আসে।

প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ অনুসংবেদন নয়, কারণ ইহা অবিরামভাবে অথবা অল্প বিরামের ব্যবধানে পুনঃপুনঃ প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা এবং সজীবতা লইয়া ঘটে না। আবার ইহা পৌনঃপুনিক প্রতিরূপও নয়, কারণ উদ্বোধক বা স্মরণ-সূত্রের সাহায্য না লইয়া বা অধ্যবসায়ের বেগ লইয়া ইহা পুনঃপুনঃ মনে উদিত হয় না। প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ একটি মানস-ব্যাপার এবং ইহা ঘটে প্রত্যক্ষের ঠিক পরেই। ইহা মনে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয় না। অনুসংবেদন এবং পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের মত ইহাও একটি ক্ষণিক বা অস্থায়ী অবস্থা। প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপের এই দিকটি মনে রাখিলে ইহার সহিত আসল বা প্রকৃত স্মৃতি-প্রতিরূপের (মেমরি ইমেজ্) ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

(৪) প্রকৃত স্মৃতি-প্রতিরূপ (মেমরি ইমেজ্ প্রপার্)

আসল স্মৃতি-প্রতিরূপ (মেমরি ইমেজ্ প্রপার্) এই ক্রমিক স্তরের শেষ পরিণতি। অনুসংবেদন, পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ এবং প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ, এই তিনটি স্তর, প্রত্যক্ষ হইতে প্রকৃত স্মৃতি-প্রতিরূপ পর্যন্ত ধারাবাহিক পরিণতির বিভিন্ন পর্যায় বা অবস্থা। এই ক্রমিক পরিণতিতে প্রত্যক্ষের বস্তুগত ভিত্তি ক্রমশঃ কমিতে কমিতে একেবারে দূরীভূত হয় স্মৃতি-প্রতিরূপে। পূর্ব পূর্ব স্তরগুলিতে উদ্দীপক ও প্রতিরূপের ন্যূনাধিক্য বর্তমান। অনুসংবেদনে উদ্দীপকের প্রভাব প্রতিরূপ অপেক্ষা বেশী। আবার প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপে প্রতিরূপের প্রভাব উদ্দীপক অপেক্ষা বেশী এবং স্মৃতি-প্রতিরূপে প্রত্যক্ষের উদ্দীপক নাই বলিলেই চলে, আছে শুধু প্রতিরূপ এবং প্রতিরূপকে উদ্বুদ্ধ করিবার মত স্মরণসূত্র (কিউ) অথবা অভিভাবীয় শক্তি (সাজেস্টিভ্ ফোর্স্)।

যে পাঠটি অতীতে তৈয়ারী করা হইয়াছিল, আজ তাহা স্মরণ করা হইতেছে। এই স্মরণক্রিয়ার মূল অবলম্বন হইল পাঠ বা শিক্ষার প্রতিরূপ, যাহা ঐ ক্রিয়া সাঙ্গ হইবার পর মনে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। পাঠটি স্থূলভাবে, অথবা সশরীরে মনে থাকিতে পারে না। নিশ্চয়ই উহা মনে সংরক্ষিত ছিল

পঠিত বিষয়ের প্রতিরূপ রূপে। শিক্ষক মহাশয় পাঠটি আবৃত্তি করিতে বলিলেন। এই আদেশ বা জিজ্ঞাসাই অভিভাবীয় উদ্দীপক (সাজেষ্টিভ্ ষ্টিমুলাস্) যাহা স্মরণক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ বা জাগ্রত করিয়া দিল এবং পাঠের কোনো অংশ হয়ত বিনা চেষ্টায়, আবার কোনো অংশ বিশেষ চেষ্টায় মনে পড়িল।

তাহা হইলে প্রতিরূপ প্রত্যক্ষের সেই রূপ, যাহা উহার নকলের মত মনে সংরক্ষিত হইয়া পরবর্তী চেষ্টার ফলে পুনরুজ্জীবিত (রিভাইভ্ড্) হয়।

৩। আইডেটিক্ প্রতিরূপ (আইডেটিক্ ইমেজ্)

জার্মানীর মার্‌বুর্গ্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ সাইকলজি-এর বিখ্যাত মনোবিৎ ই. আর্. যেনেশ্ এবং তাঁহার সম্প্রদায় এক প্রকার নূতন প্রতিরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা এই প্রতিরূপের নামকরণ করিয়াছেন আইডেটিক্ প্রতিরূপ। ইহা প্রধানতঃ দর্শন প্রতিরূপের আকারেই ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ বারো হইতে চৌদ্দবর্ষীয় বালক-বালিকারা আইডেটিক্ প্রতিরূপ-প্রবণ। আইডেটিক্-প্রতিরূপ-প্রবণতা কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে।

কোনো বস্তু বা ছবিতে আধ মিনিট চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া চক্ষু বুজিলে, অথবা কোনো ধূসর পশ্চাদ্‌ভূমিতে তাকাইলে, আইডেটিক্ প্রতিরূপ-প্রবণ বালক-বালিকারা ঐ বস্তু বা ছবিটিকে অবিকলভাবে দেখিতে পায়। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির দিক দিয়া এই প্রতিরূপকে দৃষ্ট বস্তু বা ছবির হুবহু নকল বলিয়া মনে হয়। ইহার স্পষ্টতা ও সজীবতা মূল প্রত্যক্ষেরই মত।

বস্তু নাই, অথচ বস্তুটি দেখা যাইতেছে, এমন অভিজ্ঞতাকে অমূল প্রত্যক্ষ (হ্যালিউসিনেশন্) বলে কিন্তু আইডেটিক্ প্রতিরূপ অমূল প্রত্যক্ষ নয়, কারণ ইহাতে প্রতিরূপের অবাস্তবতা বা অলীকতা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে, যাহা অমূল প্রত্যক্ষে থাকে না। আইডেটিক্ প্রতিরূপে বস্তুর নকলের অবিকলতা (ফটোগ্রাফিক্ ফাইডেলিটি) থাকিলেও, বাস্তবতাবোধ নাই। যেনেশ্ ইহাকে বলিয়াছেন তথাকথিত অমূল প্রত্যক্ষ (সিউডো-হ্যালিউসিনেশন্)।

আইডেটিক্-প্রতিরূপ-প্রবণ ব্যক্তিকে যেনেশ্ বলেন আইডেটিক্ ব্যক্তি (আইডেটিক্ ইন্‌ডিভিজুয়্যাল্)। তিনি আইডেটিক্ প্রবণতাকে ব্যক্তিত্বের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিত্বের অনেকগুলি জাতিরূপ (টাইপ্‌স্) নির্ণয় করিয়াছেন। যেমন টি-টাইপ অথবা টিটানয়েড এবং বি-টাইপ অথবা বেজ্-

ডউঅয়েড্ ব্যক্তিত্বের দুইটি প্রধান জাতিরূপ। এই বিশুদ্ধ জাতিরূপ দুইটি ছাড়া তিনি আরও কয়েকটি জাতিরূপও নির্ণয় করিয়াছেন।[১]

আইডেটিক্ প্রতিরূপের সহিত অন্যান্য প্রতিরূপের তুলনা

আইডেটিক্ প্রতিরূপের সহিত প্রত্যক্ষ ও প্রতিরূপের মধ্যবর্তী স্তরগুলির পার্থক্য রহিয়াছে। আইডেটিক্ প্রতিরূপকে অনুসংবেদন বলা যায় না। অনুসংবেদন একটি সার্বভৌম এবং ব্যাপক ঘটনা—আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই অনুসংবেদন ঘটে। কিন্তু আইডেটিক্ প্রতিরূপ প্রধানতঃ চৌদ্দ বৎসরের কমবয়স্ক বালক-বালিকাদেরই ঘটে। সবর্ণ অনুসংবেদন উহার বিপরীত অসবর্ণ অনুসংবেদনে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু আইডেটিক্ প্রতিরূপে এইরূপ ঘটে না।

আইডেটিক্ প্রতিরূপের সহিত পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের পার্থক্যও স্পষ্ট। দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথমটি অবিরাম বা ছেদহীন। তাহা ছাড়া, অনুসংবেদন এবং পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের সহিত আইডেটিক্ প্রতিরূপের আর একটি পার্থক্য এই যে প্রথম দুইটি তৃতীয়টির তুলনায় ব্যাপক, কারণ তৃতীয়টি শুধু চাক্ষুষ প্রতিরূপেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রথম দুইটি যে কোনো সংবেদনে ঘটে।

আইডেটিক্ প্রতিরূপ অনেকটা প্রাথমিক স্মৃতি প্রতিরূপের অনুরূপ। কিন্তু এই দুইটির পার্থক্যও উপেক্ষণীয় নয়। প্রথমটি চাক্ষুষ প্রতিরূপে সীমাবদ্ধ, কিন্তু দ্বিতীয়টি যে কোনো প্রতিরূপ সম্পর্কেই ঘটিতে পারে। তাহা ছাড়া, দ্বিতীয়টি নকলের বিশ্বস্ততা (ফটোগ্রাফিক্ ফাইডেলিটি) লইয়া প্রত্যক্ষ হয় না এবং উহার মধ্যে প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা ও সজীবতা নাই।

আবার আইডেটিক্ প্রতিরূপকে স্মৃতি-প্রতিরূপও বলা যায় না। স্মৃতি-প্রতিরূপ প্রত্যক্ষের মত স্পষ্ট ও সজীব বা অবিকল। দ্বিতীয়তঃ, প্রথমটি আপনা আপনি ঘটে, কিন্তু দ্বিতীয়টিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হয়।

উপসংহার

মোটের উপর, আইডেটিক্ প্রতিরূপ একটি সাময়িক এবং বয়ঃসন্ধিক্ষণের ঘটনা। ইহাতে উপরোক্ত প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের মধ্যবর্তী স্তরগুলির মত

১ এই বিষয়টি ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের তিন (ছ) অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

ব্যাপকতা বা সার্বভৌমতা নাই। তাহা ছাড়া, ইহা চাক্ষুষ প্রতিরূপকে আশ্রয় করিয়া ঘটে। কিন্তু উপরোক্ত স্তরগুলি যে কোনো ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্কিত হইতে পারে। তাহা ছাড়া, আইডেটিক্ প্রতিরূপকে অন্য জাতীয় প্রতিরূপে পরিণত করা যায় না।

৪। প্রত্যক্ষ ফল ও প্রতিরূপ (পার্সেপ্ট্ অ্যাণ্ড্ ইমেজ্)

উহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

প্রত্যক্ষ ও প্রতিরূপের সম্বন্ধ অতি নিকট। প্রতিরূপ প্রত্যক্ষেরই রেখা বা ছায়াপাত। যে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় নাই তাহার প্রতিরূপও নাই। সুতরাং প্রতিরূপ প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। আবার প্রত্যক্ষও প্রতিরূপের অপেক্ষা রাখে। প্রত্যক্ষের অঙ্গীভূত সদৃশীকরণ, পৃথকীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়া প্রতিরূপের সাহায্যে ঘটে।

প্রত্যক্ষফল ও প্রতিরূপের পার্থক্য

কিন্তু প্রত্যক্ষফল ও প্রতিরূপের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইলেও, ইহাদের পার্থক্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

স্পষ্টতা ও তীব্রতা

(১) প্রত্যক্ষ ফল সজীব ও স্পষ্ট জ্ঞান। ইহা এইরূপ স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হয় যে উহার বাস্তবতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে না। পক্ষান্তরে, প্রতিরূপ ক্ষীণ ও অস্পষ্ট জ্ঞান। প্রতিরূপ বাস্তবতার ছাপ লইয়া প্রত্যক্ষ হয় না। উহার সজীবতা এবং স্পষ্টতা প্রত্যক্ষ টেবিলের তুলনায় নাই বলিলেই চলে।

হিউম্-এর মত

তাহা হইলে তীব্রতা (ইন্টেন্সিটি), স্পষ্টতা (ভিভিড্নেস্) এবং সজীবতার (লাইভ্লিনেস্) দিক হইতে প্রতিরূপ প্রত্যক্ষের তুলনায় নিকৃষ্ট। হিউম্-এর মতে প্রতিরূপ এবং প্রত্যক্ষফলের পার্থক্য শুধু তীব্রতার পরিমাণগত পার্থক্য। তিনি বলেন যে প্রতিরূপ প্রত্যক্ষের একটি ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া মাত্র। উহারা আসলে একজাতীয় মানসবৃত্তিরই যথাক্রমে স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট রূপ।

যাহা তীব্র এবং সজীব প্রত্যক্ষরূপে মনকে **আঘাত** করে, তাহাই কম তীব্র বা সজীবভাবে প্রতিরূপের আকারে মনে জাগে।

স্টাউট্ কর্তৃক হিউম্-এর সমালোচনা

মনোবিৎ স্টাউট্, হিউম্-এর মত গ্রহণ করেন নাই। স্টাউট্-এর মতে প্রত্যক্ষ ও প্রতিরূপের পার্থক্য শুধু পরিমাণগত নয়, কিন্তু প্রকারগত। অর্থাৎ, প্রতিরূপ শুধু প্রত্যক্ষের একটি সংস্করণ নয়, কিন্তু ইহা একটি স্বতন্ত্র মানসবৃত্তি। স্টাউট্ দেখাইয়াছেন যে হিউম্ প্রকারান্তরে এই পার্থক্যের ইঙ্গিত করিয়াও ইহা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নাই। হিউম্ বলিয়াছেন যে **প্রত্যক্ষ অপেক্ষাকৃত বেশী সজীব ভাবে মনকে নাড়া দেয়,** কিন্তু প্রতিরূপ মনকে নাড়া দিতে পারে না। প্রদীপের মন্দ আলোক অথবা ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বা মৃদু শব্দ প্রভৃতি ক্ষীণ প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত। আবার বিদ্যুতের তীব্র আলোক অথবা বজ্রাঘাতের উচ্চ শব্দ প্রভৃতি স্পষ্ট প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত। তীব্র বিদ্যুতের প্রতিরূপ হয়ত ক্ষীণ আলোকের প্রত্যক্ষের তুলনায় তীব্র। কিন্তু ক্ষীণ আলোকের প্রত্যক্ষ মনকে যেরূপ নাড়া দিতে পারে তীব্র আলোকের প্রতিরূপ সেইরূপ পারে না।

সুতরাং, প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের পার্থক্যকে শুধু পরিমাণগত পার্থক্য বলা চলে না। প্রতিরূপ প্রত্যক্ষফলের ক্ষীণ সংস্করণ মাত্র নয়।

মনকে অধিকার করিবার ক্ষমতা

(২) দ্বিতীয়তঃ, প্রতিরূপ অপেক্ষা প্রত্যক্ষ স্পষ্টতর। প্রত্যক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু প্রতিরূপের নাই। প্রত্যক্ষ সবলে মনকে অধিকার করে। স্টাউট্এর ভাষায়, প্রত্যক্ষের মনকে 'আক্রমণ' অথবা সবলে অধিকার করিবার (অ্যাগ্রেসিভ্ ক্যারেক্টার্) গুণ আছে। প্রতিরূপের স্বভাবে মনকে অধিকার করিবার অথবা মনোযোগ কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা নাই।

সমগ্রতা—আংশিকতা

(৩) তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ বস্তু একটি সমগ্র বা গোটা বস্তু। টেবিলের প্রত্যক্ষে মোটামুটিভাবে সমগ্র টেবিলটি অথবা টেবিলের কোনো সম্পূর্ণ অংশ জ্ঞাত হয়। পক্ষান্তরে টেবিলটির প্রতিরূপে উহার সমগ্রতা ক্ষুণ্ণ হয়। টেবিলটিকে স্মরণ

করিতে গেলে হয়ত উহার একটি পায়া মনে আসে, অন্য পায়াগুলি মনে আসে না, উহার দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ একটানাভাবে অথবা একটি সম্পূর্ণ ফালি হিসাবে স্মরণ হয় না, কিন্তু স্মরণ হয় কাটা কাটা বা খণ্ডবিখণ্ড টুক্‌রারূপে। দেখা যাইতেছে যে প্রত্যক্ষের তুলনায় প্রতিরূপ আংশিক (ফ্র্যাগ্‌মেণ্টারি)।

ধারাবাহিকতা

(৪) প্রত্যক্ষের একটানা ভাব বা ধারাবাহিকতা (কন্‌টিন্যুইটি) প্রতিরূপে নাই। প্রত্যক্ষফল অপেক্ষাকৃত স্থির এবং অচঞ্চল, কিন্তু প্রতিরূপ প্রত্যক্ষের তুলনায় চঞ্চল। প্রতিরূপ নিয়ত দোলায়মান (ফ্লাক্‌চুয়েটিং) এবং হ্রাসবৃদ্ধিসম্পন্ন। অনেক মনোবিৎ, যেমন স্টাউট্, টিশনার্ প্রভৃতি, প্রতিরূপের পরিবর্তনশীলতা এবং চঞ্চলতার (ফ্লোয়িং অ্যাণ্ড্ ফ্লিকারিং ক্যারেক্টার্) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। নীচে (৬)-এর আলোচনায় দেখা যাইবে যে প্রতিরূপকে প্রত্যক্ষের তুলনায় কম চঞ্চলও বলা যাইতে পারে।

মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষমতা

(৫) প্রত্যক্ষ স্বভাবতঃ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ইহাকে স্থিরভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য ঐচ্ছিক মনোযোগের দরকার হয় না। কিন্তু প্রতিরূপ নিয়ত পরিবর্তনশীল। কাজেই, ইহাকে স্থিরভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য ঐচ্ছিক মনোযোগের দরকার হয়।

চঞ্চলতা

(৬) আর এক দিক হইতে প্রত্যক্ষই ক্ষণিক বা চঞ্চল এবং প্রতিরূপ অপেক্ষাকৃত কম ক্ষণিক অথবা চঞ্চল। প্রত্যক্ষ বিষয় বাস্তব জগতের একটি অংশ। ঐ বস্তুটি যে স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়াছে তাহা ত্যাগ করিলেই মনের সহিত বস্তুর যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিষয়ের স্থান ত্যাগ করিলেই উহার প্রতিরূপ নষ্ট হয় না, বরং, মোটের উপর স্থির বা অপরিবর্তিতভাবে মনে সংরক্ষিত থাকে।

অর্থাৎ গতি বা স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ অন্তর্হিত হয় কিন্তু প্রতিরূপ স্থির ও অপরিবর্তিত থাকে।

৫। প্রতিরূপ প্রবণতায় ব্যক্তিভেদ
(টাইপস্ অফ্ ইমেজারি)

চাক্ষুষ, শ্রাবণ এবং চেষ্টীয় প্রতিরূপ-প্রবণতা

প্রতিরূপ গঠনের প্রবণতা সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমান হয় না। এই বিষয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে উল্লেখযোগ্য ভেদ দেখা যায়। ইংরেজ মনোবিৎ ফ্র্যান্সিস্ গ্যাল্‌টন্ প্রতিরূপ-গঠনে ব্যক্তিভেদ সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। তিনি এক শত ব্যক্তির উপর প্রশ্নাবলী পদ্ধতি (কোশ্চেনেয়ার্ মেথড্) প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রাতঃকালীন আহারের টেবিল স্মরণ করিতে গিয়া সকল ব্যক্তি একই জাতীয় প্রতিরূপের সাহায্য লয় না। কোনো ব্যক্তি হয়ত প্রাতরাশ টেবিলের দৃশ্যগুলি, যেমন টেবিলের বা চা-কাপের রং অথবা বিভিন্ন ব্যক্তির চেহারা মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইল। এই ব্যক্তি **চাক্ষুষ-প্রতিরূপ-প্রবণ (ভিসাইল)**, অর্থাৎ তাহার স্মরণ ক্রিয়ায় চাক্ষুষ প্রতিরূপ প্রাধান্য লাভ করে। আবার কোনো ব্যক্তি হয়ত চা-কাপের টুং-টাং শব্দ বা কেট্‌লি হইতে কাপে চা ঢালিবার শব্দ, অথবা প্রাতরাশ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের কণ্ঠস্বর শুনিল। এই ব্যক্তি প্রধানতঃ **শ্রবণ-প্রতিরূপ-প্রবণ (অডাইল)**। আবার কোনো ব্যক্তি হয়ত প্রাতরাশ-টেবিল স্মরণ করিতে গিয়া বয়-এর অথবা অন্যান্য লোকদের ছুটাছুটি, কেট্‌লি হইতে কাপে ঢালিবার কালে চা-এর ধারা প্রভৃতির প্রতিরূপ মনে করিল। এই ব্যক্তি **চেষ্টীয় প্রতিরূপ-প্রবণ (কাইনেস্থেটিক)**।

মিশ্রিত প্রকার (মিক্স্‌ড্ টাইপ্)

ব্যক্তির প্রতিরূপ-প্রবণতা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর, যথা—চাক্ষুষ (ভিসাইল্), শ্রাবণ (অডাইল্) এবং চেষ্টীয় (কাইনেস্থেটিক্)। কিন্তু একটি চতুর্থ প্রকারের প্রতিরূপ-প্রবণতা আছে, এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই এই শ্রেণীভুক্ত। এই চতুর্থ প্রকারের প্রতিরূপ-প্রবণতাকে বলা যায় **মিশ্রিত প্রকার (মিক্স্‌ড্ টাইপ)**। এই ব্যক্তি স্মরণের বিষয়কে দুইটি বা তিনটি প্রতিরূপের সাহায্যে গ্রহণ করে। যেমন, প্রাতরাশের টেবিল টিকল্পনা করিতে গিয়া এই ব্যক্তি চাক্ষুষ, শ্রাবণ এবং চেষ্টীয়, এই সকল রকমের প্রতিরূপই স্মরণ করে, যদিও মিশ্রিত প্রতিরূপ-প্রবণতার মধ্যেও কোনো একটি বিশেষ প্রকারের প্রতিরূপের দিকে অধিক ঝোঁক দেখা যায়।

স্পার্শন, ঘ্রাণীয় এবং স্বাদীয় প্রবণতা আছে কি?

উপরোক্ত চারিটির অতিরিক্ত প্রতিরূপ-প্রবণতা, যেমন স্পার্শন (ট্যাক্-টাইল্), ঘ্রাণীয় (অল্ফ্যাক্টরি) এবং স্বাদীয় (গাস্টেটরি) ভেদও আছে কিনা সেই সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। মোটের উপর ব্যক্তির প্রতিরূপ-প্রবণতার প্রকারভেদ প্রধানতঃ উপরোক্ত চারিটিই।

প্রতিরূপ-প্রবণতার গুরুত্ব

প্রতিরূপ-প্রবণতার ভেদ ব্যক্তির মনোবিকাশের উপর আলোকপাত করে। ব্যক্তির ভবিষ্যৎ পেশা, তাহার শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি প্রতিরূপ-প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চাক্ষুষ প্রতিরূপ-প্রবণ শিক্ষায় চাক্ষুষ সংবেদনের এবং শ্রবণ প্রতিরূপ-প্রবণ শিক্ষায় শ্রবণ সংবেদনের প্রাধান্য থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তির শিক্ষা হইবে দেখিয়া, আবার দ্বিতীয় ব্যক্তির শিক্ষা হইবে প্রধানতঃ শুনিয়া।

৬। প্রতিরূপের আরও কয়েকটি প্রকারভেদ

প্রতিরূপের আরও কয়েকটি প্রকারভেদও উল্লেখযোগ্য।

(১) **সামান্য প্রতিরূপ** (জেনারিক্ ইমেজ্) একই বা সদৃশ বস্তুর সাদৃশ্যগুলির সমবেত প্রতিরূপ। এই প্রক্রিয়াটি অনেকটা সম্মিলিত চিত্রের (কম্পোজিট্ ফটোগ্রাফি) মত। হাসপাতালের রোগীরা কিরূপ তাহা সাধারণভাবে বুঝিতে হইলে সকল রোগীর আকৃতির পার্থক্যগুলি বাদ দিয়া এবং সাদৃশ্যগুলি লইয়া যে সাধারণ বা সম্মিলিত চিত্র (কম্পোজিট্ ফটোগ্রাফ্) গঠিত হয় তাহা সামান্য প্রতিরূপের (জেনারিক্ ইমেজ্) অনুরূপ।[১]

(২) **যুক্ত প্রতিরূপ** (কম্পোজিট্ ইমেজ্) গঠিত হয় একই বা এক-শ্রেণীর ব্যক্তি বা বস্তুর বিভিন্ন প্রতিরূপগুলি মিলিত হইবার ফলে।

(৩) সংবেশিত (হিপ্নোটাইজ্ড্) ব্যক্তির অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় যে প্রতিরূপগুলি অমূল প্রত্যক্ষের মত বস্তুর আকারে ভাসিয়া ওঠে, উহাদিগকে বলে হিপ্নাগোগিক্ ইমেজ্, অথবা **সংবেশিত অবস্থাকালীন প্রতিরূপ**।

(৪) অমূল প্রত্যক্ষের প্রতিরূপ (হ্যালিউসিনেটরি ইমেজ্) বলে সেই প্রতিরূপকে যাহা অমূল প্রত্যক্ষে ভাসিয়া ওঠে এবং সত্য বলিয়া মনে হয়।

১—ত্রিংশ পরিচ্ছেদ—তৃতীয় অনুচ্ছেদ—পৃঃ ৫২০-৫২১ দ্রষ্টব্য

৭। স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপ (মেমরি ইমেজ্ অ্যাণ্ড্ দি ইমেজ্ অফ্ ইমাজিনেশন্)

স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপ—যে প্রতিরূপ অতীত অভিজ্ঞতাকে পরিবর্তিত না করিয়া পুনরুপস্থিত করে তাহাকে **স্মৃতিপ্রতিরূপ** (মেমরি ইমেজ্) বলে। আবার যে প্রতিরূপ অতীত অভিজ্ঞতাকে পরিবর্তিত করিয়া অথবা উহার অংশগুলির পুনর্বিন্যাস করিয়া পুনরুপস্থিত করে তাহাকে বলে কল্পনা-প্রতিরূপ।

স্মৃতিপ্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

সাদৃশ্য

স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপ উভয়ই অতীত প্রত্যক্ষের ফল। যে শিল্পী তাজমহলের ছবি আঁকিতেছেন, তিনি এই হর্ম্যটিকে যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, অবিকল তাহারই পুনরুৎপাদন করিতেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথ তাজমহল সম্বন্ধে তাঁহার কাব্যসৃষ্টিতে উহার এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতিরূপগুলিকে নূতনভাবে সাজাইয়াছেন। তাহা হইলে, কি স্মৃতি-প্রতিরূপ, কি কল্পনা-প্রতিরূপ, ইহারা উভয়ই অতীত অভিজ্ঞতার ফল।

পার্থক্য

স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপের পার্থক্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(১) সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, স্মৃতি-প্রতিরূপ অপেক্ষাকৃত স্থায়ী এবং কল্পনা-প্রতিরূপ অপেক্ষাকৃত ক্ষণিক। এই মতে স্মৃতিপ্রতিরূপ প্রত্যক্ষের হুবহু পুনরুৎপাদন, সুতরাং প্রত্যক্ষের মতই স্থির, এবং কল্পনা-প্রতিরূপ স্বাধীন, সুতরাং উহা অস্থির বা ক্ষণিক।

কিন্তু টিশ্নার্ প্রভৃতি মনোবিৎ মনে করেন যে, এই দুই প্রতিরূপের বাস্তব সম্বন্ধ বিপরীত। ইঁহাদের মতে **স্মৃতিপ্রতিরূপই অস্থির কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপ স্থির**। একটি স্মৃতি-প্রতিরূপ হয়তো এই মাত্র মনে হইল, আবার পরক্ষণেই বিস্মৃত হইল। কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপকে স্থির রাখিয়া শিল্পী ছবি আঁকেন অথবা কবি কাব্য রচনা করেন। সুতরাং কল্পনা-প্রতিরূপ স্থির এবং স্মৃতি-প্রতিরূপ অস্থির।

(২) আবার স্মৃতি-প্রতিরূপ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপ অপেক্ষাকৃত নৈর্ব্যক্তিক। যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বা জানিয়াছি তাহা স্মরণ করিতেছি এইরূপ ব্যক্তিবোধ (পার্স্যোনাল কন্‌সাচনেস্‌) স্মৃতিপ্রতিরূপের কেন্দ্র। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে প্রতিরূপ গ্রহণ করিয়া উহাকে যে নূতনভাবে সাজাইতেছি তাহা ব্যক্তির কল্পনা হইলেও, তাহাতে ব্যক্তিবোধ নাই বলিলেই চলে।

(৩) স্মৃতি-প্রতিরূপের সহিত পরিচিতি-বোধ (ফীলিং অফ্‌ ফেমিলিয়ারিটি) সংযুক্ত থাকে। যে ঘটনাটির স্মরণ হইতেছে তাহা ব্যক্তির পবিচিত ঘটনা। কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপে এইরূপ পরিচিতিবোধ থাকে না।

(৪) স্মৃতি-প্রতিরূপেব অতীত নির্দেশ (রেফারেন্স্‌ টু দি পাস্ট্‌) এবং স্থান-নির্দেশ (লোক্যালাইজেশন্‌) থাকে। এমন কোনো ঘটনার স্মরণ হয় না যাহা নির্দিষ্ট কালে বা স্থানে সংঘটিত হয় নাই। কবে, কোথায়, ঘটনাটি ঘটিযাছিল এই অতীত কাল এবং স্থানের প্রতিরূপ জাগরূক না হইলে এই ঘটনার স্মরণ সম্পূর্ণ হয় না। একটি লোককে দেখিয়াই মনে হইল যেন তাহাকে চিনি। কিন্তু এই লোকটিকে চেনা তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন মনে পড়ে কোথায়, কবে এবং কি উপলক্ষে তাহাকে দেখিয়াছিলাম।

কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপে এইরূপ কোনো কাল বা স্থানের নির্দেশ নাই। ফুল আকাশে ফোটে না, কিন্তু ফুলেব প্রতিরূপকে আকাশের প্রতিরূপের সহিত জুড়িয়া আকাশ-কুসুম কল্পনা সম্ভব। এমনও কল্পনা করা যায়, যখন এই জগতে থাকিব না, তখন ফেলিয়া-যাওয়া বস্তুগুলি হযত এই ভাবে বা অন্য ভাবে থাকিবে। বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, এই তিন কালের প্রতিরূপ চযন করিয়া কল্পনার জাল বোনা যাইতে পাবে। ছাত্র ভবিষ্যৎ পরীক্ষার ফল অথবা অতীতে আরও ভাল পবীক্ষাব ফল এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইলে বর্তমানে তাহার কিরূপ প্রস্তুত হওয়া উচিত তাহা কল্পনা করিতে পারে।

পরস্পর-সাপেক্ষতা

স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপের পার্থক্য চূড়ান্ত নয। সাধারণ অভিজ্ঞতায় উহারা প্রায়ই সংমিশ্রিত থাকে। যাহাকে স্মৃতি-প্রতিরূপ অথবা অতীত প্রত্যক্ষের নকল মনে করা হয়, তাহা প্রায়ই পুনরুৎপাদন ক্রিয়ায কল্পনার প্রভাবে ইতরবিশেষ হইয়া দাঁড়ায়। তোতাপাখীর মত অবিকল আবৃত্তি (রোট্‌ লার্নিং) ছাড়া উন্নত স্তরের স্মরণক্রিয়ায় প্রায়ই নূতন সংগঠন

থাকে। ফলে এই সকল স্মৃতি-প্রতিরূপের সহিত কল্পনা-প্রতিরূপ মিশ্রিত হয়।

আবার কল্পনা-প্রতিরূপেও স্মৃতি-প্রতিরূপের সাহায্য আবশ্যক। উহা অতীত প্রত্যক্ষ হইতে সংগৃহীত হয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা যে স্থানে বা কালে বা অবস্থায় প্রত্যক্ষ হইয়াছিল তাহা হইতে পৃথক স্থানে, কালে বা অবস্থায় কল্পিত হয়। যেমন, মৎস্যদেহের নিম্নাংশ এবং কন্যাদেহের উপরাংশ প্রত্যক্ষ হইয়াছিল যথাক্রমে মৎস্যে এবং কন্যায়। কিন্তু মৎস্যকন্যার (মারমেইড) কল্পনায় এই অংশ বা অবয়বগুলি উহাদের অবয়বী হইতে বিশ্লিষ্ট এবং একটি অপরটিতে সংযোজিত হওয়ায় এমন একটি কল্পিত প্রাণী সৃষ্ট হয় যাহার দেহের নিম্নাংশ মৎস্যের এবং উপরাংশ কন্যার।

৮। স্মৃতি ও কল্পনা (মেমরি অ্যাণ্ড্ ইমাজিনেশন্)

কল্পনা (ইমাজিনেশন্) কথাটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমটি উহার ব্যাপক এবং দ্বিতীয়টি সঙ্কীর্ণ বা যথার্থ অর্থ।

ব্যাপক অর্থ

ব্যাপক অর্থে প্রত্যক্ষলব্ধ প্রতিরূপকে নানাপ্রকারে সম্বদ্ধ করিবার মানস ক্রিয়া অথবা অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবনকেই (রিভাইভ্যাল্) কল্পনা বলে। প্রতিরূপের পুনরুজ্জীবন দুই প্রকারের হইতে পারে, যথা—প্রত্যক্ষের ক্রম ও বিন্যাসের অনুরূপ এবং ভিন্নরূপ ক্রম এবং বিন্যাসে।

পূর্ব-পঠিত পাঠের পুনরাবৃত্তিতে প্রতিরূপগুলি পর পর মনে জাগিতে পারে। এই স্মরণক্রিয়ায় পঠিত বস্তুকে ঠিক যে ক্রমে অথবা পূর্বাপর সম্বন্ধে যেমন ভাবে শিখিয়াছিলাম ঠিক সেই ক্রমে অথবা পূর্বাপর সম্বন্ধে তেমনভাবে পুনরুজ্জীবিত বা পুনরুৎপন্ন করিতেছি। **অনুভূত বিষয়ের হ্রাসবৃদ্ধি অথবা অদলবদল না করিয়া উহার প্রতিরূপগুলিকে যথাক্রমে পুনরুৎপন্ন বা পুনরুজ্জীবিত করাকে স্মরণক্রিয়া বলে।** ব্যাপক অর্থে স্মরণও কল্পনা।

সঙ্কীর্ণ অর্থ

সঙ্কীর্ণ অর্থে কল্পনা বলিতে বুঝায় সেই মানসক্রিয়া যাহাতে পূর্ব-প্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতিরূপগুলি পুনরুৎপন্ন বা পুনরুজ্জীবিত হইলেও পূর্ব ক্রম, বিন্যা

অথবা অবস্থায় হয় না, কিন্তু নূতন ক্রম, বিন্যাসে অথবা অবস্থায় হইয়া থাকে। যেমন-পূর্ব-পঠিত পাঠটি শুধু যে ভাবে শিখিয়াছিলাম ঠিক সেইভাবেই উহার প্রতিরূপগুলিকে পুনরুৎপন্ন না করিয়া নূতন ক্রম, বিন্যাস বা অবস্থায় পুনরুৎপন্ন করিয়া নূতন বস্তু গঠন করার নাম কল্পনা। তাজমহল ঠিক যেমনটি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ঠিক তেমনটি উহার প্রত্যক্ষলব্ধ প্রতিরূপগুলিকে পুনরুজ্জীবিত না করিয়া, অন্যভাবে অথবা উহাদের সম্বন্ধের অদলবদল করিয়া কিছু নূতন সৃষ্টির আকারে পুনরুজ্জীবিত করার নাম কল্পনা। যেমন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শা-জাহান কবিতায় তাজমহল সম্বন্ধে নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন তাজমহল, শা-জাহান এবং মমতাজের প্রতিরূপগুলিকে নানাভাবে সংযোজিত করিয়া।

তাহা হইলে উপরোক্ত দুইটি প্রকারভেদ অনুসারে কল্পনা দুই প্রকার, যথা—পুনরুৎপাদনমূলক কল্পনা (রিপ্রডাক্টিভ্ ইমাজিনেশন্) এবং গঠনমূলক কল্পনা (কন্স্ট্রাক্টিভ্ ইমাজিনেশন্)। কল্পনার এই ব্যাপকতাকে সঙ্কুচিত করিয়া প্রথমটিকে বলা হয় স্মৃতি (মেমরি) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় কল্পনা (ইমাজিনেশন্)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে স্মৃতির বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

মেলোন অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেন্টস্ অফ্ সাইকলজি—দ্বাদশ, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জি এফ্. স্টাউট্—এ ম্যানুয়াল্ অফ্ সাইকলজি—১ম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উড্ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস্—সাইকলজি—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

উড্ওয়ার্থ " (ত্রয়োদশ সংস্করণ) দশম পরিচ্ছেদ

বোরিং, ল্যাংফেল্ড্, ওয়েল্ড্—ফাউণ্ডেশন্স্ অব্ সাইকলজি—নবম পরিচ্ছেদ

এম্ কলিন্স্ অ্যাণ্ড্ জে. ড্রিভার—এক্সপেরিমেণ্টাল্ সাইকলজি—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ই বি টিশ্নার—এ প্রাইমার অফ্ সাইকলজি—সপ্তম পরিচ্ছেদ

" —এ টেক্সট্বুক্ অফ্ সাইকলজি—১১২ এবং ১১৮ অনুচ্ছেদ

Exercise

1 Define percept and image. Explain their relation (pp 521-522)

2. Explain the stages in the transition from percept to image. (pp. 522-525)

3 Distinguish between after-image, recurrent image, primary memory image and memory image proper. (pp. 522-525)

4 What is the Eideic Image? How does it differ from other images? Why is it called pseudo-hallucination? (pp. 525-527)

5. Distinguish between percept and image. Do they differ in degree or in kind ? (pp. 527-529)
6. What are the main image-types ? How does an individual differ from other individuals in the power of forming images ? (pp. 530-531)
7. Write notes on (a) Generic image, (b) composite photography, (c) composite image, (d) hypnagogic image and (e) hallucinatory image. (pp. 531)
8. Distinguish between memory image and the image of imagination (pp 532-534)
9. Is it true that the memory image is fixed, while the image of imagination is flowing and flickering ? (p 532)
10. Distinguish between memory and imagination. In what sense is memory also called imagination ? (pp. 534-535)

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

স্মৃতি (মেমরি)

১। স্মৃতি কাহাকে বলে?

স্মৃতি ও স্মরণ

কল্পনা দুই প্রকার, যথা—পুনরুৎপাদনমূলক কল্পনা এবং গঠনমূলক কল্পনা। যে কল্পনায় অতীত প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলি অবিকলভাবে পুনরুৎপন্ন হয়, তাহাকে বলে পুনরুৎপাদনমূলক কল্পনা (রি-প্রডাকৃটিভ্ ইমাজিনেশন্) বা স্মৃতি। যেমন "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" লাইনটি যেমন শেখা হইয়াছিল, ঠিক তেমনভাবেই উহা মনে করিবার নাম উহার স্মৃতি। অতীতে প্রত্যক্ষ বা অনুভূত বস্তুর যথাসম্ভব অবিকল পুনরুৎপাদনের **ক্ষমতাকে** স্মৃতি (মেমরি) এবং এই **ক্রিয়াকে** স্মরণ (রিমেম্বারিং, রিকলিং) বলা হয়।

স্মৃতি এবং স্মরণ আবার নির্ভর করে শিক্ষা (লার্নিং), শিক্ষালব্ধ বিষয়ের সংরক্ষণ বা ধৃতি (রিটেন্শন্), পুনরুৎপাদন (রিপ্রডাক্শন্, রি-কল) প্রভৃতি ক্রিয়ার উপর।

২। স্মৃতির অঙ্গ (ফ্যাক্টর্‌স্ অফ্ মেমরি)

স্মৃতির বিশ্লেষণ

স্মৃতি কতগুলি অঙ্গ বা অংশ লইয়া গঠিত। স্মৃতির অঙ্গ প্রধানতঃ চারটি, যথা—**ধৃতি বা ধারণ** (রিটেন্শন্), **পুনরুৎপাদন,** পুনরুজ্জীবন বা পুনরুদ্বোধন (রি-প্রডাক্শন্, রি-কল্, রিভাইভ্যাল্), **পুনর্জ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞা** (রি-কগ্‌নিশন্) এবং **স্থান-কাল নির্দেশ** (লোক্যালাইজেশন্)।

শিক্ষণ স্মৃতির অঙ্গ কিনা

উড্ওয়ার্থ্ প্রভৃতি মনে করেন যে শিক্ষণ বা অভিজ্ঞতার্জন (লার্নিং) স্মৃতির প্রথম অঙ্গ, কারণ অতীত প্রত্যক্ষ বা শিক্ষণ সাহায্যে অর্জিত অভিজ্ঞতাই প্রতিরূপ সাহায্যে স্মৃত হয়। কিন্তু এই মত যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। শিক্ষণ প্রধানতঃ সংবেদন, প্রত্যক্ষ, অনুভূতি, আকর্ষণ প্রভৃতির প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। ইহা স্মৃতির ভিত্তিমূল হইলেও, স্মৃতির অঙ্গ নয়। যদি বলা হয় যে, যেহেতু শিক্ষণ না হইলে স্মৃতি সম্ভব হয় না, সুতরাং ইহা স্মৃতির অংশ বা অঙ্গ, এই যুক্তি সঙ্গত

বলিয়া মনে হয় না। কারণ অনুরূপ যুক্তিসাহায্যে বলা যায় যে, যেহেতু সংবেদন, প্রত্যক্ষ প্রভৃতির সাহায্য ছাড়া স্মৃতি ঘটে না, সুতরাং উহারাও স্মৃতির অঙ্গ। অতএব **শিক্ষণকে স্মৃতির অংশ বা অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা ঠিক বলিয়া মনে হয় না।**

(১) ধৃতি বা ধারণ (রিটেন্‌শন্)

সংবেদন, শিক্ষণ, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি মনের সংগ্রাহক (অ্যাকুইজিটিভ্) বৃত্তি। ইহাদের সাহায্যে মন নূতন নূতন জ্ঞান আহরণ করে। এই আহৃত জ্ঞান লব্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া গেলে, জ্ঞানের বৃদ্ধি বা বিকাশ সম্ভব হয় না। ইহা মনে ধৃত বা সংরক্ষিত (রি-টেইন্‌ড্, প্রিজার্ভ্‌ড্) থাকিলেই উহার ভিত্তিতে উচ্চতর জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। ধৃতি, ধারণ বা সংরক্ষণ (রি-টেন্‌শন্) মনের এই সংরক্ষণমূলক শক্তি।

যাহাই চেতনাকে স্পর্শ করে তাহাই মনের উপর রেখাপাত করে। এই রেখাপাত (ইম্‌প্রেশন্) প্রতিরূপের (ইমেজ্) আকারে মনে ধৃত বা সংরক্ষিত থাকে। কোনো উদ্দীপক-অবস্থা ঘটিলেই এই সংরক্ষিত প্রতিরূপ পুনরুৎপন্ন হয়, যাহার ফলে স্মৃতি ঘটিয়া থাকে। যেমন, মনোবিদ্যার এই অনুচ্ছেদটি লিখিতে গিয়া পূর্ব-আলোচিত তথ্যগুলির পর পর স্মরণ হইতেছে বলিয়াই লেখা অগ্রসর হইতেছে। এই তথ্যগুলি প্রতিরূপের আকারে হয় নাই, কিন্তু ধৃত বা সংরক্ষিত হইয়া মনে অবস্থান করিতেছে। প্রত্যেকটি পূর্বলিখিত কথা পরবর্তী কথাগুলিকে উদ্দীপিত করিবার ফলে স্মরণ-ক্রিয়া সম্ভব হইতেছে।

(২) পুনরুৎপাদন বা পুনরুদ্দীপন (রি-প্রডাক্‌শন্, রি-কল্)

কিন্তু প্রতিরূপগুলি শুধু মনে সংরক্ষিত থাকিলেই স্মরণক্রিয়া সম্ভব হয় না। নানা অভিজ্ঞতার ফলে নানা প্রতিরূপই তো মনে রহিয়াছে। যে বিষয়টিকে স্মরণ করিতে হইবে তাহার প্রতিরূপগুলিকে উহাদের সংরক্ষিত বা অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত বা প্রকাশিত করা দরকার। মনে সংরক্ষিত অব্যক্ত প্রতিরূপ ব্যক্ত করাকে বলে পুনরুৎপাদন, পুনরুদ্দীপন বা পুনরুজ্জীবন (রি-প্রডাক্‌শন্, রি-ভাইভ্যাল্, রি-কল্)।

পুনরুৎপাদন সম্ভব হয় কোনো উদ্দীপক (ষ্টিমুলাস্), সূত্র (কিউ) বা অভিভাবের (সাজেশন্) সাহায্যে। উদ্দীপক প্রতিরূপগুলিকে অতীত

অভিজ্ঞতার ক্রম, সম্বন্ধ, বিন্যাস প্রভৃতি অনুযায়ী পুনরুপস্থাপিত করে। যে সম্বন্ধের জন্য উদ্দীপক অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলিকে পুনরুপস্থাপিত করিতে পারে তাহাকে বলা হয় অনুষঙ্গ (অ্যাসোসিয়েশন্)।

(৩) পুনর্জ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞা (রি-কগ্‌নিশন্)

পূর্ব-অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিরূপগুলিকে ধারণ বা সংরক্ষণ এবং পুনরুৎপাদন করাই স্মরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে বিষয়টি পূর্ব অভিজ্ঞতায় জ্ঞাত হইয়াছিল, পুনরুৎপন্ন প্রতিরূপ যে উহারই প্রতিরূপ এই পুনর্জ্ঞানও স্মৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। অর্থাৎ স্মৃতি বা স্মরণকে সম্ভব করিতে হইলে উহার প্রতিরূপকে কোনো পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের প্রতিরূপ বলিয়া চিহ্নিত করা অথবা পুনরায় জানা চাই। যে বিষয়টিকে পূর্বে জানা হইয়াছিল তাহাই পুনর্বার জ্ঞাত হইতেছে, এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে স্মৃতি বা স্মরণ সম্ভব হয় না।

পুনর্জ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞা (রি-কগ্‌নিশন্) ছাড়া স্মরণক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। হয়ত পূর্বজ্ঞাত বিষয়টি ঠিকমতই পুনরুৎপন্ন হইল, অথচ উহাকে পূর্বজ্ঞাত বলিয়া চিনিতে পারা গেল না, অথবা যে বস্তুটিকে পুর্বে জানিয়াছিলাম সেই বস্তুটিকেই পুনরায় জানিতেছি বা স্মরণ করিতেছি, এই আকারের পুনর্জ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞা ঘটিল না। এইরূপ ক্ষেত্রে পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের পুনরুদ্দীপন হওয়া এবং না হওয়া সমান হইয়া দাঁড়াইল।

সুতরাং পুনর্জ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞা স্মরণের অপরিহার্য অঙ্গ।

(৪) স্থান-কাল নির্দেশ (লোক্যালাইজেশন্)

কোনো বস্তুর প্রত্যভিজ্ঞায় উহার প্রতিরূপটি যে উহারই প্রতিরূপ, এই প্রকার বোধ অনিবার্য। প্রতিরূপের স্থানকাল নির্দেশ (লোক্যালাইজেশন্) না হইলে এই আকারের প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হয় হয় না। শুধু সংরক্ষিত বস্তুর প্রতিরূপ পুনরুৎপন্ন হইলেই হইল না। বস্তুটি কোথায়, কবে অথবা কখন জ্ঞাত হইয়াছিল সেই স্থান-কাল জ্ঞানেরও পুনরুৎপাদন হওয়া চাই। স্থান-কাল-নির্দেশসহ বস্তুর পুনরুজ্জীবন না ঘটিলে উহার পরিচিতি-বোধ (ফীলিং অফ্ ফেমিলিয়ারিটি), যাহাকে টিশ্‌নার্ প্রত্যভিজ্ঞার প্রাণ বলিয়াছেন, তাহা ঘটে না। দূর হইতে একটি লোককে দেখিয়া তাহাকে যেন চিনি বা জানি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু **যেন** চিনি বা জানি, এই সংশয়মিশ্রিত প্রত্যভিজ্ঞা

নিশ্চিত জ্ঞান নয়। এই জ্ঞান নিশ্চিত হয় তখনই, যখন ঐ লোকটিকে কোন্ স্থানে কবে বা কোন্ সময় দেখিয়াছিলাম তাহা নির্দিষ্ট হয়। এই দৈশিক ও কালিক নির্দেশ ঘটিলেই **যেন** চিনি এই অনিশ্চয়তাজনিত অস্বস্তিবোধ নিশ্চিত পরিচিতি অথবা প্রত্যভিজ্ঞার স্বস্তি-বোধে পরিণতি লাভ করে।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে ধৃতি বা ধারণ (রিটেন্শন্), পুনরুৎপাদন বা পুনরুদ্দীপন (রি-প্রডাক্শন্, রি-কল্), পুনর্জ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞা (রি-কগ্নিশন্) এবং স্থান-কাল-নির্দেশ (লোক্যালাইজেশন্)—এই চারিটি স্মৃতির অঙ্গ। স্মৃতি বলিতে বুঝায় সেই স্মরণ করিবার ক্ষমতাকে যাহা পুর্ব-অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিরূপের সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন, প্রত্যভিজ্ঞা এবং স্থানকাল নির্দেশ করিবার ফলে ঘটে।

৩। সংরক্ষণ বা ধৃতির বিশ্লেষণ

দৈশিক সংস্কার

আপাতদৃষ্টিতে সংরক্ষণ, ধৃতি বা মনে-রাখা ব্যাপারটিকে সহজ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহাকে সহজ বলিয়া মনে হওয়ার কারণ জড়জগতের জ্ঞানলব্ধ দৈশিক সংস্কার। জড়জগতের সকল বস্তুই থাকে দেশে বা স্থানে। যেমন, টেবিলটি আছে বলিতে আমরা বুঝি যে ইহা ঘরে, বারান্দায় বা অন্য কোনো স্থানে আছে। তেমনই আমরা মনে করি যেন মনও ঘর বা বারান্দার মত একটি স্বল্প বা দীর্ঘ-পরিসর স্থান যেখানে পুর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ থাকে।

প্রতিরূপের দৈশিক আকার ও অবস্থান আছে কি ?

কিন্তু জড়বস্তুর যেমন দৈশিক পরিমাণ আছে উহাদের প্রতিরূপগুলির তেমন নাই। একটি আঠার ফুট লম্বা ঘরের প্রতিরূপ আঠার ফুট লম্বা নয়। আবার হিম-শীতল জলের প্রতিরূপ হিম-শীতল নয়। প্রতিরূপগুলি যে ভাবেই মনে সংরক্ষিত হউক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে বাহ্যবস্তু সশরীরে মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। অথচ পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা যে একেবারে মুছিয়া যায় না, কিন্তু মনে কিছু রাখিয়া যায়, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সংরক্ষণ কিরূপে ঘটিতে পাবে তাহা সহজবোধ্য না হইলেও, ইহা বাস্তবিকই ঘটিয়া থাকে।

সংরক্ষণ বা ধৃতি সম্বন্ধে জটিল প্রশ্ন এই যে, পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ কি আকারে এবং কোথায় সংরক্ষিত হয়। উহারা কি মানস অথবা শারীর ব্যাপার? উহারা কি মনেরই একপ্রকার বিকার বা পরিবর্তন, অথবা নার্ভ-তন্ত্রের এবং বিশেষ করিয়া গুরুমস্তিষ্কেরই বিকার বা পরিবর্তন?

প্রথমে শারীরবৃত্তীয় মতবাদগুলির আলোচনা করা যাউক।

(১) শারীরবৃত্তীয় মতবাদ (ফিজিয়লজিক্যাল্ থিওরি)

শারীরবৃত্তীয় মতে সংরক্ষণনার্ভতন্ত্রের এবং গুরুমস্তিষ্কের বিকার বা পরিবর্তন বিশেষ এই মতটি মুয়েন্স্টারবার্গ্, জ্যাস্ট্রো, কার্পেণ্টার্, মিল্, লুইস, জেম্স্, ওয়াট্সন্ প্রভৃতি মনোবিদ্গণ সমর্থন করিয়াছেন।

শারীরবৃত্তীয় মত প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর। প্রথমটি হইল মিল্, কার্পেণ্টার প্রভৃতির, দ্বিতীয়টি জেম্স্ প্রভৃতির এবং তৃতীয়টি ওয়াট্সন প্রভৃতির মত।

(ক) স্থায়ী অচেতন মস্তিষ্ক-ক্রিয়া-বাদ (থিওরি অফ্ পার্মানেণ্ট্ আন্-কন্সাচ্ সেরিব্রেশন্)

মিল্, কার্পেণ্টার্ প্রভৃতির মতে সংরক্ষণ একপ্রকার অচেতন গুরুমস্তিষ্কীয় (সেরিব্র্যাল্) প্রক্রিয়া বা কম্পন (ভাইব্রেশন্)। ইহারা মনে করেন যে, শিক্ষণ, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রত্যেক মানসবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার বা কম্পনের সূত্রপাত হয় এবং ঐ সকল মানসবৃত্তির অবসানের পরও উহাদের সহকারী মস্তিষ্ক-ক্রিয়া বা কম্পন অস্পষ্ট ও অচেতন ভাবে চলিতে থাকে। এই অবচেতন মস্তিষ্কক্রিয়া বা কম্পনকেই বলা যায় সংরক্ষণ। পুনরুৎপাদন এই অস্পষ্ট মস্তিষ্ক-ক্রিয়াকে স্পষ্ট বা তীব্র করার নামান্তর। **সংরক্ষণ বা ধৃতি (রিটেন্শন্) বলিতে বুঝায় এই স্থায়ী মস্তিষ্কক্রিয়া (পার্মানেণ্ট্ ভাইব্রেশন্ ইন্ দি ব্রেইন্) অথবা অচেতন মস্তিষ্কস্পন্দন (আন্-কন্সাচ সেরিব্র্যাল্ ভাইব্রেশন্)।**

(খ) স্থায়ী মস্তিষ্ক-গঠন-বিকার বাদ (থিওরি অফ্ পার্মানেণ্ট্ সেরি-ব্র্যাল্ মডিফিকেশন্)

অধ্যাপক উইলিয়াম্ জেম্স্ মনে করেন যে, সংরক্ষণ হইল মস্তিষ্ক-গঠনের স্থায়ী বিকার বা পরিবর্তন (পার্মানেণ্ট্ সেরিব্র্যাল্ মডিফিকেশন্)। শিক্ষণ বা প্রত্যক্ষ

যে যে মস্তিষ্ক-অংশগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট, ঐ ক্রিয়ার ফলে সেই সেই মস্তিকাংশের গঠনে স্থায়ী পরিবর্তন বা সংস্কার সাধিত হয়। মানসবৃত্তির পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে মস্তিষ্কের পথ সংক্ষিপ্ত হইয়া যায়; যে কারণে পূর্বে যে কাজটি সম্পাদন করিতে বেশী সময় লাগিত, পরে তাহা সম্পাদন করিতে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে। জেম্‌স্‌-এর মতে এইরূপ **স্থায়ী সংক্ষিপ্ত মস্তিষ্ক-পথ স্থাপিত হইবার নামই সংরক্ষণ বা ধৃতি।** পূর্বজ্ঞাত কোনো বস্তু মনে আছে বা সংরক্ষিত আছে বলিতে বুঝায় যে, অভিজ্ঞতার ফলে সংক্ষিপ্ত মস্তিষ্ক-পথ (শর্ট্‌ ব্রেইন্‌-পাথ্‌) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে জেম্‌স্‌-এর মতে সংরক্ষণ মস্তিষ্কীয় সংগঠনের (মর্ফোল-জিক্যাল্‌) ব্যাপার।

(গ) আবার ওয়াটসন প্রভৃতি চেষ্টিতবাদী মনোবিৎ মনে করেন যে সংরক্ষণ একশ্রেণীর নির্জ্ঞান বা অচেতন শারীর বিকার (আন্‌কন্‌সাচ্‌ বডিলি মডিফিকেশন্‌)। এই মত এই যে ইহা শারীর কারণকে শুধু মস্তিষ্কে বা নার্ভে সীমাবদ্ধ রাখে না, কিন্তু সকল আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের (ভিসারাল্‌ অর্গ্যান্‌স্‌), গ্রন্থির (গ্ল্যাণ্ড্‌স্‌) এবং মাংসপেশীর (মাস্‌ল্‌স্‌) ক্রিয়াকে উহার অন্তর্ভুক্ত করে।

(২) মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ (সাইকলজিক্যাল্‌ থিওরি)

অন্তর্জ্ঞান মনের স্থায়ী পরিবর্তনবাদ (থিওরি অফ্‌ সাবকন্‌সাচ্‌ মেণ্টাল্‌ মডিফিকেশন্‌)

সংরক্ষণ বা মনে থাকার কারণ সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটি হইল মনোবৈজ্ঞানিক (সাইকলজিক্যাল্‌)। এই মতানুসারে মনের চেতন ক্ষেত্রের নীচে একটি অন্তর্জ্ঞান স্তর রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ, শিক্ষণ প্রভৃতি অভিজ্ঞতায় মনের চেতন স্তর ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু এই সকল অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি অন্তর্হিত হইলেও, মনের অন্তর্জ্ঞান স্তরে উহাদের রেখা, ছায়া, অনুলিপি, নকল বা প্রতিরূপ (ইমেজ্‌) রাখিয়া যায়। এই প্রতিরূপ বলিতে বুঝায় অন্তর্জ্ঞান মনের স্থায়ী পরিবর্তন (সাব্‌কন্‌সাচ্‌ মেণ্ট্যাল্‌ মডিফিকেশন্‌)। বস্তুগুলি মনের চেতন স্তরে ক্রিয়া করিবার ফলে উহারা মানস পরিবর্তনের আকারে মনের গভীরতর অন্তর্জ্ঞান স্তরে তলাইয়া যায়। স্টাউট্‌-এর ভাষায়, ঐ বস্তুগুলি উহাদিগকে পুনরায় জানিবার একটি প্রবণতা (প্রি-ডিস্‌পোজিশন্‌) মনে রাখিয়া যায়।

তাহা হইলে, অতীত-অভিজ্ঞতা-লব্ধ বিষয় প্রতিরূপের আকারে মনে থাকিয়া যায় বলিতে আমরা বুঝিব মনের এমন কোনো পরিবর্তন (মডি-ফিকেশন্) যাহার ফলে ঐ বস্তুকে পুনরায় জানিবার প্রতি একটি প্রবণতা জন্মে এবং ভবিষ্যতে কোনো উদ্দীপক উপস্থিত হইলেই এই প্রবণতা সক্রিয় পুনরুৎ-পাদনে পরিণত হয়।

এই মতগুলির সমালোচনা

শারীরবৃত্তীয় মতগুলি সংরক্ষণকে শারীর ক্রিয়ায় বা সংগঠনে পরিণত করে। এই মতগুলি হইতে শিক্ষণীয় এই যে সংরক্ষণের সহিত নার্ভতন্ত্র, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই মত সংরক্ষণের মানসরূপকে উপেক্ষা করে। আবার কোন্ সংরক্ষণের সহিত কোন্ শারীর ক্রিয়া ঘটে তাহা সঠিকভাবে নিরূপণ করিতেও এই মত অসমর্থ। তৃতীয়তঃ, এই মত মানস প্রতিরূপের প্রকারগত ভেদকে মস্তিষ্কপথের অথবা মস্তিষ্ক ক্রিয়ার পরিমাণগত ভেদ অনুসারে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু একটি শব্দ প্রতিরূপ এবং বর্ণপ্রতিরূপের প্রকারগত পার্থক্য উহাদের মস্তিষ্ক-কেন্দ্রীয় স্নায়ুপথের সরলতা বা জটিলতা দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। চতুর্থতঃ, মিল্ এবং কার্পেণ্টার সংরক্ষণকে নির্জ্ঞান মস্তিষ্ক ক্রিয়া বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহারা যেন বলিতে চাহেন যে সংজ্ঞান মস্তিষ্ক-ক্রিয়াও আছে। কিন্তু কোনো মস্তিষ্ক-ক্রিয়াই সংজ্ঞান হইতে পারে না। সর্বোপরি, এই মতে মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ এলাকাতেই মস্তিষ্ক-ক্রিয়া চলে। অথচ অসংখ্য সংরক্ষিত বস্তুব তুলনায় এই এলাকা ক্ষুদ্র-পরিসর।

উপসংহার

সুতরাং সংরক্ষণ অন্তর্জ্ঞান মনের প্রবণতা বা পরিবর্তন বিশেষ, এই মতই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। অবশ্য এই মনোবৈজ্ঞানিক মত স্বীকার করিবার অর্থ এই নয় যে সংরক্ষণের সহিত শারীর ব্যাপারের সংস্রব নাই। উপরন্তু সংরক্ষণ মানস ব্যাপার হইলেও ইহার এমন কতগুলি সহকারী শারীর ব্যাপার আছে যেগুলি স্বীকার করিলে ইহা আরও সহজবোধ্য হয়। শারীরবৃত্তীয় মত সংরক্ষণের এই দৈহিক দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

৪। পুনরুৎপাদন

যে ক্রিয়ায় পূর্বজ্ঞাত বস্তু উহার প্রতিরূপ সাহায্যে পুনরুপস্থাপিত হয় তাহাকে পুনরুৎপাদন, পুনরুদ্দীপন অথবা পুনরুদ্রেক বলে।

স্মৃতি শুধু আয়ত্ত বিষয়ের সংরক্ষণই নয়, কিন্তু কার্যকালে সংরক্ষিত বিষয়ের ব্যবহারও বটে। মনের কথা মনেই থাকিয়া গেলে, উহাকে পুনরুৎপন্ন বা পুনরুদ্দীপিত করিয়া মনে না করিলে, স্মৃতি কার্যকরী হয় না। কিন্তু অসংখ্য পূর্বজ্ঞাত বস্তুর ছাপ বা প্রতিরূপই তো মনে রহিয়াছে। এই অসংখ্য সংরক্ষিত প্রতিরূপই তো একই সময়ে মনে করিবার দরকার হয় না। যেমন "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" দিয়া যে কবিতাটি আরম্ভ হইয়াছে তাহা হয়তো মনে করা দরকার। এই লাইনটি মনে আসিবার পরই যদি "এ কথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শা-জাহান" লাইনটি মনে উদিত হয় তবে স্মরণক্রিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রথম লাইনটি মনে পড়া মাত্র যদি "কাননে কুসুম কলি সকলই ফুটিল" লাইনটি স্মৃতিপটে উদিত হয়, তবেই স্মরণক্রিয়া যথাযথ হইয়াছে বলা যায়। যে কোনো অধীত বা পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের পুনরুৎপাদন বা মনে করাই স্মৃতির পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশাল সংরক্ষণ ভাণ্ডার হইতে যখন যতটুকু "মনে করা" বা পুনরুৎপাদন করা দরকার ঠিক ততটুকুর পুনরুদ্ধারই স্মৃতির পক্ষে প্রয়োজন।

পুনরুৎপাদন বা "মনে করা" ব্যাপারটি খেয়ালখুশী মত করিলে চলে না। ইহা কতগুলি নিয়মসূত্রে নিয়ন্ত্রিত বা আবদ্ধ। অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি যে সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, এই নিয়মগুলি তদনুযায়ী হইয়া থাকে। যেমন, অভিজ্ঞতায় বা পাঠ-শিক্ষণ কালে "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" লাইনটির শব্দগুলিকে একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলায় অভ্যাস করা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি শব্দের সহিত অপর শব্দের পূর্বাপর সম্বন্ধ রহিয়াছে। সংরক্ষিত অবস্থায়ও ইহাদের প্রতি-রূপগুলি ইহাদের বাস্তব সম্বন্ধ অনুযায়ী শৃঙ্খলায় আবদ্ধ থাকে। ফলে একটি শব্দের প্রতিরূপ মনে আসিলেই পরবর্তী শব্দের প্রতিরূপটি মনে উদিত হয় এবং এইরূপে পূর্বাপরক্রমে পুনরুৎপাদন চলিতে থাকে। অর্থাৎ একটি উদ্দীপক প্রতিরূপ অপর একটিকে অভিভাবিত (সাজেস্ট্) করে, অথবা একটি অপরটির অভিভাবীয় শক্তি (সাজেস্টিভ্ ফোর্স্) হইয়া দাঁড়ায়।

পূর্বজ্ঞাত বিষয়গুলির প্রতিরূপ যে নিয়মে পরস্পর সম্বদ্ধ, এবং পূর্বাপর ক্রমে পুনরুৎপন্ন হয়, সেই নিয়মকে অনুষঙ্গ নিয়ম বা অনুষঙ্গ-সূত্র (ল' অফ্

স্যাসোসিয়েশন্) বলা হয়। যেমন "পাখী সব করে রব..." লাইনটির একটি শব্দ উহার পরবর্তী বা পূর্ববর্তী শব্দের সহিত স্থানীয় বা দৈশিক সান্নিধ্যসূত্রে গ্রথিত বলিয়া, একটি অপরটিকে স্মরণ করাইয়া দেয় বা পুনরুৎপন্ন করে।

৫। অনুষঙ্গ ও অভিভাব
(অ্যাসোসিয়েশন্ অ্যাণ্ড্ সাজেশন্)

পূর্বজ্ঞাত বিষয়গুলির একটি বা একাধিক প্রতিরূপ অভিভাব শক্তির দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া যে নিয়ম অনুসারে অন্য একটি বা একাধিক প্রতিরূপ পুনরুৎপন্ন করে সেই নিয়ম বা সূত্রকে বলে অনুষঙ্গ-সূত্র বা নিয়ম। এই পুনরুৎপন্ন প্রতিরূপগুলির প্রত্যেকটি অপরটির সহিত অনুষক্ত, অর্থাৎ উহাদের একটি অপরটির সহিত এইরূপে সম্বদ্ধ যে, একটি মনে পড়িলেই অপরটি মনে পড়িয়া যায়। এইরূপে **একটি প্রতিরূপের অপর একটিকে পুনরুৎপন্ন করিবার শক্তিকে বলে অভিভাব শক্তি** (সাজেস্টিভ্ ফোর্স্)।

কিন্তু একটি প্রতিরূপের পক্ষে আর একটি প্রতিরূপকে পুনরুৎপন্ন করা তখনই সম্ভব যখন ইহাদের মধ্যে অনুষঙ্গ (অ্যাসোসিয়েশন্) থাকে। দুইটি প্রতিরূপ অনুষক্ত থাকিলেই উহাদের একটির পক্ষে অপরটিকে অভিভাবিত বা উদ্দীপিত করা সম্ভব। যেমন "পাখী সব" এই অধীত অংশটির প্রতিরূপ মনে জাগিয়া উঠিবামাত্র উহার পরবর্তী অংশ "করে রব" মনে হইয়া যায়, কারণ প্রথম অংশটির পরেই দ্বিতীয় অংশটি পঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনুষঙ্গসূত্র স্থাপিত হইয়াছে, ফলে, প্রথমটি দ্বিতীয়টির উদ্দীপক বা অভিভাব শক্তি হইযা দাঁড়াইয়াছে।

সুতরাং অভিভাব এবং অনুষঙ্গ একই পুনরুৎপাদন ক্রিয়ার দুইটি দিক। প্রতিরূপগুলি অনুষঙ্গ নিয়মে আবদ্ধ বলিযাই উহাদের একটি অপরটিকে অভিভাবিত করিতে পারে। সুতরাং অভিভাব অনুষঙ্গের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আর এক দিক দিয়া বিচার করিলে অনুষঙ্গও অভিভাবের উপর নির্ভরশীল। বুদ্ধিপূর্বক শিক্ষণের (ইন্টেলিজেন্ট্ লার্নিং) ফলে যে অনুষঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহার মূলে অভিভাব কাজ করে। যেমন "পাখী সব করে রব" অংশের সহিত "রাতি পোহাইল" অংশের এবং "রাতি পোহাইল" অংশের সহিত "কাননে কুসুমকলি সকলই ফুটিল" অংশের স্বাভাবিক সম্বন্ধটি বুঝিয়া কবিতাটি পাঠ করিলে, প্রত্যেক

পূর্ববর্তী অংশ উহার পরবর্তী অংশকে অভিভাবিত করে এবং এই অভিভাবের ফলে উহাদের মধ্যে সহজে এবং স্থায়ীভাবে অনুষঙ্গ সূত্র স্থাপিত হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে অভিভাব এবং অনুষঙ্গ পরস্পরসাপেক্ষ।

৬। অনুষঙ্গ-নিয়ম
(ল'জ্ অফ্ অ্যাসোসিয়েশন্)

যে নিয়ম অনুসারে পূর্ব-অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিরূপের সম্বন্ধ-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকে বলা হয় অনুষঙ্গ-নিয়ম।

আধুনিক মনোবিদ্যায় প্রধানতঃ তিন প্রকার অনুষঙ্গ-সূত্র বা নিয়ম স্বীকৃত হইয়াছে, যথা সান্নিধ্যসূত্র (ল' অফ্ কন্‌টিগুইটি), সাদৃশ্যসূত্র (ল' অফ্ সিমিলারিটি) এবং বৈপরীত্যসূত্র (ল' অফ্ কন্‌ট্র্যাস্ট্)।

(১) সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ সূত্র (ল' অফ্ কন্‌টিগুইটি)

পূর্ব অভিজ্ঞতায় যে সকল বস্তু দেশ এবং কাল সম্বন্ধে পরস্পরের কাছাকাছি বা নিকটবর্তীরূপে জ্ঞাত হইয়াছিল, উহাদের প্রতিরূপগুলি সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ-সূত্রে সম্বদ্ধ হয়। যেমন অতীত শিক্ষণে "পাখী সব করে রব" অংশের কাছাকাছি বা নিকটবর্তীরূপে "রাতি পোহাইল" অংশটি পঠিত হইয়াছিল। এই শব্দগুলি দেশ এবং কাল সম্বন্ধে যেমন পরস্পর কাছাকাছি বা নিকটবর্তী, উহাদের প্রতিরূপগুলিও তেমন সান্নিধ্যসূত্রে অনুষক্ত হয়। সান্নিধ্য অনুষঙ্গ-সূত্র বলিতে বুঝায় পরস্পর নিকটবর্তী প্রতিরূপের সেই সম্বন্ধ, যাহার ফলে উহাদের একটি মনে পড়িলে, আর একটিও মনে পড়িয়া যায়।

মনোবিদ্যায় **অনুষঙ্গ বলিতে বস্তুর সহিত বস্তুর সম্বন্ধ বুঝায় না।** কিন্তু প্রত্যক্ষ বা জ্ঞাত বস্তুর সম্বন্ধ অনুযায়ী উহাদের প্রতিরূপের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহাকেই মনোবৈজ্ঞানিক অনুষঙ্গ বলে। এই অনুষঙ্গ সূত্রে সম্বদ্ধ প্রতিরূপগুলির একটি মনে জাগিলে অন্যগুলিও পর পর পুনরুপস্থাপিত হয়—ইহাই মনোবৈজ্ঞানিক অনুষঙ্গের তাৎপর্য। পূর্বপ্রত্যক্ষ বস্তুগুলির একটি পুনরায় প্রত্যক্ষ হইলে, বাকী বস্তুগুলির প্রতিরূপ আপনা-আপনি, অথবা পুনরুৎপাদন চেষ্টার ফলে, মনে ভাসিয়া ওঠে। আবার এই অনুষক্ত প্রতিরূপগুলির একটি মনে জাগিয়া উঠিলেও অন্যান্যগুলি মনে ভাসিয়া উঠিতে পারে।

দৈশিক এবং কালিক সান্নিধ্য (স্প্যাশাল্ অ্যাণ্ড্ টেম্পোর‍্যাল্ কন্‌টিগুইটি)

দেশ এবং কাল সম্বন্ধে সান্নিধ্য দুই প্রকারের হইতে পারে। যেমন "পাখী সব করে রব" অংশটির **কাছাকাছি বা নিকটবর্তী** স্থানেই "রাতি পোহাইল" অংশটি পঠিত হইয়াছে। এই দুইটি অংশ দৈশিক সান্নিধ্য বা নৈকট্যে আবদ্ধ। সুতরাং ইহাদের প্রতিরূপগুলিও দৈশিক সান্নিধ্যসূত্রে অনুষক্ত। আবার প্রথম অংশটি পঠিত হইবার **পর** পঠিত হয় দ্বিতীয় অংশটি, অর্থাৎ এই দুইটি অংশ কালিক পৌর্বাপর্যে পঠিত হয়। সুতরাং ইহাদের প্রতিরূপগুলিও কালিক সান্নিধ্যসূত্রে অনুষক্ত। আকাশের উপব মেঘ ভাসিয়া বেড়ায়, সুতরাং আকাশ ও মেঘ এবং উহাদের প্রতিরূপগুলিও দৈশিক সান্নিধ্যসূত্রে অনুষক্ত। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকাইবার পর মেঘগর্জন শোনা যায়, সুতরাং বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জনের অনুষঙ্গ কালিক এবং ইহাদেব প্রতিরূপও কালিক সান্নিধ্য-সূত্রে অনুষক্ত।

(২) সাদৃশ্য অনুষঙ্গ (অ্যাসোসিয়েশন্ বাই সিমিলারিটি)

দুই বা ততোধিক বস্তুর একটি অপরটির সদৃশ বলিয়া জ্ঞাত হইলে, উহাদের প্রতিরূপগুলিও পরস্পর সদৃশ বলিয়া যে সম্বন্ধে অনুষক্ত হয় তাহাকে সাদৃশ্য অনুষঙ্গ বলে। যেমন রামু এবং শ্যামু দুইটি যমজ ভাই পূর্ব অভিজ্ঞতায় সদৃশ বলিয়া জ্ঞাত হওয়ায়, পরবর্তী কালে একজনকে দেখিলে বা স্মরণ করিলেই আর একজনের কথা মনে পড়ে। অথবা রামুকে পূর্বে দেখা হইয়াছিল। পরে শ্যামুকে দেখিয়া রামুকে মনে পড়িল, কারণ উহাদের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে।

আবার, রবীন্দ্রনাথের ফটো দেখিয়া তাঁহার চেহারাটি মনে জাগিল, কারণ ফটো বা প্রতিকৃতির সহিত চেহারাটি সাদৃশ্যসূত্রে আবদ্ধ। কাব্যের উপমা সাদৃশ্য অনুষঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিলফুলের সহিত সুগঠিত নাসিকার, পদ্মের সহিত নয়নের, চন্দ্রের সহিত বদনের, পুরুষের সহিত বৃক্ষের এবং ললনার সহিত লতার উপমাস্থলে তুলনীয় বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে। ফলে একটিকে দেখিলে বা মনে পড়িলেই অপরটি মনে পড়ে। **সদৃশ বস্তু সদৃশ বস্তুর কথা মনে করাইয়া দেয়।** অথবা, সদৃশ বস্তুর প্রতিরূপ সাদৃশ্য অনুষঙ্গ-সূত্রে সম্বদ্ধ হয় বলিয়া, উহাদের একটি মনে হইলেই, অপরটি মনে পড়ে।

(৩) বৈপরীত্য অনুষঙ্গ (অ্যাসোসিয়েশন্ বাই কন্‌ট্রাস্ট্)

বস্তু বা উহার প্রতিরূপ কোনো বিপরীত বস্তু বা উহার প্রতিরূপকে যে নিয়ম অনুসারে মনে করাইয়া দেয় সেই নিয়মসূত্রকে বৈপরীত্য অনুষঙ্গ-সূত্র বলে। যে সকল বস্তু একটি আর একটির বিপরীত, উহাদের একটিকে দেখিলে বা মনে করিলে অপরটি মনে পড়ে বা স্মৃত হয়। যেমন দুঃখের দিনে সুখের দিনগুলি মনে পড়ে। অমা রজনী দেখিয়া পূর্ণিমা রাত্রির কথা মনে উদিত হয়। বামন বা খর্বকায় লোক দেখিয়া বিরাটবপু লোকের কথা মনে পড়ে। দুর্নাম শুনিয়া সুখ্যাতির কথা এবং অসমতল পার্বত্যপথে চলিতে চলিতে বাংলার সমতলভূমির কথা মনে উদিত হয়, কারণ ইহাদের একটি অপরটির বিপরীত। যে ব্যক্তিটি আজ ফুলের মালা পরাইল সেই হয়ত একদিন জুতার মালা পরাইয়াছিল, অথবা যে আজ উপকারের আশায় আসিয়াছে সেই হয়ত অতীতে ক্ষতি করিয়াছিল। এই সকল পরস্পরবিরোধী আচরণ, একটি অপরটির স্মারক হইয়া দাঁড়ায়। বৈপরীত্য অনুষঙ্গ-সূত্র অনুসারে বিপরীত সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বস্তুর একটি প্রত্যক্ষ করিলে বা মনে পড়িলে অপরটিও মনে পড়ে।

৭। তিন প্রকার অনুষঙ্গ নিয়মের সম্বন্ধ উহাদের পারস্পরিক মৌলিকতা

উপরোক্ত তিনটি অনুষঙ্গ-সূত্র ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। অনেকের মতে এই তিনটি অনুষঙ্গ-সূত্রই সমানভাবে মৌলিক। কিন্তু ইহারা সমান মৌলিকতা দাবী করিতে পারে কি না সেই সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ রহিয়াছে।

বৈপরীত্য অনুষঙ্গ মৌলিক হইতে পারে না

অধিকাংশ মনোবিৎ সান্নিধ্য এবং সাদৃশ্য অনুষঙ্গ-সূত্র দুইটিকে সমভাবে মৌলিক বা মুখ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে **বৈপরীত্য সূত্র সাদৃশ্যেরই বিকার বা রূপান্তর।** অন্ধকার আলোক স্মরণ করাইয়া দেয়, কারণ উহারা উভয়েই মূলতঃ আলোকসংবেদন, এই বিষয়ে সদৃশ। আবার বামন দেখিয়া বিরাটবপু ব্যক্তির কথা মনে হয়, কারণ উহারা উভয়েই আকারের উচ্চতা-জ্ঞাপক বলিয়া সদৃশ। দুঃখের দিনে সুখময় দিনগুলির কথা মনে পড়ে, কারণ সুখও দুঃখ অনুভূতির প্রকারভেদ বলিয়া সদৃশ। অর্থাৎ সাদৃশ্যসূত্রের

উপর নির্ভর করিয়া বৈপরীত্য **সূত্র কাজ করে। এক বৃন্তে দুইটি ফুলের মত** বিপরীত **বস্তু সান্নিধ্যসূত্রে** গ্রথিত।

সুতরাং বৈপরীত্য সূত্রটি মৌলিক বা মুখ্য অনুষঙ্গসূত্র হইতে পারে না।

টিশ্‌নার্‌-এর সমালোচনা

টিশ্‌নার্, বৈপরীত্য অনুষঙ্গ-সূত্রকে সাদৃশ্য অনুষঙ্গ-সূত্রে পরিণত করিবার বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি তুলিয়াছেন।[১]

প্রথমতঃ, বৈপরীত্য অনুষঙ্গ-সূত্রকে সাদৃশ্য অনুষঙ্গ-সূত্রে পরিণত করিবার যুক্তিটি **মনোবৈজ্ঞানিক নয়, কিন্তু যুক্তিবৈজ্ঞানিক।** ইহা মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উত্থাপিত হয় নাই, কিন্তু হইয়াছে যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে। এই যুক্তি অনুসারে খর্বকায় ব্যক্তি বিরাটকায় ব্যক্তিকে মনে করাইয়া দেয় উহাদের অন্তর্নিহিত দৈর্ঘ্যরূপ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে, অথবা দৈর্ঘ্যবিষয়ক সামান্য ধারণার সাহায্যে। কিন্তু এই তথাকথিত সামান্য ধারণা মনোবিদ্যার অন্তর্দর্শনে ধরা পড়ে না। ইহা তর্কের খাতিরে, অথবা যুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। পক্ষান্তরে, অন্তর্দর্শনে বৈপরীত্য অনুষঙ্গ মৌলিক বলিয়াই ধরা পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, বৈপরীত্য এবং সাদৃশ্য অনুষঙ্গ সমপর্যায়ভুক্ত নয়। **সাদৃশ্য অনুষঙ্গ চিন্তা বা ধারণামূলক, কিন্তু বৈপরীত্য অনুষঙ্গ বেদনামূলক বিরুদ্ধভাবোধের নামান্তর।** বামনের পার্শ্বে সাধারণ ব্যক্তিকে বড, আবার বিরাটকায় ব্যক্তির পার্শ্বে ঐ ব্যক্তিকে ছোট দেখায়, কারণ প্রথম ক্ষেত্রে বামন অনুকম্পার এবং সাধারণ ব্যক্তি প্রশংসার পাত্র, আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাধাবণ ব্যক্তিই অনুকম্পার এবং বিরাটকায় ব্যক্তি প্রশংসার পাত্র। এই বিরুদ্ধ বেদনা-মূলক অনুভূতিই বৈপরীত্য অনুষঙ্গের ভিত্তি। সুতরাং **বৈপরীত্য অনুষঙ্গকে সাদৃশ্য অনুষঙ্গে পরিণত করা যায় না।**

টিশ্‌নার-এর মত

কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় বিপরীত বস্তুগুলি প্রায়ই পাশাপাশি বা সান্নিধ্য সম্বন্ধে থাকে, যেমন শাদা কাগজের উপর কালো অক্ষর, উজ্জ্বল আলোকের গভীর ছায়া। সুতরাং **বৈপরীত্য অনুষঙ্গ সান্নিধ্য অনুষঙ্গের প্রকারবিশেষ।**

১ ই. বি. টিশ্‌নার্‌—এ টেক্সট্‌বুক্‌ অফ্‌ সাইকলজি—১০৫ অনুচ্ছেদ—পৃঃ ৩৭৫-৩৭৬

সান্নিধ্য ও সাদৃশ্যের মৌলিকতায় মতভেদ

সান্নিধ্য এবং সাদৃশ্যের পারস্পরিক মৌলিকতায় মতভেদ রহিয়াছে।

সান্নিধ্যই মৌলিক সূত্র—জেম্‌স্‌

অধ্যাপক **জেম্‌স্‌** মনে করেন যে **সান্নিধ্যই প্রধান বা মৌলিক** এবং সাদৃশ্য অপ্রধান বা গৌণ। রামুকে দেখিয়া শ্যামুর কথা মনে হইল। রামু এবং শ্যামু এক বা অভিন্ন নয়, কিন্তু সদৃশ বা সমধর্মী। অর্থাৎ রামু এবং শ্যামু যেমন কোনো কোনো বিষয়ে সদৃশ, আবার অন্যান্য বিষয়ে বিসদৃশ বা ভিন্নও বটে। রামুকে দেখিয়া শ্যামুকে মনে পড়িবার মূলে রহিয়াছে উহাদের সাদৃশ্য। কিন্তু উহাদের সাদৃশ্য জ্ঞানের মূলে রহিয়াছে পার্থক্য জ্ঞান। রামুর সহিত শ্যামুর সাদৃশ্যজ্ঞানের সহিত উহাদের পার্থক্যজ্ঞান সান্নিধ্য অনুষঙ্গে অনুষক্ত। ফলে, উহাদের সাদৃশ্যজ্ঞান সান্নিধ্য অনুষঙ্গ সাহায্যে উহাদেব পার্থক্য মনে করাইয়া শ্যামুকে স্মৃতিপথে লইয়া আসে।

সাদৃশ্যই মৌলিক সূত্র—স্পেন্সর্‌

স্পেন্সর্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণের মতে সাদৃশ্য অনুষঙ্গই মৌলিক এবং সান্নিধ্য অনুষঙ্গ গৌণ। "পাখী সব করে রব" অংশটি "রাতি পোহাইল" অংশটিকে মনে করাইয়া দেয়, প্রথমতঃ, সাদৃশ্য সূত্রের সাহায্যে উহার নিজ প্রতিরূপকে জাগরূক করিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ, এই পুনরুৎপন্ন প্রতিরূপের সহিত পরবর্তী প্রতিরূপটির সান্নিধ্য অনুষঙ্গের সাহায্য। সুতরাং সান্নিধ্য অনুষঙ্গ সাদৃশ্য অনুষঙ্গের উপর নির্ভর করে। আবার, অন্য দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে সান্নিধ্য অনুষঙ্গে সম্বদ্ধ প্রতিরূপের স্থানগত অথবা কালগত সাদৃশ্য আছে। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্তি উহা যে বেদীতে স্থাপিত তাহা এবং উহার লৌহবেষ্টনী, একই স্থানে, অর্থাৎ গোলদীঘিতে অবস্থিত। আবার বিদ্যুৎ মেঘগর্জনকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কারণ এই দুইটিই কালিক ঘটনা, সুতরাং সদৃশ।

পুনরৈকীকরণ নিয়ম-সূত্র—হ্যামিল্টন্‌

তিনটি অনুষঙ্গ নিয়মকে উপরোক্তভাবে একটি বা দুইটিতে পরিণত করিবার পশ্চাতে হেতু রহিয়াছে। অনুষঙ্গ আসলে একটি নিয়ম এবং ইহার

তিনটি দিক, যথা সান্নিধ্য, সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্য। হ্যামিল্টন্ অনুষঙ্গের এই অন্তর্নিহিত ঐক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে অনুষঙ্গ আসলে পুনবেকীকরণ নিয়মেরই (ল' অফ্ রেড্-ইন্‌টিগ্রেশন্) দিগ্‌দর্শন মাত্র। তিনি পুনরেকীকরণকে একমাত্র অনুষঙ্গ-সূত্র বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতা একটি সমগ্র পরিস্থিতির জ্ঞান। এই সমগ্র পরিস্থিতির যে কোনো অংশ পুনরুৎপন্ন হইলে, ইহার সমগ্র পরিস্থিতিটিকে পুনরুপস্থাপন করিবার প্রবণতা ঘটে। "পাখী সব করে রব" অংশটি সমগ্র কবিতাটির অংশ। সুতরাং এই অংশটি মনে পড়িলে, উহা যে সমগ্র কবিতাটির অংশ, সেই সমগ্র কবিতাটি পুনরুপস্থাপিত করে। আবার বিদ্যুৎ এবং মেঘগর্জন মিলিয়া সমগ্র এককটিই প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতার বিষয়। ফলে বিদ্যুতের ঝলক দেখিলেই, এই অংশটি সমগ্র পরিস্থিতির বাকী অংশকে পুনরুৎপন্ন করে।

এই নিয়মের শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা

পুনরেকীকরণ বা পুনঃসমাকলন (রেড্-ইন্‌টিগ্রেশন্) শারীরবৃত্তের ভাষায় একপ্রকার নার্ভীয় অভ্যাস (নার্ভাস্ হ্যাবিট্)। সমগ্র বস্তুর প্রত্যক্ষে যে নার্ভ-পথ (নার্ভাস্ পাথ্) ক্রিয়া করে উহার প্রত্যেক অংশের সহিত প্রত্যেক অংশের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ফলে, এই নার্ভ-পথের একটি অংশ সক্রিয় হইলে, অন্য অংশগুলিও সক্রিয় হয়, এবং একটি অংশের স্মরণ হইলে অন্য অংশগুলির স্মরণ ঘটে।

৮। অনুষঙ্গের কারণ (কন্‌ডিশন্‌স্ অফ্ অ্যাসোসিয়েশন্)

বিশেষ কারণ

তিন প্রকার অনুষঙ্গ এবং উহাদের কারণ আলোচিত হইয়াছে। সান্নিধ্য অনুষঙ্গের কারণ দুই বা ততোধিক জ্ঞাত বস্তুর দৈশিক বা কালিক নৈকট্য, সাদৃশ্য অনুষঙ্গের কারণ উহাদের সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্য অনুষঙ্গের কারণ উহাদের বৈপরীত্য।

সাধারণ কারণ

তিন প্রকার অনুষঙ্গের একটি সাধারণ কারণ মনোযোগ। সকল নিকটবর্তী, সদৃশ বা বিপরীত ঘটনার প্রতিরূপই অনুষক্ত হয় না। যে ঘটনাগুলি

মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে, শুধু উহাদের প্রতিরূপের মধ্যেই অনুষঙ্গ গড়িয়া ওঠে।

প্রাথমিকতা (প্রাইমেসি), সাম্প্রতিকতা (রিসেন্‌সি), পৌনঃপুন্য বা নৈরন্তর্য (ফ্রিকোয়েন্‌সি) এবং স্পষ্টতা (ভিভিড্‌নেস্‌) অনুষঙ্গের আরও কয়েকটি সাধারণ কারণ। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, এই চারিটি কারণ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া অনুষঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই চারটি কারণকে অনুষঙ্গের গৌণ সূত্র বা নিয়মও (সেকেণ্ডারি ল'জ্ অব্ অ্যাসোসিয়েশন্) বলা যাইতে পারে।

অনুষঙ্গের একটি কারণ **প্রাথমিকতা** (প্রাইমেসি)। প্রথম প্রতিরূপের অনুষঙ্গ দীর্ঘস্থায়ী, সুতরাং ইহা সহজে পুনরুদ্দীপিত হইতে পারে। অনুষঙ্গের আর একটি কারণ প্রতিরূপ এবং উহাদের অনুষঙ্গের **সাম্প্রতিকতা** (রিসেন্‌সি)। সাম্প্রতিক প্রতিরূপ এবং উহাদের অনুষঙ্গ সহজে পুনরুদ্দীপিত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকে। তৃতীয়তঃ, **যত অধিকবার** প্রতিরূপ এবং উহাদের অনুষঙ্গের আবৃত্তি ঘটে উহারা তত স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত এবং সহজে পুনরুদ্দীপিত হয়। চতুর্থতঃ, প্রতিরূপের অনুষঙ্গ **যত স্পষ্টভাবে** (ভিভিড্) ঘটে, উহাদের প্রভাব তত স্থায়ী এবং পুনরুদ্দীপন তত সহজ হয়।

৯। আরও কয়েকটি শ্রেণীর অনুষঙ্গ

(ক) অবাধ ভাবানুষঙ্গ (ফ্রী-অ্যাসোসিয়েশন্)—ফ্রয়েড্

বিখ্যাত মনঃসমীক্ষক (সাইকো-অ্যানালিস্ট্) ফ্রয়েড্ মনঃসমীক্ষণের যে পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন উহার নাম **অবাধ ভাবানুষঙ্গ** (ফ্রী অ্যাসোসিয়েশন্)। অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতিটি এইরূপ। মানসরোগীকে অথবা সমীক্ষিত হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে ইজি চেয়ারে আরামে অর্ধশায়িত হইয়া মন শিথিল করিতে অথবা ছাড়িয়া দিতে বলা হয়। মনের শিথিল বা বাধামুক্ত অবস্থায় তাহার মনের সকল ভাবনা, চিন্তা বা চেতনবৃত্তি, কোনো কাট ছাঁট না করিয়া, অবিকৃত এবং বাধাহীনভাবে তাহাকে বলিয়া যাইতে হয়। রোগী যে সকল চিন্তা প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে অথবা চাপিয়া যায়, আবার সেই সকল অংশের অবাধ ভাবানুষঙ্গ করা হয়, কারণ এই সকল দ্বিধাপুর্ণ ভাবনা, আবেগ বা ইচ্ছাই মানস রোগের মূল কারণ। উহারা অবদমিত হইয়াই রোগসৃষ্টি করিয়াছে এবং যে বিবেক বা অধিশাস্তা (সুপার-এগো) উহাদিগকে অশ্লীল

বা অবৈধ বলিয়া অবদমিত করিয়াছে, তাহাই উহাদের আত্মপ্রকাশে বাধা দেয়। একটির পর একটি করিয়া নির্জ্ঞান মনের সকল অবদমিত বাসনাগুলি অবাধ ভাবানুষঙ্গের ধারায় বাহির হইয়া আসে। এইরূপে রোগীর শৈশবকালীন (ইন্‌ফ্যান্টাইল্) ইডিপাস গূঢ়ৈষা (ইডিপাস্ কম্‌প্লেক্স্) প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ তাহার পিতামাতার প্রতি যে শৈশব ভালবাসা ও ঘৃণা অবদমিত হইয়াছিল, তাহা অবাধ ভাবনাস্রোতে ভাসিয়া ওঠে। কিন্তু ভালবাসা এবং ঘৃণার যথাযোগ্য পাত্র, পিতামাতা, উপস্থিত নাই। সুতরাং ইহা সংক্রামিত হয় মনঃসমীক্ষকের উপর। এই সংক্রমণই (ট্র্যান্‌স্‌ফারেন্স্) হইল অবাধ ভাবানুষঙ্গের চূড়ান্ত পর্যায়। এই পর্যায়ে রোগী সম্পূর্ণভাবে মনঃসমীক্ষকের আয়ত্তে আসিয়া পড়ে। বিচক্ষণ মনঃসমীক্ষক, এই অবস্থায়, রোগীকে তাহার গূঢ়ৈষাগুলি (কম্‌প্লেক্স) হইতে মুক্ত করেন এবং তাহাকে পুনরায় বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে শিক্ষা (রি-এডুকেশন্ টু রিয়্যালিটি) দেন। ফলে রোগী রোগ এবং গূঢ়ৈষামুক্ত হইয়া স্বাভাবিক মানস জীবন ফিরিয়া পায়।

অবাধ ভাবানুষঙ্গ মৌলিক কিনা

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে অবাধ ভাবানুষঙ্গ মৌলিক অনুষঙ্গসূত্র নয়। ইহা পূর্বঅনুষক্ত ভাবকে পুনরুদ্দীপিত করিবার একটি পদ্ধতি বিশেষ। সুতরাং ইহা উল্লিখিত তিনটি অনুষঙ্গসূত্রের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না।

(খ) শব্দ-অনুষঙ্গ (ওয়ার্ড্ অ্যাসোসিয়েশন্)

শব্দ-অনুষঙ্গ য়ুঙ্গ উদ্ভাবিত বিশ্লেষণ মনোবিদ্যার পদ্ধতি। অস্বভাবী বিশ্লেষণ মনোবিদ্যার (অ্যানালিটিক্যাল্ সাইকলজি) প্রতিষ্ঠাতা সি. জি. য়ুঙ্গ্ নির্জ্ঞানে অবস্থিত গূঢ়ৈষাগুলিকে সংজ্ঞানে রূপান্তরিত করিবার যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহার নাম শব্দ-অনুষঙ্গ (ওয়ার্ড্ অ্যাসোসিয়েশন্)। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষণীয় ব্যক্তির গূঢ়ৈষার ইঙ্গিতকারী (কম্‌প্লেক্স্ ইন্‌ডিকেটর্) অর্থপূর্ণ শব্দতালিকা প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেকটি শব্দ শুনিয়া বা দেখিয়া যে শব্দটি তাহার মনে আসে, পরীক্ষণীয় ব্যক্তি সেই শব্দটি বলিয়া প্রতিক্রিয়া করে। বিরাম-ঘড়ি (স্টপ্ ওয়াচ্) সাহায্যে প্রয়োগকর্তা প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় লিপিবদ্ধ করেন। যেমন 'টাকা' শব্দটি উপস্থাপিত করিলে, পাত্র

হয়ত 'রোজগার' কথাটি বলিয়া, আবার 'বাঘ' কথাটি শুনিয়া বা দেখিয়া সে হয়ত 'ভয়' কথাটি বলিয়া প্রতিক্রিয়া করে।

এই পরীক্ষায় দেখা যায়, যে অর্থপূর্ণ শব্দ কোনো গূঢ়েষার মূলে আঘাত করে, তাহার প্রতিক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটে। এই শব্দগুলি পাত্রের মনে নানা আবেগ সঙ্কোচ বা দ্বিধা সৃষ্টি করায়, প্রতিক্রিয়া বিলম্বিত হয়।

শব্দ-অনুষঙ্গ পদ্ধতি অপরাধ এবং মানসরোগের কারণ নির্ণয়ে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, স্বভাবী ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকৃতির উপরও ইহা যথেষ্ট আলোকপাত করে। এই পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, কোনো কোনো ব্যক্তি অন্তর্বৃত (ইন্‌ট্রোভার্ট্), বহির্বৃত (এক্স্‌ট্রোভার্ট্) এবং উভয়বৃত (অ্যাম্‌বিভার্ট্)। শব্দ অনুষঙ্গ একপ্রকার প্রায়োগিক পদ্ধতি। ইহা পুনরুৎপাদনের সাধারণ সূত্র নয়। ইহা সাধারণ অনুষঙ্গ-সূত্রগুলির উপর নির্ভর করে।

১০। (ক) ভাল স্মৃতিশক্তির লক্ষণ (মার্ক্‌স্ অফ্ গুড্ মেমরি)

ভাল স্মৃতি বলিতে স্মৃতির সকল অঙ্গগুলিরই উৎকর্ষ বুঝায়। স্মৃতির মূলে রহিয়াছে শিক্ষণ এবং স্মৃতির অঙ্গ সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন, প্রত্যভিজ্ঞা এবং স্থান-কাল-নির্দেশ। **স্মরণীয় বিষয়কে যত তাড়াতাড়ি শিখিয়া যত দীর্ঘ-কাল মনে ধারণ বা সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজন মত যত অনায়াসে, নিখুঁত এবং প্রাসঙ্গিকভাবে, অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন অংশ বাদ দিয়া প্রয়োজনীয় অংশ পুনরুৎপাদন করিয়া, উহার স্থান-কাল-নির্দেশ সাহায্যে চেনা যায়, স্মৃতিশক্তি সেই পরিমাণে ভাল।**

স্মৃতিশক্তির প্রকারভেদ

কোনো কোনো ব্যক্তি শীঘ্র অথবা বিলম্বে শিখিয়া অধীত বিষয়কে দীর্ঘকাল অথবা অল্পকাল ধারণ করিতে পারে, আবার অনায়াসে অথবা কষ্টে এবং প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে উহার পুনরুৎপাদন করিতে পারে। যে ব্যক্তি স্মরণীয় বিষয়কে তাড়াতাড়ি শিখিয়া দীর্ঘকাল মনে সংরক্ষণ এবং অনায়াসে ও প্রাসঙ্গিকভাবে পুনরুৎপাদন করিতে পারে তাহার স্মৃতিশক্তিই **উৎকৃষ্ট।** **অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট** স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি বিলম্বে শিখিয়া স্মরণীয় বিষয়কে দীর্ঘকাল সংরক্ষণ এবং অনায়াসে ও প্রাসঙ্গিকভাবে পুনরুৎপাদন

করিতে পারে। **তৃতীয় স্তরের** স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি তাড়াতাড়ি শিখিয়া তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যায়। আবার **সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট** স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি বিলম্বে শিখিয়া তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যায়। চলিত কথায়, এই চার স্তরের স্মৃতি-শক্তিকে যথাক্রমে বেগচিরা, চিরচিরা, বেগবেগা এবং চিরবেগা বলা হয়।

(খ) মুখস্থ বিদ্যার (ক্র্যামিং) দোষগুণ

মুখস্থ বিদ্যার (ক্র্যামিং) গুণ এই যে পরিণামে নিষ্প্রয়োজন অথচ উপস্থিত প্রয়োজনীয় বিষয় শিখিবার পক্ষে ইহা কার্যকরী। অনেক বিষয় সাময়িক প্রয়োজনে আয়ত্ত করিতে হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকিলকে দীর্ঘ বিবরণ মুখস্থ করিতে হয়। আবার পরীক্ষার্থীরও অনেক বিষয় মুখস্থ করা দরকার। অথচ উকিলের বা পরীক্ষার্থীর পরবর্তী জীবনে এই বিষয়গুলি কোনো কাজে লাগে না। সুতরাং এই জাতীয় বিষয় মুখস্থ করিয়া ফেলাই আশু প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু তোতাপাখীর মত মুখস্থ করা (প্যারট্ লার্নিং, ক্র্যামিং) অথবা আবৃত্তিজ স্মৃতি (রোট্ লার্নিং) আশু প্রয়োজনের সহায়ক হইলেও, পরিণামে নির্ভরযোগ্য নয়। আবৃত্তিজ স্মৃতি অল্পস্থায়ী এবং দ্রুত বিস্মৃতিই উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। না বুঝিয়া মুখস্থ করিবার প্রধান দোষ এই যে ইহার অংশগুলি বুঝিয়া মুখস্থ করা হয় না এবং উহাদের মধ্যে স্থায়ী অনুষঙ্গ-সূত্র গড়িয়া ওঠে না। ফলে, একটি অংশ আর একটির উদ্দীপক হইতে পারে না।

(গ) বুদ্ধি-পূর্বক স্মৃতির (লজিক্যাল্ মেমরি) গুণ

বুদ্ধিপূর্বক স্মৃতির (লজিক্যাল্ মেমরি) গুণ এই যে অধীত বা জ্ঞাত বিষয়ের অংশগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ-জ্ঞান ইহার মূল অবলম্বন। "পাখী সব" মনে হইলেই "করে রব" এবং "করে রব" মনে হইলেই "রাতি পোহাইল" অংশ মনে পড়ে, কারণ এইস্থলে প্রত্যেকটি পরবর্তী অংশের অর্থ উহার পূর্ববর্তী অংশের অর্থকে অনুসরণ করে। ফলে, এই অংশগুলির মধ্যে একটি অর্থপূর্ণ সঙ্গতি জ্ঞাত হয় এবং একটি অংশ অপরটির সূচক বা জ্ঞাপক হইয়া দাঁড়ায়। ১ ৩ ৫ ৭ ৯ ১১ ১৩ ১৫, এই সমষ্টি সংখ্যাটিকে যান্ত্রিক (মেকানিক্যাল্) ভাবে, অর্থাৎ না বুঝিয়া শিখিতে গেলে, যতবার আবৃত্তির প্রয়োজন হয়, উহার প্রত্যেকটি পরবর্তী সংখ্যা উহার পূর্ববর্তী সংখ্যা হইতে দুই বেশী এইরূপ বুঝিলে, ততবার আবৃত্তির

প্রয়োজন হয় না, এমন কি একটি আবৃত্তির বেশী প্রয়োজন হয় না। আবার, প্রথম পদ্ধতির তুলনায় দ্বিতীয় পদ্ধতির ফলও হয় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী।

(ঘ) স্মৃতি বা স্মরণের কারণ (কন্‌ডিশন্‌স্ অফ্ মেমরি)

মানস কারণ

স্মৃতি বা স্মরণের কারণ বলিতে বুঝায় সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন, প্রত্যভিজ্ঞা এবং স্থানকালনির্দেশের কারণ।

সংরক্ষণের কারণে সাম্প্রতিকতা (রিসেন্‌সি), প্রাথমিকতা (প্রাইমেসি), পৌনঃপুন্য (ফ্রিকোয়েন্‌সি) এবং স্পষ্টতা (ভিভিড্‌নেস্) প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এই কারণগুলির অতিরিক্ত সংরক্ষণের অপর কারণগুলি হইল বর্তমান প্রত্যক্ষ বিষয়ের অতীত অভিজ্ঞতা অথবা উহাকে সংপ্রত্যক্ষে (অ্যাপার্‌সেপ্‌শন্) সংশ্লেষণ করিবার মত ক্রিয়াশীল মনোযোগ এবং ইহার কারণরূপে মনোযোগের বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ (ইন্‌টারেস্ট্)। কোনো বস্তুকে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝিতে হইলে, অথবা সংপ্রত্যক্ষ করিতে হইলে, অতীত সংপ্রত্যক্ষ ভাণ্ডার (অ্যাপারসেপ্‌টিভ্ মাস্) এবং বর্তমান প্রত্যক্ষকে একটি অখণ্ড মনোযোগের বিষয় বলিয়া বুঝিতে হয় এবং এইরূপ অখণ্ড মনোযোগের বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বা আগ্রহ থাকা চাই।

পুনরুৎপাদনের কারণ, প্রথমতঃ, অভিভাবক শক্তি, যাহা পুনরুৎপাদন ক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে এবং দ্বিতীয়তঃ, অনুষঙ্গসূত্র যাহা পুনরুৎপন্ন প্রতিরূপকে সংবদ্ধ করে, যাহার ফলে, একটি অংশ মনে পড়িলেই অন্যান্য অংশগুলি মনে পড়িয়া যায়।

দৈহিক কারণ

উপরোক্ত মানস কারণগুলি ছাড়াও স্মৃতির **দৈহিক কারণ** রহিয়াছে। সংরক্ষণের মূলে থাকে নার্ভ-পথের গঠন এবং মস্তিষ্ক-পদার্থ ও নার্ভের ক্রিয়া বা পরিবর্তন। শিক্ষণের ফলে সংশ্লিষ্ট নার্ভপথ ও মস্তিষ্কপদার্থের অংশগুলি পুনর্গঠিত বা পরিবর্তিত হয়। ফলে, উহার একটি অংশ সক্রিয় হইলে উহার পরবর্তী অংশটি সক্রিয় হয় এবং অনুভূত বিষয়ের পুনরাবির্ভাব ঘটে। শারীরবৃত্তের দিক হইতে স্মৃতিকে যান্ত্রিক স্মৃতি (অর্গ্যানিক্ মেমরি) বলা যাইতে পারে।

(৬) স্মৃতির উন্নতি (ইম্প্রুভ্মেণ্ট্ অফ্ মেমরি)

অনুশীলনের ফলে স্মৃতিশক্তির উন্নতি হয় কি ?

অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্স্-এর মতে স্মৃতি যান্ত্রিক স্মৃতিরই নামান্তর। ইহা মস্তিষ্ক ও নার্ভপথের স্থায়ী পুনর্গঠনের ফলে উৎপন্ন হয়। তিনি বলেন যে স্মৃতিশক্তি অপরিবর্তনীয়, অর্থাৎ ইহার কোনোপ্রকার উন্নতিই সম্ভব নয়, যদিও শারীরিক সুস্থতা ও অসুস্থতা অনুসারে স্মৃতিশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। স্মৃতিশক্তি ব্যক্তির দৈহিক গঠনের দ্বারা নির্দিষ্ট। সুতরাং অনুশীলনের ফলে উহার উন্নতি অসম্ভব।

জেম্স-এর মতটিকে অধ্যাপক **স্টাউট্** সর্বাংশে সমর্থন করেন নাই। স্টাউট্ জেম্স্-এর সহিত এই বিষয়ে একমত যে অনুশীলনের ফলে সাধারণ স্মৃতিশক্তির উন্নতি ঘটে না। কিন্তু তিনি মনে করেন যে অনুশীলনের ফলে সাধারণ স্মৃতিশক্তির উন্নতি সম্ভব না হইলেও, কোনো বিশেষ বিষয়ের স্মৃতিশক্তিকে উন্নত করা সম্ভব। যেমন কোনো অভিনেতা হয়ত অনুশীলনের ফলে তাহার অভিনয়াংশ মুখস্থ করিতে পারে, অথবা কোনো ছাত্র ইতিহাসের নাম, তারিখ এবং ঘটনাগুলি মনে রাখিতে পারে। জেম্স্ হয়ত আপত্তি করিবেন যে, উল্লিখিত উন্নতি আসলে স্মৃতিশক্তির উন্নতি নয়, কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতির, যেমন মনোযোগ আকর্ষণ প্রভৃতি আনুসঙ্গিক কারণগুলির, উন্নতি। স্টাউট্ হয়ত ইহার উত্তরে বলিবেন যে, যেহেতু এই আনুষঙ্গিক কারণগুলির উন্নতির ফলে কোনো বিশেষ বিষয়ের সংরক্ষণ দৃঢ়তর এবং পুনরুৎপাদন ক্ষিপ্রতর হয়, সুতরাং অনুশীলনের ফলে বিশেষ বিষয়ে স্মৃতির উন্নতি সাধিত হয়। পক্ষান্তরে জেম্স্ মনে করেন যে শিক্ষণপদ্ধতির উন্নতি সম্ভব হইলেও, স্মৃতিশক্তির অথবা স্মৃতির উন্নতি হইতে পারে না।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

উড্ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড্ মার্ক্ইস্—সাইকলজি—সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

উড্ওয়ার্থ্—সাইকলজি (ত্রয়োদশ সংস্করণ)—নবম, দশম পরিচ্ছেদ

বোরিং, ল্যাংফেল্ড, ওয়েল্ড্—ফাউণ্ডেশন্স্ অফ্ সাইকলজি—অষ্টম পরিচ্ছেদ

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেণ্ট্স্ অফ্ সাইকলজি—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জি. এফ্. স্টাউট্—এ ম্যানুয়্যাল্ অফ্ সাইকলজি—চতুর্থ খণ্ড—প্রথম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এম্ কলিন্স্, জে. ড্রিভার—এক্স্পেরিমেণ্টাল্ সাইকলজি—দ্বাদশ, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ই. বি. টিশ্নার—এ প্রাইমার অফ্ সাইকলজি—সপ্তম পরিচ্ছেদ

পি. এন্. ভট্টাচার্য—নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব—দর্শন, ১৩৪৭

Exercise

1. Define memory What are the factors of memory ? (pp. 537-540)
2. Give an analysis of the factors involved in memory. (pp 537-540)
3. What is retention ? How is retention possible ? Explain the theories of retention (pp. 540-543)
4. Explain the process of recall and the laws operating in the process. (pp 544-545)
5. Distinguish between suggestion and association. (pp. 545-546)
6. What are the laws of association ? What part do they play in the process of recall ? (pp 546-548)
7. Are all the laws of association equally fundamental ? Can these laws be reduced to one law ? (pp. 547-548)
8. Explain the conditions of Association. (pp. 549-550)
9. Write notes on "Free Association" and "Word Association". Can they replace the laws of Association ? (pp. 550-552)
10. What are the marks of good memory ? What are the effects of cramming ? (pp 552-554)
11. Explain the conditions of memory. Distinguish between unintelligent and intelligent (logical) memory. (p. 554)
12. Can memory be improved by practice ? Discuss. (p 555)

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

স্মৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণা
(এক্স্‌পেরিমেণ্ট্‌স্‌ অন্‌ মেমরি) এবং বিস্মৃতি

১। সুষ্ঠু শিক্ষণ বা শিক্ষণে সময় এবং শ্রম সংক্ষেপ
(মেথড্‌স্‌ অফ্‌ ইকনমাইজিং মেমরি)

(ক) শিক্ষণীয় বিষয়ের সমগ্র এবং আংশিক পদ্ধতি
(হোল্‌ অ্যাণ্ড্‌ পার্ট মেথড্‌)

কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে কত কম সময়ে ও পরিশ্রমে আয়ত্ত করা যায়, এই প্রশ্নের প্রয়োগমূলক গবেষণা করিয়াছেন এবিংহাউস্‌ এবং অন্যান্য মনোবিৎ। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে শিক্ষণীয় বিষয়টি খুব বৃহৎ না হইলে, উহা অখণ্ড বা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা করিতে যত সময় এবং শ্রম লাগে, উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অথবা আংশিকভাবে শিক্ষা করিতে তদপেক্ষা বেশী সময় এবং শ্রমের দরকার হয়। অর্থহীন শব্দাংশ (নন্‌সেন্স্‌ সিলেব্‌ল্‌), সংখ্যা (ডিজিট্‌), কবিতা, গদ্য, শিক্ষণীয় বিষয় যাহাই হউক না কেন, উহার সম্পূর্ণ শিক্ষণ (হোল্‌ লার্নিং), আংশিক শিক্ষণ (পার্ট্‌ লার্নিং) অপেক্ষা বেশী ফলপ্রসূ (এফিসিয়েন্ট্‌) এবং সংক্ষিপ্ত (ইকনমিক্‌) হয়। যেমন, শিক্ষণের দুই বৎসর পরেও, খণ্ডিত বা আংশিক পদ্ধতির তুলনায়, সম্পূর্ণ বা অখণ্ড পদ্ধতিতে শেখা কবিতা, শতকরা ১৬০ অধিক সুষ্ঠুভাবে পুনরুৎপাদন করা যায় বলিয়া দেখা গিয়াছে।

সমগ্র পদ্ধতির উৎকর্ষের কারণ

সমগ্র পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতার কারণ এই যে ইহাতে প্রত্যেকটি অংশকে অপরাপর অংশের সহিত সংযুক্ত বা অনুষক্ত করিয়া শিক্ষা করা হয় এবং ইহার ফলে, স্মরণক্রিয়ার অভিভাবক সূত্রগুলির সংখ্যা এবং সবলতা অধিক হয়। পক্ষান্তরে, খণ্ডিত বা আংশিক পদ্ধতিতে শিক্ষার অংশগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে, একটি অংশ অপরটির স্মারক বা উদ্বোধক হইতে পারে না।

(খ) শিক্ষণ-সময়ের সমগ্র এবং আংশিক পদ্ধতি

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষণের মোট সময়কে একবারে না লাগাইয়া, উহাকে বিভক্ত করিয়া ব্যবহার করিলে শিক্ষণ, সংরক্ষণ এবং পুনরুৎপাদন, অর্থাৎ স্মরণ, অপেক্ষাকৃত সহজ এবং উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

ধরা যাউক যে শিক্ষণীয় বিষয়টি আটবার আবৃত্তি করিয়া শিখিতে হইবে। একদিনেই বিষয়টির আটবার আবৃত্তি না করিয়া যদি প্রত্যহ দুইবার হিসাবে চার দিনে আটবার আবৃত্তি করা হয়, তাহা হইলে শিক্ষা, সংরক্ষণ এবং পুনরুৎপাদন বেশী সহজ এবং ফলপ্রসূ হয়।

এই বিষয়ে এবিংহাউস্ ছাড়া আরও অনেক মনোবিৎ, যেমন মায়ার্স্, স্টার্চ্, প্রয়োগমূলক গবেষণা করিয়া মোটের উপর একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। **স্টার্চ্** দুই ঘণ্টা শিক্ষণকালকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত পাত্রের উপর চার প্রকারে প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণী প্রত্যেক বারে দশ মিনিট করিয়া, প্রত্যহ দুইবার আবৃত্তির সাহায্যে, ছয় দিনে, দ্বিতীয় দলটি প্রত্যেক বারে কুড়ি মিনিট করিয়া, প্রত্যহ একবার আবৃত্তির সাহায্যে, ছয় দিনে, তৃতীয় দলটি প্রত্যেক বারে চল্লিশ মিনিট করিয়া, এক দিন অন্তর এক দিন আবৃত্তির সাহায্যে, ছয় দিনে এবং চতুর্থ দলটি দুই ঘণ্টা আবৃত্তি করিয়া, একদিনে, শিক্ষণকার্য শেষ করিল। স্টার্চ্ দেখিলেন যে প্রথম দলটির শিক্ষণফলই সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক। সুতরাং স্টার্চ্ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন যে শিক্ষণ সময়কে সংক্ষিপ্ত এবং বেশী সংখ্যক ভাগে বণ্টন করিলেই শিক্ষণফল মোটের উপর ভাল হয়। অবশ্য এই সংক্ষিপ্ত বিভাগেরও একটি সীমা আছে, যাহা প্রয়োগ-সাহায্যে স্থির হয়।

শিক্ষণ সময়ের বিভাগ শিক্ষণফলকে উন্নত করে, কারণ ইহার ফলে একটানাভাবে শিক্ষণের ক্লান্তি বা শ্রম ঘটে না এবং শিক্ষণ বিষয়ের অংশগুলির মধ্যে অনুষঙ্গসূত্র সহজে গড়িয়া ওঠে।

(গ) আবৃত্তি পদ্ধতি (রেসিটেশন্)

তৃতীয়তঃ, শিক্ষণীয় পাঠ শুধু পড়িয়া গেলে যে সুফল পাওয়া যায়, পড়িবার পর উহা আবৃত্তি করিলে তদপেক্ষা বেশী সুফল পাওয়া যায়। পড়িবার পর পাঠের আবৃত্তিতে অনধিগত অংশ ধরা পড়ে এবং যেখানে যেখানে ঠেকিয়া যাইতে হয়, সেই সেই অংশগুলি যে আরও অভ্যাস করা দরকার, তাহা বুঝা যায়। এই শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজেই নিজের পরীক্ষক হইয়া দাঁড়ায়।

দেখা গিয়াছে যে শিক্ষার সবটুকু সময় পাঠে নিয়োজিত করিলে যে স্থলে পাঠের শতকরা ৩৫ ভাগ স্মরণ করা যায়, ঐ সময়ের এক, দুই, তিন এবং চার পঞ্চমাংশ আবৃত্তিতে লাগাইলে যথাক্রমে ৫০, ৫৪, ৫৭ এবং ৭৪ শতাংশ স্মরণ করা যায়।

(ঘ) অতিরিক্ত শিক্ষণ (ওভার-লার্নিং) এবং পর্যালোচনা (রিভিউ)

চতুর্থতঃ, অতিরিক্ত শিক্ষণ (ওভার-লার্নিং) এবং পর্যালোচনা (রিভিউ) সাহায্যে শিক্ষণ এবং স্মরণক্রিয়া সংক্ষিপ্ত এবং কার্যকরী হইয়া থাকে। পঠিত বিষয়কে ঠিক স্মরণ করা যায়, এমন অবস্থার পরও শিক্ষণ চালাইলে, সংরক্ষণ দৃঢ়তর হয়। একটি চল্লিশ মিনিটের বক্তৃতার পরেই পাঁচ মিনিট উহার পর্যালোচনা করিলে, দুই মাস পরে উহার স্মরণক্রিয়া পঞ্চাশ শতাংশ উন্নততর হয়।

(ঙ) শ্রেণীগঠন পদ্ধতি

তাহা ছাড়া, শিক্ষণীয় বিষয়কে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া শিখিলে, স্মৃতির উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন ২৫, ৩৫, ৪৫ সংখ্যা তিনটিকে মনে রাখা ২৭, ৩৬, ৪৮ এই তিনটি সংখ্যা অপেক্ষা সহজ। প্রথম সংখ্যা তিনটির প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী সংখ্যা অপেক্ষা দশ বেশী বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যা তিনটি এইরূপ নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ হয় না। আবার কবিতা বা গান শিক্ষা করা সহজতর হয়, কারণ উহাতে শব্দের শ্রেণীগঠন ছাড়া ছন্দ এবং তাল সংযুক্ত হয়।

(চ) অর্থপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি (লজিক্যাল্ মেমরি)

আবার অর্থপূর্ণ শিক্ষণে, অথবা শিক্ষণীয় বিষয়ের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহা শিক্ষা করিলে, স্মৃতি ফলপ্রসূ হয়। যেমন, শিক্ষার্থী যে সকল ঘটনা বা বিষয়েব সহিত তাহার জীবনের সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া উহা শিক্ষা করে, সেইগুলি তাহার মনে থাকে বেশী। প্রতিবেশীর যে সন্তানটি নিজ সন্তানের সমবয়সী, তাহার বয়স মনে রাখা সহজ হয়। এক কথায়, শিক্ষণীয় বিষয়ের অর্থবোধ স্মৃতির বিশেষ সহায়ক। এই কারণে অর্থপুর্ণ স্মৃতি (লজিক্যাল্ মেমরি) যান্ত্রিক স্মৃতি রোট্ লার্নিং, ক্র্যামিং) অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

(ছ) স্মৃতির সহায়ক বা সঙ্কেত

স্মৃতির সহায়ক বা সঙ্কেত অবলম্বন করিলে এই ক্রিয়া সংক্ষেপিত এবং কার্যকরী হয়। যেমন, বার্বারা, সিলারেণ্ট, ডেরিয়াই, ফেরিও প্রভৃতি নাম মনে রাখা সহজতর হয়, "বর্বর ছেলেরা দৌড়ে ফেরে একে একে"—এইরূপ সঙ্কেতের সাহায্যে। আবার রামধনুর সাতটি রং-এর নাম মনে রাখা সহজতর হয়, 'ভিব্জিঅর' বা 'বেনীআসহকলা', এই সাঙ্কেতিক বর্ণগুলির সহায়তায়।

২। স্মৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণা
(এক্স্‌পেরিমেণ্ট্‌স্‌ অন্‌ মেমরি)

এবিংহাউস্‌-এর পরীক্ষণীয় বিষয়

হার্ম্যান্‌ এবিংহাউস্‌ স্মৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণার পথিকৃৎ। অর্থহীন শব্দাংশের (নন্‌সেন্স্‌ সিলেব্‌ল্‌স্‌) সম্পূর্ণ শিক্ষণ বা মুখস্থ করিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শিক্ষণের পরবর্তী বিভিন্ন কালে বিস্মৃতির হার বা পরিমাণ সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করিয়াছেন। সংরক্ষণের উপর প্রতীপ বাধের (রেট্রোঅ্যাক্‌টিভ্‌ ইন্‌হিবিশন্‌) প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া, সংরক্ষণের পরিমাণ নির্ণয়, শিক্ষণের (মেমরাইজেশন্‌) সময় ও শ্রমসংক্ষেপ (ইকনমি), প্রভৃতি সমস্যার সমাধানে এবিংহাউস্‌-এর প্রয়োগমূলক গবেষণা প্রসিদ্ধ।

অর্থহীন শব্দাংশ বা সংখ্যা

এবিংহাউস্‌-এর প্রয়োগগুলির মূল অবলম্বন অর্থহীন শব্দাংশ (নন্‌সেন্স্‌ সিলেব্‌ল্‌স) এবং সংখ্যা (ডিজিট্‌স্‌), যেমন, ব্যাপ্‌, টক্স্‌, মাক্‌, রিফ্‌, জেল্‌, কর্‌, টাফ্‌, রেব্‌, যুজ্‌, এক্‌, ২৫১৬৩৭৯ ইত্যাদি। পূর্বগঠিত অনুষঙ্গ হইতে প্রয়োগবিষয়কে মুক্ত রাখিয়া স্মৃতির গবেষণা করিবার জন্যই তিনি অর্থহীন শব্দাংশ বা সংখ্যা অবলম্বনের পক্ষপাতী।

অতিরিক্ত শিক্ষণ

এবিংহাউস্‌ অর্থহীন শব্দাংশ পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন যে পুনরাবৃত্তিই শিক্ষণ বা মুখস্থ করিবার প্রধান উপায়। শিক্ষণীয় শব্দাংশগুলির সংখ্যা বেশী হইলে, অধিক-সংখ্যক এবং উহাদের সংখ্যা কম হইলে, অল্পসংখ্যক পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়। তিনি আরও দেখিলেন, কোনো শব্দাংশতালিকা

সম্পূর্ণভাবে শিখিবার পরও অধিকবার শিখিলে, উহা অধিকতর স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়। সম্পূর্ণ শিক্ষার পরও কয়েকবার শিক্ষা করিবার নাম অতিরিক্ত শিক্ষণ (ওভার-লার্নিং)।

এবিংহাউস্ স্থায়ীভাবে শিখিবার বা মনে রাখিবার যে প্রয়োগগুলি নির্দেশ করিয়াছেন উহাদের নাম (১, ২) শিক্ষণ এবং পুনরাবৃত্তি বা সঞ্চয় পদ্ধতি (লার্নিং অ্যাণ্ড্ সেভিং মেথড্স্), (৩) স্মারণ পদ্ধতি (প্রম্‌টিং মেথড্) এবং (৪) যুগ্মস্মৃতি পদ্ধতি (স্কোরিং মেথড্)।

(১, ২) শিক্ষণ এবং পুনরাবৃত্তি বা সঞ্চয় পদ্ধতি (লার্নিং অ্যাণ্ড্ সেভিং মেথড্স্)

শিক্ষণ পদ্ধতি—লার্নিং মেথড্

শিক্ষণ এবং পুনরাবৃত্তি পদ্ধতিতে কতগুলি অর্থহীন শব্দাংশ বা সংখ্যা স্মৃতিযন্ত্রের (মেমরি অ্যাপারেটাস্) ছিদ্রে একটি একটি করিয়া নিয়মিত কাল ব্যবধানে উপস্থাপিত করা হয় এবং পাত্র সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি শব্দাংশ বা সংখ্যা বলিয়া যায়। তারপর পাত্রকে ঐ শব্দাংশ বা সংখ্যা মনে করিতে বলা হয়। পাত্র উহা মনে করিতে না পারিলে, উহা পুনঃপুনঃ উপস্থাপিত করা হইতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পাত্র নির্ভুল এবং নিয়মিতভাবে উহা মনে করিতে পারে। শিক্ষণ পদ্ধতি (লার্নিং মেথড্) এইখানেই শেষ হয়।

পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি

শিক্ষণের এক বা একাধিক দিন, এমন কি এক সপ্তাহ, পরে পাত্রকে ঐ শব্দাংশ বা সংখ্যাতালিকা পুনরুদ্রেক করিতে বলা হয়। পুনরুদ্রেকে ভুল হইলে ঐগুলির পুনঃশিক্ষণ বা পুনরাবৃত্তি দরকার। পদ্ধতির এই অংশকে বলে পুনবাবৃত্তি পদ্ধতি। প্রথম শিক্ষণে যতবার আবৃত্তি বা পুনরুপস্থাপন দরকার হইয়াছিল, পুনঃশিক্ষণে তদপেক্ষা কমবার আবৃত্তি এবং পুনরুপস্থাপনের প্রয়োজন। পুনরাবৃত্তিতে যে সময় বা পুনরুপস্থাপন কম লাগে, তাহা অবশ্যই প্রথম শিক্ষণ ফলের সংরক্ষণের জন্য। পুনঃশিক্ষণে আবৃত্তি বা উপস্থাপনের বার এবং সময় বাঁচিবার কারণ অতীত শিক্ষণফলের সংরক্ষণ। পুনরাবৃত্তি পদ্ধতিকে সঞ্চয় পদ্ধতিও (সেভিং মেথড্) বলা হয়, কারণ সংরক্ষণে সঞ্চিত শিক্ষণ ফলই পুনঃশিক্ষণের সময় ও পরিশ্রমের লাঘব করে।

(৩) স্মারণ পদ্ধতি (প্রম্‌টিং মেথড্)

স্মারণ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ এবং পুনরুৎপাদনের পরিমাণ নির্ণীত হয়, অসম্পূর্ণ শিক্ষণের পর বিষয়ের পুনরুৎপাদন কালে পাত্রকে কতবার উহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার হয়, সেই অনুসারে। পাত্র অসম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত বিষয় মনে করিতে গিয়া যত অধিক বার ঠেকিয়া যায় এবং যত অধিকবার তাহাকে বলিয়া বা স্মরণ করাইয়া দিতে হয়, তাহার পুনরুৎপাদন তত অসম্পূর্ণ।

(৪) যুগ্মস্মৃতি পদ্ধতি (স্কোরিং মেথড্)

যুগ্মস্মৃতি পদ্ধতিতে কতগুলি অর্থহীন শব্দাংশ বা সংখ্যা এইরূপ নির্দিষ্ট-সংখ্যক বার পাত্রের নিকট উপস্থাপিত করা হয় যাহাতে সে ঐগুলি সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষা করিতে পারে না। উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে পাত্র শব্দাংশগুলিকে ট্রোকে তালে জোড়ায় জোড়ায় বলিয়া যায়। কিছুক্ষণ পর পাত্রকে অনিয়মিত-ভাবে শব্দাংশ-জোড়াগুলির প্রথমটি দেখাইয়া অপর শব্দাংশটি স্মরণ করিতে বলা হয়। দ্বিতীয় শব্দাংশটিকে শুদ্ধভাবে মনে করিতে যতটা সময় লাগে সেই সময়কে বলে সাফল্যাঙ্ক কাল (স্কোরিং টাইম্)।

(৫) অন্যান্য পদ্ধতি

এবিংহাউস্-প্রদর্শিত উপরোক্ত চারিটি পদ্ধতি ছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে স্মৃতির প্রায়োগিক গবেষণা করা হইয়াছে। যেমন **সংরক্ষিত বিষয় পদ্ধতি** (মেথড্ অফ্ রিটেইন্‌ড্ মেম্‌বার্‌স্)। এই পদ্ধতিতে দেখা হয়, উপস্থাপিত শব্দাংশ বা সংখ্যাতালিকা হইতে পাত্র কয়টি বলিতে পারে।

পুনর্গঠন পদ্ধতিতে (রিকন্‌স্ট্রাক্‌শন্ মেথড্) প্রত্যেক উপস্থাপনের পর উপস্থাপিত বিষয়গুলিকে অন্যভাবে সাজাইয়া আবার দেখানো হয় এবং বিষয়গুলিকে প্রথমে যে ভাবে সাজানো হইয়াছিল, পাত্রকে বলা হয়, উহাদিগকে আবার ঠিক সেইভাবে সাজাইতে।

প্রত্যভিজ্ঞার প্রয়োগিক গবেষণা

প্রত্যভিজ্ঞার প্রায়োগিক গবেষণায় দুইটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমটি **নির্বাচন পদ্ধতি** (মেথড্ অফ্ সিলেক্‌শন্)। ইহাতে শিক্ষণের পর

জ্ঞাত বস্তুগুলিকে অন্যান্য অজ্ঞাত বস্তুর সহিত মিশাইয়া দেখানো হয় এবং পাত্র ঐ মিশ্রণ হইতে জ্ঞাত বস্তু বাছিয়া লয়। প্রত্যভিজ্ঞা নির্ণয়ের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হইল **'অভিন্ন তালিকা' পদ্ধতি** (আইডেন্টিক্যাল্ সিরিজ্ মেথড্)। ইহাতে যে তালিকাটি অসম্পূর্ণভাবে শিক্ষা করা হইয়াছে সেই সম্পূর্ণ তালিকাটিই পাত্রের নিকট পুনরুপস্থাপিত করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তালিকায় কোনো অদল বদল হইয়াছে কি না।

৩। বিস্মৃতি (ফর্‌গেট্‌ফুল্‌নেস্)

(ক) বিস্মৃতির উপকারিতা

সাধারণতঃ স্মৃতিশক্তিকে সম্পদ এবং বিস্মৃতিকে আপদ বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু এইরূপ ধারণা ভুল। স্মৃতির মত বিস্মৃতিও মানসজীবনে প্রয়োজনীয়। 'প্রথমতঃ, নিখুঁত অথবা প্রাসঙ্গিক স্মৃতি সম্ভব হয় বহু অনাবশ্যক এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ভুলিয়া গিয়া। যখন যেটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই মনে করিতে হইলে, জ্ঞাত বিষয়ের নিষ্প্রয়োজনীয় অংশ ভুলিয়া যাইতে হয়। তাহা ছাড়া, বিস্মৃতি মানসজীবনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখিতে সাহায্য করে। সন্তানবিয়োগের মর্মান্তিক শোক এবং অপমান অথবা ক্ষতির অসহনীয় বেদনাও কালক্রমে সহনীয় হয় বিস্মৃতির কোমল স্পর্শে। দৈনন্দিন জীবনে নিদ্রা ক্ষতস্থানে বিস্মৃতির স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলাইয়া দেয়। তৃতীয়তঃ, বিস্মৃতি নূতন স্মৃতিকে সাহায্য করে, মনের সঞ্চিত আবর্জনা বা জঞ্জাল-স্তূপ সরাইয়া দিয়া। "পাখী সব" অংশটিই যদি সর্বদা মনে পড়ে, তাহা হইলে "করে রব" প্রভৃতি পরবর্তী অংশগুলির স্মরণ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

(খ) বিস্মৃতির অপকারিতা

কিন্তু বিস্মৃতির উপরোক্ত তিন প্রকার গুণ সত্ত্বেও, ইহা যে অনেক সময় মানসজীবনের অন্তরায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয় ভুলিয়া যাওয়া দরকার। কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয় ভুলিয়া যাওয়া ক্ষতিকর।

(গ) বিস্মৃতির কারণ (কজেজ্ অফ্ ফরগেটিং)

বিস্মৃতির কারণ কি ? শিক্ষণ ও স্মরণের **কালব্যবধানই** ইহার মুখ্য বা একমাত্র কারণ হইতে পারে না। এই কালব্যবধানে অথবা শিক্ষণের পর

যে সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়াছে উহারাই পুর্বজ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতিপথে বা **(ইণ্টারফিয়ারেন্স্)** সৃষ্টি করে, ফলে পুর্বজ্ঞাত বিষয়গুলি বিস্মৃত হয়। তা ছাড়া দৈনন্দিন জীবনের নানাপ্রকার সদৃশ এবং বিসদৃশ ঘটনা পরস্পরকে ব্যাহ করিয়া পরস্পরের স্মৃতি ক্ষুন্ন করে। পরবর্তীকালে জ্ঞাত বিষয়ের পুর্বজ্ঞা বিষয়ের বিরুদ্ধে বাধাকে বলা হয় **প্রতীপ বাধা (রেট্রো-অ্যাকৃটিভ্ ইন্হি বিশন্)**। পুর্বজ্ঞাত বিষয়ের শিক্ষণের পর মনের বিশ্রাম দরকার। বিশ্রামে ফলে উহা মনে স্থায়ী অথবা **বদ্ধমূল (কন্‌সলিডেটেড্)** হইয়া থাকে। অন্যভা বলিতে গেলে, শিক্ষণের পর বিশ্রামের ফলে অবচেতন মনে শিক্ষালব্ধ বিষয়ে পরিপাক ক্রিয়া চলিতে থাকে। এই বিশ্রামকালকে **তাপকাল (ইন্‌কিউবেশ পিরিয়ড্)** বলা হয়। বিশ্রাম অথবা তাপকালে পুর্বজ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতি রেখাগুলি স্থায়ীভাবে মনে বসিয়া যাইবার সময় পায়। পক্ষান্তরে, একা বিষয় শিক্ষা করিবার ঠিক পরেই আর একটি বিষয় শিক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

কালের প্রভাব অথবা বাধা (ইন্‌টার্‌ফিয়ারেন্স্) যেমন বিস্মৃতি ঘটাইতে পারে, তেমন **মস্তিষ্কের দুর্বলতা** বা পীড়াও বিস্মৃতির কারণ হইতে পারে মস্তিষ্কে আঘাতের ফলে অনেক সময় বিস্মৃতি ঘটিতে দেখা যায়। মস্তিষ্কে অনুষঙ্গ প্রদেশের (অ্যাসোসিয়েশন্ এরিয়া) ক্ষতিতে এবং বার্ধক্য-জনিত মস্তিষ্ক-দুর্বলতায় স্মৃতিশক্তি ব্যাহত হয়।

বিস্মৃতির কারণ সম্বন্ধে আর একটি মতের নাম **অব্যবহারজনিত ক্ষীণত** (অ্যাট্রফি থ্রু ডিজিউজ্)। পেশী পরিচালিত না হইলে উহা দুর্বল হইয়া পড়ে কারণ উহার কিঞ্চিৎ সারাংশ রক্ত শুষিয়া লয়। আবার সক্রিয় পেশী রক্ত হইতে উহার পুষ্টি টানিয়া লইয়া সবল হয়। সেইরূপ যে সকল স্মৃতি রেখার দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুশীলন হয় না উহারা আস্তে আস্তে ক্ষীণ হইয়া মুছিয়া যায়।

ফ্রয়েড্-এর মত

বিস্মৃতির কারণ সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় মত উল্লেখযোগ্য। এই মতানুসারে **অবদমনই** বিস্মৃতির মূল কারণ। অবদমন একটি জৈব ক্রিয়া। ইহা আত্ম রক্ষার উপায়, যেহেতু ইহা মনকে পীড়াদায়ক অথবা অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা হইতে রক্ষা করে। বেদনাদায়ক স্মৃতির বিনিময়ে, অথবা বিস্মৃতির

আশ্রয় লইয়া, মন নিজ শাস্তি ক্রয় করে। আমরা আমাদের প্রাপ্য চেক্-এর কথা মনে রাখি, কিন্তু দেয় বিল্-এর কথা ভুলিয়া যাই। ফ্রয়েডীয় মতানুসারে বিস্মৃতির কারণ স্মরণ করিবার অনিচ্ছা, অর্থাৎ বিস্মৃতি ইচ্ছামূলক।

ওয়াট্‌সন্-এর মত

চেষ্টিতবাদী ওয়াটসন্ মনে করেন যে বিস্মৃতির কারণ হইল **ভাষার অভাব** অথবা বাচিক অনুষঙ্গের (ভার্ব্যাল্ অ্যাসোসিয়েশন্) অভাব। শৈশবের প্রথম তিন অথবা চার বৎসরকালীন অভিজ্ঞতার বিস্মরণের মূলে রহিয়াছে এই অবস্থায় ভাষা অথবা বাচিক অনুষঙ্গের অভাব। ভাষার অভ্যাস কার্যকরী হইলেই অভিজ্ঞতার স্মরণ হয়, অর্থাৎ ঐ সম্বন্ধে লোককে বলা যায়।

৪। বিস্মৃতির প্রতিকার

বিস্মৃতির প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বনীয়। (১) একটি জ্ঞাত বিষয়ের সহিত যাহাতে অপর জ্ঞাত বিষয়ের সংঘাত না হয়, অর্থাৎ যাহাতে একটি অপরটিকে ব্যাহত না করে, সেই বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। (২) স্মৃতির পারস্পরিক ব্যাঘাতের মূলে রহিয়াছে একটি স্মৃতিরেখা মনে বদ্ধমূল না হইতেই, অন্য স্মৃতিরেখার দ্বারা মনকে প্রভাবিত করা। সুতরাং একটি স্মৃতিরেখাকে বদ্ধমূলভাবে মনে বসিয়া যাইবার সুযোগ দিতে হইলে, উহার পরক্ষণেই মনকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত। (৩) অনভ্যাসজনিত স্মৃতিক্ষীণতার বিষয়ে সতর্ক হইতে হইলে, অর্জিত বা জ্ঞাত বিষয়ের পুনরনুশীলন দরকার। এই বিষয়ে মনের সক্রিয়তার ফলে স্মৃতিরেখা মুছিয়া যায় না, বরং স্পষ্ট থাকে। (৪) বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার বিস্মৃতি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, উহা কেন বেদনাদায়ক তাহা বুঝিবার অভ্যাস করিতে হয়। এই কারণ বুঝিতে পারিলে ইহা অবদমিত বা বিস্মৃত হইবে না। (৫) জ্ঞাত বিষয়টি ভাষা অথবা বাচিক অনুষঙ্গের সাহায্যে জ্ঞাত হইলে, উহা বিস্মৃত হইবে না। (৬) সর্বোপরি, জ্ঞাত বা অর্জিত বিষয়কে নিশ্চিতভাবে মনে রাখিতে হইলে, উহার অতিরিক্ত শিক্ষণ (ওভার্-লার্নিং) দরকার।

৫। বিস্মৃতির প্রায়োগিক গবেষণা
(এক্সপেরিমেণ্ট্যাল্ স্টাডিজ্ অন্ ফরগেট্ফুল্নেস্)

বিস্মৃতির হার (রেট্ অফ্ ফরগেটিং)

বিস্মৃতির হার (রেট্ অফ্ ফরগেটিং) সম্বন্ধে এবিংহাউস্-এর প্রয়োগমূলক গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধেই বলা যায়, শিক্ষণের অব্যবহিত পরেই বিস্মৃতি বেশী মাত্রায় বা হারে এবং খুব শীঘ্র ঘটে, কালক্রমে ইহা অল্পহারে বা মাত্রায় এবং মন্দগতিতে ঘটিয়া, পরিণামে ইহা আর ঘটে না, অথবা নগণ্য হারে এবং গতিতে ঘটে।
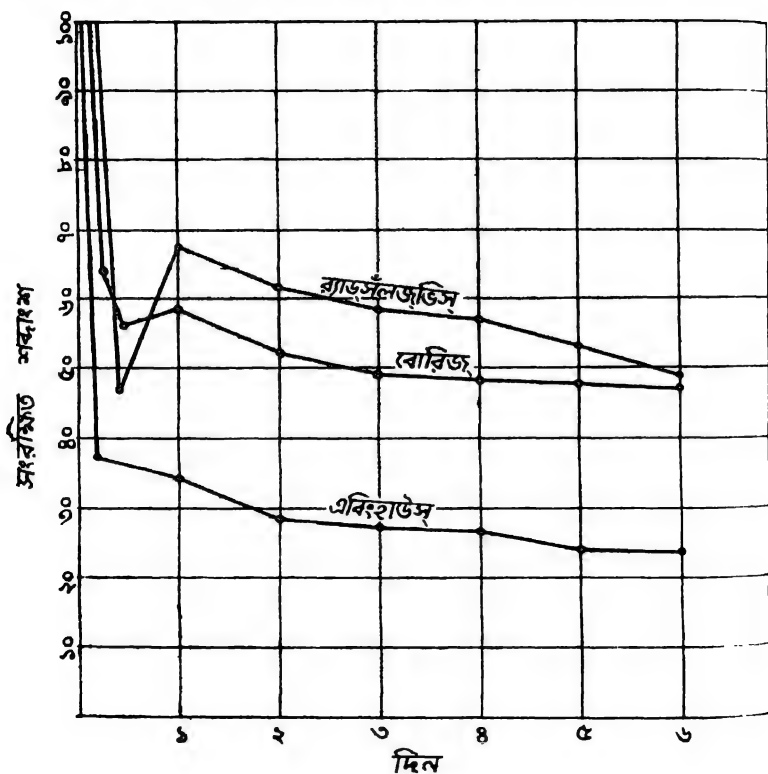
৫৭ নং চিত্র—
অর্থহীন শব্দাংশ সাহায্যে পরীক্ষিত বিস্মৃতি

উপরে ৫৭ নং চিত্রে এবিংহাউস্ বোরিজ্ এবং র্যাড্সলজ্ভিস্-এর তুলনামূলক বিস্মৃতিরেখা দেখানো হইয়াছে।

এবিংহাউস্-এর মতে শিক্ষণের প্রথম আধ ঘণ্টায়, আট ঘণ্টায় এবং একমাসে শিক্ষালব্ধ বিষয়ের যথাক্রমে অর্ধেক, দুই-তৃতীয়াংশ এবং চার-পঞ্চমাংশের বিস্মৃতি ঘটে। বিস্মৃতির এইরূপ হার হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে শিক্ষণের অল্পকাল পরেই শিক্ষালব্ধ বিষয়ের পুনরুদ্রেক বিশেষ কার্যকরী হয়, কারণ এই সময়েই দ্রুতহারে বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে। মুয়েলার, স্যুম্যান্, র‍্যাড্সলজ্ভিস্, বোরিজ্ প্রভৃতি মনোবিদ্গণ অল্পবিস্তর একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই প্রধানতঃ অর্থহীন শব্দাংশতালিকা লইয়া প্রায়োগিক গবেষণা করিয়াছেন।

৬। স্মৃতি-প্রসর (মেমরি স্প্যান্)

পাত্রের নিকট কতগুলি অর্থহীন শব্দাংশ, বর্ণ বা সংখ্যা একবার মাত্র উপস্থাপিত করা হইল। ইহার ঠিক পরেই, সে এই উপস্থাপিত শব্দাংশের যতটুকু পর্যন্ত নির্ভুল ও সুশৃঙ্খল পুনরুৎপাদন করিতে পারে এবং যতটুকুর বেশী পারে না ঐটুকুকে পাত্রের স্মৃতি-প্রসর (মেমরি স্প্যান্) বলে।

মনোবিদ্যার প্রয়োগশালার একটি সহজ প্রয়োগ হইল পাত্রের নিকট কমবেশী দীর্ঘ অর্থহীন শব্দাংশ, সংখ্যা বা বর্ণতালিকা নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থাপিত করা। পাত্র একবার মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া উপস্থাপনের ঠিক পরেই উহার যতটুকু শুদ্ধভাবে মনে করিতে পারে, তাহাই তাহার **অব্যবহিত স্মৃতি-প্রসর** (ইমিডিয়েট্ মেমরি স্প্যান্)। দর্শন প্রত্যক্ষে সাধারণতঃ ক্ষণদৃক্ যন্ত্রের (ট্যাসিস্টোস্কোপ্) সাহায্যে এই বস্তুগুলি এত অল্প সময়ের জন্য উপস্থাপিত হয় যে পাত্র একবারের বেশী উহাদের উপর দৃষ্টিপাত করিতে পারে না। অন্যভাবেও অব্যবহিত স্মৃতি-প্রসর পরীক্ষা করা যায়। যেমন পাত্রকে প্রতি সেকেণ্ডে একটি করিয়া শব্দ বলিয়া যাওয়া হয় এবং পাত্র ঊর্ধ্বসীমায় যতগুলি শ্রুত শব্দ মনে করিয়া বলিতে পারে তাহাই তাহার অব্যবহিত স্মৃতি-প্রসর।

এই প্রয়োগের ফলে দেখা গিয়াছে যে চার হইতে ছয় বর্ষীয় শিশুগণের স্মৃতি-প্রসর সাধারণতঃ চারটি সংখ্যা। পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি অক্লেশে পাঁচটি, ছয়টি এবং চেষ্টা না করিয়াই সাতটি বা আটটি পর্যন্ত সংখ্যা, একবার মাত্র অল্পক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া, মনে করিতে পারে। নারীপুরুষ, প্রত্যক্ষবস্তু, মনের নানা অবস্থা, মনোযোগ ও অনুশীলন প্রভৃতি ভেদে স্মৃতিপ্রসরের তারতম্য হইতে পারে। যেমন, উপস্থাপিত তালিকাটি দীর্ঘ হইলে পাত্রের মন অতি-ভারাক্রান্ত (ওভার্-লোডেড্) হইয়া পড়ে এবং স্মৃতি-প্রসর কমিয়া যায়।

অব্যবহিত স্মৃতি-প্রসর সাধারণতঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এবং একটি বয়ঃসীমা পর্যন্ত বাড়িতে থাকে। মিউম্যান্ বলিয়াছেন যে তের বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত অত্যন্ত ধীরগতিতে, তের হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত দ্রুতগতিতে ইহার বৃদ্ধি চলিতে থাকে। মিউম্যান্ আরও দেখিয়াছেন যে কুড়ি হইতে বাইশ বৎসর বয়ঃক্রমে ইহা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে এবং তাহার পর ইহার সামান্য হ্রাস ঘটে।

উপস্থাপনের ঠিক পরেই, অর্থাৎ প্রত্যক্ষবস্তু চেতন-স্তর ত্যাগ করিবার পূর্বেই, উহা স্মরণ বা মনে করাকে বলে **অব্যবহিত বা ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি** (ইমিডিয়েট্ মেমরি)। শিক্ষণ বা প্রত্যক্ষ এবং স্মরণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকিলে যে স্মৃতি অবশিষ্ট রহিয়া যায় তাহাকে বলে **স্থায়ী স্মৃতি** (পার্মানেণ্ট্ মেমরি)।

শিক্ষার দিক হইতে স্মৃতি-প্রসরের গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, যেহেতু শব্দ বানান করিতে গিয়া সপ্তমবর্ষীয় শিশু সাধারণতঃ মাত্র ছয়টি বর্ণ পর্যন্ত মনে করিতে পারে, সুতরাং তাহাকে ছয় সংখ্যার বেশী বর্ণবিশিষ্ট শব্দের বানান শিখাইতে হইলে ঐ শব্দকে শব্দাংশের এককে ভাগ করিয়া শিখাইতে হইবে।

৬। স্মৃতির বিকৃতি বা রোগ (ডিজর্ডারস্ অফ্ মেমরি)

সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন, প্রত্যভিজ্ঞা এবং স্থানকাল নির্দেশের বিষয়

সাধারণতঃ স্মৃতির বিকার (ডিজর্ডার্) বলিতে স্মৃতির চারটি অঙ্গের, যথা সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন , প্রত্যভিজ্ঞা এবং স্থানকাল নির্দেশের, বিকার বুঝায়।

সংরক্ষণের বিকার ঘটে মস্তিষ্কের আঘাতে—যেমন মস্তিষ্কে গুলিবিদ্ধ হইয়া। এইরূপ আঘাতের ফলে মস্তিষ্ক-পদার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের সংরক্ষণ নষ্ট হয় এবং স্মরণক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে।

দ্বিতীয়তঃ, পুনরুৎপাদনের বিকার উপস্থিত হয় হিস্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে মানসিক আঘাতের ফলে। হিস্টিরিয়া রোগী হয়ত কোনো বেদনাজনক ঘটনা মনে করিতে চাহে না বলিয়াই, উহা মনে করিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যভিজ্ঞার বিকার বাতুল বা উন্মাদগণের মধ্যে সচরাচর দৃষ্ট হয়। বাতুল তাহার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি বা পরিবেশকেও চিনিতে পারে না। তাহা ছাড়া দৈনন্দিন জীবনেও ইহা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। হয়ত রাস্তায় কোনো পরিচিত বন্ধু সম্ভাষিত না হইয়াই চলিয়া গেল, অথবা কোনো পূর্বপরিচিত ব্যক্তি প্রথম সাক্ষাতে অপরিচিত বলিয়া মনে হইল।

আবার স্থান-কাল-নির্দেশ ক্ষমতাও বহু স্মৃতির বিকারেই পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ বিকারে দূরবর্তী বস্তু নিকটে এবং নিকটবর্তী বস্তু দূরে বলিয়া স্মৃত হয়, আবার অল্প সময় দীর্ঘ এবং দীর্ঘ সময় অল্প বলিয়া মনে হয়।

বিস্মরণ, অতিস্মরণ এবং উপস্মরণ

অন্য দিক দিয়া স্মৃতির বিকারগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—যথা (১) বিস্মরণ বা অস্মার (অ্যাম্‌নেসিয়া), (২) অতিস্মরণ (হাইপার্মনেসিয়া) এবং উপস্মরণ (প্যারাম্‌নেসিয়া)।

বিস্মরণ বা অস্মার—অ্যাম্‌নেসিয়া

(১) সাধারণভাবে বিস্মরণ বা অস্মার (অ্যাম্‌নেসিয়া) বলিতে বুঝায় স্মরণ করিবার অক্ষমতা বা ভুলিয়া যাওয়া। রিবো তাঁহার ডিজিজ্‌ অফ্‌ মেমরি গ্রন্থে অস্মার-এর নিম্নোক্ত বিভাগ করিয়াছেন (ক) প্রথমতঃ সাধারণ (জেনার‍্যাল্‌) এবং আংশিক (পার্শিয়্যাল্‌) ভেদে অস্মার দুই প্রকার। সাধারণ অস্মার আবার সাময়িক (টেম্পোরারি), পর্যাবৃত্ত (পিরিয়ডিক্যাল্‌), বর্ধনশীল (প্রগ্রেসিভ্‌) এবং জন্মগত (কন্‌জেনিট্যাল্‌) হইতে পারে।

সাময়িক অস্মার কোনো আকস্মিক ঘটনার বা অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে হঠাৎ আরম্ভ হইয়া আবার হঠাৎ শেষ হয়, যেমন ভ্রামর অথবা মৃগী (এপিলেপ্সি) রোগে। প্রতীপক্রিয় অস্মার (রেট্রোয়্যাক্‌টিভ্‌ অ্যাম্‌নেসিয়া) এবং আভিঘাতিক অস্মার (সক্‌ অ্যাম্‌নেসিয়া) এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

পর্যাবৃত্ত অস্মার দুই বা বহু ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে (মাল্‌টিপ্‌ল্‌ পার্সন্যালিটি) পরিলক্ষিত হয়। ডঃ জেকিল এবং মিস্টার হাইড্‌-এর মত দুইটি স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব একই ব্যক্তির মধ্যে পর্যায়ক্রমে আবির্ভূত হইত। ডঃ জেকিল্‌-এর ব্যক্তিত্ব সক্রিয় হইলে মিঃ হাইড্‌-এর এবং মিঃ হাইড্‌-এর ব্যক্তিত্ব সক্রিয় হইলে ডঃ জেকিল-এর ব্যক্তিত্ব নিষ্ক্রিয় হইত।

বর্ধনশীল অস্মার বার্ধক্যের চিত্তভ্রংশের (সিনাইল্‌ ডিমেন্সিয়া) সহিত আবির্ভূত হয়। ইহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। সাম্প্রতিক ঘটনার প্রথম বিস্মৃতি এবং পুর্ববর্তী ঘটনার পরবর্তী বিস্মৃতি বার্ধক্যজনিত অস্মার-এর বৈশিষ্ট্য।

জন্মগত অস্মার জড়ধী (ইডিয়ট্‌) এবং দুর্বলধী (ইম্‌বেসাইল্‌) ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়। সহজাত মস্তিষ্কের দোষ হইতেই এই স্মৃতিবিকার ঘটে।

আংশিক অস্মার হয় বিশেষ ঘটনা, ব্যক্তি বা বস্তুর সম্বন্ধে। কাহারও হয়ত দৃষ্ট অথবা শ্রুত বিষয়ের স্মরণ নষ্ট হইতে পারে। পরীক্ষাকালে পরীক্ষার্থীর পরীক্ষণীয় বিষয়ের বিস্মৃতি এবং পরীক্ষান্তে উহার স্মরণ এই জাতীয় অস্মার একটি নাম হয়ত কিছুতেই মনে করা যায় না, কাহারও নিকট লিখিত প্রত্যেক চিঠিই হয়ত ডাকে দিতে ভুল হয়, এই সকল ঘটনা আংশিক অস্মার-এর পরিচিত দৃষ্টান্ত।

অতিস্মরণ—হাইপার্ম্নেসিয়া

অতিস্মরণ নামক স্মৃতিবিকারে অতীত অভিজ্ঞতায় অত্যধিক পুনরুদ্রেক ঘটে। এই বিকারে দীর্ঘকাল-বিস্মৃত ঘটনাগুলি নিখুঁতভাবে মনে জাগিয়া প্রবল বন্যার মত মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে। অতীতের ঘটনাগুলির যে সকল খুঁটিনাটি মনে রাখা স্বাভাবিক নয়, সেইগুলি সবেগে মনকে আক্রমণ করে। ইহার ফলে মনের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়। বিস্মরণ অতিস্মরণ অপেক্ষা কম উদ্বেগজনক স্মৃতিবিকার নয়। সুস্থ ও স্বভাবীমনের পক্ষে অতীত ঘটনার অনেক খুঁটিনাটি ভুলিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। অতীতের অনেক কিছু না ভুলিলে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য মনকে প্রস্তুত করা যায় না।

উপস্মরণ—প্যারাম্নেসিয়া

উপস্মরণ একটি প্রত্যভিজ্ঞার ভ্রম। অপরিচিতকে পরিচিত বলিয়া বোধ করাকে বলে উপস্মরণ। ফরাসীরা ইহাকে বলে দি জা ভু অথবা দি জা ভিকু। বর্তমানের অভিজ্ঞতাটি যেন পূর্বেও হইয়াছে এইরূপ বোধ হয়, যদিও এইরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। রাস্তা পার হইবার পূর্বেই মনে হইতে পারে যেন পার হইয়াছি। একটি নূতন স্থানকে বহু পরিচিত বলিয়া অনুভব হইতে পারে, যদিও এই পরিচিতির কোনো সম্ভাবনা ঘটে নাই। প্রধানতঃ নবযৌবনে (অ্যাডোলেসেন্স্) এই প্রত্যভিজ্ঞার ভ্রমটি ঘটিয়া থাকে।

উপস্মরণের কারণ

উপস্মরণের নানা কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে ভবিষ্যৎ-সূচক স্বপ্ন (প্রফেটিক ড্রিম্) বলিয়াছেন। আবার প্লেটো পূর্বজন্মলব্ধ অভিজ্ঞতাকে ইহার কারণ বলিয়াছেন। মনোবিদ্‌গণ উহার নিম্ন প্রকার কারণ দেখাইয়াছেন।

(ক) প্রত্যক্ষের বিলম্ব ঘটিবার জন্য প্রথম সংবেদনটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যেন পূর্ব-প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভূত হয় ; (খ) মনোযোগের অথবা মানসশক্তির হ্রাসফলে প্রত্যক্ষটিকে স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় ; (গ) পরিচিতি বোধটি প্রত্যক্ষের যে অংশের সহিত সংলগ্ন, তাহা হইতে ছড়াইয়া পড়ে সেই সকল অংশে যাহাতে উহা সংলগ্ন হয়, কারণ প্রথম অংশের সহিত দ্বিতীয় অংশগুলির সাদৃশ্য রহিয়াছে ; (ঘ) ডঃ মড্স্লে প্রভৃতি মনে করেন যে মস্তিষ্কের দুই অর্ধাংশের কার্যে সামঞ্জস্য বা মিল না থাকাই উপস্মরণের কারণ।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

উড্ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড্ মার্ক্ইস্—সাইকলজি—সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

উড্ওয়ার্থ্—সাইকলজি (ত্রয়োদশ সংস্করণ)—দশম পরিচ্ছেদ

বোরিং, ল্যাংফেল্ড্, ওয়েল্ড্—ফাউণ্ডেশন্স্ অফ্ সাইকলজি—অষ্টম পরিচ্ছেদ

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেণ্ট্স্ অফ্ সাইকলজি—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

এম্ কলিনস্ অ্যাণ্ড্ জে. ড্রিভার্—এক্সপেরিমেণ্টাল্ সাইকলজি—ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এইচ্ ই. গ্যারেট্—গ্রেট্ এক্সপেরিমেণ্ট্স্ ইন্ সাইকলজি—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সি. মায়াস্—এ টেক্সট্ বুক্ অফ্ এক্সপেরিমেণ্ট্যাল্ সাইকলজি—প্রথম খণ্ড—দ্বাদশ, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

Exercise

1. What are the methods of economising memory ? (pp 557-560)
2. Discuss whether the whole or part method of learning is more economical. (pp. 557-558)
3. Write notes on (a) Recitation, (b) Overlearning and (c) Grouping as methods of learning. (pp 558-559)
4. How does logical memory and symbolism help the learning process ? (pp 559-560)
5. Explain some of the main experiments on memory laying stress on those made by Ebbinghaus. (pp. 560-563)
6. Write notes on (a) method of retained members, (b) Reconstruction method, (c) method of Selection and (d) Identical Series method. (pp. 562-563)
7. Explain the psychology of forgetfulness. What are its causes ? (pp 563-565)
8. What are the remedies of forgetfulness ? (p. 565)
9. Explain some of the main experiments on forgetfulness (pp 566-567)
10. What is meant by memory-span ? What is the method of determining it ? (pp. 567-568)
11. What are the main diseases of memory ? Explain the main types of these diseases. (pp. 568-571)
12. Write notes on (a) Amnesia, (b) Hypermnesia, (c) Paramnesia. (pp. 569-571)

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা (লার্নিং)

১। শিক্ষণ কাহাকে বলে

অভিজ্ঞতা বা অনুশীলনের ফলে প্রতিক্রিয়ার সংস্কারসাধনকে (মডিফিকেশন্) শিক্ষণ বলে। প্রত্যেক উদ্দীপনার ফলে প্রতিক্রিয়ার সংস্কার বা পরিবর্তন ঘটে। যেমন, একটি নূতন কবিতার প্রথম পঠনে বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক সহজে সাড়া দিতে চায় না, কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থবার পঠনে, উহাদের প্রতিক্রিয়া ক্রমশঃ সহজ হইতে থাকে। কবিতাটি আরও অধিকবার অনুশীলন করিলে, উহা আয়ত্ত হইয়া যায়। এইরূপে, শিখিবার মানসিক এবং দৈহিক ক্রিয়াগুলির ফল সুগঠিত এবং স্থায়ী হয়। প্রথম পাঠে কবিতাটি বুদ্ধিতে এবং মস্তিষ্কে অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু পুনরাবৃত্তির ফলে উহার প্রতিকূলতা কমিতে থাকে এবং মস্তিষ্কে ও বুদ্ধিতে অনুকূল প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয়। যে পাঠ্য বিষয়টি প্রথম পঠনে অত্যন্ত দুরূহ এবং নীরস বলিয়া মনে হয়, তাহাই শিক্ষণের ফলে হইয়া দাঁড়ায় সহজ এবং সরস।

বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা, দৌড়ানো, কথা বলা, সাইকেল চড়া, টাইপ করা, সেলাই করা, সাঁতার কাটা প্রভৃতি ক্রিয়া এবং সহজাত ক্রিয়া বাদ দিলে, প্রায় সকল মানস এবং দৈহিক ক্রিয়াই শিক্ষণের ফলে ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেকটি ক্রিয়াই প্রথমে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে, কিন্তু অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফলে সহজ হইয়া দাঁড়ায়। **যে ক্রিয়ার ফলে প্রতিকূল এবং দুরূহ কাজ অনুকূল এবং সহজ হইয়া দাঁড়ায় তাহাকে শিক্ষণ বলে। অথবা যে ক্রিয়া প্রত্যেক পরবর্তী অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনকে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের তুলনায় উন্নততর করে তাহাই শিক্ষণ।**

শিক্ষণের শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি

যে ক্রিয়া প্রতিকূল দৈহিক বা নার্ভক্রিয়াকে অনুকূল করে, অথবা সংশ্লিষ্ট দৈহিক ক্রিয়াগুলিকে উহাদের উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিতে সাহায্য করে, তাহাকে শিক্ষণ বলে। "হাঁটিতে শিখেনা কেহ না খেয়ে আছাড়।" হাঁটিতে

হইলে নার্ভ, পেশী এবং স্নায়ু প্রভৃতির সংযোজন প্রয়োজনীয় তাহা শিক্ষণ-সাপেক্ষ। দৈহিক ক্রিয়ার সংস্কার-সাধন এবং স্থায়ী সংগঠনও শিক্ষণের ফল।

শিক্ষণ ও অভ্যাস গঠন

শিক্ষণ অভ্যাস বিশেষ। অনুশীলনে অভ্যাসগঠনের প্রাথমিক ক্লেশ স্বাচ্ছন্দ্যে পরিণত হয়, ফলে অভ্যাস গৌণ স্বভাব (সেকেণ্ড্ নেচার্) হইয়া দাঁড়ায়। শিক্ষণের ফলেও অনুশীলনের প্রাথমিক ক্লেশ ক্রমে ক্রমে স্বভাবসুলভ হইয়া পড়ে। যে আজ অনায়াসে চোখ বুজিয়া সেলাই বা টাইপ করিয়া যাইতে পারে, তাহার পক্ষে এই ক্রিয়া শিক্ষণের প্রাথমিক স্তরে খুবই আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল। যে ছাত্র আজ অবলীলাক্রমে বই পড়িয়া যায় তাহাকেই একদিন বহু ক্লেশে বর্ণমালার মরুভূমি পার হইতে হইয়াছিল। সুতরাং অনভ্যস্ত বা নূতন বিষয়ে অভ্যস্ত হওয়াকেও শিক্ষণ বলা যাইতে পারে।

২। শিক্ষণের গবেষণায় পশুব্যবহার

শিক্ষণের গবেষণায় মনোবিদ্‌গণ তাঁহাদের পাত্র হিসাবে উচ্চতর প্রাণী বা পশুর ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ইঁদুর, বিড়াল, কুকুর, বানর, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি পশুর শিক্ষাপ্রণালী অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, কারণ উহা কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তির প্রভাবমুক্ত। পক্ষান্তরে মানুষের শিক্ষণ প্রণালী উচ্চতর মানসবৃত্তির প্রভাবমুক্ত নয়।

লয়েড্ মর্গ্যান্-এর সূত্র (লয়েড্ মর্গ্যান্'স্ ক্যানন্)

উচ্চতর পশুর শিক্ষাপ্রণালীকে মানুষের শিক্ষাপ্রণালীর মানদণ্ডে বিচার করা অনুচিত। এইরূপ করিলে পশুর শিক্ষণগবেষণা পণ্ড হয়। এই বিষয়ে সতর্ক করিবার জন্য বিখ্যাত প্রাণিমনোবিৎ লয়েড্ মর্গ্যান্ তাঁহার সূত্রে এই নির্দেশ দিয়াছেন: **"কোনো ক্রিয়াকে নিম্নতর মানসবৃত্তির ফলরূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইলে কোনোমতেই উচ্চতর মানসবৃত্তির ফলরূপে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়।"** যেমন, একটি কুকুরকে বেড়া দিয়া ঘেরা উঠানে রাখা হইলে, সে যদি মুখ দিয়া উহার দরজার খিল খুলিয়া ফেলে, এইরূপ মনে করা উচিত নয় যে কুকুরটি যুক্তির সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করিয়াছে। পক্ষান্তরে আবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার লক্ষ্য, এই লক্ষ্যে

পৌছিবার নির্দিষ্ট উপায়ের অভাব, নানা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া ও অবস্থাটি পর্যবেক্ষণ করিয়া শেষ পর্যন্ত ঠিক পথ পাইয়া লক্ষ্যে পৌছানো, এই ক্রিয়াগুলিই কুকুরের উক্ত আচরণ বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রথমে কুকুরটি শিখিল কোথায় এবং কোন্ স্থানে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এবং তারপর সে শিখিল কোন্ জিনিসটি বা যন্ত্রটির সাহায্যে তাহার লক্ষ্যে পৌছিতে হইবে। প্রথমটি হইল **স্থান শিক্ষণ** (প্লেস্ লার্নিং) এবং দ্বিতীয়টি হইল **যন্ত্র-শিক্ষণ** (টুল্ লার্নিং)।

৩। শিক্ষণ মতবাদ (থিওরিজ্ অফ্ লার্নিং)

কি প্রণালীতে শিক্ষণ ঘটে, এই বিষয়ে মনোবিদ্‌গণ একমত নহেন। কেহ কেহ, যেমন থর্নডাইক্, মনে করেন যে শিক্ষণ একটি যান্ত্রিক ও অন্ধ ক্রিয়া (মেকানিক্যাল্ অ্যাণ্ড্ ব্লাইণ্ড্ প্রসেস্) এবং ইহাতে বুদ্ধির বা চেতনার নিয়ন্ত্রণ নাই। অন্ধ আবেগের বশবর্তী হইয়াই পশু লক্ষ্যে পৌছাইতে শিক্ষা করে। শিক্ষণের মূলে থাকে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা বা পরীক্ষা। প্রাথমিক চেষ্টায় ভুলের সংখ্যা থাকে বেশী। চেষ্টার পুনরাবৃত্তির ফলে, ভুলের সংখ্যা কমিতে থাকে এবং সর্বশেষে নির্ভুল সাফল্য লাভ হয়। থর্ন্ডাইক্-প্রবর্তিত শিক্ষণ-মতকে পরীক্ষা ও ভ্রান্তিমূলক (ট্রায়াল্ অ্যাণ্ড্ এরর্ থিওরি) মত বলা হইয়া থাকে।

আবার কেহ কেহ, যেমন প্যাভ্লো, বিচ্‌টিরিও, ওয়াট্‌সন্ মনে করেন যে শিক্ষণ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স্) বুঝায়। স্বাভাবিক বা নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত উহার স্বাভাবিক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ারূপেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঐ স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত অস্বাভাবিক উদ্দীপক, উপস্থাপিত করা হইলে দ্বিতীয়টি প্রথমটির প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। **অস্বাভাবিক উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন প্রতিক্রিয়াকে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত বলে।** সকল শিক্ষণই জ্ঞাত বস্তুর সাহায্যে অজ্ঞাতকে জানা, অর্থাৎ স্বাভাবিক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়াটিকে কোনো অস্বাভাবিক উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন করিতে শিক্ষা বুঝায়।

শিক্ষণ সম্বন্ধে তৃতীয় মতবাদটি গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্‌গণের পরিজ্ঞান মতবাদ (ইন্‌সাইট্ থিওরি অফ্ লার্নিং)। নানা প্রচেষ্টা বা পরীক্ষার মধ্য দিয়া ভুলভ্রান্তি সংশোধনের মৌলিক প্রতিবর্তের সাপেক্ষতার শিক্ষণ সাহায্যেও ইহা

ঘটে না। শিক্ষণ ঘটে শিক্ষণীয় বিষয়ের সমগ্র রূপটির পরিজ্ঞান (ইন্‌সাইট্) সাহায্যে। শিক্ষণ ভুলভ্রান্তি সংশোধনের ফলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় না, কিন্তু হয় শিক্ষণীয় বিষয়ের আকস্মিক পরিজ্ঞানের ফলে।

৪। থর্ন্‌ডাইক্-এর পরীক্ষা ও ভ্রম সংশোধন মতবাদ (থিওরি অফ্ ট্রায়াল্ অ্যাণ্ড্ এরর্)

থর্ন্‌ডাইক্-এর পরীক্ষা ও ভুল সংশোধন মতবাদ তাঁহার দ্বারা পরিচালিত মাছ, মুরগীশাবক, বিড়াল, কুকুর এবং বানরের উপর দীর্ঘ গবেষণার ফল।

থর্ন্‌ডাইক্ বলেন যে "শিক্ষণ বলিতে বুঝায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঠিক সম্বন্ধস্থাপন। ইহা একটি অন্ধ যান্ত্রিক ক্রিয়া, যাহাতে একবার ভুল করিয়া, আবার ভুল সংশোধন করিয়া অগ্রসর হইতে হয়।" শিক্ষণ বুদ্ধি বা বিচারগত নয়, কিন্তু যান্ত্রিক এবং অন্ধ। থর্ন্‌ডাইক্-এর মতবাদকে যোগসূত্র স্থাপনের মতবাদও (কনেক্‌শন্‌ইজ্‌ম্, দি বণ্ড্ থিওরি অফ্ লার্নিং) বলা হয়।

থর্ন্‌ডাইক্-এর পরীক্ষা

থর্ন্‌ডাইক্-এর অসংখ্য পশু-শিক্ষণ-গবেষণার মধ্যে বিড়ালের উপর গবেষণাই সমধিক প্রসিদ্ধ। বিড়ালের শিক্ষণপ্রণালী নির্ণয়ের জন্য তিনি একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে ধাঁধাঁ পিঞ্জরের (পাজ্‌ল্ বক্স্) ভিতর আটকাইয়া রাখিলেন। ঐ ধাঁধাঁ পিঞ্জরের একটু দূরে উহার প্রিয় খাদ্য মাছ থাকিল। ক্ষুধার্ত বিড়ালটি এই অবস্থায় নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিল। প্রথমেই সে পিঞ্জরের গরাদের ভিতর মাথা ঢুকাইতে, মাছ টানিয়া লইবার জন্য থাবা বাড়াইতে এবং পিঞ্জরের গবাদে আঁচড়াইতে ও কামড়াইতে থাকিল। কিন্তু তাহার সকল প্রচেষ্টাই বিফল হইল। এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে হঠাৎ তাহার থাবার আঘাতে, যে দড়িতে পিঞ্জরের দরজাটি বাঁধা ছিল, সেই দড়িটি খুলিয়া গেল। বিড়াল পিঞ্জরমুক্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া মাছ খাইল এবং সন্তুষ্ট হইল। প্রত্যেক পরবর্তী পরীক্ষায় বিডালের ভুল প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা এবং দড়ি টানিয়া খাঁচার বাহিরে আসিয়া মাছ খাইবার সময়ও, ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। সর্বশেষ পরীক্ষায় সে ভুল চাল-চলনে বিন্দুমাত্র সময়ক্ষেপ না করিয়াই লক্ষ্যে পৌছাইতে শিখিল। বলা যাইতে পারে, বিড়াল এইবার লক্ষ্যে পৌছাইতে শিখিয়াছে।

খাঁচার দরজা খুলিয়া খাদ্যে পৌছিতে চব্বিশটি ক্রমিক পরীক্ষায় বারো নম্বর বিড়ালটির যথাক্রমে ১৬০, ৩০, ৯০, ৬০, ১৫, ২৮, ২০, ৩০, ২২, ১১, ১৫, ২০, ১২, ১০, ১৪, ১০, ৮, ৮, ৫, ১০, ৮, ৬, ৬, ৭ সেকেণ্ড সময় লাগিয়াছে। নীচের লেখ বা চিত্রে এই পরীক্ষাফল দেখানো হইল।
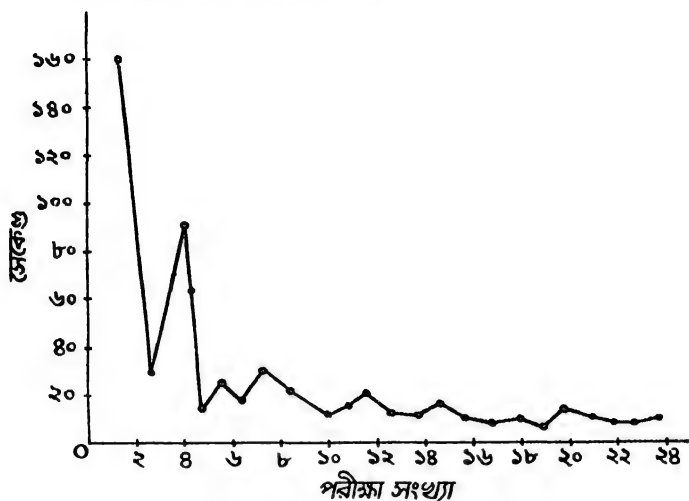
৫৮নং চিত্র—বিড়ালের শিক্ষণ চিত্র

উপরের লেখ বা চিত্র হইতে বুঝা যায় যে বিড়ালের লক্ষ্যে পৌছিবার সময় অনিয়মিতভাবে হইলেও, ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে বিড়ালের ভুল বিচলনগুলি ক্রমশঃ মুছিয়া গিয়া (স্ট্যাম্প্ড্ আউট্) শুদ্ধ বিচলনগুলি থাকিয়া যায় (স্ট্যাম্প্ড্ ইন্)।

৫। থর্ন্ডাইক্-উদ্ভাবিত শিক্ষণসূত্র (ল'জ্ অফ্ লার্নিং)

বিভিন্ন পশুর উপর পরীক্ষা করিয়া থর্ন্ডাইক্ কয়েকটি শিক্ষণসূত্র বা নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন।

(১) ফল-সূত্র (ল' অফ্ এফেক্ট্): কোনো উদ্দীপকের সহিত প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় সম্বন্ধের ফলে সন্তোষজনক অবস্থায় উহাদের সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয় এবং বিরক্তিজনক অবস্থায় দুর্বলতর হয়। পরিবর্তনীয় সম্বন্ধ বলিতে বুঝায় শিক্ষণের দ্বারা পরিবর্তনীয় সম্বন্ধ। কতগুলি উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধ

অপরিবর্তনীয়, যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস, হজমক্রিয়া, মণিপ্রতিবর্ত (পিউপিলারি রিফ্লেক্স্), নাকডাকা প্রভৃতি।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তে বিড়ালের খাদ্যরূপ লক্ষ্যে পৌছানো নানা পরিবর্তিত বিচলনের নির্ভর করে। যে বিচলনগুলি লক্ষ্যে পৌছিবার সহায়ক, সেইগুলি উহার ক্ষুধা-নিবারণরূপ সন্তোষজনক অবস্থার উদ্ভব করে, সুতরাং সেইগুলির সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয় এবং উহারা টিকিয়া থাকে। কিন্তু যে বিচলনগুলি লক্ষ্যে পৌছিবার প্রতিকূল, সেইগুলি উহার ক্ষুধা না মিটাইয়া বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে, সুতরাং উহাদের সম্বন্ধ দুর্বলতর হয় এবং উহারা মুছিয়া যায়।

ফলসংক্রান্ত নিয়মকে **পুরস্কার ও দণ্ডসংক্রান্ত নিয়মও (দি ল' অফ্ রিওয়ার্ড্ অ্যাণ্ড্ পানিশ্মেণ্ট্)** বলা যায়। বিড়ালের যে বিচলন বা চেষ্টা খাদ্যলাভে সহায়তা করে, সেইগুলির ফলে সে সন্তুষ্ট বা পুরস্কৃত হয়, আবার যেগুলি ঐরূপ করে না, উহাদের ফলে সে অসন্তুষ্ট বা দণ্ডিত হয়। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ায় যে পরিবর্তনীয় সম্বন্ধ পুরস্কার এবং দণ্ড আনে তাহা যথাক্রমে দৃঢ়তর এবং দুর্বলতর হয়।

(২) **অনুশীলন বা পৌনঃপুনিকতা সূত্র** (ল' অফ্ এক্সারসাইজ্ অর্ ফ্রিকোয়েন্সি): অনুশীলন বা পৌনঃপুনিকতা নিয়মের দুইটি দিক, যথা অনুশীলন এবং অননুশীলন। কোনো উদ্দীপকের সহিত প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে, অনুশীলন সম্বন্ধটিকে দৃঢ়তর করে, আবার উহা স্থাপিত না হইলে, অনুশীলনের অভাব সম্বন্ধটিকে দুর্বল করে। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম নিয়মটি অক্ষুণ্ণ থাকা চাই, অর্থাৎ অনুশীলনের এবং অননুশীলনের ক্ষেত্রে সম্বন্ধটি যথাক্রমে সন্তোষজনক এবং অসন্তোষজনক হওয়া চাই।

উপরোক্ত অনুশীলন নিয়মের সহিত সম্বন্ধের **তীব্রতা** (ইন্টেন্সিটি) এবং **সাম্প্রতিকতা** (রিসেন্সি) বিশেষভাবে জড়িত। উজ্জ্বল আলোক, উচ্চ শব্দ প্রভৃতি তীব্র উদ্দীপকের সহিত পুনঃ পুনঃ অনুশীলিত প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আবার যে সম্বন্ধটি সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে তাহা অতীতে স্থাপিত সম্বন্ধ অপেক্ষা দৃঢ়তর হয়।

অনুশীলন এবং ফলসংক্রান্ত নিয়ম দুইটি একযোগে কাজ করে। সাধারণতঃ যে ক্রিয়া সন্তুষ্ট অথবা পুরস্কৃত করে, তাহারই অনুশীলন হয় এবং যাহা বিরক্ত বা দণ্ডিত করে তাহার অনুশীলন হয় না। ফলে, প্রথমোক্ত ক্রিয়াটি থাকিয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয়োক্তটি থাকে না।

(৩) প্রস্তুতি-সংক্রান্ত নিয়ম (দি ল' অফ্ রেডিনেস্) : থর্ন্ডাইক্ এই নিয়মকে প্রধানতঃ নার্ভক্রিয়ার প্রস্তুতি অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নার্ভ তন্ত্রের উপর উদ্দীপকের ক্রিয়ায় যে নিউরোন্‌গুলি সক্রিয় হইয়া নার্ভপ্রবাহের আকারে ঐ উত্তেজনাকে নার্ভকেন্দ্রে লইয়া যায়, ঐ নিউরোন্‌গুলিকে পরিবহন একক (কন্ডাক্‌শন্ ইউনিট্) বলা যাইতে পারে। সকল পরিবহন-একক উত্তেজনা গ্রহণ করিয়া নার্ভকেন্দ্রে পরিচালিত করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে না। উত্তেজনাকে পরিচালিত করিতে প্রস্তুত পরিবহন-এককের পক্ষে উহা পরিচালনা করা সুখকর। কিন্তু এইরূপ করিতে প্রস্তুত নয় এমন পরিবহন-এককের পক্ষে উহা পরিচালনা করা বিরক্তিকর।

কয়েকটি গৌণ নিয়ম

(১) একই উদ্দীপকের বহু প্রতিক্রিয়া-সূত্র (ল' অফ্ মাল্‌টিপ্‌ল্ রেস্‌পন্স্ টু দি সেইম্ এক্সটার্ন্যাল্ সিচুয়েশন্)—উপরোক্ত তিনটি প্রধান নিয়ম ছাড়াও থর্ন্ডাইক্ আরও পাঁচটি গৌণ নিয়ম উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটি হইল একই বাহ্য উদ্দীপকের বহু প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়ম। যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ বিড়াল খাদ্য-দর্শনরূপ উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ায় নানারূপে অঙ্গচালনা করে অথবা নানারূপে ক্রিয়াশীল হয়।

(২) প্রতিন্যাস, প্রস্তুতি অথবা স্বভাবের নিয়ম (ল' অফ্ অ্যাটিচুড্, সেট্ অর্ ডিস্‌পজিশন্)—দ্বিতীয় গৌণ নিয়মটি হইল প্রতিন্যাস, প্রস্তুতি অথবা স্বভাবের নিয়ম। ক্ষুধার্ত বিড়ালের প্রতিন্যাস প্রস্তুতি এবং স্বভাব খাদ্যান্বেষণে সক্রিয় হয়। সে পিঞ্জরের দরজা খুলিবার জন্য অস্থির হয়, কিন্তু ক্ষুধা মিটিয়া গেলে হয়ত পিঞ্জরেই শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়ে।

(৩) আংশিক প্রতিক্রিয়া নিয়ম (ল' অফ্ পার্শিয়াল্ অ্যাক্‌টিভিটি)—তৃতীয়টি হইল আংশিক সক্রিয়তার নিয়ম। যে বিড়াল অনেকগুলি পিঞ্জরের বাহিরে আসিতে শিখিয়াছে সে অনভিজ্ঞ বিড়ালের তুলনায় নূতন পিঞ্জরের পার্শ্বে অবস্থিত ক্ষুদ্র বস্তুগুলির প্রতি বেশী মনোযোগী হইবে। এই দিক দিয়া শিক্ষণ বলিতে বুঝায় কোনো সমগ্র পরিস্থিতির অর্থপূর্ণ অংশ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া। আংশিক প্রতিক্রিয়া সূত্রটি এই, "কোনো অবস্থার একটি অংশ বা উপাদানই কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি

করিতে পারে, যদিও সমগ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবার সম্পূর্ণ অবস্থাটি উপস্থিত নাও থাকিতে পারে।”

(৪) সাদৃশ্য বা উপমান সূত্র (ল’ অফ্ অ্যাসিমিলেশন্ অর্ অ্যানালজি)—চতুর্থ নিয়মটি হইল সাদৃশ্য অথবা উপমান নিয়ম। “এক অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তাহা অনুরূপ অবস্থা দ্বারাও সৃষ্টি হইতে পারে, যদিও পূর্বে সেই অবস্থা স্বভাবতঃ সেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিত না।” অতীতে যে সকল পরিস্থিতির কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটে নাই সেইগুলি উহাদের সদৃশ পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। যেমন নূতন পিঞ্জরে আবদ্ধ বিড়াল নূতন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া, পুরাতন পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকা কালে সে যে সকল অঙ্গচালনা করিয়াছিল, তাহার অনুরূপ অঙ্গচালনা করে।

(৫) পঞ্চম গৌণ নিয়মটি হইল আনুষঙ্গিক পরিবর্তন নিয়ম (ল’ অফ্ অ্যাসোসিয়েটেড্ শিফ্টিং)—এই নিয়মটি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত নিয়মের অনুরূপ। একটি প্রতিক্রিয়া উহার স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত একসঙ্গে উপস্থাপিত উদ্দীপকের দ্বারাও উৎপন্ন হইতে পারে। যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়াল মাছের পাত্র দেখিয়াই উহা পাইবার জন্য সচেষ্ট হয়।

৬। পরীক্ষা ও ভ্রমসংশোধনবাদের সমালোচনা

গুণ

থর্নডাইক্-এর শিক্ষণমতবাদ মনোবিদ্যায় আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। **বহু পরীক্ষা ও প্রয়োগের ভিত্তিতে তাঁহার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত।** সুতরাং প্রায়োগিক মনোবিদ্যায় ইহার মূল্য অপরিসীম।

দোষ

(১) কিন্তু তাঁহার মতবাদটি যান্ত্রিক। ইহাতে শিক্ষণে উদ্দেশ্যমূলকতার স্থান নাই। অথচ বিড়াল প্রভৃতি উচ্চতর পশুরা তো বটেই, এমন কি প্যারামিসিয়া, অ্যামিবা প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীরাও, অনেক মনোবিদের মতে, অজ্ঞাত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে শিখে। অসংখ্য পুনরাবৃত্তি অথবা অনুশীলনও নিরর্থক হয়, যদি শিখিবার ইচ্ছা না থাকে। আবার শিখিবার ইচ্ছা থাকিলে একবার অনুশীলনেও আশাতীত সুফল পাওয়া যায়।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্, উড্‌ওয়ার্থ্ প্রভৃতি মনোবিৎ শিক্ষণে কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুতি এবং লয়েড্ মর্গ্যান্ প্রচেষ্টার মধ্যে একাগ্রতা বা দৃঢ়তার স্থান স্বীকার করিয়াছেন। পিঞ্জরাবদ্ধ বিড়াল পিঞ্জরের বাহিরে আসিয়া খাদ্য না পাওয়া পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা করিয়া যায়। সুতরাং উহার প্রচেষ্টা অন্ধ বা যান্ত্রিক নয়। চেতন ও প্রত্যক্ষমূলক মনোযোগ, সুখ দুঃখ বেদনা প্রভৃতি মানসবৃত্তির সহিত ইহা সংশ্লিষ্ট। অথচ থর্ন্‌ডাইক্ যেন বলিতে চান যে শিক্ষণে এই সকল উচ্চতর মানসবৃত্তির কোনো স্থান নাই।

(২) চেষ্টা ও ভুল করিতে করিতে ক্রমশঃ ভুল কমিয়া যায়। কিন্তু নিছক যান্ত্রিকভাবে অথবা আপনা আপনি ভুলগুলি শোধরায় না। চেষ্টা ও ভুলের ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে প্রাণীর দৈহিক-মানসিক অবস্থার উপর। কোনো পরিস্থিতিতে হয়ত ভুলগুলি প্রাণীকে এমন বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে যে উহা অন্ধভাবে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়া যাইতে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে শাস্তি ভুল সংশোধনের পরিবর্তে আরও বদ্ধমূল করিয়া দেয়।

(৩) থর্ন্‌ডাইক্ ধরিয়া লইয়াছেন যে শিক্ষণ কতগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন ঘটনার সংযোগ মাত্র। কিন্তু শিক্ষণ একটি সমগ্র ব্যাপার। ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয়ের সমগ্র রূপটির জ্ঞান বা চেতনা আবশ্যক। পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়াল খাঁচাটি এবং উহার বাহিরে স্থাপিত খাদ্য পরস্পরবিচ্ছিন্নভাবে দেখে না, কিন্তু সে দেখে ক্ষুধা-খাদ্য-খাঁচা প্রভৃতির সমন্বয়ে একটি সমগ্র পরিস্থিতি।

(৪) থর্ন্‌ডাইক্-উদ্ভাবিত নিয়মগুলিও অনেকাংশে অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। যেমন ফলসংক্রান্ত নিয়মের সহিত যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর সামঞ্জস্য নাই। সাফল্য-জনিত সন্তোষ বা পুরস্কার এবং অসাফল্যজনিত বিরক্তি বা শাস্তি বিড়াল, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীর উপর উচ্চতর মানসবৃত্তির আরোপ করে।

৭। ওয়াট্‌সন্-এর শিক্ষণ মতবাদ

ওয়াট্‌সন্ বলিয়াছেন যে শুধু অনুশীলন বা পৌনঃপুনিকতা এবং সাম্প্রতিকতা, এই দুইটি নিয়ম দিয়াই শিক্ষণ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে শিক্ষণের ব্যাখ্যায় চেতনা বা মন-প্রভাবিত মানসবৃত্তি স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। **পৌনঃপুনিকতা সূত্রের প্রয়োজন** এই যে ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়ার তুলনায় সফল প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা বেশী, কারণ প্রত্যেক প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি হয় সাফল্যলাভে, অথচ একই ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া প্রতি চেষ্টায় না ঘটিতে

পারে। এই কারণেই বার বার চেষ্টার ফলে সাফল্য লাভ হয়। আবার যে চেষ্টায় সাফল্য লাভ ঘটে তাহা **সাম্প্রতিকও** বটে, কারণ সফল প্রতিক্রিয়াই সর্বশেষ চেষ্টা। সেই কারণেও সফল প্রতিক্রিয়া স্থায়িত্বলাভ করে এবং বিফল প্রতিক্রিয়ার বিলোপ ঘটে।

ওয়াট্‌সনীয় মতের সমালোচনা

পক্ষান্তরে টম্‌সন্ অনুশীলন এবং সাম্প্রতিকতা নিয়ম অপেক্ষা ফল-সংক্রান্ত নিয়মকে প্রধান বলিয়া মনে করেন। থর্ন্‌ডাইক্ স্বয়ং এই নিয়ম দুইটিকে ফল-সংক্রান্ত নিয়মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে করেন।

টম্‌সন্, ওয়াট্‌সনীয় মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ফল-সংক্রান্ত নিয়মকে বাদ দিয়া শুধু অনুশীলন এবং সাম্প্রতিকতা নিয়মের সাহায্যে শিক্ষণের ব্যাখ্যা হইতে পারে না। সফল ক্রিয়াগুলি যে সর্বাধিক পুনঃ পুনঃ ঘটিবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। হয়ত একই ভুল প্রতিক্রিয়ার বহুবার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে এবং এই ভুলটি বার বার অনুষ্ঠিত হইবার ফলে বদ্ধমূল হইয়া যাইতে পারে। আবার সাম্প্রতিকতাই যদি শিক্ষণের মূল কারণ হয় তাহা হইলে প্রত্যেকটি পুর্ববর্তী ভুল ক্রিয়া সাম্প্রতিক হওয়ায় পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইবে। উপরন্তু শেষ সফল বা শুদ্ধ ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক হওয়ায় পরবর্তী পরীক্ষায় প্রথমেই উহা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং অসাম্প্রতিক ভুল ক্রিয়ায় সময়ক্ষেপ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং শুধু অনুশীলন বা সাম্প্রতিকতা শিক্ষণের মূল কারণ হইতে পারে না। ফল-সংক্রান্ত নিয়মের সহিত উহাদের যুক্ত করা দরকার।

ম্যাক্‌ডুগাল্, কফ্‌কা প্রভৃতি মনোবিদেরা থর্ন্‌ডাইক্ এবং ওয়াট্‌সন্-এর মতবাদকে যান্ত্রিক এবং বিকৃত বলিয়া মনে করেন।

৮। সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ
(কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স্ থিওরি)

প্যাভ্‌লো, বিচ্‌টিরিও প্রভৃতি রুশ বিজ্ঞানীরা এবং ল্যাশ্‌লি ও ওয়াট্‌সন্ প্রভৃতি চেষ্টিতবাদীরা শিক্ষণকে সাপেক্ষ প্রতিবর্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্দীপক স্বভাবতঃ যে প্রতিবর্ত উৎপন্ন করে তাহাকে বলে নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত (সিম্প্‌ল্, আন্‌কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স্)। যেমন মাংসের সহিত জিহ্বার সংস্পর্শে

কুকুরের লালা-নিঃসরণ প্রতিবর্ত ঘটে, অথবা জোর আওয়াজ শুনিবামাত্র শিশু ভয়ে চমকাইয়া ওটে।

এইবার জিহ্বার সহিত মাংস-সংস্পর্শের ঠিক পূর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে যদি কয়েক বার একটি ঘণ্টা বাজানো হয়, তবে ঘণ্টার শব্দ শুনিবামাত্র কুকুরের লালা নিঃসরণ হইতে থাকে। অথবা জোর আওয়াজটি হইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি কয়েকবার শিশুকে একটি সুন্দর খেলনা দেওয়া হয়, তবে সুন্দর খেলনাটি দেখিবামাত্র শিশু ভয়ে চমকাইয়া ওঠে। এই দুইটি স্থলে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া যে লালা-নিঃসরণ এবং সুন্দর খেলনা দেখিয়া যে ভয় উৎপন্ন হয় তাহা সাপেক্ষ প্রতিবর্ত।

এই মতে শিক্ষণ একপ্রকার সাপেক্ষ প্রতিবর্ত। শুধু যে মনুষ্যেতর প্রাণীদের শিক্ষণই এইরূপ, তাহা নয়। মানুষের শিক্ষণ, এমন কি সকল উচ্চতর মানস ক্রিয়াই, সাপেক্ষ প্রতিবর্তরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। প্যাভ্‌লো, বিচ্‌টিরিও প্রভৃতি রুশ বিজ্ঞানীদের গবেষণা উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রেই বিশেষ-ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ক্রাস্‌নোগরস্কি, মিস মাতির, ওয়াট্‌সন, ল্যাশ্‌লে প্রভৃতি বিজ্ঞানিগণ শিশুর শিক্ষণ বিষয়ে পরীক্ষা ও প্রয়োগ করিয়া, মানুষের শিক্ষণও যে মূলতঃ সাপেক্ষ প্রতিবর্তই, এই মত প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা করিয়াছেন।

শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহল অথবা জানিবার ঔৎসুক্যকে নূতন বা অজ্ঞাত বস্তুতে জাগাইয়া তোলা যায়। যে বস্তুতে শিশুর স্বাভাবিক ঔৎসুক্য আছে, উহার সহিত, যাহাতে শিশুর স্বাভাবিক ঔৎসুক্য নাই, সেই বস্তুর, অনুষঙ্গ-স্থাপনই এই মতে শিক্ষণের স্বরূপ। যেমন শিশু পাখী কি তাহা জানে, কিন্তু 'পাখী' নামটি জানে না। তাহাকে একটি পাখী দেখাইয়া, যদি কয়েকবার বলা হয় এইটি 'পাখী', তবে তাহার পক্ষে পাখী কথাটি শিক্ষা করা সহজ হয়। এই ক্ষেত্রে শিশুর 'পাখী' কথাটির শিক্ষণ পাখী বস্তুটির পূর্বজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে।

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত মতে সকল শিক্ষণই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত। উচ্চতর শিক্ষণের সহিত সহজ বা সরল শিক্ষণের পার্থক্য শুধু জটিলতর এবং সহজতর সাপেক্ষ প্রতিবর্তের পার্থক্য। যে নিয়মে শিশু 'পাখী' কথাটিকে পাখীর জ্ঞানের সাপেক্ষ করিয়া শিক্ষা করে, সেই নিয়মেই নিউটন্ তাঁহার মাধ্যাকর্ষণ সূত্র অথবা শঙ্কর তাঁহার অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়াছেন।

সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের সমালোচনা

গুণ

সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ থর্ন্ডাইক্-এর ফল-সংক্রান্ত নিয়মের সাহায্য লয় না, সুতরাং উচ্চতর মানসবৃত্তির উপর নির্ভর না করিয়াই শিক্ষণের ব্যাখ্যা করিতে পারে। কিন্তু থর্ন্ডাইক্-প্রবর্তিত অনুশীলন এবং উহার সহকারী সাম্প্রতিকতা নিয়মটিকে এই মত স্বীকার করে। সাপেক্ষ উদ্দীপক যদি নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত পুনঃ পুনঃ উপস্থাপিত হয়, তবেই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ঘটিতে পারে।

প্রায়োগিক মনোবিদ্যায় সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এই গবেষণা শিশু-শিক্ষণ ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটাইয়াছে। পূর্বে শিক্ষণ ব্যাপারটি অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহা যে স্পষ্টতর হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের অনস্বীকার্য প্রভাব। শিক্ষণে অনুষঙ্গ ক্রিয়া করে, সন্দেহ নাই। শিশুর শিক্ষণ যে মূলতঃ কতগুলি সাপেক্ষ প্রতিবর্তের প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যাসরূপ স্থায়ী সাপেক্ষ প্রতিবর্ত গঠন, তাহা সাম্প্রতিক মনোবিদ্যার একটি স্বীকৃত সত্য। মেধাবী শিক্ষার্থী সহজেই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত করিতে পারে, কিন্তু মন্দধী শিক্ষার্থী পারে না। তাহা ছাড়া, শিক্ষণ যে শিক্ষকের আয়ত্তাধীন, সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ সেইদিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এই মতবাদ দেখাইয়াছে, ইচ্ছানুরূপ শিক্ষণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া আশানুরূপ শিক্ষণফল লাভ করা যায়।

দোষ

কিন্তু এই সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও, সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ যান্ত্রিক বাদ! ইহা শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, আকর্ষণ, মনোযোগ প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলিকে যথা-যোগ্য স্থান দেয় না। অথচ ইহাদের অভাব হইলে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত স্থাপিত হইতে পারে না। শিক্ষার্থী যদি না শিখিতে চায়, অথবা শিক্ষণীয় বিষয়ে মনোযোগ না দেয়, তাহা হইলে শিক্ষণ কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, সকল উদ্দীপকই যে সাপেক্ষ হইতে পারে, এমন নয়। এমন কতগুলি উদ্দীপক আছে, যাহা অন্য উদ্দীপকের পরিবর্তে কাজ করিতে পারে না। যেমন, মায়ের উপর শিশুর স্বাভাবিক টান বা আকর্ষণ থাকে, কিন্তু মায়ের সহিত যাহাকে দেখে, শিশু তাহাকেই মায়ের মত ভালবাসিতে শিখে না।

৯। গেস্টাল্ট্ মতবাদ—পরিজ্ঞানবাদ (ইন্‌সাইট্ থিওরি)

গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার মতে শিক্ষণ শুধু অন্ধ বা আকস্মিক চেষ্টা ও ভুলের যান্ত্রিক ফল নয়, অথবা সাপেক্ষ প্রতিবর্তও নয়, কিন্তু একটি সমগ্র শিক্ষণীয় পরিস্থিতির পরিজ্ঞান (ইন্‌সাইট্)। অথবা শিক্ষণ শুধু চেষ্টা ও ভুল-সংশোধনের ক্রমিক ফল নয়, কিন্তু সমগ্র পরিস্থিতির দ্রুত ও এককালীন পরিজ্ঞান-ফল।

কোয়েলার্-এর গবেষণা

ক্যানারি দ্বীপে অবস্থিত নর-বানর বা শিম্পাঞ্জীর গবেষণাগারে কোয়েলার্ গবেষণা করিয়াছেন, কি প্রকারে শিম্পাঞ্জীরা বস্তু প্রত্যক্ষ করে বা শিখে। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া, উহাদের বিশৃঙ্খল চেষ্টার আকস্মিক অবসান হয় সমস্যার পরিজ্ঞান অথবা অন্তর্দৃষ্টির ফলে। যে পশুটি খাবার নাগাল পাইতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃথা চেষ্টায় হয়রান হইতেছিল, সে হয়ত হঠাৎ দেখিল, খাবারের নাগাল পাইবার উপযোগী একটি লাঠি মাটিতেই পড়িয়া আছে। আবার কোনো শিম্পাঞ্জী হয়ত হঠাৎ দেখিল, যে কম্বলটি খাঁচায় পড়িয়া আছে, তাহাই খাদ্যের নাগাল পাইবার উপায়।

কোয়েলার্-এর তৃতীয় গবেষণা আরও চমকপ্রদ। শিম্পাঞ্জীটির নাগালের বাহিরে, অনেক উঁচুতে, কলা ঝুলিতেছিল। সে দুইটি পৃথক লাঠি দিয়া ঐ কলা টানিয়া লইবার বৃথাই চেষ্টা করিল এবং লাঠি দুইটি লইয়া অনেকক্ষণ উদ্দেশ্য-হীনভাবে খেলা করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে, সে হঠাৎ একটি লাঠি অপরটির প্রান্তে জুড়িয়া দিয়া কলা টানিয়া লইল।

পরিজ্ঞান বা ইন্‌সাইট্ দ্রুত এবং এককালীন শিক্ষণ। ইহা ধীরে ধীরে বা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয় না। পরিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের বস্তুগুলির বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে। ফলে, যে বস্তুটি প্রত্যক্ষের পশ্চাদ্‌ভূমিতে ছিল তাহাই উহার কেন্দ্রে আসিয়া পড়ে। যেমন খাদ্যের নাগাল পাইবার অনুপযোগী পৃথক লাঠি দুইটি প্রত্যক্ষের কেন্দ্রে থাকিলে উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রত্যক্ষের পশ্চাদ্‌ভূমিতে থাকে। কিন্তু পরিজ্ঞানের ফলে ইহাই প্রত্যক্ষের কেন্দ্র অধিকার করে। ইহা বিদ্যুতের মত হঠাৎ উদ্ভাসিত হয় এবং সমগ্র সমস্যাটির উপর আলোকপাত করে।

পরিজ্ঞান অথবা ইন্‌সাইট্ নূতন আবিষ্কারের অনুরূপ। ইহা নব উন্মেষ-শালিনী চেতনা। উদ্ভাবনশালী পরিজ্ঞানের আসল রূপ হইল ইহার তড়িৎ-গতিতে প্রকাশ বা ইল্যুমিনেশন্।

গেস্টাল্ট্ শিক্ষণবাদের সমালোচনা ✓

গুণ

পরিজ্ঞানবাদ উপরোক্ত দুইটি মতবাদ হইতে মূলতঃ ভিন্ন। মত দুইটি অনুষঙ্গ-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরীক্ষা ও ভুল সংশোধন-বাদ এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ শিক্ষণ পরিস্থিতিকে সমগ্ররূপে গ্রহণ না করিয়া, উহার অংশগুলি পৃথক্ করিয়া লয়। পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়াল জানে না যে তাহাকে পিঞ্জরের বাহিরে আসিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ক্ষুধা মিটাইতে হইবে। সে শুধু ক্ষুধার অন্ধ আবেগে, একটির পর আর একটি অঙ্গচালনা করে এবং যে অঙ্গচালনা আন্দাজে ঢিল মারিবার মত লক্ষ্যে লাগিয়া যায়, তাহাই যান্ত্রিক নিয়মে টিকিয়া থাকে।

এই কারণে বলা যায়, পরীক্ষা ও ভুল সংশোধনবাদ শিক্ষণকে একটি পারমাণবিক ব্যাপারে পর্যবসিত করে। কতগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন পৃথক পরমাণুর সংযোজন ও বিয়োজনে জড়বস্তু উৎপন্ন হয়, তেমনই কতগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন পৃথক চেষ্টার সংযোজন ও বিয়োজনে শিক্ষণ ঘটে। পরিজ্ঞানবাদ এই মনোবৈজ্ঞানিক পরমাণু-বাদের বিরোধী। এই মতে শিক্ষণ-পরিস্থিতি একটি সমগ্র বা গোটা বস্তু। সমগ্রের যে কোনো অংশ পরিবর্তিত হইলে অন্যান্য অংশগুলির পরিবর্তন হয়।

পরিজ্ঞান-বাদ উপরোক্ত দুইটি মতের মত যান্ত্রিক নয়। ইহাতে উচ্চতর মানসবৃত্তির স্থান আছে। কিন্তু পরিজ্ঞান-বাদও প্রায়োগিক। ইহা হ্বার্দাইমার্, কোয়েলার্, কফ্‌কা প্রভৃতি গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্‌গণের গবেষণায় সমৃদ্ধ।

দোষ

কিন্তু উপরোক্ত শিক্ষণ মতবাদ দুইটি যে একেবারে মিথ্যা, তাহা প্রমাণিত হয় না। পরিজ্ঞান তড়িৎগতিতে হয় স্বীকার করিলেও, ইহার প্রস্তুতি হিসাবে পরীক্ষা ও ভ্রম প্রয়োজনীয়। যে শিম্পাঞ্জীটি দুইটি লাঠি জোড়া দিয়া কদলী সংগ্রহ করিতে শিখিল, সে উহা হঠাৎ শিখে নাই। পূর্বে সে পৃথক লাঠি

দুইটি দিয়া চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং চেষ্টা ও ভ্রমের মধ্য দিয়াই ঐ শিম্পাঞ্জীকে শিক্ষণ কার্যে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। বিশেষ এই, চেষ্টা ও ভ্রম অন্ধ আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয় নাই, কিন্তু প্রথম হইতেই একটি সমগ্র পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে।

পরিজ্ঞান শুধু যে অন্তর্দৃষ্টি বা ইন্‌সাইট্‌ তাহা নয়, কিন্তু পশ্চাদ্‌দৃষ্টি (হাইণ্ড্‌-সাইট্‌) এবং সম্মুখদৃষ্টিও (ফোর্‌-সাইট্‌) বটে। ইহাতে সমগ্র পরিস্থিতির অগ্র ও পশ্চাৎ দৃষ্টি রহিয়াছে।

উপসংহার

শুধু চেষ্টা ও ভ্রমসংশোধন এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তে শিক্ষণে সময় ও শক্তির অপচয় হয়। শিক্ষণ-পরিস্থিতি না বুঝিয়া শুধু বোকার মত এলোমেলো চেষ্টা করিয়া যাওয়া ক্ষতিকর। অবশ্য দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুই যন্ত্রের মত করিতে হয়। গতানুগতিক ক্রিয়াগুলির শিক্ষণে হয়ত প্রথম মতবাদ দুইটির সমর্থিত শিক্ষাপ্রণালী যথেষ্ট সহায়তা করে। কিন্তু যে সকল শিক্ষণে মনোযোগ, ইচ্ছা, আকর্ষণ, বুদ্ধি প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলির প্রয়োজন, তাহাতে প্রথম মতবাদ দুইটির যাথার্থ্য বিষয়ে সন্দেহ আছে।

স্কট্‌-এর গবেষণাফল উদ্ধৃত করিয়া **ইউয়ার্‌** পরীক্ষা ও ভ্রমবাদ, অনুকরণবাদ এবং চিন্তনবাদ, এই তিনটি শিক্ষণ পদ্ধতির তুলনা করিয়াছেন। কোনো বিশেষজ্ঞের হাতে কলমে কাজ দেখিয়া, করিবার চেষ্টাকে **অনুকরণ পদ্ধতি** বলে। এই পদ্ধতিতে অযথা সময় ও শক্তির অপচয় নিবারিত হয়। কিন্তু ইহার দোষ এই যে ইহা শিক্ষার্থীর স্বাধীন চেষ্টাকে ব্যাহত করে। **চিন্তন পদ্ধতি** শিক্ষণীয় পরিস্থিতির প্রত্যেকটি অংশের সহিত অপরাপর অংশের সম্বন্ধ বুঝিয়া শিক্ষণচেষ্টার পদ্ধতি। এই পদ্ধতি মূলতঃ পরিজ্ঞান পদ্ধতির অনুরূপ।

ইউয়ার্‌ দেখাইয়াছেন যে কোনো যান্ত্রিক ধাঁধাঁর সমাধানে পরীক্ষা ও ভ্রম পদ্ধতিতে যদি আট ঘণ্টা লাগে, তাহা হইলে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে লাগে দুই ঘণ্টা এবং তৃতীয় পদ্ধতিতে মাত্র আধ ঘণ্টা।

উপসংহারে আরও বলা যায় যে শিক্ষণপদ্ধতি শুধু সংযোগ অনুষঙ্গের উপর নির্ভর না করিয়া সাদৃশ্য অনুষঙ্গের উপরও নির্ভর করে। যাহাতে শুধু যান্ত্রিক নিয়মই কাজ করে না, বুদ্ধিপুর্বক শিখিবার নিয়মও কাজ করে, সেই শিক্ষণ-পদ্ধতিই ফলপ্রসূ। এই দিক দিয়া বিচার করিলে, পরীক্ষা ও ভ্রম-সংশোধনবাদ

এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ গ্রহণীয় নয়, কারণ এই দুইটিতে সংযোগ অনুষঙ্গই প্রাধান্য লাভ করে। পরিজ্ঞানবাদ এই দোষ হইতে মুক্ত।

১০। শিক্ষণের গতি

শিক্ষণ নিয়মিত হারে অগ্রসর হয় না। প্রথমে দ্রুত পরে শিথিল, আবার দ্রুত, আবার শিথিল, এইরূপ-বিভিন্ন হারে শিক্ষণের গতি চলিতে থাকে। আবার মাঝে মাঝে শিক্ষণের গতি থামিয়া গিয়া, একইভাবে চলিতে থাকে। তৃতীয়তঃ, একই বস্তুর শিক্ষণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ পরিলক্ষিত হয়। উৎসাহ এবং মনোযোগের পার্থক্যই ব্যক্তিগত ভেদের কারণ।

থর্ন্ডাইক্-এর চব্বিশটি পরীক্ষায় পিঞ্জরাবদ্ধ বিড়ালের লক্ষ্যে পৌছাইতে যে সময় লাগিয়াছিল, মধ্যে মধ্যে সময় কমিয়া যাইবার পরিবর্তে যে সময় বাড়িয়া গিয়াছিল এবং কোনো কোনো উপর্যুপরি পরীক্ষায় যে সময়ের কোনো নড়চড় হয় নাই—এই ঘটনাগুলিতে শিক্ষণগতির প্রথম দুইটি লক্ষণ দেখা যাইবে।

ব্রায়ান্ ও হার্টার্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, শিক্ষণের ফলে তারবার্তায় বা টেলিগ্রাফে প্রতি মিনিটে কতগুলি বর্ণ গ্রহণ বা প্রেরণ করা যায়। তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিয়া কলিন্স্ ও ড্রিভার্ শিক্ষণগতির রেখাচিত্রকে এইরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।[১]

৮

অনুশীলনের সপ্তাহ

৫৯নং চিত্র

তারবার্তায় বর্ণ গ্রহণ ও প্রেরণ-শিক্ষার গতি—শিক্ষণের 'মালভূমি'

শিক্ষণ রেখাচিত্রে আরম্ভকালে দ্রুত উন্নতি লক্ষিত হয়। এই উন্নতির গতি ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে। উন্নতির একটি সীমায় পৌছিবার পর,

১ এম্ কলিন্স্ অ্যাণ্ড্ জে. ড্রিভার্—এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকলজি—পৃঃ ২২৭

অধিকতর উন্নতি অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই স্তরটিকে বলা হয় **শিক্ষণের মালভূমি** (প্লেটিও অফ্ লার্নিং) এবং কিট্সন্ বলিয়াছেন নৈরাশ্যের মালভূমি। উৎসাহের অভাব, দৈহিক অবসাদ, চেষ্টার অভাব, অমনোযোগ প্রভৃতি কারণে এই অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইহা কাটাইয়া উঠিতে হইলে, উপযুক্ত সময়ে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয়। এই সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হইবার জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য আবশ্যক। শিক্ষার 'মালভূমি' আর একটি কারণেও ঘটিতে পারে, যেমন ইহাই হয়ত অনুসৃত প্রণালীতে, শিক্ষার্থীর বয়স ও মস্তিষ্কের শক্তি অনুসারে, শিক্ষণ-সীমা (ফিজিয়লজিক্যাল্ লিমিট্)।

১১। সুষ্ঠু শিক্ষণ বা শিক্ষণে সময় ও শ্রম সংক্ষেপ
(অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

১২। পশুর এবং মানুষের শিক্ষণ

থর্ন্ডাইক্, হব্হাউস্, কোয়েলার্, প্যাভ্লো প্রভৃতি মনোবিৎ প্রধানতঃ মনুষ্যেতর পশুতে বা প্রাণীতে তাঁহাদের শিক্ষণ-গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। অন্যদিকে ওয়াট্সন্, ল্যাশ্লে প্রভৃতি শিক্ষণমতবিশারদগণ শিশু এবং সাবালক মানুষের উপরও তাঁহাদের পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়াছেন।

মনুষ্যেতর প্রাণী এবং মানুষের শিক্ষণ-পদ্ধতিতে প্রকারগত ভেদ নাই বলিয়াই বিশিষ্ট মনোবিদ্গণের অভিমত। উহাদের শিক্ষণ-পদ্ধতির পার্থক্য পরিমাণগত। মনুষ্যেতর প্রাণীর শিক্ষণ-পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল এবং অনুন্নত। কিন্তু মানুষের শিক্ষণ-পদ্ধতি অধিকতর জটিল এবং উন্নত।

পশু বা প্রাণীর তুলনায় মানুষের শিক্ষণ-পদ্ধতির উৎকর্ষের কারণ মানুষের মানসিক, দৈহিক প্রভৃতি সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ।

(১) পশুর তুলনায় মানুষের নার্ভতন্ত্র উন্নত। তাহার মস্তিষ্ক অধিক পরিণত এবং বিকশিত। কাজেই মানুষের ক্ষেত্রে, শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যে উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর অনুষঙ্গ স্থাপিত পশুদের ক্ষেত্রে তাহা হয় না।

(২) মস্তিষ্ক-বিকাশের সহিত মানুষের বুদ্ধি অধিকতর বিকশিত। সুতরাং তাহার পর্যবেক্ষণশক্তিও উন্নততর। মানুষ প্রত্যক্ষ বস্তুর যত দিক পর্যবেক্ষণ করিতে পারে, পশুরা বা প্রাণীরা তত দিক পর্যবেক্ষণ করিতে পারে না।

(৩) সমস্যার সমাধানে মানুষ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে পারে এবং সমস্যার বিভিন্ন অংশ নিজ আয়ত্তে আনিয়া উহার সম্মুখীন হইতে পারে।

(৪) সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই ভাষা ব্যবহারে সক্ষম। নাম, সংখ্যা, প্রভৃতি প্রতীকের সাহায্যে মানুষ শিক্ষণকার্য অধিকতর সংক্ষেপে ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে পারে।

(৪) মানুষের কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তি উন্নত হওয়ায়, মানুষ অতীত ও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত বস্তু সম্বন্ধেও শিক্ষালাভ করিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণীরা শুধু উপস্থিত বিষয়ের শিক্ষালাভেই সমর্থ।

১৩। শিক্ষণের প্রধান অঙ্গ

শিক্ষণের প্রধান অঙ্গগুলি এই ঃ—

(১) শিক্ষণের প্রধান অঙ্গ হইল জিজ্ঞাসা বা জানিবার ইচ্ছা। এই জিজ্ঞাসা, কৌতূহল বা ঔৎসুক্য দেখা দেয় প্রথমতঃ অভাব বা প্রয়োজন বোধে। ইহা সকল প্রাণীরই একটি অদম্য স্বভাব বা প্রকৃতি।

অবশ্য উড্ওয়ার্থ্ প্রভৃতি মনোবিৎ মনোবিদ্যাকে ক্রিয়াত্মক (ডায়নামিক্) বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা বা জানিবার ইচ্ছা নয়, কিন্তু কোনো কার্যকরী ফল লাভ করা।

(২) শুধু জানিবার ঔৎসুক্যই যথেষ্ট নয়। ঔৎসুক্য মিটাইবার উপযোগী ইচ্ছা সঙ্কল্প বা প্রস্তুতিও আবশ্যক। ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের অভাবে শিক্ষার বাসনা মনে উঠিয়া মনেই লীন হইয়া যায়।

(৩) জানিবার প্রয়োজন বোধ হইতে আসে পর্যবেক্ষণ বা অনুসন্ধান। শিক্ষণীয় পরিস্থিতি সাধারণতঃ জটিল অবস্থায় থাকে। এই পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলিকে উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ না করিলে, উহার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব হয় না।

(৪) সার্থক পর্যবেক্ষণের সহিত মনোযোগও অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। পরিস্থিতিকে মনোযোগ দিয়া পর্যবেক্ষণ না করিলে উহার প্রধান এবং গৌণ-অংশগুলির পার্থক্য স্পষ্টভাবে বুঝা সম্ভব নয়।

(৫) শিক্ষণীয় পরিস্থিতি জটিল হইলে পর্যবেক্ষণ ও মনোযোগের সহিত শিক্ষণ চেষ্টার পুনরাবৃত্তি বা অনুশীলনও দরকার।

(৬) সুফললাভ, আকর্ষণ প্রভৃতি অঙ্গগুলি অনুশীলনে প্রাণ ও শক্তিসঞ্চার করে। চেষ্টায় সুফললাভ হইলে, চেষ্টা আরও বলবতী হইয়া শিক্ষণ-কার্যকে অগ্রসর করে। কিন্তু প্রত্যেক চেষ্টাই বৃথা হইলে, উহাতে শক্তি থাকে না।

(৭) অনুশীলনের বলাধানকারী অঙ্গ পুরস্কার এবং শাস্তি। চেষ্টা বৃথা হইলে অসন্তোষ বা শাস্তি এবং উহার সাফল্যে সন্তোষ বা পুরস্কার আসে।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

উড্ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস্—সাইকলজি—ষোড়শ পরিচ্ছেদ
বোরিং, ল্যাংফেল্ড্, ওয়েল্ড্—ফাউণ্ডেশন্স্ অফ সাইকলজি—সপ্তম পরিচ্ছেদ
এম্. কলিন্স্ অ্যাণ্ড্ জে. ড্রিভার—এক্সপেরিমেণ্ট্যাল্ সাইকলজি—ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
পি. স্যাণ্ডিফোর্ড—এডুকেশন্যাল্ সাইকলজি—নবম পরিচ্ছেদ

Exercise

1. Define learning. What is the physiological basis of learning ? (pp 572-573)
2. Why are animals used in experiments on learning ? (pp. 574-575)
3. Briefly explain the main theories of learning (pp 573-574)
4. Describe some of Thorndike's animal experiments in learning (pp. 575-576)
5. What are Thorndike's Laws of Learning ? Discuss. (pp. 576-579)
6. Critically expound Thorndike's Trial and Error method of learning (pp 579-580)
7. Briefly explain Watson's theory of learning. Does it improve upon that of Thorndike ? (pp. 580-581)
8. Explain and criticise the conditioned Reflex theory of learning. (pp. 581-583)
9. What is learning by insight ? Is learning by insight ? Discuss (pp. 584-587)
10. Compare the different theories of learning. Which of these appears to you to be the best ? Discuss. (pp. 576-587)
11. How does learning proceed ? Represent the process of learning by a curve. (pp 587-588)
12. Compare animal learning to human learning. (pp 588-589)
13. Give an analysis of the main conditions of learning. (pp 589-590)
14. Write notes on :
    (a) Lloyd Morgan's canon (pp 573-574)
    (b) Laws of learning. (pp. 575-579)
    (c) Plateau of learning. (pp. 587-588)

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গঠনমূলক কল্পনা
(কন্‌স্ট্রাক্‌টিভ্‌ ইমাজিনেশন্‌)

১। কল্পনা ও স্মৃতি

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে পুনরুৎপন্ন কল্পনা (রিপ্রডাক্‌টিভ্‌ ইমাজিনেশন্‌) বা **স্মৃতি** এবং **গঠনমূলক কল্পনার** (কন্‌স্ট্রাক্‌টিভ্‌ ইমাজিনেশন্‌) পার্থক্য বুঝানো হইয়াছে। পুনরুৎপন্ন কল্পনায় বা স্মৃতিতে অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলি অতীত ক্রম বা বিন্যাস অনুসারে পুনরুদ্রিক্ত (রিভাইভ্‌ড্‌) হয়। উদ্যানে ফুলটি যে স্থানে যে গাছে যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, পরবর্তী স্মরণক্রিয়ায় উহার প্রতিরূপ অবিকলভাবে মনে ভাসিয়া উঠিল। অনুভূত বিষয়ের এইরূপ হুবহু বা অবিকল পুনরুদ্রেককে (রি-কল্‌) পুনরুৎপন্ন কল্পনা বা স্মৃতি বলা হইয়া থাকে। অবশ্য, পুনরুৎপাদন প্রায়ই একেবারে হুবহু বা অবিকলভাবে ঘটে না, কিন্তু পূর্ব প্রত্যক্ষ বিষয়ের স্মরণে, যে পবিবর্তন ঘটে উহা স্মৃতির জন্য ঘটে না, ঘটে স্মৃতির সহিত মিশ্রিত কল্পনার জন্য। দৈনন্দিন জীবনে স্মৃতি কল্পনার বর্ণে বঞ্জিত হয়। উদ্যানের ফুলটি স্মরণ করিতে গিয়া নানা গঠনমূলক কল্পনা ঘটিতে পারে, যেমন ঐ ফুলটি যদি অন্য বাগানে থাকিত, অথবা ফুলটি যদি আরও বড় হইত, ইত্যাদি। **পূর্ব অভিজ্ঞতার বিষয়টি ঠিক যেমন জ্ঞাত হইয়াছিল, তেমনটি করিয়া উহার পুনরুদ্রেককে স্মরণ বলে। কিন্তু যে মানসক্রিয়ায় অতীত অভিজ্ঞতার বিষয় ভিন্ন ক্রম, বিন্যাস বা অবস্থায় পুনরুদ্রিক্ত হয় তাহাকে কল্পনা বলে।**

২। কল্পনা গঠনের নিয়ম

পূর্ব-প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতিরূপকে নূতন সম্বন্ধ, ক্রম, আকার বা অবস্থা আরোপ করিয়া স্মরণ করার নাম গঠনমূলক কল্পনা (কন্‌স্ট্রাক্‌টিভ্‌ ইমাজিনেশন্‌)।

প্রত্যক্ষ বিষয়ের সংযোজন (কন্‌জাংশন্‌), বিযোজন (ডিস্‌জাংশন্‌), বৃদ্ধি (অগ্‌মেণ্টেশন্‌), হ্রাস (ডিমিনিউশন্‌), নাড়াচাড়া (ম্যানিপুলেশন্‌) প্রভৃতি উপায়ে কল্পনা সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, অভিভাব (সাজেশন্‌) এবং উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণও (মোটিভেশন্‌) কল্পনা গঠনে সহায়তা করে।

মৎস্যের নিম্নাংশের সহিত নারীমূর্তির উপরাংশ **সংযোজিত** (কন্‌জয়েন্‌ড্‌) করিয়া আমরা মৎস্যকন্যার (মারমেইড্‌) কল্পনা ঘটিতে পারি। এই স্থলে মৎস্যের অঙ্গ হইতে উহার নিম্নাংশ এবং নারীদেহ হইতে উহার উপরাংশ **বিয়োজিত** (ডিস্‌জয়েন্‌ড্‌) করিয়া উহাদের সংযোজিত করা হইয়াছে। আবার আকাশ-কুসুমের কল্পনাও সম্ভব। এই স্থলে কুসুম উহার নৈসর্গিক পরিবেশ হইতে বিয়োজিত হইয়া আকাশের সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ বিষয়ের **হ্রাসবৃদ্ধি** (ডিমিনিউশন্‌ অ্যাণ্ড্‌ অগ্‌মেণ্টেশন্‌) ঘটাইয়াও কল্পনা-গঠন সম্ভব। যেমন, কল্পনা করা হয় যে যম সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ সূক্ষ্ম শরীরকে আকর্ষণ অথবা অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন।

বিষয়ের প্রতিরূপগুলিকে নানাপ্রকারে **নাড়াচাড়া** (ম্যানিপুলেশন) করিয়াও কল্পনা সম্ভব। আল্‌নাস্কার দিবাস্বপ্নে কল্পনা করিতেছে, সে তাহার মৃৎপাত্রগুলি বেচিয়া এত বড়লোক হইবে যে দেশের রাজকুমারী তাহার পাণিপ্রার্থিনী হইবেন এবং সে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে। এই কল্পনাটিকে **উদ্দেশ্যনিয়ন্ত্রিত** (মোটিভেটেড্‌) বলাও যায়, কারণ ইহাতে আল্‌নাস্কারএর ব্যর্থতা আত্মম্ভরিতার মধ্যে পরিপূর্তি (কম্‌পেন্‌সেশন্‌) খুঁজিয়াছে।

আবার **অভিভাবের** (সাজেশন্‌) ফলেও কল্পনা ঘটিতে পারে—যেমন কল্পনা করা হইল যেন রাজকুমার তাহার পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া আকাশে উড়িতেছেন।

৩। কল্পনার সীমা

কল্পনা অতীত অভিজ্ঞতাকে নূতন আকারে, পরিবেশে, বিন্যাসে বা অবস্থায় পুনরুদ্রিক্ত করে। কল্পনাকে একেবারে অঘটন কিন্তু ঘটন-পটীয়সী বলা ভুল হইবে। অভিজ্ঞতা হয় নাই, এমন আজগুবি বস্তুর কল্পনা অসম্ভব। আকাশ-কুসুমের এবং মৎস্যকন্যার দুইটি অংশের পৃথক প্রত্যক্ষ হইয়াছিল বলিয়াই উহাদের সংযোজিত বা বিযোজিত কল্পনা সম্ভব। কল্পনার প্রতিরূপ সম্পূর্ণ নূতন হইতে পারে না। উহা অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়েরই প্রতিরূপ। নূতনত্ব শুধু প্রতিরূপের সংগঠনে অথবা সম্বন্ধে।

সুতরাং **কল্পনা কোনো অসীম শক্তি বা ক্রিয়া নয়।** কল্পনা উহার পক্ষ বিস্তার করিয়া অসীম শূন্যে অনন্তকাল ধরিয়া ছুটিতে পারে না। উহার শ্রান্ত

পক্ষ বাস্তব প্রত্যক্ষের আশ্রয় চায়। যে বস্তুর অভিজ্ঞতা নাই তাহার প্রতিরূপ নাই, সুতরাং কল্পনাও হয় না। কল্পনার সংযোজন, বিযোজন ক্ষমতা **বাস্তব অভিজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ।** স্বর্ণলঙ্কা কল্পনা করা সম্ভব, কিন্তু একই স্থানে স্বর্ণময় এবং স্বর্ণময় নয়, এইরূপ পরস্পরবিরোধী লঙ্কার কল্পনা অসম্ভব। কল্পনা **যুক্তি-বিদ্যার মূলসূত্রগুলিকে অতিক্রম করিতে পারে না।**

স্মৃতি কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করে। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হইলে কল্পনাশক্তিও দুর্বল হয়। অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃত প্রতিরূপকে নানাপ্রকারে মিশ্রিত করিবার নামই কল্পনা। আবার অতীত অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুর সংমিশ্রণও সীমাবদ্ধ। অতীতে অচ্ছেদ্যভাবে প্রত্যক্ষ বস্তুকে কল্পনা ছিন্ন করিতে পারে না। যেমন আগুনকে উত্তপ্ত এবং বরফকে ঠাণ্ডা বলিয়া জানা আছে। বরফের বা আগুনের স্পর্শপ্রতিরূপও যথাক্রমে উত্তপ্ত এবং শীতল বস্তুর প্রতিরূপ।

৪। কল্পনার প্রকারভেদ

কল্পনা অনেক প্রকারের হইতে পারে। প্রথমতঃ, অনৈচ্ছিক এবং ঐচ্ছিক কল্পনাকে যথাক্রমে নিশ্চেষ্ট (প্যাসিভ্) এবং সচেষ্ট (অ্যাক্‌টিভ্) কল্পনা বলে। দ্বিতীয়তঃ, ঐচ্ছিক বা সচেষ্ট কল্পনাকে আবার গ্রহণশীল (রিসেপ্‌টিভ্) এবং সৃজনশীল (ক্রিয়েটিভ্), এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তৃতীয়তঃ, সৃজনশীল কল্পনা আবার বুদ্ধিমূলক (ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্), কার্যকরী (প্র্যাক্‌টিক্যাল্) এবং সৌন্দর্যমূলক (ইস্‌থেটিক্) ভেদে তিন প্রকার। চতুর্থতঃ, বুদ্ধিমূলক কল্পনা আবার বিশ্বাসযুক্ত (উইথ্ রিলিফ্) এবং বিশ্বাসমুক্ত (উইদাউট্ রিলিফ্)।

নিশ্চেষ্ট ও সচেষ্ট কল্পনা

ইচ্ছাকৃত কল্পনাকে ঐচ্ছিক বা সচেষ্ট এবং অনিচ্ছাকৃত কল্পনাকে অনৈচ্ছিক বা নিশ্চেষ্ট কল্পনা বলে। নিশ্চেষ্ট কল্পনা ইচ্ছাকৃত অথবা সংজ্ঞান উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। ইহাতে প্রতিরূপের বা ভাবনার স্রোত মনে প্রবাহিত হয়, মন তৃণের মত এই প্রবাহে ভাসিয়া চলে, অথবা অবাধ ভাবনা বা প্রতিরূপ শৃঙ্খলে (ফ্রী ট্রেন অফ্ আইডিয়াজ্) মন শৃঙ্খলিত হয়, উহার কোনো স্বাধীনতা থাকে না এবং এই কল্পনা প্রবাহে মন নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টার স্থান গ্রহণ করে। **নিশ্চেষ্ট**

কল্পনা নিজ ছন্দে বা খেয়ালে চলিতে থাকে। ইহাতে মন ইচ্ছানুশাসিত নয়, কিন্তু কল্পনানুশাসিত।

মেলোন্ এবং ড্রামণ্ডকে অনুসরণ করিয়া[১] কল্পনার উপরোক্ত শ্রেণীভেদকে নিম্নপ্রদর্শিত বিন্যাসে দেখানো যাইতে পারে :
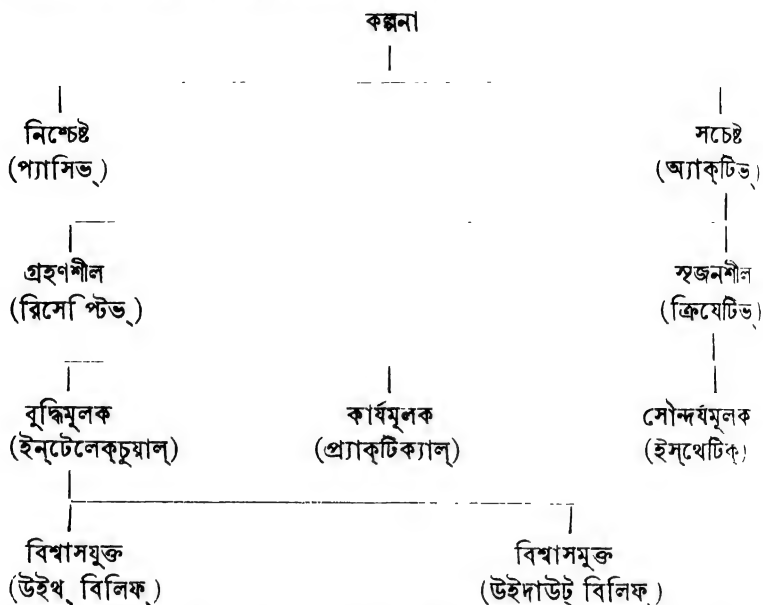
দিবাস্বপ্ন (ডে ড্রিম্, রিভেরি, ব্রাউন্ স্টাডি) নিশ্চেষ্ট কল্পনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহাতে ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যের বাধাবন্ধন থাকে না। ইহা স্বচ্ছন্দে ও অবাধে চলে। এই কল্পনা পৌরাণিক কাহিনী, রূপকথা এবং উপাখ্যানের অবলম্বন।

পক্ষান্তরে সচেষ্ট বা ঐচ্ছিক কল্পনা ইচ্ছানুশাসিত এবং উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত। ইহা কল্পয়িতার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অনুসারে চলে। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার প্রভৃতি সৃজনশীল কল্পয়িতারা প্রধানতঃ এই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আচার্য শঙ্কর তাঁহার অদ্বৈতবাদ, নিউটন তাঁহার মাধ্যাকর্ষণ সূত্র, লিওনার্ডো তাঁহার অপরূপ চিত্রশিল্প এবং কালিদাস, সেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁহাদের অমর কাব্য

১ মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেণ্টস্ অফ্ সাইকলজি—পৃঃ ৪৩৯

সম্পদ উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা সচেষ্ট বা ইচ্ছামূলক কল্পনা। এই কল্পনায় কল্পয়িতা বাহিত হইয়া চলেন না, কিন্তু কল্পনা বাহিত হয় কল্পয়িতার ইচ্ছায় এবং অনুশাসনে।

সচেষ্ট কল্পনা— গ্রহণশীল (রিসেপ্‌টিভ্‌)
— সৃজনশীল (ক্রিয়েটিভ্‌)

সচেষ্ট কল্পনা, আবার গ্রহণশীল এবং সৃজনশীল ভেদে দুই প্রকার। প্লেটো-কল্পিত অতীন্দ্রিয় আদর্শসত্তাগুলি সৃজনশীল কল্পনার দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁহার অবাধ কল্পনা-প্রবাহকে সংযত করিয়াছেন পরম সত্য ও শিবের উপলব্ধিতে। কালিদাস তাঁহার নিরঙ্কুশ কল্পনাকে সৌন্দর্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনাও সৃজনশীল। আবার নিউটন্‌ সমগ্র বিশ্ব কি নিয়মশৃঙ্খলে বিধৃত, তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে সৃজনশীল কল্পনার সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কার কবিয়াছেন।

কিন্তু প্লেটো, কালিদাস, নিউটন্‌ প্রভৃতি মনীষিগণের পাঠক উঁহাদের সৃজনশীল আবিষ্কার বুঝিতে গিয়া উঁহাদের কল্পনার ধারা অনুসরণ করিতে সচেষ্ট। এই কারণে পাঠকের কল্পনা নিশ্চেষ্ট বা অনৈচ্ছিক নয়, কিন্তু সচেষ্ট বা ঐচ্ছিক। আবার, পাঠকের কল্পনা গ্রহণশীল, কারণ তিনি কল্পনার সাহায্যে কোনো নূতন সৃষ্টি করিতেছেন না, কিন্তু অন্যের উদ্ভাবিত কল্পনার অনুসরণ করিতেছেন।

সৃজনশীল কল্পনা, আবার, উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন স্রষ্টাদিগের ক্ষেত্রে নিশ্চেষ্টও হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাঁহার কাব্যসৃষ্টি কাব্যলক্ষ্মীর কৃপায় উৎসারিত। যন্ত্রচালিতের মত উচ্চাঙ্গ সৃজনশীল কল্পনার বাহন হইয়া অনেক স্রষ্টাই জগতে কীর্তিমান হইয়াছেন।

—বুদ্ধিমূলক (ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্‌)
সৃজনশীল কল্পনা— সৌন্দর্যমূলক (ইস্‌থেটিক্‌)
—কার্যকরী (প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌)

সৃজনশীল কল্পনা, আবার বুদ্ধিমূলক, সৌন্দর্যমূলক এবং কার্যকরী ভেদে তিন প্রকারের হইতে পারে। জ্ঞানলাভের বা সত্যনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যে কল্পনা করা হয়, তাহাকে বলে বুদ্ধিমূলক কল্পনা। গণিতজ্ঞ অসীমের কল্পনা করেন, সসীম সংখ্যা বুঝিবার জন্য। আবার দার্শনিক ঈশ্বরের কল্পনা করেন জগৎ ব্যাপার বুঝিবার জন্য। ইঁহাদের কল্পনা সৃজনশীল বুদ্ধিমূলক কল্পনা।

সৌন্দর্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য প্রভৃতি সুকুমার বা ললিতকলা সৃষ্টির মানসে যে কল্পনা নিয়োজিত হয়, তাহাকে বলে সৌন্দর্যমূলক কল্পনা। মহাকবি কালিদাস শকুন্তলার যে কমনীয় রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মূলে রহিয়াছে তাঁহার সৃজনশীল সৌন্দর্যমূলক কল্পনা।

কর্মসম্পাদনের উদ্দেশ্যে যে কল্পনার প্রয়োজন হয়, তাহাকে বলে কার্যকরী কল্পনা। কাজ করিবার পূর্বেই কল্পনা করিয়া লইতে হয়, কি প্রকারে কাজটি করা হইবে। যুদ্ধ পরিচালনার পূর্বে যুদ্ধপ্রণালী সম্বন্ধে সেনাধ্যক্ষের কল্পনা সৃজনশীল কার্যকরী কল্পনা।

বুদ্ধিমূলক কল্পনা—
- —বিশ্বাসমুক্ত (উইথ্ বিলিফ্)
- —বিশ্বাসযুক্ত (উইদাউট্ বিলিফ্)
  - —ঐতিহাসিক (হিস্টরিক্যাল)
  - —আশামূলক (এক্সপেক্ট্যাণ্ট্)
  - —বৈজ্ঞানিক (সায়েন্টিফিক্)

বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা

বুদ্ধিমূলক কল্পনা, আবার, বিশ্বাসমুক্ত এবং বিশ্বাসযুক্ত ভেদে দুই প্রকার। যে বুদ্ধিমূলক কল্পনায় কল্পিত বস্তুর সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে তাহাকে বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা বলে। মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় মানুষ বিজ্ঞানসম্মত ঘর বাড়ী তৈয়ারী করিতে পারিত, নালন্দা একটি বিশাল আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, অথবা বুদ্ধদেব অতুল রাজৈশ্বর্য তুচ্ছ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, এই জাতীয় ঐতিহাসিক কল্পনার সত্যতায় আমরা বিশ্বাসী। সুতরাং **ঐতিহাসিক কল্পনা**, বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা। আবার, জুন মাসে ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কোর্স-এর প্রাথমিক পরীক্ষা হইবে, অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে আরও গরম পড়িবে, অথবা মাঘ মাসে আরও শীত পড়িবে, এই জাতীয় আশাও (এক্স্পেক্টেশন্, অ্যান্টিসিপেশন্) বিশ্বাসযুক্ত কল্পনার উদাহরণ। **আশামূলক কল্পনায়** বর্তমান অপূর্ণ অবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট অনুভূতির সহিত ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পূর্ণতা এবং তৎসংশ্লিষ্ট অনুভূতির তুলনামূলক বোধ থাকে। কল্পিত ঘটনা বা বস্তুটি বর্তমান নয় কিন্তু ভবিষ্যৎ, এই বোধ আশামূলক কল্পনার বিশেষ ধর্ম। তাহা ছাড়া, কল্পিত ঘটনাটি যে ঘটিবে এইরূপ বিশ্বাস ইহার প্রধান লক্ষণ। উপরন্তু, কল্পিত ঘটনাটি বাস্তব হইলে, উহার সম্মুখীন হইবার প্রস্তুতিও আশামূলক কল্পনার বৈশিষ্ট্য।

আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করা, প্রিয়জনের বা মাননীয় অতিথির আসন্ন আগমনের প্রত্যাশায় তাহার আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা, আলোচ্য কল্পনার উদাহরণ। তৃতীয়তঃ, **বৈজ্ঞানিক কল্পনাও** বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা। যেমন সূর্যের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ বা সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিদিকে পৃথিবীর আপন কক্ষে আবর্তনের ফলেই দিনরাত্রি, মাস-বর্ষ, ষড়ঋতু প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে, এই সকল কল্পিত বিষয়ের সত্যতায় আমরা বিশ্বাস করি।

বিশ্বাসমুক্ত কল্পনা

পক্ষান্তরে বিশ্বাসমুক্ত কল্পনায় কল্পিত ঘটনা বা বস্তুর সত্যতায় বিশ্বাস থাকে না। এই কল্পনা বাস্তব জগতের নিয়ন্ত্রণহীন। ইহা অবাধ এবং স্বচ্ছন্দ। ইহা আপন সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে না। পৌরাণিক কাহিনী অথবা উদ্দাম কল্পনামূলক রূপকথা বিশ্বাসমুক্ত কল্পনার উদাহরণ। বিশ্বাসমুক্ত কল্পনা সচেষ্ট (গ্রহণশীল এবং সৃজনশীল উভয়তঃ) এবং নিশ্চেষ্ট, দুই প্রকারেরই হইতে পারে। শিশুকে তেপান্তরের মাঠের বা স্বপনপুরীর রাজকন্যার গল্প বলা হইতেছে। যিনি গল্প বলিতেছেন বা লিখিতেছেন তাহার বিশ্বাসমুক্ত কল্পনা সচেষ্ট এবং সৃজনশীল। আবার শ্রোতা শিশুর বিশ্বাসমুক্ত কল্পনা সচেষ্ট হইলেও, গ্রহণশীল। দিবাস্বপ্ন প্রভৃতি বিশ্বাসমুক্ত কল্পনাগুলি নিশ্চেষ্ট।

৫। অমূল প্রত্যক্ষ বা মায়া (হ্যালিউসিনেশন্) এবং আরও কয়েকটি কল্পনা

অমূল প্রত্যক্ষ

যে কল্পনা প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা লইয়া জ্ঞাত হয়, অথচ যাহার বস্তুগত ভিত্তি নাই, তাহাকে অমূল প্রত্যক্ষ বলে। ইহা বিষয়গত প্রত্যক্ষ (অব্জেক্টিভ্ পার্সেপ্শন্) নয়, কিন্তু মানস বা পাত্রগত প্রত্যক্ষ (সাব্জেক্টিভ্ পার্সেপ্শন্)। এই কল্পনা এমন প্রবল ও স্পষ্ট হইয়া ওঠে যে কল্পিত বিষয়টি প্রত্যক্ষ বলিয়া ভ্রম হয়। মনের অবস্থা বহির্বিক্ষিপ্ত (প্রোজেক্টেড্) হইয়া এই ভ্রান্তি ঘটায়।

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্[১] উল্লিখিত বিয়াঁচি-এর দৃষ্টান্ত সাহায্যে ভ্রান্তকল্পনার প্রাত্যক্ষিক স্পষ্টতা ও প্রবলতা বুঝা যাইবে। "কোনো ভদ্র মহিলা এক মুচিকে

১ মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেণ্ট্স্ অফ্ সাইকলজি—পৃঃ ৪৪৫

মাতাল বলায়, মুচিটি চটিয়া গিয়া ভদ্রমহিলাকে গালাগালি করিল। মহিলাটি তাহাকে শাসাইয়া গেলেন যে তিনি ঐ অঞ্চলের চারজন কৃষককে ঘটনাটি জানাইয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবেন। মুচি কৃষকদের ভয়ে লুকাইয়া রহিল। ইহার পর এক রাত্রিতে স্বপ্নে শয়তান আসিয়া মুচিকে বলিল, 'যে কোনোটি বাছিয়া লও; হয় তোমার ডান হাতটি কাটিয়া ফেল, নতুবা ঐ চারটি কৃষকের হাতে খুন হও।' স্বপ্নেই মুচি ভাবিল, বরং সে একটি হাত বাদ দিয়াই প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবে। জাগিয়াও সে দেখিল যে শয়তান তাহার পাশেই বসিয়া আছে এবং তাহাকে হাত কাটিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিতেছে। এই দৃশ্যে ভীত হইয়া, ভয়েই হউক, অথবা ব্যথা পাইবার আশঙ্কায়ই হউক, সে আদেশ পালন করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। সেই ভৌতিক মূর্তির নিকট আপত্তি তুলিয়া সে আবার নির্দেশ পাইল যে তাহার কোনো ব্যথা অনুভব হইবে না। মুচিটি তখনই একটি পুরানো করাতের দিকে তাকাইল এবং 'শয়তানের ও নিজ সহায়তায়' কোনো ব্যথা অনুভব না করিয়াই হাতটি কাটিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল তাহার হাতটি যেন কাঠ দিয়া তৈয়ারী। হাতটি কাটা শেষ হওয়া মাত্র সে ব্যথা অনুভব করিল এবং রক্ত-স্রোতের পরিমাণ দেখিয়া ভয়ার্ত চীৎকারে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিল।"

উপরের উদাহরণটিতে জাগ্রৎ অবস্থায় ভৌতিক মূর্তি দর্শন, আদেশ শ্রবণ, কোনো ব্যথা অনুভূত হইবে না এইরূপ আশ্বাসলাভ প্রভৃতি কল্পনাগুলি অমূল প্রত্যক্ষ, কারণ এইগুলি মুচিটির নিছক কল্পনা মাত্র। এই কল্পনাগুলির বহিঃ-প্রত্যক্ষরূপে বিক্ষেপণের মূল কারণ হয়ত মুচিটির অন্যায় কার্যের জন্য অপরাধ-বোধ এবং মোড়লস্থানীয় চারিটি কৃষকের ভয়।

প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদে অমূল ভ্রম প্রত্যক্ষের এবং উহার সহিত সমূল প্রত্যক্ষের সাদৃশ্য ও পার্থক্য অলোচনা দ্রষ্টব্য।[১]

(খ) অবাধ কল্পনা (ফ্যান্টাস্যি)

অবাধ কল্পনা সৌন্দর্যমূলক কল্পনার প্রকারভেদ। ইহা ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং বিশৃঙ্খল। ইহা ঐচ্ছিক সৌন্দর্যমূলক কল্পনার মত উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত নয়। অবাধ কল্পনা শিল্পীর সাময়িক খেয়াল-খুসীর সৃষ্টি। ইহা একপ্রকার

১ চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ—অষ্টম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

মুক্ত চিন্তাপ্রবাহ, যাহা লাগামবিহীন ঘোড়ার মত যথেচ্ছভাবে বিহার করে।

অবাধ কল্পনা সৃজনশীল। ইহার ফলে উচ্চস্তরের শিল্পসৃষ্টি হইতে পারে।

(গ) স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তন (অটিস্টিক্ থিঙ্কিং)

স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মসর্বস্ব চিন্তন এক প্রকার নিশ্চেষ্ট বা অনৈচ্ছিক কল্পনা। এই কল্পনা কল্পয়িতা ব্যক্তির নিজ ব্যক্তিত্বে সীমাবদ্ধ। অভাববোধ, ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ব্যক্তিগত প্রয়োজনই এই প্রকার কল্পনা বা চিন্তনের উৎস। এই মানসবৃত্তির সহিত বাস্তব জগতের সংস্রব থাকে না। ইহাতে ব্যক্তি স্বয়ং তাহার কল্পনার কেন্দ্র।

ইহাকে চিন্তন বলা হইলেও, আসলে ইহা কল্পনাবিশেষ, কারণ চিন্তন বিষয়মুখী (অব্জেক্টিভ্), কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তন, আপনাতে আপনি মগ্ন বা লীন। বাস্তব জীবনসংগ্রামে পরাজিতবোধ এবং উহার ফলে উৎপন্ন বাস্তব-বিমুখতাই স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তনের মূল কারণ।

(ঘ) দিবা-স্বপ্ন বা জাগর স্বপ্ন (ডে ড্রিম্)

সাধারণতঃ স্বপ্ন ঘটে নিদ্রিত অবস্থায় এবং রাত্রিতে। কিন্তু জাগরণে এবং দিবাভাগে একরূপ অর্ধনিদ্রিত অবস্থা ঘটে, যাহাতে বাস্তব জগতের উদ্দীপক প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকে। জাগরণের অর্ধনিদ্রিত বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বপ্নের মত যে নিশ্চেষ্ট, অনৈচ্ছিক বা স্বতঃক্রিয় কল্পনা ঘটে, তাহাই জাগর স্বপ্ন বা দিবা স্বপ্ন (ডে ড্রিম্)। ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনা (অটিস্টিক্ থিঙ্কিং), কল্পনাজাল (রিভেরি) এবং অবাধ কল্পনার (ফ্যান্ট্যাসি) অনুরূপ।[১]

উপরোক্ত কল্পনাগুলির পার্থক্য

উপরোক্ত কল্পনাগুলির পার্থক্য নির্ভর করে উহাদের উৎসের গভীরতার উপর। অবদমিত বাসনাই এই জাতীয় কল্পনার মূল কারণ। অবদমিত বাসনার প্রভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনায় ব্যক্তি নিজের মধ্যে নিজকে গুটাইয়া ফেলে। স্বয়ং-

১ অবাধ কল্পনা, স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তন, জাগরস্বপ্ন প্রভৃতি কল্পনাগুলির মধ্যে অনেকেই ভেদ স্বীকার করেন না। যেমন, উড্ওয়ার্থ, মর্গ্যান্, বোরিং প্রভৃতি ইহাদিগকে সমার্থক মনে করেন।

সম্পূর্ণ কল্পনার তুলনায় দিবাস্বপ্নে অবদমনের গভীরতা অপেক্ষাকৃত কম। তাহা ছাড়া, দিবাস্বপ্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনার তুলনায় সাময়িক। কল্পনাজাল, উদ্দাম কল্পনা প্রভৃতি অবস্থাগুলি আরও হাল্কা এবং উহাদের অবদমনমূলক উৎসের গভীরতা আরও কম। উহারা বাস্তব-বিমুখ, কিন্তু প্রথমটি সর্বাপেক্ষা বেশী, দ্বিতীয়টি তদপেক্ষা কম এবং তৃতীয়গুলি আরও কম।

৬। স্বপ্ন (ড্রিম্)

সুষুপ্তি বা গভীর নিদ্রা এবং জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থায় প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা ও বাস্তবতা লইয়া যে কল্পনারাশি ঘটে তাহাকে স্বপ্ন (ড্রিম্) বলে।

সুষুপ্তি বা গভীর নিদ্রায় দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ থাকে না। সুতরাং ইহাতে স্বপ্ন ঘটে না। ইহা একটি স্বপ্নাতীত অবস্থা। সুষুপ্তি ও জাগরণের মধ্যবর্তী অর্ধনিদ্রিত বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়ই স্বপ্ন ঘটিয়া থাকে। অবশ্য এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বা অর্ধনিদ্রিত অবস্থাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনা, দিবা-স্বপ্ন প্রভৃতির অনুকূল অর্ধজাগ্রত অবস্থা হইতে আরও গভীর।

স্বপ্ন ঘটে কতগুলি কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া। স্বপ্নে বহির্জগতের সহিত কোনো প্রত্যক্ষ সংস্রব থাকে না, কিন্তু প্রত্যক্ষের লুপ্তাবশেষ স্মৃতিরেখা বা প্রতিরূপই মাত্র থাকে। এই প্রতিরূপগুলি বিচিত্রভাবে সংযোজিত বা বিযোজিত, বর্ধিত বা হ্রস্বায়িত, অভিভাবিত, প্রেষিত বা উদ্দেশ্যনিয়ন্ত্রিত হইয়া স্বপ্নের সৃষ্টি করে এবং যাহা কখনও প্রত্যক্ষ হয় নাই এমন অভিনব আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

স্বপ্ন গঠনমূলক কল্পনা, কারণ ইহাতে প্রতিরূপগুলি নূতনভাবে সম্বদ্ধ হইয়া নূতন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। একই কারণে স্বপ্ন সৃজনশীল কল্পনা। কিন্তু স্বাপ্নিক প্রতিরূপের সংমিশ্রণ সাধারণ অর্থে নিশ্চেষ্টভাবে ঘটে বলিয়া, স্বপ্ন একপ্রকার নিশ্চেষ্ট বা অনৈচ্ছিক কল্পনা।

স্বপ্ন ও অমূল প্রত্যক্ষ (ড্রিম্ অ্যাণ্ড্ হ্যালিউসিনেশন্)

সাদৃশ্য :

স্বপ্ন শুধু কল্পনাই নয়। স্বপ্নের প্রতিরূপ বাস্তব জগতের সংস্রববর্জিত মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বাস্তবরূপে ভাসমান হয়। সুতরাং স্বপ্ন অমূল প্রত্যক্ষবিশেষ। যেমন অমূল প্রত্যক্ষে, তেমন স্বপ্নে, সাধারণতঃ বাস্তব প্রত্যক্ষ

এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ থাকে না। আবার যেমন অমূল প্রত্যক্ষে, তেমন স্বপ্নে, অবস্তু প্রতিরূপগুলিই বস্তু বলিয়া মনে হয়। তৃতীয়তঃ, যেমন অমূল প্রত্যক্ষের, তেমন স্বপ্নের, মূলে থাকে মানসিক বা দৈহিক বিকার। ভীতু ব্যক্তি অথবা অজীর্ণরোগী প্রায়ই স্বপ্নে অমূলক ভয়, যেমন চোরের ভয়, ভূতের ভয়, দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হয়।

পার্থক্য

কিন্তু স্বপ্নের সহিত অমূল প্রত্যক্ষের পার্থক্যও লক্ষ্য করিবার মত। প্রথমতঃ, স্বপ্ন ঘটে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায়, কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষ ঘটে জাগ্রদবস্থায়। দ্বিতীয়তঃ, স্বপ্নের তুলনায় অমূল প্রত্যক্ষ অধিকতর স্পষ্ট, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্বাভাবিক। অমূল প্রত্যক্ষে বুদ্ধির সংযম এবং বিবেক বা অধিশাস্তার শাসন থাকে বলিয়া, প্রতিরূপের মিশ্রণ বাস্তবের দ্বারা আংশিক ভাবে নিয়মিত হয়। ফলে, অমূল প্রত্যক্ষের বিষয় একেবারেই অদ্ভুত বা কিম্ভূতকিমাকার হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, স্বপ্নে বুদ্ধির সমালোচনা এবং বিবেক বা অধিশাস্তার শাসন অভিভূত হইয়া পড়ে, ফলে স্বাপ্নিক বিষয় প্রায়ই অদ্ভুত বা কিম্ভূতকিমাকার হয়। তৃতীয়তঃ, অমূল প্রত্যক্ষের তুলনায় স্বপ্ন অধিকতর জটিল। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির উৎস মনের গভীরতর স্তরে নিহিত। চতুর্থতঃ, অমূল প্রত্যক্ষের কারণবিশ্লেষণ সাধারণ মনোবিদ্যার নিয়মেই করা যায়। কিন্তু স্বপ্নের কারণবিশ্লেষণ মনঃসমীক্ষণের অবাধ ভাবানুষঙ্গ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে।

স্বপ্ন ও ভ্রমপ্রত্যক্ষ (ড্রিম্ অ্যাণ্ড ইলিউশন্) স্বপ্নের উদ্দীপক-বাদ (স্টিমুলাস্ থিওরি)

ফ্রয়েড্-এর পূর্বতন অধিকাংশ মনোবিৎ এবং শারীরবৃত্তবিৎ স্বপ্নকে প্রধানতঃ ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে স্বপ্ন বহির্জগতের উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন। যে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায়ও বাহিরের উদ্দীপক (যেমন শয্যার স্পর্শ, পোষাক, তোষক, লেপ প্রভৃতির চাপ), আভ্যন্তরীণ শারীর যন্ত্রগুলির অবস্থাজনিত উদ্দীপক (যেমন নিশ্বাসপ্রশ্বাসে বাধা, রক্তচলাচল এবং নাড়ীর গতিপরিবর্তন, হজমের গোলমাল), শয়ন করিবার ভঙ্গী (যেমন চিৎ হইয়া বা উপুড় হইয়া শয়ন করা), মনের উপর

ক্রিয়াশীল থাকে। জাগরণে মন বাহ্যজগতের সংস্পর্শে আসিয়া এই সকল উদ্দীপকের প্রতি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করে। কিন্তু অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় মন বাহ্যজগতের সংস্পর্শবিহীন হয়। ফলে, এইসকল উদ্দীপকের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া মন প্রতিরূপের সংমিশ্রণে একটি অবাস্তব জগৎ সৃষ্টি করে।

সুতরাং স্বপ্ন শুধু অমূল প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু সমূল অর্থাৎ বস্তুভিত্তিক ভ্রমপ্রত্যক্ষ (ইলিউসন্)। যেহেতু বস্তুজগতের কোনো না কোনো উদ্দীপকক্রিয়ার অপব্যাখ্যাই স্বপ্নের কারণ, সুতরাং স্বপ্নেরও বাস্তব ভিত্তি রহিয়াছে। যেমন, হয়ত কোনো অর্ধ নিদ্রিত ব্যক্তির নাকে সুড়সুড়ি দেওয়ার ফলে সে স্বপ্ন দেখিল, যেন তাহার মুখমণ্ডল হইতে একটি আলকাতরার মুখোস খুলিয়া ফেলা হইতেছে। হয়ত কোনো ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিল যে একটি শোভাযাত্রা যাইতেছে, কারণ ঢাক বাজাইয়া তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মানো হইয়াছে। উড়িবার স্বপ্ন অথবা নগ্নতার স্বপ্ন যথাক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচড়া এবং দেহতাপহ্রাসের দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে। অর্ধ নিদ্রাবস্থায় আবরণশূন্য পায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিবার ফলে, কেহ হয়ত স্বপ্ন দেখিল যে সে জলের মধ্য দিয়া যাইতেছে। আবার মশারির খুঁটি ঘাড়ে পড়িয়া যাওয়ায়, কেহ বা স্বপ্ন দেখিল যে সে ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে বাস করিতেছে এবং শীঘ্রই তাহার ফাঁসি হইবে।

ক্লাইন্ তাঁহার পাত্রদিগের উপর নানা প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছেন যে উদ্দীপক, শয়নভঙ্গী প্রভৃতি কারণগুলি স্বপ্ন উৎপন্ন করে। চিৎ হইয়া অথবা হাত বুকের উপর রাখিয়া নিদ্রিত হইলে বোবায় পায়। বিভিন্ন অবস্থান কিরূপে স্বপ্নকে প্রভাবিত করে, জে. মোর্‌লি ভোল্‌ও তাহার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করিয়াছেন।

স্বপ্ন সমূল ও অমূল প্রত্যক্ষের সংমিশ্রণ

স্বপ্ন সমূল এবং অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের সংমিশ্রণ। ইহাকে সম্পূর্ণ অমূল প্রত্যক্ষ বলা চলে না, কারণ স্বপ্নের উপর আভ্যন্তরীণ বা বাহ্য উদ্দীপকের প্রভাব রহিয়াছে। আবার স্বপ্নকে সম্পূর্ণভাবে সমূল ভ্রম প্রত্যক্ষও বলা যায় না, কারণ স্বপ্নাবস্থার বাস্তব অবলম্বন বা ভিত্তি নাই।

স্বপ্ন উহার কোনোটিই নয়

আবার বলা যাইতে পারে যে স্বপ্ন অমূল বা সমূল ভ্রম প্রত্যক্ষের কোনোটিই নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কাল্পনিক প্রত্যক্ষ। ইহা জাগরণ এবং সুষুপ্তির মধ্যবর্তী

অর্ধনিদ্রাবস্থায় একপ্রকার কল্পনা। বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক থাকিলেও উহাদিগের উত্তেজনায় ইন্দ্রিয়গুলি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করে না—সুতরাং স্বপ্নকে অমূল প্রত্যক্ষ বা সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের কোনোটিই বলা চলে না। আবার জাগরণ অবস্থায় সংঘটিত হয় না বলিয়াও স্বপ্নকে উহার কোনোটি বলা যায় না, কারণ এই দুইটি প্রত্যক্ষই জাগরণে ঘটিয়া থাকে।

সুতরাং বলিতে হয় যে স্বপ্ন অমূল এবং সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের সহিত আংশিক সাদৃশ্য এবং পার্থক্যযুক্ত স্বতন্ত্র কল্পনা।

৭। স্বপ্নের বিভিন্ন মতবাদ (থিওরিজ্ অফ্ ড্রিম্)

জেম্স্এর শারীরবৃত্তীয় মতবাদ (মস্তিষ্ক-পথ-অবরোধবাদ)

উপরোক্ত উদ্দীপকবাদের মত অধ্যাপক উইলিয়াম্ জেম্স্ও স্বপ্নের শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে স্বপ্নে মস্তিষ্ক আংশিকভাবে নিদ্রিত বা নিষ্ক্রিয় থাকে। এই অবস্থায় কতগুলি মস্তিষ্ক-পথ (ব্রেন্-পাথ্) বন্ধ হয়, আবার কতগুলি উন্মুক্ত থাকে, ফলে স্বাভাবিক অনুষঙ্গের ব্যাঘাত ঘটে।

ধরা যাউক যে নিদ্রিত অবস্থার মুখে হাওয়া লাগিলে, স্বাভাবিক অনুষঙ্গসূত্র অনুসারে ঠাণ্ডা, শীত, তুষার, পতন, বিন্দু, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, গাড়ী, যান, বাষ্প প্রভৃতির কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ঠাণ্ডা বা শীতলতার কথা ভাবিলে যে মস্তিষ্কপথগুলি সক্রিয় হইয়া শীত, তুষার, পতন প্রভৃতির কথা মনে করাইয়া দেয় সেই মস্তিষ্কপথগুলি বন্ধ হইয়া গেলে, ঠাণ্ডা বা শীতলতা স্মরণের সহিত অনুষক্ত প্রতিরূপগুলি মনে ভাসিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু এই মস্তিষ্কপথগুলি অবরুদ্ধ (ব্লকৃড্) থাকিলেও, হয়ত পূর্ববর্তী কোনো অভিজ্ঞতার (যেমন পুতুলনাচ দেখার) সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো মস্তিষ্কপথ উন্মুক্ত এবং ক্রিয়াশীল থাকে। ফলে, নিদ্রিত অবস্থায় মুখে হাওয়া লাগিবার জন্য কাগজের তুষার ঝঞ্ঝায় পুতুলনাচের স্বপ্ন উৎপন্ন হইল। অধিকাংশ মস্তিষ্কপথ অবরুদ্ধ থাকায়, স্বপ্নে অনুষঙ্গসূত্রগুলির অবস্থা দাঁড়ায় বন্যায় মোটর গাড়ীর সোজাপথ ছাড়িয়া নানা বাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া সোজাপথে আসিবার মত।

৮। ফ্রয়েড্এর স্বপ্নমত

অন্যান্য মতবাদের সমালোচনা

ফ্রয়েড্ স্বপ্নের অন্যান্য মতবাদ খণ্ডনপূর্বক স্বমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(ক) স্বপ্নের শারীরবৃত্তীয় মতবাদগুলির প্রধান দোষ এই যে উহারা স্বপ্ন কেন এবং কি প্রকারে নির্দিষ্ট আকারে প্রকাশিত হয়, ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

উদ্দীপকবাদ (ষ্টিমুলাস্ থিওরি) স্বপ্নকে সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের (ইলিউসন্) আলোকে ব্যাখ্যা করে। ফ্রয়েড্এর আপত্তি অনুসারে, বাহিরের বা ভিতরের উদ্দীপক, স্বপ্নের আংশিক কারণ হইলেও, উহার সম্পূর্ণ কারণ হইতে পারে না। **উদ্দীপকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া না ঘটিয়া, কেন উহার স্বাপ্নিক প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক এবং ব্যক্তিভেদে বিচিত্র হয় তাহাই জিজ্ঞাস্য।** অর্ধনিদ্রিত ব্যক্তির শয্যা নাড়িলে, কেন কেহ ভূমিকম্পের, কেহ বা পড়িয়া যাইবার, আবার কেহ বা পাতালে প্রবেশ করিবার, স্বপ্ন দেখে ? এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে গিয়া, উদ্দীপকবাদ অচল হইয়া পড়ে।

জেম্স্এর মস্তিষ্ক-পথ-অবরোধ-বাদও এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারে না। প্রশ্ন এই যে কি কারণে, কোনো ব্যক্তির একটি মস্তিষ্কপথ, আবার অপর ব্যক্তির আর একটি মস্তিষ্কপথ, অবরুদ্ধ থাকে।

(খ) হ্বুণ্ড্, জড্ল্ প্রভৃতি স্বপ্নে অনুষঙ্গসূত্রের অভাব, বিচারবুদ্ধির স্তিমিত ক্রিয়া, জ্ঞানের অভাব এবং অন্যান্য মানসক্রিয়ার মন্দীভূত অবস্থা প্রভৃতি নঞর্থক কারণগুলির উল্লেখ করিয়াই, স্বপ্নব্যাখ্যায় ক্ষান্ত হইয়াছেন।

(গ) ভবিষ্যদর্থক (প্রফেটিক্) প্রাচীন স্বপ্নব্যাখ্যাও অচল। প্রত্যেক স্বপ্নেরই ভাবী অর্থ সূচনা (প্রফেটিক্ সিগ্নিফিক্যান্স্) করিবার ক্ষমতা আছে, এই মত অযৌক্তিক। মনোবিদ্যা জ্যোতিষশাস্ত্র নয় যে প্রত্যেক স্বপ্নের ভবিষ্যৎ গণনা করিতে বসিবে। যান্ত্রিক কারণবাদ (ক'জ্যাল্ ডিটার্মিনিজ্ম্), অথবা পূর্ববর্তী ঘটনাই পরবর্তী ঘটনার কারণ, এই সূত্রই স্বপ্নব্যাখ্যার মূল ভিত্তি।

৯। ফ্রয়েডীয় মতে স্বপ্নের ব্যাখ্যা

ফ্রয়েড্ মনে করেন যে স্বপ্ন ব্যাখ্যা করিতে হইবে স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি-মনের আলোকে। স্বপ্নের কারণ ব্যক্তিমনের নির্জ্ঞান অবদমিত বাসনার চরিতার্থতা-প্রবণতা।

স্বপ্নের প্রেরক কামনাগুলি (মোটিভেটিং ডিজায়ার) প্রধানতঃ, কামজ বা যৌন এবং ইহাদের মূল কেন্দ্র বা লক্ষ্য, পিতামাতা। সমাজ, শিক্ষা, পরিবার প্রভৃতি কর্তৃস্থানীয় বা শাসক শক্তিগুলি এই সকল কামনার সহজ পরিপূর্তির

পরিপন্থী। শাস্তি বা শাসনের ভয়ে এই অবৈধ কামনাগুলি অবদমিত হয় এবং সংজ্ঞান মন ত্যাগ করিয়া আসংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান মনে আশ্রয় গ্রহণ করে।

কিন্তু অবদমিত কামনা নির্জ্ঞান অজ্ঞাতবাসে নির্বাসিত হইয়াও নিষ্ক্রিয় থাকে না। ইহারা সর্বদা সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করিয়া চরিতার্থতার উপায় অনুসন্ধান করে। জাগরণে উহাদের এই উদ্দেশ্য সফল হয় না। পিতামাতা, পবিবার, সমাজ, শিক্ষক প্রভৃতি দণ্ডদাতা এবং শাসক শক্তিগুলির প্রতিনিধি-স্থানীয় বিবেক বা অধিশাস্তা (সুপার-এগো), জাগরণে এই অশ্লীল কামনাগুলির পরিপূর্তি ব্যাহত করে।

অর্ধনিদ্রিত স্বপ্নাবস্থায় দণ্ডদাতা এবং শাসকশক্তির প্রতিভূ অধিশাস্তা, আচ্ছন্ন এবং শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সতর্ক প্রহরী আধিশাস্তার অনবধানতার সুযোগ লইযা, অর্ধনিদ্রার সুড়ঙ্গপথে অবদমিত কামনাগুলি সংজ্ঞানে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। কিন্তু, পাছে বিবেক সজাগ হইয়া এই নিষিদ্ধ কামনাগুলিকে আবার নিরুদ্ধ করিয়া নির্জ্ঞান মনে তাড়াইয়া দেয়, এই আশঙ্কায়, ইহারা আত্মগোপনের নানা কৌশল অবলম্বন করে এবং ভদ্রতা ও শালীনতার মুখোস পরিয়া ছদ্ম বা বিকৃত বেশে সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয়।

(১) স্বপ্নের অস্ফুট ও ব্যক্ত রূপ

স্বপ্নের নির্জ্ঞানরূপকে বলে ইহার অস্ফুট, বা অব্যক্ত উপাদান (লেটেণ্ট কন্‌টেণ্ট্) এবং ইহার সংজ্ঞান মনে ব্যক্ত রূপকে বলে ব্যক্ত উপাদান (ম্যানিফেস্ট্ কন্‌টেণ্ট্)। স্বপ্নের অস্ফুট বা নির্জ্ঞান রূপটি সংজ্ঞানে ব্যক্তরূপে প্রকাশিত হয় ছদ্ম বা বিকৃত বেশে। সুতরাং **স্বপ্ন অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছার, অথবা উহার অস্ফুট রূপের সংজ্ঞান, ছদ্ম বা বিকৃত (ডিজ্‌গাইজ্‌ড্) ব্যক্তরূপ।**

অস্ফুট রূপটি অবিকৃতভাবে ব্যক্ত হইতে পারে না, পাছে স্বপ্নপ্রহরী ড্রিম্-সেন্সর্) অথবা অধিশাস্তা ইহাদিগকে চিনিয়া ফেলে এবং উহাদিগকে আবার অবদমিত করিয়া নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত করে। সুতরাং আসলে স্বপ্ন একটি **আপোষ বা সন্ধিমূলক সংগঠন** (কম্‌প্রোমাইজ্ ফর্মেশন্)। ইহা অবদমিত ইচ্ছার সহিত অধিশাস্তার বিরোধ, এই দুই শক্তির আপোষবিশেষ।

(২) স্বপ্ন-কৃতি (ড্রিম্-ওয়ার্ক্)

অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছা বা স্বপ্নের অস্ফুটরূপ কি কি কৌশল অবলম্বন করিয়া ছদ্মবেশে ব্যক্ত স্বপ্নরূপে প্রকাশিত হয়? স্বপ্নকৃতির (ড্রিম্-ওয়ার্ক্) কৌশল (মেকানিজ্‌ম্) প্রধানতঃ চার প্রকার :—

(ক) সংক্ষেপণ (কন্‌ডেন্‌সেশন্)

স্বপ্নকৃতির প্রথম কৌশল **সংক্ষেপণ**। সাধারণতঃ সংক্ষেপণ বলিতে অস্ফুট স্বপ্ন উপাদানের (লেটেণ্ট ড্রিম্-কন্‌টেণ্ট্) স্ফুট স্বপ্ন উপাদানে (ম্যানিফেস্ট ড্রিম্-কন্‌টেণ্ট্) সংক্ষিপ্ত রূপান্তর বুঝায়। নির্জ্ঞান মন স্বপ্নকৃতির এই কৌশলটি অবলম্বন করে দুই বা ততোধিক অস্ফুট স্বপ্ন-উপাদানকে আংশিকভাবে সংমিশ্রিত করিয়া। বিভিন্ন স্বপ্ন-উপাদানের সংমিশ্রণ-ফলে ব্যক্ত স্বপ্ন-উপাদান বিকৃত হয়। যেমন 'ক্রিস্ট্‌মাস্ হোলিডেজ্' এবং 'অ্যাল্‌কোহল' শব্দগুলির আংশিক সংমিশ্রণের ফলে উৎপন্ন হয় অদ্ভুত 'অ্যাল্‌কোহোলিডেজ্' শব্দটি। স্বপ্নে দেখা গেল, একটি দাড়িওয়ালা, বেঁটে, বৃদ্ধ, খোঁড়া লোক। কিন্তু আসলে এই একটি লোক হয়ত চারটি-লোকের বিশিষ্ট লক্ষণগুলির সংক্ষেপিত রূপ। পরিচিত বিভিন্ন সদৃশ অংশগুলিকে একত্র করিয়া একটি যৌগিক আকৃতির (কম্পোজিট্ ফিগার্) স্বপ্ন, দৈনন্দিন জীবনে প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়। এই যৌগিক আকৃতির ব্যক্তিটি হয়ত রামের পোষাক, যদুর চেহারা, মধুর পেশা, অর্থাৎ তিন ব্যক্তির তিনটি অস্ফুট স্বপ্ন-উপাদান, সংক্ষেপিত করিয়া হরির ব্যক্ত স্বপ্ন উপাদানরূপে প্রকাশিত হইল।

(খ) অভিক্রান্তি (ডিস্‌প্লেস্‌মেণ্ট্)

স্বপ্নকৃতির দ্বিতীয় কৌশল **অভিক্রান্তি**। অভিক্রান্তি বলিতে ব্যক্ত স্বপ্নরূপে অব্যক্ত স্বপ্ন উপাদানের স্থানচ্যুতি বা স্থান পরিবর্তন বুঝায়। যাহাতে ব্যক্ত স্বপ্নরূপে অব্যক্ত স্বপ্ন-ইচ্ছাগুলি ধরা না যায়, সেই উদ্দেশ্যে প্রসঙ্গনির্দেশের (অ্যালিউসন্) মত ঐ ইচ্ছার সহিত অসম্পর্কিত কোনো দূরবর্তী অংশ উহার স্থান গ্রহণ করিতে পারে। আবার অব্যক্ত স্বপ্ন-উপাদানে যাহা মুখ্য তাহাকে গৌণ এবং যাহা গৌণ তাহাকে মুখ্য করিয়া, অর্থাৎ বিভিন্ন অংশের উপর ভুল বা মিথ্যা জোর (অ্যাক্‌সেণ্ট্) দিয়াও ব্যক্ত স্বপ্নরূপ প্রকাশিত হইতে পারে। যেমন স্বপ্নে হিংস্র ব্যাঘ্রের মত কোনো ভীতিজনক পশু দেখিয়া ভয় হইল না,

কিন্তু ভয় হইল একটি নিরীহ মেষ-শাবক দেখিয়া। ব্যাঘ্রভীতিই স্বাভাবিক, কিন্তু অভিক্রান্তির ফলে ইহা মেষের উপর আরোপিত হইয়াছে।

স্বপ্ন ব্যাখ্যার (ড্রিম্ ইন্‌টার্‌প্রেটেশন্) পর অভিক্রান্তি ব্যর্থ পরিহাস বা কষ্ট-কল্পনা বলিয়া মনে হয়। ফ্রয়েড্ একটি উদাহরণ দিয়া এই ব্যাপারটি বুঝাইয়াছেন। কোনো গ্রাম্য কর্মকার একটি খুন করিয়াছিল। আদালত কর্মকারকে দোষী সাব্যস্ত করিল। ঐ গ্রামে সে-ই একমাত্র কর্মকার, সুতরাং সে অপরিহার্য। কিন্তু যেহেতু ঐ গ্রামে তিনজন দর্জি বাস করিতেছিল, দোষী কর্মকারের স্থানে একটি নিরীহ দর্জিরই ফাঁসি হইল।

(গ) রূপান্তর (ট্র্যান্‌স্‌ফর্মেশন্)

স্বপ্নকৃতির তৃতীয় কৌশল **রূপান্তর**। ফ্রয়েড্ এই রূপান্তরের আর একটি নাম দিয়াছেন **নাটন** (ড্র্যামাটাইজেশন্)। একটি উপন্যাসবর্ণিত ঘটনাকে দৃশ্যরূপে দেখাইতে হইলে, নাটকাকারে রূপান্তরিত করিতে হয়। অব্যক্ত অংশের ব্যক্ত দৃশ্যে রূপান্তরিত হইবার প্রক্রিয়াই নাটন। যেমন, "কলেজের ছুটি হইলে কার্সিয়ং যাইব—ভাবী ঘটনার এই ইচ্ছাটি স্বপ্নে—কলেজের ছুটি হইল, দার্জিলিং মেলে উঠিলাম, ট্রেন ছাড়িয়া দিল, এইরূপ চিত্রাবলীর ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়।"[১]

(ঘ) প্রতীকতা (সিম্‌বলিজ্‌ম্)

স্বপ্নকৃতির চতুর্থ কৌশল **প্রতীকতা**। অব্যক্ত অংশের উপাদানগুলি আত্মগোপনের ছলে প্রতীক সাহায্যে ব্যক্ত অংশে প্রকাশিত হয়। "সর্বদেশেই সর্বসময়েই একটি প্রতীক একই বস্তুর নির্দেশ করিয়া থাকে। কাজেই প্রতীককে সার্বজনীন বলিয়া ধরিয়া লইলে ভুল করা হয় না। যেমন সাপ পুংলিঙ্গের, বাক্স জননেন্দ্রিয়ের, রাজা পিতার, রাণী মাতার, গৃহ দেহের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়।"[২]

ফ্রয়েড্ বলিয়াছেন, প্রতীকতাই সম্ভবতঃ স্বপ্নবাদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য অংশ। তাঁহার মতে স্বপ্নে প্রতীকরূপে প্রকাশিত বস্তুগুলি অসংখ্য নয়—ইহারা প্রধানতঃ মানুষের দেহ, পিতামাতা, ভাইবোন, মৃত্যু এবং নগ্নতা।

[১] ডঃ সুহৃৎ চন্দ্র মিত্র—মনঃসমীক্ষণ—পৃঃ ৬৭

[২] ডঃ সুহৃৎ চন্দ্র মিত্র—মনঃসমীক্ষণ—পৃঃ ৭৩

সার্নার-এর মতে গৃহ মনুষ্যদেহের সাধারণ প্রতীক। শিশু ও ভাই-বোনের প্রতীক ক্ষুদ্র জানোয়ার, জন্মের প্রতীক জল, মৃত্যুর ভ্রমণ, নগ্নতার পোষাক-পরিচ্ছদ।

অনুযোজনা (সেকেণ্ডারি ইলাবোরেশন্)

স্বপ্নকৃতির আরও একটি বিকৃতি-কৌশল **অনুযোজনা**। এই কৌশলটি আসলে স্বপ্নকৃতির কৌশল নয়। জাগরণের পর স্বপ্ন বর্ণনা করিতে গিয়া, স্বপ্নের সহিত কিছু কিছু মনগড়া উপাদান যুক্ত করিয়া উহাকে সুসংবদ্ধ রূপ দান করিবার, একটি কৌশল অবলম্বিত হয়। এই কৌশলই অনুযোজনা। "অন্যের নিকট বলিবার সময় স্বপ্নবৃত্তান্তের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। কোনো দৃষ্ট অংশ বাদ পড়িয়া কোনো নূতন অদৃষ্ট অংশ হয়ত স্বপ্নবর্ণনায় জুড়িয়া যায়। জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক, বর্ণনা করিবার সময় স্বপ্নের এই যে পরিবর্তন হয়, মনঃসমীক্ষকেরা ইহার নাম দিয়াছেন অনুযোজনা।"[১]

১০। ফ্রয়েডীয় স্বপ্নমতের রূপ

ইচ্ছা-পূরণ মতবাদ

ফ্রয়েড্-এর স্বপ্নমতবাদকে সাধারণতঃ **ইচ্ছা-পূরণ মতবাদ** (উইশ্ ফুল্‌ফিল্‌মেণ্ট্ থিওরি) বলা হইয়া থাকে। জাগ্রৎ-জীবনের অশ্লীল কামনাগুলি অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত হয়। নিষিদ্ধ বাসনাগুলি অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নের আকারে সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে। এই বাসনাগুলি কামজ বা যৌন। সুতরাং স্বপ্ন কামজ বাসনার চরিতার্থতা।

সকল স্বপ্নব্যাখ্যাই যৌন নয়

কিন্তু স্বপ্ন ইচ্ছা-পূরণ হইলেও, সকল স্বপ্নই যে যৌন বা কামজ ইচ্ছার পূরণ, এমন নয়। ফ্রয়েড্ বলিয়াছেন, "সকল স্বপ্নব্যাখ্যাই যৌন এই উক্তিটির বিরুদ্ধে স্বপ্ন-বিষয়ক গ্রন্থে বহু বাক্‌বিতণ্ডা চলিয়াছে। কিন্তু আমার স্বপ্নব্যাখ্যা গ্রন্থের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই। ইহা এই গ্রন্থের আটটি সংস্করণের কোথায়ও পাওয়া যাইবে না, বরং ইহার বক্তব্যের সহিত এই উক্তির বিরোধই

১ ডঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র—মনঃসমীক্ষণ—পৃঃ ৬৭

রহিয়াছে।"[১] ফ্রয়েডীয় মতে সঙ্কীর্ণার্থক কামজ কামনা ছাড়া অন্যান্য কামনাও স্বপ্নে চরিতার্থ হইতে পারে, যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রভৃতি।

স্বপ্ন অনৈচ্ছিক বা নিশ্চেষ্ট কল্পনা কি না

স্বপ্ন অনৈচ্ছিক বা নিশ্চেষ্ট কল্পনা বলিয়া মনে হইলেও, ইহা ঐচ্ছিকও বটে। স্বপ্ন অনৈচ্ছিক এই অর্থে, ইহাকে কোনো সংজ্ঞান ইচ্ছা. নিয়ন্ত্রণ করে না। কিন্তু ইহা ঐচ্ছিক বা সচেষ্ট এই অর্থে যে, কতগুলি নির্জ্ঞান ইচ্ছাই স্বপ্নের ভিতর দিয়া পূর্ণ হইতে চায়।

স্বপ্ন অকারণ নয়

স্বপ্ন অকারণ বা কার্যকারণসূত্রের ব্যতিক্রম নয়। স্বপ্নের কারণ রহিয়াছে। ইহার কারণ অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছা। স্বপ্নে কোনো উদ্দেশ্য আরোপ করা অসঙ্গত। ইহা কোনো ভবিষ্যৎ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ঘটে না, কিন্তু ঘটে অতীতে অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছার দ্বারা।

স্বপ্ন বিশ্লেষণ কাহাকে বলে

স্বপ্নের প্রতিরূপ অসংলগ্ন এবং খাপছাড়া বলিয়া মনে হইতে পারে। আসলে উহারা সুশৃঙ্খল এবং অনুষঙ্গ-সূত্রে আবদ্ধ। অনুষঙ্গ-সূত্রগুলি বাহির করিতে হইলে, অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতির সাহায্যে স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিতে হয়। স্বপ্ন-বিশ্লেষণ বলিতে বুঝায় স্বপ্নের ব্যক্ত উপাদানকে অব্যক্ত উপাদানে অনূদিত অথবা পরিণত করা। কি কি কৌশলে অব্যক্ত উপাদান ব্যক্ত উপাদানে পরিণত হইয়াছে, তাহার আবিষ্কার ও স্বপ্ন-বিশ্লেষণের লক্ষ্য।

স্বপ্নের মূল্য অথবা গুরুত্ব

স্বাভাবিক জীবনের নিয়মিত ছন্দে স্বপ্ন একপ্রকার যতিভঙ্গ বা ছন্দঃপতন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং জীবনের স্বাভাবিকতা সংরক্ষণে যে স্বপ্নের কোনো মূল্য আছে, তাহা মনে হয় না।

১ ফ্রয়েড্—ইন্টারপ্রেটেশন্ অফ্ ড্রিমস্—পৃঃ ৩৭৩

কিন্তু স্বপ্ন শুধু স্বাভাবিক জীবনের নিয়মভঙ্গ নয়। জীবনের স্বাভাবিকতা সংরক্ষণে স্বপ্নের মূল্য অপরিসীম। এই কারণে মনোরোগ-চিকিৎসায় ফ্রয়েড্ স্বপ্ন-বিশ্লেষণকে শীর্ষস্থান দিয়াছেন। মনোরোগের মূল কারণ নিহিত থাকে নির্জ্ঞান মনের অবদমিত ইচ্ছায়। অবদমিত ইচ্ছাগুলি বিকৃত বা ছদ্মভাবে স্বপ্নে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং স্বপ্ন-বিশ্লেষণ করিলেই মনোরোগের কারণ-নির্ণয় (ডায়াগ্নোসিস্) সহজ হইয়া পড়ে। এই অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছাগুলিকে সংজ্ঞান মনে টানিয়া আনিয়া উহাদিগকে বাস্তব জীবনের সহিত উপযোজিত করাই রোগনিবারণের উপায়।

স্বভাবী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব (পার্সন্যালিটি) বুঝিবার পক্ষেও স্বপ্ন পথপ্রদর্শক। ব্যক্তি কিরূপ বুঝা যায়, সে কি বা কেমন স্বপ্ন দেখে, তাহা বুঝিলে।

বিরেচন বা নিঃসারণ (পার্গেশন্, ক্যাথার্সিস্) হিসাবেও স্বপ্ন মূল্যবান অংশ গ্রহণ করে। স্বপ্ন মনের সঞ্চিত আবর্জনাস্তূপ সংজ্ঞানে ঠেলিয়া দিয়া উহার ভার লাঘব এবং নিদ্রার সহায়তা করে। স্বপ্ন নিদ্রার প্রতিবন্ধক, এই সাধাবণ ধারণা ভ্রান্ত। ফ্রয়েড্ স্বপ্নকে **"নিদ্রার অভিভাবক"** (গার্জিয়ান্ অফ্ স্লীপ্) বলিয়াছেন। মনের যে সকল সঞ্চিত ইচ্ছা নিদ্রাব ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে, সেইগুলি স্বপ্নে মনের অন্তস্তল হইতে উহার উপরিতলে ভাসিয়া ওঠে এবং মনের ভার লাঘব করিয়া নিদ্রার সহায়তা করে।

শিশুর স্বপ্ন

অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছার বিকৃত পূরণই স্বপ্ন। কিন্তু এই স্বপ্নলক্ষণ পরিণত বয়স্কদের স্বপ্নেই প্রযোজ্য। পবিণতবয়স্কদেব অবদমিত ইচ্ছা তাহাদের অজ্ঞাতসারে নির্জ্ঞান মনে থাকে এবং ছদ্মবেশে বা বিকৃতভাবে সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু শিশুর স্বপ্ন এই লক্ষণটির ব্যতিক্রম। শিশুর স্বপ্নও পবিণত ব্যক্তির স্বপ্নেরই মত ইচ্ছার পরিপূরক, সন্দেহ নাই। কিন্তু শিশুর অধিশাস্তা বা বিবেক (সুপার্-এগো) এখনও বিকাশ লাভ করে নাই। সুতরাং তাহাব ন্যায়-অন্যায় বোধ এখনও জন্মায় নাই। কাজেই, অন্ধ ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছাকে নিরুদ্ধ বা অবদমিত করিবার পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তি দুইটি তাহার মনে এখনও প্রবল শক্তিতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না।

শিশুর জাগরণে অপূর্ণ বাসনা অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞানে আশ্রয় লয় না। ইহা সংজ্ঞান মন ত্যাগ করিয়া উহার ঠিক নিম্নতলে, অর্থাৎ আসংজ্ঞান মনের

(প্রি-কন্‌সাচ্ মাইণ্ড্) প্রতীক্ষাগারে (অ্যান্টিরুম্), অবসর লয়। এই অপূর্ণ বাসনা অবিকৃতভাবে স্বপ্নে পরিপূর্তি বা চরিতার্থতা লাভ করে। শিশু হয়ত চকোলেটের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল এবং স্বপ্নে চকোলেট চুষিবার মুখভঙ্গী করিতে লাগিল। এই ক্ষেত্রে জাগরণে শিশুর চকোলেট খাইবার ইচ্ছা অবদমিত হয় নাই, অথবা নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত হয় নাই। এস্থলে শিশুর অনবদমিত এবং ব্যক্ত বাসনা স্বপ্নে পূর্ণ হইয়াছে। আবার শিশুর কোনো কোনো বাসনা হয়ত শাসনের বা শাস্তির ভয়ে অবদমিত হইয়াছে, কিন্তু নির্জ্ঞানের গভীর স্তরে নির্বাসিত হইয়া অব্যক্ত হয় নাই। এই অবদমিত, অথচ ব্যক্ত, বাসনাটিও শিশুর স্বপ্নে পূর্ণতা বা চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে।

১০। স্বপ্ন-প্রতিরূপ (ড্রিম্-ইমেজ্)

স্বপ্ন-প্রতিরূপের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) ইহার **স্পষ্টতা ও বিশদতার** প্রধান কারণ, মনোযোগ। স্বপ্নে বাস্তব জগতের সংস্রব না থাকায়, এই প্রতিরূপগুলির উপর মনোযোগ নিঃশেষে কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে, স্বপ্নের প্রতিরূপ জাগরণের মত বাস্তব বলিয়া মনে হয়। (২) স্বপ্ন-প্রতিরূপ **জাগরণে স্পষ্ট এবং অসংবদ্ধ বলিয়া মনে হয়।** স্বপ্নকৃতি অথবা অব্যক্ত উপাদানের ব্যক্তরূপে পরিণতির কৌশলই ইহার কারণ। (৩) জাগরণে প্রায়ই স্বপ্নপ্রতিরূপের **বিস্মৃতি** ঘটে। এই প্রসঙ্গেও উপরোক্ত কারণটি উল্লিখিত হইতে পারে। (৪) স্বপ্ন-প্রতিরূপ **প্রত্যক্ষ ও স্বতঃসিদ্ধ** বলিয়া মনে হয়। কারণ পরে বর্ণিত হইতেছে। (৫) স্বপ্ন-প্রতিরূপ **দার্শন প্রতিরূপের আকারে দৃষ্ট হয়।** কারণ পরে আলোচ্য। (৬) স্বপ্ন-প্রতিরূপ **বর্তমান** বলিয়া জ্ঞাত হয়। অতীত **বা** ভবিষ্যৎ ঘটনার স্বপ্ন-প্রতিরূপও বর্তমান বলিয়া বোধ হয়। (৭) ইহা যেন **বহির্জগতে বিক্ষিপ্ত** বলিয়া ভাসমান হয়। (৮) ইহা **অনৈচ্ছিক।** (৯) স্বপ্ন-প্রতিরূপ নানা **উদ্ভট এবং আজ্‌গুবি** আকারে সংমিশ্রিত হয়। (১০) **বিচার এবং সমালোচনা শক্তি স্তিমিত** হওয়ায়, স্বপ্নের অদ্ভুতত্বকেও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

স্বাপ্নিক দার্শন প্রতিরূপ

দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, চাপ প্রভৃতি সকল সংবেদনের প্রতিরূপই স্বপ্নের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে, দার্শন প্রতিরূপ অবলম্বন করিয়াই স্বপ্ন

ঘটিয়া থাকে। চলিত কথায়ও আমরা "স্বপ্ন দেখি", কিন্তু শুনি না, স্পর্শ করি না, আঘ্রাণ বা আস্বাদন করি না। স্বাপ্নিক বস্তুগুলি দৃশ্য চিত্রাবলীর মত একটির পর একটি ভাসিয়া ওঠে। স্বপ্নের দৈহিক অবস্থায় যদি তাপ উদ্দীপক ক্রিয়া করে, তবে আমরা হয়ত এট্না বা ভিসুভিয়স্ পর্বতে উঠিবার অথবা তুষারক্ষেত্রের উপর দিয়া চলিবার স্বপ্ন দেখি। যদি পেশীগুলি আড়ষ্ট হয়, তবে হয়ত দেখি যে একদল কাঁকড়া আমাদিগকে চিম্‌টি কাটিতে আসিতেছে এবং উদ্দীপকটি যদি স্বাদ হয়, তবে হয়ত আমরা স্বপ্ন দেখি যে কোনো সুখাদ্য বা অখাদ্য ভোজন করিতেছি। কিন্তু এই সব স্বপ্নেই দার্শন প্রতিরূপ প্রাধান্য লাভ করে।

স্বপ্ন-প্রতিরূপের দার্শন হইবার কারণ

স্বাপ্নিক প্রতিরূপ প্রধানতঃ **দার্শন** (ভিসুয়্যাল্) হইবার তিনটি কারণ দেখানো যাইতে পারে। প্রথমতঃ, চক্ষু আলোকের, চোখের পাতার চাপের এবং রক্ত-সঞ্চালনের সামান্য পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল। এই সংবেদনগুলি আবার মস্তিষ্কের ধূসর সংবেদনের দ্বারা বর্ধিত হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং মস্তিষ্ক এই উভয়ের উত্তেজনীয়তাই দার্শন স্বপ্নের অনুকূল। দ্বিতীয়তঃ, যে কারণে কল্পনা প্রধানতঃ দার্শন প্রতিরূপের আকারে ঘটে, সেই একই কারণে স্বপ্নও দার্শন প্রতিরূপের আকারে সংঘটিত হয়। তৃতীয়তঃ, সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুই প্রধান, বেশী ব্যবহৃত এবং বাহ্য জগতের জ্ঞান আহরণে নির্ভরযোগ্য। এই কারণে মস্তিষ্কের দর্শনকেন্দ্র অন্যান্য কেন্দ্রগুলির সহিত সর্বাধিক সংযোগসূত্রে সম্বদ্ধ এবং যে কোনো কেন্দ্র উত্তেজিত হইলেই দর্শনকেন্দ্র উত্তেজিত হয়।

স্বপ্নের স্বতঃসিদ্ধতাবোধ

স্বপ্নের সহিত উহার সত্যতা বা স্বতঃসিদ্ধতাবোধ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুগুলি স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

স্বপ্নের স্বতঃসিদ্ধতাবোধের দুইটি কারণ। প্রথমতঃ, স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাগুলিকে পরীক্ষা বা সংশোধন করিবার উপায় নাই। স্বপ্নে সত্যাসত্যের এমন কোনো বাস্তব মানদণ্ড নাই, যাহার সহিত না মিলিলে স্বপ্নকে মিথ্যা বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ, স্বাপ্নিক প্রতিরূপ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ। এই অবস্থায়, স্বপ্ন-প্রতিরূপ ছাড়া অপর বস্তুতে মনোযোগ থাকে না। মনোযোগ উহার বিষয়কে

স্পষ্ট এবং বিশদ করিয়া তোলে। স্বাপ্নিক প্রতিরূপে মনোযোগ নিঃশেষে কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, উহা বাস্তবতার স্বতঃসিদ্ধতা লইয়া ভাসমান হয়।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেণ্ট্স্ অফ্ সাইকলজি—ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জি. এফ্. ষ্টাউট্—এ ম্যানুয়্যাল্ অফ্ সাইকলজি—তৃতীয় খণ্ড,দ্বিতীয় অংশ—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উড্ওয়ার্থ অ্যাণ্ড্ মাকু ইস্—সাইকলজি—অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বোরিং, ল্যাংফেল্ড, ওয়েল্ড্—ফাউণ্ডেশনস্ অফ্ সাইকলজি—নবম পরিচ্ছেদ

ই. বি. টিশ্নার্—এ প্রাইমার্ অফ্ সাইকলজি—চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

জি. মার্ফি—জেনার‍্যাল্ সাইকলজি—বিংশ পরিচ্ছেদ

এস্. ফ্রয়েড্—ইণ্টারপ্রেটেশন্ অফ্ ড্রিম্স্—৩৭৩ পৃঃ

" " —ইনট্রডাক্টারি লেক্চারস্ অন্ সাইকো-অ্যানালিসিস্—দ্বিতীয় ভাগ

এস্. সি মিত্র—মনঃসমীক্ষণ—পৃঃ ৬৭-৭৩

Exercise

1. Distinguish between memory and imagination. (p. 591)
2. Explain the ways in which imagination is constructed (pp. 591-592)
3. What are the limits of imagination ? (pp. 592-593)
4. Explain and illustrate the different kinds of imagi..ation (pp 593-597)
5. Distinguish between imagination with and without belief. (pp. 596-597)
6. Distinguish between autistic thinking and day-dreams. (pp 599 600)
7. Distinguish between dream, illusion and hallucination (pp 600-603)
8. Distinguish between physiological and psychological theories of dream. (pp 603-604)
9. Expound Freud's theory of dream. How does Freud distinguish between his and the stimulus theory of dream ? (pp. 604-608)
10. Explain the mechanisms of dream-formation. (pp 606-608)
11. Give an analysis of Freud's theory of dream. (pp. 608-611)
12. What is the value of dream-study ? How does dream guard sleep? (pp. 609-610)
13. How does Freud explain children's dreams ? (pp. 610-611)
14. Bring out the nature of the dream-image (pp. 611-613)
15. Does dream operate through visual images ? If so, why ? How do you account for the self-evident feeling of dreams ? (pp. 611-613)

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

চিন্তন—থিঙ্কিং

১। চিন্তন কাহাকে বলে

বিভিন্ন অর্থ

স্মৃতি, কল্পনা প্রভৃতি নানা মানস ক্রিয়ার অর্থে চিন্তন কথাটি ব্যবহৃত হয়। কাহারও নাম স্মরণ করিতে গিয়া, আমরা নামটি 'চিন্তা করিয়া দেখি'। আবার, কোনো নূতন পরিস্থিতিতে কি ভাবে চলিব, তাহাও আমরা 'চিন্তা করি'। এখানে প্রথমোক্ত চিন্তন ক্রিয়া স্মরণের এবং দ্বিতীয়টি কল্পনার নামান্তর। কিন্তু এইরূপ অস্পষ্ট অর্থে প্রয়োগ করিলে, চিন্তন ক্রিয়ার মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়। চিন্তনের এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা স্মরণের বা কল্পনার নাই। এই অসাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যই চিন্তনের বিশেষ বা সঙ্কীর্ণ অর্থ।

এই বিশেষ বা সঙ্কীর্ণ অর্থে চিন্তন বলিতে কোনো সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় ভাব বা ধারণাপ্রবাহ (ট্রেন্ অফ্ আইডিয়াজ্) বুঝায়। কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হইলে চিন্তনের প্রয়োজন হয় না। একটি বিষয় বুঝিবার বা কাজ করিবার কালে, বাধা উপস্থিত হইলেই, চিন্তনের উদ্ভব হয়। শরীর সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে চলিতেছে, অথবা অঙ্কগুলি বেশ সহজে হইয়া যাইতেছে, এইরূপ গতানুগতিক অবস্থায়, কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হওয়ায়, চিন্তন নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু হঠাৎ শরীর খারাপ হইলে চিন্তা হয়, কেন সাবধানে থাকা সত্ত্বেও শরীর খারাপ হইল। একটি অঙ্ক হঠাৎ আট্‌কাইয়া গেলে চিন্তা হয়, কেন অঙ্কটি হইতেছে না, তবে কি এইটির জন্য অন্য নিয়ম জানা দরকার।

চিন্তন বলিতে আমরা বুঝিব জ্ঞাত সত্যের সাহায্যে কোনো নূতন সমস্যাকে বুঝিবার অথবা জানিবার জন্য ভাব বা ধারণা প্রবাহ। অথবা যাহা জ্ঞাত রহিয়াছে তাহার সাহায্যে অজ্ঞাতকে জানিবার ক্রিয়াকে চিন্তন বলে। কিন্তু জ্ঞাত সত্যগুলি জ্ঞাত হইয়াছে অতীত সংবেদন, প্রত্যক্ষ, স্মরণ, কল্পনা প্রভৃতি ক্রিয়ার সাহায্যে। কাজেই, চিন্তন এই অপেক্ষাকৃত সরল অবগতিমূলক ক্রিয়াগুলির উপর নির্ভর করে। সংবেদন এবং প্রত্যক্ষ সাহায্যে চিন্তনের উপাদান (মেটিরিয়্যাল্‌স্) অর্জিত হয়। সুতরাং ইহারা চিন্তনের অর্জনমূলক (অ্যাকুইজিটিভ্) দিক। আবার অর্জিত বা সংগৃহীত উপাদান-

গুলি স্মৃতিতে এবং কল্পনাতে সংরক্ষিত হয়। সুতরাং ইহারা চিন্তনের সংরক্ষণ-মূলক (প্রিজার্ভেটিভ্) দিক। তৃতীয়তঃ, প্রত্যয় (কন্সেপ্ট্) বা সামান্য-ধারণা, অবধারণা (জাজ্মেন্ট্) এবং যুক্তি (রিজ্নিং) প্রভৃতি উচ্চতর চিন্তনস্তরগুলি উহার সংগঠনমূলক (কন্‌স্ট্রাক্‌টিভ্) দিক।

বৃষ্টি দেখিয়া অনুমান করা হইল, নিশ্চয়ই মেঘ করিয়াছে। এই স্থলে, বৃষ্টির অতীত প্রত্যক্ষ এবং স্মরণের ফলে জ্ঞাত বিষয়টি যে বৃষ্টি তাহা বুঝা গেল। অতীত প্রত্যক্ষে বৃষ্টির সহিত মেঘের নিয়মিত সম্বন্ধও জানা আছে। এই জ্ঞাত সত্যের ভিত্তিতে অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হওয়া গেল যে মেঘ করিয়াছে।

চিন্তন একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং উহাকে বিশ্লেষণ করিলে সংবেদন, প্রত্যক্ষ, স্মরণ, কল্পনা প্রভৃতি সহজতর ক্রিয়াগুলির ফলও ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। **ব্যাপক অর্থে** চিন্তন বলিতে বুঝায় মনের অবগতিমূলক বৃত্তিগুলি, যথা সংবেদন, প্রত্যক্ষ, স্মরণ, কল্পনা, প্রত্যয়, অবধারণা এবং যুক্তি। কিন্তু এই ব্যাপক অর্থে চিন্তনের বৈশিষ্ট্য থাকে না। চিন্তনের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে বলিতে হয় যে ইহা **প্রত্যয় (কন্সেপ্ট্), অবধারণা (জাজ্মেন্ট্) এবং যুক্তি (রিজ্নিং) এই তিনটি অঙ্গ লইয়া গঠিত।**

চিন্তন মনের অবগতিমূলক (কগ্নিটিভ্) ক্রিয়া। কিন্তু মন একটি সমগ্র বস্তু। ইহার জ্ঞানমূলক ক্রিয়াকে অনুভূতি এবং চেষ্টামূলক ক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ফলে, চিন্তন অনুভূতি এবং চেষ্টার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। একটি জ্ঞাত সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হওয়া যেমন একদিক দিয়া অবগতিমূলক ক্রিয়া, আবার অন্য দুইটি দিক দিয়া ইহা অনুভূতিমূলক এবং ইচ্ছামূলক ক্রিয়াও বটে। কোনো সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে একটি জ্ঞানমূলক অনিশ্চয়তা, অনুভূতিমূলক অস্বস্তি এবং চেষ্টামূলক আড়ষ্টতা থাকে। আবার এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় এবং সাফল্যেও থাকে জ্ঞানমূলক অনুসন্ধান ও অনিশ্চয়তাবোধ, অনুভূতিমূলক কষ্ট ও সুখবোধ এবং চেষ্টামূলক চাপ ও শিথিলতাবোধ।

সুতরাং, সঙ্কীর্ণ অর্থে চিন্তনের অর্থ হইল, **কোনো সমস্যা-সমাধানে ভাব বা ধারণাপ্রবাহ, অথবা জ্ঞাত বিষয়ের আলোকে অজ্ঞাত বিষয়কে জানা।** এই অর্থে চিন্তনের তিনটি অঙ্গ হইল প্রত্যয়, অবধারণা এবং যুক্তি।

২। চিন্তনের বাহন (টুল্‌স্‌ অফ্‌ থিঙ্কিং)

প্রত্যক্ষ-ফল (পার্সেপ্ট্‌)

অনুভূতি এবং ইচ্ছা প্রভৃতি মানসবৃত্তির মত চিন্তনও একটি সহজ এবং স্বাভাবিক ক্রিয়া। কিন্তু চিন্তন সম্ভব হয় কতগুলি বাহন (টুল্‌) বা উপায়ের সাহায্যে। চিন্তনের পশ্চাতে রহিয়াছে প্রত্যক্ষ-ফল (পার্সেপ্ট্‌)। "পর্বতটিতে আগুন আছে, কারণ পর্বতটি হইতে ধূম বাহির হইতেছে এবং যেখানে ধূম আছে সেখানেই আগুন আছে।" এই অনুমান বা চিন্তনটির মূলে ধূম এবং আগুনের প্রত্যক্ষ-ফল রহিয়াছে, কারণ যাহার ধূম এবং আগুন প্রত্যক্ষ হয় নাই, তাহার পক্ষে এইরূপ চিন্তন অসম্ভব। পর্বতে প্রত্যক্ষ ধূমের অবশ্যই আগুনের সহিত সম্বন্ধ আছে, কারণ পূর্ব-প্রত্যক্ষে ইহাদের নিয়ত সম্বন্ধ জানা হইয়াছে।

প্রত্যয় (কন্‌সেপ্ট্‌)

প্রত্যক্ষফল চিন্তনের একটি বাহন বা উপায়। কিন্তু উপরের দৃষ্টান্তে পর্বতে প্রত্যক্ষ ধূম অতীতে প্রত্যক্ষ সকল ধূমের সমজাতীয়, এইরূপ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই বিশেষ ধূম অতীতে প্রত্যক্ষ সকল ধূমের সম-জাতীয়। এইরূপ **একই জাতীয় সকল বিশেষ বস্তুর সাধারণ গুণগুলির ধারণাকে বলা হয় প্রত্যয়** (কন্‌সেপ্ট্‌)। প্রত্যয়ের সাহায্য ছাড়া চিন্তন অসম্ভব। চিন্তন দুই বা ততোধিক প্রত্যয়ের সম্বন্ধ। উপরোক্ত উদাহরণের চিন্তনটি পর্বত, ধূম এবং আগুন, এই তিনটি সামান্য ধারণা বা প্রত্যয়ের সম্বন্ধে গঠিত।

অবধারণা (জাজ্‌মেণ্ট)

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, প্রত্যক্ষ-ফলের মত প্রত্যয়ও চিন্তনের বাহন (টুল্‌) বা উপায়। আবার **প্রত্যয়ের সহিত প্রত্যয়ের সম্বন্ধকে বলে অবধারণা (জাজ্‌মেণ্ট্‌)।** চিন্তন এক বা একাধিক অবধারণার সম্বন্ধে গঠিত হয়। যেমন উপরের উদাহরণের তিনটি অংশই অবধারণা (জাজ্‌মেণ্ট্‌)। 'পর্বতে আগুন আছে,' কারণ 'পর্বতে ধূম আছে' এবং 'যেখানে ধূম আছে সেখানে আগুন আছে'—এই তিনটি অবধারণা লইয়া চিন্তনটি গঠিত।

প্রতীক (সিম্বল্)

চিন্তনের মূল অবলম্বন হইল প্রতীক (সিম্বল্)। **জ্ঞাত বস্তুর সাহায্যে অজ্ঞাত বস্তুকে অভিব্যঞ্জিত বা ইঙ্গিত করাই প্রতীকের কাজ।** যেমন ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকাটি ভারতীয় জাতীয়তার প্রতীক, অথবা সিংহ ইংরাজ-জাতির জাতীয় প্রতীক। তেমনই প্রত্যক্ষ ধূম অপ্রত্যক্ষ আগুনের প্রতীক। প্রত্যক্ষ ধূম একটি উপস্থিত বস্তু। ইহার সাহায্যে অনুপস্থিত আগুনের জ্ঞান হয়।

ভাষা (ল্যাঙ্গোয়েজ্)

আবার ভাষাও চিন্তনের একটি মস্ত বড় বাহন। ভাষার সাহায্য না লইয়া চিন্তন সম্ভব কিনা, তাহা একটি বিশেষ সমস্যা। এই বিষয়ে দর্শন এবং যুক্তি-বিদ্যার মতামত যাহাই হউক না কেন, মনোবিদ্যার দিক হইতে ভাষা যে চিন্তার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিন্তনের একটি অপরিহার্য উপায় এবং প্রকাশ হইল ভাষা। যে সকল চিন্তন ভাষায় প্রকাশ না করিয়া আমরা মনে মনে করি, তাহার সঙ্গে সঙ্গেও ভাষা-প্রতিরূপ (ভার্ব্যাল্ ইমেজ্) বা ভাষা-অভ্যাস (ল্যাঙ্গোয়েজ্ হ্যাবিট্) কাজ করে।

ভাষা ও প্রতীক

ভাষা চিন্তনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রতীক অথবা চিহ্নের (সাইন) কাজ করে। কোনো ব্যক্তিকে 'রাম' বলিয়া অভিহিত করিবার অর্থ ঐ নাম সাহায্যে উহাকে অপরাপর ব্যক্তি ও বস্তু হইতে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা। ঐ ব্যক্তিকে 'রাম' বলিয়া ডাকিবার অর্থ ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ চিন্তা বা ভাবকে ঐ ব্যক্তির এবং অপরাপর ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করা, অথবা আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তার আদান প্রদান করা।

৩। প্রত্যক্ষ-ফল (পার্সেপ্ট্) প্রতিরূপ (ইমেজ্) এবং প্রত্যয় (কন্সেপ্ট্)

প্রত্যক্ষ-ফল ও প্রত্যয়ের পার্থক্য

(১) প্রত্যক্ষ-ফল একটি বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রত্যয় বা সামান্যধারণা শুধু বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়, ইহা প্রত্যেক

সমজাতীয় বস্তু বা ব্যক্তিতে একই অর্থে প্রযোজ্য। পর্বতে যে ধূম দেখিতেছি, সেই প্রত্যক্ষের ফল ঐ ধূমেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ধূম সম্বন্ধে প্রত্যয় বা সামান্যধারণা শুধু ঐ ধূমেই সীমাবদ্ধ নয়, পক্ষান্তরে ধূমজাতীয় সকল বস্তুতেই প্রযোজ্য। (২) উপরের তুলনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে প্রত্যক্ষ-ফল শুধু বর্তমানে সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রত্যয় বা সামান্য-ধারণা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, সকল কালেই প্রসারিত। ধূম-প্রত্যক্ষ শুধু বর্তমান ধূমেরই প্রত্যক্ষ। কিন্তু ধূমের সামান্য ধারণা বা প্রত্যয় যে ধূম বর্তমানে প্রত্যক্ষ হইতেছে, অতীতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, অর্থাৎ সকল ধূমের বা ধূম-সামান্যের, প্রত্যয়। (৩) আবার প্রত্যক্ষফল স্থূল বা মূর্ত (কংক্রিট্)। পক্ষান্তরে প্রত্যয় অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এবং অমূর্ত (অ্যাব্স্ট্র্যাক্ট্)। প্রত্যক্ষ ধূমের রূপগুণ আছে। ইহা যেমন বস্তু বুঝায়, তেমন ঐ বস্তুর গুণও বুঝায়। পক্ষান্তরে, ধূম প্রত্যয় কতগুলি সাধারণ গুণের ধারণা, ইহার মূর্তি নাই। (৪) প্রত্যক্ষ-ফল একটি সমগ্র বস্তুকে বুঝায়, কিন্তু প্রত্যয় বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন সাধারণ গুণাবলীকে বুঝায়। ধূমপ্রত্যক্ষে অল্পবিস্তরভাবে ধূমের সকল গুণগুলি-সহ ধূম জ্ঞাত হয়, কিন্তু ধূম প্রত্যয়ে শুধু ইহার যে সকল গুণ ধূমে আছে তাহারই জ্ঞান হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ এবং প্রত্যয় (পার্সেপ্ট্, ইমেজ্ অ্যাণ্ড্ কন্সেপ্ট্)

প্রত্যক্ষ যেমন ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ, প্রতিরূপও তেমন ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ। ধূমের প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ ধূমেরই প্রতিরূপ, অন্য ধূমের নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ শুধু উপস্থিত বস্তুর জ্ঞান। পক্ষান্তরে প্রতিরূপ অনুপস্থিত অথবা পুনরুপস্থিত বস্তুর জ্ঞান। আবার, প্রত্যক্ষ বর্তমান বস্তুর জ্ঞান, কিন্তু প্রতিরূপ অতীত-প্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ উহার বস্তুর বর্তমানতা বুঝায়, কিন্তু প্রতিরূপ বুঝায় যে উহার বস্তু অতীত বা অবর্তমান।

কিন্তু প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপ যেমন ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ, প্রত্যয় তেমন নয়। ধূমের প্রত্যক্ষ বর্তমানে এবং প্রতিরূপ অতীতে জ্ঞাত ধূমে সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে ধূমের প্রত্যয় বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ, সকল ধূমেই প্রযোজ্য। আবার, প্রত্যক্ষ বস্তুর উপস্থিতি এবং প্রতিরূপ উহার পুনরুপস্থিতি বুঝায়, কিন্তু প্রত্যয় উহার পুনঃপুনরুপস্থিতি (রি-রি-প্রেজেণ্টেশন্) বুঝায়। প্রত্যক্ষ ধূম বর্তমানে উপস্থিত (প্রেজেণ্টেড), প্রতিরূপের ধূম অতীতে উপস্থিত এবং বর্তমানে

পুনরুপস্থিত (রি-প্রেজেণ্টেড্)। কিন্তু প্রত্যয়ের ধূম পুনরুপস্থিত ধূম প্রতিরূপের মধ্য দিয়া পুনঃপুনরুপস্থিত (রি-রি-প্রেজেণ্টেড্)।

অন্য দিক দিয়া দেখিলে, প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যয়ের মধ্যবর্তী একটি মানসবৃত্তি। স্থূলতা অথবা মূর্ততা এবং সূক্ষ্মতা অথবা অমূর্ততার দিক দিয়াও এই সম্বন্ধ সত্য। প্রত্যক্ষ স্থূল অথবা মূর্ত। প্রতিরূপ অপেক্ষাকৃত কম স্থূল বা মূর্ত এবং প্রত্যয় সর্বাপেক্ষা কম স্থূল বা মূর্ত।

সামান্য এবং যৌগিক প্রতিরূপ (জেনারিক্ অ্যাণ্ড্ কম্পোজিট্ ইমেজ্)[১]

দেখা গেল যে প্রতিরূপ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুতে সীমাবদ্ধ এবং প্রত্যয় সমজাতীয় সকল ব্যক্তি বা বস্তুতে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, প্রতিরূপের সাধারণতা নাই যেমন প্রত্যয়ের আছে। কিন্তু কোনো কোনো মনোবিৎ দেখাইয়াছেন যে বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিসূচক প্রতিরূপ এবং সমজাতীয় সকল বস্তু বা ব্যক্তিসূচক প্রত্যয়ের মধ্যবর্তী একপ্রকার প্রতিরূপ আছে যাহা একাধিক বস্তু বা ব্যক্তির ধর্ম সূচিত করে। এই প্রতিরূপকে বলা হইয়াছে **সামান্য প্রতিরূপ** (জেনারিক্ ইমেজ্)। সামান্য প্রতিরূপের সদৃশ আর এক প্রকার প্রতিরূপকে বলা হয় **যৌগিক প্রতিরূপ** (কম্পোজিট্ ইমেজ্)।

যৌগিক প্রতিরূপ গঠিত হয় কতগুলি সমজাতীয় বা সদৃশ বস্তুর প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে। ইহাতে প্রত্যক্ষ বস্তুগুলির পার্থক্য বাদ পড়িয়া যায় এবং উহাদের সাদৃশ্য সংরক্ষিত হয় প্রতিরূপের আকারে। কোনো হাসপাতালের রোগীদের সমষ্টিগত চেহারা কিরূপ তাহা যৌগিক চিত্রে ধরা পড়ে, রোগীদের চেহারার পার্থক্য বাদ দিয়া এবং সাদৃশ্য সংরক্ষণ করিয়া। অনুরূপভাবে সামান্য প্রতিরূপে একই জাতীয় বিভিন্ন বস্তুর পার্থক্য বাদ পড়িয়া উহাদের সাদৃশ্য থাকিয়া যায়। সামান্য প্রতিরূপ অনেকটা নক্সার মত, কারণ ইহা একজাতীয় যে কোনো বস্তুকে বুঝাইতে পারে। একজাতীয় একাধিক বস্তুর পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষের ফলে বস্তুগুলির সাদৃশ্য মনের উপর দাগ কাটিতে থাকে, যাহার ফলে উহাদের পার্থক্যগুলি বাদ পড়িয়া সাদৃশ্যের সামান্য প্রতিরূপ সৃষ্ট হয়।

কিন্তু সামান্য প্রতিরূপ প্রত্যয়ের মত সামান্য বা সাধারণ মনে হইলেও, তাহা নয়। প্রত্যয় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সকল সমজাতীয় বস্তুরই সাধারণ ধারণা। কিন্তু

১ ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

সামান্য প্রতিরূপ শুধু জ্ঞাত সমজাতীয় বস্তুর সাধারণ ধারণা। অর্থাৎ, সামান্য প্রতিরূপে জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত বস্তুতে জ্ঞানের প্রসারণ নাই, কিন্তু প্রত্যয়ে জ্ঞানের এইরূপ প্রসারণ রহিয়াছে।

৪। প্রত্যয় গঠন
(ফর্মেশন্ অফ্ দি কন্সেপ্ট্)

প্রত্যয় বা সামান্য ধারণা সাধারণতঃ স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ, ইহা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়াই গঠিত হয়।

প্রত্যয়ের গঠন-প্রণালী বিশ্লেষণ করিলে উহার কয়েকটি স্তর বা অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। (১) **পর্যবেক্ষণ** (অব্জার্ভেশন্)—যেমন, "মানুষ" এই সামান্য ধারণাটির মূলে রহিয়াছে রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পর্যবেক্ষণ। (২) **বিশ্লেষণ** (অ্যানালিসিস)—আমরা পর্যবেক্ষিত ব্যক্তি বা বস্তুর গুণাবলী বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের বুঝিয়া থাকি। যেমন, রামের ক, খ, জ, ব, শ, শ্যামের গ, জ, ত, প, ব এবং যদুর ঘ, চ, জ, ড, ব গুণগুলি আছে। (৩) **তুলনা** (কম্পারিজন্)—আমরা রাম, শ্যাম এবং যদুর পর্যবেক্ষিত গুণগুলিকে তুলনা করিয়া দেখি কোন্‌গুলি উহাদের সাধারণ গুণ। এই স্থলে দেখা যায় যে জ বা জীববৃত্তি এবং ব বা বুদ্ধিবৃত্তি পর্যবেক্ষিত ব্যক্তিগণের সাধারণ গুণ। (৪) **বিমূর্তকরণ** (অ্যাব্স্ট্র্যাক্শন্)—আমরা জীববৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি, এই সাধারণ গুণ দুইটিকে অন্যান্য পরিবর্তনশীল গুণগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করিয়া একদিকে রাখি বা একত্র করি। (৫) **সামান্যী-করণ** (জেনার‍্যালাইজেশন্)—এই সাধারণ গুণগুলিকে শুধু পর্যবেক্ষিত রাম, শ্যাম এবং যদুতে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া উহাদের সমজাতীয় সকল মানুষে প্রয়োগ করি। অর্থাৎ আমরা এই সামান্য বচনে উপস্থিত হই যে জীববৃত্তি এবং বুদ্ধি-বৃত্তি শুধু এই তিনজনেরই সাধারণ গুণ নয়, কিন্তু উহাদের সমজাতীয় সকল মানুষেরই সাধারণ গুণ। (৬) **নামকরণ** (নেমিং)—জীববৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির সামান্য ধারণা বা প্রত্যয়টির "মানুষ" বা "মনুষ্যত্ব" এই নামকরণ করি।

উপরোক্ত উপায়ে "মানুষ" বা "মনুষ্যত্ব", এই প্রত্যয় বা সামান্য ধারণাটি গঠিত হইয়া থাকে। অনিচ্ছাকৃত অথবা স্বতঃক্রিয় চিন্তনেও এই স্তরগুলি স্বাভাবিক নিয়মে অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ চিন্তনে, যেমন শিশুর চিন্তনে, ইহাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকে না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের চিন্তনে—

যেমন ন্যায় (লজিক্), বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিতে—এই স্তরগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পন্ন এবং স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, প্রথমোক্ত মনোবৈজ্ঞানিক প্রত্যয় জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু ন্যায় দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রত্যয় সাধারণতঃ সুনির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তিত থাকে।

৫। ভাষা (ল্যাঙ্গোয়েজ্), সঙ্কেত, প্রতীক ও নক্সা

ভাষা

ভাষা চিন্তনের বাহন, অর্থাৎ ভাষার সাহায্যেই চিন্তন প্রকাশিত হয়। ভাষা যে চিন্তন-প্রকাশের একটি মস্ত বড বাহন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাষাই এক ব্যক্তিমনের সহিত অপর ব্যক্তিমনের সম্বন্ধসূত্র। রামের মনোভাব জানিতে হইলে, তাহাকে উহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়। তাহা হইলে, মনোভাব বা চিন্তন জানিবার বাহন হইল ভাষা।

কথিত এবং অকথিত ভাষা

শুধু কথিত বা বাচনিক ভাষায়ই (আর্টিকুলেট্ স্পীচ্) যে চিন্তন প্রকাশিত হয়, তাহা নয়। অকথিত ভাষা (ইন্-আর্টিকুলেট্ স্পীচ্) বা নানা আকার-প্রকার এবং ইঙ্গিত প্রভৃতির সাহায্যেও মনোভাব বা চিন্তন প্রকাশিত হইয়া থাকে। মূক-বধির (ডেফ্-মিউট্) ব্যক্তিগণ আকার-প্রকার বা ইঙ্গিতের সাহায্যেই তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করে।

ভাষা ও চিন্তা

ভাষা ব্যতীত চিন্তন সম্ভব কিনা, এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। চেষ্টিত-বাদীরা বলিয়া থাকেন যে চিন্তন অকথিত বা কথিত ভাষারই নামান্তর। কিন্তু অন্যান্য অনেক মনোবিৎ, যেমন কুল্পে, স্টাউট্, বিনে প্রভৃতি মনে করেন যে ভাষা-প্রতিরূপ-বিহীন চিন্তন (ইমেজ্লেস্ থট্) সম্ভব।

এই প্রশ্নটির বিচার পরবর্তী অনুচ্ছেদে করা যাইতেছে। আপাততঃ সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে চিন্তন এবং ভাষার আপেক্ষিক গুরুত্ব যাহাই হউক না কেন, ইহাদের সম্বন্ধ যে অতিশয় ঘনিষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সঙ্কেত (সাইন্), প্রতীক (সিম্‌বল্) এবং নক্সা (ডায়াগ্রাম্)

চিন্তনে সঙ্কেতের (সাইন্) বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। ভাষা চিন্তন বা ভাবেরই সঙ্কেত বিশেষ। ভাষা কোনো অর্থের (মিনিং) প্রকাশ করিয়া উহাকে চিহ্নিত করে, বা উহার সঙ্কেতরূপে কাজ করে। চিন্তনের উচ্চতর স্তরে ভাষা ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত বা ঘনীভূত আকার গ্রহণ করে, অর্থাৎ সাঙ্কেতিক হইয়া দাঁড়ায়। যেমন বীজগণিতে শুধু কয়েকটি বর্ণের সাহায্যে চিন্তন প্রকাশিত হয়। দর্শনের অনেকগুলি চিন্তন এক বা একাধিক প্রত্যয়ের সাহায্যে ব্যক্ত হইয়া থাকে। একটিমাত্র সূত্র বা প্রত্যয়ের সাহায্যে বিজ্ঞান এবং দর্শন বহু চিন্তন প্রকাশ করিয়া থাকে।

সঙ্কেত ও প্রতীক

উপরের আলোচনা হইতে এমন মনে হয় না যে **সঙ্কেত এবং প্রতীকের** (সিম্‌বল্) মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে। উহারা চিন্তন সম্পর্কে প্রায় একই প্রকারের কাজ করে। উহারা উভয়েই চিন্তনকে ব্যক্ত করে। কিন্তু সঙ্কেত এবং প্রতীকের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। উহাদেব পার্থক্য এই যে **সকল প্রতীকই সঙ্কেত, কিন্তু সকল সঙ্কেতই প্রতীক নয়।** প্রতীকের তুলনায় সঙ্কেত অধিকতর ব্যাপক। অঙ্গভঙ্গী, যেমন হাত বা মাথা নাড়িয়া হাঁ বা না করা, সদর্থক (পজিটিভ্) এবং নঞর্থক (নেগেটিভ্) চিন্তন প্রকাশ করে। আবার হাসি-কান্না, ঘুষি বাগানো, দন্তঘর্ষণ, ভ্রূকুঞ্চন প্রভৃতি ভঙ্গীগুলি কোনো না কোনো মনোভাবের সঙ্কেত করে। দৌড়ানো, বসিয়া পড়া বা শুইয়া পড়া বিভিন্ন মানসিক অবস্থার সূচক। কিন্তু এই সঙ্কেতগুলিকে প্রতীক বলা যায় না। প্রতীক সাধারণতঃ অতি সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ইহা শেষোক্ত সঙ্কেত-গুলির তুলনায় অধিকতর সংক্ষিপ্তভাবে অধিকতর সূক্ষ্ম চিন্তন প্রকাশ করে। যেমন বেদান্তে ওম্ এই প্রণব মন্ত্রটি সৃষ্টিস্থিতিসংহারমূলক পরমকারণ ব্রহ্মের প্রতীক অথবা বাচকরূপে ব্যবহৃত হয়। খ্রীষ্টানগণ ক্রশ্ চিহ্নকে তাঁহাদের ধর্মীয় প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করেন।

সুতরাং দেখা গেল যে চিন্তনের সূক্ষ্ম সঙ্কেতগুলিই প্রতীক, কিন্তু অঙ্গভঙ্গী বা সাধারণ নাম প্রভৃতির বাচক ভাষাগুলি চিন্তনের সঙ্কেত হইলেও, প্রতীক নয়। অথবা স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে সঙ্কেত দুই প্রকারের হইতে পারে। সূক্ষ্ম সঙ্কেতই প্রতীক, কিন্তু স্থূল সঙ্কেত প্রতীক নয়।

নক্সা

আবার, **নক্সাও** (ডায়াগ্রাম্) চিন্তনের একপ্রকার সঙ্কেত বা উহা প্রকাশ করিবার একপ্রকার বাহন। জ্যামিতির রেখাঙ্কন (ফিগার্), যুক্তি শাস্ত্রীয় ন্যায়ের আকার (ফিগার্), অয়লার্-এর বৃত্তসাহায্যে (অয়লার্'স্ সার্ক্ল্) পদের ব্যক্ত্যার্থের বণ্টনপ্রণালীর (ডিস্ট্রিবিউশন্ অফ্ টার্মস্) ব্যাখ্যা, প্রভৃতি নক্সার দৃষ্টান্ত। চিন্তনের সূক্ষ্ম বিষয়কে ইন্দ্রিয় সাহায্যে জানিবার উপায় নাই। নক্সা উহাদিগকে ইন্দ্রিয় সাহায্যে বুঝিবার বা বুঝাইবার উপায়।

যেমন ত্রিভুজ একটি নক্সা। ত্রিভুজ বলিতে আমরা বুঝি তিনটি সরল রেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ রেখাঙ্কনকে। কিন্তু সরলরেখার সংজ্ঞা (যাহার শুধু দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ নাই এবং যাহা দিক পরিবর্তন না করিয়া একই দিকে অগ্রসর হয় এমন রেখা) অনুসারে ইহাকে অঙ্কন করা যায় না। অথচ জ্যামিতির জটিল ও সূক্ষ্ম চিন্তন বুঝিবার সহায়ক হয় ত্রিভুজ প্রভৃতি রেখাঙ্কন। দৈনন্দিন জীবনেও রাস্তার, প্রস্তাবিত গৃহের বা অন্যান্য পরিকল্পনার নক্সা ঐ ঐ বিষয়ে চিন্তনকে সাহায্য করিয়া থাকে।

৬। অবধারণ (জাজ্‌মেণ্ট্) এবং যুক্তি (রিজ্‌নিং)

দুইটি প্রত্যয়ের সম্বন্ধকে সত্য বলিয়া মনে করিবার ক্রিয়াকে অবধারণ (জাজ্‌মেণ্ট্) বলে।

অবধারণকে চিন্তনের একক বলা হইয়া থাকে, কারণ বাস্তব চিন্তনে অবধারণ অপেক্ষা অধিকতর মৌলিক স্তর নাই। অবধাবণই চিন্তনের মৌলিকতম অংশ, কারণ ইহার সাহায্যেই চিন্তন ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা প্রত্যয়কে অবধারণের সংগঠক এবং চিন্তনের মৌলিকতম অংশ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মত যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীতে যাহাই হউক না কেন, মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে গ্রহণীয় নয়।

অবধারণে বিশ্লেষণ (অ্যানালিসিস্) এবং সংশ্লেষণ (সিন্থেসিস্) প্রভৃতি ক্রিয়া অংশ গ্রহণ করে। "গোলাপ সুগন্ধ ফুল", এই অবধারণে গোলাপের নানা গুণের মধ্যে উহার সৌগন্ধ্য গুণটি বাছিয়া লওয়া হইয়াছে, সুতরাং ইহা বিশ্লেষণ-মূলক। আবার, ইহাতে এই বিশ্লিষ্ট গুণটিকে গোলাপের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে, সুতরাং এই অবধারণটি সংশ্লেষণ-মূলকও বটে।

অবধারণ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। "গোলাপ সুগন্ধ ফুল" এইটি সদর্থক (অ্যাফার্মেটিভ্) অবধারণ। আবার "গোলাপ ফল নয়", এই অবধারণটি নঞ্‌বাচক (নেগেটিভ্)। আবার "এই গোলাপটি বড়" এবং "সকল গোলাপই সুগন্ধ" যথাক্রমে বিশেষ (পার্টিকুলার্) এবং সামান্য (য়ুনিভার্স্যাল্) অবধারণের দৃষ্টান্ত। অবধারণ আরও অনেক প্রকারের হইতে পারে।

অবধারণ সাহাযোই চিন্তনের ক্রমবিকাশ ঘটিয়া থাকে। চিন্তন বুঝিতে হইলে অবধারণের সাহায্য লইতে হয়। যেমন "সূর্য উদিত হইয়াছেন" এই অবধারণটি "রাত্রি শেষ হইয়াছে", "এখন হাত মুখ ধুইবার সময়" প্রভৃতি অন্যান্য অবধারণের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায়, অবধারণ চিন্তনের ক্রমবিকাশের ধারায় অনুমান অথবা যুক্তির আকার গ্রহণ করে।

যুক্তি (রিজ্‌নিং)

এক বা একাধিক অবধারণকে আশ্রয় করিয়া কোনো নূতন অবধারণে উপনীত হইবার প্রণালীকে বলা হয় যুক্তি।

অবধারণ বুঝিতে হইলে, উহাকে যুক্তির আকারে প্রসারিত করিয়া বুঝিতে হয়। যেমন, "সূর্য উদিত হইয়াছেন" অবধারণটি বুঝিতে হইলে বলিতে হয় যে "আমি সূর্যোদয় দেখিতেছি", "সূর্য উদিত না হইলে আমি সূর্যোদয় দেখিতাম না", "চারিদিক আলোকিত হইয়াছে", "রাত্রির অন্ধকার দূর হইয়াছে," প্রভৃতি অবধারণগুলি।

যুক্তি প্রধানতঃ দুই প্রকারের হইতে পারে। যে অবধারণকে আশ্রয় করিয়া কোনো অজ্ঞাতপূর্ব অবধারণে উপনীত হওয়া যায় তাহা বিশেষ এবং নূতন অবধারণটি সামান্য হইতে পারে। এইরূপ বিশেষ অবধারণ হইতে সামান্য অবধারণে উপনীত হওয়ার যুক্তিপদ্ধতিকে বলে **আরোহ অনুমান** (ইন্‌ডাকটিভ্ রিজ্‌নিং)। যেমন রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যু দেখিয়া অনুমান করা হইল যে "সকল মানুষই মরণশীল"। আবার সামান্য অবধারণকে আশ্রয় করিয়া কোনো অপেক্ষাকৃত বিশেষ অবধারণে পৌছিবার নাম **অবরোহ অনুমান** (ডিডাকটিভ্ রিজ্‌নিং)। যেমন, "সকল মানুষই মরণশীল", এই সামান্য অবধারণটিকে আশ্রয় করিয়া, "রাম মানুষ" অবধারণের সাহায্যে, অনুমান করা যাইতে পারে যে "রাম মরণশীল"।

৭। চিন্তন সম্পর্কে মনোবিদ্যার এবং যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী

উপরের আলোচনা হইতে এইরূপ মনে হইতে পারে যে চিন্তন বিষয়ে মনোবিদ্যার এবং যুক্তিবিদ্যার কোনো পার্থক্য নাই, কারণ যুক্তিবিদ্যার মত মনোবিদ্যাও প্রত্যয়, অবধারণ এবং যুক্তি লইয়া আলোচনা করে। এই সংশয় অমূলক নয়, কারণ এই তিনটি চিন্তন স্তরই মনোবিদ্যা এবং যুক্তিবিদ্যার পক্ষে সমান আলোচ্য বিষয়।

কিন্তু এই সংশয় অমূলক। প্রত্যয়, অবধারণ এবং যুক্তি মনোবিদ্যা এবং যুক্তিবিদ্যার সমান আলোচ্য বিষয় হইলেও, উহাদের আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথমতঃ মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী পাত্রগত বা মানসিক (সাব্‌জেক্‌টিভ্), কিন্তু যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়গত (অব্‌জেক্‌টিভ্)। অর্থাৎ মনোবিদ্যা চিন্তনের আলোচনা করে চিন্তনকারী মনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে, অথবা ঐ মনের ক্রিয়া বা বৃত্তি রূপে। চিন্তনের অভিজ্ঞতা কিরূপ, চিন্তন কিরূপে সহজ হইতে ক্রমশঃ জটিল স্তরে পরিণত হয়, এই জাতীয় প্রশ্নই মনোবিদ্যায় জ্ঞাতব্য বিষয়। পক্ষান্তরে, যুক্তিবিদ্যার জ্ঞাতব্য বিষয় হইল চিন্তনক্রিয়ার ফল কি, চিন্তন সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সত্য কিনা, প্রভৃতি প্রশ্ন। দ্বিতীয়তঃ, মনোবিদ্যার আলোচনা ঘটনানিষ্ঠ (পজিটিভ্), কিন্তু যুক্তিবিদ্যার আলোচনা আদর্শনিষ্ঠ (নর্ম্যাটিভ্)। অর্থাৎ মনোবিদ্যা চিন্তনকে ঘটনারূপে গ্রহণ করে, উহার সত্যতা বা অসত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে না। কিন্তু যুক্তিবিদ্যা চিন্তনের সত্যতা বা অসত্যতা লইয়াই আলোচনা করে, উহার ঘটনানিষ্ঠ বা বাস্তব রূপ যুক্তিবিদ্যার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। তৃতীয়তঃ, মনোবিদ্যার পক্ষে সত্য মিথ্যা নির্বিশেষে সকল চিন্তনই ঘটনা বা ক্রিয়া হিসাবে সমান গুরুত্বপূর্ণ। পক্ষান্তরে, যুক্তিবিদ্যায় সত্য চিন্তনই গ্রহণীয় এবং মিথ্যা চিন্তন বর্জনীয়।

শুদ্ধ ও অশুদ্ধ চিন্তন

মনোবিদ্যা প্রধানতঃ চিন্তনের ঘটনানিষ্ঠ রূপটির আলোচনা করে। কিন্তু যুক্তিবিদ্যা প্রধানতঃ আলোচনা করে চিন্তনের শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতা, অথবা উহার আদর্শনিষ্ঠ রূপটির।

বাস্তব ঘটনা হিসাবে যথার্থ এবং অযথার্থ চিন্তন মনোবিদ্যার পক্ষে সমান বাস্তব। কি কি কারণে চিন্তন যথার্থ এবং অযথার্থ হয় এই দুইটি প্রশ্নই

মনোবিদ্যার পক্ষে সমান মূল্যবান। **কুসংস্কার, ব্যক্তিগত ধারণা, আকর্ষণ বা ভাল লাগা এবং মন্দ লাগা, সুখ-দুঃখ** প্রভৃতি অনুভূতি, **ইচ্ছা-অনিচ্ছা, মনোযোগ-অমনোযোগ, উদ্দেশ্য-উদ্দেশ্যহীনতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস** প্রভৃতি নানা মানসিক অবস্থার উপর চিন্তনের যাথার্থ্য এবং অযাথার্থ্য নির্ভর করে। ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্তী হইয়া আমরা ভুল চিন্তা করিয়া থাকি। ভুল গাড়ীতে চড়িয়া হয়ত গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পারি না। আবার, হয়ত ভুল আকর্ষণ, মনোযোগ, উদ্দেশ্য প্রভৃতি নানা মানসিক কারণে, ঠিক গাড়ীতে চাপিয়াও গন্তব্যস্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাই। এই সকল ক্ষেত্রে অযথার্থ চিন্তাই অনর্থের মূল। যাহাকে বিশ্বাস করা উচিত তাহাকে অবিশ্বাস অথবা যাহাকে অবিশ্বাস করা উচিত তাহাকেই হয়ত বিশ্বাস করা হয়। হয়ত পুর্বকল্পিত কোনো ব্যক্তিগত ধারণাই এই সকল ভ্রান্তির মূল।

কল্পনাপ্রবণতার ফলে, বাস্তবের সহিত কল্পনার সামঞ্জস্য না করিয়া কল্পনার সহিত বাস্তবের সামঞ্জস্য ঘটাইতে গিয়াও অনেক ভ্রান্তি হয়, আবার তীব্র প্রক্ষোভ বা আবেগে অন্ধ হইয়াও মানুষ ভুল চিন্তা করিতে পারে। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অথবা পক্ষপাতিত্ব বশে ভুল করিবার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অদুরদর্শিতা বা সঙ্কীর্ণদৃষ্টি চিন্তনে ভুল ঘটাইতে পারে। তাহা ছাড়া, মনঃসমীক্ষণ-মতে অবদমিত নির্জ্ঞান কামনাও দৈনন্দিন জীবনে ভুলভ্রান্তি ঘটায়।

৮। অপ্রতিরূপ চিন্তন (ইমেজ্‌লেস্ থট্)

সংবেদন, প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ কল্পনা প্রভৃতি সহজতর মানসবৃত্তি চিন্তনে পরিণতি লাভ করে।

চিন্তন সাধারণতঃ প্রতিরূপ সাহায্যেই ঘটিয়া থাকে। যেমন "অশ্ব চতুষ্পদ জন্তু" এই সামান্য সদর্থক অবধারণটি (য়্যুনিভার্স্যাল্ অ্যাফার্মেটিভ্ জাজ্‌মেণ্ট্) করিতে গিয়া, কোনো না কোনো অশ্বের প্রতিরূপ মানস চক্ষে ভাসিয়া ওঠে। আবার "সকল মানুষ মরণশীল" এই অবধারণেও কোনো না কোনো মানুষের প্রতিরূপ মনে ভাসিয়া ওঠে। প্রতিরূপ ছাড়া চিন্তন সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। চিন্তন সপ্রতিরূপ অথবা প্রতিরূপ-সাপেক্ষ।

দ্বিতীয়তঃ, চিন্তন স্থুল প্রতিরূপের সাহায্য না লইয়াও, শুধু শাব্দ প্রতিরূপের (ভার্ব্যাল্ ইমেজ্) সাহায্যে ঘটিতে পারে। যেমন, প্রতীকমূলক চিন্তনে

(সিম্‌বলিক্ থট্) স্থূল প্রতিরূপ থাকে না, কিন্তু থাকে শাব্দ-প্রতিরূপ—যথা বীজগণিতে এ, বি, সি প্রভৃতি বর্ণগুলি সংখ্যার বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয়তঃ, চিন্তা প্রকার প্রতিরূপের সাহায্য না লইয়াই ঘটিতে পারে।

চিন্তন নিয়তই সপ্রতিরূপ কিনা, অথবা ইহা কখনও কখনও অপ্রতিরূপও হইতে পারে, সাম্প্রতিক মনোবিদ্‌গণ এই প্রশ্নটি লইয়া বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন। কুল্পে, স্টাউট্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ অপ্রতিরূপ বা প্রতিরূপহীন চিন্তন স্বীকার করিয়াছেন। বিনে, উড্‌ওয়ার্থ্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণও তাঁহাদের প্রয়োগমূলক গবেষণার ভিত্তিতে অপ্রতিরূপ চিন্তন সমর্থন করিয়াছেন। অধ্যাপক উইলিয়ম জেম্‌স্‌ও তাঁহার চেতনা-প্রবাহ (স্ট্রিম্ অফ্ কন্‌সাচ্‌নেস্) আলোচনা প্রসঙ্গে সক্রিয় (ট্র্যান্‌জিটিভ্) ও নিষ্ক্রিয় (সাব্‌স্ট্যান্‌টিভ্) বৃত্তির পার্থক্য দেখাইয়া প্রথমটিকে অপ্রতিরূপ চিন্তনের অনুরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি যাহাকে চেতনা-প্রান্ত (ফ্রিঞ্জ্ অফ্ কন্‌সাচ্‌নেস্) বলিয়াছেন তাহা অপ্রতিরূপ চিন্তনেরই সামিল। উপরোক্ত মনোবিদেরা মনে করেন যে সপ্রতিরূপ চিন্তার মধ্যেও অপ্রতিরূপ চিন্তন কাজ করিয়া থাকে।

অ্যাল্‌ফ্রেড্ বিনে তাঁহার তেরো এবং চৌদ্দ বৎসরের দুই কন্যাকে কতগুলি সমস্যা সমাধান করিতে দিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, সমস্যা সমাধানে সর্বদাই তাহাদের মনে প্রতিরূপ ভাসিয়া উঠিয়াছে কিনা। তাহারা বলিল যে তাহাদের চিন্তন মাঝে মাঝে অপ্রতিরূপভাবে অথবা প্রতিরূপের সাহায্য না লইয়াই ঘটিযাছে। এই প্রয়োগের ভিত্তিতে বিনে সিদ্ধান্ত করিলেন, প্রতিরূপ যে সর্বদাই চিন্তনের বাহন, তাহা নয়। তাঁহার মতে চিন্তন চিন্তা-উপাদানের (থট্ এলিমেণ্ট্) ক্রিয়া।

কুল্পে এবং তাঁহার অনুগামী মার্বে প্রভৃতি মনোবিৎ এই সমস্যাটির গবেষণা করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। চিন্তন শুধু প্রতিরূপের ব্যবহার (ম্যানিপুলেশন্ অফ্ ইমেজেস্) নয়, কিন্তু 'চিন্তা' নামক অবগতিমূলক মানস-উপাদানের ক্রিয়াবিশেষ। অ্যাক্ এবং ওযাট্ প্রভৃতি কুল্পে-পন্থী মনোবিদেরাও এই মতের প্রায়োগিক সমর্থন কবিলেন। স্টাউট্‌ও স্বাধীনভাবে একই সিদ্ধান্ত কবিলেন যে চিন্তন অপ্রতিরূপভাবেও ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু টিশ্‌নাব প্রভৃতি স্থ্যুণ্ড্‌পন্থী মনোবিদ্‌গণ অপ্রতিরূপ চিন্তন স্বীকার করেন নাই। যাহাকে উপরোক্ত মতাবলম্বী মনোবিদেরা মৌলিক বা অবিশ্লেষণীয় চিন্তা-উপাদান বলিয়া থাকেন, তাহা আসলে মৌলিক মানস

উপাদান নয়, কিন্তু সংবেদন, অনুভূতি এবং প্রতিরূপেরই সংগঠন। টিশ্‌নার-এর মতে সংবেদন, অনুভূতি এবং প্রতিরূপই মৌলিক মানস উপাদান এবং ইহাদের অতিরিক্ত কোনো 'চিন্তা' উপাদান স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।

গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্‌গণ মনে করেন যে কি সংবেদন, কি চিন্তা, মনকে যে কোনো উপাদানে বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াসে মনোবিদ্যা বিকৃত হয়। মন একটি সমগ্র বা গোটা বস্তু—ইহাকে বিভাজন বা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা ভ্রান্তিমূলক।

উড্‌ওয়ার্থ-এর মতে অপ্রতিরূপ চিন্তনের অবিসম্বাদী প্রমাণ রহিয়াছে। চিন্তন ক্রিয়ায় অপ্রতিরূপ চিন্তন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। অবশ্য উড্‌ওয়ার্থ্ গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্‌গণের সহিত এই বিষয়ে এক মত যে মনোবিদ্যায় "চিন্তা-উপাদানের" (থট্ এলিমেন্ট্) উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ওয়াট্‌সন্-এর মত—চিন্তন অনুচ্চারিত ভাষা

চেষ্টিতবাদী ওয়াট্‌সন্-এর মতে চিন্তনও একপ্রকার চেষ্টিত অথবা উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া এককের সমষ্টি। চিন্তন অস্পষ্ট বা অনুচ্চারিত (ইম্‌প্লিসিট্, ইন্-আর্টিকুলেট্, সাব্-ভোক্যাল্) ভাষার প্রতিক্রিয়া। ইহা একপ্রকার সংবেদন-গতি-মূলক (সেন্সরি মোটর) অস্পষ্ট ক্রিয়া। এই ক্রিয়া প্রায়ই দৃশ্য বিচলন (মুভ্‌মেন্ট্) বা শ্রবণযোগ্য ভাষায় প্রকাশিত হয় না। স্পষ্ট চেষ্টিতের পরিবর্তে যে অস্পষ্ট বা অব্যক্ত চেষ্টিত ঘটে, তাহাই চিন্তন। বস্তু এবং কাজের সহিত ভাষার সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে, কারণ কাজ করিবার সময় শিশু প্রায়ই প্রকাশ্যে বা স্বগতভাবে বলিতে থাকে সে কি করিতেছে। প্রথমে প্রকাশ্য ভাবেই শিশু বলে সে কি করিতেছে। দুই ধাপ পরেই দেখা যায় যে সে স্বগতভাবে কথা বলিতেছে এবং তাহার কথা অপরে শুনিতে পায় না। এই অবস্থায় শিশু বাস্তবে কাজ না করিয়াও, ঐ সম্বন্ধে মনে মনে কথা বলে অথবা চিন্তা করে। বাস্তবে কাজ না করিয়াও, সমস্যার সমাধানে চিন্তন করিয়া শিশুর সময় এবং পরিশ্রমের লাঘব হয়। সে হয়ত তাহার একটি খেল্‌না না সরাইয়াই ভাবে, "আচ্ছা খেল্‌নাটা যদি ওখানে সরিয়ে রাখি···কিন্তু ওখানে রাখলে ওটা বেমানান দেখাবে।" ওয়াট্‌সন্-এর মতে, বাস্তবিক কাজের পরিবর্তে এই অব্যক্ত চেষ্টিত বা চিন্তন প্রধানতঃ বাচিক বিচলনেরই (স্পীচ মুভ্‌মেন্ট্) সমষ্টি।

ওয়াট্‌সনীয় মতের সমালোচনা

(১) চিন্তনের বাচিক বিচলন, ওয়াট্‌সন্ যন্ত্র সাহায্যে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে বিচলন প্রধানতঃ বাক্-যন্ত্রের, যেমন জিহ্বার, এবং স্বরযন্ত্রের (ল্যারিংস্) পেশী সঞ্চালন অথবা ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া প্রভৃতি লইয়া গঠিত। চিন্তনকালে যে বাক্‌যন্ত্রের সূক্ষ্ম সঞ্চালন এবং ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতির ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইগুলি চিন্তনের পর্যাপ্ত কারণ না হইয়া, আংশিক কারণও হইতে পারে। কিন্তু ওয়াট্‌সন্ চিন্তনকে এই বিচলন বা ক্রিয়ার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। (২) উচ্চতর চিন্তনের ক্ষেত্রে বাক্‌যন্ত্রপেশীর ক্রিয়া যন্ত্রসাহায্যে প্রায়ই ধরা পড়ে না। (৩) চিন্তন ভাষারই নামান্তর হইলে, সর্বদা ভাব-প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যাইত। অথচ, কথা বলিতে বলিতে একটি পরিচিত শব্দে আটকাইয়া যাওয়া সাধারণ অভিজ্ঞতা। (৪) চিন্তন = ভাষা, এই সমীকরণটি সত্য হইলে, ভাষা = চিন্তন, এই সমীকরণও সত্য হইবে। অথচ, দ্বিতীয় সমীকরণটি গ্রহণীয় নয়, কারণ একেবারেই চিন্তা না করিয়া বিদেশী ভাষায় লিখিত পাঠ মুখস্থ বলিয়া যাওয়া সম্ভব। (৫) চিন্তনে একটি বস্তুর সহিত আর একটি বস্তুর সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে আশ্রয় বাক্য হইতে নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। চিন্তনের এই নূতনত্ব ওয়াট্‌সন্-স্বীকৃত পুরাতন বাচিক অভ্যাস দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না।

সুতরাং চিন্তনকে শুধু বাক্‌যন্ত্রের পেশীসঞ্চালন অথবা অব্যক্ত ভাষা বলা যায় না। চিন্তন ভাষা নয়, যদিও ইহার সহিত ভাষার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড—এলিমেন্ট্‌স্ অফ্ সাইকলজি—চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
জি. এফ্. স্টাউট্—এ ম্যানুয়্যাল্ অফ্ সাইকলজি—৪র্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ
উড্‌ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড্ মাকু ইস্—সাইকলজি—অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ
জি মার্ফি—জেনার‍্যাল্ সাইকলজি—ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ
এন্. এল্ মান্—সাইকলজি—একাদশ অনুচ্ছেদ

Exercise

1. Define thinking. What are its main parts ? (pp. 614-615)
2. What are the tools of thinking ? Explain and illustrate them. (pp. 616-617)

3. Compare percept, image and concept to one another
   What do you mean by generic and composite image? (pp. 617-620)
4. How is the concept formed? (pp. 620-621)
5. Distinguish between language, sign, symbol and diagram as tools of thinking. (pp. 621-623)
6. Explain judgment and reasoning as processes of thought. (pp. 623-624)
7. Explain the psychological as distinguished from the logical approach to the problem of thinking. (pp 625-626)
8. Distinguish between correct and incorrect thinking. Does this distinction constitute the subject matter of psychology? (pp. 625-626)
9. Is imageless thought possible? Discuss. (pp. 626-629)
10. What is thought in the ultimate psychological analysis? Explain with special reference to the views of Titchener and Watson. (pp. 627-629)

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিশ্বাস (বিলিফ্)

১। বিশ্বাস কাহাকে বলে—বিশ্বাসের বিশ্লেষণ

নিশ্চয়তা অথবা সত্যতাবোধকে বলে বিশ্বাস। ধারণা অথবা প্রত্যয়ের সহিত উহার বিষয় বা বস্তুর সামঞ্জস্য সম্বন্ধে **নিশ্চয়প্রতীতিই** বিশ্বাস। বিশ্বাস জ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ, কারণ প্রত্যয় বা ধারণার সহিত বস্তুর সামঞ্জস্যে বিশ্বাসকেই বলে জ্ঞান। বিশ্বাসের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহা সহজ বা সরল মানসবৃত্তি নয়, কিন্তু একাধিক মানসবৃত্তির মিশ্রণ-ফল। বিশ্বাসে অবগতি, চেষ্টা এবং অনুভূতিমূলক মানসবৃত্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে।

(১) বিশ্বাস **অবগতিমূলক** (কগ্নিটিভ্), কারণ যে বিষয়ে বিশ্বাস ঘটে, উহার জ্ঞান বিশ্বাসের অপরিহার্য অঙ্গ। একেবারে না জানিয়া কোনো বস্তুতে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া আপন কক্ষে নিয়ত ঘুরিতেছে, এইরূপ বিশ্বাসের মূলে রহিয়াছে পৃথিবী এবং সূর্য সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান। অমুক লোকটি প্রতারক, এই বিশ্বাসের মূলে রহিয়াছে ঐ ব্যক্তি এবং প্রতারক সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান। বিশ্বাসের অবগতিমূলক ধর্ম নিরূপিত হয় উহার বিষয়মুখীনতা (অব্জেকৃটিভিটি) দ্বারা। যে বিষয়ে বিশ্বাস পোষণ করা হয় তাহা জ্ঞাতার সৃষ্টি বা কল্পনা নয়, কিন্তু স্বতন্ত্র বস্তু। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস খেয়ালখুশীর ব্যাপার নয়, কিন্তু **বাধ্যতামূলক।** বিশ্বাস করা বা না করা ব্যক্তিগত (সাব্জেকৃটিভ্) ব্যাপার নয়। ইহাতে বাধ্যবাধকতা বোধ রহিয়াছে।

কোনো কোনো মনোবিৎ বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ অবগতিমূলক বলিয়া মনে করেন। চরম অবগতিমূলক মতবাদ একদেশদর্শী। বিশ্বাস অবগতির মত শুদ্ধ বা তাত্ত্বিক (থিওরেটিক্যাল) মনোভাব হইতে পারে না, ইহা ব্যবহারিক বা কার্যকরীও (প্র্যাকৃটিক্যাল্) বটে। তাহা ছাড়া, বিশ্বাসে অনুভূতিমূলক উপাদানও রহিয়াছে। বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তি বা সুখ অনুভূতি থাকে। এই সকল কারণে বিশ্বাসকে শুধু অবগতিমূলক মানসবৃত্তি বলা যায় না।

(২) বিশ্বাস **অনুভূতিমূলকও** (অ্যাফেক্‌টিভ্) বটে, কারণ বিশ্বাস উৎপন্ন হইলে সুখ বা স্বস্তি ঘটে। **সংশয়** (ডাউট্) একটি উদ্বেগজনক

মানসিক অবস্থা, ইহাতে অনিশ্চয়তার অশান্তি এবং দুঃখ থাকে। কিন্তু বিশ্বাসে উদ্বেগের উপশম হয় এবং নিশ্চয়তাবোধের শান্তি বা আনন্দ অনুভূত হয়। সন্দেহাকুল চিত্তে কোনো কর্মপন্থা অনুসরণ করা যায় না, ফলে মানসিক অসহায়তাবোধের সৃষ্টি হয়। সন্দেহ নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে স্থির হইয়া যায়, কোন্ কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়া সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। ফলে, মানসিক ক্লেশ, অশান্তি এবং অসহায়তাবোধ দূর হইয়া আসে নিশ্চিন্ততার আশ্বাস।

বিশ্বাসের এই অনুভূতিমূলক ধর্মের জন্য অনেকেই ইহাকে সম্পূর্ণ অনুভূতিমূলক বলিয়া মনে করেন। এই মতও গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্বাস শুধু অনুভূতিমূলক ব্যাপার হইলে ইহা ব্যক্তিমনে সীমাবদ্ধ (সাব্‌জেক্‌টিভ্) এবং নিষ্ক্রিয় (প্যাসিভ্) হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বিশ্বাস শুধু ব্যক্তিমনে সীমাবদ্ধ মানস অবস্থা নয়। ইহাতে ব্যক্তিমন-নিরপেক্ষ কোনো বহিঃসত্তার ইঙ্গিত রহিয়াছে এবং আরও রহিয়াছে কোনো বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হইবার কর্মপ্রবণতা। সুতরাং বিশ্বাস একাধারে অনুভূতি, জ্ঞান ও ইচ্ছামূলক।

(৩) বিশ্বাস চেষ্টা বা **ইচ্ছামূলকও** বটে। সংশয়ে কর্মব্যাঘাত ঘটে। ইহাতে উভয় সঙ্কটে পড়িয়া, কোনো নির্দিষ্ট কর্মপন্থাই অনুসরণ করা যায় না। সংশয়ে পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি অবস্থার দ্বন্দ্ব থাকে। ফলে কোনো অবস্থাই কর্মে প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, বিশ্বাস উৎপন্ন হইবামাত্র কর্মবিরোধের অবসান ঘটে এবং একটি নির্দিষ্ট কর্মপন্থা স্থির হইয়া যায়। ফলে চেষ্টা এবং কর্মপ্রবৃত্তির অনুকূল অবস্থা আসে। বিশ্বাসে স্থির হইয়া যায় কিরূপে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। সুতরাং ইহাতে কর্মপ্রস্তুতি ঘটে।

বেইন্ প্রভৃতি মনোবিৎ বিশ্বাসকে চেষ্টা বা ইচ্ছামূলক (কোনেটিভ্) বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই মতও একদেশদর্শী। ইহা অবগতি এবং অনুভূতিমূলক দিক্ দুইটিকে বাদ দিয়া, বিশ্বাসকে শুধু ক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ করে।

২। বিশ্বাসের ভিত্তি ও কারণ (গ্রাউণ্ড্‌স্ অ্যাণ্ড্ কন্‌ডিশন্‌স্ অফ্ বিলিফ্)

উপরের আলোচনা হইতে বিশ্বাসের ভিত্তি ও কারণ সম্বন্ধে যে জ্ঞান পাওয়া গিয়াছে তাহা অস্পষ্ট। সুতরাং এই বিষয়টির পৃথক আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

বিশ্বাসের ভিত্তি কি? **বুনিয়াদী** মনোবিদ্‌গণ বলেন যে বিশ্বাসের ভিত্তি অবগতি বা জ্ঞান। ইঁহারা মনে করেন যে ভাবের বা ধারণার সহিত বস্তুর সামঞ্জস্যে নিশ্চয়তাবোধই বিশ্বাস।

(ক) বিশ্বাসের অবগতিমূলক ভিত্তি বা কারণ

অবগতির বিভিন্ন স্তরের সহিত বিশ্বাস যুক্ত। (১) **প্রত্যক্ষই** বিশ্বাসের প্রাথমিক ভিত্তি, কারণ প্রত্যক্ষে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটে এবং বিষয় সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। যে রংটি দেখিতেছি বা যে শব্দটি শুনিতেছি তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বিশ্বাস প্রত্যক্ষের অপরিহার্য অঙ্গ। প্রত্যক্ষকে উহার বিষয়ই নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণ সরাসরি-ভাবে অনুভূত হইয়া প্রত্যক্ষ বিষয়ের সত্যতায় বিশ্বাস উৎপন্ন করে। বাহ্য প্রত্যক্ষের মত আন্তর প্রত্যক্ষও বিশ্বাস উৎপাদন করে। সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি মানস অবস্থাগুলি অনুভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্য বলিয়া স্থির বিশ্বাস জন্মায়। অন্তর্দর্শন ও মানস অবস্থার সত্যতায় বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে পারে।

(২) **স্মৃতিও** বিশ্বাসের ভিত্তি। স্মরণক্রিয়া প্রতিরূপের সাহায্যে প্রত্যক্ষ বিষয়কে উহার দেশ, কাল, বা অনুষঙ্গ প্রভৃতি অনুসারে পুনরুৎপাদন করে এবং উহার সত্যতায় বিশ্বাস জন্মায়। আমরা যাহা স্মরণ করি, তাহা শুধু ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরই নির্ভর করে না, কিন্তু স্মৃত বস্তুর নিজস্ব নিয়মের উপরও নির্ভর করে। স্মরণে এই বিশ্বাস উৎপন্ন হয় যে উহার প্রতিরূপগুলি অতীত অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ের যথার্থ প্রতিরূপ।

আবার **কল্পনাও** কল্পিত বস্তুর সত্যতায় বিশ্বাস জন্মাইতে পারে। এই কারণে ভ্রান্ত কল্পনাও সত্য বলিয়া মনে হয়। বৃক্ষ হইতে পতিত আপেল দেখিয়া নিউটন মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের কল্পনা করিলেন। অথবা রাষ্ট্রনায়ক কল্পনা করিলেন তাঁহার রাষ্ট্রের উন্নত অবস্থা। উভয়ক্ষেত্রেই কল্পনার সত্যতায় বিশ্বাস রহিয়াছে। এমন কি, আল্‌নাস্কার্‌-এর জাগরস্বপ্ন অথবা শক্তু কলসের কাহিনীর জাগরস্বপ্ন উহাদের সত্যতায় বিশ্বাস বহন করে, যদিও উভয়ক্ষেত্রেই কল্পনা ও উহার বিষয়ের সামঞ্জস্য না থাকায়, বিশ্বাস অমূলক ও মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়।

(৩) **অনুমান** বা যুক্তিও বিশ্বাসের ভিত্তি হইতে পারে। কোনো জ্ঞাত সত্যের ভিত্তিতে অজ্ঞাত সত্যকে জানিবার ফলে, উহাতে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। রান্নাঘর হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে দেখিয়া, আমরা অনুমান করি যে উনানে

আগুন দেওয়া হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে হয়, কারণ পূর্ব প্রত্যক্ষে আমরা দেখিয়াছি যে যখনই রান্নাঘর হইতে ধোঁয়া বাহির হইয়াছে তখনই উনানে আগুন দেওয়া হইয়াছে।

(৪) আবার **অবিচ্ছেদ্য ভাবানুষঙ্গ** (ইন্‌সেপারেব্‌ল্‌ অ্যাসোসিয়েশন্‌ অফ্‌ আইডিয়াজ্‌) হইতেও বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। আগুনে হাত দিলে হাতে গরম লাগে, জল পান করিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয় প্রভৃতি প্রত্যক্ষে আগুনে হাত দেওয়ার সহিত হাতে গরম লাগার, জলপানের সহিত তৃষ্ণা নিবারিত হইবার অভিজ্ঞতা দুইটির প্রতিরূপ বা ধারণা অবিচ্ছেদ্যভাবে অনুষক্ত হইয়া উহাদের সম্বন্ধ বিষয়ে বিশ্বাস জন্মায়। কেহ যদি বলে সে আগুনে হাত দিলে হাত ঠাণ্ডা লাগে, অথবা জলপান করিলে তৃষ্ণা বাড়িয়া যায়, আমরা এইরূপ উক্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিই, কারণ এইরূপ অনুষঙ্গ অবিচ্ছেদ্য এবং বিশ্বাস্য নয়।

(৫) **বাচিক অভিভাবনও** (ভার্ব্যাল্‌ সাজেশন্‌) বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়া থাকে। গুজব যে নানাপ্রকার উদ্ভট বিশ্বাস সৃষ্টি করে, ইহা সুবিদিত। যুদ্ধের উন্মাদনায় মানুষ নানা গুজব বা রটনায় বিশ্বাস করে। যেমন গত মহা-যুদ্ধে, জাপান কলিকাতা ধ্বংস করিয়া দিবে, এইরূপ গুজবের প্রভাবে কলিকাতাবাসীরা দলে দলে কলিকাতা ত্যাগ করিবার ফলে, এই ঘনবসতি-পূর্ণ শহরটি প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়ে।

(৬) বাচিক অভিভাবন যে বিশ্বাসের একটি প্রবল কারণ তাহা প্রমাণিত হয় আর একটি যুক্তিতে। ভারতীয় দর্শনে **শব্দ** বা শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো সূত্র হইতে আমরা জ্ঞান লাভ করি তাহা বিশ্বাসের একটি প্রধান উৎস।

(খ) বিশ্বাসের প্রক্ষোভমূলক ভিত্তি বা কারণ

অনেকের মতে বিশ্বাস একটি প্রক্ষোভমূলক মানসবৃত্তি।

(১) প্রক্ষোভ বা আবেগ বিশ্বাসের ভিত্তি বা কারণরূপে উপেক্ষণীয় নয়। ক্রোধ, ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি প্যাশন্‌ বা **অতিরাগ** উপযুক্ত পাত্রে অবিশ্বাস এবং অপাত্রে বিশ্বাস উৎপন্ন করে। 'ব্রাহ্মণ-নকুল' কথার কাহিনী সুবিদিত। এই কাহিনীর ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রের রক্ষক নকুলকেই ভক্ষক মনে করিয়া হত্যা করিয়াছিল। শরৎচন্দ্রের শ্রীনাথ বহুরূপীর কাহিনীতে দেখানো হইয়াছে ভয় কিরূপে মিথ্যা বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছিল। আবার ঘৃণাও মিথ্যা বিশ্বাস উৎপন্ন করে।

(২) তাহা ছাড়া, শ্রদ্ধা, সম্মান প্রভৃতি **উচ্চতর রসও** (সেন্টিমেন্ট্) বিশ্বাসের উর্বর ক্ষেত্র। পরশুরাম পিতৃভক্তিতে প্রভাবিত হইয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে মাতৃহত্যায় দোষ নাই। উপমন্যু, আরুণি প্রভৃতির গুরুভক্তি কঠোর পরীক্ষায়ও বিচলিত হয় নাই। হিন্দু পতিব্রতা নারী বিশ্বাস করেন, পতি পরম গুরু।

(৩) ব্যক্তির **আয়ানও** (টেম্পারামেণ্ট্) বিশ্বাসের হেতু হইতে পাবে। আশাবাদী উজ্জ্বল ভবিষ্যতে বিশ্বাস পোষণ করে। সদা-প্রফুল্ল ব্যক্তি বিপদে পড়িলেও বিপদ কাটিয়া যাইবে বলিয়া বিশ্বাস করে। আবার সংশয়বাদী এবং নৈরাশ্যবাদী সম্পদের মধ্যেও বিপদের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত থাকে।

(গ) বিশ্বাসের ইচ্ছামূলক ভিত্তি বা কারণ

অনেকে মনে করেন যে বিশ্বাস একটি ইচ্ছা বা ক্রিয়ামূলক বৃত্তি।

(১) দেকার্তে প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলেন যে কতগুলি বিশ্বাস **সহজাত প্রবৃত্তি** (ইন্স্টিঙ্ক্টিভ্)—যেমন ঈশ্বর, কার্যকারণসূত্র, পুনর্জন্ম প্রভৃতি।

(২) জেম্স্এর মতে ইচ্ছাই বিশ্বাসের কারণ। তিনি বলেন যে **ইচ্ছা বিশ্বাসের জনক,** অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেই কোনো বস্তুতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা যাইতে পারে। এই মতটিকে চরমপন্থী বলিয়া মনে হয়। বিশ্বাস শুধু ইচ্ছা অনিচ্ছার সৃষ্টি হইতে পারে না, যেহেতু বিশ্বাসে একটি বিষয়গত বাধ্যতা-বোধ (অব্জেক্টিভ্ কম্পাল্শন্) বর্তমান থাকে।

(৩) কিন্তু **প্রবল ইচ্ছা বা সক্রিয় আবেগ** (ইম্পাল্স্) যে বিশ্বাস-প্রবণতা জন্মাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ষু পুত্রের আরোগ্যলাভ কামনার প্রভাবে মৃত্যুর মুখে তিলে তিলে অগ্রসর পুত্রকেও মাতা ক্রমশঃ সুস্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন। আবার আত্মশক্তিতে অতিবিশ্বাসী পরীক্ষার্থী হয়ত বিশ্বাস করে যে সে সগৌরবে উত্তীর্ণ হইবে, যদিও ইহার কোনো সম্ভাবনা নাই।

(৪) **ক্রিয়া ও বিশ্বাস** পরস্পর পরস্পরের ভিত্তি। বিশ্বাস ক্রিয়ায় বা কর্মে প্রবৃত্ত করে সন্দেহ নাই। আবার ক্রিয়াও বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে। কোনো উদ্দেশ্যলাভের জন্য ক্রিয়া-সম্পাদনে, ঐ ক্রিয়ায় অবলম্বিত উপায়গুলি যে উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল, এইরূপ বিশ্বাস না থাকিলে ক্রিয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং বিশ্বাস ক্রিয়ায় ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়। আবার, কোনো বিশ্বাস যদি ক্রিয়ায় পরিণত না হইতে পারে, তাহা হইলেও উহা বিশ্বাসপদবাচ্য হইতে পারে না। সুতরাং ক্রিয়াকেও বিশ্বাসের ভিত্তি বলিতে হয়।

(৫) **কার্যকালীন প্রয়োজনও** (প্র্যাক্‌টিক্যাল্ নেসেসিটি) বিশ্বাসের জনক হইতে পারে। যেমন নিমজ্জমান ব্যক্তি ভাসমান তৃণকেও তাহার জীবনরক্ষার উপায় বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে।

(ঘ) বিশ্বাসের সামাজিক ভিত্তি ও কারণ

উপরোক্ত কারণগুলির অধিকাংশ বিশ্বাসের ব্যক্তিগত কারণ বা ভিত্তি। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণ ছাড়াও বিশ্বাসের সামাজিক কারণ রহিয়াছে।

শিশু যে পরিবারে জন্ম ও শিক্ষালাভ করে, যে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে, যে পল্লীতে বা পরিবেশে বর্ধিত হয় এবং যে রাষ্ট্রের নাগরিক, তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না। পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি তাহার মনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। ফলে, শিশুর মনে কতগুলি সংস্কার, ধারণা বা আদর্শে বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়। যেমন সাধারণ শিশু হয়ত বিশ্বাস করে যে পিতাই পরম ধর্ম, স্বর্গ এবং দেবতা, আবার মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী। এইরূপে ধর্মানুষ্ঠান, উপাসনা, প্রার্থনা প্রভৃতি পারিবারিক এবং সামাজিক কর্মপ্রণালী সাধারণতঃ শিশুর মনে বিশ্বাস জন্মায় যে ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে এবং আত্মার জন্মমৃত্যু নাই প্রভৃতি।

সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-বিচার, সংস্কার-ধারণা, আদর্শ-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিমনে সংক্রামিত হয় এবং ঐগুলির প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন করে। সামাজিক উত্তরাধিকারের (সোশ্যাল্ হেরিটেজ্) প্রভাবে ব্যক্তিমন সমাজের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস প্রায়ই যুক্তিতর্কের প্রভাবে বিকৃত হয় না এবং ব্যক্তিবিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৩। বিশ্বাস, অবিশ্বাস ও সংশয়

বিশ্বাস (বিলিফ্), অবিশ্বাস (ডিজ্‌বিলিফ্) এবং সংশয়ের (ডাউট্) মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্য জানা আবশ্যক।

ভাব অথবা ধারণার সহিত বস্তুর সামঞ্জস্যে নিশ্চিত বোধকে বিশ্বাস বলে। বিশ্বাস ইতিবাচক (পজিটিভ্) মনোভাব। অবিশ্বাস কিন্তু বিশ্বাসের অভাব মাত্র নয়। ইহাও একপ্রকার বিশ্বাস। অবিশ্বাস বলিতে বুঝায় নেতিবাচক

(নেগেটিভ্) বিশ্বাস—অর্থাৎ ভাব অথবা ধারণার সহিত বিষয়ের সামঞ্জস্য নাই এইরূপ নিশ্চয়তাবোধ। ঈশ্বর সম্বন্ধে সকলের মনেই ধারণা রহিয়াছে। এই ধারণানুযায়ী ঈশ্বর আছেন, এই নিশ্চিতবোধের নাম ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ইহার অনুযায়ী ঈশ্বর নাই, এই নিশ্চিতাবোধের নাম অবিশ্বাস।

পক্ষান্তরে, সংশয় বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস হইতে ভিন্ন। মনোগত ধারণার সহিত বিষয়ের সামঞ্জস্য থাকিতেও পারে বা নাও থাকিতে পারে, এইরূপ অনিশ্চিত মানস অবস্থাকে বলে সংশয় বা সন্দেহ। ঈশ্বরের মনোগত ধারণার সহিত তাঁহার বিষয়গত সত্যতার মিল আছে কিনা, অর্থাৎ ঈশ্বর কি আছেন, অথবা নাই, এই পরস্পরবিরুদ্ধ অথবা উভয়সঙ্কটমূলক অবস্থাকে বলে সংশয়। বিশ্বাস ইতিবাচক (পজিটিভ্) এবং অবিশ্বাস নেতিবাচক (নেগেটিভ্) জ্ঞান। কিন্তু সংশয় জ্ঞান-পদবাচ্য নয়। ইহা বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস এই উভয়ের, সুতরাং জ্ঞানের, অভাব-বাচক মনোভাব।

৪। বিশ্বাস (বিলিফ্), প্রতীতি (ট্রাস্ট্) এবং আস্থা (ফেইথ্)

বিশ্বাস সমগ্র মনের অবস্থা, অর্থাৎ ইহা অবগতি, অনুভূতি এবং চেষ্টা বা ক্রিয়ামূলক মানসবৃত্তি। বিভিন্ন মনোবিদ্ বিশ্বাসের এই তিনটি উপাদানের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কাহারও মতে বিশ্বাস অবগতিমূলক মনোবৃত্তি, কেহ বা মনে করেন যে ইহা অনুভূতিমূলক, কাহারও বা দাবী এই যে ইহা চেষ্টা বা ক্রিয়ামূলক। এই তিনটি মতবাদই চরম এবং একদেশদর্শী। ইহাদের দোষগুণ পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

কিন্তু বিশ্বাস উপরোক্ত তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত হইলেও, উহাদের মাত্রা বা পরিমাণ ভেদ অনুসারে বিশ্বাসের প্রকারভেদ হইতে পারে। অবগতি, অনুভূতি এবং চেষ্টা বা ক্রিয়ামূলক উপাদানের প্রাধান্য বা গৌণতা অনুসারে বিশ্বাসের তিনটি স্তর রহিয়াছে। যথা, বিশ্বাস প্রধানতঃ অবগতি, জ্ঞান বা বুদ্ধিমূলক অবস্থা। বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চয়তার জ্ঞানই বিশ্বাসের প্রধান লক্ষণ। দ্বিতীয়তঃ, প্রতীতি (ট্রাস্ট্) বলিতে বুঝায় সেই প্রকারের বিশ্বাস, যাহাতে জ্ঞানমূলক ভঙ্গীটির তুলনায় চেষ্টা বা ক্রিয়ামূলক ভঙ্গীটি প্রধান। তৃতীয়তঃ, আস্থা (ফেইথ্) বা শ্রদ্ধা এমন বিশ্বাস, যাহাতে জ্ঞানমূলক এবং চেষ্টামূলক ভঙ্গী দুইটির তুলনায় অনুভূতিমূলক ভঙ্গীটি প্রধান।

৫। বিশ্বাস ও জ্ঞান (নলেজ্)

জ্ঞানের (নলেজ্) সহিত বিশ্বাস অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বিশ্বাসহীন জ্ঞানকে জ্ঞান বলা যায় না। ব্যাপক অর্থে জ্ঞান একটি মৌলিক অবস্থা। জীবনের প্রথম চেতন মুহূর্ত হইতে ইহার সূত্রপাত। এই অর্থে জ্ঞান সহজ এবং অনায়াসলভ্য। যেমন, সদ্যোজাত শিশুও মাতৃগর্ভ হইতে বিচ্যুত হইয়া পৃথিবীর স্পর্শ সম্বন্ধে চেতন হয়।

কিন্তু জ্ঞান কথাটি ব্যাপক অর্থেই সীমাবদ্ধ নয়। মনোবিকাশের উচ্চতর স্তরে ইহা একটি জটিল, আয়াসলভ্য এবং সঙ্কীর্ণ মানস অবস্থার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে, জ্ঞানের নিম্নোক্ত কারণগুলি পাওয়া যায়। (১) জ্ঞান নির্ভর করে বিষয় সম্বন্ধে কতগুলি মতগত ধারণার উপর। (২) ইহাতে এই ধারণা-গুলির মধ্যে স্বসামঞ্জস্য বা স্ব-বিরোধের অভাব থাকা আবশ্যক। (৩) আবার এই ধারণাগুলির সহিত উহাদের বিষয়ের সামঞ্জস্য থাকা চাই। (৭) চতুর্থতঃ, ধারণার সহিত বস্তুর সামঞ্জস্যে বিশ্বাস থাকা চাই।

শুধু ধারণার স্ব-সামঞ্জস্য জ্ঞানপদবাচ্য হইতে পারে না। আবার, স্ব-সুসমঞ্জস ধারণাসমষ্টির সহিত বিষয়ের সামঞ্জস্য থাকিলেই জ্ঞান হয় না, কিন্তু উহাদের সামঞ্জস্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তা বোধ অথবা বিশ্বাস থাকিলেই জ্ঞান হয়।

যেমন, টলেমি জ্যোতির্বিদ্যার মতে পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সূর্য পরিভ্রমণ করে। এই ধারণা স্ব-সুসমঞ্জস বা স্ব-বিরোধমুক্ত ছিল। তাহা ছাড়া, এই ধারণা যে পৃথিবী ও সূর্য্যের বাস্তব সম্বন্ধের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, টলেমি এইরূপ বিশ্বাসও পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই বিশ্বাসকে জ্ঞান বলা যায় না, কারণ সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তন করে, এই ধারণা স্ব-সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলেও এবং এই সামঞ্জস্যে বিশ্বাস থাকিলেও, ইহাতে বাস্তব সামঞ্জস্যের অভাব রহিয়াছে। আসলে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে না, কিন্তু পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে। সুতরাং টলেমীয় মতবাদে জ্ঞানের উপরোক্ত প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ কারণ কয়টি থাকিলেও উহার তৃতীয় কারণটি—যথা স্ব-সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণার সহিত বাস্তব অবস্থার সামঞ্জস্য—নাই বলিয়া উহাকে জ্ঞান বলা অসঙ্গত।

আবার, স্ব-সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণারাশির সহিত বাস্তব অবস্থার সামঞ্জস্য থাকিয়াও উহাতে বিশ্বাস না থাকিলে, প্রকৃত জ্ঞান হয় না।

দেখা যাইতেছে যে সকল যথার্থ জ্ঞানই বিশ্বাসমূলক, যদিও সকল বিশ্বাসই যথার্থ জ্ঞানমূলক নয়। অর্থাৎ বিশ্বাস না থাকিলে যথার্থ জ্ঞান হয় না, কিন্তু যথার্থ জ্ঞান না থাকিলেও বিশ্বাস থাকিতে পারে। তাহা ছাড়া, বিশ্বাস যেমন জ্ঞানমূলক তেমনই অনুভূতি ও চেষ্টামূলক। উপরন্তু জ্ঞান শুদ্ধ অথবা তাত্ত্বিক (পিওর্, থিওরেটিক্যাল্), কিন্তু বিশ্বাস কার্যকরী বা ব্যবহারিকও বটে।

৬। বিশ্বাস ও কল্পনা (বিলিফ্ অ্যাণ্ড্ ইম্যাজিনেশন্)

ঐচ্ছিক কল্পনা ও বিশ্বাস

কল্পনা ও বিশ্বাসের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। বিশেষ করিয়া, ঐচ্ছিক কল্পনা যে বিশ্বাসের ভিত্তি বা কারণ হইতে পারে আমরা তাহা দেখিয়াছি। এইরূপ কল্পনায় যাহা খুশী তাহাই কল্পনা করিয়া যাইবার স্বাধীনতা নাই। ইহা কোনো উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজন দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। যেমন তাজমহলের উপর একটি কবিতা রচনা করিতে হইলে, অথবা উহার ছবি আঁকিতে হইলে, ঐ বস্তুটির দ্বারা কল্পনাকে সংযমিত এবং নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক হয়।

ঐচ্ছিক কল্পনায়, ষ্টাউট্ এর ভাষায়, "ব্যক্তির ক্রিয়ার উপর বস্তুর নিয়ন্ত্রণ (অব্জেক্টিভ্ কন্ট্রোল্ অফ্ সাব্জেক্টিভ্ অ্যাক্টিভিটি)" রহিয়াছে। স্টাউট্-এর মতে এই বস্তুগত নিয়ন্ত্রণ অথবা সংশোধনই (অব্জেক্টিভ্ কোয়ার্শন্) বিশ্বাসের সারভূত ধর্ম। ঐচ্ছিক কল্পনায় বিশ্বাস বর্তমান। সুতরাং এই কল্পনায় ব্যক্তির ক্রিয়ার উপর বস্তুগত নিয়ন্ত্রণ বা সংশোধন থাকে।

অনৈচ্ছিক কল্পনা ও বিশ্বাস

অনৈচ্ছিক কল্পনার সহিত বিশ্বাসের সম্বন্ধ ভিন্ন প্রকারের। অনৈচ্ছিক বা স্বতঃক্রিয় কল্পনা অল্লাধিক পরিমাণে বিশ্বাসমুক্ত। যেমন আকাশ-কুসুম কল্পনা একপ্রকার অনৈচ্ছিক কল্পনা। এই কল্পনায় বস্তুগত নিয়ন্ত্রণ নাই, সুতরাং বিশ্বাসও নাই। তেমনই শশবিষাণের (খরগোশের শিং) বা মৎস্য-কন্যার কল্পনাও বিশ্বাসমুক্ত। কিন্তু এই শ্রেণীর স্বতঃক্রিয় কল্পনায় এবং জাগর-স্বপ্নে (ডে ড্রিম্) বাস্তব নিয়ন্ত্রণ না থাকিলেও, চিন্তার আকারগত নিয়মগুলির, যেমন বিরোধ-সূত্র (ল' অফ্ কন্ট্রাডিকশন্) অথবা তাদাত্ম্য সূত্রে (ল' অফ্

আইডেন্‌টিটি) নিয়ন্ত্রণ থাকে। আকাশ-কুসুম, শশ-বিষাণ, কচ্ছপ-কেশ বা মৎস্যকন্যার কল্পনায় আত্মবিরোধ নাই। আকাশে ফুল ফুটিয়াছে, শশক বা খরগোশের শিং গজাইয়াছে, কচ্ছপের কেশোদ্গম হইয়াছে, অথবা কোনো কন্যার নিম্নাংশ মৎস্যাকৃতি হইয়াছে—এই জাতীয় কল্পনায় কোনো স্ব-বিরোধ নাই, যদিও বাস্তব বিরোধ রহিয়াছে। অর্থাৎ এই সকল কল্পনায় বাস্তব নিয়ন্ত্রণ বা সংশোধন না থাকিলেও, আকারগত নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে।

বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে তিন প্রকারের কল্পনা

বিশ্বাসের অল্পাধিক্য অনুসারে কল্পনাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) প্রথমতঃ, যে কল্পনা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসাশ্রয়ী অথবা যাহাতে ব্যক্তিগত কল্পনার বিষয়গত নিয়ন্ত্রণ থাকে—যেমন বাড়ী তৈয়ারী করিবার পূর্বে বাড়ীর নক্সা কল্পনা ঐচ্ছিক কল্পনা। (২) দ্বিতীয়তঃ, যে কল্পনা সম্পূর্ণ বিশ্বাসমুক্ত, যেমন জাগর-স্বপ্ন অথবা স্বতঃক্রিয় কল্পনা, তাহা অনৈচ্ছিক। ইহাতে কল্পনার আকারগত সত্যতায় (ফর্ম্যাল্ ট্রুথ্) বিশ্বাস থাকিলেও উহার বাস্তব সত্যতায় (মেটিরিয়্যাল্ ট্রুথ্) বিশ্বাস নাই। এই জাতীয় কল্পনার উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। (৩) তৃতীয়তঃ, উপরোক্ত দুই প্রকারের চরম কল্পনার মধ্যবর্তী আর এক প্রকারের কল্পনায়। এই কল্পনায় আংশিকভাবে বিশ্বাস রহিয়াছে, আবার আংশিকভাবে বিশ্বাস নাইও। যেমন তাজমহলের উপর কবিতা লিখিতে গিয়া অনেক কল্পনা করিতে হয় যাহার সত্যতায় বিশ্বাস আছে, আবার আরও অনেক কল্পনা আসিয়া পড়ে যাহাতে বিশ্বাসের অভাব আছে। একটি উপন্যাস লিখিতে অনেক কাল্পনিক ঘটনা বানাইয়া লিখিতে হয়, যাহার সহিত বাস্তবের সামঞ্জস্য নাই অথবা যাহাতে বিশ্বাস নাই, আবার এমন অনেক ঘটনাও কল্পনা করিতে হয় সেগুলির সত্যতায় বিশ্বাস আছে।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

মেলোন্ অ্যাণ্ড ড্রামণ্ড্—এলিমেণ্ট্‌স্ অফ্ সাইকলজি—চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

জি. এফ্. স্টাউট্—এ ম্যানুয়্যাল্ অফ্ সাইকলজি—চতুর্থ খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ

Exercise

1. Define belief. Analyse the factors involved in belief. (pp. 631-632)
2. What are the grounds and conditions of belief ? (pp. 632-636)

3 Is belief a cognitive, conative or an affective process? Discuss. (pp. 632-636)

4 Distinguish between belief, disbelief and doubt. (pp 636-637)

5. Distinguish between belief, trust and faith. (p. 637).

6 How is belief related to knowledge? Discuss. (pp. 638-639)

7. Explain the relation between belief and imagination (pp. 639-640)

8 Distinguish between imagination with belief and imagination without belief (pp. 639-640)

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বেদনা (ফীলিং) বা সংবেদনজ অনুভূতি

১। অনুভূতি কথাটির বিভিন্ন অর্থ

অনুভূতি (ফীলিং) কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) সাধক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন। এই ক্ষেত্রে অনুভূতির অর্থ উপলব্ধি বা সাক্ষাৎচেতনা (ইন্‌টুইশন্)। (২) ডাক্তার রোগীর নাড়ী অনুভব করেন। এই ক্ষেত্রে অনুভূতির অর্থ স্পর্শ-সংবেদন এবং গতি-সংবেদন। কেহ বা অন্ধকারে পথ অনুভব করিয়া চলে। এই ক্ষেত্রেও অনুভূতির অর্থ স্পর্শ ও গতি সংবেদন। (৩) স্পেন্সর্, মিল্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ সকল চেতনার অর্থেই অনুভূতি কথাটির প্রয়োগ করিয়াছেন। স্পেন্সর্-এর মতে অনুভূতি এবং ইহার নানাপ্রকার সম্বন্ধ সাহায্যেই সকল মানসবৃত্তির ব্যাখ্যা সম্ভব। (৪) অনুভূতি বলিতে সুখ এবং দুঃখও বুঝায়। (৫) আবার, অনুভূতি কথাটির অর্থ সংবেদনজ সুখ এবং দুঃখও বটে। (৬) সর্বশেষে, অনুভূতি বলিতে ভাবজ সুখ, দুঃখ অথবা প্রক্ষোভ (ইমোশন্) এবং আদর্শজ রসও (সেন্টিমেণ্ট্) বুঝায়। এই অর্থে ক্রোধ, ভয়, আনন্দ, নিরানন্দ, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি উচ্চতর মানস বৃত্তিগুলিই অনুভূতির অন্তর্গত।

সুতরাং সঙ্কীর্ণ অর্থে অনুভূতি সংবেদনজ সুখ দুঃখ হইতে আরম্ভ করিয়া আদর্শজ রস পর্যন্ত এবং ব্যাপক অর্থে যে কোনো চেতনা বুঝাইতে পারে। কিন্তু আমরা অনুভূতি বলিতে বুঝিব সংবেদন হইতে উৎপন্ন সুখ ও দুঃখ, বেদনা এবং উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রক্ষোভ সংবেদনজ সুখ-দুঃখ অনুভূতিকে আমরা বলিব বেদনা বা সংবেদনজ অনুভূতি (সেন্স্ ফীলিং) এবং এই উভয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অথবা ভাব (আইডিয়া) বা ধারণা হইতে উদ্ভূত অনুভূতিকে আমরা বলিব প্রক্ষোভ (ইমোশন্)। অথবা সুখ-দুঃখ বেদনাই সংবেদনজ অনুভূতি এবং আনন্দ-নিরানন্দ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি ভাবজ অনুভূতিই (আইডিয়্যাল্ ফীলিং) প্রক্ষোভ।

মিষ্টান্নের মিষ্ট সংবেদনে যে সুখ এবং কুইনাইনের তিক্ত সংবেদনে যে দুঃখ অনুভূত হয় তাহাই সংবেদনজ অনুভূতি (সেন্স্ ফীলিং) বা বেদনা। আবার পরীক্ষায় সাফল্য বা অসাফল্যের সংবাদে যে সুখ বা দুঃখ অনুভূত হয়, কঠিন

প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া যে ভয় এবং অপমানিত হইয়া যে ক্রোধ অনুভূত হয় তাহাই প্রক্ষোভ (ইমোশন্) বা ভাবজ অনুভূতি (আইডিয়্যাল্ ফীলিং)।

২। বেদনা (সেন্স্ ফীলিং) কাহাকে বলে?

ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা হইতে উৎপন্ন সংবেদনের সুখ-দুখ অনুভূতিকে বেদনা (সেন্স্ ফীলিং) বলে। কিন্তু বেদনার এই সংজ্ঞায়, উহার সহিত যান্ত্রিক সুখ-দুঃখ সংবেদনের (অর্গ্যানিক্ সেন্‌সেশন্) পার্থক্য থাকে না। অথচ যান্ত্রিক সুখ-দুঃখ (অর্গ্যানিক প্লেজার্-পেইন্) এবং সুখ-দুঃখ বেদনা পৃথক। মাথাব্যথার, পেটব্যথার, ফোড়ার বা ক্ষতের কষ্ট বা দুঃখ এবং সাধারণ সুস্থতা-সংবেদনের (কমন্ সেন্‌সিবিলিটি) সতেজ, সরস সুখ-বোধ আসলে বেদনা নয়, কিন্তু সংবেদন। পক্ষান্তরে মিষ্টান্ন বা কুইনাইনের স্বাদ সংবেদন হইতে উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ অনুভূতি বেদনা, কিন্তু সংবেদন নয়।

বেদনা ও যান্ত্রিক সংবেদন

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সুখ-দুঃখ বোধের **সাদৃশ্য** এই যে উহারা উভয়েই সংবেদন হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ইহাদের **পার্থক্য** এই যে (১) প্রথমটি **বিষয়গত** (অব্‌জেকৃটিভ্), এবং দ্বিতীয়টি **মানসিক বা ব্যক্তিগত** (সাব্‌জেকৃটিভ্), (২) প্রথমটি শরীরের কোনো অংশে, যেমন মাথায়, পেটে, **স্থান নির্দেশ** করে, কিন্তু দ্বিতীয়টি করে না। (৩) তাহা ছাড়া, যান্ত্রিক সুখদুঃখের **আক্রমণাত্মক** (অ্যাগ্রেসিভ্) লক্ষণ আছে, যাহার ফলে উহারা সবলে মনোযোগ অধিকার করে। কিন্তু সুখদুঃখ বেদনায় এই লক্ষণ নাই; (৪) সুখদুঃখ সংবেদনের তুলনায় সুখদুঃখ বেদনা **অস্পষ্ট এবং ম্লান।** যান্ত্রিক দুঃখের **কামড়ানো, দপ্ দপ্ করা** জাতীয় লক্ষণ আছে, যাহার ফলে উহা স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু সুখদুঃখ বেদনার এইরূপ স্পষ্টতা নাই, (৫) সুখদুঃখ সংবেদন অপেক্ষাকৃত **সক্রিয়,** কিন্তু সুখদুঃখ বেদনা **নিষ্ক্রিয়।**

৩। বেদনা এবং সংবেদন (ফীলিং অ্যাণ্ড্ সেন্‌সেশন্)

ইহাদের কোনটি মৌলিক?

হার্বার্ট স্পেন্সর্, জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্, ডঃ এস. সি. মিত্র প্রভৃতি মনোবিৎ

বেদনাকেই সংবেদনের তুলনায় অধিকতর মৌলিক আখ্যা দিয়াছেন। ইঁহাদের মতে বেদনাই আদিম (প্রিমিটিভ্) বা মৌলিক (এলিমেণ্টারি) মানসবৃত্তি এবং অন্যান্য মানসবৃত্তি বেদনারই বিকার। আবার কোনো কোনো মনোবিৎ সংবেদনকেই বেদনার তুলনায় অধিকতর মৌলিক বা আদিম বলিয়া মনে করেন, যেমন হ্বুণ্ড্-এর প্রথম মত। তাঁহাদের মতে বেদনা স্বতন্ত্র মানসবৃত্তি নয়, কিন্তু সংবেদনেরই গুণ বিশেষ। তাঁহারা বেদনাকে সংবেদনের বেদনা-রাগে (ফীলিং টোন্, হেডনিক্ টোন্) পরিণত করিয়াছেন।

হ্বুণ্ড (তাঁহার পরবর্তী মতে), কুল্পে, টিশ্‌নার প্রভৃতির মতে বেদনা এবং সংবেদন, এই দুইটিই সমানভাবে মৌলিক বা আদিম মানসবৃত্তি। সংবেদনের এমন কতগুলি লক্ষণ রহিয়াছে, যেগুলি বেদনার লক্ষণ হইতে স্বতন্ত্র। তাহা ছাড়া, সংবেদনের নিজস্ব গুণ আছে, যেমন জাতি, পরিমাণ, তীব্রতা, স্থায়িত্ব, বিশদতা প্রভৃতি। এই সকল কারণে সংবেদনকে বেদনার বিকার বা গুণে পরিণত করা যায় না। আবার বেদনারও এমন কতগুলি লক্ষণ আছে যাহা সংবেদন হইতে স্বতন্ত্র। তাহা ছাড়া, বেদনারও নিজস্ব গুণ রহিয়াছে, যেমন মানসিকতা (সাব্‌জেক্‌টিভিটি) এবং সুখদুঃখ।

সুতরাং বেদনা এবং সংবেদন সমভাবে মৌলিক। ইহাদের একটিকে অপরটির বিকার বা গুণ বলিয়া মনে করা অসঙ্গত।

বেদনা এবং সংবেদনের পার্থক্য

সংবেদন এবং বেদনা ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। সংবেদনহীন বেদনা অথবা বেদনা-হীন সংবেদন নাই। কিন্তু উহাদের পার্থক্যও উল্লেখযোগ্য।

(১) সংবেদন চেতনার বিষয়গত (অব্‌জেক্‌টিভ্) এবং বেদনা ব্যক্তিগত বা মানসিক (সাব্‌জেক্‌টিভ্) দিক। অর্থাৎ, সংবেদন উহার বিষয়ের জ্ঞান বহন করিয়া আনে, কিন্তু বেদনা ব্যক্তির নিজস্ব অবস্থার জ্ঞান বহন করে।

(২) সংবেদনের দেশাভিজ্ঞান বা স্থানীয় নির্দেশ (লোক্যাল সাইন্) থাকে, কিন্তু বেদনার থাকে না।

(৩) বিভিন্ন সংবেদন একই কালে অনুভূত হইতে পারে—যেমন মিষ্টান্নের সুমিষ্ট স্বাদ, সুগন্ধ, কোমল স্পর্শ এবং দর্শন, এই বিভিন্ন সংবেদন-গুলি একসঙ্গে ঘটিতে পারে। কিন্তু সুখদুঃখ একই সময়ে ঘটিতে পারে কিনা সন্দেহ।

(৪) সংবেদনের মধ্যে বেদনার দ্বিপ্রান্তিকতা (বাই-পোলারিটি) নাই। সুখ এবং দুঃখ, একটি অপরটির বিপরীত, যাহার ফলে একটিকে অপরটিতে পরিণত করা যায় না। কিন্তু শাদা এবং কালো এই দুইটি রংএর মধ্যে বৈপরীত্য থাকিলেও, একটিকে অপরটিতে পরিণত করা যায়।

(৫) একই উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তি করিলে, সংবেদন চেতনার একটি অংশ হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু বেদনা ক্রমে ক্রমে দুর্বল হইয়া বিলুপ্ত হয়।

(৬) সংবেদনের প্রতিরূপ সাহায্যে স্মরণ হয়। কিন্তু বেদনার প্রতিরূপ নাই, সুতরাং ইহার স্মরণ হইতে পারে না।

(৭) হেফ্‌ডিং বলিয়াছেন যে যদিও সংবেদন এবং বেদনা এই উভয়েরই আপেক্ষিকতা (রিলেটিভিটি) আছে, অনুষঙ্গ নিয়ম শুধু সংবেদনেই প্রযোজ্য। একটি সংবেদন অপর একটি সংবেদনের সহিত অনুষক্ত হইতে পারে, যাহার ফলে, একটি অপরটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু একটি বেদনার সহিত আর একটির এমন অনুষঙ্গ স্থাপিত হয় না, যাহার ফলে একটি অপরটিকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। বেদনা বেদনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে শুধু ভাব বা ধারণার মধ্যস্থতায়।

(৮) সংবেদনের মত বেদনারও জাতি, পরিমাণ, তীব্রতা এবং স্থায়িতা আছে। কিন্তু সংবেদনের বিশদতা গুণটি বেদনায় নাই।

(৯) অভিনিবেশ চেতনায় (অ্যাটেন্‌টিভ্‌ কন্‌সাচ্‌নেস্‌) সংবেদন এবং বেদনা বিভিন্ন স্থান অধিকার করে। সংবেদনে অভিনিবেশ সম্ভব, কিন্তু বেদনায় উহা সম্ভব নয়। ফলে, সংবেদন স্পষ্ট ও বিশদ কিন্তু বেদনা অস্পষ্ট এবং অবিশদ চেতনা।

৪। বেদনার প্রকার ও মাত্রাভেদ

প্রচলিত মতবাদ এবং হব্‌ণ্ড্‌-এর ত্রিমাত্রাত্মক মতবাদ
(ট্রাইডাইমেন্‌সন্যাল্‌ থিওরী অফ্‌ ফীলিং)

(১) প্রচলিত একমাত্রাত্মক (য়্যুনি-ডাইমেন্‌সন্যাল্‌) মতবাদ

বেদনার প্রকারভেদ লইয়া মতভেদের অন্ত নাই। প্রচলিত মনোবিদ্যার মতানুসারে বেদনা দুই প্রকার—যথা সুখ এবং দুঃখ। এমন কোনো বেদনা নাই যাহা এই দুইটির একটিতে অন্তর্ভুক্ত নয়। সুখ এবং দুঃখই বেদনার দুইটি জাতি বা প্রকার। ইহারা যেমন জাতিতে বা প্রকারে পৃথক, তেমন পরিমাণ,

তীব্রতা, স্থায়িত্বেও ভিন্ন হইতে পারে। যেমন একটি রসগোল্লা খাইবার সুখের তুলনায় দুইটি রসগোল্লা খাইবার সুখের পরিমাণ বেশী। আবার মৃদু মিষ্টান্ন-ভোজনসুখের তুলনায় তীব্র মিষ্টান্নভোজনসুখ অধিক তীব্র। অল্পকাল স্থায়ী সঙ্গীতশ্রবণের সুখ হইতে দীর্ঘকাল স্থায়ী সঙ্গীতশ্রবণের সুখ অধিক স্থায়ী। কিন্তু সুখদুঃখের বিশদতা গুণ নাই। ইহারা অবিশদ অথবা অস্পষ্ট।

বেদনার উপরোক্ত মতকে একমাত্রাত্মক (য়্যুনিডাইমেন্‌সন্যাল্) মতবাদ বলা যাইতে পারে, কারণ এই মতানুসারে বেদনা এক প্রান্তে সুখ এবং অপর প্রান্তে দুঃখ পর্যন্ত একই দিকে পরিবর্তিত হয়।

(২) দ্বিমাত্রাত্মক (বাই-ডাইমেন্‌সন্যাল্) মতবাদ

কিন্তু প্রচলিত একমাত্রাত্মক মতবাদের বিরুদ্ধে রয়েস্ বেদনার দ্বিমাত্রাত্মক মত (বাইডাইমেন্‌সন্যাল্) সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে বেদনার পরিবর্তন দুই দিকে পরিচালিত হয়—প্রথমটি সুখ-দুঃখ মাত্রায় এবং অপরটি স্থিরতা-অস্থিরতা মাত্রায়।

(৩) ত্রিমাত্রাত্মক (ট্রাই-ডাইমেন্‌সন্যাল্) মতবাদ

হ্বুণ্ড্ বেদনার ত্রিমাত্রাত্মক মত (ট্রাই-ডাইমেন্‌সন্যাল্ থিওরি) উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে সুখঃদুঃখই একমাত্র মৌলিক বেদনা নয়, কিন্তু জোড়াবদ্ধ এই দুইটি বেদনা ছাড়াও, দুই জোড়ায় আরও চারটি মৌলিক বেদনা রহিয়াছে, যথা উত্তেজনা—নিস্তেজতা (এক্সাইট্‌মেণ্ট-ডিপ্রেসন্) এবং চাপ উপশম (স্ট্রেন্-রিলিফ্)। হ্বুণ্ড্ বলেন যে বেদনার পরিবর্তন তিনটি দিকে সাধিত হয়। প্রথম মাত্রাটির এক প্রান্তে সুখ এবং অপরপ্রান্তে দুঃখ, দ্বিতীয় মাত্রাটির এক প্রান্তে উত্তেজনা এবং অপর প্রান্তে নিস্তেজতা এবং তৃতীয় মাত্রাটির এক প্রান্তে চাপ এবং অপর প্রান্তে উপশম বা শিথিলতা বোধ রহিয়াছে।

পার্শ্বের রেখাচিত্রটিতে হ্বুণ্ড্-প্রদর্শিত বেদনার গতি দেখানো হইয়াছে। বেদনা আরম্ভ হয় উত্তেজনা এবং দুঃখের সংমিশ্রণে এবং উহার সহিত চাপ বেদনা শীঘ্রই সংযোজিত হয়। এই উত্তেজনা-দুঃখ-চাপ বেদনা সুখ এবং নিস্তেজতা বেদনায় পরিচালিত হয় এবং উহাতে শিথিলতা বেদনারাগ দেখা দেয়। এইরূপে বেদনার গতি শেষ হয় নিরপেক্ষ-বিন্দুতে (ইন্‌ডিফারেন্স্ পয়েন্ট), যে স্থান হইতে উহার সূত্রপাত হইয়াছিল।

হ্ব্ুণ্ড্ বলেন যে পাত্রগণের নাড়ী ও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিশ্চিতভাবে এই ত্রিমাত্রাত্মক বেদনার সমর্থন করে। **চাপ** নাড়ীর গতিশক্তি ও গতিহার এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গভীরতা ও হার কমাইয়া দেয়, কিন্তু **উপশম বা**
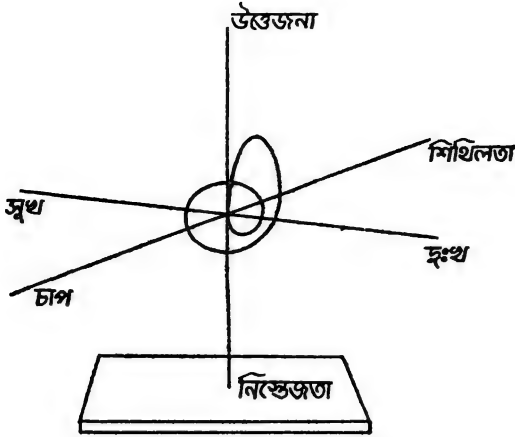
হ্ব্ুণ্ড্-এর ত্রিমাত্রাত্মক বেদনার গতিচিত্র

শিথিলতা এই চারটিরই বৃদ্ধি ঘটায়। **উত্তেজনায়** নাড়ীর গতিশক্তি বাড়ে, উহার গতিহার অপরিবর্তিত থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাসের গভীরতা এবং হার বাড়িয়া যায়, কিন্তু **নিস্তেজতায়** নাড়ীর গতিশক্তি কমিয়া যায়, যদিও উহার গতিহার অপরিবর্তিত থাকে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের গভীরতা এবং হার কমিয়া যায়। আবার **সুখে** নাড়ীর গতিশক্তি বাড়ে, যদিও উহার হার কমে, শ্বাসপ্রশ্বাসের গভীরতা কমে এবং হার বাড়ে. কিন্তু **দুঃখে** নাডীব শক্তি কমিয়া এবং উহার হার বাড়িয়া যায়, আবার শ্বাস-প্রশ্বাসের গভীরতা বাড়িয়া উহার হার কমিয়া যায়।

হ্ব্ুণ্ড্-এর ত্রিমাত্রাত্মক-বেদনা মতবাদের সমালোচনা

কিন্তু হ্ব্ুণ্ড্-এর মত এবং তাঁহার প্রয়োগলব্ধ ফল অনেক মনোবিৎ গ্রহণ করেন নাই।

যেমন **টিশ্নার** দেখাইয়াছেন যে চাপ-শিথিলতা এবং উত্তেজনানিস্তেজতা এই চারটি বেদনা আসলে যৌগিক, মৌলিক নয়। তাঁহার মতে ইহারা 'সাধারণ সংবেদন' (কোয়েনেস্থেসিস্), চেষ্টা-বেদন (কাইনেস্থেসিস্) এবং

সুখদুঃখ বেদনা দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। সুতরাং তিনি বলেন যে সুখদুঃখ, এই দুইটিই মাত্র মৌলিক বেদনা।

হ্বুণ্ড্-বর্ণিত শ্বাসপ্রশ্বাস এবং নাড়ীর শক্তি ও হারের উপর ছয়টি বেদনায় ফলাফল নিম্নপ্রদর্শিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :—

	নাড়ীর শক্তি	নাড়ীর গতির হার	শ্বাস প্রশ্বাসের গভীরতা	শ্বাস প্রশ্বাসের হার
হ্রাসপ্রাপ্ত হয়	চাপ, নিস্তেজতা দুঃখ	তাপ, সুখ	চাপ, নিস্তেজতা সুখ	চাপ, নিস্তেজতা, দুঃখ
অপরিবর্তিত থাকে		উত্তেজনা নিস্তেজতা		
বর্ধিত হয়	শিথিলতা উত্তেজনা, সুখ	শিথিলতা, দুঃখ	শিথিলতা, উত্তেজনা দুঃখ	শিথিলতা, উত্তেজনা, সুখ

মনোবৈজ্ঞানিক কারণে হ্বুণ্ড্-এর মত যে সঙ্গত নয় তাহা দেখানো হইল। কিন্তু এই মতটি যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, টিশ্নার্ তাহাও দেখাইয়াছেন। (১) প্রথমতঃ, এই মতে উদ্দীপকের তীব্রতা, জাতি এবং স্থায়িতা অনুসারে যথাক্রমে সুখ-দুঃখ, উত্তেজনা-নিস্তেজতা এবং চাপ-শিথিলতা, এই তিনটি বেদনার মাত্রা রহিয়াছে। কিন্তু উদ্দীপকের পরিমাণ বা দৈশিক গুণ অনুসারে বেদনার একটি চতুর্থ মাত্রা না থাকায়, হ্বুণ্ড্-এর বেদনা-বিভাগ যুক্তির দিক দিয়া অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। (২) দ্বিতীয়তঃ, উত্তেজনা-নিস্তেজতা এবং চাপ-শিথিলতা মাত্রা দুইটি সুখ-দুঃখ মাত্রার একই নিয়মে কল্পিত হয় নাই। শিথিলতা চাপের নিম্নতম স্তর। আবার নিস্তেজতা উত্তেজনার ঠিক বিপরীত নয়। অপর পক্ষে, সুখ ও দুঃখ একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত। (৩) তৃতীয়তঃ, **উড্ওয়ার্থ্** বলিয়াছেন, বেদনার মাত্রা যে ঠিক তিনটিই হইবে, এমন কারণ নাই। তিনটি মাত্রার অতিরিক্ত বেদনার একটি চতুর্থ মাত্রাও থাকিতে পারে, যেমন পরিচিতি-অপরিচিতি বোধ।

৫। বেদনার স্বরূপ (নেচার্ অফ্ ফীলিং)

সংবেদনজ অনুভূতি বা বেদনার প্রধান ধর্মগুলি নিম্নে উল্লিখিত হইল।

(১) সাধারণতঃ সংবেদন হইতেই বেদনা উদ্ভূত হয়। কিন্তু বেদনার ভিত্তিস্থানীয় সংবেদন স্পষ্ট বা বিশ্লিষ্ট নয়—ইহা **সংবেদনপিণ্ড** বিশেষ।

(২) বেদনা সংবেদনের গুণ বা বিকার নয়। ইহা সংবেদনের মতই একপ্রকার **মৌলিক** চেতনা।

(৩) বেদনা ব্যক্তিগত বা **মানসিক** (সাব্জেক্টিভ্)। সংবেদনে যেমন বিষয়নির্দেশ (অব্জেক্টিভ রেফারেন্স্) থাকে, বেদনায় তেমন থাকে না। লাল রং দেখিয়া শিশুর সুখ হইল। এই স্থলে 'দেখা' রূপ সংবেদনটি লাল রং রূপ বিষয়কে নির্দেশ করে। কিন্তু সুখবেদনা নির্দেশ করে শিশুর মানস অবস্থাকে। অবশ্য বেদনার এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা মানসিকতা বুঝায় না যে ইহার বিষয় নাই, কিন্তু বুঝায় যে বিষয়ের প্রতি বেদনার ততটা নির্দেশ নাই, যতটা আছে মানসিক অবস্থার প্রতি।

(৪) একই বস্তুর সংবেদন স্বভাবতঃ একই প্রকারের হইয়া থাকে—যেমন শব্দের বা আলোকের সংবেদন। কিন্তু **একই বস্তু বা বিষয় বিপরীত বেদনা ঘটাইতে পারে।** যেমন একই সঙ্গীত কাহারও মনে সুখ, আবার কাহারও মনে দুঃখ জাগাইতে পারে।

(৫) সংবেদনের বিষয় সর্বজনগ্রাহ্য। যেমন একটি আলোক একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তি দেখিতে পারে। কিন্তু বেদনাব **সর্বজনগ্রাহ্যতা নাই।** একই আলোক দেখিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের বেদনা ঘটিতে পারে।

(৬) বেদনা অল্পাধিক **নিষ্ক্রিয়** (প্যাসিভ্)। সংবেদনে যেমন ইন্দ্রিয়কে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভিযোজন (অ্যাডাপ্টেশন্) আবশ্যক হয়, বেদনায় তেমন হয় না। বেদনা পরিহারের বা লাভের চেষ্টায় ক্রিয়া বা ইচ্ছা উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু নিজস্বভাবে বেদনায় সক্রিয়তা নাই। অবগতিমূলক এবং ইচ্ছামূলক মানসবৃত্তির তুলনায় বেদনা নিষ্ক্রিয়।

কিন্তু **ম্যাক্ডুগাল, উড্ওয়ার্থ্** প্রভৃতি মনোবিদ্গণ বেদনাকে সক্রিয় মানসবৃত্তি বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে বেদনায় সুখকর বস্তু লাভ করিবার এবং দুঃখকর বস্তু পরিহার করিবার প্রতিন্যাস (অ্যাটিচুড্) এবং প্রবণতা (টেন্ডেন্সি) থাকে। কিন্তু প্রতিন্যাস বা প্রবণতা বাস্তবভাবে সক্রিয় মানসবৃত্তি নয়, ক্রিয়ার প্রস্তুতি বিশেষ। প্রতিন্যাস বা প্রবণতাকে বাস্তব কার্যে পরিণত করিতে বেদনা অক্ষম। সুতরাং বেদনাকে সক্রিয় মানসবৃত্তি বলা চলে না।

(৭) বেদনায় অল্পাধিক শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনা ঘটে। বেইন্-এর মতে চাঞ্চল্য বা উত্তেজনাই বেদনার বিশেষ লক্ষণ। বেদনায় আভ্যন্তরীণ শারীরযন্ত্রগুলির সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন ঘটে।

(৮) হেফ্‌ডিং দেখাইয়াছেন যে অন্যান্য মানসবৃত্তির মত বেদনায়ও আপেক্ষিকতা সূত্র (ল' অফ্ রিলেটিভিটি) কাজ করে। বেদনা শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার তুলনায় অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন একই সঙ্গীত কাহারও মনে সুখ, আবার কাহারও মনে দুঃখ জন্মাইতে পারে। আশা, নৈরাশ্য, উদ্বেগ প্রভৃতি অবস্থাগুলি বেদনাকে প্রভাবিত করে। বস্তুর নূতনত্ব অথবা পরিবর্তনও বেদনার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৬। বেদনা ও প্রক্ষোভ (ফীলিং অ্যাণ্ড্ ইমোশন্)

অনুভূতি দুই প্রকার—যথা **সংবেদনজ** বা **বেদনা** অনুভূতি (সেন্স্ ফীলিং) এবং **ভাবজ** বা **প্রক্ষোভ** অনুভূতি (আইডিয়্যাল ফীলিং, ইমোশন্)।

সাদৃশ্য

বেদনা ও প্রক্ষোভের সাদৃশ্য এই যে (১) উহারা উভয়েই সুখদুঃখাত্মক, (২) উহারা উভয়েই সংবেদন এবং প্রত্যক্ষের ফল, (৩) উহারা উভয়েই অল্পাধিক ব্যক্তিগত বা মানসিক এবং নিষ্ক্রিয় মানসবৃত্তি; (৪) আবার দুইটিই শারীরিক এবং মানসিক উত্তেজনার সহিত সংশ্লিষ্ট।

পার্থক্য

(১) বেদনা এবং প্রক্ষোভ সংবেদন বা প্রত্যক্ষ হইতে উদ্ভূত হইলেও দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় জটিল। বেদনার কারণভূত সংবেদন বাস্তব জগতের একটি বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ, কিন্তু প্রক্ষোভের কারণভূত সংবেদন বাস্তব জগতের কোনো সমগ্র পরিস্থিতির (সিচুয়েশন্) সহিত সম্পর্কিত। যেমন ক্লান্তি, তৃষ্ণা এবং উত্তাপবোধের দুঃখবেদনা বিশ্রাম, জল এবং বাতাসকে ইঙ্গিত করে। কিন্তু ভয় প্রক্ষোভ বুঝায় সম্মুখস্থ ভয়ের বস্তুকে, নিজ অসহায়তাকে, পলায়নের অসম্ভাব্যতাকে, আসন্ন দুঃখ প্রভৃতিকে, অর্থাৎ একটি সমগ্র পরিস্থিতিকে।

(২) বেদনা প্রক্ষোভের তুলনায় স্থূল এবং প্রক্ষোভ বেদনার তুলনায় সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি। বেদনার মূলে রহিয়াছে সংবেদন বা প্রত্যক্ষ। কিন্তু প্রক্ষোভের

মূলীভূত কারণ ধারণা বা ভাবও (আইডিয়া) হইতে পারে। একা, অন্ধকারে বনের ভিতর দিয়া যাইতে দস্যু, ব্যাঘ্র বা সর্প প্রভৃতির ভয় হয়। এই ক্ষেত্রে ভয়ের কারণ প্রত্যক্ষ দস্যু, ব্যাঘ্র বা সাপ নয়, কিন্তু উহাদের প্রতিরূপ বা ধারণা। অপর পক্ষে স্থূল সুখ বা দুঃখ বেদনার কারণ বাস্তব সংবেদন বা প্রত্যক্ষ, কিন্তু প্রতিরূপ বা ধারণা নয়।

(৩) যেহেতু প্রক্ষোভ বেদনার তুলনায় জটিল, দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথমটির দৈহিক প্রকাশগুলিও স্পষ্ট। প্রক্ষোভে নাড়ীর, শ্বাসপ্রশ্বাসের, দেহবিস্তারের এবং পেশীর শক্তি, বেদনার তুলনায় অধিক। তাহা ছাড়া, প্রক্ষোভে দেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গসকল বেদনার তুলনায় বেশী সক্রিয় হয়।

৭। বেদনার অবস্থা বা নিয়ম
(কন্‌ডিশন্‌স্ অফ্ প্লেজার্ অ্যাণ্ড্ পেইন্)

বেদনা নিম্নলিখিত নিয়মগুলির অধীন :—

(১) উদ্দীপনা সংক্রান্ত নিয়ম (ল' অফ্ স্টিমুলেশন্)

বেদনা কোনো ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনাজনিত সংবেদন বা প্রত্যক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। বেদনার মূলে উদ্দীপকের সক্রিয়তা আবশ্যক। কোনো উদ্দীপক হয়ত চেতনার নিম্নসীমা (থ্রেশোল্ড্) অতিক্রম করিলেই সুখজনক হয়। এই উদ্দীপকটি বাড়াইতে থাকিলে সুখবেদনাও বাড়িতে থাকে। উহাকে আরও বাড়াইলে একটি নিরপেক্ষ (নিউট্র্যাল্) অনুভূতি আসিয়া পড়ে এবং আরও বাড়াইলে হয়ত দুঃখবেদনা উপস্থিত হয়।

উদ্দীপনা-সংক্রান্ত নিয়মটি এই :—**সুখকর উদ্দীপক মধ্যমপরিমাণের তীব্রতাবিশিষ্ট (স্টিমুলাস্ অফ্ মডারেট্ ইন্‌টেন্‌সিটি) হইলে সুখ উৎপন্ন করে, কিন্তু অত্যন্ত কম বা বেশী তীব্রতাবিশিষ্ট হইলে, দুঃখ উৎপন্ন করে।** যেমন, ভাল গান শুনিতে না শুনিতেই থামিয়া গেলে অথবা একঘেয়েভাবে চলিতে থাকিলে, উহা দুঃখদায়ক হয়, কিন্তু মধ্যমপরিমাণ সময় পর্যন্ত চলিলে সুখবিধান করে। আবার অত্যন্ত অস্পষ্ট বা অতি তীব্র আলোকে দেখা কষ্টকর এবং মাঝারি আলোকে দেখা সুখকর হইয়া থাকে।

হ্যামিল্টন্-প্রদর্শিত এই নিয়মটিকে সর্বাংশে সত্য বলা যায় না। ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। যদিও এই নিয়মটি সুখদায়ক উদ্দীপকের বেলায়

খাটে, ইহা দুঃখদায়ক উদ্দীপকের বেলায় খাটে কিনা সন্দেহ। দুঃখদায়ক উদ্দীপকের তীব্রতা যে পরিমাণেরই হউক না কেন, উহা দুঃখ উৎপন্ন করে। যেমন, মৃদু, মধ্যম বা তীব্র, প্রত্যেক পরিমাণে কুইনাইন সেবনই দুঃখজনক হয়।

সুতরাং সুখদুঃখবেদনা উদ্দীপকের জাতির উপরও নির্ভর করে।

(২) পরিবর্তন সংক্রান্ত নিয়ম (ল' অফ্ চেঞ্জ্)

বেদনা আপেক্ষিক। উহা মানস এবং শারীর অবস্থার পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে। পরিবর্তন বা নূতনত্ব যেমন মনোযোগ আকর্ষণ করে, তেমন বেদনারও কারণ হয়। একই গানের রেকর্ড অনবরত বাজাইতে থাকিলে উহাতে সুখ বা দুঃখ বিলুপ্ত হইয়া ঔদাসীন্য আসে। প্রত্যহ আহার করিলে একই সুস্বাদু খাদ্য সুস্বাদু লাগে না। আবার ঐ গানের বা খাদ্যের ফাঁকে ফাঁকে অন্য গান বা খাদ্য অনুপ্রবিষ্ট হইলে, উহার সুখদায়কতা বজায় থাকে। পরিবর্তনই চেতনার সঞ্জীবনী শক্তি। একঘেয়েমি (মনোটনি) ইহাকে নির্জীব বা প্রাণহীন করিয়া তোলে। এই উদ্দীপকের ক্রিয়া নার্ভতন্ত্রের জড়তা (ইনার্সিয়া) ঘটায় এবং পরিবর্তনের ফলে উহার সক্রিয়তা ফিরিয়া আসে।

তাহা হইলে বেদনার পরিবর্তন সংক্রান্ত নিয়মটি এই:—**উদ্দীপনার পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য সুখদায়ক, পক্ষান্তরে উহার একঘেয়েমি (মনোটনি) বা নিরন্তরতা দুঃখদায়ক।**

কিন্তু এই নিয়মটিরও ব্যতিক্রম আছে। পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য যে সুখকর তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল পরিবর্তনই সুখকর নয়। আকস্মিক পরিবর্তন সুখের পরিবর্তে দুঃখ ঘটায়, কারণ এইরূপ পরিবর্তনের সহিত অভিযোজন অসম্ভব হয়। যেমন, একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিতে না দেখিতেই যদি আর একটি উহার স্থান গ্রহণ করে, তাহা হইলে চক্ষু কোনো দৃশ্যেই অভিযোজিত হইতে না পারিয়া দুঃখ বা পীড়া বোধ করে। দ্বিতীয়তঃ, সুখকর অবস্থা দুঃখকর অবস্থায় পরিবর্তিত হইলেও, দুঃখকর অবস্থাটি আরও বেশী দুঃখকর অনুভূত হয়। সুতরাং উদ্দীপকের পরিবর্তন হইলেই হইল না। সুখবেদনা তখনই ঘটে, যখন পরিবর্তনটি একটি সুখকর অবস্থা হইতে আর একটি সুখকর অবস্থায়, অথবা একটি দুঃখকর অবস্থা হইতে সুখকর বা কম দুঃখকর অবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। তৃতীয়তঃ, নিশ্চলতা বা অপরিবর্তনীয়তা যে শুধু দুঃখই উৎপন্ন করে তাহা নয়। দুঃখকর অবস্থার পুনরাবৃত্তির ফলে উহাই সুখকর হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

(৩) সামঞ্জস্য ও সংঘাত সংক্রান্ত নিয়ম
(ল' অফ্ হার্মনি অ্যাণ্ড ডিস্কর্ড)

দৈনন্দিন জীবনে অসংখ্য উদ্দীপক এলোমেলোভাবে শরীর ও মনের উপর আঘাত করে। গোলমাল বা কর্কশ আওয়াজ, নানা রংএর হিজিবিজি, অসমতল বা এবড়ো থেবড়ো ভূমি, বিশৃঙ্খল ও অসংযত কাজ বা আচরণ, সুখকর হয় না। কোকিলের কুহুতান, তাল-মান-লয়যুক্ত সঙ্গীত, সুখকর হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর উদ্দীপকগুলি একটি অপরটিকে বাধা দেয়, কাজেই ইহারা পীড়াদায়ক হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর উদ্দীপকগুলি একটি অপরটিকে সাহায্য করিয়া শরীর ও মনের একতানতা উৎপন্ন করে এবং সুখদায়ক হয়।

তাহা হইলে সামঞ্জস্য ও সংঘাত সংক্রান্ত নিয়মটি এই :—

সামঞ্জস্যপূর্ণ বা মিলিত উদ্দীপক এবং ক্রিয়া সুখ উৎপন্ন করে, কিন্তু পরস্পরবিরোধী উদ্দীপক একটি আর একটির বাধা সৃষ্টি করিয়া দুঃখ উৎপন্ন করে।

৮। বেদনার মতবাদ
(থিওরিজ্ অফ্ প্লেজার্ অ্যাণ্ড্ পেইন্)

উপরোক্ত নিয়মগুলি সুখ-দুঃখ-বেদনার অভিজ্ঞতা-প্রসূত সাধারণ বর্ণনা মাত্র। উহারা সুখদুঃখের মূল কারণ অথবা স্বরূপ ব্যাখ্যা করে না। অর্থাৎ, উহারা বেদনার তথ্যসম্বন্ধীয় নিয়ম, কিন্তু উহার তত্ত্বসম্বন্ধীয় নিয়ম নয়। সুখ-দুঃখ-বেদনার মূল কারণ বা তত্ত্ব সম্বন্ধে মতবাদগুলি প্রধানতঃ নিম্নলিখিতরূপ—

(১) মনোবৈজ্ঞানিক (সাইকলজিক্যাল্) মতবাদ

এই মতবাদটি সুখ-দুঃখ-বেদনাকে মানস কারণের কার্য হিসাবে এবং ইহাকে মানসবৃত্তিরূপে ব্যাখ্যা করে।

মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদের কয়েকটি প্রকারভেদ উল্লেখযোগ্য—

(ক) বুদ্ধিপ্রকারক (ইন্টেলেক্চুয়্যালিস্ট্) মতবাদ

লাইব্নিজ্ বেদনাকে অস্পষ্ট ভাব বা ধারণা (কন্ফিউজ্ড্ আইডিয়াজ্) বলিয়া মনে করেন। আবার হেগেল্-এর মতানুসারেও বেদনা একপ্রকার অস্পষ্ট জ্ঞান (ইম্প্লিসিট্ নলেজ্)। জর্জ যান্ত্রিক বেদনাকে সুস্থতাবোধ অথবা

অসুস্থতাবোধের আকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার ওয়েৎজ্-এর মতে যান্ত্রিক বেদনা একপ্রকার দুর্বল সংবেদন, যাহা চেতনায় স্পষ্টরূপে ভাসিয়া উঠিতে চেষ্টা করে।

প্রথমোক্ত মত দুইটি মনোবৈজ্ঞানিক নয়, কিন্তু দার্শনিক। শেষোক্ত মত দুইটি মনোবৈজ্ঞানিক। কিন্তু উহারা বেদনাকে যান্ত্রিক সংবেদনে পরিণত করে। তাহা ছাড়া, উপরোক্ত সব মতবাদগুলিরই দোষ এই যে উহারা বেদনাকে বুদ্ধিক্রিয়ার ফলরূপে গ্রহণ এবং উহার মৌলিকতা অস্বীকার করে।

মানস-যান্ত্রিক মতবাদ (সাইকো-মেক্যানিক্যাল্ থিওরি)

বেদনার মানস-যান্ত্রিক মতবাদের ব্যাখ্যাতা হার্বার্ট। তাঁহার মতে বেদনা পরস্পরবিরোধী ভাব বা ধারণার (আইডিয়া) কার্য। ভাবনা একপ্রকার চাপ (স্ট্রেন) সৃষ্টি করে। বাধ (ইন্‌হিবিশন্) অতিক্রম করিয়া ভাবনাকে আত্মরক্ষা করিতে হয়। এই মতে পরস্পর-বিরোধী ভাবের সামঞ্জস্য হইলে সুখ এবং বিরোধ ঘটিলে দুঃখ জন্মে।

এই মতও বেদনার মৌলিকতা অস্বীকার করে। কিন্তু বেদনা শুধু বুদ্ধিক্রিয়া নয়। ইহাও একটি মৌলিক মানসবৃত্তি।

(খ) ইচ্ছামূলক মতবাদ (কোনেটিভ থিওরি)

ওয়ার্ড মনে করেন যে বেদনা মনোযোগের ফল বা ক্রিয়া। বিষয়ে মনোযোগের সফল অভিযোজন সুখ এবং বিফল অভিযোজন দুঃখ উৎপন্ন করে।

স্টাউট্‌ও বলেন যে বেদনা ইচ্ছার (কোনেশন্) কার্য বা ফল। ইচ্ছা উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। "যে সকল অবস্থা ইচ্ছার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা বা আনুকূল্য করে, তাহাই সুখদায়ক। আবার যে সকল অবস্থা ইচ্ছাকে উহার উদ্দেশ্যসাধনে বাধা দেয়, তাহাই দুঃখদায়ক হয়।" যেমন গোলমাল একটি দুঃখ বা কষ্টকর অবস্থা, কারণ উহা ইচ্ছাশক্তিকে অথবা মনোযোগকে বিষয়ে নিবদ্ধ হইতে বাধা দেয়। কিন্তু নীরবতা সুখজনক, কারণ উহা ইচ্ছাশক্তি বা মনোযোগকে উহার বিষয়ে নিবদ্ধ হইতে সাহায্য করে।

ওয়ার্ড্ এবং স্টাউট্ বেদনাকে ইচ্ছার কার্যরূপে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বেদনাকে গৌণ এবং ইচ্ছাকে মুখ্য বা প্রধান মানসবৃত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বেদনা ইচ্ছার মতই একটি মৌলিক মানসবৃত্তি।

মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদগুলির সমালোচনায় বলা যাইতে পারে যে উহারা বেদনাকে সম্পূর্ণভাবে মানসিক কারণ দিয়া ব্যাখ্যা করিতে চায়, কিন্তু উহার শারীর কারণকে উপেক্ষা করে। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণ।

(গ) বেদনা-বাদ (অ্যাফেক্‌টিভ্ থিওরি)

উপরোক্ত মতবাদগুলি বেদনাকে জ্ঞান বা ইচ্ছার ফলরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছে। কিন্তু **মিল্, স্পেন্সর, ডঃ এস, সি, মিত্র** প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণের মতে বেদনাই একমাত্র মৌলিক মানসবৃত্তি এবং বেদনা হইতেই সংবেদন, ভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। ডঃ মিত্র বলিয়াছেন, "বেদনা অথবা অনুভূতিই সেই আদিম মানসলক্ষণ যাহা হইতে, অথচ যাহাকে বাদ দিয়া, আর সব মানসবৃত্তি বিকাশলাভ করিয়াছে।"

টিশ্‌নার্ মনে করেন যে বেদনা এবং সংবেদন মূলতঃ একই প্রকার মানস উপাদান হইতে উদ্ভূত। কিন্তু ক্রমবিকাশের ধারায় উহারা পৃথক হইয়া যায়। ঐ একাকার মানস উপাদানের একটি অংশ বেদনা এবং আর একটি অংশ সংবেদন। বেদনা অংশটি যদি আরও অধিক বিকাশলাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে উহা সংবেদনই হইয়া যাইত। কিন্তু বিকাশের অনুকূল অবস্থা লাভ করিতে না পারিয়া, উহা সংবেদন হইতে পৃথক বেদনারূপেই রহিয়া গিয়াছে।

(২) শারীরবৃত্তীয় বাদ (ফিজিয়লজিক্যাল্ থিওরি)

(ক) অ্যারিস্টট্‌ল্ বলিয়াছেন যে প্রত্যেক অবয়বীর (অর্গ্যানিজ্‌ম্) ভাণ্ডারে নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি রহিয়াছে। এই শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি নাই। ইহার পরিমিত ব্যবহার সুখজনক এবং অপরিমিত ব্যবহার দুঃখদায়ক।

এই মতবাদের সমালোচনায় বলা যায় যে ইহা অস্পষ্ট। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে উল্লিখিত হয় নাই কি উদ্দেশ্যে শক্তির ব্যবহার হইলে সুখ বা দুঃখ হয়। কোনো অসদুদ্দেশ্যে শক্তির পরিমিত ব্যবহার হইলেও দুঃখ ঘটিতে পারে। আবার সদুদ্দেশ্যে শক্তির অপরিমিত ব্যবহারেও সুখ হইতে পারে।

(খ) স্টাউট্ তাঁহার ইচ্ছামূলক মানসবাদের ভিত্তিতে বেদনার একটি শারীর-বৃত্তীয় মতবাদও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ইচ্ছামূলক ক্রিয়ায় নার্ভ-এর সাম্যাবস্থা (ইকুইলিব্রিয়াম্) নষ্ট হইয়া যায়। যে ইচ্ছামূলক ক্রিয়ায়

এই নার্ভীয় বৈষম্য দূর হয় অথবা উহার সাম্যাবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই সুখকর এবং যাহাতে এইরূপ না হয়, তাহাই দুঃখদায়ক।

স্টাউট্-এর এই মতবাদ তাঁহার মানস মতবাদের শারীর পরিপূরক হিসাবে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইচ্ছামূলক ক্রিয়ার কাজই যদি হয় নার্ভীয় সাম্যাবস্থা নষ্ট করা, তবে অন্য ইচ্ছামূলক ক্রিয়া কিরূপে নষ্ট সাম্যাবস্থার পরিপূরণ করিবে তাহা ভাবিবার বিষয়।

উপরোক্ত দুইটি মতবাদকে বিশুদ্ধ শারীর মতবাদ বলা যায় না। প্রথমটি যেমন শারীর তেমন জৈবও বটে, কারণ অবয়বী শরীর ও প্রাণবিশিষ্ট জীব আবার দ্বিতীয়টি মানস মতবাদের পরিপূরক।

(৩) বহিঃপ্রান্তিক শারীরবৃত্তীয় মতবাদ (পেরিফেরেল্ ফিজিয়লজিক্যাল্ থিওরি)

এই মতে বহিঃপ্রান্তিক নার্ভগুলিতে একটি বিশেষ বেদনামূলক ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে। এই নার্ভের পুষ্টির বা উহার অভাবের উপর যথাক্রমে সুখ এবং দুঃখ নির্ভর করে। প্রত্যেক উদ্দীপনায়ই নার্ভশক্তি ব্যয়িত হয়। উদ্দীপনায় নার্ভশক্তির ব্যয় কিভাবে বণ্টিত হয় এবং কিভাবে এই ব্যয়িত শক্তির পরিপূরণ হয় তাহার উপর নির্ভর করে সুখ এবং দুঃখ বেদনা।

(৪) অন্তঃপ্রান্তিক বা কেন্দ্রীয় শারীরবৃত্তীয় মতবাদ (সেন্ট্র্যাল্ ফিজিয়লজিক্যাল্ থিওরি)

এই মতে মস্তিষ্কের নার্ভক্রিয়া বেদনার মূল কারণ। মেনার্ট বলেন যে মস্তিষ্কের পুষ্টির বিভিন্ন অবস্থার উপর সুখদুঃখ বেদনা নির্ভর করে। যে নার্ভ-ক্রিয়ায় মস্তিষ্কের পুষ্টি ব্যাহত হয়, তাহা দুঃখ এবং যাহাতে উহার পরিপূরণ হয় অথবা উহা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা সুখ সৃষ্টি করে। হ্বুণ্ড্ বলিয়াছেন, সংবেদনের উপর সংপ্রত্যক্ষের ক্রিয়াই সুখ দুঃখের নিয়ামক।

(ঙ) ফেক্‌নার বলেন যে সুখ এবং দুঃখ যথাক্রমে সুসমঞ্জস এবং সংঘাতপূর্ণ স্নায়ু-স্পন্দন হইতে উদ্ভূত হয়।

(গ) এবং (ঘ) চিহ্নিত মতবাদ দুইটি বিশুদ্ধ শারীরবৃত্তীয় মতবাদ।- কিন্তু শুধু নার্ভ্ বা মস্তিষ্কের পুষ্টি অনুসারে বেদনার ব্যাখ্যা আংশিক। বেদনার মানসরূপ এই ব্যাখ্যায় উপেক্ষিত। এই মতবাদ দুইটিকে বেদনার

শারীর ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা গেলেও, উহার মানস ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা যায় না।

শেষোক্ত (৬) মতবাদটিও সুখদুঃখের মানসরূপ ব্যাখ্যা করে না।

(৫) মানস-দৈহিক মতবাদ (সাইকো-ফিজিক্যাল্ থিওরি)

বেদনার মানস অভিজ্ঞতার সহিত বিভিন্ন শারীর প্রকাশ-লক্ষণ দেখা যায়। বেদনার মানস অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপক প্রতিবর্তভাবে কতগুলি শারীব প্রকাশও ঘটাইয়া থাকে। যেমন, সুখদুঃখ বেদনার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাস, নাড়ীপ্রবাহের গতি ও শক্তি পবিবর্তিত হয়। এই দিক দিয়া আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উদ্দীপনাজনিত সংবেদনগুলিই বেদনা।

এই মতবাদটি উইলিয়াম্ জেম্স্ এবং ল্যাঙ্গ্ প্রভৃতির গবেষণার সহিত জড়িত। ইহা সন্তোষজনক নয়, কারণ ইহাতে বেদনার নিজস্ব মৌলিকতা নাই, কিন্তু ইহা যান্ত্রিক সংবেদনেরই নামান্তর।

(৬) জৈব মতবাদ (বায়োলজিক্যাল্ থিওরি)

স্পিনোজা, কাণ্ট্ হার্বার্ট স্পেন্সর, বেইন্ প্রভৃতি সুখদুঃখ-বেদনাকে জৈব বা প্রাণশক্তির (ভাইট্যাল্ এনার্জি) সহিত যুক্ত করিয়াছেন। সুখ প্রাণশক্তিব বৃদ্ধি এবং দুঃখ উহার ক্ষয় বা হ্রাস সূচনা করে, অর্থাৎ সুখ জীবনীশক্তি বাড়াইয়া তোলে এবং দুঃখ উহাকে কমাইয়া দেয়। যেমন কাণ্ট্ বলিয়াছেন, "সুখ জীবনীশক্তি বৃদ্ধির এবং দুঃখ জীবনীশক্তি ব্যাঘাতের অনুভূতি।" স্পিনোজা বলিয়াছেন, শক্তিপ্রসারণের বোধই সুখ এবং শক্তিসঙ্কোচের বোধই দুঃখ।

হার্বার্ট স্পেন্সর্ জৈব বিবর্তনের (বায়োলজিক্যাল্ এভল্যুশন্) তথ্য সাহায্যে তাঁহার মতবাদ ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। যে সকল প্রাণী প্রাণশক্তির বস্তুতে সুখ পায় এবং উহার ক্ষতিকর বস্তুতে দুঃখ পায়, তাহারাই জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকে এবং যাহারা ঐরূপ পায় না, তাহারা জীবনসংগ্রামে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। হিউম্ বলিয়াছেন, উদরী রোগীর তৃষ্ণা বাড়িলে রক্ষা নাই, কারণ জলপান তাহার প্রাণশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর।

বেইন্ সুখের জীবনীশক্তিবৃদ্ধির এবং দুঃখের জীবনীশক্তিহ্রাসেব সম্বন্ধকে তাঁহার আত্ম-সংরক্ষণ সূত্র সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জৈব মতবাদটির **সমালোচনায়** ইহার বাস্তব মূল্য অস্বীকার করা যায় না। সুখ যে সঞ্জীবনীশক্তি এবং উহা যে হৃদ্‌যন্ত্র, ফুস্‌ফুস্‌ যকৃৎ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ যন্ত্র-গুলির ক্রিয়াকে সবল ও সুস্থ করে, তাহা স্বীকৃত সত্য। আবার দুঃখ যে ইহার বিপরীত ফল উৎপন্ন করে, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই মতানুসারে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ব্যাখ্যা করা যায় না। মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে সুখ পায়। মৃত্যু ত্বরান্বিত হইবে জানিয়াও উদরী রোগী পুনঃপুনঃ জলপান করিতে ইচ্ছা করে, নিশ্চিত মৃত্যুর পথে তিলে তিলে অগ্রসর হইয়াও ক্ষয়রোগী অসুখী বোধ করে না। তাহা ছাড়া, অনেক মারাত্মক বিষ পান করিতে সুস্বাদু এবং অনেক উপকারী ঔষধ সেবন করিতে কষ্টকর।

স্পেন্সর হয়ত বলিবেন যে প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম থাকে এবং উপরোক্ত উদাহরণগুলি সাধারণ জৈববেদনাবাদের ব্যতিক্রম মাত্র। স্টাউট্‌ দ্বিতীয় দৃষ্টান্তগুলিকে স্পেন্সর্‌-এর সমর্থনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বিস্বাদ বা মন্দস্বাদ ভেষজগুলি সেবনকালে সাময়িকভাবে জীবনীশক্তির হ্রাস করে বলিয়া দুঃখকর এবং পরক্ষণেই উহারা প্রাণশক্তির সহিত মিশিয়া উহার বৃদ্ধি বা উন্নতি সাধন করে বলিয়া সুখকর হয়। মারাত্মক অথচ সুস্বাদু বিষও পানকালে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি সাধন করে এবং পরক্ষণে উহাদের বিষক্রিয়াকালে দুঃখবেদনা উৎপন্ন করে।

৯। বেদনা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন

(ক) সুখদুঃখের একটি সদর্থক এবং অপরটি নঞর্থক কিনা

কোনো কোনো দুঃখবাদী (পেসিমিস্ট্‌) দার্শনিক সুখকে নঞর্থক এবং দুঃখকে সদর্থক বেদনা বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে সুখ বলিয়া কোনো পৃথক বেদনা নাই। ইহা দুঃখের অভাব মাত্র। পাশ্চাত্য দর্শনে সোপেন্‌হাওয়ার্‌ এবং ভারতীয় দর্শনে সাংখ্য এবং বৌদ্ধ দার্শনিকেরা এইরূপ মতের প্রবক্তা। আবার বেদান্ত আনন্দকেই আসল অনুভূতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই মতে দুঃখ সুখের অভাব মাত্র।

সমালোচনায় বলা যাইতে পারে, উপরোক্ত মতটি দার্শনিক। সকল বেদনাই দুঃখময়, এইরূপ অনুভূতি স্বাভাবিক নয়। তাহা ছাড়া, সুখের অনুভূতি না থাকিলে দুঃখের অনুভূতি ঘটিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, অন্তর্দর্শনেও

সুখদুঃখ সমভাবে মৌলিক বলিয়া ধরা পড়ে। চতুর্থতঃ, প্রায়োগিক পদ্ধতিতে দেখা যায়, সুখ এবং দুঃখের শারীর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন। সুতরাং সুখ এবং দুঃখ, একটি অপরটির অভাবাত্মক নয়। দুইটিই সদর্থক বেদনা।

(খ) নিরপেক্ষ বেদনা (নিউট্র্যাল্ ফীলিং) সম্ভব কিনা

সুখ ও দুঃখ বেদনা দুইটি একই সুখদুঃখ মাত্রার দুই প্রান্তে অবস্থিত পরস্পরবিরুদ্ধ বেদনা। সুতরাং উহাদের মধ্যবর্তী কোনো বেদনা—যাহা সুখও নয় দুঃখও নয়—নাই বলিয়াই মনে হইতে পারে।

কিন্তু হ্বুণ্ড্ প্রভৃতি মনোবিৎ মনে করেন যে সুখদুঃখ-নিরপেক্ষ মধ্যবর্তী বেদনা থাকা সম্ভব। একই মাত্রার বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত সুখ ও দুঃখ একটি কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে।

সর্বোচ্চ সুখ বেদনা ---------------⊙---------------সর্বোচ্চ দুঃখ বেদনা

নিরপেক্ষ বেদনা

উপরের কাল্পনিক রেখার বাম প্রান্তে রহিয়াছে সর্বোচ্চ-পরিমাণ সুখবেদনা, আবার উহার দক্ষিণ প্রান্তে রহিয়াছে সর্বোচ্চ-পরিমাণ দুঃখবেদনা। বাম প্রান্ত হইতে দক্ষিণে অগ্রসর হইলে, সুখবেদনার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে কমিতে, মধ্যবিন্দুতে শূন্য হইয়া যায়। আবার, এই নিরপেক্ষ শূন্য বিন্দু হইতে আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইতে থাকিলে, প্রথমে নিম্নতম দুঃখ-বেদনা উপস্থিত হয় এবং উহা ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে উচ্চতম দুঃখসীমায় পৌছায়। আবার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত সর্বোচ্চ দুঃখবেদনা হইতে বামে অগ্রসর হইলে, দুঃখ কমিতে কমিতে মধ্যবিন্দুতে শূন্য হইয়া দাঁড়ায় এবং ঐ মধ্যবিন্দু হইতে আরও বামে অগ্রসর হইলে প্রথমে নিম্নতম সুখবেদনা উপস্থিত হয় এবং উহা ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে সর্বোচ্চ-পরিমাণ সুখবেদনাসীমায় পৌছায়।

সুতরাং হ্বুণ্ড্-এর মতে সুখদুঃখের মধ্যবর্তী নিবপেক্ষ বেদনা (নিউট্র্যাল্ ফীলিং) আছে, যাহা উহাদের অতিক্রম-বিন্দু (ট্র্যান্‌জিশন্ পয়েন্ট্)।

হ্বুণ্ড্-মতের সমালোচনা

কিন্তু হ্বুণ্ড্-এর এই মতবাদ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। (১) ইহা বেদনার আপেক্ষিকতা সূত্রকে (ল' অফ্ রিলেটিভিটি অফ্ ফীলিং) লঙ্ঘন করে। নিরপেক্ষ বেদনার তথাকথিত শূন্যবিন্দুটি আসলে শূন্য নয়। কল্পিত

সরলরেখাটির সুখ-প্রান্ত হইতে অগ্রসর হইলে, এই বিন্দুটি দুঃখময় এবং দুঃখপ্রান্ত হইতে অগ্রসর হইলে, এই বিন্দুটি সুখময় বলিয়া অনুভূত হওয়া উচিত। (২) কোনো বস্তুর মৃদু উত্তপ্ত উপরিভাগে হাতের পাতা রাখিলে, প্রথমে সুখ-বেদনা অনুভূত হয়। এইবার উহার উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকিলে, সুখ-বেদনা দুঃখবেদনায় পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনের পুর্বে সুখবেদনার সহিত মৃদু অথবা ক্ষীণ দুঃখবেদনা উপস্থিত হয়। (৩) তাহা ছাড়া, যে সাধারণ সুস্থতাবোধের (কমন্ সেন্‌সিবিলিটি) পটভূমিতে বেদনা ফুটিয়া ওঠে, তাহা সুখদায়ক। সুতরাং যাহাকে নিরপেক্ষ মধ্যবিন্দু বলা হয়, তাহা ঐ সুখবেদনার তুলনায় দুঃখকর। (৪) তথাকথিত নিরপেক্ষ বেদনার অন্তর্দর্শনে উহাতে সুখদুঃখের সূক্ষ্ম ক্রমিক পরিবর্তন অথবা দোলন (অসিলেশন্) অনুভূত হয়। (৫) তথাকথিত নিরপেক্ষ বেদনা আসলে অবগতিমূলক। ইহা একটি বুদ্ধি-নির্মাণ বা কল্পনা, কিন্তু অনুভূতি বা বেদনা নয়।

(গ) মিশ্র বেদনা (মিক্স্‌ড্ ফীলিং) সম্ভব কিনা

সুখও বটে, দুঃখও বটে, এমন মিশ্রিত বেদনা আছে কি ? সুখ এবং দুঃখ যদি পরস্পরবিরোধী বেদনা হয়, তাহা হইলে যুক্তির দিক দিয়া এইরূপ সুখদুঃখ-মিশ্রিত বেদনা থাকিতে পারে না।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্, স্টাউট্ প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ মিশ্রিত বেদনা স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে সুখ এবং দুঃখ পরস্পর বিরুদ্ধ বেদনা নয়, সুতরাং ইহারা মিশ্রিত হইতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের এবং কবির বর্ণিত বেদনায় সুখ-দুঃখের মিশ্রণ দেখা যায়। মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে হয়ত এইরূপ মিশ্র বেদনা (মিক্সড্ ফীলিং) অনুভব করিয়াছিলেন। রোমিও জুলিয়েৎ-এর নিকট "বিদায় মধুর বিষণ্ণতা (পার্টিং ইজ্ সুইট্ সরো।)" স্টাউট্ মধুর বিষাদের (প্লিজিং মেলাঙ্কলি) উল্লেখ করিয়াছেন। শোকের মধ্যেও সুখ অনুভূত হইতে পারে। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের মধুর স্মৃতিগুলি জাগিয়া উঠিলে দুঃখ সুখরাগে রঞ্জিত হয়।

সমালোচনায় বলিতে হয় যে মনোবিদ্যা বিজ্ঞান। দৈনন্দিন জীবনের অথবা কবিকল্পনার নজীর যাহাই হউক না কেন, অন্তর্দর্শনে অথবা প্রায়োগিক গবেষণায় মিশ্রবেদনার সন্ধান পাওয়া যায় না। সুখ এবং দুঃখ যুগপৎ ঘটিতেছে বলিয়া মনে হইলেও, বাস্তবিকই যুগপৎ ঘটে না। সুখ ও দুঃখ

দোলকের মত এমন দ্রুতভাবে দোলায়মান হয় যে উহাদের যুগপৎ অনুভূতি ঘটে।

(ঘ) বেদনা ও মনোযোগ (ফীলিং অ্যাণ্ড্ অ্যাটেন্‌শন্)

সংবেদনের সহিত বেদনার একটি প্রধান পার্থক্য এই যে সংবেদন মনোযোগের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু বেদনা পাবে না। মনোযোগের ফলে সংবেদন স্পষ্টতর হয়, কিন্তু বেদনা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ক্রোধ দমন করিবার উপায় হিসাবে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখাবয়ব আয়নায় দেখাইবার উপদেশ দেওয়া হয়। সুখ বা দুঃখের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেই ঐ বেদনা নিম্নলিখিত কারণে মিলাইয়া যায়। (১) বেদনায় মনোযোগের সঙ্গে উহার ভিত্তিস্থানীয় সংবেদন হইতে মনোযোগ সরিয়া যায়, সুতরাং বেদনা অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। (২) বেদনা স্বয়ং মনোযোগ এবং সংবেদনের যুক্ত ফল। সুতরাং বেদনায় মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গে এই যুক্তফলটি বিচ্ছিন্ন এবং অস্পষ্ট হয়। (৩) মনোযোগের ফলে মন শান্ত এবং স্থির হয়। বেদনা একপ্রকার উত্তেজনার অনুভূতি। সুতরাং ইহা মনোযোগের ফলে ব্যাহত হয়।

(ঙ) বিষয়গত এবং ব্যক্তিগত বেদনা (অব্‌জেক্‌টিভ্ অ্যাণ্ড্ সাব্‌জেক্‌টিভ্ ফীলিং)

কোনো কোনো মনোবিৎ ব্যক্তিগত বেদনার সহিত বিষয়গত (অব্‌জেক্‌টিভ) বেদনাও স্বীকার করিয়াছেন। যেমন, পীতবর্ণের উজ্জ্বলতা দর্শনের সুখবেদনা ঐ উজ্জ্বলতাকেই নির্দেশ করে, সুতরাং ইহা বিষয়গত (অব্‌জেক্‌টিভ্)। পক্ষান্তরে উজ্জ্বলতাদর্শন দ্রষ্টার মনে সুখবেদনা রূপ যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে উহা মানসিক বা ব্যক্তিগত (সাব্‌জেক্‌টিভ্)। মনোযোগের ফলে বিষয়গত বেদনা বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু ব্যক্তিগত বেদনা হয়।

(চ) বেদনার শারীর লক্ষণ (বডিলি এক্স্‌প্রেশন্‌স্ অফ্ ফীলিং)

প্রত্যেক মানসবৃত্তিই শরীরের বিবিধ লক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে। শারীর প্রকাশগুলি দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, কোন্ ব্যক্তি সুখী অথবা দুঃখিত। বেদনা মুখমণ্ডলের পেশীয় বিচলনে প্রকাশিত হয়। এই জন্যই কাহারও মুখভঙ্গী

দেখিয়াই আমরা বুঝিতে পারি তাহার কি বেদনা হইয়াছে। আমরা বলিয়া থাকি, অমুককে সুখী বা দুঃখিত, ভীত বা ক্রুদ্ধ দেখাইতেছে।

বেদনায় সমগ্র শরীর আন্দোলিত হয়। শুধু মুখাবয়বে নয়, সমগ্র শরীরেই বেদনার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। অন্ততঃ চারটি শারীর প্রকাশ দেখিয়া আমরা ব্যক্তির সুখ বা দুঃখ বেদনা বুঝিতে পারি, যথা—(১) নাড়ীর অবস্থা, (২) শ্বাস-প্রশ্বাসের অবস্থা, (৩) শরীরের বিস্তার (ভল্যুম্) এবং (৪) পেশীর শক্তি।

(১) সুখ বেদনায় নাড়ী সবল এবং দুঃখ বেদনায় উহা দুর্বল হয়। (২) আবার সুখে শ্বাসপ্রশ্বাস গভীরতর এবং দুঃখে অগভীর হয়। (৩) সুখে স্বচ্ছন্দ রক্তচলাচল ঘটে এবং দুঃখে উহা ব্যাহত হয়। সেই কারণে সুখে আমরা যেন ফুলিয়া উঠি, কিন্তু দুঃখে সঙ্কুচিত বা ক্ষুদ্র হইয়া পড়ি। (৪) সুখে পেশীজ শক্তি বাড়িয়া যায়, কিন্তু দুঃখে ইহা কমিয়া থাকে।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

উড্ওয়ার্থ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস্—সাইকলজি—একাদশ পরিচ্ছেদ

বোরিং, ল্যাংফেল্ড্, ওয়েল্ড্—ফাউণ্ডেশন্স্ অফ্ সাইকলজি—পঞ্চম পবিচ্ছেদ

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেন্ট্স্ অফ্ সাইকলজি—দশম পরিচ্ছেদ

জি. এফ্. ষ্টাউট্—এ ম্যানুয়্যাল্ অফ্ সাইকলজি—তৃতীয় খণ্ড—পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এম্ কলিন্স্ অ্যাণ্ড জে. ড্রিভার—এক্সপেরিমেণ্ট্যাল্ সাইকলজি—একাদশ পরিচ্ছেদ

ই. বি. টিশনার—এ প্রাইমার্ অফ্ সাইকলজি—চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ই. বি টিশনার—এ টেক্সটবুক্ অফ্ সাইকলজি—পৃঃ ২২৫—২৬৩

Exercise

1. What does feeling mean ? What are the sub-divisions of feeling ? (pp 642-643)
2. Define sense-feeling Illustrate your answer with an example. (p. 643)
3. Distinguish between feeling and sensation. (pp 643-645)
4. How many feelings are there ? Critically explain the tri-dimensional theory of feeling. (pp. 645-648)
5. Give an analysis of the nature and characteristics of feeling. (pp. 648-650)
6. Distinguish between feeling and emotion. (pp. 650-651)
7. What are the conditions of pleasure and pain ? Explain the different laws of feeling. (pp 651-653)
8. Distinguish between the laws and theories of pleasure and pain (pp 651-663)
9. What are the different psychological theories of feeling ? Which of them is the best and why ? (pp. 653-658)

10. Explain the theories of feeling. Discuss their merits and demerits. (pp. 553-658)
11. Is pleasure more fundamental than pain ? Discuss (pp 658-659)
12. Is there any neutral feeling ? Discuss. (pp. 659-600)
13. Is there any feeling which is the mixture of pleasure and pain ? (pp. 660-661)
14. (a) How is feeling related to attention ? (p 661)
    (b) Distinguish between subjective and objective feeling. (p. 661)
15. Explain the bodily expressions of feeling. (pp. 661-662)

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রক্ষোভ (ইমেজ্) বা ভাবজ অনুভূতি

১। প্রক্ষোভ কাহাকে বলে
(ডেফিনিশন্ অফ্ ইমোশন্)

প্রক্ষোভ অনুভূতির (ফীলিং) সেই ভাবগত (আইডিয়্যাল্) রূপ যাহা বেদনার তুলনায় জটিল, যাহা শরীরের সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন ঘটায়, যাহা মানসিক দিক হইতে একটি তীব্রবেদনাযুক্ত ও উত্তেজনাময় অবস্থা, যাহার কোনো নির্দিষ্ট ক্রিয়া বা চেষ্টিত উৎপন্ন করিবার প্রবণতা আছে এবং যাহা কোনো সমগ্র পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ ফল।

কুল্পে বলিয়াছেন যে প্রক্ষোভ যান্ত্রিক সংবেদন এবং বেদনার এক প্রকার মিশ্রণ। **হেফ্ডিং**-এর মতে প্রক্ষোভ একপ্রকার সুখদুঃখ বেদনা যাহাতে উহাদের কারণ সম্বন্ধে চেতনা থাকে। **সালি** মনে করেন যে প্রক্ষোভ এক প্রকার সংবেদনজ এবং পুনরুদ্রিক্ত উপাদান যাহা বেদনার রাগে রঞ্জিত। আবার **ওয়ার্ড্** বলেন যে প্রক্ষোভ একটি সমগ্র মানসবৃত্তি যাহাতে অবগতি, সুখদুঃখবেদনা এবং ইচ্ছা বর্তমান।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি হইতে বুঝা যায় যে প্রক্ষোভ **মৌলিক মানসবৃত্তি নয়,** কিন্তু যৌগিক বা জটিল মানসবৃত্তি।

প্রক্ষোভের বিশ্লেষণ

প্রক্ষোভের বিশ্লেসণ হইতে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি পাওয়া যায় :—

(১) প্রক্ষোভে একটি **সুখদুঃখবেদনার অনুভূতি** আছে। প্রক্ষোভ বেদনা-রাগে (হেডোনিক্ টোন্) রঞ্জিত। (২) ইহাতে বিস্তৃত বা সর্বাঙ্গীণ যান্ত্রিক ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে—যেমন নাড়ীর শক্তি ও গতি, শ্বাসপ্রশ্বাসের গভীরতা-অগভীরতা, গ্রন্থির রসক্ষরণ প্রভৃতি। এই সর্বাঙ্গীণ যান্ত্রিক ক্রিয়াকে বলা হয় **যান্ত্রিক ঝঙ্কার** (অর্গ্যানিক্, সোম্যাটিক্ রেজোন্যান্স্)। (৩) প্রক্ষোভের একটি কালিক ধর্ম বা স্থায়িত্ব (ডিউরেশন্) আছে। ইহা হঠাৎ আরম্ভ হয়, ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে চরম সীমায় পৌছায় এবং ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। (৪) প্রক্ষোভ বেদনার মত কোনো নির্দিষ্ট বা বিচ্ছিন্ন উদ্দীপক দ্বারা

উৎপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে ইহার উদ্দীপক একটি সমগ্র পরিস্থিতি (হোল্ সিচুয়েশন্)। (৫) স্টাউট্ বলিয়াছেন যে প্রক্ষোভের **স্বভাব পরগাছার মত** (ইমোশন্স্ আর্ প্যারাসিটিক্যাল্ ইন্ নেচার), কারণ ইহা সহজ প্রবৃত্তি অথবা ইচ্ছাকে অবলম্বন করিয়া ঘটে। যেমন, বাছুর ধরিতে গেলে গরু ক্রুদ্ধ হইয়া গুঁতাইতে আসে। এই ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রক্ষোভটি 'মাতৃত্ব' সহজ প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া ঘটে। (৬) প্রক্ষোভের কারণ শুধু সংবেদন বা উপস্থিত কোনো বস্তুর প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু উহার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিরূপ বা ভাবও বটে। অর্থাৎ প্রক্ষোভ **উপস্থিত ও পুনরুপস্থিত, এই উভয় প্রকার কারণে ঘটিয়া থাকে।** (৭) প্রক্ষোভে **বিচারশক্তি ব্যাহত হয়।** প্রক্ষুব্ধ অবস্থায় আমরা সম্পূর্ণভাবে আবেগের দাস হইয়া পড়ি এবং এমন কথা বলি অথবা কাজ করি যাহা শান্ত অবস্থায় মূর্খতা বা বোকামি বলিয়া মনে হয়। (৮) প্রক্ষোভ সহজেই **সাপেক্ষ (কন্‌ডিশন্‌ড) হইয়া পড়ে।** চেষ্টিতবাদীরা প্রক্ষোভের সাপেক্ষকরণ সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন। যে বস্তুতে শিশুর সহজাত প্রক্ষোভ ঘটে, তাহার সহিত অন্য কোনো বস্তু উপস্থাপিত করিলে, দ্বিতীয় বস্তুটিতে সাপেক্ষ প্রক্ষোভ জন্মে। এই বিষয়টি পূর্বেই সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।[১] (৯) প্রক্ষোভ যে শুধু অনুভূতিমূলক (অ্যাফেক্‌টিভ্) মানসবৃত্তি তাহাই নয়। ইহাতে অবগতিমূলক (কগ্‌নিটিভ্) এবং ইচ্ছামূলক (কোনেটিভ্) উপাদানও রহিয়াছে। অবশ্য অনুভূতিমূলক উপাদানই প্রক্ষোভে প্রধান স্থান গ্রহণ করে।

২। প্রক্ষোভ, মেজাজ (মুড্), অতিরাগ (প্যাশন্), স্বভাব (ডিস্‌পোজিশন্) এবং আয়ান (টেম্‌পারামেণ্ট্)

মেজাজ্ (মুড্)

প্রক্ষোভ কোনো প্রত্যক্ষ বস্তু, প্রতিরূপ বা ভাব অবলম্বন করিয়া ঘটিয়া থাকে। ইহা একটি বাস্তব অনুভূতি। যেমন, কাহারও দ্বারা অপমানিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে ক্রোধ নামক প্রক্ষোভ ঘটে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, উহার প্রতিরূপ বা ভাব হইতে বাস্তব ক্রোধ না ঘটিলেও, ক্রুদ্ধ মেজাজ্ (মুড্) থাকিতে পারে। যেমন, প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে অমুক

১। অষ্টম পরিচ্ছেদ—দ্বাদশ অনুচ্ছেদ—পৃঃ ১৫৫ দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তি আজ খুব খুশী বা চটিয়া আছেন। এই স্থলে অমুক ব্যক্তিটি যে নির্দিষ্ট ভাবে কাহারও উপর চটিয়া আছেন, অথবা তাহার এই প্রক্ষোভ যে প্রতি মুহূর্তে বাস্তব ক্রোধের আকারে প্রকাশিত হইতেছে তাহা নয়। কিন্তু তাহার মধ্যে বাস্তব ক্রোধের প্রবণতা রহিয়াছে। এই ক্রোধপ্রবণতা কোনো অছিলা বা ছুতা পাইলেই বাস্তব ক্রোধের আকারে ফাটিয়া পড়িতে পারে।

তাহা হইলে **মেজাজ বলিতে বুঝায় এমন প্রক্ষোভ-প্রবণতা যাহা বাস্তব প্রক্ষোভে প্রকাশিত হয় নাই অথচ যাঁহার বাস্তব প্রক্ষোভে প্রকাশিত হইবার প্রবণতা আছে।**

প্রক্ষোভ ও মেজাজের সম্বন্ধ

(১) প্রক্ষোভের যেমন **নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তু** থাকে, মেজাজের তেমন **থাকে না।** মেজাজ যে কোনো বস্তুকে আশ্রয় করিয়া বাস্তব প্রক্ষোভরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। (২) প্রক্ষোভ যেমন একটি **বাস্তব অনুভূতি,** মেজাজ সেইরূপ **নয়।** মেজাজ একপ্রকার প্রক্ষোভ-প্রবণতা যাহা উপযুক্ত সময়ে নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তির সম্পর্কে বাস্তব প্রক্ষোভরূপে দেখা দিতে পারে। (৩) প্রক্ষোভের তুলনায় মেজাজ বা প্রক্ষোভপ্রবণতার **সুখদুঃখ অনুভূতি কম।** (৪) মেজাজ প্রক্ষোভের ন্যায় হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে, একটি চরম অবস্থায় পৌছিয়া, ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয় না। মেজাজ প্রক্ষোভের তুলনায় **অধিক স্থায়ী।**

প্রক্ষোভ ও মেজাজ **পরস্পর-সাপেক্ষ।** প্রক্ষোভের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির ফলে, উহার প্রবণতা বা মেজাজ জন্মিতে পারে। ক্রোধ প্রশ্রয় পাইলে, অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ক্রোধপ্রবণতা বা মেজাজ গঠিত হয়। আবার, প্রক্ষোভ মেজাজের ফলস্বরূপ দেখা দিতে পারে। রাগী লোক সহজেই চটিয়া যায়। সাহেবের দ্বারা অপমানিত বড় বাবু গৃহে ফিরিয়া নিরীহ পত্নীর উপর তাঁহার অপমানজনিত ক্রোধমেজাজ প্রকাশ করিতে পারেন।

মেজাজের কারণ

মেজাজের একটি কারণ, অতীত প্রক্ষোভফল। প্রক্ষোভকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে, উহা শরীর ও মনের উপর যে প্রভাব রাখিয়া যায়, তাহাই মেজাজের আকার গ্রহণ করে। যান্ত্রিক কারণেও মেজাজ গঠিত হইতে পারে। যেমন

বদ্‌হজম বা অজীর্ণ এবং অনিদ্রা বদ্‌মেজাজ এবং সুস্থ হজমক্রিয়া ও সুনিদ্রা মধুর মেজাজ উৎপন্ন করে। তাহা ছাড়া, আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির ক্রিয়া মেজাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণ, রক্তচলাচল এবং শ্বাসক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা মেজাজকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

স্বভাব (ডিস্‌পজিপন্‌) ও মেজাজ

(১) মেজাজ যেমন প্রক্ষোভের তুলনায় বেশী স্থায়ী প্রবণতাবিশেষ, তেমন স্বভাবও (ডিস্‌পজিশন্‌) মেজাজের তুলনায় **অধিক স্থায়ী** প্রবণতা। মেজাজ বড জোর একদিন বা আরও কিছু বেশী কাল স্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু স্বভাব ব্যক্তির আজীবন সঙ্গী। (২) স্বভাব মেজাজের তুলনায় **গভীরতর মানসস্তরে** নিহিত। (৩) স্বভাব মেজাজের মত যে কোনো অছিলার সুযোগ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে না, কিন্তু **উপযুক্ত বিষয়** অবলম্বন কবিয়া প্রকাশিত হয়। (৪) মেজাজ অর্জিত বা বাস্তব প্রক্ষোভলব্ধ প্রবণতা। কিন্তু প্রক্ষোভ-স্বভাব **অর্জিত এবং জন্মগত উভয়ই** হইতে পারে। ইহা কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি প্রক্ষুব্ধ হইবার স্থায়ী প্রবণতা। মাতৃত্ব নারীর পক্ষে একটি জন্মগত প্রক্ষোভ-স্বভাব। (৫) আবার প্রক্ষোভের তুলনায় যেমন মেজাজ, মেজাজের তুলনায় তেমন স্বভাব, কম সুখদুঃখ-বেদনাশীল। **প্রক্ষোভের বেদনা স্পষ্ট, মেজাজের অস্পষ্ট** এবং **স্বভাবের আরও অস্পষ্ট।**

আয়ান বা ধাত্‌ (টেম্‌পারামেণ্ট্‌), মেজাজ ও স্বভাব

আয়ান বা ধাত্‌ শুধু প্রক্ষোভ, প্রক্ষোভ-প্রবণতা বা স্বভাবই বুঝায় না। ইহার অর্থ অধিকতর **ব্যাপক**। ইহাতে অবগতি এবং ইচ্ছাও স্থান অধিকার করে, যদিও ইহাতে প্রক্ষোভই প্রধান। পক্ষান্তরে, প্রক্ষোভে এবং প্রক্ষোভ-প্রবণতায়, জ্ঞান ও ইচ্ছামূলক বৃত্তি নগণ্য স্থান অধিকার করে।

আয়ান **জন্মগত** এবং ব্যক্তির মানসিক গঠনের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। পক্ষান্তরে, প্রক্ষোভের সহিত ব্যক্তির **মানসগঠনের সম্বন্ধ** নাই বলিলেই চলে, কারণ মূল প্রক্ষোভগুলি সকল ব্যক্তিতেই সমান। মেজাজের সহিতও মানসিক গঠনের সম্বন্ধ অল্প। মেজাজ আত্মপ্রকাশ করিয়াই শরতের মেঘের মত মিলাইয়া যায়। আবার, স্বভাবের সহিত মানসগঠনের সম্বন্ধ

আয়ানের মত গভীর এবং ব্যাপক নয়। প্রক্ষোভ-স্বভাব ব্যক্তির সর্বাংশকে স্পর্শ করে না, কিন্তু করে তাহার অনুভূতিকে।

আয়ানের গভীরতা, ব্যাপকতা এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে উহার সহিত ব্যক্তির মানসিক এবং দৈহিক গঠনের অঙ্গাঙ্গিভাবের উপর। গ্যালেন্ প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণ দেহের চারটি ধাতুর সহিত জড়িত **চার শ্রেণীর আয়ানের** উল্লেখ করিয়াছেন—যথা কোলেরিক্, স্যাঙ্গুইন্, ফ্লেম্যাটিক এবং মেলাঙ্কোলিক্।[১]

যে ব্যক্তির চিন্তা দ্রুত এবং সুখদুঃখ অনুভূতি প্রবল, সে **কোলেরিক্,** যে ব্যক্তির চিন্তা দ্রুত কিন্তু সুখদুঃখ অনুভূতি দুর্বল, সে **স্যাঙ্গুইন্,** যাহার চিন্তা ধীর এবং অনুভূতি দুর্বল, সে **ফ্লেম্যাটিক্** এবং যাহার চিন্তা ধীর হইলেও অনুভূতি গভীর, সে **মেলাঙ্কোলিক্।** আবার রক্ত, পিত্ত, শ্লেষ্মা এবং প্লীহার আধিক্য এই সকল আয়ানের লক্ষণ। প্রাচীন বিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন যে স্যাঙ্গুইন্ ব্যক্তির রক্তাধিক্য, কোলেরিক্-এর পিত্তাধিক্য, ফ্লেম্যাটিক্-এর শ্লেষ্মাধিক্য এবং মেলাঙ্কোলিক্-এর প্লীহাধিক্য থাকে। এই চারটি ছাড়াও, একটি পঞ্চম প্রকারের আয়ান উল্লেখযোগ্য যথা **স্নায়বিক** (নার্ভাস্)। এই আয়ান-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে স্নায়ুরসের আধিক্য থাকে। আয়ুর্বেদ মতে ব্যক্তির তিনটি মৌলিক ধাতুর, যথা বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার প্রাধান্য অনুসারে তাহার আয়ানও তিন শ্রেণীর—যথা **বায়ু-প্রধান, পিত্ত-প্রধান** এবং **শ্লেষ্মা-প্রধান।**

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণের প্রাধান্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের আয়ান উৎপন্ন হয়। এই গ্রন্থিগুলি হইতে নিঃসৃত শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া ব্যক্তির মন ও শরীরকে প্রভাবিত করে। যেমন থাইরয়েড্ গ্রন্থির অধিক রসক্ষরণ ব্যক্তিকে চঞ্চল এবং অতিসক্রিয় আবার উহার অল্প রসক্ষরণ নিষ্ক্রিয় এবং মন্দবুদ্ধি করিয়া তোলে।[২]

অতিরাগ (প্যাশন্)

অতিরাগ (প্যাশন্) কথাটি দ্ব্যর্থবোধক। ইহার সাধারণ অর্থ **নিষ্ক্রিয় বেদনা।** ইহা (১) যে কোনো প্রক্ষোভ, (২) প্রবল প্রক্ষোভ, যেমন

১ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের—২ অনুচ্ছেদ (পৃঃ ২২৬) এবং ৩ অনুচ্ছেদ (পৃঃ ২৩৪-২৩৫) দ্রষ্টব্য।

২ ,, ,, —১ অনুচ্ছেদ (পৃঃ ২২৬-২২৭) দ্রষ্টব্য।

তীব্র ক্রোধ বা দ্বেষ, (৩) প্রবল এবং বদ্ধমূল প্রক্ষোভ-স্বভাব, যেমন তীব্র প্রতিহিংসা এবং (৪) কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি অন্ধ আসক্তি, যেমন স্ত্রৈণ ব্যক্তির স্ত্রীর প্রতি, বিজ্ঞানীর অঙ্কের প্রতি অথবা খেলোয়াড়ের খেলার প্রতি আসক্তি, প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এই সকল অর্থভেদ সত্ত্বেও **অতিরাগ বুঝায় এইরূপ মেজাজ অপেক্ষা প্রবলতর প্রক্ষোভ-প্রবণতা যাহা ব্যক্তিকে অল্পকালেই অবসন্ন করিয়া ফেলে।** হেফ্‌ডিং-এর মতে অতিরাগ এবং প্রক্ষোভস্বভাব প্রায় সমার্থক। ইহারা উভয়েই বুঝায় অনুভূতি-প্রবণতা। কিন্তু উহারা পৃথক, কারণ অতিরাগে ক্রিয়ামূলক আবেগ প্রক্ষোভ-স্বভাব অপেক্ষা বেশী। ইহাতে **অনুভূতির সহিত ক্রিয়া-প্রবণতা অথবা সক্রিয়তা বর্তমান থাকে।**

৩। প্রক্ষোভের শ্রেণীভেদ

অনুভূতিকে প্রথমতঃ, সংবেদনজ বেদনা এবং ভাবজ প্রক্ষোভ, এই দুই শ্রেণীতে এবং সংবেদনজ বেদনাকে, আবার, যান্ত্রিক সংবেদনজ এবং সুখদুঃখবেদনা, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। সকল যান্ত্রিক এবং বিশেষ সংবেদনই সুখদুঃখাত্মক রাগে (হেডনিকটোন্) রঞ্জিত হয়।

ভাবজ অনুভূতি অথবা প্রক্ষোভকে আবাব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় —যথা সাধারণ প্রক্ষোভ এবং বিশেষ প্রক্ষোভ। সাধারণ প্রক্ষোভ, যেমন হর্ষ এবং বিষাদ, সকল ব্যক্তিই অনুভব করে। বিশেষ প্রক্ষোভগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে। বিশেষ প্রক্ষোভ আবাব ব্যক্তিগত বা মূর্ত এবং নৈর্ব্যক্তিক বা অমূর্ত ভেদে দুই প্রকার। ব্যক্তিগত বা মূর্ত প্রক্ষোভ স্বার্থকেন্দ্রিক (ইগোইষ্টিক্) এবং পরার্থপর (আল্‌ট্রুইষ্টিক্) ভেদে দুই শ্রেণীর হইতে পারে। প্রথমটি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহকে কেন্দ্র করিয়া ঘটে। ভয়, ক্রোধ, ঘৃণা, হিংসা, অহঙ্কার প্রভৃতি ব্যক্তিগত বা স্বার্থকেন্দ্রিক প্রক্ষোভ। অপব পক্ষে সহানুভূতি, ভালবাসা, দয়া, পিতৃস্নেহ, মাতৃস্নেহ, দেশপ্রেম, বন্ধুবাৎসল্য প্রভৃতি ব্যক্তিগত অথচ পরার্থপর বা সামাজিক প্রক্ষোভ। অন্যদিকে নৈর্ব্যক্তিক প্রক্ষোভে ব্যক্তির স্থান নাই। নৈর্ব্যক্তিক প্রক্ষোভকে রস (সেন্টিমেণ্ট্) বলে। ইহারা আবার তিন শ্রেণীর—যথা জ্ঞানাত্মক বস অথবা সত্যপ্রেম, অনুভূতি-মূলক বা সৌন্দর্যমূলক রস বা সৌন্দর্যপ্রেম এবং ইচ্ছা বা চরিত্রমূলক রস অথবা ন্যায়প্রেম।

প্রক্ষোভের উপরোক্ত শ্রেণীভেদে ডঃ হেন্‌রী স্টিফেন্‌-এর মত অনুসরণ করা হইয়াছে। এই শ্রেণীভেদটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যাইতেছে।
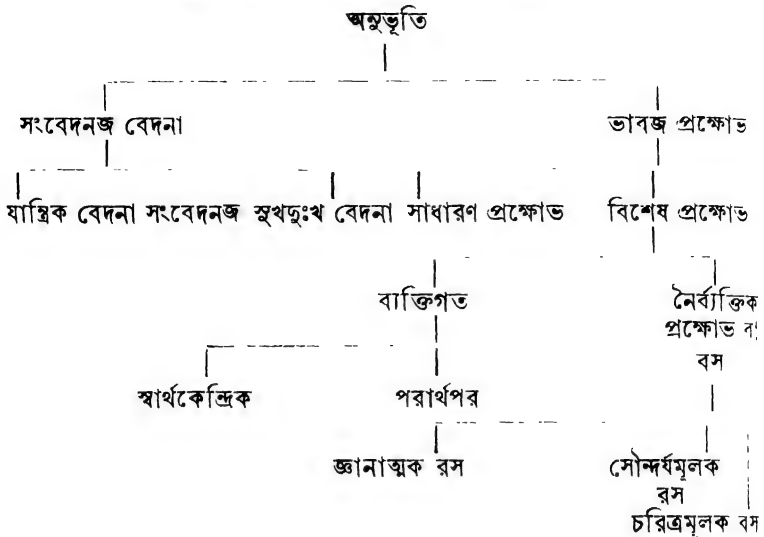
৪। প্রক্ষোভের গঠন

প্রক্ষোভের স্বরূপ বুঝিতে হইলে কয়েকটি প্রধান প্রক্ষোভের মানস এবং শারীর লক্ষণগুলির বিশ্লেষণ আবশ্যক।

(ক) ভয় (ফিয়ার্‌)

চার্লস্‌ ডারুইন্‌ তাঁহার "অন্‌ দি এক্সপ্রেশন্‌ অফ্‌ ইমোশন্‌ ইন্‌ ম্যান্‌ অ্যাণ্ড্‌ অ্যানিম্যাল্‌স্‌" গ্রন্থে **ভয়ের** যে **বিশ্লেষণ** করিয়াছেন তাহা এই :—

"চোখ মুখ বিস্তৃত হয় এবং ভ্রূযুগল উপরে ওঠে। ভীত ব্যক্তি প্রথমে প্রাণহীন মূর্তির মত নিশ্চল এবং নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া থাকে অথবা হামাগুড়ি দিয়া দৃষ্টির অন্তরালে সরিয়া পড়ে। তাহার বুক সজোরে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতে থাকে এবং পাঁজরার গায়ে স্পন্দিত হয় বা ধাক্কা দেয় ; কিন্তু এই অবস্থায় ইহা দেহের সর্বাংশে বেশী রক্ত প্রেরণ করিয়া অস্বাভাবিকরূপে কার্যকর হয় কি না তাহা অনিশ্চিত, কারণ মূর্ছার প্রথম অবস্থার মত ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে চর্ম ফ্যাকাসে হইয়া যায়।

"উপরকার এই বিবর্ণতা হয়ত রক্তবাহ কেন্দ্র (ভ্যাসোমোটর্ সেণ্টার্) প্রভাবিত হইয়া চর্মের ক্ষুদ্র ধমনীগুলিকে সঙ্কুচিত করিবার ফলে ঘটে। নিদারুণ ভয়ে যে চর্ম বিশেষরূপে প্রভাবিত হয় তাহা বুঝা যায়, যখন চর্ম হইতে অদ্ভুত এবং অবোধ্য রকমের ঘাম বাহির হইতে থাকে। ঘাম বাহির হওয়া আরও আশ্চর্যজনক এই জন্য যে চর্ম শীতল থাকে এবং ঘামও ঠাণ্ডা, অথচ স্বেদগ্রন্থিগুলির ক্রিয়ার উদ্দীপনা নির্ভর করে চর্মের উত্তাপের উপর।

"চর্মরোমগুলি দাঁড়াইয়া ওঠে। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়। লালাগ্রন্থিগুলি ঠিক মত কাজ করে না এবং মুখ শুকাইয়া যায়।...দেহের সকল পেশীই কম্পিত হয়। প্রথমেই ওষ্ঠ কাঁপিতে থাকে। ..কণ্ঠস্বর বাধিয়া যায় বা অস্পষ্ট হয় বা একেবারেই কণ্ঠরোধ ঘটে। ভয় তীব্রতর হইয়া আতঙ্কে পরিণত হইলে...হৃদয় উদ্দামভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে অথবা নিষ্ক্রিয় হইয়া যায় এবং মূর্ছা ঘটে, মৃতের বিবর্ণতা দেখা দেয়, শ্বাসকৃচ্ছ্র অনুভূত হয় এবং নাসারন্ধ্রের পক্ষদ্বয় অত্যন্ত বিস্তৃত হয়।...মুক্ত এবং ঠিক্‌রাইয়া-পড়া চক্ষুগোলক ভয়ের বস্তুতে নিবদ্ধ হয়, অথবা অস্থির-ভাবে এক দিক হইতে আর একদিকে ঘুরিতে থাকে। তারারন্ধ্র অত্যন্ত বিস্তৃত হয়। দেহের পেশীগুলি শক্ত হয় অথবা যেমন তড়কায় ঘটে, তেমন খিঁচাইতে থাকে।

"হাত দুইটি একবার মুষ্টিবদ্ধ হয় আর একবার খুলিয়া যায়। হাত দুইটি যেন কোনো ভয়ঙ্কর বিপদ এড়াইবার জন্য প্রসারিত হইতে পারে অথবা উহারা উদ্দামভাবে মাথার উপয় নিক্ষিপ্ত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে সোজা পালাইয়া যাইবার আকস্মিক এবং দুর্দমনীয় প্রবণতা দেখা দেয়।"

আসন্ন বিপদরূপে প্রত্যক্ষ বা কল্পিত কোনো পরিস্থিতিই ভয়ের বস্তু। **মনের দিক** হইতে প্রথমেই ঘটে একটি কেন্দ্রীয় বা মস্তিষ্কগত ক্রিয়া, যাহা ভীতিজনক পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ বা ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট। ভীত ব্যক্তির ঐচ্ছিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয় পেশীজ ক্রিয়ায় এবং তাহার চিন্তনের বিষয় হইয়া দাঁড়ায় ভীতিজনক পরিস্থিতিটি। অস্বাভাবিক উত্তেজনা এবং আভ্যন্তরীণ উত্তেজনার ফলে সর্বাঙ্গীণ অস্বস্তি অনুভূত হয়। স্টাউট্ বলিয়াছেন, ভয় শুধু যে আসন্ন বিপদ হইতে ঘটে তাহাই নয়, কিন্তু "কোনো অদ্ভুত, আকস্মিক, প্রবলভাবে আক্রমণকারী ঘটনার চমকপ্রদ অথবা উদ্বেগজনক ফল হিসাবেও ঘটিয়া থাকে।" দৃষ্টান্ত হিসাবে ভূতের ভয় উল্লিখিত হইতে পারে। জ্ঞানের

নিম্নতর অবস্থায় ভয়ের যান্ত্রিক প্রকাশ প্রবল আকারে দেখা যায়, কিন্তু উচ্চতর অবস্থায় উহার প্রবলতা কমিয়া যায়।

(খ) ক্রোধ (অ্যাঙ্গার্)

ডারুইন্‌-প্রদত্ত ক্রোধের দৈহিক ও মানসিক লক্ষণের বর্ণনা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

ক্রোধে হৃদ্‌যন্ত্র এবং রক্তচলাচল পরিবর্তিত হয়—মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, কপাল এবং গলার শিরা স্ফীত এবং রক্ত মাথায় চালিত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিও পরিবর্তিত হয়, বুক দুলিতে এবং স্ফীত নাসারন্ধ্র কাঁপিতে থাকে। দেহ সক্রিয় হইবার প্রস্তুতি হিসাবে সোজা হয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শক্ত হইয়া অপমানকারীর উপর ঝুঁকিয়া পড়ে। দৃঢ় ও স্থির সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া মুখ বন্ধ থাকে এবং দন্ত আবদ্ধ হয় অথবা দন্তে দন্তে ঘর্ষণ চলিতে থাকে। অপমানকারীকে আঘাত করিবার জন্য মুষ্টিবদ্ধ হাত তোলা, তাহাকে চলিয়া যাইতে বলা, ধাক্কা দেওয়া, আঘাত করা, এমন কি প্রাণহীন বস্তুকেও আঘাত বা আছাড় দেওয়া ক্রোধের সাধারণ লক্ষণ। ক্রুদ্ধ শিশুরা উপুড় বা চিৎ হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া চীৎকার করিতে থাকে এবং নাগালের মধ্যে যে বস্তু পায় তাহা আঁচড়াইতে, লাথি মারিতে অথবা কামড়াইতে থাকে।

কিন্তু ক্রোধে পেশীতন্ত্র অন্যভাবে সক্রিয় হয়। প্রবল ক্রোধে পেশীর কম্পন ঘটিয়া থাকে। ওষ্ঠ অসাড়, কণ্ঠ রুদ্ধ অথবা উচ্চ এবং কর্কশ হইয়া পড়ে। ক্রুদ্ধ অবস্থায় বেশী কথা বলিলে, মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতে থাকে। ক্রোধে চুল কণ্টকিত এবং কপাল মাঝে মাঝে কুঞ্চিত হয়। চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়ে এবং কোটর হইতে যেন চোখ বাহির হইয়া আসিতে চায়।

মনের দিক হইতে ক্রোধ বিরুদ্ধতা বা প্রতিকূলতা চূর্ণ করিতে চায়। এই প্রক্ষোভটির লক্ষণ হইল সক্রিয় বিরোধিতা এবং আক্রমণ, যেমন ভয়ের লক্ষণ হইল অসহায়বোধ এবং পলায়ন। জ্ঞানের নিম্নতর অবস্থায় ক্রোধ নিকটবর্তী সকল বস্তুকেই ভাঙ্গিতে, ছিঁড়িতে এবং ধ্বংস করিতে চায়। যেমন একই দলভুক্ত একটি কুকুরের ডাকে অন্যান্য কুকুর ক্রুদ্ধ হয় এবং আক্রমণ করিবার মত কিছু না দেখিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া বসে। কিন্তু জ্ঞানের উচ্চতর স্তরে ক্রোধ অধিকতর জটিল আকার ধারণ করে এবং চিন্তন বিকাশের ফলে বাস্তব কারণে সীমাবদ্ধ হয়।

স্টাউট্ মনোবিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলির সহিত সম্বন্ধ ক্রোধের বিভিন্ন আকারগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। **প্রাথমিক স্তরে** যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া ক্রোধ যে কোনো বস্তুর দিকেই ধাবিত হয়। **জ্ঞানমূলক চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে** ক্রোধের প্রকাশ স্পষ্টতর হইয়া ওঠে। এই অবস্থায় ক্রোধ সম্মুখস্থ যে কোনো বস্তুর দিকে আর চালিত হয় না, কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রোধের কারণ তাহার দিকে চালিত হয়। শারীরিক বলপ্রয়োগই ক্রোধ-প্রকাশের সাধারণ উপায়। কিন্তু **উচ্চতর মানসবিকাশের স্তরে** শারীরিক বল প্রয়োগের পরিবর্তে বিরুদ্ধ শক্তিগুলি যে আমাদের শক্তির নিকট পরাভূত হইয়াছে এই কল্পনা বা জ্ঞানই হযত যথেষ্ট। চিন্তনেব বিকাশই এইরূপ কল্পনা বা জ্ঞানের কারণ।

ক্রোধ এবং ভয় এই দুইটি প্রক্ষোভকে ক্যানন্ জরুরী প্রক্ষোভ (এমার্জেন্সি ইমোশন্) বলিয়াছেন। ক্রোধ জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হইয়া উহাকে পরাভূত করিবার চেষ্টা করে এবং ভয় উহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পাবিয়া পলায়ন প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। ভয়ের তুলনায় ক্রোধ অধিকতর বলশালী। আবার প্রথমটিব তুলনায় দ্বিতীয়টি অধিকতর বহিক্ষ্রিয় এবং কম দুঃখদায়ক প্রক্ষোভ।

(গ) হর্ষ ও বিষাদ

সুখ দুঃখ বেদনার তুলনায় হর্ষ ও বিষাদ উন্নততর অনুভূতি, কারণ ইহারা উৎপন্ন হয় কোনো সমগ্র পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ, কল্পনা বা চিন্তন হইতে। কোনো ইচ্ছার বা ইচ্ছামূলক প্রবণতাব পরিপূর্তি হইলে, হর্ষ এবং উহাব ব্যর্থতা ঘটিলে, বিষাদ উপস্থিত হয়।

হর্ষ ও বিষাদ সকল প্রক্ষোভের মূলগত অনুভূতি, কারণ সকল প্রক্ষোভই হর্ষ অথবা বিষাদের দ্বারা অনুরঞ্জিত হয। কিন্তু **ম্যাকৃডুগ্যাল্**-এর মতে হর্ষ ও বিষাদ মৌলিক প্রক্ষোভ নয়। তিনি বলেন যে ইহারা উৎপন্ন (ডিরাইভ্ড্) প্রক্ষোভ অথবা তাঁহার মতে হর্ষ ও বিষাদ ইচ্ছার পুরণ অথবা অপূরণ হইতে উদ্ভূত হয়। বিষাদ সাধারণতঃ পশ্চাদ্দর্শী (রেট্রস্পেক্টিভ্) প্রক্ষোভ, কাবণ ইহা পশ্চাতে তাকায়। অতীত ব্যর্থতা হইতেই দুঃখের বা বিষাদেব উৎপত্তি। আবার হর্ষ প্রধানতঃ সম্মুখদর্শী (প্রস্পেক্টিভ্), ইহা সম্মুখে তাকায়, কারণ ইচ্ছার পরিপূর্ণতা হইতেই হর্ষের উৎপত্তি।

শরীরের উপর হর্ষ ও বিষাদের **ক্রিয়া** বিপরীত। এই ক্রিয়া সুখদুঃখ বেদনার অনুরূপ, যদিও অধিকতর জটিল এবং সর্বাঙ্গীণ। নাড়ী, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচলাচল, হজমক্রিয়া প্রভৃতির উপর হর্ষ সুস্থ প্রভাব এবং বিষাদ অসুস্থ প্রভাব বিস্তার করে।

ইহাদের **প্রকাশও** বিপরীত। হর্ষান্বিত ব্যক্তি সোজা হইয়া দাঁড়ায়। তাহার বক্ষ প্রসারিত হয়, চোখ উজ্জ্বল এবং মুখমণ্ডল হাস্যময় হয়। সে হয়ত আনন্দে লাফাইয়া ওঠে, অন্য ব্যক্তির সহিত বেশী মেলামেশা করে। আবার বিষাদগ্রস্ত ব্যক্তির চক্ষু দিয়া জল বাহির হয়, সে দুঃখভারে নোয়াইয়া পড়ে, তাহার বক্ষ সঙ্কুচিত হয় এবং দেহ শিথিল হইয়া বা এলাইয়া পড়ে।

(ঘ) ভালবাসা

ভালবাসা প্রক্ষোভটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **সঙ্কীর্ণ অর্থে** ইহা যৌন বা কামজ লিপ্সার নামান্তর। এই ভালবাসা সাধারণতঃ স্বার্থপর, কারণ ব্যক্তির নিজ কামনা পরিতৃপ্ত হইলেই ইহার অবসান ঘটে।

ব্যাপক অর্থে ভালবাসা একটি পরার্থপর বা সামাজিক প্রক্ষোভ। অনুরাগ এবং সহানুভূতি ইহার প্রধান লক্ষণ। ভালবাসায় এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সুখদুঃখের সহিত আপন সুখদুঃখ অভিন্ন অনুভব করে, উহাকে আদর করে এবং সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখে। মাতৃস্নেহ ভালবাসার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। উচ্চতর স্তরে কোনো আদর্শ ভালবাসার বস্তু হইতে পারে—যেমন ভক্তের ভালবাসা ভগবানের প্রতি অথবা শিল্পীর ভালবাসা সৌন্দর্যের প্রতি। এই উচ্চতর অনুভূতিগুলি প্রক্ষোভের তুলনায় উন্নততর রস (সেন্টিমেন্ট্)।

(ঙ) ঘৃণা

ভালবাসার বিপরীত প্রক্ষোভ হইল ঘৃণা। ঘৃণ্য বস্তু বা ব্যক্তি আকর্ষণ না করিয়া আমাদিগকে দূরে সরাইয়া রাখে।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্-এর মতে ঘৃণা মৌলিক নয়, কিন্তু যৌগিক প্রক্ষোভ। ইহাতে মিশ্রিত থাকে ক্রোধ, ভয় এবং বিতৃষ্ণা। ভালবাসা সুস্থ কিন্তু ঘৃণা হইল অসুস্থ প্রক্ষোভ। প্রথমটিতে আমাদের সত্তা প্রসারিত কিন্তু দ্বিতীয়টিতে ইহা সঙ্কুচিত

হয়। আবার প্রথমটি পরার্থপর বা সামাজিক এবং গঠনমূলক, কিন্তু দ্বিতীয়টি স্বার্থপর, অসামাজিক এবং ধ্বংসমূলক প্রক্ষোভ।

(চ) সহানুভূতি (সিম্প্যাথি)

অপরের অনুভূতির সহিত নিজ অনুভূতির নাম সহানুভূতি। অপরের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হওয়াই সহানুভূতির লক্ষণ।

সহানুভূতি একটি পরার্থকেন্দ্রিক প্রক্ষোভ। ইহা সহজাত, অনৈচ্ছিক এবং সকলের, এমন কি শিশুর মধ্যেও, দেখা যায়। শিশু তাহার মাতাকে হাসিতে দেখিলে হাসে এবং কাঁদিতে দেখিলে কাঁদে। অনুকরণ প্রবৃত্তিই সহানুভূতির মূল কারণ। একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করিলেই, দলের অন্যান্য কুকুর সহজাত অনুকরণ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া ঘেউ ঘেউ করে।

উচ্চতর সহানুভূতিতে যেমন পরের সুখদুঃখের অনুভূতি ঘটে, তেমন অবগতিমূলক এবং ইচ্ছামূলক মানসবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। সুখদুঃখ প্রভৃতির বহিঃ-প্রকাশের প্রত্যক্ষ, অর্থবোধ, নিজকে অপরের অবস্থায় কল্পনা করা এবং চিন্তন সাহায্যে অপরের অনুভূতি বুঝিতে পারা, এই সবগুলিই অনুভূতির কারণ।

সহানুভূতি সম্ভব হয় সম-অবস্থাযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে। ক্রোরপতি দরিদ্রকে করুণা করিতে পারে, কিন্তু দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হইতে পারে না। সম-অবস্থার ব্যক্তিই নিজকে অপরের অবস্থায় কল্পনা করে।

সমানুভূতি (এম্প্যাথি)[১]

সহানুভূতি এবং সমানুভূতির পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। সহানুভূতিতে দুই ব্যক্তির মধ্যে 'সাহিত্য' বা সাদৃশ্য অনুভূতি হয়। ইহাতে এক ব্যক্তি নিজকে অপর ব্যক্তির সহিত অভিন্ন অথবা এক বলিয়া বোধ করে না। কিন্তু সমানুভূতিতে এক ব্যক্তি যেন অপরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত একাত্মতা বা অভিন্নতা বোধ করে। শিশুরা ঘুড়ি উড়াইয়া আনন্দ পায়, কারণ তাহারা উহার সহিত এমন অভিন্নতা বোধ করে যে তাহাদের মনে হয় যেন তাহারাই আকাশে ঘুড়ি হইয়া উড়িতেছে। কল্পনায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব অতিক্রম করিয়া, তাহারা আনন্দ অনুভব করে।

---

১ উড্ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস্—সাইকলজি (প্রথম এশীয় সংস্করণ), পৃঃ ৩৩৯—৩৪০

৫। প্রক্ষোভের প্রচলিত কেন্দ্রীয় মতবাদ (ট্রেডিশন্যাল্, সেণ্ট্র্যাল্ থিওরি অফ্ ইমোশন্)

প্রক্ষোভের বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া যায় :—

(১) কোনো প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণা, যাহা প্রক্ষোভ উৎপন্ন করে, (২) এই মানস ক্রিয়াগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট কতগুলি কেন্দ্রীয় বা মস্তিষ্কগত ক্রিয়া, (৩) প্রক্ষোভের সুখ-দুঃখাত্মক অনুভূতি, (৪) এই অনুভূতির সহকারী কতগুলি শারীর প্রকাশ, যেমন নাড়ী, শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদ্‌যন্ত্র, রক্তসঞ্চালন, অন্তঃক্ষরা এবং বহিঃক্ষরা গ্রন্থির রসক্ষরণ, পেশীজ ক্রিয়ার পরিবর্তন এবং (৫) প্রক্ষোভ-অনুভূতির ফলস্বরূপ প্রতিক্রিয়া।

উদাহরণ

কেহ হয়ত বাঘ দেখিয়া ভয় পাইল। ব্যাঘ্রপ্রত্যক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ভীতিজনক পরিস্থিতির উপলব্ধি পর্যন্ত মানস ক্রিয়াগুলি দুঃখবেদনাময় এবং ইহারা সাধিত হয় কতগুলি মস্তিষ্কীয় বা কেন্দ্রীয় ক্রিয়ার সহযোগিতায়। ব্যাঘ্র-দর্শনের ফলে শরীরযন্ত্রের নানা পরিবর্তন হইল, যেমন ভীত ব্যক্তির মুখ বিবর্ণ হইয়া বা শুকাইয়া গেল, বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, হাতপা অসাড় বোধ হইল এবং সে পলায়ন করিল, বা মূর্ছিত হইল।

প্রক্ষোভের উল্লিখিত ব্যাখ্যা ঐ সম্বন্ধে প্রচলিত (ট্রেডিশন্যাল্) কেন্দ্রীয় (সেণ্ট্র্যাল্) মতবাদেই প্রযোজ্য। প্রক্ষোভের প্রচলিত মতবাদ অনুসারে ইহার প্রথম এবং প্রধান কারণ হইল কোনো বস্তু, ব্যক্তি বা পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণা। এই কারণটি মুখ্যতঃ কেন্দ্রীয় বা মস্তিষ্কগত, যেহেতু প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণা দৈহিক দিক হইতে নার্ভকেন্দ্রের বা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধ। প্রক্ষোভ উৎপন্ন হইলেই উহার ফলস্বরূপ নানা যান্ত্রিক, গ্রন্থীয়, এবং পেশীজ সংবেদন বা প্রকাশ ঘটে এবং ইহাদের ফলে প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে, **প্রচলিত মত অনুসারে প্রথমে প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণা, এই কেন্দ্রীয় ক্রিয়াগুলি ঘটে, উহাদের ফলে প্রক্ষোভ উৎপন্ন হয়, আবার প্রক্ষোভের ফলে দেহযন্ত্রীয় নানা প্রকাশ দেখা দেয় এবং উহাদের ফলে প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া ঘটে।**

কিন্তু জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ প্রক্ষোভের প্রচলিত মত স্বীকার করেন নাই।

৬। প্রক্ষোভের জেম্‌স্‌-ল্যাঙ্গ্‌ মতবাদ
(জেম্‌স্‌-ল্যাঙ্গ্‌ থিওরি অফ্‌ ইমোশন্‌)

অ্যামেরিকান মনোবিৎ উইলিয়াম্‌ জেম্‌স্‌ এবং ড্যানিশ্‌ শারীরবৃত্তবিৎ সি. জি. ল্যাঙ্গ্‌ প্রক্ষোভের যে মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা প্রচলিত বা কেন্দ্রীয় মতবাদের বিপরীত। জেম্‌স্‌ এবং ল্যাঙ্গ্‌ স্বাধীনভাবে, যথাক্রমে ১৮৮৪ এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, প্রক্ষোভের যে দুইটি মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন উহারা আসলে অভিন্ন, সুতরাং যুক্তভাবে জেম্‌স্‌-ল্যাঙ্গ্‌ মতবাদরূপে পরিচিত।

জেম্‌স্‌-ল্যাঙ্গ্‌ মনে করেন যে প্রক্ষোভের উদ্দীপক কারণ প্রথমেই প্রক্ষোভ উৎপন্ন করে না, অথবা প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণা জাতীয় কেন্দ্রীয় ক্রিয়ার ফলে প্রক্ষোভ ঘটে না। **এই মতানুসারে প্রক্ষোভের উদ্দীপক কারণ প্রথমেই আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রের নার্ভকেন্দ্রকে উদ্দীপিত করিয়া নানাপ্রকার যান্ত্রিক সংবেদন ঘটায় এবং এই যান্ত্রিক সংবেদনগুলির যে মানসবৃত্তি উৎপন্ন হয় তাহাই প্রক্ষোভ। প্রচলিত মতানুসারে প্রকাশের কারণ প্রক্ষোভ, কিন্তু জেম্‌স্‌-ল্যাঙ্গ্‌ মতানুসারে প্রক্ষোভের কারণ প্রকাশ।**

জেম্‌স্‌-এর প্রসিদ্ধ মনোবিদ্যাগ্রন্থ "প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্‌ অফ্‌ সাইকলজি" হইতে তাহার মতব্যাখ্যার একটি প্রসিদ্ধ অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"এই স্থূল প্রক্ষোভগুলি সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ চিন্তাধারা এই যে কোনো ঘটনার মানসিক প্রত্যক্ষ প্রক্ষোভ নামক মানস অনুভূতি উৎপন্ন করে এবং শেষোক্ত মানসবৃত্তি দৈহিক প্রকাশ ঘটায়। পক্ষান্তরে আমার মতবাদ এই যে উদ্দীপক ঘটনা প্রত্যক্ষ হইবার ঠিক পরেই দৈহিক পরিবর্তনগুলি ঘটিয়া থাকে এবং এই পরিবর্তনগুলি ঘটিবার ফলে উহাদের যে অনুভূতি হয় তাহাই প্রক্ষোভ। সাধারণ জ্ঞানবশে আমরা বলিয়া থাকি যে আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখিত হইয়া কাঁদি, ভালুকের সাক্ষাৎফলে ভীত হইয়া পলায়ন করি, প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট অপমানিত হইয়া ক্রোধবশে তাহাকে আঘাত করিয়া বসি। কিন্তু যে মতটি বর্তমানে সমর্থিত হইতেছে তদনুসারে এই ঘটনাক্রম ভ্রান্ত। একটি মানসবৃত্তি আর একটি মানসবৃত্তির দ্বারা প্রবর্তিত হয় না। দৈহিক প্রকাশগুলি উহাদের মধ্যবর্তী থাকে। এইরূপ বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত যে আমরা কাঁদি বলিয়াই দুঃখিত হই, আঘাত করি বলিয়াই ক্রুদ্ধ হই, কাঁপি বলিয়াই

ভীত হই, কিন্তু দুঃখিত, ক্রুদ্ধ এবং ভীত হই বলিয়া যথাক্রমে কাঁদি না, আঘাত করি না এবং কাঁপি না।"

জেম্‌স্ আরও বলিতেছেন, **"দৈহিক পরিবর্তনগুলি** যাহাই হউক না কেন, উহার প্রত্যেকটি ঘটিবামাত্র **তীক্ষ্ণ বা অস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়।"** আবার, **"আমরা যদি কোনো প্রবল প্রক্ষোভের কল্পনা করি** এবং **উহার চেতনা হইতে সকল দৈহিক লক্ষণগুলি বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করি,** আমরা দেখি যে **উহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। কোনো মানস 'উপাদানই' থাকে না যাহা দ্বারা প্রক্ষোভটি গঠিত হইতে পারে এবং যাহাও বা অবশিষ্ট থাকে তাহা শুধু একটি শুষ্ক এবং নিরপেক্ষ বুদ্ধিমূলক প্রত্যক্ষ ক্রিয়া।"** জেম্‌স্ আরও বলিতেছেন, **"আমার শরীর যদি অসাড় হইত, তাহা হইলে কি কোমল কি কঠোর সকল অনুভূতি হইতেই আমি বঞ্চিত হইতাম এবং শুধু অবগতি বা বুদ্ধিমূলক সত্তা বহন করিতাম।"**

জেম্‌স্-এর মতে "**প্রক্ষোভ-উৎপাদক বস্তু দৈহিক পরিবর্তন** ঘটায় **একটি পূর্বগঠিত দেহযন্ত্রের দ্বারা।** এই পরিবর্তন এমন সূক্ষ্ম এবং অসংখ্য যে সমগ্র দেহযন্ত্রকে বলা চলে একটি শব্দায়মান ফলক যাহাতে প্রত্যেকটি চেতনা-পরিবর্তন ঝঙ্কৃত হয়।" অধিকন্তু "প্রত্যেকটি দৈহিক পরিবর্তন কতগুলি উপাদানের সমষ্টি। উপাদানগুলি হইল দেহযন্ত্রের পরিবর্তন এবং প্রত্যেকটি পরিবর্তনই উদ্দীপক বস্তুর প্রতিবর্তী ফল।"

তাহা হইলে জেম্‌স্-এর মতানুসারে **প্রত্যক্ষকে কেন্দ্র করিয়া** যে **যান্ত্রিক সংবেদনগুচ্ছ প্রতিবর্তরূপে উদ্দীপিত হয়, তাহাই প্রক্ষোভ।** মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমগ্র প্রক্ষোভচেতনাকে প্রতিবর্তরূপে উৎপন্ন যান্ত্রিক সংবেদনে পরিণত করা যায়।

সি. জি. ল্যাঙ্গ্-এর মত

জেম্‌স্-এর সহিত কোনোরূপে সম্পর্কিত না হইয়াই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সি. জি. ল্যাঙ্গ্ও মূলতঃ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। জেম্‌স্ এবং ল্যাঙ্গ্ উভয়ের মতেই প্রক্ষোভ কতগুলি শারীর প্রকাশ, পরিবর্তন বা সংবেদন মাত্র। **জেম্‌স্ যান্ত্রিক সংবেদনের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।** কিন্তু **ল্যাঙ্গ্ বাহুলিয়ামক (ভ্যাসো-মোটর্) পরিবর্তনের উপর বেশী**

জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন যে **প্রক্ষোভের উদ্দীপক যদি বাহ্যনিয়ামক যন্ত্রকে সক্রিয় না করিত তাহা হইলে আমরা উদাসীন বা নিস্পৃহ জীবন যাপন করিতাম।** এইরূপ অবস্থায় বাহ্যজগতের সংবেদন আমাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করিত এবং জ্ঞান বাড়াইত, কিন্তু না করিত সুখ উৎপাদন, না প্রবৃত্ত করিত ক্রোধে, না অবনমিত করিত উদ্বেগে, না অভিভূত করিত ভয়ে। প্রক্ষোভের জন্য বাহনিয়ামক যন্ত্রকেই ধন্যবাদ দিতে হয়।

সুতরাং ল্যাঙ্গ্-এর মতানুসারে প্রক্ষোভের দুইটি অংশ। প্রথমটি হইল উহার সংবেদনরূপ কারণ যাহা স্মরণের অথবা অনুষক্ত ধারণার সাহায্যে কাজ করে। আবার দ্বিতীয়টি হইল উহার কার্য, অর্থাৎ প্রতিবর্তরূপে উৎপন্ন বাহনিয়ামক পরিবর্তনগুলি, যেমন বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে রক্তসঞ্চালন এবং উহাদের উপর নির্ভরশীল মানসিক ও দৈহিক পরিবর্তনগুলি। তাঁহার মতেও এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কোনো বেদনা নাই। **প্রক্ষোভ শেষোক্ত পরিবর্তনগুলিরই নামান্তর।**

জেম্স্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তি

জেম্স্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি সংক্ষিপ্তভাবে এইপ্রকার :—

(১) **প্রক্ষোভ হইতে উহার শারীরপ্রকাশগুলির বেদনা বিচ্ছিন্ন করিলে প্রক্ষোভ থাকে না, থাকে একটি শুষ্ক এবং সুখদুঃখনিরপেক্ষ বুদ্ধিমূলক প্রত্যক্ষ।**

(২) **বস্তুশূন্য বা অমূলক প্রক্ষোভও (অব্জেক্টলেস্ ইমোশন্) প্রচলিত মতে ব্যাখ্যাত হয় না।** মানসরোগী বিনা কারণেই ভীত, ক্রুদ্ধ বা অন্যপ্রকারে প্রক্ষুব্ধ হইতে পারে। তাহার প্রক্ষোভের মূলে প্রায়ই বাস্তব প্রত্যক্ষ থাকে না, কিন্তু থাকে শুধু যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ। সুতরাং এই প্রকার 'ভাসমান' বা শূন্য প্রক্ষোভ আসলে যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশেরই নামান্তর।

(৩) **প্রক্ষোভের যান্ত্রিক প্রকাশের কৃত্রিম উৎপাদনে উহা উৎপন্ন হয়।** যেমন অভিনেতারা ক্রোধ, ভয়, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলির বহিঃ-প্রকাশ অনুকরণ করিয়া উহাদের অনুভব করিয়া থাকেন।

(৪) **প্রক্ষোভ এবং উহার যান্ত্রিক প্রকাশ অভিন্ন, কারণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভ বাড়িয়া যায়।** পলায়ন করিতে বা কাঁদিতে আরম্ভ করিলেই ভয় বা দুঃখ আরও পাইয়া বসে।

(৫) **প্রক্ষোভের প্রকাশ দমন করিলেই প্রক্ষোভ অন্তর্হিত হয়।** যেমন পলায়ন না করিলে অথবা না কাঁদিলে ভয় এবং দুঃখ তিরোহিত হয়।

এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে যান্ত্রিক প্রকাশ বা সংবেদন ঘটিলেই প্রক্ষোভ ঘটে এবং উহারা না ঘটিলে প্রক্ষোভ ঘটে না। সুতরাং প্রক্ষোভ প্রকাশ বা সংবেদনেরই নামান্তর।

৭। জেম্‌স্‌-ল্যাঙ্গ্‌ মতবাদের সমালোচনা

জেম্‌স্‌-ল্যাঙ্গ্‌ মতবাদ অভিন্ন। সুতরাং জেম্‌স্‌-এর মতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলি ল্যাঙ্গ্‌-এর মতের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য।

(১) জেম্‌স্‌ল্যাঙ্গ্‌ মতবাদ **নূতন নয়।** অ্যারিস্টট্‌ল্‌, মেল্‌ব্র্যান্স্‌, দেকার্তে, স্পিনোজা প্রভৃতি দার্শনিক যান্ত্রিক এবং বাহনিয়ামক সংবেদনই প্রক্ষোভ, এইরূপ মত ল্যাঙ্গ্‌ ও জেম্‌স্‌-এর বহুপূর্বে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

(২) জেম্‌স্‌-এর প্রথম যুক্তিতে বলা হইয়াছে যে কোনো প্রক্ষোভ হইতে উহার শারীর প্রকাশ বিচ্ছিন্ন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা প্রক্ষোভ নয়, কিন্তু শুষ্ক বুদ্ধিক্রিয়া। এই যুক্তিতে অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে **প্রক্ষোভ উহার যান্ত্রিক প্রকাশ হইতে অবিচ্ছেদ্য।**

জেম্‌স্‌ এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন। তিনি ইহার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রক্ষোভ এবং উহার যান্ত্রিক প্রকাশ অভিন্ন অথবা আসলে একই বস্তু। কিন্তু জেম্‌স্‌-এর এই সিদ্ধান্ত তাঁহার যুক্তি হইতে অনুসরণ করে না। **দুইটি বস্তু সংযুক্ত হইলেই উহারা অভিন্ন এইরূপ প্রতিপন্ন হয় না।** এই সমালোচনা প্রসঙ্গে স্টাউট্‌-এর বক্তব্য এইরূপ। একটি জলাশয়ে তরঙ্গ সৃষ্টি না করিয়া উহাতে ঢিল পড়িতে পারে না। কিন্তু ঢিল নিক্ষেপ এবং তরঙ্গ এক বা অভিন্ন নয়। অনুরূপ যুক্তিতে বলা যায় যে ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, শোক প্রভৃতি প্রক্ষোভ উহাদের যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ না ঘটিলে ঘটিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া উহারা এক বা অভিন্ন এইরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। **এইরূপ যুক্তিতে সহভাবের সহিত কার্যকারণভাবের ভ্রম (মিস্‌টেকিং কো-এক্‌জিস্‌টেন্‌স্‌ ফর্‌ কজেশন্‌) ঘটে।**

(৩) জেম্‌স্‌ বলিয়াছেন যে বস্তুশূন্য বা অমূলক প্রক্ষোভের মূলে কেন্দ্রীয় ক্রিয়া নাই (অর্থাৎ ইহা প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণা হইতে উৎপন্ন হয় না),

কিন্তু আছে শুধু বহিঃপ্রান্তীয় যান্ত্রিক প্রকাশ বা সংবেদন সুতরাং, এইরূপ প্রক্ষোভ অবশ্যই উহার যান্ত্রিক প্রকাশ বা সংবেদনের সহিত অভিন্ন।

বস্তুশূন্য বা অমূলক প্রক্ষোভ স্বভাবী জীবনে খুব কমই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু অস্বভাবী জীবনে ইহার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। মত্ততার কোনো অবস্থায় হয়ত মাতাল তাহার চারিদিকেই ইঁদুর ছুটিয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পায়। ভ্রম-বাতুল রোগী নানাপ্রকার অমূলক উদ্বেগ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি প্রক্ষোভ অনুভব করে, অথচ আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ অনুভূতির বাস্তব হেতু নাই।

কিন্তু অমূলক বা বস্তুশূন্য প্রক্ষোভের সত্যতা স্বীকার করিলেও, উহারা যে শুধু যান্ত্রিক প্রকাশ বা সংবেদনেরই নামান্তর, এইরূপ সিদ্ধান্ত অমূলক। আসলে মানসরোগীর এইরূপ **বস্তুশূন্য প্রক্ষোভের কারণ তাহার প্রক্ষোভ-স্বভাব যাহা অতীত প্রত্যক্ষ, কল্পনা অথবা ধারণা হইতে গঠিত হইয়াছে।**

মনোবিদ্যার দিক হইতে এই তথাকথিত বস্তুশূন্য প্রক্ষোভ আসলে বস্তুশূন্য বা নির্বিষয় নয়। মাতাল ইঁদুর দেখিতেছে, অথচ ইঁদুর নাই। এই ক্ষেত্রে কল্পিত ইঁদুরই প্রক্ষোভের বিষয়। সুতরাং **প্রক্ষোভ বস্তুশূন্য নয়।**

(৪) জেম্‌স্ বলেন যে যান্ত্রিক প্রকাশের কৃত্রিম উৎপাদনে প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ইহা স্বীকার করিলেও, এইরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক যে প্রক্ষোভ কৃত্রিম যান্ত্রিক প্রকাশের সহিত অভিন্ন। প্রথমতঃ, বুঝিতে হইবে কি উপায়ে কৃত্রিম যান্ত্রিক প্রকাশগুলি উৎপন্ন হয়। ইহারা উৎপন্ন হয় প্রক্ষোভের বিষয়ের কল্পনা, ধারণা বা চিন্তন হইতে। **যে অভিনেতা অভিনীত চরিত্রের সহিত কাল্পনিক একাত্মতা বোধ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষেই ঐ চরিত্রের অনুভূতি, আবেগ বা প্রক্ষোভের অভিনয় সম্ভব।** এই প্রক্ষোভ প্রথমে অস্পষ্ট। উহার প্রকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া উহা স্পষ্টতর বা তীব্রতর হইতে থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এই ক্ষেত্রে **প্রক্ষোভ হইতেই যান্ত্রিক প্রকাশ উৎপন্ন হয়।** এই যান্ত্রিক প্রকাশ কৃত্রিম, যেহেতু প্রক্ষোভের কারণও কল্পিত বা কৃত্রিম।

(৫) জেম্‌স্ বলেন, প্রক্ষোভের যান্ত্রিক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভ বাড়িতে থাকে, সুতরাং যান্ত্রিক প্রকাশই প্রক্ষোভের কারণ। কিন্তু কথাটি আপাতদৃষ্টিতে সত্য হইলেও, আসলে মিথ্যা। **অবদমিত প্রক্ষোভের প্রকাশ** আরম্ভ কালে প্রক্ষোভ বাড়ায়। যাহারা নিদারুণ শোকেও দুঃখ প্রকাশ করে না, অবদমিত দুঃখ তাহাদের মনে একপ্রকার দুঃখ-স্বভাব সৃষ্টি করে। একবার

কাঁদিতে আরম্ভ করিলে নিরুদ্ধ শোক যেন আরও উথলিয়া ওঠে। কিন্তু প্রক্ষোভের প্রকাশ উহার প্রাথমিক বৃদ্ধি ঘটাইলেও, পরে আর উহার বৃদ্ধি ঘটায় না। প্রকাশের ফলে প্রক্ষোভের প্রাথমিক বৃদ্ধি ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। **পর্যাপ্ত প্রকাশের ফলে দুঃখ প্রভৃতি প্রক্ষোভের তীব্রতা হ্রাস পায়।**

সুতরাং **প্রকাশের সহিত প্রক্ষোভ বাড়িয়া যায়, অতএব প্রক্ষোভ প্রকাশের সহিত অভিন্ন, জেম্‌স্‌-এর এইরূপ যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।**

(৬) জেম্‌স্‌ বলিয়াছেন যে যেহেতু যান্ত্রিক প্রকাশ দমন করিলে প্রক্ষোভও দমিত হয়, সুতরাং ইহারা অভিন্ন। কিন্তু এই যুক্তিও স্বীকার্য নয়। **প্রক্ষোভের প্রকাশ দমন করিবার চেষ্টা করিলে, প্রক্ষোভ না কমিয়া বাড়িয়াই যায়।** অবদমিত প্রক্ষোভের ফলে প্রক্ষোভ-স্বভাবের সৃষ্টি হয় এবং উহা বিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করে তাহা ছাড়া অবদমনের চেষ্টায় শারীরিক ও মানসিকবৈকল্যও ঘটিতে পারে, যথা স্নায়ুদৌর্বল্য প্রভৃতি।

(৭) জেম্‌স্‌ ওয়ার্ড্‌ তাঁহার "সাইকলজিক্যাল্‌ প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌স্‌" গ্রন্থে প্রচলিত মতের সমর্থনে বলিয়াছেন যে প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণা হইতে যান্ত্রিক প্রকাশগুলি সোজাসুজিভাবে উৎপন্ন হয় না কিন্তু হয় উহাদের মধ্যবর্তী বুদ্ধিক্রিয়া অথবা কেন্দ্রীয় ক্রিয়ার মধ্য দিয়া। **একটি পরিস্থিতির জ্ঞান হইতে প্রক্ষোভ এবং প্রক্ষোভ হইতে উহার যান্ত্রিক প্রকাশ উৎপন্ন হয়।** ওয়ার্ড্‌ পরিহাসছলে বলিয়াছেন, **"জেম্‌স্‌কে প্রথমে একটি পিঞ্জরাবদ্ধ এবং পরে একটি মুক্ত ভালুকের সম্মুখীন করা হউক। প্রথমটিকে তিনি উপহার দিবেন পিষ্টক, কিন্তু দ্বিতীয়টিকে তাঁহার পায়ের পরিষ্কার গোড়ালি দুইটি।"** পিঞ্জরাবদ্ধ ভালুককে জেম্‌স্‌ যে পরিস্থিতিতে দেখিবেন, মুক্ত ভালুককে তাহার ভিন্ন পরিস্থিতিতে দেখিবেন। প্রথমটি তাঁহার মনে জাগাইবে কৌতুক অনুভূতি বা আমোদ, আর দ্বিতীয়টি ভয়। প্রথম পরিস্থিতির লঘুতা এবং দ্বিতীয় পরিস্থিতির গুরুত্ব-জ্ঞানই যথাক্রমে পিষ্টক উপহার এবং পলায়ন এই দুইটি বিপরীত যান্ত্রিক প্রকাশের কারণ।

সুতরাং প্রক্ষোভ উহার বহিঃপ্রকাশের দ্বারা উৎপন্ন হয় না, কিন্তু উৎপন্ন হয় উহার কেন্দ্রীয় বা মস্তিষ্কগত ক্রিয়ার দ্বারা।

(৮) **স্টাউট্‌, ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌** প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ জেম্‌সীয় মতবাদের একটি গুরুতর ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে ইচ্ছা-

মূলক ক্রিয়ার সহিত প্রক্ষোভের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। ইচ্ছামূলক ক্রিয়ার পূরণ বা ব্যাঘাত হইতেই প্রক্ষোভ উৎপন্ন হয়। এই কারণে স্টাউট্ প্রক্ষোভের **"পরগাছা-সুলভ প্রকৃতির** (প্যারাসিটিক্যাল্ নেচার্)" কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রক্ষোভ শক্তি আহরণ করে ইচ্ছামূলক ক্রিয়া হইতে। মাতা নিজকে সন্তানের দুঃখে দুঃখী এবং সুখে সুখী অনুভব করেন, কারণ প্রথমটিতে তাঁহার মাতৃত্ব সহজ প্রবৃত্তি ব্যাহত এবং দ্বিতীয়টিতে পূর্ণ হয়। অধ্যাপক উইলিয়াম্ **জেম্স্ প্রক্ষোভের ইচ্ছামূলক ভিত্তি উপেক্ষা করিয়াছেন।**

আবার স্নাইডার্, ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ প্রভৃতির মতে প্রক্ষোভ সহজ প্রবৃত্তির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ বলেন যে **প্রক্ষোভ সহজপ্রবৃত্তির মর্মস্থল** (কোর্)। যেমন পলায়ন নামক সহজপ্রবৃত্তির মর্মস্থল ভয়, যোধন নামক সহজ প্রবৃত্তির মর্মস্থল ক্রোধ। **জেম্স্-এর মতবাদে প্রক্ষোভের সহিত সহজ প্রবৃত্তির যোগসূত্র উপেক্ষিত হইয়াছে।**

(৯) উপরন্তু জেম্স্-এর স্বীকৃতি অনুসারে তাঁহার মতবাদ অপেক্ষাকৃত **স্থূল প্রক্ষোভগুলিতে সীমাবদ্ধ কিন্তু সূক্ষ্ম বা সুকুমার প্রক্ষোভগুলিতে প্রযোজ্য নয়।** ক্রোধ, ভয়, হিংসা প্রভৃতি স্থূল প্রক্ষোভে উচ্চতর মানস বৃত্তির ক্রিয়া থাকে না। কিন্তু সুকুমার বা সূক্ষ্ম প্রক্ষোভ অর্থাৎ যে সকল প্রক্ষোভ সৌন্দর্য, সত্য, এবং ন্যায়ান্যায়বোধের সহিত জড়িত, সেইগুলি কেন্দ্রীয় মতবাদ অনুসারেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

(১০) যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ যদি প্রক্ষোভের কারণ হইয়া থাকে তাহা হইলে **একই প্রকারের যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ একই প্রকারের প্রক্ষোভের সহিত সংশ্লিষ্ট হইত। কিন্তু বাস্তব ঘটনা বিপরীত।** কেহ যেমন ভয় পাইয়া দৌড়াইতে পারে, তেমন আনন্দেও দৌড়াইতে পারে। আনন্দে প্রিয়জনকে দূর হইতে দেখিয়া ক্রোধে, পলায়মান শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে, উদ্বেগে, ট্রেন ধরিতে গিয়া, এইরূপ বিভিন্ন প্রক্ষোভের ফলে একই জাতীয় দৌড়ানো-রূপ বহিঃপ্রকাশ এবং বক্ষস্পন্দন, নাড়ীর গতি, রক্তসঞ্চালন, গ্রন্থির রসক্ষরণ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ প্রকাশ ঘটিতে পারে।

টিশ্‌নার্ বলিয়াছেন, **"আনন্দে অভিমানে এবং দুঃখে আমরা অশ্রু-মোচন করিতে পারি; ভয়ে, নৃশংসতায় এবং ক্রোধে আমরা আঘাত করিতে পারি; কোনো বন্ধুকে ধরিয়া ফেলিবার জন্য আমরা দৌড়াইতে পারি, তেমনই পশ্চাতে ধাবিত ভালুক দেখিয়াও আমরা**

দৌড়াইতে পারি; আগ্রহাতিশয্যে যেমন আমরা কাঁপিতে পারি, তেমন ভাবপ্রবণতায় অথবা ভীত হইয়াও কাঁপিতে পারি।"

উপসংহার

সুতরাং যান্ত্রিক প্রকাশ বা সংবেদন প্রক্ষোভের কারণ নয়। পূর্বোক্ত বিরুদ্ধ যুক্তি সাহায্যে ইহাই প্রমাণিত হইল যে জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদ গ্রহণীয় নয়।

(১১) **জেম্‌স্ কর্তৃক নিজ মতের সংস্কার সাধন**

জেম্‌স্ স্বয়ং তাঁহার মতের অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া উহার সংস্কার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার মতের পরবর্তী সংস্করণে দুইটি স্বীকৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহার ফলে তাঁহার পূর্বমতবাদ এবং প্রচলিত মতবাদের আমূল বিরোধিতা বহুল পরিমাণে ক্ষীণ এবং দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

জেম্‌স্ কর্তৃক তাঁহার নিজ মতের **প্রথম সংস্কারটি** এই :—

প্রক্ষোভ যে প্রত্যক্ষ কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাতে বেদনা বর্তমান। পূর্বমত অনুসারে প্রত্যক্ষে বেদনা নাই—প্রত্যক্ষ প্রতিবর্তভাবে (রিফ্লেক্স্‌লি) যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ ঘটায় এবং পরিবর্তরূপে উহাদের প্রক্ষোভ উৎপন্ন হয়। পূর্বমতে প্রক্ষোভের উদ্দীপক প্রত্যক্ষে সুখদুঃখ বেদনা নাই, কিন্তু পরবর্তী মতে, প্রত্যক্ষের সংবেদনাত্মক গুণগুলিতে সুখদুঃখ-বেদনা বর্তমান।

জেম্‌স্ **দ্বিতীয় সংস্কার** করিয়াছেন প্রত্যক্ষ বিষয়ের ব্যাখ্যায়। এতদনুসারে **প্রক্ষোভের উদ্দীপক কারণ একটি সমগ্র পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ।** এই স্বীকৃতি ওয়ার্ড্-প্রদর্শিত প্রত্যক্ষ বিষয়ের সমগ্র রূপের স্বীকৃতি। ইহার ফলে জেম্‌স্-এর বহিঃপ্রান্তিক প্রক্ষোভ-মতবাদ প্রচলিত কেন্দ্রীয় মতবাদের নিকটবর্তী এবং উহাদের বিরুদ্ধতা অনেকাংশে শিথিল হইয়াছে।

(১২) **জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদের প্রায়োগিক সমালোচনা অথবা এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রায়োগিক প্রমাণ**

জেমস্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদ প্রয়োগ পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সাম্প্রতিক কালে সি. এস. শেরিংটন্, ডব্‌ল্যু. বি. ক্যানন্, পি. বার্ড্ প্রভৃতি বিজ্ঞানিগণ তাঁহাদের প্রয়োগলব্ধ ফলের সাহায্যে জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

(ক) **শেরিংটন্**-এর প্রয়োগ প্রযুক্ত হইয়াছে কুকুরের উপর। তিনি অস্ত্রোপচার করিয়া এই প্রাণীর **সকল দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্র, চর্ম এবং পেশীর সহিত মস্তিষ্কের স্নায়ুপথ ছিন্ন করিয়া দিলেন। ফলে, ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংবেদন অথবা প্রকাশ নিরুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, কুকুরের ক্রোধ, বিরক্তি, ভয়, আনন্দ, দুঃখ প্রভৃতি প্রক্ষোভের কোনো দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটিল না।** জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদ যদি যথার্থ হইত, সংবেদন এবং প্রকাশ বন্ধ হইলে প্রক্ষোভও বন্ধ হওয়া উচিত। শেরিংটন্ প্রতিপন্ন করিলেন যে প্রক্ষোভ যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশের ফলে ঘটে না। যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ প্রক্ষোভের তীব্রতা বাড়াইতে পারে মাত্র।

(খ) **ক্যাননৃ**-এর প্রয়োগপদ্ধতি জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদেব খণ্ডনে আব একটি ধাপ অগ্রসর হয়। **ক্যাননৃ তাঁহার পরীক্ষণ-পাত্র বিড়ালের স্বতঃক্রিয় নার্ভমণ্ডলী কর্তিত করিয়া দিলেন, যাহার ফলে উহাদের ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল ক্রোধের যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ রহিত হইল।** জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ মতানুসারে এই অবস্থায় বিড়ালের ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি প্রক্ষোভ হওয়া উচিত নয়। **অথচ** উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলে, **ঐ বিড়াল** গোঁ গোঁ করা, ফোঁস ফোঁস করা, দাঁত বাহির করা, কান খাড়া কবা এবং আঘাত করিবার জন্য সাম্‌নের পা তোলা, প্রভৃতি **ক্রোধের সকল বহির্লক্ষণগুলিই প্রকাশ করিতে পারিল।**

ক্যাননৃ-পরীক্ষিত বিড়ালের আচরণ হইতে মনে হয় যে উহার আভ্যন্তরীণ বা যান্ত্রিক সংবেদন প্রক্ষোভের পক্ষে অপরিহার্য নয়।

ক্যাননৃ-বার্ড্ মতবাদ—প্রক্ষোভের কেন্দ্রীয় মতবাদ

ক্যাননৃ ও তাঁহার সহকর্মী পি. বার্ড্ তাঁহাদের প্রয়োগ সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ প্রক্ষোভের কারণ নয়, কিন্তু **মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস্ কেন্দ্রই প্রক্ষোভ এবং উহার যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশের সাধারণ কারণ।** প্রক্ষোভেব কারণ এই যে উহার **উদ্দীপক-ক্রিয়া অন্তর্বাহী নার্ভপ্রবাহের আকারে হাইপো-থ্যালামাস্-এ বাহিত হয় এবং ঐ উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছিয়া বহির্বাহী নার্ভ-প্রবাহের আকারে আন্তর যন্ত্রগুলিতে, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতে, চর্মে,**

পেশীতে এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চালিত হয় যাহার ফলে সর্বাঙ্গীণ যান্ত্রিক প্রকাশ ঘটিয়া থাকে।

ক্যানন্ ও বার্ড্ তাঁহাদের এই মতবাদের নামকরণ করিয়াছেন **কেন্দ্রীয় অথবা অন্তঃপ্রান্তীয় মতবাদ (সেন্ট্র্যাল্ থিওরি অফ্ ইমোশন্)।** পক্ষান্তরে জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদ **বহিঃপ্রান্তীয় মতবাদ (পেরিফের‍্যাল্ থিওরি অফ্ ইমোশন্)** বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্যানন্-এর প্রয়োগফলে প্রমাণিত হইয়াছে, প্রক্ষোভের কেন্দ্রীয় মতবাদ অর্থাৎ মস্তিষ্ককেন্দ্রে চালিত অন্তর্বাহী নার্ভপ্রবাহের ফলেই প্রক্ষোভ ঘটে, এই মতবাদই যথার্থ। পক্ষান্তরে প্রক্ষোভের বহিঃপ্রান্তীয় জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ সমর্থিত মতবাদ, অর্থাৎ মস্তিষ্ককেন্দ্রের বাহিরে অবস্থিত দেহযন্ত্রের সংবেদন বা প্রকাশ হইতেই প্রক্ষোভ উৎপন্ন হয়, এই মতবাদ, ভ্রান্ত।

মানুষের প্রক্ষোভ

(গ) বলা যাইতে পারে যে উপরোক্ত প্রায়োগিক মতবাদ নিম্নতর প্রাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সুতরাং মানুষের প্রক্ষোভে উহার প্রযোজ্যতা সন্দিগ্ধ।

ক্যানট্রিল, হাণ্ট্ প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা মানুষের ক্ষেত্রে দেখিয়াছেন যে অ্যাড্রিনিন্ ইন্‌জেক্‌শন্-এর ফলে উহাদের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রে ক্রোধের সকল প্রকাশ উৎপন্ন হইলেও, প্রকৃত ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আন্তরযন্ত্র সংবেদন বা প্রকাশই প্রক্ষোভ হইলে, এই অবস্থায় ক্রোধ উৎপন্ন হইত।

সি. এল্. ড্যানা একটি চল্লিশবর্ষীয়া বুদ্ধিমতী নারীর দৃষ্টান্ত দিয়া জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। এই মহিলাটির গ্রীবাদেশের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ফলে, তাঁহার **মস্তিষ্কের সহিত দেহকাণ্ডের এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নার্ভসূত্র ছিন্ন হইয়া আন্তরযন্ত্র সংবেদন এবং প্রকাশ ব্যাহত করিয়াছিল।** জেম্‌স্-ল্যাঙ্গ্ মতবাদ অনুসারে ইঁহার সকল প্রকার প্রক্ষোভই নষ্ট হইয়া যাইবার কথা। অথচ **বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল যে তাঁহার হর্ষ, শোক, ভালবাসা প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি অল্পাধিক অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।** উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা গেল যে **দেহের সংবেদন ও প্রকাশ ছাড়াই মস্তিষ্কে প্রক্ষোভের অনুভূতি ঘটিতে পারে।**

সুতরাং **যুক্তির এবং প্রায়োগিক প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হইল যে জেম্‌স্- ল্যাঙ্গ্ প্রদর্শিত বহিঃপ্রান্তীয় প্রক্ষোভ-মতবাদ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রচলিত প্রক্ষোভ মতবাদ, যাহা**

প্রায়োগিক গবেষণার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় বা অন্তঃপ্রান্তীয় মতবাদের আকার গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

৮। প্রক্ষোভ-প্রকাশের কারণ

ডারুইন্-এর মতে প্রক্ষোভের সকল প্রকাশ এবং অঙ্গভঙ্গীর মূল কারণ তিনটি। (১) প্রথমটি হইল **কার্যকরী অনুষক্ত-অভ্যাস সূত্র** (প্রিন্সিপ্ল্ অফ্ সার্ভিসিয়েব্ল্ অ্যাসোসিয়েটেড্ হ্যাবিট্স্)। এই সূত্র অনুসারে কোনো কোনো প্রক্ষোভ-প্রকাশ এমন কতগুলি অভ্যাসের লুপ্তাবশেষ, যেগুলি অতীতে প্রাণীর জীবনসংগ্রামে প্রয়োজনীয় ছিল। যেমন ক্রোধে মুষ্টিবদ্ধ করা অথবা দন্ত বিকশিত করা। এই অঙ্গভঙ্গীগুলি প্রাণীর অতীত জীবনসংগ্রামে কার্যকরী ছিল বলিয়া অনুষক্ত হইয়া অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে এবং পরবর্তী পুরুষে বংশগতি অনুসারে সংক্রামিত হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় ডারুইনীয় সূত্রটি হইল **বিরোধ সূত্র** (প্রিন্সিপ্ল্ অফ্ অ্যান্টিথিসিস্)। এই সূত্র অনুসারে অনেক প্রক্ষোভ-প্রকাশই প্রাণীর স্বাভাবিক প্রক্ষোভ-প্রকাশের বিপরীত। যেমন কুকুর বন্ধুত্ব প্রকাশ করে উহার পক্ষে অধিক স্বাভাবিক বৈরিতার বিপরীত প্রকাশগুলির সাহায্যে।

(৩) ডারুইন্-নির্দেশিত তৃতীয় সূত্রটি হইল **নার্ভ-তন্ত্রের গঠন অনুসারে এবং প্রথম হইতেই ইচ্ছা এবং কতক অংশে অভ্যাসের উপর নির্ভর না করিয়া প্রক্ষোভের প্রকাশ করা।** যেমন কষ্টে ঘর্মাক্ত বা ভয়ে কম্পিত হওয়া, আনন্দে লম্ফ ঝম্প করা, এই সূত্রের ক্রিয়া অনুসারে সংঘটিত হয়।

প্রথম সূত্রটিই প্রক্ষোভ-প্রকাশের কারণে বিশেষ আলোকপাত করে।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

উড্ওয়ার্থ্ অ্যাণ্ড্ মার্কুইস্—সাইকলজি—একাদশ পরিচ্ছেদ

বোরিস্, ল্যাংফেল্ড্, ওয়েল্ড্—ফাউণ্ডেশন্স্ অফ্ সাইকলজি—পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জি. এফ্. স্টাউট্—এ ম্যানুয়াল্ অফ্ সাইকলজি—তৃতীয় খণ্ড—প্রথম অংশ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মেলোন্ অ্যাণ্ড্ ড্রামণ্ড্—এলিমেন্ট্স্ অফ্ সাইকলজি—অষ্টম পরিচ্ছেদ

ই. বি. টিশ্নার—এ টেক্স্ট্ বুক্ অফ্ সাইকলজি—১২৮-১৩২ অনুচ্ছেদ

জি মার্ফি—জেনারাল্ সাইকলজি—পঞ্চম পরিচ্ছেদ

Exercise

1. Define emotion. Analyse its characteristics. (pp. 664-665)
2. Distinguish between emotion, emotional mood, passion, emotional disposition and temperament. (pp. 665-669)
3. Classify feeling. Explain the different kinds of feelings. (pp. 669-670)
4. Explain the psychology of emotion with an example. (pp. 664-665 ; 670-675)
5. Bring out the psychology of fear, anger, joy and sorrow, love, hatred and sympathy. (pp. 670-675)
6. Explain the Traditional theory of Emotion. (p. 676)
7. Analyse the Lange-James theory of Emotion and adduce the arguments in its favour. (pp. 677-680)
8. Critically expound the Lange-James Theory of Emotion. (pp. 677-687)
9. Explain James' revised version of his theory of emotion. (p. 684)
10. What are the experimental evidences against the Lange-James Theory of Emotion ? (pp. 684-687)
11. Distinguish between the Peripheral and the Central Theory of Emotion. Which of the two do you prefer and why ? (pp. 685-686)
12. Explain the contributions of Sherrington, Cannon and Bard to the Central Theory of Emotion (pp. 684-686)
13. What experimental studies have been made on human emotion ? (pp. 686-687)
14. Explain the causes of emotional expression. (p. 687)
15. Why does Stout describe emotion as 'parasitical' in nature ? Explain with reference to the view of McDougall. (pp. 682-683)

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রস (সেন্টিমেণ্ট্)

১। রস (সেণ্টিমেণ্ট্) কাহাকে বলে

রস, প্রক্ষোভ এবং বেদনা

অনুভূতিমূলক মানসবৃত্তির অপরিণত এবং অধিক পরিণত অবস্থা যেমন যথাক্রমে বেদনা (ফীলিং) এবং প্রক্ষোভ (ইমোশন্), ইহার পূর্ণ-পরিণত বা পরিপক্ক অবস্থা তেমন রস (সেন্টিমেণ্ট্)। অবগতির পরিণত বা পূর্ণ-বিকশিত অবস্থা চিন্তন। আবার ক্রিয়ার পরিণত বা পূর্ণ-বিকশিত অবস্থা ঐচ্ছিক ক্রিয়া। **সেইরূপ অনুভূতির পরিণত বা পূর্ণ-বিকশিত অবস্থা রস।** সুতরাং সুখদুঃখবেদনা, প্রক্ষোভ এবং রসের পার্থক্য প্রকারগত নয়, কিন্তু পরিমাণগত। প্রক্ষোভ বেদনার তুলনায় সূক্ষ্মতর এবং জটিলতর অনুভূতি, আবার রসও প্রক্ষোভের তুলনায় সূক্ষ্মতর এবং জটিলতর অনুভূতি। এই তিনটিই অনুভূতিমূলক বৃত্তির স্তর বিশেষ—বেদনা নিম্নতম, প্রক্ষোভ উহার তুলনায় উচ্চতর এবং রস আবার এই দুইটির তুলনায় উচ্চতর। **উড্ওয়ার্থ্** মনে করেন যে বেদনা ও রসের পার্থক্য তীব্রতার পার্থক্য। বেদনা প্রবল হইলেই উহাকে রস, আবার রস ক্ষীণ হইলেই উহাকে বেদনা বলা যায়।

রস কথাটির বিভিন্ন অর্থ

রস কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চলিত ভাষায় **ভাব-প্রবণতা (সেন্টিমেণ্ট্যালিটি)** অর্থেই রস কথাটি প্রচলিত। অমুক লোকটি খুব ভাবালু (সেন্টিমেণ্ট্যাল্) বলিতে বুঝায় যে সে সহজেই ভাবাবেগে বিচলিত হয়, অর্থাৎ সামান্য কারণেই সুখী, দুঃখী, ভীত বা ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে। অথবা এই অর্থে রস প্রক্ষোভ-প্রবণতা বুঝায়, যাহার ফলে ব্যক্তি সামান্য কারণেই প্রক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। দ্বিতীয়তঃ, রস কথাটিকে চিন্তনের স্তরেও তোলা হইয়া থাকে। **ড্রিভার** প্রভৃতি মনোবিৎ রস বলিতে **সুখদুঃখবেদনার সহিত যুক্ত ধারণা বা ভাব-সমষ্টি (কম্প্লেক্স্)** বুঝিয়া থাকেন। রস একপ্রকার বেদনামিশ্রিত চিন্তন। তৃতীয়তঃ, কাহারও কাহারও মতে রস শুধু বেদনাযুক্ত

ধারণা বা ভাবসমষ্টি নয়, কিন্তু **ক্রিয়াত্মকও বটে।** অর্থাৎ ইঁহারা রসকে **একাধারে অনুভূতিমূলক, অবগতিমূলক এবং ক্রিয়ামূলক** বলিয়া মনে করেন। রস বলিতে বুঝায় কতগুলি ধারণা বা ভাব, ঐ ভাব বা ধারণাকে আশ্রয় করিয়া সুখদুঃখবেদনা বা প্রক্ষোভ এবং এই ভাব এবং অনুভূতি অনুসারে কর্মপ্রবণতা। কতগুলি ধারণা বা ভাবকে আশ্রয় করিয়া সুখদুঃখ প্রভৃতি প্রক্ষোভ অনুভব করিবার এবং তদনুযায়ী কর্ম করিবার প্রবণতাই রস।

রস কথাটির শেষোক্ত অর্থ অথবা উহার সামান্য ইতরবিশেষ অনেক মনোবিদের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। যেমন **ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ এবং শ্যাণ্ড্** রস বলিতে বুঝিয়া থাকেন **প্রক্ষোভ-প্রবণতা,** যাহা কোনো বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া সুগঠিত হয়। আবার **স্টাউট্, মেলোন্, ড্রামণ্ড্** প্রভৃতির মতে রস যে কোনো **প্রক্ষোভ-স্বভাব (ইমোশন্যাল্ ডিজ্‌পোজিশন্)।** রস প্রক্ষোভ অনুভব করিবার একপ্রকার প্রবণতা, যাহা উপযুক্ত উদ্দীপকের সংস্পর্শে বাস্তব প্রক্ষোভে আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপ প্রক্ষোভ-প্রবণতা বা প্রক্ষোভ-স্বভাব (ইমোশন্যাল্ ডিজ্‌পোজিশন্) প্রায়ই গঠিত হয় **অভ্যাস এবং অভিজ্ঞতার** ফলে। যেমন, শিশু প্রথম জীবনেই পিতামাতার সহিত যে নির্দিষ্ট আচরণে অভ্যস্ত হয়, উহাই ভবিষ্যতে তাহার "পিতৃভক্তি" অথবা "মাতৃভক্তি"র (ফাদার্-সেন্টিমেণ্ট্ অর্ মাদার্-সেন্টিমেণ্ট্) কেন্দ্ররূপে গঠিত হয়।

রস কথাটির প্রকৃত অর্থ

প্রকৃতপক্ষে রস বলিতে বুঝায় কতগুলি প্রক্ষোভের **এমন সংগঠন (অর্গানাইজেশন্ অফ্ ইমোশন্‌স্) যাহা সৌন্দর্য (বিউটি), সত্য (ট্রুথ্), মঙ্গল বা ন্যায়ান্যায় (গুড্‌নেস্), এবং ঈশ্বর (গড্) প্রভৃতি উচ্চতর ভাব বা আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে,** উহাদের সংস্পর্শে আসিয়া বাস্তব প্রক্ষোভের আকারে আত্মপ্রকাশ করে, সুখদুঃখবেদনা-মিশ্রিত থাকে এবং এইরূপ জ্ঞান ও অনুভূতি অনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত করে।

তাহা হইলে, রস ও প্রক্ষোভের প্রধান পার্থক্য এই যে প্রথমটি সংগঠনাত্মক অনুভূতি-প্রবণতা, কিন্তু দ্বিতীয়টি বাস্তব অনুভূতি। অর্থাৎ **প্রক্ষোভের মত বাস্তব অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা নয়, কিন্তু কোনো আদর্শ বা ভাবকে কেন্দ্র করিয়া প্রক্ষোভের সংগঠন বিশেষ।** যেমন, সৌন্দর্যরসে রসিক

শিল্পী, সর্বদা এই রসের অধিকারী হইলেও, তিনি যে সর্বদা এই রসের বাস্তব অনুভূতি লাভ করিতে থাকেন তাহা নয়। তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহার সৌন্দর্যানুভূতি বা স্বভাব রহিয়াছে এবং উপযুক্ত উদ্বোধক বা উদ্দীপকের সংস্রবে আসিলেই তাঁহার সৌন্দর্যানুভূতি ঘটে।

রস ও গূঢ়ৈষা (কম্প্লেক্স্)

রস কতগুলি প্রক্ষোভের সংগঠিত সমষ্টি। তাই বলিয়া **রস শুধু গূঢ়ৈষা বা কম্প্লেক্স্ নয়।** কিন্তু ড্রিভার প্রভৃতি মনোবিৎ প্রক্ষোভ বা রসকে গূঢ়ৈষা এবং উহার সহিত যুক্ত সুখদুঃখবেদনাকে **আধান (অ্যাফেক্ট্)** বলিয়াছেন। গূঢ়ৈষা প্রধানতঃ ইচ্ছামূলক। ইহা অবদমিত ইচ্ছার সমষ্টি, যদিও ইহার সহিতই গৌণভাবে আধান বা সুখদুঃখ বেদনা অনুষক্ত থাকে। কিন্তু রসকে প্রধানতঃ ইচ্ছামূলক বলা যায় না—অনুভূতিমূলক দিকটিই রসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাহা ছাড়া, গূঢ়ৈষা মানসরোগীর ধর্ম (প্যাথলজিক্যাল্)। পক্ষান্তরে রস স্বভাবী ব্যক্তির স্বভাব। তৃতীয়তঃ, গূঢ়ৈষার মত রস শুধু অবদমিত বাসনার সমষ্টি নয়।

২। রসের বিভিন্ন প্রকার

যে ভাব বা আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া প্রক্ষোভ রসের আকারে সংগঠিত হয়, তাহা প্রধানতঃ চারটি—যথা অবগতিমূলক বা বুদ্ধিমূলক, অনুভূতিমূলক, ইচ্ছা-মূলক এবং এমন একটি আদর্শ যাহাতে সমগ্র সত্তার উপলব্ধি হয়। প্রথমটি হইল যুক্তিবিদ্যার আদর্শ, **সত্য।** দ্বিতীয়টি নন্দনবিদ্যায় আদর্শ, **সৌন্দর্য।** তৃতীয়টি নীতিবিদ্যার আদর্শ, যাহার নাম **মঙ্গল বা কল্যাণ। সত্যম্, শিবম্ এবং সুন্দরম্ এবং ঈশ্বর যাহাতে এই আদর্শত্রয় কেন্দ্রীভূত এবং পরিণত হয়, এই চারিটি আদর্শকে আশ্রয় করিয়া এবং অবগতি, ইচ্ছা, অনুভূতি এবং সমগ্র সত্তাকে অবলম্বন** করিয়া যে **চারটি** রস **সংগঠিত হইয়া থাকে তাহাই যথাক্রমে বুদ্ধিমূলক (লজিক্যাল্), ইচ্ছামূলক বা নৈতিক (মর‍্যাল্), এবং অনুভূতিমূলক বা সৌন্দর্যমূলক (ইস্থেটিক্)।** তাহা হইলে, সত্য (ট্রুথ্), সুন্দর (বিউটি), কল্যাণ (গুড্নেস্) এবং ঈশ্বর (গড্) এই চারটি আদর্শের আশ্রয়ে যে চারটি রসের সংগঠন ঘটে, তাহাই মনোবিদ্যার আলোচ্য।

৩। বুদ্ধিমূলক (লজিক্যাল্ বা ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল্) অথবা সত্যাশ্রিত রস

সত্য, জ্ঞান, অনন্ত—এই আদর্শের প্রতি প্রেম বা শ্রদ্ধাকে অবলম্বন করিয়া যে প্রক্ষোভ-স্বভাব গঠিত হয় তাহাকে বুদ্ধিমূলক (ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল্) বা যুক্তিমূলক (লজিক্যাল্) রস বলে। দার্শনিক, বিজ্ঞানী প্রভৃতি, যাঁহারা বুদ্ধির সাহায্যে সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার প্রয়াসী, তাঁহারা প্রধানতঃ এই রসে রসিক। যেমন প্লেটো, শঙ্করাচার্য, কাণ্ট্, নিউটন্, কেপ্‌লার্ প্রভৃতি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যাশ্রিত রসের পূজারী।

সত্যাশ্রিত রসের বিশ্লেষণ

কোনো সমস্যার সম্মুখীন হইলেই উহার সমাধান করা দরকার হয় এবং এই সমাধানচেষ্টার প্রথম ধাপ সমস্যাটিতে মনোযোগ বা অবধান। অবধারণা (জাজ্‌মেণ্ট্) এবং যুক্তির (রিজ্‌নিং) সাহায্য না লইয়া কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না। সমস্যার এইরূপ সমাধান চেষ্টা জাগে একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি হইতে। আবার এই অস্বস্তিকর অনুভূতি দূর করিবার জন্য যে চেষ্টা হয় তাহার সাফল্যে জন্মে সুখ অনুভূতি। অবধান বা সমাধান চেষ্টা ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া; অবধারণা এবং যুক্তি বুদ্ধির ক্রিয়া, আবার সমস্যার সমাধান হইতে যে সুখ জন্মে তাহা অবগতিমূলক ক্রিয়া। সুতরাং **সত্যাশ্রিত রসে অবগতি, ইচ্ছা এবং অনুভূতি এই তিন প্রকারের মানসক্রিয়াই** অংশ **গ্রহণ করে।**

কিন্তু সত্যাশ্রিত রসটিতে তিন প্রকারের মানসক্রিয়াই অংশগ্রহণ করিলেও, উহাতে নানাপ্রকার প্রক্ষোভ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যেমন **কৌতুহল** (কিউরিয়সিটি) প্রক্ষোভটি সত্য-রসের সংগঠনে একটি প্রধান উপাদান। সত্য নির্ণয়ের, নূতনকে জানিবার, নিঃসংশয় হইবার একটি স্বাভাবিক কৌতূহল-বোধ বুদ্ধির বিশেষ ধর্ম। সত্যনির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস-অবিশ্বাস, স্বস্তি-অস্বস্তি, বিস্ময় প্রভৃতি প্রক্ষোভের দোলায়মানতা চলিতে থাকে এবং সত্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-অনুভূতি জন্মে।

সুতরাং কৌতূহল অনুভূতি (ইমোশন্ অফ কিউরিয়সিটি) সত্যরসের একটি প্রধান উপাদান।

৪। কান্ত-রস বা সৌন্দর্য-রস
(ইস্‌থেটিক্ সেণ্টিমেণ্ট্)

সৌন্দর্য উপলব্ধিকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রক্ষোভ-স্বভাব গঠিত হয় তাহাকে কান্ত-রস বা সৌন্দর্য-রস (ইস্‌থেটিক্ সেন্টিমেণ্ট্) বলে। রূপমাধুর্যের, বর্ণবিন্যাসের, শব্দসামঞ্জস্যের বা সঙ্গীতের, গতিচ্ছন্দের অথবা নৃত্যের সৌন্দর্য এবং উহাদের বিপরীত গুণগুলির কদর্যতা উপলব্ধিতে যে সুখময় এবং দুঃখময় প্রক্ষোভ-প্রবণতা উৎপন্ন হয় তাহাই কান্ত-রস। "যখনই আমি আকাশে রামধনু দেখি, আমার হৃদয় নাচিয়া ওঠে (মাই হার্ট্ লিপ্‌স্ ইন্ জয়্ হোয়েন্ আই বিহোল্ড্ এ রেইন্‌বো ইন্ দি স্কাই)" এবং "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে", ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ এবং রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় উক্তি কান্ত-রসের অভিব্যক্তি।

কান্ত-রসের গঠনে শ্রবণ এবং দর্শন প্রত্যক্ষ প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্য জাতীয় প্রত্যক্ষগুলি যথা, স্পর্শ, ঘ্রাণ এবং আস্বাদন উপরোক্ত দুইটির তুলনায় স্থূল এবং সুকুমার বা ললিত কান্তরসের অনুপযোগী। বিশেষ করিয়া শ্রবণ এবং দর্শন প্রত্যক্ষেই সুন্দর ও কদর্য, এই দ্বিবিধ অন্ধারণা ঘটে। যে শ্রবণ বা দর্শন প্রত্যক্ষে শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, সৌষ্ঠব উপলব্ধ হয় তাহাই সুন্দর এবং যাহাতে ঐরূপ হয় না তাহাই অসুন্দর, বিশ্রী বা কদর্য।

কান্ত-রসের লক্ষণ

কান্তরসের বিশেষ লক্ষণগুলি উল্লিখিত হইতেছে।

(১) কান্তরসের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা **স্বার্থসম্পর্কশূন্য** (ডিস্-ইন্‌টারেস্টেড্) এবং **নিস্পৃহ** (ডিট্যাচ্‌ড্)। ইহা আনন্দ দেয়, কান্তরসের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। কান্তরসের **উদ্দেশ্য থাকে না।** কোনো বস্তু উদ্দেশ্য সাধন করে বলিয়া সুন্দর, এবং এইরূপ করে না বলিয়া অসুন্দর তাহা নয়।

(২) কান্তরস **শুদ্ধ এবং অভেজাল।** সৌন্দর্য অবিমিশ্র প্রীতি বা সুখ অথবা বিশুদ্ধ আনন্দ উৎপন্ন করে। আবার কদর্যতা উৎপন্ন করে বিরক্তি বা দুঃখ। কীট্‌স্ বলিয়াছেন, "যাহা সুন্দর তাহা চির আনন্দময় (এ থিঙ্গ্ অফ্ বিউটি ইজ্ এ জয়্ ফর্ এভার্)"। বিশুদ্ধ আনন্দই কান্তরসের উপজীব্য। ইহাতে অন্য কোনো বিজাতীয় ভাব বা প্রক্ষোভের সংমিশ্রণ নাই।

(৩) কান্তরস **অংশগ্রহণযোগ্য।** অর্থাৎ একই কালে একাধিক ব্যক্তি একই বস্তুতে সৌন্দর্যবোধের প্রীতি এবং কদর্যতাবোধের বিরক্তি অনুভব করিতে পারে। এই রস **সার্বজনিক।** ইহা উপভোগে কমিয়া যায় না। কীট্স্ বলিয়াছেন যে কান্তরসের আনন্দ বাড়িয়াই যায়।

কান্তরসের উপাদান

কান্তরস **বিশ্লেষণ** করিলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া যায়।

(১) **দর্শন এবং শ্রবণই কান্তরসের বিশেষ উপাদান**, কারণ ইহারাই ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে কম স্বার্থবিজড়িত।

(২) কান্তরসের সংগঠনে বহু অনুভূতি এবং প্রক্ষোভ অংশগ্রহণ করিলেও, উহাদের মধ্যে **সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা বা সঙ্গতি** থাকে। উহাদের মিলনে একটি সম্পূর্ণ সুন্দরের সৃষ্টি হয়। যেমন নানা বর্ণের সমন্বয়ে সুন্দর দৃশ্য এবং নানা শব্দের সমন্বয়ে সুন্দর সঙ্গীত উৎপন্ন হয়।

(৩) কান্তরস নানা ভাবের **অভিব্যঞ্জক** (সাজেষ্টিভ্)। ইহা অতীত জীবনের বহু **স্মৃতিকে জাগাইয়া তোলে।** কোকিলের স্বর মধুর এবং রামধনুর দৃশ্য সুন্দর লাগে, কারণ ইহারা অতীতের বহু সুখময় স্মৃতি জাগায়।

৮। কয়েকটি প্রধান রস

রসগুলির মধ্যে বিরাট রস, করুণ রস, অদ্ভুত রস এবং হাস্য রস প্রধান।

(ক) বিরাট রস (সেন্‌টিমেণ্ট্ অফ্ দি সাব্‌লাইম্)

অসীম আকাশ, অন্তহীন সমুদ্র, গগনচুম্বী পর্বত প্রভৃতি **বিরাট অথবা মহৎ বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে যে রসের উপলব্ধি হয় তাহাকে বিরাট রস (সেন্‌টিমেণ্ট্ অফ্ দি সাব্‌লাইম্) বলে।** আবার কোনো বিরাট ব্যক্তিত্বের বিরাটত্ব উপলব্ধির ফলেও এই রসের অভ্যুদয় হইতে পারে।

বিরাট রস একটি বিশুদ্ধ অথবা অবিমিশ্র রস নয়। বিরাটের উপলব্ধিতে **দুইটি বিপরীত ভাব** ক্রিয়া করে। প্রথম ভাবটি হইল বিরাটের প্রতি **আকর্ষণ।** আকর্ষণবোধ সুখ এবং বিস্ময় অনুভূতি জাগায়। দ্বিতীয় ভাবটি হইল **ভয় এবং ভক্তি বা শ্রদ্ধা।** বিরাট মহনীয় এবং বরণীয়। ইহা আমাদের অন্তরে মহান্ এবং বিরাট হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগায়, সুতরাং আমরা ইহার প্রতি আকৃষ্ট হই। আবার ইহা বিরাট, আমরা ক্ষুদ্র। বিরাটের সংস্পর্শে অন্তরে

ভয় জাগে, পাছে আমরা ইহাতে হারাইয়া যাই। আবার এই ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা বা ভক্তিরও আবির্ভাব হয়, কারণ আমাদের ঈপ্সিত বিরাটত্ব উহার মধ্যে বাস্তব রূপে থাকে। **বিরাটের সৌন্দর্য আমাদের আকর্ষণ করিয়া বা কাছে টানিয়াও দূরে সরাইয়া রাখে।** উহার সান্নিধ্যে আসিয়া আমাদের ক্ষুদ্রতা প্রকট হইয়া পড়ে। তাই বিরাটকে দূর হইতেই বলিতে হয়, "লহ শুধু ক্ষুদ্রের প্রণাম"। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিরাট ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসিলেও এইরূপ অনুভূতি জানিতে পারে।

বিরাট রস প্রধানতঃ অনুভূতিমূলক। কিন্তু ইহাতে অবগতি এবং ইচ্ছামূলক উপাদানও বর্তমান থাকে। আবার প্রত্যেকটি অনুভূতি, অবগতি এবং ইচ্ছামূলক উপাদানেই বিপরীত দুইটি দিকও থাকে—যেমন আনন্দ এবং কষ্ট, অবধান এবং অনবধান, আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ।

(খ) করুণ বা বিয়োগান্ত রস (সেন্‌টিমেণ্ট্ অফ্ ট্র্যাজেডি)

করুণ বা বিয়োগান্ত রসেও বিপরীত ভাবের সংমিশ্রণ থাকে। **যে রস বস্তুর সৌন্দর্য এবং অসঙ্গতি, এই দুইটি বিপরীত অথচ যুগপৎ উপলব্ধি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে করুণ বা বিয়োগান্ত রস বলে।**

করুণ রস যেমন একটি কান্তরস, তেমন শীলরস বা নৈতিক রসও বটে। এই রস শুধু ব্যক্তিগত উপলব্ধিতেই পর্যবসিত নয়, কিন্তু সামাজিক সঙ্গতি বা অসঙ্গতি, ন্যায় বা অন্যায় উপলব্ধিও উহাতে অংশগ্রহণ করে।

করুণ রসের উৎপাদক বস্তুটি সুন্দরও বটে, কিন্তু অন্যায়ও বটে। যেমন সেক্সপীয়র বর্ণিত **ডেস্‌ডেমোনার পরিণাম** পাঠকের মনে যুগপৎ কান্তরস এবং অন্যায় উপলব্ধিরূপ শীলরস উৎপন্ন করে। আবাব কালিদাস বর্ণিত **শকুন্তলার পতিগৃহে প্রত্যাখ্যান** পাঠকের মনে যুগপৎ এই বিপরীত ভাবদ্বয়ের সৃষ্টি করে। ডেস্‌ডেমোনা এবং শকুন্তলার এই দুরবস্থা পাঠ করিয়া পাঠকের মনে স্বতঃই এই অবিচারের প্রতি একটি ধিক্কার জাগিয়া ওঠে, অথচ 'অথেলো' এবং 'শকুন্তলা' নাটকের কাব্যসৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়া কান্ত রসও জাগিয়া ওঠে।

অদ্ভুত রস (সেন্‌টিমেণ্ট্ অফ্ দি লুডিক্রাস্)

অদ্ভুত রসেও দুইটি পরস্পরবিরোধী ভাবের দোলায়মানতা থাকে। কিন্তু এই রসের বস্তু সুন্দর অথচ সামঞ্জস্য-বিহীন বা খাপ্‌ছাড়া। অদ্ভুত রস **বিরাট**

রসের বিপরীত। বিরাট রসে রসিক ব্যক্তি নিজকে বিরাট বস্তুর তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অপকৃষ্ট (ইন্‌ফিরিয়র্‌) বলিয়া অনুভব করে। তাহা ছাড়া বিরাট বস্তুর প্রতি ভয়ের সহিত ভক্তি বা শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণের সহিত বিকর্ষণও মিশ্রিত থাকে। কিন্তু অদ্ভুত রসের মনোভাব ইহার বিপরীত। **অদ্ভুত রসে রসিক ব্যক্তি রস-উদ্দীপক বস্তুর তুলনায় নিজেকে বিরাট, মহৎ বা উৎকৃষ্ট (সুপিরিয়র্‌) বলিয়া অনুভব করে।**

অদ্ভুত রসে বস্তুর অপকর্ষ এবং অসঙ্গতি উপলব্ধি জ্ঞান থাকে। আবার নিজ প্রাধান্য জাহির করিবার ইচ্ছা এবং সুখ-দুঃখ বেদনাও এই রসের উপাদান। অর্থাৎ ইহা অবগতি, অনুভূতি এবং ইচ্ছামূলক উপাদানে গঠিত।

৬। হাস্য-রস (কমিক্‌ সেন্‌টিমেণ্ট্‌)

অদ্ভুত রস হাসির খোরাক জোগায়। ইহা হাস্যরসেরই (কমিক্‌ সেন্টিমেণ্ট্‌) একটি প্রকারভেদ। হাসি নানা কারণে ঘটিতে পারে। কাতুকুতু বা সুড়সুড়ি প্রভৃতি দৈহিক কারণে, অপরের হাসি দেখিয়া এবং নিছক অনুকরণ প্রবৃত্তির বশেও হাসি আসিতে পারে। হাসির সংক্রামকতা আছে, যাহার ফলে ইহা ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু এইজাতীয় হাসির সহিত অদ্ভুত রসের উপলব্ধি ঘটে না। ইহারা হাস্য-রস কিন্তু অদ্ভুত রস নয়। আবার আনন্দে এবং অদ্ভুত দৃশ্য দর্শনে বা শব্দ শ্রবণেও হাস্যরসের উদয় হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ হাস্যরস অদ্ভুতরসও বটে। সুতরাং **হাস্যরস অদ্ভুত রসের তুলনায় ব্যাপক।** সকল অদ্ভুত রসই হাস্যরস, কিন্তু সকল হাস্যরসই অদ্ভুত রস নয়।

সাধারণতঃ হাস্য সুখবেদনার প্রকাশ। প্রশ্ন এই যে কি কি কারণে হাস্যরস সুখবেদনার উৎস হইয়া দাঁড়ায়, অথবা সুখবেদনার উৎস কি। **হব্‌স্‌-এর মতে, অপরের দুর্গতি দেখিয়া আকস্মিক নিজ মহিমাবোধই হাসির কারণ।** যেমন পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশে পড়াইতে পড়াইতে হঠাৎ নাক্‌ ডাকিয়া ঘুমাইতে লাগিলেন। এই ব্যাপারটি হাস্যকর। আমরা বয়সে ছোট হইয়াও না ঘুমাইয়া আমাদের অধ্যয়নব্রত পালন করিতেছি। কিন্তু অন্য দিকে বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত আদর্শ শিক্ষকের মর্যাদাভ্রষ্ট হইয়া দিনের বেলায় পড়াইতে পড়াইতে ঘুমাইতেছেন। এই হাসির মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়ের আদর্শচ্যুতি দেখিয়া আমাদের হাম-বড় ভাব বা উৎকর্ষবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। আকস্মিক মহিমাবোধ এবং উহার সহিত অসামঞ্জস্য বা অসঙ্গতিবোধই

এইরূপ হাস্যরসের মূলকারণ। শিক্ষক মহাশয়ের এইরূপ আচরণ তাঁহার মর্যাদার সহিত এবং সমাজে শিক্ষককে যে উচ্চস্থান দেওয়া হয় তাহার সহিত সামঞ্জস্য-বিহীন।

কিন্তু উপরোক্ত অপকর্ষ এবং অসঙ্গতিই হাস্যরসের পর্যাপ্ত কারণ হইতে পারে না। অসঙ্গতি এবং অপকর্ষ যদি এইরূপ আকারের হয় যে উহার ফলে অন্য কোনো তীব্রতর প্রক্ষোভ জন্মিতে পারে, তাহা হইলে হাস্যরসের উৎপত্তি না হইয়া অন্য কোনো রসের, এমন কি বিপরীত রসেরও, উৎপত্তি হইতে পারে। যেমন একজন বয়স্ক লোককে স্বাভাবিক অবস্থায় পড়িয়া যাইতে দেখিলে আমরা হয়ত হাসিয়া উঠি, কারণ এই হাস্যরস অন্য কোনো তীব্রতর প্রক্ষোভের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু এই পতন যদি এমন সাংঘাতিক হয় যে পতিত ব্যক্তির হাত পা ভাঙ্গিয়া গেল অথবা ঐ ব্যক্তি মরিয়াই গেল, তাহা হইলে হাস্যরসের পরিবর্তে করুণ রসের আবির্ভাব ঘটে।

আবার যাহার পতনের ফলে অসঙ্গতিবোধ এবং আমাদের আত্ম-মহিমা-বোধের প্রভাবে আমরা হাসিয়া উঠি, তাহার সহিত আমাদের **সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক।** যেমন গাছ হইতে একটি পাখী, অথবা শিশু বা বৃদ্ধলোক পড়িয়া গেলে, ঐ পতন দেখিয়া আমরা হাসিয়া উঠি না, কিন্তু দুঃখিতই হই।

হার্বার্ট স্পেন্‌স্‌র্‌-এর মত

হাসির কারণ সম্বন্ধে হার্বার্ট্ স্পেন্সর্ হব্‌স্‌-এর তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে **নার্ভশক্তির প্রাচুর্য বা অতিরিক্ততা (সার্প্লাস্ নার্ভাস্ এনার্জি) হাসির যথার্থ কারণ।** নার্ভশক্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত হইলে, হাসির মধ্য দিয়া উপ্‌চাইয়া পড়ে। এই মতে প্রতিবেশের সহিত উপযোজনে নার্ভতন্ত্রের সকল শক্তি ব্যয়িত না হইয়া, উহার কিছু অবশেষ থাকে। এই অবশিষ্ট নার্ভশক্তি ব্যয়িত হয় হাসির মধ্য দিয়া। কিন্তু হার্বার্ট্ স্পেন্সর্-এর এই মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখে হয়ত শেষ নিশ্বাস ফেলিবার কালেও হাসির রেখা লাগিয়া থাকে। এই ব্যক্তির হাসি নার্ভশক্তির প্রাচুর্যের ফলে ঘটিয়াছে এইরূপ বলা যায় না। তাহা ছাড়া, হাসি শুধু জৈব কারণেই ঘটিয়া থাকে, এইরূপ মতও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। হাসির মানসিক কারণ উপেক্ষণীয় নয়।

বের্গসোঁ-এর মত

বের্গসোঁ মনে করেন যে হাসি শুধু ব্যক্তিগত কারণে ঘটে না, কিন্তু ঘটে সামাজিক কারণে। **হাসি সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।** আড়ষ্ট, এলোমেলো এবং যান্ত্রিক ব্যবহার হাস্যোদ্রেক করিয়া থাকে, কারণ ইহা সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতিকূল। এই সকল আচরণ হাসির উদ্রেক করে বলিয়া আচরণকারী তাহার আচরণের অসঙ্গতি বুঝিতে এবং উহা সংযত করিতে শিখে, ফলে তাহার সামঞ্জস্যসাধনের অক্ষমতা সংশোধিত হয় এবং সামাজিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসে।

কিন্তু বের্গসোঁ-এর মতও সর্বাংশে সত্য নয়। হাসি যে ব্যক্তির আচরণের আড়ষ্টতা এবং অনমনীয়তা অথবা অসামঞ্জস্য সংযত করে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। যে ব্যক্তি জুতা পায়ে পরিয়া অথবা চশমা চোখে আঁটিয়া উহা খুঁজিয়া বেড়ায়, সে অপরের হাস্যোদ্রেক করে এবং সকলকে হাসিতে দেখিয়া নিজকে শোধ্‌রাইয়া লইবার সুযোগ পায়। কিন্তু হাস্যরস যে সর্বদাই সামাজিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধন করে এমন নয়। বিশুদ্ধ হাস্যরস স্বতঃসঞ্জাত। ইহা অন্য কোনে উদ্দেশ্য সাধনের ধার ধারে না।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌-এর মত

হাসির কারণ সম্পর্কে ম্যাকড়গ্যাল্‌-এর মতে হাসির সামাজিক মূল্য অন্যরূপ। তাঁহার অভিমত এই যে **হাস্যরস সহানুভূতির (সিম্‌প্যাথি) প্রতিকার (অ্যান্টিডোট্‌) বিশেষ।**

সহানুভূতি সমাজজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ইহা জীবনের দুঃখযন্ত্রণার লাঘব করে। ইহা পরম দুঃখে এবং ব্যথায় সান্ত্বনার প্রলেপ বুলাইয়া দেয়। কিন্তু সহানুভূতি যেরূপ সমাজজীবনের পক্ষে হিতকর, তেমন ক্ষতিকরও বটে। সহানুভূতি মানুষকে সর্বদা তাহার দুঃখের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সহানুভূতির ফলে মানুষ দুঃখ ভুলিতে চাহিলেও উহা ভুলিতে পারে না।

হাসি জীবনের দুঃখময় দিক্‌ হইতে মনোযোগ সরাইয়া দুঃখ হাল্‌কা করিয়া দেখিবার সুযোগ দেয়। দুঃখময় জীবনও হাসির মাধুর্যে সতেজ ও সরস হইয়া ওঠে। হাসি শরীর ও মনকে সুস্থ-সবল করে এবং জীবন-সংগ্রাম সহনীয় করিয়া তোলে।

উপসংহার

হাস্যরস মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। মনুষ্যেতর প্রাণীরা এই রস হইতে বঞ্চিত। অ্যারিস্টট্‌ল্ মানুষকে "হসনশীল প্রাণী (লাফিং অ্যানিম্‌ল্)" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হাসির কারণ আংশিকভাবে ব্যক্তিগত, সামাজিক, দৈহিক, জৈব এবং মানসিক। এই বিষয়ে যত মতভেদই থাকুক না কেন, হাসি যে সুখময় অনুভূতির জ্ঞাপক তাহাতে সন্দেহ নাই।

৭। শীল-রস (মর‍্যাল্ সেন্‌টিমেণ্ট্)

যে রস নৈতিক আদর্শকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় তাহাকে শীল-রস বলে। এই রসের অবলম্বন চরিত্র, সততা, ন্যায়, নির্ভীকতা, বীরত্ব, পবিত্রতা, কর্তব্য প্রভৃতি নৈতিক আদর্শ।

শীল-রস উদ্দীপিত হয় শীল অথবা নৈতিক আচরণ দ্বারা। অথবা শীল বা নৈতিক আচরণ (মর‍্যাল্ কন্‌ডাক্ট্) নিয়ন্ত্রিত হয় শীল-রসের দ্বারা।

শীল-রসে **অনুভূতি, অবগতি এবং ইচ্ছা, এই তিন প্রকারের উপাদানই বর্তমান থাকে।** এই রসের ইচ্ছামূলক উপাদান স্পষ্ট। ইহা উদ্রিক্ত হয় শীল বা আচরণের ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে অবধারণায়। ন্যায় আচরণ করা উচিত এবং অন্যায় আচরণ করা অনুচিত, এইরূপ কর্তব্য (ডিউটি) এবং বাধ্যবাধকতা বোধ (সেন্স্ অফ্ মর‍্যাল্ অব্‌লিগেশান্) শীল-রসের **ইচ্ছামূলক উপাদান।** এইরূপ উপলব্ধির সহিত ন্যায় শীল আচরণ এবং অন্যায় শীল বর্জন করিবার একটি ক্রিয়া-প্রবণতা (টেন্‌ডেন্‌সি টু অ্যাক্‌শন্) জড়িত থাকে।

আবার শীল-রসের অন্তর্নিহিত অবগতিমূলক উপাদানও লক্ষণীয়। ক্রিয়াপ্রবণতার কারণ কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা বোধ, আবার দ্বিতীয়টির কারণ ন্যায় এবং অন্যায় শীলের অবধারণা (মর‍্যাল্ জাজ্‌মেণ্ট্)। এই অবধারণা সম্ভব হয় অবধান বা মনোযোগ সাহায্যে। শীলের ন্যায়-অন্যায় বিবেক বা পার্থক্য জ্ঞানই শীল-রসের প্রধান **অবগতিমূলক উপাদান।**

শীল-রসের অনুভূতিমূলক উপাদানে আবার অনেক প্রকারের প্রক্ষোভ থাকে। ন্যায়ান্যায়বোধের সহিত জড়িত থাকে ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ এবং অন্যায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিরক্তি। ন্যায়-শীল আচরণ করিতে না পারিলে জাগে অনুতাপ বা অনুশোচনা (রিপেন্‌ট্যান্স্) এবং উহা আচরণ

করিতে পারিলে জাগিয়া ওঠে আত্মপ্রসাদ বা **আত্মসন্তুষ্টি**। শীল-রসের প্রধান **অনুভূতিমূলক উপাদান** হইল আত্মপ্রসাদ, শ্রদ্ধা, অনুরাগ, আকর্ষণ প্রভৃতি।

৮। ধর্মীয় রস (রিলিজিয়াস্ সেন্টিমেন্ট্) বা ভাগবত রস (ডিভাইন্ সেন্টিমেন্ট্)

যে রস ধর্মীয় আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বর বা কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তার সহিত মানুষের সম্বন্ধকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হয়, তাহাকে ধর্মীয় রস (রিলিজিয়াস্ সেন্টিমেন্ট্) বলে।

ধর্মীয় রস সকল রসের চরম পরিণতি বা পরিপাক। সত্যাশ্রিত রস, কান্ত রস এবং শীল রস ধর্মীয় রসে চরম উৎকর্ষ লাভ করে।

ধর্মীয় বা ভাগবত রসের বস্তু হইল একটি সর্বান্তর্ভাবী সত্তা। এইরূপ কোনো সত্তা যথার্থ, কি অযথার্থ তাহা মনোবিদ্যার জিজ্ঞাস্য নয়। সর্বান্তর্ভাবী সত্তার প্রতি মানুষের সমগ্র সত্তা অভিমুখী হয় এই বাস্তব ঘটনাই মনোবিদ্যার আলোচ্য। ধর্মীয় বা ভাগবত রসে মানুষের সমগ্র সত্তা অংশ গ্রহণ করে। ইহার তুলনায় অন্যান্য সকল রসগুলি আংশিক—কারণ উহাদের কোনোটিতেই একটি সর্বান্তর্ভাবী সত্তার সহিত মানুষের সমগ্র সত্তার উপযোজন ঘটে না। তাহা ছাড়া, অন্যান্য রসগুলির বিষয় হইল সীমাবদ্ধ, আর ধর্মীয় রসের বিষয় অসীম।

ধর্মীয় রসে **অবগতিমূলক উপাদান** অংশ গ্রহণ করে। ইহাতে অন্ততঃ এইটুকু জ্ঞান থাকে যে ইহা অন্যান্য রস হইতে ভিন্ন। এই পার্থক্য জ্ঞানের মূলে থাকে অন্যান্য রসবস্তুর সহিত ধর্মীয় রসবস্তুর সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য জ্ঞান। ধর্মীয় রস শুধু ব্যক্তিগত রুচিবৈচিত্র্য নয় কিন্তু উহা বিষয়গতও বটে। উহার বিষয় এমন সত্তা, যাহার সংস্পর্শেই এই রসের আবির্ভাব ঘটিতে পারে।

আবার ধর্মীয় রস **ইচ্ছামূলকও** বটে। ধর্মীয় রস নানা প্রকার ক্রিয়ায়, নিয়মনিষ্ঠায় এবং আচরণে আত্মপ্রকাশ করে। যেমন পূজা, প্রার্থনা, ব্রত, নিয়ম, উপবাস প্রভৃতি ধর্মাঙ্গগুলি ধর্মীয় রসের বিভিন্ন ক্রিয়াত্মক প্রকাশ। তাহা ছাড়া, মন্দির, মসজিদ্, গীর্জা, উপাসনা-মন্দির প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মূলও ধর্মীয় রস।

ধর্মীয় রসের **প্রধান উপকরণ অনুভূতি ও প্রক্ষোভ।** ভয়, বিস্ময়, ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, আত্মসমর্পণ প্রভৃতি অনুভূতি ধর্মীয় রসের সংগঠক। ধর্মীয় রস **বিস্ময়**-মিশ্রিত, কারণ ইহার বিষয় বিরাট।

বিরাট মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পক্ষে দুরবগাহ, সুতরাং বিস্ময়কর। ইহার এই বিরাটত্ব জীবকে যেমন আকর্ষণ করে তেমনই যেন দূরে সরাইয়া রাখে। ইহা **ভয়, প্রেম, এবং শ্রদ্ধারও বস্তু**। মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে চায় আপন হইতেও আপনার রূপে; তাই তাঁহাকে ভালবাসে। আপনার হইয়াও ঈশ্বর বিরাট। তাই তাঁহার প্রতি জাগে ভক্তি বা শ্রদ্ধা। তিনি উপলব্ধ হন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং পালয়িতা রূপে, তাই জাগে তাঁহার প্রতি **কৃতজ্ঞতা**। আবার তাঁহাকে মানুষ উপলব্ধি করে তাহার একান্ত প্রভুরূপে, তাই জাগে তাঁহার প্রতি **আত্মসমর্পণ** কামনা।

উপসংহার

ধর্মীয় রসে সত্যাশ্রয়ী রসের বিস্ময়, কৌতূহল, অবধান, শীলরসের শ্রদ্ধা প্রভৃতি, এবং কান্তরসের বিরাট-অনুভূতি, ভয়, আকর্ষণ প্রভৃতি মিলিত হয়। এই সর্বান্তর্ভাবী রসে সকল রসের পরিণতি এবং পরিপক্বতা ঘটে।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

মেলোন্ অ্যাণ্ড ড্রামণ্ড—এলিমেণ্ট্স্ অফ্ সাইকলজি—চতুর্থ-অষ্টম পরিচ্ছেদ
জি. এফ্ ষ্টাউট্—এ ম্যানুয়্যাল্ অফ্ সাইকলজি—চতুর্থ খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ
ডবল্যু ম্যাক্‌ডুগাল্—আউটলাইন্স্ অফ্ সাইকলজি—একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
ই বি. টিশ্‌নার—এ প্রাইমার অফ্ সাইকলজি—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

Exercise

1 Difine sentiment. In what different senses is the term sentiment used? What is the true sense of the term? (pp 689-698)
2. What are the main kinds of sentiment? (p 691)
3. Give an analysis of the intellectual sentiment (p. 692)
4 Analyse the aesthetic sentiment. What are its characteristics? (pp. 693-694)
5. Explain the sentiment of the sublime as distinguished from that of the ludicrous. What is the sentiment of tragedy? (pp. 694-696)
6 Give a psychological analysis of the comic sentiment. What are the causes of laughter? (pp. 696-699)
7 Analyse briefly the moral sentiment. (pp. 699-700)
8. What is the religious sentiment? Is it the highest sentiment? (pp 700-701)

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সাম্প্রতিক মনোবিদ্যার বিভিন্ন সম্প্রদায় (কন্‌টেম্‌পোরারি স্কুল্‌স্‌ অফ্‌ সাইকলজি)

১। মনোবিদ্যার শাখা[1] ও সম্প্রদায়—ইহাদের পার্থক্য

মনোবিদ্যার শাখা বলিতে বুঝায় ইহার বিভাগ বা অংশগুলিকে, যেমন বৃক্ষের শাখা বলিতে বুঝায় ইহার বিভাগ বা অংশকে। মনোবিদ্যার সহিত উহার শাখাগুলির সম্পর্ক **অবয়বীর সহিত অবয়বের সম্বন্ধ,** অথবা একটি সমগ্র বা গোটা বস্তুর সহিত উহার বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধ। অর্থাৎ, অনেকগুলি শাখা লইয়াই মনোবিদ্যারূপ সমগ্র বিজ্ঞানটি গঠিত।

কিন্তু মনোবিদ্যার সম্প্রদায় বলিতে উহার অংশ বা বিভাগ বুঝায় না, বুঝায় **মনোবিদ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মত ও পথ।** মনোবিদ্যার সহিত উহার সম্প্রদায়গুলির সম্বন্ধ অবয়বী এবং অবয়বের অথবা সমগ্র এবং অংশের সম্বন্ধ নয়, **কিন্তু এক প্রকার মনোবিদ্যার সহিত অন্য প্রকার মনোবিদ্যার সম্বন্ধ।** প্রত্যেকটি মনোবিদ্যা সম্প্রদায়ই এক একটি সমগ্র বা গোটা মনোবিদ্যা এবং প্রত্যেকটি সম্প্রদায়েরই বিভিন্ন শাখা থাকিতে পারে। এক শ্রেণীর আম গাছের সহিত অন্য শ্রেণীর আম গাছের সম্বন্ধ যেমন গাছ এবং উহার শাখার সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌, তেমন মনোবিদ্যার একটি সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ মনোবিদ্যা এবং উহার শাখার সম্বন্ধ হইতে পৃথক্‌।

যেমন, শিশু মনোবিদ্যা মনোবিদ্যার একটি অংশ বা শাখা। পক্ষান্তরে চেষ্টিত মনোবিদ্যা মনোবিদ্যার একটি সম্প্রদায়। চেষ্টিত মনোবিদ্যা একটি সমগ্র বা গোটা মনোবিদ্যা। কিন্তু শিশু মনোবিদ্যা সমগ্র নয়, ইহা সমগ্র মনোবিদ্যার শাখা বা অংশবিশেষ। চেষ্টিত মনোবিদ্যারও বিভিন্ন শাখা থাকিতে পারে। যথা, চেষ্টিত মনোবিদ্যার মত ও পথ অনুসারে শিশু মনোবিদ্যা, শিক্ষা মনোবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন শাখাগুলির আলোচনা হইতে পারে। **মনোবিদ্যার শাখা এবং মনোবিদ্যার সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ, কিন্তু মনোবিদ্যার সম্প্রদায় এবং মনোবিদ্যার সম্বন্ধ উপজাতি এবং জাতির সম্বন্ধ।**

১ এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদ (পৃঃ ৬৫—৮১) দ্রষ্টব্য।

মনোবিত্থার বিভিন্ন সম্প্রদায়

মনোবিত্থা অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে, যেমন—**ক্রিয়াবাদী (ফাংশন্যালিস্ট্), অবয়ববাদী (স্ট্রাক্‌চার‍্যালিস্ট্), চেষ্টিতবাদী (বিহেভিয়রিস্টিক্), সমগ্রবাদী (গেস্টাল্ট্), উদ্দেশ্যবাদী (হর্মিক্)** এবং **মনঃসমীক্ষণবাদী (সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল্)**।

২। মনের ক্রিয়া (ফাংশন্) এবং অবয়ব বা গঠন (স্ট্রাক্‌চার্)

অন্যান্য বস্তুর মত মনেরও দুই দিক্ হইতে আলোচনা করা যায়—একটি মনের গঠন (স্ট্রাক্‌চার্) বা সত্তার (এক্‌জিস্টেন্স্) দিক্ এবং অপরটি উহার ক্রিয়ার বা কাজের (ফাংশন্) দিক্। প্রথম দিক্ হইতে মন সম্বন্ধে প্রশ্ন এই: মন কি কি উপাদানে বা মাল মশলা দিয়া তৈয়ারী? উহাকে বিশ্লেষণ করিলে কি কি অংশ পাওয়া যায়? কোন্ কোন্ উপাদানের সংযোগফলকে মন বলা যাইতে পারে? সত্তা হিসাবে মনের স্বরূপ বা প্রকৃতি কি?

অবয়ববাদ (স্ট্রাক্‌চার‍্যালিজ্‌ম্) মনের গঠন বা সত্তামূলক দিক্‌টির আলোচনা করে। এই মতবাদ ধরিয়া লয় যে মন একটি যৌগিক পদার্থ এবং ইহা কতগুলি মৌলিক অবয়ব বা অঙ্গের সংযোগে গঠিত। অবয়ববাদের মতে মনোবিত্থা মনের গঠন বা সত্তা সম্বন্ধীয় বিত্থা। এই মতবাদকে **সত্তাবাদও (এক্‌জিস্টেন্সিয়্যালিজ্‌ম্)** বলা হয়, কারণ ইহা মনকে নিছক সত্তারূপে দেখে এবং মনের উপর কোনো মূল্যমান আরোপ করে না।

দ্বিতীয় দিক্ হইতে মন সম্বন্ধে প্রশ্ন এই: মনের কাজ বা ক্রিয়া কি? কোন্ কোন্ আচরণে বা চেষ্টিতে মন আত্মপ্রকাশ করে? মনের চেষ্টিতগুলি কি কি নিয়মের অধীন এবং কোন্ কোন্ স্তরে বিকাশলাভ করে? নিয়ত ক্রিয়াশীল বা প্রকাশশীল সত্তা হিসাবে মনের স্বভাব কি? **ক্রিয়াবাদীর (ফাংশন্যালিস্ট্) মতে মনোবিত্থা মনের বিভিন্ন ক্রিয়া বা কার্যপ্রণালীর বিত্থা।**

উহাদের পরস্পর-সাপেক্ষতা

মনের গঠন বা সত্তা এবং কার্য বা প্রকাশ একই মনের দুইটি দিক্। সুতরাং একটি অপরটি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচিত হইতে পারে না। মনের

গঠন বা সত্তা নিষ্ক্রিয় গঠন বা সত্তা নয়, আবার উহার ক্রিয়া, গঠন বা সত্তাহীন মনের প্রকাশ নয়। কাজেই উহারা পরস্পর-সাপেক্ষ।

কার্যতঃও দেখা যায় যে অবয়ববাদী বা সত্তাবাদী মনোবিৎ মনের ক্রিয়া আলোচনা না করিয়া পারেন না, আবার ক্রিয়াবাদী মনোবিৎও মনের সত্তা বা গঠনকে উড়াইয়া দিতে পারেন না। প্রত্যেকেই হয়ত নিজ গবেষণার উৎসাহে অপরকে উপেক্ষা করিতেছেন বলিয়া মনে হইতে পারে।

আসলে ইহাদের একটি অপরটির পরিপূরক। মন আছে বলিয়াই ক্রিয়া করিতে পারে এবং মন ক্রিয়া করিতে পারে বলিয়াই আছে। যে মন কাজ করে না, কিন্তু শুধু থাকে, তাহা মনোবিদ্যার আলোচ্য নয়। আবার যে ক্রিয়া কোনো মানস সত্তার ক্রিয়া নয়, সেইরূপ কর্তাহীন ক্রিয়াও অনেক মনোবিদের মতে অর্থহীন বাগাড়ম্বর মাত্র। যেমন ওয়ার্ড্, স্টাউট্ প্রভৃতি ক্রিয়াবাদী মনোবিৎ মানস সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। আবার হ্বুণ্ড্, কুল্পে, টিশ্‌নার্ প্রভৃতি অবয়ববাদী মনোবিৎ মানসক্রিয়ার আলোচনা না করিয়া পারেন নাই। ইহা সত্ত্বেও, এই দুইটি দিকের একটি বা অপরটির উপর গুরুত্ব আরোপ করিবার ফলে, মনোবিদ্‌গণ অবয়ববাদী (স্ট্রাক্‌চার্যালিস্ট্) এবং ক্রিয়াবাদী (ফাংশন্যালিস্ট্) সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন।

৩। অবয়ববাদী (স্ট্রাক্‌চার্যালিস্ট্) সম্প্রদায়

মনোবিদ্যায় অবয়ববাদের আধুনিক পথিকৃৎ **হ্বুণ্ড্, টিশ্‌নার্, কুল্পে** এবং বিখ্যাত পিতা-পুত্র জেম্‌স্ মিল্ ও জন্ স্টুয়ার্ট মিল্। প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকগণ মনের স্বরূপ এবং গঠন লইয়াই মাথা ঘামাইয়াছেন বেশী। মানস সত্তার প্রবক্তা **প্লেটো** অবয়ববাদী এবং মানস ক্রিয়ার ব্যাখ্যাতা **অ্যারিস্টট্‌ল্** ক্রিয়াবাদী। আবার আধুনিক মনোবিদ্যায় **জন্ লক্** এবং **ডেভিড্ হিউম্** অবয়ব বা সত্তাবাদী।

মানস রসায়ন

টমাস্ ব্রাউন্ এবং জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ রসায়নের আদর্শে মনকে কতগুলি মৌলিক উপাদানে গঠিত যৌগিক পদার্থরূপে ব্যাখ্যা করেন। মানস রসায়ন (মেন্ট্যাল্ কেমিষ্ট্রি) মতে অনুষঙ্গ সূত্র অনুসারে মৌলিক সংবেদনের সংমিশ্রণেই মন তৈয়ারী। ব্রাউন্ এবং মিল্ অবয়ববাদী মনোবিৎ।

এই সম্প্রদায়ের আধুনিক ব্যাখ্যাতা **হ্বিল্‌হেল্‌ম্ হ্বুণ্ড্।** তাঁহার মতে মনোবিদ্যা আন্তর বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার (ইণ্টারন্যাল্ বা ইমিডিয়েট্ এক্স্‌পিয়েরিয়েন্স্) বিদ্যা। মন সংবেদন এবং বেদনা, এই দুইটি মৌলিক উপাদানে গঠিত। সংবেদনের চারিটি লক্ষণ, যথা তীব্রতা, পরিমাণ, গুণ এবং স্থায়িত্ব। আবার বেদনা ছয় প্রকার, যথা সুখ-দুঃখ, চাপ-শিথিলতা, উল্লাস-বিষণ্ণতা। হ্বুণ্ড্ মনে করেন যে প্রত্যক্ষ সংবেদন ও স্মৃতির মিশ্রণ, অনুষঙ্গ-সূত্রে সম্বদ্ধ সংবেদনের উদ্বোধনই স্মৃতি, আবার সংবেদনের মিশ্রণই চিন্তন।

সংপ্রত্যক্ষ (অ্যাপার্শেপ্‌শন্)

হ্বুণ্ড্-এর সংপ্রত্যক্ষ (অ্যাপার্সেপ্‌শন্) মতবাদ প্রসিদ্ধ। **লাইব্‌নিজ্-**এর মত তিনিও চেতনার স্পষ্টতা লক্ষণ সাহায্যে সংপ্রত্যক্ষের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। স্পষ্টতম চেতনাই সংপ্রত্যক্ষ। সংপ্রত্যক্ষ মনোযোগের কারণ। আবার মনোযোগই ক্রিয়া উৎপন্ন করে, সুতরাং সংপ্রত্যক্ষ ক্রিয়ারও কারণ। ফলে, হ্বুণ্ড্-এর মতে, সংপ্রত্যক্ষের সহিত ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের পার্থক্য নাই। **হার্বার্ট্** সকল মানস উপাদানকেই শেষ পর্যন্ত কতগুলি ধারণার অন্তর্নিহিত শক্তিতে পরিণত করিয়াছেন। হ্বুণ্ড্, হার্বার্ট্-এর বুদ্ধিমূলক ব্যাখ্যার সহিত একমত নহেন। তিনি সংপ্রত্যক্ষ বা ইচ্ছাকে একটি মৌলিক মানস শক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই, তাঁহার মতে, মানস উপাদানগুলির **সৃজনী সংশ্লেষণ (ক্রিয়েটিভ্ সিন্‌থেসিস্)** ঘটায়।

টিশ্‌নার্

এড্‌ওয়ার্ড্ ব্র্যাড্‌ফোর্ড্ টিশ্‌নার্ই সর্বপ্রথম 'স্ট্রাক্‌চার‍্যালিজ্‌ম্' এবং 'ফাংশন্যালিজ্‌ম্' কথা দুইটি ব্যবহার করেন। তিনি মনকে **সংবেদন,** এবং **প্রতিরূপ** এবং **বেদনা,** এই তিনটি মৌলিক মানস উপাদানে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই মৌলিক মানস উপাদানগুলি নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন এবং অল্পাধিক স্থায়ী সত্তা। মিল্-এর মত টিশ্‌নার্ও মানস উপাদানের রাসায়নিক সংমিশ্রণ স্বীকার করিয়াছেন। মানস উপাদানের বিভিন্ন সংমিশ্রণই সকল মানসবৃত্তির কারণ। টিশ্‌নার্-এর মতে **অন্তর্দর্শন** মনোবিদ্যার প্রধান পদ্ধতি। প্রত্যেক পরীক্ষা বা প্রয়োগে পাত্রের কাজ হইল তাহার মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন এবং প্রয়োগকর্তার কাজ হইল পাত্রের বাহ্যপ্রকাশগুলি পর্যবেক্ষণ করা। আয়ত্তাধীন

অবস্থায় পাত্রের অন্তর্দর্শন এবং প্রয়োগকর্তার পর্যবেক্ষণ—এই দুইয়ের সমন্বয়েই মনোবিদ্যার **প্রায়োগিক পদ্ধতি** গঠিত।

টিশ্‌নার্‌-এর মতে মনোবিদ্যা "চেতনার বিদ্যা (সায়েন্স অফ্ কন্‌সাচ্‌নেস্)।" চেতনার অবয়ব বা গঠনই মনোবিদ্যার বিষয়। চেতনা যাহা তাহা, অথবা চেতনার সত্তাই উহার গঠন এবং উহার কার্যকলাপই উহার ক্রিয়া। তিনি বলিয়াছেন, **"প্রায়োগিক মনোবিদ্যার প্রধান লক্ষ্য হইল মনের অবয়ব বিশ্লেষণ, চেতনার গ্রন্থি হইতে মৌলিক বৃত্তিগুলির উদ্ঘাটন।"** সংবেদন, প্রতিরূপ এবং বেদনাই চেতনার তিনটি মৌলিক অবয়ব বা অঙ্গ। সংবেদন প্রত্যক্ষের, প্রতিরূপ স্মৃতি, কল্পনা ধারণা প্রভৃতির এবং বেদনা অনুভূতি বা ইমোশন এবং রস (সেন্টিমেণ্ট্)-এর মৌলিক অবয়ব। এই অবয়বগুলি কাল্পনিক নয়, কিন্তু বাস্তব সত্তা। এই কারণে টিশ্‌নার্ তাঁহার মতবাদকে **এক্সিজ্‌টেন্‌শিয়্যালিজ্‌ম্ অথবা সত্তাবাদ** বলিয়াছেন।

অপ্রতিরূপ চিন্তন

"অপ্রতিরূপ চিন্তন" (ইমেজ্‌লেস্ থট্) সম্বন্ধে অবয়ববাদীরা বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন। অজ্‌ওয়ার্ল্ড্ কুল্পে, আল্‌ফ্রেড্ বিনে প্রভৃতি হ্বুণ্ড্-এর অনুগামীরা অন্তর্দর্শন সাহায্যে অপ্রতিরূপ চিন্তন বা মৌলিক ও বিশুদ্ধ চিন্তন উপাদানের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্‌গণের মধ্যেও কেহ কেহ, যেমন অধ্যাপক জি. এফ্. স্টাউট্, অপ্রতিরূপ চিন্তনের সত্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু টিশ্‌নার্ এইরূপ কোনো বিশুদ্ধ বা মৌলিক চিন্তন স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে অপ্রতিরূপ চিন্তনের সত্যতা স্বীকার করিবার মূলে রহিয়াছে মনোবিদ্যার সহিত যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গীর ভ্রম। কুল্পে প্রভৃতি অপ্রতিরূপ চিন্তনের সমর্থকেরা অভিজ্ঞতার সত্তা বর্ণনা না করিয়া উহার অর্থ নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা অন্তর্দর্শন পদ্ধতি ঠিক মত প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। পূর্বেই অভিজ্ঞতার বিষয়টি জানিয়া কিরূপ অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত বা বাঞ্ছনীয় এইরূপ আশা করিয়া অন্তর্দর্শন করিলে **'মনোবিদের ভ্রম'** ('দি সাইকলজিস্ট্'স্ ফ্যালাসি') ঘটে। পূর্বেই অপ্রতিরূপ চিন্তন সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করা হইয়াছে[১]।

১ একত্রিংশ পরিচ্ছেদ, অষ্টম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

তাহা হইলে **মৌলিক মানস উপাদান, উহাদের গুণাবলী এবং উহাদের মিশ্রণের অনুষঙ্গ সূত্র বাহির করাই অবয়ববাদী মনোবিদের কাজ।** **টিশ্‌নার্, সংপ্রত্যক্ষ** স্বীকার করেন নাই। সংবেদন ও প্রতিরূপের স্পষ্টতা বাড়ানোর কাজটি মনোযোগের, সংপ্রত্যক্ষের নয়। **অর্থ বা মিনিং** বলিতে উঁহারা বোঝেন মানসগঠনের পটভূমি।

সত্তাবাদ (এক্সিজ্‌টেন্‌শিয়্যালিজ্‌ম্)

টিশ্‌নার্ প্রভৃতি অবয়ববাদী মৌলিক মানস উপাদানগুলিকে সত্তা বলিয়া মনে করেন। পরবর্তীকালে টিশ্‌নার্ তাঁহার সম্প্রদায়কে অবয়ববাদী না বলিয়া সত্তাবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সত্তাবাদী মনোবিৎ মানসবৃত্তির গঠন, সত্তা, পবিমাণ, গুণ, প্রভৃতির আলোচনা করেন এবং উহাব কোনো উদ্দেশ্য বা মূল্যাযন স্বীকার করেন না।

৪। ক্রিয়াবাদী বা ফাংশন্যালিস্ট্ সম্প্রদায়

ক্রিয়াবাদী বা ফ্যাংশন্যালিস্ট্ মনোবিদ্যা মনের সত্তা বা গঠন আলোচনা না কবিয়া উহাব ক্রিযাবলী আলোচনা কবে। এই মতে মনোবিদ্যা চেতনার বিদ্যা (সায়েন্স্ অফ্ কন্‌সাচ্‌নেস্) নয়, কিন্তু **মানসক্রিয়ার বিদ্যা** (সাযেন্স অফ্ মেণ্ট্যাল্ প্রসেসেস্)।

এই মনোবিদ্যাব মূল উৎস সম্ভবতঃ অ্যাবিস্টট্‌ল্। তিনি মনকে একটি সত্তা মাত্র হিসাবে গ্রহণের বিরোধী। তাঁহার মতে মনোবিদ্যার বিষয় শুধু মনের সত্তা বা গঠন নয়, কিন্তু প্রধানতঃ উহার ক্রিয়া বা কার্যকলাপ।

সাম্প্রতিক ক্রিয়াবাদ প্রসার লাভ কবিয়াছে বিশেষ কবিযা আমেরিকায, অধ্যাপক **উইলিয়াম জেম্‌স্** এবং **জন ডিউই**-এর নেতৃত্বে। জার্মান মনোবিৎ হ্যারল্ড্ হেফডিংও ক্রিয়াবাদেব সমর্থন করিয়াছেন। ক্রিযাবাদী মনোবিদ্যা জীববিদ্যাকে (বায়লজি) উহার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে। পরিবেশের সহিত উপযোজন প্রাণীর প্রধান ধর্ম। ক্রিয়াবাদী মনোবিৎ দেখাইতে চাহেন যে মন বলিতে বুঝায় পরিবেশের সহিত উপযোজন করিবার সামর্থ্য। তাহার মতে জীববিদ্যার আদর্শে বা ভিত্তিতে মনোবিদ্যার ব্যাখ্যা করা সঙ্গত। **মনোবিদ্যা মনের উপযোজন ক্রিয়ার বিদ্যা।**

উইলিয়াম্ জেম্স্

জেম্স্ নিজকে কোনো সম্প্রদায়ের সহিত জড়িত না করিয়া উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে মনোবিদ্যার গবেষণা করিয়াছেন। তিনি মনকে কতগুলি পৃথক সত্তায় বিভক্ত করেন নাই। তাঁহার মতে মন সংগঠনমূলক সত্তা নয়, কিন্তু ক্রিয়া। চেতনা একটি ধারা বা প্রবাহ। মন চেতনা-প্রবাহ ছাড়া কিছু নয়। অনুষঙ্গবাদীরা কতগুলি কল্পিত পৃথক্ সত্তাকে অনুষঙ্গ সাহায্যে সংমিশ্রিত করিয়া মানসজীবনের ব্যাখ্যা করেন। জেম্স্-এর মতে এই পৃথক্ সত্তাগুলি নাই। জেম্স্ নিজকে ক্রিয়াবাদী বলিয়া অভিহিত না করিলেও, তাঁহার মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রিয়াবাদের অনুকূল।

জন্ ডিউই

ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যার নির্দিষ্ট সূত্র নির্দেশ করেন জন্ ডিউই। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে প্রতিবেশের সহিত অবয়বীর (অর্গ্যানিজ্‌ম্) উপযোজনই মনোবিদ্যার আলোচ্য। ডিউই ক্রিয়া (ফাংশন) বলিতে বুঝেন কোনো উদ্দেশ্য সাধন করা। ডিউই-প্রদর্শিত সূত্র অবলম্বন করিয়া **জে. আর্. এঞ্জেল্** ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যার প্রসারিত ভূমি রচনা করেন। তাঁহার মতেও অঙ্গ বিশেষের ক্রিয়া নয়, কিন্তু সমগ্র অবয়বীর ক্রিয়াই মনোবিদ্যার বিষয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যায় **অন্তর্দর্শন** পদ্ধতির কোনো স্থান নাই, কারণ ব্যক্তির ক্রিয়াই উহার আলোচ্য এবং ক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণই করিতে হয়। কিন্তু কার্যতঃ ক্রিয়াবাদী মনোবিৎ অন্তর্দর্শন পদ্ধতিকে ত্যাগ করিতে চাহেন না, কারণ সকল মানসক্রিয়ার সহিত মানস অভিজ্ঞতা অথবা চেতনাও থাকে এবং ইহার জ্ঞানলাভে অন্তর্দর্শন আবশ্যক।

জেম্স্ ওয়ার্ড্-এর মনোবিদ্যাও ক্রিয়াবাদের অনুকূল। পৃথক্ মানস-সত্তাগুলি অনুষঙ্গ সূত্রের দ্বারা যোজিত হইয়া অভিজ্ঞতা উৎপন্ন করে, অবয়ব-বাদীর এইরূপ মতবাদ তিনি স্বীকার করেন নাই। তিনি এবং তাঁহার অনুগামী **স্টাউট্** মনকে ক্রিয়াশীল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার **ম্যাক্‌ডুগ্যাল্** উদ্দেশ্যমূলক বা হর্মিক মনোবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা হইলেও, তাঁহাকে ক্রিয়াবাদী মনোবিৎ বলা যায়, কারণ তাঁহার মতে মনের প্রধান ধর্ম হইল কাজ করা। সাধারণতঃ, ক্রিয়াবাদীরা মনকে স্থায়ী সত্তা হিসাবে স্বীকার করেন না। কিন্তু ওয়ার্ড্, স্টাউট্, সালি, হেফ্‌ডিং প্রভৃতি ক্রিয়াবাদী মনোবিদেরা মানস

সত্তা স্বীকারের পক্ষপাতী। তাহা ছাড়া, অন্যান্য অনেক ক্রিয়াবাদীর তুলনায় ইঁহারা অন্তর্দর্শন পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

অবয়ব-বাদ এবং ক্রিয়াবাদের সম্বন্ধ

অবয়ববাদ ও ক্রিয়াবাদকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়। টিশ্‌নার্‌ উত্তরকালে এই দুই মতবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিষয়ে অবহিত হইয়াছিলেন। আবার কুল্পেও সঙ্কল্পে বা ইচ্ছাশক্তিতে উপযোজনের (অ্যাড্‌জাস্ট্‌মেণ্ট্‌) প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া পরোক্ষ ক্রিয়াবাদের সমর্থন করিয়াছিলেন। ক্যাটেল্‌ প্রভৃতি স্থুঃ,গুপন্থিগণও চেতনা অপেক্ষা মানস ক্রিয়ার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, ওয়াশ্‌বার্ন্‌, হোল্ট্‌, মণ্টেগ্‌ প্রভৃতি অবয়ববাদিগণও ক্রিয়াবাদের মূল্য স্বীকার করিয়াছেন।

এদিকে ক্রিয়াবাদিগণও মনোবিত্থায় মানসবৃত্তি এবং অভিজ্ঞতার স্থান স্বীকার করিয়া পরোক্ষে অবয়ববাদকে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা অন্তর্দর্শনের মূল্যও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। সুতরাং বর্তমানে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। অবয়ববাদী ক্রিয়া এবং উপযোজন স্বীকার করিয়াছেন, আবার ক্রিয়াবাদীও চেতনা বা অভিজ্ঞতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন।

সে যাহা হউক, গঠন বা সত্তা এবং ক্রিয়া বা প্রকাশ মনের দুইটি প্রধান দিক। ইহাদের পারস্পরিক প্রাধান্যই এই দুই সম্প্রদায়ের আলোচ্য।

৫। চেষ্টিতবাদ বা বিহেভিয়রিজ্‌ম্‌

চেষ্টিতবাদ বা বিহেভিয়রিজ্‌ম্‌-এর মতে চেষ্টিতের বিত্থাই মনোবিত্থা। জে. বি. ওয়াট্‌সন্‌ এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতারূপে পরিচিত। কিন্তু ওয়াট্‌সন্‌-এর পূর্বেই ম্যাক্স্‌ মেয়র্‌ তাঁহার "দি ফাণ্ডামেণ্টাল ল'জ্‌ অফ্‌ হিউম্যান্‌ বিহেভিয়র্‌" এবং "সাইকলজি অফ্‌ দি আদার্‌ ওয়ান্‌" নামক দুইখানি গ্রন্থে চেষ্টিতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

চেষ্টিত মনোবিত্থার প্রধান বক্তব্য

(১) মনোবিত্থা চেষ্টিতের বিত্থা। চেষ্টিত বলিতে বুঝায় উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া এককের সমষ্টি। উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া বলিতে বুঝায় প্রতিবর্ত বা

রিফ্লেক্স্ অ্যাক্‌শন্। সুতরাং চেষ্টিত কতগুলি প্রতিবর্তের সমষ্টি। আবার সাপেক্ষ প্রতিবর্ত[১] গঠন করে উচ্চতর চেষ্টিতগুলি।

(২) মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী অতীতে পাত্রগত বা সাব্‌জেক্‌টিভ্ ছিল। পাত্রগত দৃষ্টিভঙ্গী মনোবিদ্যাকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পর্যবসিত করে। কিন্তু ওয়াট্‌সন্-এর মতে মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়গত। ফলে, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যাও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

(৩) মনোবিদ্যায় অন্তর্দর্শনের স্থান নাই। অন্তর্দর্শন ব্যক্তির মনেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং ইহার সাহায্যে সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তলাভের চেষ্টা বৃথা। অন্তর্দর্শন-মনোবিদ্যা (ইন্‌ট্রস্‌পেক্‌টিভ্ সাইকলজি) একই প্রশ্নের সমাধানে পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। যেমন একই অন্তর্দর্শন পদ্ধতির ভিত্তিতে টিশ্‌নার্ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে অপ্রতিরূপ চিন্তন অসম্ভব, আবার কুল্পে, স্টাউট্ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে ইহা সম্ভব।

অন্তর্দর্শন পদ্ধতির পরিবর্তে **বাচিক বিবরণ পদ্ধতি** গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই মনোবিদ্যার বিষয়গত পদ্ধতি। পাত্রের বাচিক বিবরণ শুনিয়া তাহার চেষ্টিত বুঝিতে হইবে। মানুষের প্রধান প্রতিক্রিয়া কথা বলা। উদ্দীপক উপস্থিত হইলেই, উহার প্রতিক্রিয়া সে ভাষায় প্রকাশ করে। এইরূপ পদ্ধতির সাহায্যে মনোবিদ্যায় কতগুলি সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব।

(৪) মনোবিদ্যায় 'মন', 'চেতনা' প্রভৃতি প্রচলিত ধারণাগুলি বর্জন করিতে হইবে। এই ধারণাগুলি বৈজ্ঞানিক নয়, কিন্তু দর্শনের পক্ষপুটে আশ্রিত। চেষ্টিতের অতিরিক্ত কোনো চেতন বা মানস সত্তা নাই। **তথাকথিত মানস সত্তা বা ক্রিয়াগুলি চেষ্টিত ছাড়া কিছু নয়।**

(ক) **সংবেদন এবং প্রত্যক্ষ** গতীয় প্রতিক্রিয়া বা মোটর্ রেস্‌পন্স বিশেষ। পাত্র একটি রং দেখিয়া বলিল যে সে রং দেখিতেছে। এই বাচিক বিবরণই তাহার রং দেখারূপ সংবেদন বা প্রত্যক্ষ। আবার (খ) **স্মৃতি** এবং **কল্পনা** বিচলন (মুভ্‌মেণ্ট্) বিশেষ। **প্রতিরূপ** সংবেদচেষ্টীয় (সেন্সরি-মোটর্) ক্রিয়ার নামান্তর। (গ) **চিন্তন** বলিতে বুঝায় **অস্পষ্ট গতীয় চেষ্টিত (ইম্‌প্লিসিট্ মোটর্ বিহেভিয়র্)**। অনেক সময় শিশু সবাকভাবে চিন্তা করে। শিশু হয়ত, শোনা যায় এমন ভাবে কথা বলিতে বলিতে কাজ করিয়া যায়।

১ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ১৫১-১৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পরবর্তী ধাপে সে স্বগতভাবে কথা বলে। আরও পরে চিন্তা করিবার সময় তাহার ঠোঁট নড়ে এবং সর্বশেষে সে চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলিতে শিখে, যাহা বাহিরের বিচলনে প্রকাশ পায় না, কিন্তু স্বরযন্ত্রের অস্পষ্ট বিচলনে পর্যবসিত হয়। **চিন্তা বাগ্‌যন্ত্রের কতগুলি সূক্ষ্ম বা অস্পষ্ট বিচলন ছাড়া কিছু নয়। চিন্তন একপ্রকার নির্বাক ভাষা। সূক্ষ্ম যন্ত্র সাহায্যে চিন্তনকালীন বাগ্‌যন্ত্রবিচলন ধরা পড়ে।** (ঘ) **বেদনা ও প্রক্ষোভ** বা অনুভূতির কেন্দ্র মস্তিষ্ক নয়—ইহারাও সংবেদ-চেষ্টীয় বা সেন্সরি-মোটর্ বিচলন। সংবেদ-প্রবাহ আসে কামজ ইন্দ্রিয়গুলি হইতে এবং চেষ্টীয় প্রবাহ যায় পেশী এবং গ্রন্থিগুলিতে, যাহার ফলে সুখ বস্তুর দিকে অগ্রসর করায় এবং দুঃখ বস্তু হইতে সরাইয়া লয়। **প্রক্ষোভ বা অনুভূতি বলিতে বুঝায় সমগ্র দেহযন্ত্রের, বিশেষ করিয়া আন্তরযন্ত্র (ভিসার‍্যাল্) এবং গ্রন্থিজ (গ্ল্যাণ্ডুলার্)** পরিবর্তন। প্রত্যেকটি অনুভূতি বা প্রক্ষোভ এক একটি নির্দিষ্ট আকারের দৈহিক পরিবর্তন। যেমন, উদ্দীপকের সম্মুখীন হওয়ামাত্র যে অন্তরযন্ত্রীয় এবং গ্রন্থিজ পরিবর্তন ঘটে, সেইগুলির সমষ্টিই ভয়।

(৫) উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার ফলে নার্ভতন্ত্রের সক্রিয় অংশ এইরূপ গঠিত হয়, যে উহার একটি অংশ উদ্দীপিত হইলেই, সংশ্লিষ্ট অংশগুলি উদ্দীপিত হয়। ফলে নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রভাবে নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার নার্ভীয় অভ্যাস বা গঠন (নার্ভাস্ হ্যাবিট্ অর্ প্যাটার্ণ্)-এর সৃষ্টি হয়।

(৬) তাঁহার গবেষণাব প্রথম ভাগে ওয়াট্‌সন্ চেষ্টিতের উপর বংশানুগতিক প্রভাব স্বীকার করেন নাই। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে যে কোনো সুস্থ শিশুকে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে যে কোনো বিশেষজ্ঞে পরিণত করা যায়।

সমালোচনা

নানা দোষ সত্ত্বেও চেষ্টিতবাদ কযেকটি **গুণের অধিকারী।** (১) চেষ্টিতবাদের বৈশিষ্ট্য উহার **প্রগতিশীলতা।** চিরাচরিত মনোবিদ্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় উহার প্রাণশক্তির প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। (২) ইহা মনোবিদ্যাকে দর্শনের বন্ধনপাশ হইতে মুক্ত করিযা স্বতন্ত্র মর্যাদা দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। (৩) চেষ্টিতবাদ সাম্প্রতিক মনোবিদ্যাব প্রত্যেক শাখার উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। (৪) ইহা

বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গী এবং বাচিক বিবরণ পদ্ধতির সাহায্যে মনোবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে উন্নীত করিতে সচেষ্ট।

কিন্তু চেষ্টিতবাদ অনেক **দোষে দুষ্ট।**

(১) **চেতনা, মন** প্রভৃতি ধারণাগুলিকে নির্বাসন করা বড় কথা নয়—বড় কথা হইল উহাদের ব্যাখ্যা। চেষ্টিতবাদ ইহাদের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই। (২) চেষ্টিতবাদ অন্তর্দর্শন পদ্ধতির বদলে বাচিক বিবরণ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু **বাচিক বিবরণ অন্তর্দর্শনের উপর নির্ভরশীল।** লাল রং দেখিবামাত্র পাত্র বলিল যে সে লাল রং দেখিতেছে। এই স্থলে লাল রং সংবেদনের চেতনা না থাকিলে তাহার পক্ষে বাচিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। এই চেতনা অন্তর্দর্শন না হইলেও অন্তর্দর্শনের একটি নিম্নতর স্তর, যাহাকে স্টাউট্ আত্মসচেতনতারূপ দ্বিতীয় স্তর বলিয়াছেন। (৩) প্রতিবর্তকে চেষ্টিতের একক ধরিয়া **চেষ্টিতবাদ মনের ঐক্য উপেক্ষা করিয়াছে।** ইট পর পর সাজাইয়া বাড়ী তৈয়ারী হয়, মনও সেইরূপ কতগুলি মৌলিক প্রতিবর্তের সংযোজন, চেষ্টিতবাদীর এই ধারণা ভুল। মন প্রথম হইতেই একটি গোটা বা সমগ্র বস্তু। (৪) চেষ্টিতবাদ **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত** সাহায্যে চেষ্টিতের ব্যাখ্যা করিয়াছে। সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের উদ্ভাবক প্যাভ্‌লো বা বিছ্‌টিরিও এই মতটিকে মানস-স্তরে প্রয়োগ করেন নাই, কিন্তু শারীরবৃত্তেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। (৫) চেষ্টিতবাদ স্মৃতি, বেদনা, অনুভূতি, চিন্তা প্রভৃতি উচ্চতর মানস ক্রিয়াগুলিকে সংবেদচেষ্টীয় বিচলনরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছে। (ক) কিন্তু **স্মৃতি** যে মন বা চেতনার বিষয়, চেষ্টিতবাদের সেই দিকে লক্ষ্য নাই। যে ব্যক্তির কোনো অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহারই পক্ষে সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতি সম্ভব। এইরূপে স্মৃতি সম্ভব হয় একক চেতনার ক্রিয়া হিসাবে, অথচ চেষ্টিতবাদী একক চেতনা স্বীকার করেন নাই। (খ) আবার বেদনা ও অনুভূতিকে সংবেদ-চেষ্টীয় বিচলন রূপে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া চেষ্টিতবাদী সত্যতার মাত্রা ছাড়াইয়াছেন। এই মানস-বৃত্তিগুলির অন্তভবগম্য বা ভিতরকার দিকটিকে তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। বিশেষতঃ, **অনুভূতি বা প্রক্ষোভ শুধু যান্ত্রিক চেষ্টিত নয়, কিন্তু ইহাতেও বস্তুর জ্ঞান বা চেতনা থাকা আবশ্যক।** বাঘ দেখিলেই যে ভয় হয় তাহা নয়, বাঘকে ভয়ের বস্তু বলিয়া বুঝা বা জানা চাই। আবার (গ) চেষ্টিতবাদের মতে **চিন্তা নির্বাক ভাষা** ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু এই মত গ্রহণের অযোগ্য। প্রথমতঃ, চেতনা বা অর্থবোধ ছাড়া ভাষার উৎপত্তি হয় কিনা

সন্দেহ, কারণ ভাব প্রকাশই ভাষার কাজ। দ্বিতীয়তঃ, নির্বাক ভাষা কি কারণে সংঘটিত হয়, তাহাও চেতনা বা অর্থবোধ ছাড়া বোধগম্য হয় কিনা সন্দেহ। তৃতীয়তঃ, চিন্তা ভাষার নামান্তর হইলে, সর্বদা চিন্তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হইত, অথচ অনেক ক্ষেত্রেই ভাব আছে ভাষা নাই, এমন অবস্থা ঘটিয়া থাকে। চতুর্থতঃ, নির্বাক ভাষায় বাগ্‌যন্ত্রের স্পন্দন ধরিবার মত সূক্ষ্ম যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই—এই কথা ওয়াট্‌সন্ স্বয়ং স্বীকার করেন। **চিন্তাকে অস্পষ্ট বা নির্বাক ভাষা বলা গোঁড়ামির পরিচায়ক।**

(৬) ওয়াট্‌সন্ প্রথমে উগ্র পরিবেশবাদী (র‍্যাঙ্ক্ এন্‌ভায়রন্‌মেণ্টালিস্ট্) ছিলেন এবং বংশানুগতিক প্রভাব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু পরে যখন দেখিলেন যে, যে কোনো সুস্থ শিশুকেই নিউটন্ বা কেপ্‌লার্ করিয়া তোলা যায় না, তখন উগ্র পরিবেশবাদ সংযত করিতে বাধ্য হইলেন।

৭। হর্মিক বা উদ্দেশ্যবাদী মনোবিদ্যা

হর্মিক্ মনোবিদ্যা-মতে উদ্দেশ্যই মনের প্রধান এবং মৌলিক প্রেরক। **উদ্দেশ্য মানসজীবনের একটি বাস্তব ঘটনা।** উদ্দেশ্যমূলক আচরণ বলিতে লক্ষ্যের অনুসন্ধান বুঝায়। **উইলিয়াম্ ম্যাক্‌ডুগ্যাল্** উদ্দেশ্যবাদী মনোবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা। আচরণ বা চেষ্টিত বলিতে তিনি বুঝিয়াছেন উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা। এই চেষ্টিত প্রাণী মাত্রেরই লক্ষণ।

বলা যাইতে পারে যে উদ্দেশ্য একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, সুতরাং মনোবিদ্যায় ইহার স্থান নাই। ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ এইরূপ আপত্তি যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। তাহার মতে উদ্দেশ্য প্রাণিজগতের সার্বভৌম ধর্ম। **উদ্দেশ্যের** নিম্নলিখিত **বাহ্য লক্ষণ** ব্যাখ্যা করিয়া তিনি ইহার স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(১) উদ্দেশ্যমূলক কাজ উদ্দীপকের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়। কিন্তু উদ্দীপক নিষ্ক্রিয় হইবার পরও, কাজটি সফল না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকে। (২) লক্ষ্যে অগ্রগতি ব্যাহত হইলে, উদ্দেশ্য সাধনে বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। এইরূপে উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে। (৩) আবার উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই উদ্দেশ্যমূলক চেষ্টার বিরতি হয়। (৪) উপরন্তু, পুনরাবৃত্তির ফলে উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়ার উন্নতি ঘটে। নিষ্প্রয়োজন বা ব্যর্থ চেষ্টাগুলি বর্জিত, ক্ষিপ্রতর ও সহজতর হয় এবং প্রাণী আরও কার্যকরীভাবে লক্ষ্যে পৌছিতে শিখে।

সহজ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ

প্রাণিচেষ্টিতের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য মনোবিদ্যার প্রধান আলোচ্য। ম্যাক্‌ডুগ্যাল্-এর মতে সকল চেষ্টিতে কতগুলি মৌলিক প্রেষণা (মোটিভ্) কাজ করে। সহজ প্রবৃত্তিই (ইন্‌স্টিংক্‌ট্) প্রাণিচেষ্টিতের মূল প্রেষক। সহজ প্রবৃত্তির মর্মস্থলে (কোর্) প্রক্ষোভ (ইমোশন্) থাকে। যেমন, পলায়ন একটি সহজ প্রবৃত্তি। ইহার উদ্দেশ্য বিপদ হইতে আত্মরক্ষা বা সন্তানরক্ষা এবং ইহার অন্তর্নিহিত প্রক্ষোভ ভয়। অধিকন্তু, উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়াতে অবগতি থাকে। ভয়ের বস্তুটি দেখিয়া বা জানিয়াই পলায়ন-প্রতিক্রিয়া জন্মে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ম্যাক্‌ডুগ্যাল্-এর মতে সহজ প্রবৃত্তির তিনটি দিক্ আছে। প্রথমটি গ্রহণশীল (রিসেপ্‌টিভ্) বা জ্ঞানের দিক্, দ্বিতীয়টি প্রতিক্রিয়াশীল বা কর্মের দিক্ এবং তৃতীয়টি নিষ্ক্রিয় বা অনুভূতির দিক্।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ যে প্রধান বারোটি সহজ প্রবৃত্তির তালিকা দিয়াছেন, তাহা সহজ প্রবৃত্তি পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে।[১] পরে তিনি আরও কয়েকটি ছোটো খাটো সহজ প্রবৃত্তি এই বারোটির সহিত সংযুক্ত করিয়া সহজ প্রবৃত্তির সংখ্যা সতেরোটি করিয়াছেন—যেমন শ্বাসক্রিয়া, হাঁচি কাশি প্রভৃতি। এই বর্ধিত তালিকায় হাসি কান্না, ঘুম প্রভৃতিও স্থান পাইয়াছে। নিজ প্রাধান্য জাহির করা (সেল্‌ফ্-অ্যাসার্টিভ্‌নেস্) এবং বশ্যতা স্বীকার করা (সাব্‌মিসিভ্‌নেস্), তাঁহার মতে, দুইটি প্রধান সহজ প্রবৃত্তি।

এই সহজ প্রবৃত্তিগুলি শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ফলে জটিল আকার ধারণ করে। যেমন শিশুর যোধন প্রবৃত্তির ক্রোধ প্রথমে জাগিয়া ওঠে তাহার স্বাধীন গতিকে গায়ের জোর দিয়া বাধা দিলে, কিন্তু পরে জাগিয়া ওঠে বড়দের হুকুম মত কাজ করিতে বাধ্য হইলে। আবার শিশুর যোধন প্রবৃত্তির সহিত ক্রোধ প্রথমে প্রকাশ পায় চড়, লাথি প্রভৃতিতে এবং পরে প্রকাশ পায় কামড়ানো, আঁচড়ানো, চুলটানা, ঘুঁষি মারা প্রভৃতিতে এবং আরও পরে প্রকাশ পায় রাগারাগি এবং নানা পরোক্ষ অঙ্গভঙ্গীর মধ্য দিয়া।

রস—সেন্টিমেণ্ট্[২]

শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে সহজ প্রবৃত্তির আরও একটি পরিবর্তন ঘটে। **অনেকগুলি সহজ প্রবৃত্তি মিলিত হইয়া রস গড়িয়া তোলে।** দেশপ্রেম

১ ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। ২ পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(পেট্রিয়টিজ্‌ম্) একটি রস। ইহার মূলে থাকে দেশ বিপন্ন হইলে ভয়, আক্রান্ত হইলে ক্রোধ, অন্য দেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজ দেশের প্রাধান্য জাহিরের প্রবৃত্তি এবং জন্মভূমির প্রতি আনুগত্য বা বশ্যতা বোধ।

মানুষের চেষ্টিত বা আচরণ প্রেষিত হয় রসের দ্বারা। রসের সহিত উহার মূলীভূত সহজ-প্রবৃত্তির অনুভূতিও মিশ্রিত থাকে। ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ বলেন যে চেষ্টিত শুধু জ্ঞানের দ্বারাই পরিচালিত হয় না, কিন্তু হয় প্রধানতঃ ভালবাসা, ঘৃণা, আকর্ষণ, সাহস, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উৎসাহ প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি দ্বারা।

কতগুলি সহজ প্রবৃত্তি এবং উহাদের প্রক্ষোভ বা অনুভূতি মিলিত হইয়া যে মানসিক সংগঠন (প্যাটার্ন্) রচনা করে তাহাকেই তিনি রস বলিয়াছেন। রস কোনো আদর্শকে (আইডিয়্যাল্) কেন্দ্র করিয়া উৎপন্ন হয়। যেমন সত্য, শিব এবং সুন্দর এই তিনটি আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া যথাক্রমে সত্যাশ্রয়ী, কল্যাণাশ্রয়ী এবং সৌন্দর্যাশ্রয়ী রস গঠিত হয়। আবার ধর্মাদর্শকে কেন্দ্র করিয়া ধর্মাশ্রয়ী রস সংগঠিত হয়।

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ তাঁহার উদ্দেশ্যবাদের মূল সূত্র অনুসারে মনোবিদ্যার বহু আলোচনা করিয়াছেন। সমাজ মনোবিদ্যা, অস্বভাবী মনোবিদ্যা এবং সাধারণ মনোবিদ্যা তাঁহার উদ্দেশ্যবাদ অনুসারেই রচিত হইয়াছে। যেমন, অস্বভাবী মনোবিদ্যায় তিনি বলিয়াছেন যে বশ্যতামূলক (সাব্‌মিসিভ্) এবং প্রাধান্যমূলক (অ্যাসার্টিভ্) রসের অসামঞ্জস্যই অস্বভাবী আচরণ বা মানসিক রোগের, আবার এই দুইটির সাম্যই (ব্যালেন্স্) স্বভাবী আচরণের মূল কারণ। আবার সমাজ মনোবিদ্যায় তিনি দেখাইয়াছেন যে, মানুষের সহজ প্রবৃত্তিগুলি মিটাইবার উদ্দেশ্যেই সমাজের উৎপত্তি।

৭। গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যা

মানসবৃত্তিগুলির পৃথক্ সত্তা এবং অনুষঙ্গের ফলে উহাদের গঠন বা সংযোজন ঘটে, মনোবিদ্যার কোনো কোনো সম্প্রদায় এইরূপ মত পোষণ করে। ইহাদের বিরুদ্ধ মনোবিদ্যা-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যা প্রধান। গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার মতে মন পৃথক্ পৃথক্ মানস উপাদানের সমষ্টি নয়, কিন্তু প্রথম হইতেই একটি সমগ্র এবং গোটা বস্তু। তথাকথিত পৃথক্ মানস উপাদানগুলি কাল্পনিক, উহাদের বাস্তব অস্তিত্ব নাই।

গতির দর্শন প্রত্যক্ষ

গতি-দর্শন-প্রত্যক্ষের গবেষণা-ভিত্তিতে **হ্বার্‌দাইমার্‌** গেস্টাল্ট্‌ মনোবিদ্যার সূত্রপাত করেন। হ্বার্‌দাইমার্‌ **কোয়েলার্‌** এবং **কফ্‌কা**-এর যুক্ত গবেষণা-ফলই গেস্টাল্ট্‌ মনোবিদ্যা। হ্বার্‌দাইমার্‌ রেটিনা বা অক্ষিপটের **দর্শনক্ষেত্রের দুইটি পাশাপাশি বিন্দুকে পর পর উদ্দীপিত করিয়া দেখিলেন** যে **দুইটি পৃথক্‌ দর্শন প্রত্যক্ষ না ঘটিয়া একটি গতি-প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়।** ৬ সেকেণ্ড ব্যবধানে দুইটি আলো জ্বালাইলে, দুই বিন্দুতে অবস্থিত দুইটি আলো প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দুতে চলমান একটি আলো প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং, প্রত্যক্ষক্ষেত্রের বস্তুগুলির আলাদাভাবে প্রত্যক্ষ না হইয়া **সমগ্র (হোল্‌, কন্‌ফিগারেশন্‌, প্যাটার্ণ্‌) বা গেস্টাল্ট্‌** রূপে প্রত্যক্ষ হইবার প্রবণতা আছে।

প্রত্যক্ষই মৌলিক

গেস্টাল্ট্‌ মনোবিদ্‌গণের মতে তথাকথিত সংবেদনের পরিবর্তে **প্রত্যক্ষই নিম্নতম মানসবৃত্তি।** প্রত্যক্ষ শুধু পৃথক্‌রূপে কল্পিত সংবেদনগুলির যোগফল নয়। **প্রত্যক্ষ একটি সমগ্র বা গোটা,** নূতন এবং মৌলিক মানসবৃত্তি। সমগ্র বা গোটা বস্তুটির বা গেস্টাল্ট্‌-এর এমন অনেক গুণ থাকে, যাহা উহার অংশগুলিতে নাই। এই অংশগুলির প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু প্রত্যক্ষ হয় কোনো সমগ্র বা গোটা বস্তুর। গোটা বা সমগ্র বস্তুটিকে বিচার করিয়া বুঝিবার জন্য উহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশ্লিষ্ট অংশগুলির জ্ঞান এবং সত্তা নির্ভর করে সমগ্র বস্তুটির জ্ঞান এবং সত্তার উপর। অর্থাৎ গেস্টাল্ট্‌ মনোবিদ্যার মতে সমগ্র বস্তু অংশের ভিত্তি। অনুষঙ্গবাদ, পারমাণবিক মনোবিদ্যা অথবা অবয়বী মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে গেস্টাল্ট্‌ মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক্‌। গেস্টাল্ট্‌ মনোবিদ্যা, অধ্যাপক উইলিয়ম্‌ জেম্‌স্‌-এর মত, এই মতবাদ-গুলিকে 'ইট-কাঠ-চূণ মনোবিদ্যা (ব্রিক্‌-অ্যাণ্ড্‌-মর্টার্‌ সাইকলজি)' বলিয়া সমালোচনা করিয়াছে।

ইসোমর্ফিজ্‌ম্‌

প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের এককগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ সংবেদন নয়। উহাদের **আকার, গতি** এবং **ক্রিয়াশীলতা** আছে। উহাদের আকার (প্যাটার্ণ্‌), গতি

(মুভ্‌মেণ্ট্) এবং ক্রিয়াশীলতা (ডায়নামিজ্‌ম্) প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের বিভিন্ন উদ্দীপকের পারস্পরিক ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত। **শুধু যে প্রত্যক্ষই একটি গোটা বা সমগ্র ক্রিয়া তাহা নয়, কিন্তু উহার আনুষঙ্গিক শারীরক্রিয়াগুলিও গোটা বা সমগ্র।** মানসবৃত্তির আনুষঙ্গিক শারীরবৃত্তিগুলিতেও গাঠনিক জটিলতা বা সমগ্রতা বর্তমান থাকে। ইহাই গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার ইসোমর্ফিক্ মতবাদ বলিয়া পরিচিত।

আবার বস্তুর গোটা বা সমগ্র রূপ যে শুধু মানস এবং দৈহিক ক্রিয়াতেই সীমাবদ্ধ, তাহা নয়। কোয়েলার্ দেখাইয়াছেন যে এই সমগ্রতা বাহ্যবস্তুতেও রহিয়াছে। বাহ্য জগতের বস্তুসকল শুধু উহাদের অংশ বা উপাদানগুলির যোগফল নয়। ইহারা এমন গুণের অধিকারী যাহা সমগ্র বা গোটা বস্তুগুলিতেই আছে, কিন্তু উহাদের অংশ বা উপাদানগুলিতে নাই।

শিক্ষণ ও চিন্তন

গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার গবেষণা প্রধানতঃ প্রত্যক্ষে কেন্দ্রীভূত হইলেও, উহাতে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা (লার্নিং) বিষয়ে উহার গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা শুধু ভ্রম এবং সংশোধনের (ট্রায়াল্ অ্যাণ্ড্ এরর্) অথবা সাপেক্ষ প্রতিবর্ত-গঠনের ব্যাপার নয়। **শিক্ষা একপ্রকার পরিজ্ঞান বা ইন্‌সাইট্।** অধিকাংশ শিক্ষা মতবাদগুলি শিক্ষাকে শিক্ষণীয় বস্তুর অংশগুলির সংযোজন বা সম্বন্ধ-স্থাপন বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার মতে শিক্ষা সমগ্র বা গোটা বস্তু হিসাবে শিক্ষণীয় বস্তুর পরিজ্ঞান বা ইন্‌সাইট্। **পরিজ্ঞান ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে না, কিন্তু আকস্মিকভাবে উন্মেষিত হয়।** চিন্তনও অনুরূপভাবে ব্যাখ্যেয়। সহজ প্রবৃত্তিও একটি সমগ্র বা গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে ক্রিয়াশীল। যেমন হাতে বা পায়ে ময়লা দেখিলে হয়ত কোনো শিম্পাঞ্জী বিরক্ত হয়, আবার ঐ ময়লা মুখে থাকিলে উহা খাইয়া ফেলে।

সমালোচনা

মানসবৃত্তিকে সমগ্র হিসাবে ব্যাখ্যা করা গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার নূতন উদ্ভাবন নয়। ইহার পূর্বেই স্টাউট্ মনোযোগের সংশ্লেষণমূলক ক্রিয়ার উপর গুরুত্ব

আরোপ করিয়াছেন।[১] **কিন্তু মানসবৃত্তি যে একটি সমগ্র বস্তু, গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার পূর্বে ইহা প্রয়োগ বা পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণিত হয় নাই।** আবার, গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যা শুধু মানসবৃত্তির নয়, আনুষঙ্গিক শারীব-ক্রিয়ার সমগ্রতাও প্রমাণ করিয়াছে।

গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যা এখনও পরীক্ষামূলক স্তরেই রহিয়াছে। আবার, কোয়েলর্ বাহ্যবস্তুর সমগ্রতা দেখাইতে গিয়া মনোবিদ্যার সীমা অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাড়া, চিন্তন এবং শিক্ষণ ব্যাপাবে পরিজ্ঞান বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

গেস্টাল্ট্ মনোবিদ্যার আরও বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া উহার প্রত্যক্ষ[২] এবং শিক্ষণ[৩] সম্বন্ধীয় মত যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

৮। মনঃসমীক্ষণ বা সাইকো-অ্যানালিসিস্

মনঃসমীক্ষণকে (সাইকো-অ্যানালিসিস্), অস্বভাবী মনোবিদ্যার একটি সম্প্রদায় বলা হইয়া থাকে। কিন্তু মনঃসমীক্ষণ শুধু মানস রোগের বর্ণনাই নয়, উহার চিকিৎসাও বটে। ইহা শুধু তাত্ত্বিক (থিওরেটিক্যাল) নয়, কিন্তু ব্যবহারিক (প্র্যাক্টিক্যাল্) মনোবিদ্যাও বটে। আবার, ইহা শুধু অস্বভাবী মনোবিদ্যাই নয়, কিন্তু শিশু মনোবিদ্যা, শিক্ষা মনোবিদ্যা, সমাজ মনোবিদ্যাও বটে। মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে বিভিন্ন মনোবিদ্যার শাখা, এমন কি সাধারণ মনোবিদ্যাও গড়িয়া উঠিয়াছে।

গভীরতা-মনোবিদ্যা (ডেপ্থ্ সাইকলজি)

মনঃসমীক্ষণ (সাইকো-অ্যানালিসিস্) সিগ্‌মণ্ড্ ফ্রয়েড্-এর উদ্ভাবন। ইহাকে মনঃসমীক্ষণ বলা হয়, কারণ ইহা মনের অন্তস্তলে আসংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান স্তর অনুসন্ধান করে। আবার উপরোক্ত কারণেই ইহাকে গভীরতা

১ জি. এফ্. স্টাউট্—এ ম্যানুয়্যাল অফ্ সাইকলজি—প্রথম খণ্ড—তৃতীয় পরিচ্ছেদ—ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ।

২ এই গ্রন্থের চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ—ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩ এই গ্রন্থের উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ—নবম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

মনোবিদ্যাও (ডেপ্‌থ্‌ সাইকলজি) বলা হইয়া থাকে। ইহার মতে দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি, স্বপ্ন এবং মনোরোগ মনের গভীরতম নির্জ্ঞান স্তরে নির্বাসিত অবদমিত বাসনার বিকৃত প্রকাশরূপে ঘটে। এই অবদমিত (রিপ্রেস্‌ড্‌) বাসনাগুলিই সকল রোগলক্ষণের (সিম্প্‌টম্‌) কারণ।

মনের তিনটি স্তর

মনঃসমীক্ষণ মতে মনের তিনটি স্তর আছে—যথা সংজ্ঞান (কন্‌সাচ্‌), আসংজ্ঞান (প্রি-কন্‌সাচ) এবং নির্জ্ঞান (আন্‌কন্‌সাচ্‌)।[১] আবার অন্য দিক্‌ দিয়াও মনকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। শিক্ষা ও কৃষ্টির বিরোধী সংজ্ঞান ইচ্ছা, অবদমনের ফলে, নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত হইয়া অজ্ঞাতবাস করে। এই সকল ইচ্ছা প্রধানতঃ কামজ (সেক্সুয়্যাল্‌) বা যৌন। ইহাদের সমষ্টিকে ফ্রয়েড্‌ বলেন **অদস্‌ (ইদ্‌)**। অদস্‌ অন্ধভাবে কামজ ইচ্ছাগুলি সংজ্ঞান মনে প্রকাশ করিতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু মনের আর একটি অংশের প্রধান চেষ্টা আত্মরক্ষা। ইহার নাম **অহম্‌ (ইগো)**। অদস্‌ এবং অহম্‌-এর অতিরিক্ত মনের তৃতীয় স্তরটির নাম **অধিশাস্তা বা বিবেক** (সুপার্‌-ইগো, কন্‌সায়েন্স্‌, ইগো-আইডিয়্যাল্‌, সেন্সর্‌)। ইহার কাজ অদস্‌-এর অন্ধ ইচ্ছাগুলিকে শাসন করা। অহম্‌-এর অবস্থাটি সঙ্গীন। ইহাকে অদস্‌-এর প্রবল চাপ এবং অধিশাস্তার শাসন সহ্য করিতে হয়। ফ্রয়েড্‌ বলেন যে আত্মরক্ষার জন্য অহম্‌-এর উপরোক্ত দুইটি মনিবকেই সন্তুষ্ট রাখিতে হয়।

নির্জ্ঞান ইচ্ছার সক্রিয়তা

অবদমিত ইচ্ছা নির্জ্ঞানে নির্বাসিত হইয়া নিষ্ক্রিয় থাকে না, কিন্তু সংজ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করিতে সক্রিয় থাকে। প্রকৃত রূপে আত্মপ্রকাশ করিলে অধিশাস্তার দ্বারা আবার নির্জ্ঞানে বিতাড়িত হইবার আশঙ্কায়, উহারা আত্ম-গোপন করিয়া অথবা ছদ্মবেশে প্রকাশিত হয়। নির্জ্ঞান অবদমিত ইচ্ছার ছদ্ম বা বিকৃত প্রকাশই দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তিতে, স্বপ্নে এবং মানসরোগের বিচিত্র লক্ষণে দেখা যায়।

---

১ এই গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

নির্জ্ঞান ইচ্ছার প্রকাশ প্রণালী

নির্জ্ঞান ইচ্ছার বিকৃত প্রকাশ-প্রণালী (মেকানিজ্‌ম্) ফ্রয়েড্ তাঁহার স্বপ্ন বিশ্লেষণ (ড্রিম্-অ্যান্যালিসিস্) প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। উহাদের বিস্তৃত আলোচনা স্বপ্ন শীর্ষক অনুচ্ছেদে[১] দ্রষ্টব্য। ইহারা পাঁচ প্রকার, যথা **প্রতীকতা** (সিম্‌বলিজ্‌ম্) যাহার দ্বারা বুঝায় যে স্বপ্নে প্রকাশিত প্রত্যেকটি অংশই কোনো নির্জ্ঞান ইচ্ছা বা চিন্তার প্রতীক ; **নাটন** (ড্রামাটাইজেশন্), যাহার ফলে স্বপ্নের প্রকাশিত রূপগুলি একটি কাহিনী বা গল্পের আকার ধারণ করে ; **যুক্ত্যাভাস** (র‍্যাশন্যালাইজেশন্), যাহার ফলে স্বপ্নের আজগুবি প্রকাশগুলি সুবিন্যস্ত বা সুসঙ্গত আকারে দেখা দেয়, **সংক্ষেপণ** (কন্‌ডেন্‌সেসন্), যাহার ফলে অনেকগুলি নির্জ্ঞান ইচ্ছা স্বপ্নের এক একটি প্রকাশের মধ্য দিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে পরিণত হয় ; **অভিক্রান্তি** (ডিস্‌প্লেস্‌মেণ্ট্), যাহার ফলে স্বপ্নের প্রকাশিত রূপে প্রধান বা মুখ্য নির্জ্ঞান ইচ্ছাগুলি গৌণ এবং গৌণ ইচ্ছাগুলি মুখ্য বা প্রধান স্থান অধিকার করে।

ভুল-ভ্রান্তি, স্বপ্ন এবং মনোরোগের বিশ্লেষণ বা মনঃসমীক্ষণ বলিতে বুঝায় উহাদের অন্তর্নিহিত নির্জ্ঞান অবদমিত ইচ্ছাগুলির উদ্ঘাটন। অবাধ ভাবানুষঙ্গই (ফ্রী অ্যাসোসিয়েশন্) বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি

অবাধ ভাবানুষঙ্গের (ফ্রী অ্যাসোসিয়েশন্) প্রণালী এইরূপ :—রোগীকে শান্ত ও স্বচ্ছন্দভাবে একটি আরাম কেদারায় হেলান দিয়া বসিতে বা শুইতে বলা হয় এবং তাহার মনে যে কোনো চিন্তা, ভাব বা ইচ্ছা আসে, তাহা সংযত বা নিরুদ্ধ না করিয়া অবাধে বলিয়া যাইতে নির্দেশ দেওয়া হয়। বলিতে আরম্ভ করিয়া যেখানে যেখানে রোগী আট্‌কাইয়া যায়, সেই সকল স্থানে তাহার গূঢ়ৈষা (কম্‌প্লেক্স্) থাকে, ধরিয়া লওয়া হয়। রোগীকে পুনরায় এই সকল নিরুদ্ধ ইচ্ছা বা ভাবগুলির উপর অবাধ ভাবানুষঙ্গ করিতে বলা হয়। এইরূপে যতই রোগীর নির্জ্ঞান অবরুদ্ধ ইচ্ছা বা ভাবগুলি সংজ্ঞানে নিঃসারিত (ক্যাথার্সিস্) হয়, ততই তাহার রোগলক্ষণের উপশম হইতে থাকে।

১ এই গ্রন্থের ত্রিংশ পরিচ্ছেদ, ৭, ৮, ৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সংক্রমণ (ট্র্যান্স্ফারেন্স্)

অবাধ ভাবানুষঙ্গের প্রবাহে একটি তৃণের মত বাহিত হইতে হইতে রোগীর আপাতবিস্মৃত জীবনস্মৃতিগুলি সংজ্ঞান মনে ভাসিয়া উঠিতে থাকে। ভাবানুষঙ্গ গভীরতর হইতে থাকে এবং সুদূর অতীতে নিরুদ্ধ এবং নির্জ্ঞানে নির্বাসিত ক্রমে অবদমিত বাসনাগুলি উহাদের আনুষঙ্গিক অনুভূতি বা প্রক্ষোভ সঙ্গে লইয়া জাগিয়া ওঠে। শৈশবের সকল ভালবাসা এবং ঘৃণার কেন্দ্র পিতামাতার স্থান গ্রহণ করেন স্বয়ং মনঃসমীক্ষক (সাইকো-অ্যানালিস্ট্)। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার অনুভূতিগুলি প্রকাশিত হয় এবং মনঃসমীক্ষকই রোগীর সকল ভালবাসা, ঘৃণা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি অনুভূতির লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ান। অবাধ ভাবানুষঙ্গের এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাটির নাম ট্র্যান্স্ফারেন্স্ বা সংক্রমণ, যাহাতে পিতামাতার প্রাপ্য সকল প্রকাশগুলি সংক্রামিত হয় মনঃসমীক্ষকে।

পুনঃশিক্ষা (রি-এডুকেশন্ টু রিয়্যালিটি)

এই সন্ধিক্ষণেই মনঃসমীক্ষকের যোগ্যতা পরীক্ষিত হয়। সাধারণ মনঃসমীক্ষক এই কঠিন অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া মনঃসমীক্ষণের চরম বা চূড়ান্ত স্তরে পৌছিতে পারেন না। এই অবস্থায় মনঃসমীক্ষক রোগীকে তাহার ভুলভ্রান্তি বুঝাইয়া দেন এবং তাহাকে বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া চলিবার পুনঃশিক্ষা দিয়া মনঃসমীক্ষণ সমাপ্ত করেন। এই পুনঃশিক্ষণেব ফলে রোগী সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসে।

পাঠ্য পুস্তকাংশ

আর এস্ উড্ওয়ার্থ—কন্টেম্পোরারি স্কুল্স্ অফ্ সাইকলজি
—দ্বিতীয়, চতুর্থ, সপ্তম পরিচ্ছেদ

জি. এফ্. ষ্টাউট্—এ ম্যানুয়াল্ অফ্ সাইকলজি—আপেন্ডিক্স্

জি. মার্ফি—জেনার‍্যাল সাইকলজি—অষ্টাবিংশ পবিচ্ছেদ

ডবল্যু. বি. পিল্স্বারি—এ হিষ্টরি অফ্ সাইকলজি—পঞ্চাদশ, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

জি, মার্ফি—অ্যান্ হিষ্টরিক্যাল্ ইন্ট্রোডাক্শন টু মডার্ন সাইকলজি
—পনেরো, ষোল, আঠার, কুড়ি, বাইশ পবিচ্ছেদ

Exercise

1. Distinguish between what you mean by the 'branches' and 'schools' of psychology. (p. 702)

2. Distinguish between the so-called structure and function ot minc
(pp. 703-70·
3. Give a short history of the structural school of psychology. Wh
does Titchener call himself an Existentialist ? (pp. 704-70'
4. Give a short history of the functional school of psychology. Ai
structuralism and functionalism opposed to each other ?
(pp. 707-70
5. What are the main theses of Behaviourism ? Give a critical analys
of these theses. (pp. 709-71
6. Does Behaviourism succeed in banishing all reference to mind fro
psychology ? Discuss. (pp. 712-71
7. Give a short history of Hormic psychology. (pp. 713-71
8. Bring out the main contentions of Gestalt psychology.
9. Explain the main contributions of Gestalt psychology to tl
problem of perception and learning. (pp. 715-71
10. Point out the main features of psychoanalysis. (pp 718-72

মনোবৈজ্ঞানিক পরিভাষা

Ability—সামর্থ্য
Abnormal—অস্বভাবী
Abstract—বিমূর্ত
Accommodation—উপযোজন, অভিযোজন
Achromatic—অবর্ণ
Acromegaly—অতিবৃদ্ধি
Action—ক্রিয়া
Act Psychology—ক্রিয়া-মনোবিদ্যা
Adaptation—প্রতিযোজন, অভিযোজন
Adequate Stimulus—পর্যাপ্ত উদ্দীপক
Adjustment—উপযোজন
Adolescence—নবযৌবন
Adult—প্রাপ্তবয়স্ক
Aesthetic Sentiment—কান্তরস
Aetiology—নিদান
Affect—আধান
Affection—বেদনা
Afferent impulse—অন্তর্মুখ, সংবেদীয় প্রবাহ
After-image—অনু-প্রতিরূপ
After-sensation—অনু-সংবেদন
Alimentry canal—পৌষ্টিক নালী
All or none law—পূর্ণ বা শূন্য নিয়ম
Alternate—একান্তর
Altruistic—পরার্থকেন্দ্রিক
Ambiguous reversible perspective—দ্ব্যর্থবোধক প্রত্যাবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ
Ambivalence—উভয়বলতা
Ambivert—উভয়বৃত্ত
Amnesia—অস্মার
Ampullar sensation—দিগ্‌বেদনা
Anal eroticism—পায়ুকাম
Anabolism—উপচিতি
Analytical Psychology—বিশ্লেষক মনোবিদ্যা
Animal Psychology—প্রাণি-মনোবিদ্যা
Anticipation—পূর্বজ্ঞান
Aphasia—বাগ্‌রোধ
Apperception—সংপ্রত্যক্ষ
Applied Psychology—ফলিত মনোবিদ্যা
Aqueous humor—জলীয় পদার্থ
Articular sensation—সন্ধি সংবেদন
Ascending tract—ঊর্ধ্ববাহী অঞ্চল
Assimilation—সদৃশীকরণ
Association—অনুষঙ্গ
Association area—অনুষঙ্গ অঞ্চল
Association of ideas—ভাবানুষঙ্গ
Associationism—অনুষঙ্গবাদ
Associative reflex—অনুষঙ্গ প্রতিবর্ত
Atrophy through disuse—অব্যবহারজনিত ক্ষীণতা
Attention—মনোযোগ
Attitude—প্রতিন্যাস
Audile—শ্রবণপ্রতিরূপপ্রবণ
Auditory meatus—কর্ণপথ, কর্ণছিদ্র
Auditory sensation—শ্রবণ সংবেদন
Auricle, Pinna—কানের পাতা
Autistic thinking—স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তন
Automatic action—স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া
Autonomic nervous system—স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র
Auto-suggestion—স্বাভিভাব
Average—গড়

Background—পশ্চাদ্‌ভূমি
Beats—অধিকম্প
Behaviour—চেষ্টিত
Behaviourism—চেষ্টিতবাদ
Bi-dimensional—দ্বিমাত্রাত্মক
Binocular—দ্বি-চাক্ষুষ
Bladder—বস্তি
Blind-spot—অন্ধবিন্দু
Blood-vessel—রক্তবাহ

Catharsis—নিঃসারণ, বিরেচন
Cell—কোষ
Cell-body—কোষদেহ
Censor—প্রহরী
Cerebellum—লঘুমস্তিষ্ক
Cerebral hemisphere—মস্তিষ্ক-গোলার্ধ
Cerebro-spinal-axis—মস্তিষ্ক-সুষুম্না-কাণ্ড
Cerebrum—গুরুমস্তিষ্ক
Cervical—গ্রীবাদেশীয
Chain reflex—ক্রমিক প্রতিবর্ত, প্রতিবর্ত শৃঙ্খল
Chemical sense—রাসায়নিক ইন্দ্রিয়
Child Psychology—শিশু মনোবিদ্যা
Choice reaction-time—নির্বাচন প্রতিক্রিয়াকাল
Choleric—ক্রোধপ্রবণ
Choroid coat—রঙ্গীন পর্দা
Chroma—বর্ণমাত্র
Chronological age—ক্রমিক বয়স
Chronoscope—কালদৃক্‌
Clang—ঝঙ্কার
Clearness—বিশদতা
Clinical method—রোগিপরীক্ষা পদ্ধতি
Co-conscious personality—সহজ্ঞ ব্যক্তিত্ব

Coccyx—অন্ত্রিকাস্থি
Coenaesthesis—সমগ্র সংবেদন
Cognition—জ্ঞান, অবগতি
Cold sensation—শৈত্য সংবেদন
Cold-spot—শৈত্য-বিন্দু
Collective unconscious—সমষ্টি নির্জ্ঞান
Colour—বর্ণ
Colour-blindness—বর্ণান্ধতা
Colour-contrast—বর্ণ-বৈসাদৃশ্য
Colour-wheel—বর্ণচক্র
Colour-mixing—বর্ণ-সংমিশ্রণ
Colour prism—বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র
Coloured hearing—বর্ণযুক্ত শ্রবণ
Combination tone—যুক্তস্বন
Comic sentiment—হাস্যরস
Comparative Psychology—তুলনামূলক মনোবিদ্যা
Compensation—ক্ষতিপূরণ
Complementary colours—পরিপূরক বর্ণ
Complex—গূঢ়ৈষা, ভাবসমষ্টি
Complex-indicator—গূঢ়ৈষাসূচক
Complication—জটিলীকরণ
Compound reaction-time—যৌগিক প্রতিক্রিয়াকাল
Compromise formation—আপোষমূলক সংগঠন
Conation—ইচ্ছা
Concept—ধারণা, প্রত্যয়
Condensation—সংক্ষেপণ
Cones—শঙ্কু
Cone-vision—শঙ্কু-দৃষ্টি
Conflict—দ্বন্দ্ব
Conjunction—সংযোজন
Conscious—সংজ্ঞান
Constructive imagination—গঠনমূলক কল্পনা

Contiguity—সান্নিধ্য
Continuity—অনবচ্ছেদ, অবিরামত্ব
Contrast—বৈপরীত্য, বৈসাদৃশ্য
Controlled association—সংযত অনুষঙ্গ
Convergent—অভিসারী
Convolution—কুণ্ডলী
Co-ordination—সমন্বয়
Cornea—অচ্ছোদপটল
Correlation—পারম্পর্য
Correspondence—প্রতিষঙ্গ, মিল
Cortex—বহিঃস্তর
Cortical localization—বহিঃস্তরীয় নির্দেশ
Counting mania—গণনা-বায়ু
Creative synthesis—সৃজনী সংশ্লেষণ
Cretinism—বামনত্ব
Curiosity—ঔৎসুক্য
Curve—রেখাচিত্র
Cutaneous—চার্ম

Data—উপাত্ত
Day-dream—জাগর স্বপ্ন
Daylight vision—দিবাদৃষ্টি
Deep sensibility—গভীর সংবেদনশীলতা
Delayed reaction—বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া
Delayed conditioned reflex—বিলম্বিত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত
Delinquency—দুষ্ক্রিয়তা
Delusion—ভ্রান্তি
Dementia—চিত্তভ্রংশ
Depth Psychology—গভীরতা মনোবিদ্যা
Descending tract—নিম্নবাহী অঞ্চল
Desire—কামনা
Diagnosis—নিদান
Diagram—নক্সা
Difference tone—পার্থক্য স্বন
Digit—সংখ্যা
Dimension—মাত্রা
Disc—চক্রফলক
Discharge—নিঃসারণ, মোক্ষণ
Discrimination—বিনিশ্চয়
Discrimination reaction time—ভেদ প্রতিক্রিয়াকাল
Disjunction—বিযোজন
Displacement—অভিক্রান্তি
Disposition—স্বভাব
Dissociatian—বিষঙ্গ
Double-aspect theory—দ্বিভঙ্গী মতবাদ
Drainage theory—পরিবাহবাদ
Dramatization—নাটন
Dream-censor—স্বপ্নপ্রহরী
Dream-work—স্বপ্নকৃতি
Drive—নোদনা
Duct-gland—বহিঃক্ষরা গ্রন্থি
Ductless gland—অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি
Dull—অল্পধী
Dynamic Psychology—ক্রিয়া মনোবিদ্যা

Educational Psychology—শিক্ষা মনোবিদ্যা
Effector—সম্পাদক
Efferent impulse—বহির্মুখ, চেষ্টীয় প্রবাহ
Ego—অহম্
Egoistic—স্বার্থকেন্দ্রিক
Embodied mind—শরীরী মন
Emotion—প্রক্ষোভ
Empathy—সহানুভূতি
End-organ—প্রান্তাঙ্গ
Environment—প্রতিবেশ, পরিবেশ

Epicritic sensibility—বিলক্ষ্য বেদিতা
Epilepsy—ভ্রামর, মৃগী রোগ
Equilibrium sense—সাম্যবেদন
Exaltation—উল্লসন
Excitation—উত্তেজনা
Existentialism—সত্তাবাদ
Experience—অভিজ্ঞতা
Experiencing person—অভিজ্ঞাতা
Experimental—প্রায়োগিক
Extensity—ব্যাপ্তি, ব্যাপকতা
Exteroceptor—বাহ্যেন্দ্রিয়
Extrovert—বহির্বৃত্ত
Eye-ball—অক্ষিগোলক
Eye-lid—অক্ষিপল্লব
Eye-socket—অক্ষিগহ্বর

Facilitation—সৌকর্য, অনুকূলতা
Factor—আংশিক কারণ
Factor analysis—কারণ-বিশ্লেষণ
Faculty—শক্তি
Faith—আস্থা
Fatigue—ক্লান্তি, অবসাদ
Feeble-minded—ক্ষীণবুদ্ধি
Feeling—বেদনা
Figure—আকার
Fissure—ফাট, বিদার
Fixed idea—বদ্ধ-ভাব
Fluctuation—হ্রাসবৃদ্ধি
Fore-feel—পূর্বানুভব
Forgetfulness—বিস্মৃতি
Form-board test—আকৃতিপট্ট অভীক্ষা
Fraternal twins—ভ্রাতৃ-যমজ
Free association method—অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি
Free idea—মুক্ত-ভাব
Frequency—পৌনঃপুন্য
Frontal lobe—ললাটাঞ্চল
Functional Psychology—ক্রিয়া-মনোবিদ্যা
Fundamental tone—মূলস্বন

General ability—সাধারণ সামর্থ্য
Genetic method—জনি, বিবর্তন পদ্ধতি
Genital erotic—উপস্থ-কাম
Geometrical optical illusion—জ্যামিতিক দর্শনভ্রম
Glandular—গ্রন্থীয়
Graduated scale—অংশিত মানদণ্ড
Gustatory sensation—স্বাদ সংবেদন

Habitual action—অভ্যাস
Hallucination—মায়া, অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ
Heat-spot—তাপবিন্দু
Hedonic tone—বেদনা-রাগ
Heredity—বংশগতি
Hind-brain—পশ্চাৎ মস্তিষ্ক
Horizontal—আনুভূমিক
Horme—জৈব প্রেরণা
Hormic Psychology—উদ্দেশ্যবাদী মনোবিদ্যা
Hue—বর্ণমাত্র
Hypermnesia—অতিস্মরণ
Hypnotism—সংবেশন

Id—অদস্
Idea—ভাব
Ideal feeling—ভাবজ অনুভূতি
Ideational—ভাবনাত্ম
Ideo-motor action—ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া, ভাবগতি
Idiot—জড়ধী
Illusion—সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ
Image—প্রতিরূপ

Imageless thought—অপ্রতিরূপ চিন্তন
Imagery—প্রতিরূপ সমষ্টি
Imagination—কল্পনা
Imbecile—মন্দধী
Imitation—অনুকরণ
Immediate memory span—অব্যবহিত-স্মৃতি-প্রসর
Impression—ধারণা, ছাপ
Impulse—আবেগ
Inadequate stimulus—অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক
Inarticulate speech—অকথিত ভাষা
Inattention—অমনোযোগ
Incentive—প্রবোচক
Incubation period—তাপনকাল
Independent variable—নিরপেক্ষ ভেদ্য
Indifference interval—উদাসান্তর
Indirect vision—গৌণ, অর্জিত দর্শন প্রত্যক্ষ
Individual differences—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ
Individual Psychology—ব্যক্তি-মনোবিদ্যা
Industrial Psychology—শিল্পীয় মনোবিদ্যা
Inferiority complex—হীনতাভাব
Inhibition—বাধ
Innervation sense—নার্ভ-সংস্থান-বোধ
Insight—পরিজ্ঞান
Instinct—সহজ প্রবৃত্তি
Integration—সম্পূরণ, একীকরণ
Intellect—ধী
Intellectual sentiment—বুদ্ধিমূলক রস
Intelligence—বুদ্ধি
Intelligence Quotient—বুদ্ধ্যঙ্ক
Intelligence test—বুদ্ধি-অভীক্ষা
Intensity—তীক্ষ্ণতা, তীব্রতা
Intention—অভিপ্রায়
Interactionism—মিথষ্ক্রিয়াবাদ, অন্যোন্যক্রিয়াবাদ
Inter-brain—অন্তঃ-মস্তিষ্ক
Interference—বাধা
Internal organ—আন্তর যন্ত্র
Interoceptor—মধ্যেন্দ্রিয়
Intestine—অন্ত্র
Introspection—অন্তর্দর্শন
Introvert—অন্তর্বৃত্ত
Involuntary—অনৈচ্ছিক, প্রতি-ঐচ্ছিক
Iris—কণীনিকা
Irritability—উদ্দীপনশীলতা

Joint sensation—সন্ধি সংবেদন
Judgment—অবধারণা
Just noticeable difference—ঠিক বোধগম্য ভেদ

Katabolism—অপচিতি
Key-board—যোজক-পট্ট
Kinaesthetic sensation—চেষ্টা-বেদন সংবেদন
Knee-jerk—জানুক্ষেপ
Kymograph—গতিলিখ

Lachrymal gland—অশ্রুক্ষরণকারী গ্রন্থি
Larynx—স্বরযন্ত্র
Law of effect—ফলসূত্র
Law of exercise—পৌনঃপুনিকতা সূত্র
Law of relativity—আপেক্ষিকতা সূত্র
Latent content—অব্যক্ত উপাদান
Learning—শিক্ষণ

Lens—অক্ষিমুকুর
Local sign—দেশাভিজ্ঞান, স্থানীয় সঙ্কেত
Localisation—নির্দেশ
Logical memory—অর্থপূর্ণ শিক্ষণ
Lower limit—নিম্নসীমা
Lloyd Morgan's canon—লয়েড মর্গ্যান স্থত্র
Lumber—কটিদেশীয

Magnitude—মাত্রা
Manic-depressive insanity—খেদোন্মত্ত বাতুলতা
Masculine protest—পুরুষোচিত বিদ্রোহ
Masson Disc—ম্যাসন-এর চক্রফলক
Measurement—মাপনা, পরিমাপ
Mechanical—যান্ত্রিক
Medulla oblongata—সুষুম্না-শীর্ষক
Melancholic—বিষাদগ্রস্ত
Membrane—ঝিল্লী
Memory—স্মৃতি
Memory-image—স্মৃতি-প্রতিরূপ
Memory-span—স্মৃতি-প্রসর
Mental age—মানস বয়স
Mental Chemistry—মানস রসায়ন
Metabolism—বিপাক
Metaphysics—তত্ত্ববিদ্যা
Metronome—মাত্রামাপক
Mid-brain—মধ্য-মস্তিষ্ক
Migratory bird—অভিপ্রযাণীয় পক্ষী
Mood—মেজাজ
Moral sentiment—শীলরস
Morone—ক্ষীণধী
Motivation—প্রেষণা
Motive—উদ্দেশ্য
Motor sensation—চেষ্টীয়, গতিজ্ঞ সংবেদন

Multiple personality—বহু-ব্যক্তিত্ব
Muscular sensation—পেশীয় সংবেদন

Narcissistic—স্বকামী, স্বকামজ
Negative after-sensation—অসবর্ণ অনুসংবেদন
Nerve-cell—নার্ভ-কোষ
Nerve fibre—নার্ভ-তন্তু
Nervous impulse—নার্ভ-প্রবাহ
Nervous system—নার্ভতন্ত্র
Neural association—নার্ভীয় অনুষঙ্গ
Neurasthenia—স্নাযবিক অবসাদ
Neurosis—উদ্বায়ু
Nonsense syllables—অর্থহীন শব্দাংশ
Non-voluntary action—অনৈচ্ছিক ক্রিয়া
Normal—স্বভাবী
Normal probability curve—গড় সম্ভাবনা রেখাচিত্র
Normative—আদর্শনিষ্ঠ
Nucleus—কোষদেহকেন্দ্র

Object—বিষয়, বস্তু, পদার্থ
Objectless emotion—অমূলক প্রক্ষোভ
Objective—বিষয়গত
Objectivity—বিষয়মুখীনতা
Observation—পর্যবেক্ষণ
Obsessional Psychoneurosis—আবেশিক বায়ু
Occasionalism—প্রযোজনবাদ
Occipital lobe—দর্শনকেন্দ্র
Occupation—বৃত্তি, পেশা
Oedipus complex—ইডিপাস্ গূঢ়ৈষা
Olfactory-sensation—ঘ্রাণ সংবেদন
Omnipotence of thought—চিন্তার সর্বময়ত্ব

Optic nerve—দৃক্-নার্ভ
Optimist—আশাবাদী
Oral-erotic—মুখকাম
Organ—অঙ্গ, অবয়ব, যন্ত্র
Organic sensation—যান্ত্রিক সংবেদন
Organisation—সংগঠন
Organismic Psychology—অবয়বী মনোবিদ্যা
Oscillation—দোলন
Ossicles—কর্ণাস্থি
Overlapping—অধিক্রমণ
Over-learning—অতিরিক্ত শিক্ষণ
Over-tone—উপস্বন

Pain sensation—ব্যথা সংবেদন
Pain-spot—ব্যথাবিন্দু
Panpsychism—সর্বমানস বাদ
Pan-sexualism—সর্বকামবাদ
Paradoxical cold sensation—আপাতবিরুদ্ধ শৈত্য সংবেদন
Parallelism—সমান্তরালবাদ, সহচার
Paramnesia—স্মৃত্যাভাস, উপস্মরণ
Paranoia—ভ্রম বাতুলতা
Para-sympathetic nervous system—পরাসমবেদী নার্ভতন্ত্র
Parietal lobe—শিরকুন্তলাঞ্চল
Passion—অতিরাগ
Passive—নিষ্ক্রিয়
Patent content—ব্যক্ত উপাদান
Paternal twins—পিতৃ-যমজ
Pattern—আদর্শ, সংগঠন
Percept—প্রত্যক্ষ ফল
Perception—প্রত্যক্ষ
Performance—কৃতি
Performance test—কৃতি-অভীক্ষা
Periodic—পর্যাবৃত্ত
Periphery—বহিঃপ্রান্ত
Perseveration—অবিরতি
Personal equation—প্রাতিস্বিক ভ্রমাঙ্ক
Personality—ব্যক্তিত্ব, অস্মিতা
Pessimism—দুঃখবাদ, নৈরাশ্যবাদ
Phantasy—মনঃসৃষ্টি, অবাধ কল্পনা
Phi-phenomenon—ফাই ব্যাপার
Phlegmatic—শ্লেষ্মাপ্রবণ
Phrenology—মস্তিষ্কসংগঠন বিদ্যা
Physiological Psychology—শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা
Picture completion—ছবি সম্পূরণ
Pitch—স্বণতীক্ষ্ণতা
Plateau of learning—শিক্ষণের মালভূমি
Pleasure—সুখ
Pneumograph—শ্বাসলিখ
Point of view—দৃষ্টিভঙ্গী
Point scale—বিন্দুমান
Polymorphous perverse—বহুমুখ-কামী
Pons—যোজক
Positive—সদর্থক, ঘটনানিষ্ঠ
Positive after-sensation—সবর্ণ অনুসংবেদন
Practical—কার্যনিষ্ঠ, প্রায়োগিক
Pragnanz—সংগঠনপ্রবণতা
Preconcious—আসংজ্ঞান
Predisposition—প্রবণতা, পূর্বস্বভাব
Pre-scientific—প্রাগ্‌বৈজ্ঞানিক
Pressure sensation—চাপ সংবেদন
Pressure-spot—চাপবিন্দু
Primary colour—মৌলিক বর্ণ
Principle of serviceable associated habit—কার্যকরী অনুষক্ত-অভ্যাস সূত্র
Principle of closure—বন্ধনসূত্র
Prognosis—আরোগ্য-সম্ভাবনা
Projection—বহিঃক্ষেপণ, অভিক্ষেপ

Prompting method—স্মারণ পদ্ধতি
Prophetic dream—ভবিষ্যৎসূচক স্বপ্ন
Proprioceptor—আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়
Protensity—স্থায়িত্ব
Protopathic sensibility—অবিলক্ষ্য বেদিতা
Psychiatry—মনোরোগবিদ্যা
Psycho-analysis—মন:সমীক্ষণ
Psychochromaesthesia—বর্ণযুক্ত শ্রবণ
Psychological atomism—মানস পরমাণুবাদ
Psychologist's fallacy—মনোবিদের ভ্রম
Psycho-neurosis—বায়ুরোগ
Psycho-pathology—মনোরোগবিদ্যা
Psycho-physical—মানসদৈহিক
Psycho-physics—শারীর মনোবিদ্যা
Psychosis—বাতুলতা
Puberty—বয়:সন্ধি
Pupil—চক্ষুমণি
Pure sensation—শুদ্ধ সংবেদন
Purposivist—উদ্দেশ্যবাদী
Puzzle-box—ধাঁধা পিঞ্জর

Quality—প্রকারগত গুণ
Quantitative method—মাত্রিক, পরিমাণগত পদ্ধতি
Quantity—পরিমাণগত গুণ
Questionnaire—প্রশ্নাবলী

Random movement—অক্রম গতি
Range of attention—মনোযোগের গোচর
Rating scale—মাননির্ধারক
Rationalization—যুক্ত্যাভাস
Reaction formation—বিপরীত গঠন
Reaction-time—প্রতিক্রিয়াকাল
Reasoning—যুক্তি
Recency—সাম্প্রতিকতা
Receptor—গ্রাহক
Recognition—প্রত্যভিজ্ঞা, পুনর্জ্ঞান
Reconstruction method—পুনর্গঠন পদ্ধতি
Recurrent image—পৌন:পুনিক প্রতিরূপ
Redintegration—পুন:সমাকলন, পুনরেকীকরণ
Re-education to reality—বাস্তবানুগ পুন:শিক্ষণ
Reflection—প্রতিফলন
Reflex—প্রতিবর্ত
Reflex arc—প্রতিবর্তচক্রাংশ
Refraction—প্রতিসরণ
Refractory period—অবসাদকাল
Regression—প্রত্যাবৃত্তি
Reinforcement—বর্ধনক্রিয়া
Relative—আপেক্ষিক
Relaxation—শ্লথন, শিথিলতা
Repetition—পুনর্বৃত্তি
Repression—অবদমন
Reproduction—পুনরুৎপাদন
Resistance—বাধা
Resonance—অনুনাদ, অনুরণন
Resonator—অনুনাদক
Response—সাড়া, প্রতিক্রিয়া
Retention—ধৃতি, সংরক্ষণ
Retina—অক্ষিপট
Retinal unity and rivalry—অক্ষিপটীয় ঐক্য এবং দ্বন্দ্ব
Retinal zone—অক্ষিপটীয় মণ্ডল
Retroactive inhibition—প্রতীপ বাধ
Retrospection—পশ্চাদ্দর্শন
Review—পর্যালোচনা
Rhythm—ছন্দ

Rod-vision—দণ্ডদৃষ্টি
Rote learning—আবৃত্তি
Rotating drum—ঘূর্ণ-ড্রাম

Sacral—নিম্নদেশীয়
Sadism—ধর্ষকাম
Salivary gland—লালাগ্রন্থি
Sanguine—আশা-প্রবণ
Saturation—সম্পৃক্তি
Saving method—পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি
Scale—মান, মানক
Schizophrenia—চিত্তভ্রংশী বাতুলতা
Sclerotic coat—শ্বেত পর্দা
Score—সাফল্যাঙ্ক
Scoring method—যুগ্মস্মৃতি পদ্ধতি
Secondary elaboration—অনুযোজনা
Secondary sexual character—গৌণ যৌন লক্ষণ
Secretion—ক্ষরণ
Self—আত্মা
Self-assertion—আত্মসাম্মুখ্য
Self-consciousness—আত্মচেতনা
Self-regard—আত্মশ্রদ্ধা
Senile dementia—বার্ধক্যজনিত চিত্তভ্রংশ
Sensation—সংবেদন
Sensationalism—সংবেদনবাদ
Sense—জ্ঞানেন্দ্রিয়
Sense-organ—ইন্দ্রিয়যন্ত্র
Sense of guilt—অপরাধবোধ
Sensibility—বেদিতা
Sensory reaction time—সংবেদনজ প্রতিক্রিয়াকাল
Sensory-motor action—সংবেদন-চেষ্টীয় ক্রিয়া
Sensory nerve—সংবেদীয় নার্ভ
Sentiment—রস
Sentiment of the sublime—বিরাট রস
Sentiment of tragedy—করুণ, বিয়োগান্ত রস
Sentiment of the ludicrous—অদ্ভুত রস
Set—বিন্যাস
Shock amnesia—আভিঘাতিক অস্মার
Similarity—সাদৃশ্য
Simple reflex—সরল প্রতিবর্ত
Simultaneous contrast—যুগপৎ বৈসাদৃশ্য
Situational test—পরিস্থিতিমূলক পরীক্ষা
Skull—করোটি
Social heritage—সমাজগত বংশগতি
Social Psychology—সমাজ মনোবিদ্যা
Sociology—সমাজবিদ্যা
Solar spectrum—সৌর বর্ণালী
Somatic resonance—যান্ত্রিক ঝঙ্কার
Somaesthesis—দেহবেদিতা
Somnambulism—স্বপ্নচারিতা
Space perception—দেশ প্রত্যক্ষ
Special ability—বিশেষ সামর্থ্য
Special intelligence—বিশেষ বুদ্ধি
Specific energy—বিশিষ্ট শক্তি
Specious present—তথাকথিত বর্তমান
Spectrum—বর্ণালী
Spinal column—মেরুদণ্ড
Spinal cord—সুষুম্না কাণ্ড
Spontaneous—স্বতঃবৃত্ত
Standardization—নির্ধারণ
Stereoscope—ঘনদৃক্
Stimulus—উদ্দীপক
Stimulus-error—উদ্দীপক ভ্রম
Stop-watch—বিরাম ঘড়ি

Structural Psychology—অবয়ব মনোবিদ্যা
Style of life—জীবন পদ্ধতি
Sub-conscious—অন্তর্জ্ঞান
Sub-cutaneous—চর্মতলীয়
Subject—পাত্র
Subjective—পাত্রগত, মানস
Sublimation—উদ্‌গতি
Submissive instinct—বশ্যতাবৃত্তি
Substitute—প্রতিকল্প
Succession—পৌর্বাপর্য
Successive contrast—অনুবর্তী বৈসাদৃশ্য
Suggestion—অভিভাব
Summation tone—যোজিত-স্বন
Super-ego—অধিশাস্তা
Suppression—নিরোধ
Symbolism—প্রতীকতা
Sympathetic nervous system—সমবেদী নার্ভতন্ত্র
Symptom—রোগলক্ষণ
Synaesthesia—সহসংবেদন
Synapse—প্রান্ত-সন্নিকর্ষ
Synaptic delay—প্রান্তসন্নিকর্ষজ বিলম্ব
Synthesis—সংশ্লেষণ

Tachistoscope—ক্ষণদৃক্
Tactile—স্পার্শন
Taste-buds—স্বাদমুকুল
Taste sensation—স্বাদ-সংবেদন
Teleological determination—উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণ
Temperament—আয়ান
Temperature-spot—তাপবিন্দু
Temporal lobe—রগাঞ্চল
Tendency—প্রবণতা
Tendinous sensation—কণ্ডরা সংবেদন
Tension—টান, পীড়ন, চাপ
Test—অভীক্ষা
Thematic Apperception Test—কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষা
Theoretical—জ্ঞাননিষ্ঠ
Thinking—চিন্তন
Thoracic—বক্ষদেশীয়
Thought element—চিন্তা উপাদান
Thought-reading—ভাব-উদ্ধার
Threshold—সীমা
Tickling sensation—সুড়সুড়ি সংবেদন
Timbre—উপস্বন
Tint—আভা
Tonal gap—স্বনশূন্যতা
Tonal island—স্বনদ্বীপ
Tonal vision—শ্রুতদর্শন
Tone—স্বন
Tools of thinking—চিন্তার বাহন
Total situation—সমগ্র পরিস্থিতি
Trace conditioned reflex—রেখাত্মক সাপেক্ষ প্রতিবর্ত
Train of ideas—ভাবনা শৃঙ্খল
Trait—প্রলক্ষণ
Transference—সংক্রমণ
Transformation—রূপান্তর
Trauma—ঘাত
Trial and error—চেষ্টা ও ভ্রম সংশোধন
Tri-chromatic theory—ত্রিবর্ণবাদ
Tri-dimensional—ত্রিমাত্রাত্মক
Tropic action—অভিমুখী ক্রিয়া
Trust—প্রতীতি
Tuning fork—স্বনশূল
Twilight vision—সন্ধ্যাদৃষ্টি
Twins—যমজ
Tympanic membrane—কর্ণপটহ
Type—জাতিরূপ

Unconscious—নির্জ্ঞান
Understanding—বোধ
Uni-dimensional—একমাত্রাত্মক
Unit—একক

Variable—ভেদ্য
Vaso-motor—বাহনিয়ামক
Verbal association—বাচিক অনুষঙ্গ
Verbal report—বাচিক বিবরণ
Verbal suggestion—বাচিক অভিভাবন
Vertical—উচ্চ
Vertebrae—কশেরুকা
Vestibular sensation—কায়াস্থিতি বেদন
Visceral—আন্তর-যন্ত্রীয
Visile—চাক্ষুষ-প্রতিরূপ-প্রবণ
Vision—দর্শন, দৃষ্টি
Visual Taste—দৃষ্ট স্বাদ
Vitreous humor—গাঢ় তরল পদার্থ
Vividness—বিস্পষ্টতা
Vocation—বৃত্তি
Vocational guidance—বৃত্তীয় পরিচালনা
Vocational selection—বৃত্তীয় নির্বাচন
Volition—ইচ্ছা

Warmth—তাপ
Warning sense—সাবধানী বেদন
Weight—ভার, ওজন
Will—সঙ্কল্প, ইচ্ছা
Wish—আকাঙ্ক্ষা
Wish-fulfilment—আকাঙ্ক্ষা-পূরণ
Word-association—শব্দানুষঙ্গ

Yellow spot—পীতবিন্দু

Zone—স্থান, মণ্ডল

গ্রন্থকার-সূচী

বিষয়-সূচী